আয়ুর্ব্বেদ

মাসিকপত্র ও সমালোচক।

সম্পাদক—

কবিরাজ শ্রীবিরজাচরণ গুপ্ত কবিভূষণ।

,, শ্রীযামিনীভূষণ রায় কবিরত্ন এম. এ. এম. বি।

সহ-সম্পাদক— ,, শ্রীসত্যচরণ সেন গুপ্ত কবিরঞ্জন।

—:*:—

দ্বিতীয় বর্ষ।

(১৩২৪ আশ্বিন হইতে ১৩২৫ ভাদ্র)

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা, মাশুল।৵০

২৯ ফড়িয়া পুকুর ষ্ট্রীট, অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় হইতে

কবিরাজ শ্রীহরিপ্রসন্ন রায় কবিরত্ন কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও ৩১ নং

নন্দকুমার চৌধুরীর সেকেণ্ড লেন, সংস্কৃত প্রেস হইতে প্রকাশক কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

দ্বিতীয় বর্ষের প্রবন্ধ সূচী

(বর্ণমালানুসারে)

আয়ুর্ব্বেদ

মাসিকপত্র ও সমালোচক।

২য় বর্ষ। বঙ্গাব্দ ১৩২৪—আশ্বিন। ১ম সংখ্যা।

মঙ্গলাচরণ।

—:*:—

১

শাশ্বত যশঃ সৌরভে যাঁর সফল আত্মদান!
কণ্ঠ যাঁহার গাহিল প্রথম "তৎসবিতুর্" গান!
ভীত কম্পিত আর্ত্ত-নিনাদ বাজিল কোমল প্রাণে,
মৃতের জগতে ভ্রমিলেন যিনি অমৃতের সন্ধানে;
মহৎ হইতে মহীয়ান্ যিনি অণোরণীয়ান্ ধ্রুব;
সেই আত্রেয় এ নববর্ষে—করুণ মোদের শুভ।

২

অতুল শুভ্র-শুচি-গরিমায়-ধন্য গুরুর শিষ্য।
নয়নে যাঁহার উঠিল ফুটিয়া কল্প শেষের দৃশ্য।
গায়ত্রী যাঁর অথর্ব্ব বেদ, সংযম যাঁর শিক্ষা।
সত্য যাঁহার জীবনের ব্রত, ষড়-দর্শন দীক্ষা।
ছত্র চামর হেলায় ফেলিয়া ধরিলেন দীন-বেশ।
করুন্ মোদের মঙ্গল সেই ভিষক্ অগ্নি বেশ।

৩

শ্রীভগবানের "চর"রূপে যাঁর অবনীতে আগমন,
দৃপ্ত প্রতিভা প্রসবিল যাঁর "ছয় শত বিরেচন"
যজ্ঞ যাঁহার "জীব কল্যাণ", "আরোগ্য" যাঁর জপ,
কর্ম্মী, কর্ম্ম, জগৎ, এ তিন—বায়ু পিত্ত ও কফ,

ভূর্লোক, গোলক, ত্রিলোক, যাঁহার ছিলনাক অগোচর,
সেই **চরকের** আদর্শ পথে হইনু অগ্রসর !

৪

বিন্দুতে করি সিন্ধু সৃজন, কোটি তরঙ্গ দলি'—
সহসা ভাতিল মূর্ত্তি যাঁহার স্বর্ণ শিখায় জ্বলি।
শিরে অপূর্ব্ব অমৃত কুম্ভ, দুই করে বরাভয়,
ইঙ্গিতে যাঁর ঘুচিল নরের অকাল মৃত্যু ভয়।
মুক্ত উদার অন্তর যাঁর—দেব **ধন্বন্তরি**
তাঁহার চরণে, সবে মিলে আজ, বিনয়-প্রণাম করি।

৫

"শারীর বিদ্যা" যাঁহার নিক[illegible] [illegible]-বিদ্যা সম,
অনাথ আতুরে নিজ কোলে তুলে [illegible] যে নরোত্তম।
পর্ণ-কুটির দ্বারে এসে যাঁর—কত রাজা কত রাণী,
রত্ন খচিত মুকুট নামা'য়ে হইল যুক্ত-পাণি।
করিলেন যিনি প্রথম প্রচার—শস্ত্রের উপচার,
সে **সুশ্রুতের** চরণে মোদের অযুত নমস্কার।

৬

বৌদ্ধ যুগের বৈদ্য-প্রবর, আচার্য্য চূড়ামণি।
কর্ম্ম-ক্ষেত্রে বিভূতি যাঁহার, রোগীর রোদন-ধ্বনি,
আয়ুর্ব্বেদের আটটি অঙ্গে সদা সচেতন দৃষ্টি,
শত আগ্রহে ক্ষুদ্রের মাঝে গড়িলা বিরাট সৃষ্টি,
জুড়া'তে জীবের যন্ত্রণা জ্বালা **বাগ্‌ভট** যাঁর নাম,
তাঁহার প্রসাদে হউক মোদের পূর্ণ মনস্কাম !!

কবিরাজ শ্রীব্রজবল্লভ রায় কাব্যতীর্থ যোগবিশারদ।

আমাদের নববর্ষ।

আনন্দময় আশ্বিনে আমাদের আদরের ধন "আয়ুর্ব্বেদ" দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করিল আজ আমাদের আনন্দের দিন।

তোমরা হয় ত বলিবে—"বিশ্বের আয়ুর্ব্বেদের উপর দিয়া কত যুগ যুগান্তর বহিয়া গিয়াছে; তোমাদের আয়ুর্ব্বেদের উপর দিয়া কেবল একটী মাত্র বৎসর চলিয়া গেল; অখণ্ড দণ্ডায়মান মহাকালের একটী ক্ষুদ্র মুহূর্ত্ত—আপনার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া অতীতে গা' ঢালিয়া দিল;—ইহার জন্য আবার গৌরব কিসের? আনন্দই বা কেন?" বাস্তবিক এই "কেন"র উত্তর দিতে আমরা অক্ষম। আমরা জানি, আমাদের এই ক্ষুদ্র "আয়ুর্ব্বেদ" সেই বিশ্বের আয়ুর্ব্বেদের প্রতিনিধি,—তোমরা এই আয়ুর্ব্বেদের মহিমা ভুলিয়া গিয়াছ, তাই ভারত ব্যাপিয়া আজ আর্ত্তের অরুন্তুদ রোদন ধ্বনি! দেশে দেশে বিলাসীর শ্মশান-শয্যা বিস্তীর্ণ! অনন্ত জ্বালার অনন্ত চিত্র সম্মুখে রাখিয়া—শোকময়ী স্মৃতির সহস্র উৎপীড়ন স্বেচ্ছায় সহিয়া, তাই আমরা প্রাণের শূন্য সিংহাসনে আয়ুর্ব্বেদের পুনঃ-প্রতিষ্ঠার জন্য বড় ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছি। আমাদের কত যত্নের, কত সাধের, কত গৌরবের আয়ুর্ব্বেদ; আমাদের ইহ-পরকালের সর্ব্বস্ব, মানব জীবনের অবলম্বন, পৃথিবীর দর্প-দম্ভ "আয়ুর্ব্বেদ",—আজ এই নূতন বর্ষে নূতন হর্ষে,—কেন তাহাকে অভিনন্দন করিব না? অন্তরে-বাহিরে, স্থূলে, সূক্ষ্মে, সামঞ্জস্যের আকাঙ্খায় এতদিন যে মহা মুহূর্ত্তের অপেক্ষা করিয়াছিলাম, এই ত সেই শুভ অবসর! আজ আয়ুর্ব্বেদের "নব-বর্ষ', আজ 'পুরাতন'কে ভুলিয়া 'নূতন'কে আহ্বান করিতে হইবে। অতীতের সান্দ্র পাষাণ-দ্বার খুলিয়া যুগ যুগান্তের কত আনন্দ, কত বিষাদ, কত অভ্যুদয়, কত বিলয়, কত গঠন, কত ধ্বংস, কত উৎসব-ব্যসনের ইতি কাহিনী মাথায় বহিয়া, হতাশের নেত্রে অরুণোজ্জ্বল আশার আলোক তরঙ্গিত করিয়া, জরাজীর্ণ জগতে ব্যাধিশীর্ণ-জীবের শ্রবণ-পথে উৎসাহের অমৃত ধারা ঢালিতে, আয়ুর্ব্বেদের এই আত্ম প্রকাশ—এ ত বিধাতারই মঙ্গলাশিষ! ধর ধর বাঙ্গালী! এই মঙ্গলাশিষ মাথায় তুলিয়া ধর। তোমার জীবন কৃতার্থ হইবে! শরীরে—স্বাস্থ্যের অমলিন মণি দীপ-দীপ্তি ঝরিয়া পড়িবে! উচ্ছৃঙ্খল সংসারে—বিশ্ব লক্ষ্মীর চরণশায়ী পদ্ম শতদলে ফুটিয়া উঠিবে!

এক বৎসর পূর্ব্বে—ঠিক্ এমনি দিনে—কত আকুল আগ্রহে যাহাকে আদর করিয়া অভ্যর্থনা করিয়াছিলাম—আজ সে "পুরাতন" হইয়া কাল-সাগরে বুদ্‌বুদের মত মিশিয়া গেল! তাহার উত্তরাধিকারী হইয়া যে আসিয়াছে—সে নিশ্চয়ই "নূতন"। আয়ুর্ব্বেদের আজ "নূতন বর্ষ"; কিন্তু আয়ুর্ব্বেদ যে চির পুরাতন, তাহার আবার "নূতন বর্ষ" কি? আমরা হতভাগ্য ভারতবাসী—আমাদের জীবনে বৈচিত্র্য নাই, প্রাণে শাশ্বতী তৃপ্তি নাই, হৃদয়ে পাবনী শক্তি নাই, আমাদের

আবার "নববর্ষ" কোথায়? আমরা ত একই ভাবে—চিরকাল বর্ষ ভোগ করিয়া আসিতেছি! আমাদের চতুর্দ্দিকে প্রকৃতি—বিকৃতিময়ী, জল-বায়ু অস্বাস্থ্য কর, ভূমি-সার শস্য-বিরলা, গাভী—ক্ষীণ পয়স্বিনী, তরুলতা—দীন ফলবতী; নদ নদী—শূন্য সলিলা,—আমাদের সবই যে পুরাতন! আমাদের ঋষি-রচিত সুখের সংসার—অনৈক্য-দুষ্ট, শিল্প—স্মৃত্যাবশিষ্ট; যে দিকে চাহি -সর্ব্বত্র কেবল অভাব, অধর্ম্ম, অকাল মৃত্যু, অশান্তি আর অন্নকষ্ট! আমরা আবার নূতন কোথায় পাইব? আমাদের জীবনে নববর্ষের সার্থকতা কি? বর্ষ যায়, বর্ষ আসে; বর্ত্তমান—অতীতে রূপান্তরিত হয়, আমরা কেবল তাহারই পদক্ষেপ গণনা করি! অশ্রুসিক্ত নয়নে, আমরা কেবল চাহিয়া দেখি—কল্পিত সুখের সহস্র স্মৃতি, সুপ্ত কামনার অযুত স্বপ্নজাল, আর আশা আকাঙ্খার অসংখ্য অবশেষ!!

কিন্তু তবুও নূতনের মোহ অপরিহার্য্য! মানুষ নূতনকেই ভাল বাসে। নূতনের পিপাসা—ভীষ্মের পিপাসা। নায়কের লেখক এবং লেখকের নায়ক একটা বড় পাকা কথা বলিয়াছেন—"প্রেম পুরাতন হইবার উপক্রম হইলে, উহা পুত্র-বাৎসল্যে নূতন করিয়া ফুটিয়া উঠে। পুত্র-কন্যার নবীনতা ক্ষীণ হইয়া পড়িলে, উহা পৌত্রে-দৌহিত্রে প্রবল ভাবে নবীন হইয়া দাঁড়ায়।" সুতরাং নবীনতার আদান-প্রদানেই মানুষের জীবন। মানুষের কর্ম্ম-কোলাহল পূর্ণ প্রাণ-গতি নবীনতার স্বাদ গ্রহণের জন্যই অজানা-পথে অগ্রসর। তাই সে শোকে অশোকে, দুঃখে সুখে, জয়ে পরাজয়ে, অবসাদে উন্মাদনায়,—পুরাতনকে নূতন করিয়া একটু জিরাইবার অবসর খুঁজিয়া লয়। মানব-ইতিহাসে—এই অবসরের নাম "নববর্ষ"।

আমাদের আয়ুর্ব্বেদ ও সেই জীবন-মরণের, অপচয় উপচয়ের, তাপ-শান্তির, গতাগতির অভিব্যক্তি। আয়ুর্ব্বেদ আমাদের জন্ম-জন্মান্তরের, পিতৃ পিতামহের পুরুষ পরম্পরার অক্ষয় কর্ম্মক্ষেত্র। আয়ুর্ব্বেদের প্রসাদে—এখনও আমরা গৌরবের—মনুষ্যত্বের—বীরত্বের—জগজ্জয়ের শ্লাঘা করিতে পারি! আমাদের অনন্ত অতীতের স্পর্দ্ধা আয়ুর্ব্বেদ—আজ পুরাতন হইয়াও "নূতন", আয়ুর্ব্বেদের "নববর্ষ" আমাদের ত্রুটী সংশোধনের অবসর, পশ্চাদবলোকনের অবকাশ, হৃদয়ের শান্তির শ্বাস, উদ্যমের ক্ষণ-বিশ্রাম, জীবনের আমিত্বের পরিচ্ছেদ।

পল্লবে-পল্লবে সুষমা ছড়াইয়া, মুকুলে-মুকুলে হাসি ফুটাইয়া, বাতাসে-বাতাসে গন্ধ বিলাইয়া শরৎ আসিয়াছে। আকাশ—নীল-স্বচ্ছ-অনুদ্বেল, জলে—কুমুদ কহ্লার কমলদল, মাঠে -দূর বিসর্পি হরিৎ শোভা, আলোক বায়ুর অফুরন্ত হিল্লোলে মেদিনী মোদিনী; কোটি উষার অরুণ রাগ মাখিয়া, কাশ কুসুমের আস্তরণের উপর দিয়া, দশহাতে শেফালীর লাজ বর্ষণ করিতে করিতে—স্থল পদ্মের সঙ্গে রাঙা হাসি হাসিতে হাসিতে,—আনন্দময়ী মা আসিতেছেন! সারা বঙ্গে মহামহোৎসবের সাড়া পড়িয়াছে; এইত আয়ুর্ব্বেদের বিকাশের শুভদিন। আমাদের মানবতার হিমগিরি, জগজ্জননীর লীলাক্ষেত্র। আমাদের দেহ পর্ব্বে-পর্ব্বে উৎপন্ন, মেরুদণ্ড পর্ব্বে-পর্ব্বে সুসজ্জিত,—তাই এ দেহের একটী নাম পর্ব্বত, সেই দেহের কন্যা রূপিনী—মা আমার "পার্ব্বতী"। এই শুভ মুহূর্ত্তে—সাধক পার্ব্ব-

তীর যোগনিদ্রা ভাঙ্গাইবার আয়োজন করিয়াছেন। তবে আমরাই বা নীরব থাকিব কেন? আমাদের কার্য্যও ত উদ্বুদ্ধ শক্তিতে —ষট্‌চক্র ভেদ করা। তবে এসো ভাই! এসো—আজ মঙ্গল শঙ্খ বাজাইয়া, জলের ঝারি দিয়া, এই ফুল্ল শরতে আমরা "নববর্ষের' সাধনা করি। সত্যে, সদ্ভাবে, প্রেমে—হৃদয় পূর্ণ করিয়া, ব্যর্থ আশার বেদনা চাপিয়া, সনাতন ও পুরাতনকে আজ নূতন করিয়া ডাকিয়া লই। ঐ শুন কবি বলিতেছেন,—

"গত আয়ু প্রায়　　গত বর্ষ যায়,
যাক্, দেও গত হ'তে।
হৃদয়-মন্দিরে　　অসত্য নিবারি
শিখ'হ পূজিতে সতে।
ঐ বাজে হোরা　　দিয়া অশ্রুধারা
প্রাচীনে বিদায় দাও।
বাজে সুখ হোরা,　আনি আত্মঝারা
নূতনে ডাকিয়া লও।"

পুরাতনে ও নূতনে মিলিয়া আমরা আয়ুর্ব্বেদের সাধনা করিব। নববর্ষে নব-উদ্যমে, সিংহবাহিনীর সন্তাপ-হারিণী মূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইব। হয় ত এই সাধনার ফলে, সত্য সত্যই একদিন আমাদের চির পুরাতন "আয়ুর্ব্বেদে" দিব্য জ্যোতির্ম্ময় "নববর্ষ" আসিবে। আমাদের সাধনা কবির হাতে কবিতা হইয়া ফুটিবে। গায়কের কণ্ঠে সঙ্গীত হইয়া ঝরিবে, বাদকের বীণায় ঝঙ্কার হইয়া ক্ষরিবে, মানবের প্রাণে স্বর্গ হইয়া জাগিবে।

এসো তুমি—এসো হে নবীন অতিথি—নববর্ষ! যে ভাবেই আসিয়া থাক'—এসো। তোমার চরণে—আজ আমাদের ভিক্ষা,—এই মহা যুদ্ধে আমাদের সম্রাট্‌কে বিজয় লক্ষ্মী দান কর। তোমার প্রসাদে—আমাদের দেশ ধন-ধান্যে সমৃদ্ধ হউক। আমাদের "আয়ুর্ব্বেদে" পূর্ণ সত্ত্ব ও পূর্ণ তত্ত্ব বিরাজ করুক। আমাদের এই ক্ষুদ্র পত্রিকা তান্ত্রিকের যন্ত্র লিপির মত বিশ্বজনীন হউক।

গতবর্ষে আমাদের অনেক ভুল-ভ্রান্তি হইয়া গিয়াছে। কত সুবর্ণ সুযোগ আমরা হেলায় হারাইয়াছি। কত আত্মীয়ের মনে নিদারুণ ব্যথা দিয়াছি। নিষ্ফল-কামনায় কত অরুন্তুদ যন্ত্রণা প্রাণের ভিতর পোষণ করিয়াছি! আমাদের সে প্রমাদ-অবসাদ, অপ্রেম-অসদ্ভাব, অপূর্ণ অভাব—এ বৎসর যেন আমরা সংশোধন করিয়া লইতে পারি।

ঋষিত্বের দোহাই দিয়া,—নবোদ্যমে আবার আমরা কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিলাম। আমাদের ভরসা—গ্রাহকগণের উদার অনুগ্রহ। উদ্দেশ্য—রোগ-বিজয়। মূলমন্ত্র—বিজ্ঞানের উন্নতি। লক্ষ্য—আয়ুর্ব্বেদের মহিমা প্রচার। সহায়—সর্ব্ব-বিপদহারী নারায়ণ। আমরা জানি, আয়ুর্ব্বেদের উন্নতি সাধন—অসাধ্য ব্যাপার। ইহাতে ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা, যুধিষ্ঠিরের সত্যবাদিতা, কর্ণের উদারতা, ভীমের বল, লক্ষ্মণের উৎসর্গ, বিদুরের তেজ এবং কুবেরের ঐশ্বর্য্য চাই। দীন-দরিদ্র-ভিক্ষুক আমরা,—আমাদের তো কিছুই নাই। কিন্তু নিজের দেশের—নিজের জাতির সব ভুলিয়া, যে পাপাচার করিয়াছি, তাহাতে মহর্ষির পুণ্যাশ্রম কলুষিত হইয়াছে। সেই পাপাচারের প্রায়শ্চিত্ত—আয়ুর্ব্বেদকে রক্ষা করা। এক আয়ুর্ব্বেদের উন্নতিই আমাদিগকে অনন্ত নিরয় হইতে রক্ষা করিতে পারে। আমাদের এই ক্ষুদ্র পত্রিকা—আমাদেরই "কলঙ্কভঞ্জনের" প্রথম হেমকুম্ভ। কালদুহিতা কালিন্দীর কাল

জলে ঘট পূর্ণ করিয়া, আমরা ত সরম-সঙ্কুচিতা রাধার মত ভয়ে ভয়ে শত কৌতূহলী ব্যগ্র-দৃষ্টির সম্মুখে দাঁড়াইয়াছি—ইহাতে সহস্র ছিদ্র থাকুক,—এ যে তোমাদের গর্ব্ব-গৌরব-শ্লাঘার জিনিষ। উৎসাহের হুলুধ্বনি দিয়া, তোমার একবার ইহাকে রত্নবেদীর উপর বসাইয়া দাও। এ জলে তোমারি গৃহে—বিষ্ণুর মঙ্গলস্নান নিষ্পন্ন হইবে।

স্থৌল্য ও কার্শ্য।

স্থূল—রাম ও কৃশ—শ্যাম।

—:*:—

শ্যা। কি হে ভায়া, এ যে ক্রমশঃ বেজায় রকম গজা'চ্চ দেখ্‌ছি! শেষে দরজা কাটা'তে হবে।

রা। তবে কি তোমার মত রোগা হ'তে বল নাকি। কোন্ দিন হাওয়ার সঙ্গে মিশিয়ে যা'বে দেখছি।

শ্যা। হাওয়ায় মিশি আর না মিশি—তা'তে বড় এসে-যাবে না। কিন্তু দেশের লোকের সবাই যদি তোমারই মত হইয়া পড়ে, তা'হ'লে বসুমতী উদ্ধার করবার জন্যে ভগবান্‌কে আবার বরাহরূপ ধারণ ক'র্‌তে হ'বে বোধ হয়।

রা। ভগবান্ বরাহ বা কূর্ম্ম হ'লে তা'তে বড় ক্ষতি হবেনা, বরং অবতারের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় পুণ্যি করবার আর একটা পথ পরিষ্কার হবে। কিন্তু যাই বল ভাই, আমি তোমার মতন রোগা হতে নারাজ। রোগা হ'ব,— বলকি—রোগা খেতে পায় না।

শ্যা। খাওয়ার পরিণাম যদি এই রকম হয় ভায়া, তা' হলে আমি না খেয়ে থাকাই ভাল মনে করি। একে জীবন নানা ভারে কাতর, তা'র ওপর দু'চার মোন 'মেদ' চাপিয়ে জীবনটাকে দুর্ব্বিবহ ক'র্‌তে আদৌ ইচ্ছে নেই।

রা। তবে মুখ্যু, একটু ভার থাকা ভাল, হাল্‌কা হওয়া কিছু নয়। শাস্ত্রকারও বলিয়াছেন,—শূন্য হ'লে সবই লঘু হয়, আর পূর্ণ হলেই গুরু হয়।

শ্যা। এত পূর্ণ নয় দাদা, পূর্ণতর—পূর্ণতমও তোমার কাছে এগুতে সাহস করে না! এযে ভায়া আবার নূতন ক'রে হিমালয়ের সৃষ্টি হ'চ্ছে দেখ্‌ছি।

রা। তা হ'লেই বোঝ—ভারটা কি রকম! একবার যদি তোমার ওপর চেপে প'ড়্‌তে পারি—তা হলেই ফর্সা।

শ্যা। সেটা ঠিক, তুমি একটা জ্যান্ত ষ্টিম্‌-রোলার। কিন্তু চেপে প'ড়্‌বে কি ক'রে? তোমার ভার তোমায় জড় পদার্থ ক'রে তুলেছে, আমরা ক্ষিপ্র গতিতে স'রে যেতে পারি। এস দেখি ভায়া, একবার দু'জনে একটু দৌড়ে দেখি, বুঝি—তুমি কতটা স্থাবর আর কতটা জঙ্গম!

শ্যা। বলিস্ কি! মানুষ—বিশেষতঃ ভদ্রলোকে দৌড়্‌বে! শাস্ত্রে বলে,—অশ্বো ধাবতি অর্থাৎ অশ্ব দৌড়িতেছে। তা ঘোড়া দৌড়ুক, হরিণ দৌড়ুক, বাঘ-ভালুক-গরু-বাছুর

দৌড়ুক। আর মানুষের মধ্যে ডাক হরকরা কি—বেহারা-কুলি দৌড়ুক। ভদ্রলোকে দৌড়ুবে কি! ভদ্রলোকে এই রকম গজেন্দ্র গমনে চল্‌বে।

রা। হাঁ গড়নে এবং আকৃতিতে গজেন্দ্রের সাদৃশ্য আছে বটে! পাশাপাশি দু'টো দাঁড়ালে,—কোনটা হাতী—ঠিক করা কঠিন হ'য়ে পড়ে।

(কবিরাজ মহাশয়ের প্রবেশ)

ক। কি হে তোমাদের দুজনের বিতণ্ডা হ'চ্ছে কিসের?

শ্যা। ভাল হ'য়েছে, কবিরাজ মহাশয়কে মধ্যস্থ মানা যা'ক—যে মোটা হওয়া ভাল, কি রোগা হওয়া ভাল?

রা। বেশ কবিরাজ মশায়ই মীমাংসা করুন।

ক। এর মীমাংসা ত প'ড়েই র'য়েছে, অর্থাৎ যে স্থূলদেহ=শ্যাম চন্দ্র, কৃশ দেহ=রাম চন্দ্র। তোমাদের উভয়ের দেহই নিন্দনীয়।

রাম ও শ্যাম। কি রকম কি রকম?

ক। শাস্ত্রে বলে;—

অত্যন্তগর্হিতাবেতাবতিস্থূলকৃশৌ নরৌ।
শ্রেষ্ঠো মধ্যশরীরস্ত কার্শ্যং স্থৌল্যাত্তু পূজিতম্।

অর্থাৎ অতি স্থূল এবং অতি কৃশ নর অত্যন্ত গর্হিত। মধ্য শরীর ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ। আবার মোটা হওয়ার চেয়ে বরং রোগা হওয়া ভাল।

রা। শুনচো শ্যাম ভায়া?

শ্যা। আরে গর্হিত ত দুজনেই, তা' না হয় এপিট আর ওপিট। তা'মোটা হওয়ার চেয়ে রোগা হওয়া ভাল কেন কবিরাজ মহাশয়?

ক। রোগা লোককে চিকিৎসা ক'র্‌লে তা'র কৃশতা সহজেই দূর করা যায়। কিন্তু মোটা লোককে চিকিৎসা ক'রে তা'র স্থৌল্য কমান অত্যন্ত কঠিন। শাস্ত্রে স্থৌল্যের চিকিৎসা নাই ব'লেই এক রকম লেখা আছে।

শ্যা। আচ্ছা কবিরাজ মহাশয়, মোটা হওয়ার দোষটা কি বলুন?

ক। মোটা হ'লে ক্ষুদ্র শ্বাস হয়—হাঁপাতে হয়। ক্ষুধা, পিপাসা, নিদ্রা ও ঘাম অধিক হয়, গাত্রে দুর্গন্ধ হয়, ঘুমুলে গলা ঘড়-ঘড় করে, শরীর অবসন্ন হয়, কথা অস্পষ্ট হয়. কোন শ্রম জনক কার্য্য করা যায় না, মেদ ধাতু অত্যন্ত বর্দ্ধিত হয় ব'লে, তার পরবর্ত্তী ধাতু অর্থাৎ অস্থি, মজ্জা ও শুক্র পুষ্ট হয় না, আর সেই জন্যে স্ত্রীসহবাসের ক্ষমতা খুব ক'মে যায়, প্রাণশক্তি (Vitality) অল্প হয়, এবং প্রমেহ, পিড়কা জ্বর, ভগন্দর, বড় ফোড়া কিম্বা বায়ুজনিত রোগে আক্রান্ত হ'য়ে প্রাণ ত্যাগ করে।

শ্যা। বলেন কি ম'শায় প্রাণত্যাগ?

ক। হাঁ বাপু! ওটা সকলকেই সময়ে ত্যাগ ক'র্‌তে হয়। তবে মোটা ম'শায়রা কিছু সকালে—সকালে করেন, আর যে রোগ গুলো বল্‌লাম, ওর মধ্যে একটা না-একটা রোগে ভুগে থাকেন।

রা। আর রোগা লোকেরা নীরোগ-শরীরে দীর্ঘকাল বেঁচে থাকে, কি বলেন কবিরাজ মশায়?

ক। না বাপু, ততটা সুবিধে ভগবান্ রোগা লোকদের দেন নি।

রা। তবে রোগা হওয়ার দোষটা কি বলুন?

ক। অত্যন্ত কৃশ ব্যক্তি ক্ষুধা, পিপাসা, শীত, গরম, প্রবল বায়ু ও বর্ষা সহ্য ক'রতে পারে না, প্রায়ই বায়ু-রোগে আক্রান্ত হয়, অল্প-প্রাণ হয়, কোন শ্রমজনক কাজ ক'র্‌তে

পারে না এবং শ্বাস, কাস, শেষে প্লীহা, উদর, অগ্নিমান্দ্য, গুল্ম, ও রক্তপিত্ত রোগে প্রাণ-ত্যাগ করে। কৃশ ব্যক্তির যে কোন রোগ জন্মায়, সেটা প্রবল হ'য়েই থাকে।

শ্যা। আচ্ছা কবিরাজ ম'শায়, মোটা হ'বার কারণটা কি বলুন দেখি ?

ক। অত্যন্ত পুষ্টিকর দ্রব্য প্রচুর পরি-মাণে খাওয়া, পরিশ্রম না করা, পূর্ব্ব আহার জীর্ণ না হ'তে খাওয়া, দিবাভাগে নিদ্রা যাওয়া, অতিরিক্ত শ্লেষ্মাবর্দ্ধক দ্রব্য খাওয়া প্রভৃতি কারণে মেদের বৃদ্ধি হ'লেই লোকে মোটা হ'য়ে পড়ে।

রা। আর লোকে রোগা হয় কেন কবিরাজ ম'শায় ?

ক। অত্যন্ত বায়ু বর্দ্ধক রুক্ষ খাদ্য খাওয়া, অতিরিক্ত পরিশ্রম, অতিরিক্ত মৈথুন অধিক অধ্যয়ন, ভয়, শোক, চিন্তা, রাত্রি-জাগরণ, পিপাসা ও ক্ষুধা সহ্য করা, কষা জিনিষ খাওয়া, অল্প পরিমাণে খাওয়া প্রভৃতি কারণে শরীরের রস-ধাতু ক্ষীণ হয় এবং অন্যান্য ধাতুকে ভাল রকম পোষণ ক'র্‌তে পারে না, কাজেই শরীর কৃশ হ'য়ে পড়ে।

শ্যা। আচ্ছা কবিরাজ ম'শায়, আপনি ত ব'ল্লেন যে, স্থৌল্য রোগের চিকিৎসাই নেই। তবে কি আমায় শরীর কমা'বার কোন উপায় নেই ?

রা। কেন হে ভায়া, কমা'তে চাও কেন ? এই যে ব'ল্‌ছিলে—ভার থাকা ভাল।

শ্যা। আরে রক্ষা কর ভায়া, দু' পা চল্‌তে পারিনে, একটু নড়তে-চড়তে হাঁস-ফাঁস ক'রতে হয়, আর এই গরমে যে কি কষ্ট হয়—তা' ব'লে বোঝাবার নয়।

ক। স্থৌল্য রোগের চিকিৎসা ক'র্‌তে হ'লে—প্রথমেই যে সকল কারণে রোগ জ'ন্মেছে, সে গুলি পরিত্যাগ ক'র্‌তে হ'বে।

শ্যা। কারণ কি—তা' জানবো কি করে ?

ক। এই যে আগে ব'লেছি—প্রচুর পুষ্টি-কর দ্রব্য খাওয়া, দিনে ঘুমান, পরিশ্রম না করা ইত্যাদি।

শ্যা। হাঁ বুঝেছি, বলুন।

ক। তা'র পর পথ্যের কথা বল্‌ছি। উড়ী ধান বা কাঙ্গনী ধানের চালের ভাত, যবের ভাত, যবের রুটী, কুলত্থি কলায়, মসূর, মুগ বা বুটের দাল, শাক, বেগুণ পোড়া, খই, মধু, ঘোল, তেঁতো, কষা ও ঝাল জিনিষ, সর্ষপ তৈল, এলা'চ, রুক্ষ খাদ্য, গরম জল—এই সব এ রোগে পথ্য। এ রোগে আহারের পূর্ব্বেই জলপান করা উপকারী। আর চিন্তা, পরিশ্রম, রাত্রি-জাগরণ, মৈথুন, উপবাস, রৌদ্রসেবন, পথভ্রমণ, মধ্যে মধ্যে বমি করা ও জোলাপ নওয়া, হাতী-ঘোড়া চ'ড়ে বেড়ান—এই সব উপকারী।

শ্যা। আচ্ছা ভাবনা যদি আপনা হ'তে না আসে, তবে ভাবনা আনবো কি করে ?

ক। ভাবনার মত শরীর রোগা কর্‌বার জিনিষ আর কিছু নেই। কথায় বলে—ভেবে-ভেবে রোগা হয়ে যা'চ্ছে। তা' যে লোকটার রোগ,—তা'র আত্মীয়-স্বজন কোন রকম যোগাড়-যন্ত্র ক'রে তাকে অন্য সম্বন্ধে বা কোন বিষয় সম্বন্ধে ভাবনায় ফেল্‌বে। তা'রপর শরীর রোগা হ'য়ে গেলে তাকে বুঝিয়ে ব'লবে যে, এই জন্যে তোমায় এই রকম ক'রে ভাবনায় ফেলেছিলাম।

শ্যা। আচ্ছা এখন এ রোগের কি কি অপথ্যের কথা বলুন ?

ক। ভাল চালের ভাত, গম থেকে প্রস্তুত খাবার জিনিষ, দুগ্ধ বা দুগ্ধ থেকে প্রস্তুত খাদ্য, গুড়, চিনি, মিছরী, মাষ কলায়, ঘৃত প্রভৃতি স্নেহ দ্রব্য, পেস্তা, বাদাম প্রভৃতি স্নেহ-বহুল ফল, আম, কাঁটাল প্রভৃতি মধুর ও পুষ্টিকর ফল, মৎস্য, মাংস, মধুর দ্রব্য, আহারের পর জলপান, মিষ্ট দ্রব্য, প্রভৃতি এ রোগে অপথ্য।

শ্যা। আচ্ছা মাছ কি কিছুই খাবার যো নেই ?

ক। মাছের মধ্যে একমাত্র চিংড়ি মাছ খাওয়া যায়। সুখে থাকা ও স্নান করা—স্থৌল্য রোগে যতদূর পারা যায় ত্যাগ করা উচিত।

শ্যা। তা' হ'লে পথ্য ত বড় বিপজ্জনক ?

ক। রোগ বিপজ্জনক হ'লেই পথ্যও বিপজ্জনক হয়। একজন কলিকাতার গণ্য মান্য ব্যক্তি এই রোগের প্রতিকারের জন্য কিছু দিন কেবল মুড়ি খেয়ে ছিলেন। তা'তেই তাঁর রোগ ভাল হ'য়ে গিয়েছিল।

শ্যা। আচ্ছা কবিরাজ মশায়, এখন এর ওষুদ কি আছে বলুন ?

রা। দাঁড়াও ভায়া—এক যাত্রায় পৃথক ফল! আমি রোগা, আমার কি পথ্য আগে ত জেনে নেই, তা'রপর তোমার কথা।

শ্যা। কেন হে, এই যে ব'ল্‌ছিলে রোগা থাকাই ভাল।

রা। ভাল বটে, তবে এতটা নয়, একটু শাঁসে-জলে হওয়া চাই বৈ কি! শীত কি গরম সহ্য হয় না, কষ্ট সহ্য হয় না, একটা বলবান্ লোক পাশ দিয়ে গেলে মনে হয়—ধাক্কা লেগে প'ড়ে যাই, আর রোজই একটা-না-একটা বায়ুর উপসর্গ আছেই।

ক। আচ্ছা শোন ব'লছি। যে সকল কারণে কৃশতা জ'ন্মেছে—যেমন অল্প আহার, উপবাস, অতিরিক্ত পরিশ্রম, পথ-পর্য্যটন, রাত্রি জাগরণ প্রভৃতি—সে সমস্ত ত্যাগ ক'রতে হ'বে। তা'র পর পুষ্টিকর জিনিষ, ঘৃত দুগ্ধ, লুচি, মৎস্য, মাংস, ক্ষীর, ছানা, মাখন, পেস্তা, বাদাম, আঁম, কলা প্রভৃতি মিষ্ট ফল, চিনি, মিছরী উত্তম চালের ভাত,—এই সব সুপথ্য। কটু, তেতো ও কষা দ্রব্য, শাক, সর্ষপ তৈল, মধু—এ সব দ্রব্য পরিত্যাগ ক'রতে হ'বে। আহারের পূর্ব্বে জলপান না ক'রে—পরে করা উচিত। পরিশ্রম না করা, সুখে থাকা, দিনে নিদ্রা যাওয়া, প্রচুর আহার করা, স্নান—এই সমস্ত কৃশতা রোগে হিতকর।

রা। এ দেখ্‌ছি শ্যাম ভায়ার যা' পথ্য' আমার তাই অপথ্য। আর শ্যাম ভায়ার যা' অপথ্য -আমার তাই পথ্য।

ক। হাঁ ঠিক তাই। কার্শ্য রোগে স্থৌল্য রোগের বিপরীত এবং স্থৌল্য রোগের বিপরীত ক্রিয়া কার্শ্যরোগে ক'র্‌তে হয়।

শ্যা। ভায়া, এখন রোগা হওয়াই ভাল মনে হ'চ্ছে। কেননা তোমার পথ্যের বন্দোবস্তটা বড় লোভনীয়।

রা। আর তোমার পথ্যটা তেমনি শোচনীয়। কোন জন্মে কখন যেন মোটা না হই।

শ্যা। দেখুন কবিরাজ ম'শায়, শ্যামকে ভালভাল জিনিষ খেতে ব'ললেন, আর আমাকে ভাল জিনিষ কিছুই খেতে ব'ল্‌লেন না। এটা আপনার অবিচার হ'ল।

ক। আমার বিচার ক'রবার ত অপেক্ষা রাখনি বাপু, আগে থেকেই মোটা হ'য়ে ব'সে আছ। যদি রোগা হ'তে পারতে,—তা' হ'লে ঐ রকম পথ্যই ঘট্‌তো। তবে একদিকে তোমার জিত আছে, রামের হাতী ঘোড়া চড়া

নিষেধ, কিন্তু তুমি যত খুসী—হাতী ঘোড়া চড়, পরিশ্রম কর, চিন্তা কর, রাতজেগে থিয়েটার দেখ।

রা। আচ্ছা। কবিরাজ মশায়, শ্যামকে দাল খেতে ব'লেছেন, তা' দাল কি আমার পক্ষে নিষেধ?

ক। দাল বায়ু-বর্দ্ধক ব'লে কৃশব্যক্তির পক্ষে অহিতকর, কিন্তু এর মধ্যে যুক্তি আছে;—প্রথমতঃ তোমার যদি নিত্য দাল খাওয়া অভ্যাস থাকে এবং দাল নইলে ভাল রূপ আহার ক'র্‌তে না পার—তা' হ'লে দাল সুপথ্য না হ'লেও অল্প-স্বল্প খেতে হ'বে। তা'রপর দাল রুক্ষ ব'লে বায়ু বর্দ্ধক, সুতরাং তুমি যদি দালে যথেষ্ট ঘৃত দিয়ে খাও—তা' হ'লে আর বায়ু-বর্দ্ধক হ'তে পারে না ব'লে কুপথ্য হয় না, বরং সুপথ্য হয়। আবার দেখ, শ্যামকে দাল খেতে বলা হ'য়েছে কিন্তু শ্যাম যদি দালে যথেষ্ট ঘৃত মিশ্রিত ক'রে খায়,—তা' হ'লে সেটা শ্যামের পক্ষে কুপথ্য হবে।

শ্যা। পথ্য সম্বন্ধে আমার সকল দিকেই সুবিধা দেখ্‌ছি। যাক্ এখন ঔষধের কথা বলুন।

ক। ওষুদের কথা ব'ল্‌ছি—কিন্তু কারণ পরিত্যাগ,পথ্য সেবন, অপথ্য ত্যাগ—এইগুলি আগে চাই। বরং ওষুদ না খেলে এতেই ফল হয়, কিন্তু এগুলি না ক'র্‌লে ওষুদে কিছু হয় না। শাস্ত্রে বলেছে,—পরিশ্রম, চিন্তা, স্ত্রী-সহবাস, পথভ্রমণ, মধু খাওয়া, রাত্রি জাগরণ, যব ও শ্যামা ঘাসের বীজের চালের ভাত আহার করা—এই সকলের দ্বারা স্থৌল্য রোগ অবশ্যই নষ্ট হ'য়ে থাকে। নিদ্রা না যাওয়া, মৈথুন, ব্যায়াম এবং চিন্তা—এ গুলি যাঁরা স্থৌল্য ত্যাগ ক'র্‌তে ইচ্ছা করেন—তাঁদের ক্রমশঃ বাড়ান উচিত।

শ্যা। তা' একেবারে না ঘুমিয়ে কি থাক্‌তে পারা যা'বে?

ক। আরে তাও কি হয়? না ঘুমিয়ে মানুষ কতদিন বাঁচ্‌তে পারে? তবে এতে ঘুম যত কমান যায়, ততই ভাল।

শ্যা। এইবার ওষুধের কথা বলুন।

ক। প্রাতে পুরাণ মধু মিশ্রিত কূপ জল পান ক'র্‌লে স্থৌল্য নষ্ট হয়।

শ্যা। কূপ জল যদি না পাওয়া যায়, তা' হ'লে কি হ'বে? আর মধু ও জলের পরিমাণই বা কি? কতদিনের পুরাণ মধু?

ক। কূপ জল না পাওয়া গেলে—পুকুরের জল, তা'ও না হ'লে—নদীর জল, তাও না হ'লে—কলের জল। কূপের জলে ক্ষার থাকে ব'লে বেশী উপকারী। আর মধু সহ্যমত মাত্রায় আরম্ভ ক'রে ক্রমশঃ বাড়া'তে হ'বে। প্রথমে এক তোলা আন্দাজ মধু পাঁচ সাত তোলা জলে মিশিয়ে খেতে হয়, সহ্যমত এক ছটাক পর্য্যন্ত মধু প্রত্যহ খাওয়া যেতে পারে। জলের পরিমাণও ঐ পরিমাণে বা'ড়াতে হবে। গা' জ্বালা হ'লে মধু বাড়াবে না। দুই বৎসরের সযত্ন রক্ষিত মধু চাই।

শ্যা। আচ্ছা তা'র পর বলুন।

রা। প্রাতে উষ্ণ অন্নমণ্ড আহার করলে শরীর রোগা হয়।

শ্যা। অন্নমণ্ড মানে কি? ভাল চাল ত খেতে বারণ ক'রেছেন।

ক। শ্যামা ধানের চাল, কাঙ্গিনী ধানের চাল—এইসব জিনিষের মণ্ড ক'রে খেলেই ভাল হয়। তা' না ঘট্‌লে—যে কোন

পুরাণ চালের মণ্ড ক'রে খাওয়া যেতে পারে।

শ্যা। মণ্ড কি রকম ক'রে তৈরি ক'রতে হয়, কতটা খাওয়া যায়, আর ক'বারই বা খাওয়া যায় বলুন।

ক। চাল গুঁড়ো ক'রে,—যতটা চা'লের গুঁড়ো—তা'র চৌদ্দ গুণ জলে পাক ক'র্‌তে হয়। তা'রপর চালের গুঁড়ো জলের সঙ্গে ঘোলের মত হ'য়ে গেলে, অথবা খুব তরল থাক্‌তে নামা'তে হয়। মণ্ড একটু গরম থাক্‌তে-থাক্‌তে খাওয়া উচিত। একবার খেয়ে থাক্‌তে পা'র্‌লে ভালই, নয়ত দু'বার খেতে হয়। আর একটা কথা—যতটা খেলে পেট বেশী না ভরে—অথবা যতটুকু খেলে ক্ষুধার নিবৃত্তি হয়—ততটা খাওয়া যেতে পারে।

শ্যা। আচ্ছা আর কি ওষুদ আছে বলুন?

ক। খই; জীরা, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, হিং, সচল লবণ ও চিতার মূল—সমান ভাগে চূর্ণ ক'রে একত্র ক'রবে। আর চূর্ণ যত—তা'র ষোল গুণ যবের ছাতুর সঙ্গে মেশা'বে। দধির মাতের সঙ্গে এই ঔষধ মিশ্রিত ছাতু সহ্য মত খেতে পার;—এইরূপ ভাবে ৩।৪ তোলা থেকে ৭।৮ তোলা পর্য্যন্ত মাত্রায় দিন কতক সেবন ক'র্‌লে স্থূলতা ক'মে যায়।

শ্যা। খালি এই ছাতু খেয়েই কি থাক্‌তে হ'বে?

ক। না, অন্য যে সব পথ্যের কথা ব'লেছি, সে সবও খা'বে, আর একবার এই ওষুদ মিশ্রিত ছাতু খা'বে। তবে এটা যেন মনে থাকে যে,—বেশী খাওয়া আর পরিশ্রম না করার ফলেই স্থৌল্য রোগ হয়। সুতরাং এ রোগে যত কম ক'রে খাওয়া যায় এবং যত অধিক পরিশ্রম করা যায়—ততই ভাল। কিন্তু কম খাওয়া ব'ল্‌লাম ব'লে একবারে কম বু'ঝতে হ'বে না। কেন না,—শরীর ধারণের উপযোগী আহার চাই ত! আর পরিশ্রমও অধিক বলায় শক্তির অতীত—এমনটা বুঝ্‌তে হ'বে না, কেননা হঠাৎ অধিক পরিশ্রম ক'র্‌লে অনিষ্ট ঘট্‌তে পারে। আবার পূর্ব্বে যে ক্রমশঃ ব'লেছি—সেটা, এই আহার কমান এবং পরিশ্রম বাড়ানোর প্রতি বিশেষ প্রয়োজ্য। ক্রমশঃ আহার কমা'লে এবং পরিশ্রম বাড়া'লে কোন অনিষ্ট হয় না।

শ্যা। আচ্ছা আর কি ওষুদ আছে বলুন?

ক। ওষুদ অনেক আছে। কিন্তু সব ত তোমার ঘরে তৈয়ের ক'রে নিতে পা'রবে না। তবু দু' চারটের কথা বল্‌ছি শোন (১) মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, বিড়ঙ্গ, সজিনা বীজ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, কট্‌কী, বৃহতী, কণ্টকারী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, আকনাদি, আতইচ্, শালপানি, হিং, কেয়াফুলের গাছের মূল, যমানী, ধনে, চিতামূল, সচল লবণ, কৃষ্ণজীরা ও হবুষা (অভাবে ধনে) সমান ভাগে চূর্ণ ক'রে একত্র মিশিত ক'রে নেবে, আর চূর্ণ যত নেওয়া হ'বে—ঘৃত, মধু ও তিল তৈল প্রত্যেক জিনিষ তত পরিমাণ নিয়ে একত্র মিশ্রিত ক'রবে। তা'রপর সমস্ত মিলিত দ্রব্যের পরিমাণের ষোলগুণ যবের ছাতু নিয়ে সমস্ত একত্র ক'র্‌বে। এই ঔষধ মিশ্রিত ছাতু সহ্য মত মাত্রায় জলের সঙ্গে গুলে খেলে—স্থৌল্য, মেহ, উদর, শোথ, ভগন্দর, পাণ্ডুরোগ প্রভৃতি ভাল হয়। ঔষধ খা'বার সময় কলা, আলু প্রভৃতি কন্দ, কাঁজি, করমচা, বাঁশের কোড়্ আর করোলা উচ্ছে খেতে নেই। এ ওষুধ ৫।৬ তোলা থেকে ১১।১২ তোলা পর্য্যন্ত মাত্রায় খাওয়া যেতে পারে।

(২) কুলের পাতা আট তোলা বেটে কাঁজির সঙ্গে সিদ্ধ ক'রে খেলে স্থৌল্য ভাল হয়। কাঁজি এক সেরের সঙ্গে সিদ্ধ ক'রে যখন ঘন হয়, তখন নামিয়ে নিতে হয়।

শ্যা। অতটা খাওয়া যা'বে কেন?

ক। না পার যতটা পার—ততটা খেও।

রা। আচ্ছা কবিরাজ মহাশয়, ভায়াকে ডাল শুদ্ধ কুলপাতা খাওয়ালে হয় না?

ক। সেটা তুমি তোমার ভায়ার সঙ্গে বোঝ। কিন্তু ছাগলে কুলপাতা খায় ব'লে মনে ক'রনা যে, ইহার আর কোন রোগ-নাশকতা শক্তি নেই। পৃথিবীর অতি তুচ্ছ দ্রব্য দ্বারাও সময়ে মহান্ উপকার পাওয়া যায়।

শ্যা। আপনি তা'রপর বলুন কবিরাজ মশায়। ও পাগলের কথা ছেড়ে দিন।

ক। (৩) বিড়ঙ্গ, শুঁঠ, আমলকী ও যব চূর্ণ প্রত্যেকে এক তোলা, আর লৌহভস্ম ৪ তোলা একত্র মিশ্রিত ক'রে প্রথমে দুইরতি মাত্রায় আরম্ভ ক'রে তারপর দু' আনা বা তা'রও বেশী প্রয়োগ করা যেতে পারে।

শ্যা। লৌহ ভস্ম পা'ব কোথায়?

ক। লৌহভস্ম তৈয়ের করা ত সোজা নয়, কাজেই কোন কবিরাজের কাছ থেকে এক আধ তোলা খরিদ ক'রে লওয়া ভাল।

(৪) গুলঞ্চ চূর্ণ এক তোলা, ছোট এলা'চ চূর্ণ চার তোলা, ইন্দ্রযব চূর্ণ পাঁচ তোলা, হরীতকী ছয় তোলা, আমলকী চূর্ণ সাত তোলা এবং গুগ্‌গুলু আট তোলা—একত্র মিশ্রিত ক'রে আবশ্যক মত মধুর সঙ্গে বেশ ক'রে মেড়ে নেবে। এই ওষুদ এক সিকি হইতে এক তোলা পর্য্যন্ত মাত্রায় মধুর সঙ্গে মেড়ে খেলে স্থৌল্য ও ভগন্দর রোগ নষ্ট হয়।

শ্যা। আবশ্যক মত মধু কি বলুন? আর গুগ্‌গুলু কি? এই যে ধূনো-গুগগুলু পোড়ান হয়—সেই গুগ্‌গুলু?

ক। আবশ্যক মত মধু মানে হ'চ্ছে—যে পরিমাণ মধু দিয়ে মাড়্‌লে পাতলা হয় না, বা খুব শক্ত থাকেনা এবং বড়ির মত করা যায়। আর গুগ্‌গুলু মানে যা' ব'লছ, তাই বটে, তবে, ওরই মধ্যে যে গুগ্‌গুলু মহিষের চোখের মত লাল আভা দেখ্‌তে—সেইগুলি শোধন ক'রে নিতে হয়।

শ্যা। শোধন আবার কি ক'রে ক'রতে হয়?

ক। শাস্ত্রে বলে গুলঞ্চের কাথ; ত্রিফলার কাথ কিম্বা দুধের সঙ্গে গুগ্‌গুলু সিদ্ধ ক'র্‌তে হয়। সিদ্ধ ক'রবার সময় ন্যাকড়ায় গুগ্‌গুলু নিয়ে হাঁড়ির মুখে একটী কাঠি রেখে—ন্যাকড়া সেই কাঠির সঙ্গে বেঁধে হাড়ির ভিতর ঢুকিয়ে দিতে হয়, যেন হাঁড়ির তলায় না লাগে। তা'রপর সিদ্ধ ক'রতে-ক'রতে গুগ্‌গুলু বেশ নরম হ'লে তুলে নিয়ে মলামাটী বাদ দিয়ে উত্তম গব্য ঘৃত দিয়ে উত্তমরূপে শিলে বাটিয়া লইতে হয়।

শ্যা। আর কি ওষুদ বল্‌বেন বলুন?

ক। গুগ্‌গুলু ঘটিত আর একটা ওষুদ ব'ল্‌ছি,—মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, চিতামূল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, মুতা ও বিড়ঙ্গ—প্রত্যেকের চূর্ণ এক তোলা আর শোধিত গুগ্‌গুল নয় তোলা একত্রে আবশ্যক মত মধুর সঙ্গে মেড়ে রা'খ্‌তে হয়। এই ওষুদ এক সিকি থেকে এক তোলা মাত্রায় মধুর সঙ্গে মেড়ে খেলে—স্থৌল্য, মেহ, গুল্ম ও আমবাত রোগ ভাল হয়।

শ্যা। আর কোন ওষুদ ব'লবেন না?

ক। আর ব'লে লাভ কি, তোমারা ত

ত'য়ের ক'রে নিতে পা'রবে না। আর যে সব ওষুদ ব'ললাম—এর দুই একটা তোয়ের ক'রে খেলে আর সুপথ্যে থা'কলে ভাল হ'য়ে যা'বে।

শ্যা। আচ্ছা, তাই ক'রব আমি। আমার একজন বন্ধু এই রোগের জন্যে আমেরিকা থেকে ওষুদ আনিয়েছিল, দু'মাস খেয়েও কিছু হ'ল না। আমি বিদেশী-ওষুদ ছেড়ে দিয়ে একবার দেশী-ওষুদই চেষ্টা ক'রে দেখি।

ক। শুধু তাই নয়, তোমার সেই বন্ধুটী কেও যে সব নিয়ম ব'ললাম সেই সব নিয়ম পালন ক'রে ওষুদ খাইও। তা' হলে তিনি বু'ঝতে পারবেন যে, হাতের কাছে প্রতিকারের উপায় থাকতে, তিনি প্রলোভনে প'ড়ে বিদেশের ওষুদ আনিয়ে প্রতারিত হ'য়েছেন। এদেখে অনেকের চোখও ফুটতে পারে।

শ্যা। আচ্ছা কবিরাজ মশায়, আমার শরীরে বড় দুর্গন্ধ হয়,—এর কি কোন প্রতিকার নেই?

ক। তা' আছে বই কি। কিন্তু সে সব ব'লে লাভ নেই, কেননা তোমরা ত'য়ের ক'রে নিতে পা'রবে না। সহজ কতকগুলো মুষ্টিযোগ বলছি। (১) তেজপাতা, কলা, অগুরু, হরীতকী ও রক্তচন্দন সমভাগে বেটে প্রলেপ দিলে গায়ের দুর্গন্ধ নষ্ট হয়।

শ্যা। অগুরুটা কি? অনেক স্থানে অগুরু নাম শুনতে পাই, আর ব'য়েও দেখ্‌তে পাই, কিন্তু জিনিষটে কি—তা' জানিনে।

ক। চন্দনের মত এক রকম কাঠ। আসাম অঞ্চলে জন্মায়, খুব সদ্গন্ধ,—দামও খুব বেশী। তা তুমি অগুরু না পেলে শ্বেত চন্দন দিও।

শ্যা। সে ভাল কথা এখন আরও মুষ্টিযোগ বলুন।

ক। (২) শাঁক—কি শাঁক যা'রা তৈয়ের করে,—তা'দের দোকানে শাঁকের এক রকম গোড়া পাওয়া যায়। তাই চূর্ণ ক'রে—বাসক পাতার রস—কি বেলপাতার রসের সঙ্গে বেটে গায়ে মা'খ্‌লে দুর্গন্ধ নষ্ট হয়। (৩) তেঁতুল পাতার রস মালিস ক'রে—তা'র পর হলুদ পোড়া—তেঁতুল পাতার রসে বেটে মর্দ্দন ক'রলে বগলের এবং গায়ের দুর্গন্ধ নষ্ট হয়। (৪) তেজপাতা, কলা, অগুরু, শ্বেতচন্দন ও বেণারমূল জলের সঙ্গে বেটে মর্দ্দন করলে দুর্গন্ধ নষ্ট হয়।

শ্যা। এখানে অগুরু ও শ্বেতচন্দন দুই র'য়েছে, তবে অগুরু না পেলে তা'র বদলে কি নেব?

ক। দু'ভাগ শ্বেতচন্দন নেবে, কি অগুরুর বদলে রক্তচন্দন নেবে। কিন্তু বেশ সদ্গন্ধযুক্ত রক্তচন্দন হওয়া চাই। এক রকম গন্ধহীন লালচন্দন কাঠ বাজারে বিক্রী হয়, সেগুলো রক্তচন্দন নয়।

শ্যা। আচ্ছা তা'রপর বলুন।

ক। (৫) শিরীষছাল, বেণারমূল, নাগকেশর ও লোধ ছাল-চূর্ণ—জলের সঙ্গে বেটে প্রলেপ দিলে ত্বকের দোষ ও ঘাম হওয়া ভাল হয়।

শ্যা। আর কি?

রা। থাম ভায়া। উনি স্থৌল্য নষ্ট ক'রবেন, শরীরের দুর্গন্ধ নষ্ট ক'রবেন,—আর আমি যেন কেউ নই! আমি কি ক'রে মোটা হই—বলুন ত কবিরাজ মশায়।

ক। তোমার পথ অতি সোজা। খুব ঘুমোও, ব'সে ব'সে স্ফূর্ত্তি কর, পরিশ্রম ক'রো না, রাস্তা হেঁট না, গাড়ী ঘোড়া চড়া বন্ধ কর, চিন্তা করো না, শোক বা ভয় ক'রো না, স্ত্রী

সহবাস ক'রো না, আর পোলাও, কালিয়া, মাছ, মাংস, খাও, ঘি যত পার খাও। কিন্তু পেট বুঝে খা'বে, শেষে যেন অজীর্ণ কি অতিসার রোগ ক'রে ব'স না।

রা। তা' একেবারে চিন্তা না ক'রে আর একেবারে পথ না হেটে চ'লবে কি ক'রে মশায়?

বা। চলা ত উচিত, তবে যদি নিতান্ত না চলে, তবে যতটা কম ক'র্‌বে তত ভাল। আর যত বেশী কর্‌'বে ততই মন্দ।

রা। আর ওষুদের কথা বলুন।

ক। ঔষধ তোমার বড় দরকার হ'বে না, পুষ্টিকর জিনিষ প্রচুর খেয়ে ঐ সব নিয়ম পালন কর্‌'লেই হ'বে। আর আহারের পূর্ব্বে জল না খেয়ে আহারের পরে খা'বে। ঔষধ যদি খেতে চাও—কবিরাজী বৃহৎ ছাগলাদ্য ঘৃত, অশ্বগন্ধা ঘৃত, চ্যবন প্রাশ, মাখন, মিছরী দিয়ে মকরধ্বজ—এই সব খেতে পার।

রা। বেশ কবিরাজ মশায়?—শ্যামের বেলায় এত মুষ্টিযোগ প্রদান কর্‌'লেন, আর আমার বেলায় কি আপনার মুষ্টি শিথিল হ'য়ে গেল?

ক। মুষ্টি শিথিল হয় নি, কিন্তু ক্ষীণ দেহে যোগ করা বিপজ্জনক। তবে নেহাৎ যখন তুমি ছাড়বে না,—তখন দুই একটা শোন,—(১) ক্ষীর কাঁকলা, অশ্বগন্ধা, ভুঁইকুমড়া, ভুঁই আমলা, শতমূলী, শ্বেত বেড়েলা, পীতবেড়েলা, ও গোরক্ষচাকুলে—সমান ভাগে চূর্ণ ক'রে দুই আনা থেকে এক সিকি মাত্রায় দুধের সঙ্গে খেতে পার। (২) অশ্বগন্ধার মূল চূর্ণ বা ভুঁইকুমড়া চূর্ণ—দুধের সঙ্গে একসিকি মাত্রায় খেলে শরীর মোটা হয়। এ ছাড়া রসায়ন ও বাজীকরণ ঔষধগুলি সমস্তই কৃশতা নাশক।

শ্যা। আচ্ছা কবিরাজ মশায়, এই কি আয়ুর্ব্বেদের স্থৌল্য বা কার্শ্য—চিকিৎসার শেষ?

ক। না, কত ঔষধ আছে। কিন্তু সে সমস্ত এখন কেবল পুঁথিগত, ব্যবহার নাই।

রা। তা' কবিরাজ মশায়, আপনিও ব'ল্‌ছেন যে, শ্যামের চেয়ে আমি শীঘ্র ভাল হ'ব?

ক। সেটা নিজের উপর নির্ভর করে। ডাক্তার-কবিরাজে ব্যবস্থা করে, কিন্তু নিয়ম পালন করে—রোগী। যে যেমন নিয়ম পালন করে, সুপথ্যে থাকে, সে তেমনি ফল পায়।

রাম ও শ্যাম। আচ্ছা এখন আসি কবিরাজ মশায়, ভাল হ'লে খুসী ক'রব।

সাধনা ও সিদ্ধি।

—:*:—

যে লোক-হিতৈষণা প্রবৃত্তিবশে একদিন ভারতের আর্য্যঋষিগণ স্বার্থ-পরার্থ সমান ভাবে চিন্তা করিয়াছিলেন, যে চিন্তার ফলে জ্ঞান-বিজ্ঞান, কৃষি-শিল্প প্রভৃতি মানুষের ইহ-পরকালের যাবতীয় প্রয়োজনীয় বিষয়-গুলির ঐকান্তিকী উন্নতি সাধিত হইয়াছিল, আজি আর ভারতের সে দিন নাই; সে রাম নাই, সে অযোধ্যা নাই! সে সুখের দিন—

সে গৌরবের দিন আর নাই; সে মন্বত্রিবিষ্ণু হারীত—সে ব্যাস-বশিষ্ট-শুক-পরাশর—সে সনক-সনাতন-সনন্দ আর নাই,—সে ধন্বন্তরি-চরক-সুশ্রুত-বাগ্‌ভট আর নাই;—আছে তাঁহাদের অমূল্য উপদেশ—মনুষ্যের সর্ব্ববিধ দুঃখ নিবৃত্তি ব্যপদেশে তাঁহাদের প্রত্যক্ষসিদ্ধ নরলোক-দুর্ল্লভ অত্যদ্ভুত অলৌকিক উপদেশ মালা। যে উপদেশ নির্ব্বিচারে গ্রহণ করিয়া ভারতবাসীর ভাণ্ডার ধনধান্যেপূর্ণ ছিল, আয়ু-বল-আরোগ্য অক্ষুণ্ণ ছিল, সমাজে শৃঙ্খলা ছিল, ধর্ম্মে আস্থা ছিল, স্নেহ-প্রীতি-বিশ্বাস-ভক্তিতে হৃদয় পূর্ণ ছিল, পরার্থে স্বার্থ উপেক্ষিত হইয়াছিল, সে দিন আর নাই। সে দিন নাই—সে কিছুই নাই। একটী তন্ত্রীতে আঘাত মাত্রে যেমন বীণার প্রত্যেক তন্ত্রীই ঝঙ্কৃত হইয়া উঠে, একদিন তেমনি ঋষিদিগের একটী অঙ্গুলি হেলনে—একটি ইঙ্গিতে সমগ্র সমাজ পরিচলিত হইত, সে দিন আর নাই। সে একতা নাই, সে নিষ্ঠা নাই, সে সহানুভূতি নাই, সে কৃতজ্ঞতা নাই, সে উপদেশানুবর্ত্তিতা নাই। কেন এমন হইল, কে বলিয়া দিবে—কেন এমন হইল?

ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থ প্রভৃতি শ্রেণীগণ আজিও ত সেইরূপ সমাজের উচ্চস্তরে দাঁড়াইয়া আছেন, কিন্তু সে জ্ঞান, সে তপশ্চরণ, সে শিক্ষা কই? সে স্বার্থ-ত্যাগ—সে স্বাবলম্বন—সে সমাজহিতৈষিতা—সে পরস্পরে আত্মবোধ কই? মহর্ষিগণের বংশধর বলিয়া—আর্য্যসন্তান বলিয়া অনেকের ভিতর একটা অভিমানও আছে দেখিতে পাই, কিন্তু তাঁহাদের ন্যায় ইহাদের কোন্ গুণ বর্ত্তমান আছে? তাঁহাদের অন্তর্দ্ধানের পরে ইহারা তাঁহাদের অনুরূপ কোন্ কীর্ত্তি স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছেন? নূতন একটা কীর্ত্তি স্থাপন দূরে থাক্, তাঁহারা যাহা রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা রক্ষা করিতেই বা তাঁহাদের বংশধরগণের যত্ন-চেষ্টা কই?—আগ্রহ-আকুলতা কই? তাঁহাদের যদি সে সুবুদ্ধি—সে আত্ম-রক্ষার যত্নপরতা দেখা যাইত, তবে কি দেশের এ দুর্গতি হয়—এ অধঃপতন হয়! নিদর্শন থাকিলে সুখ একেবারে অন্তর্হিত হয় না, কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যবশে ভারতের সে সুখ নাই, সুখের সে নিদর্শনও নাই; সুতরাং সুখের সে পূর্ব্বস্মৃতি টুকু পর্য্যন্ত মুছিয়া গিয়াছে। যদি হৃদয়ে পূর্ব্ব গৌরবের সে স্মৃতি বর্ত্তমান থাকিত, তবে কি দেশের এ দারুণ দুর্গতি ঘটে? স্মৃতি গিয়াছে বলিয়াই ত এই অধঃপতন—এই পরমুখাপেক্ষিতা! আজি বৈদেশিক উন্নতি দেখিয়া আমরা মুগ্ধ,—বিজ্ঞান-দর্শন দেখিয়া,—শিল্প-সাহিত্য দেখিয়া,—কাব্য-অলঙ্কার দেখিয়া মুগ্ধ! যাহা বস্তুতঃ ভাল, তাহা দেখিয়া সর্ব্বদেশে—সর্ব্বকালেই লোকে সুখ্যাতি করে,—মুগ্ধ হয়, কিন্তু বিদেশ হইতে যাহা কিছু আমদানী হইবে, তাহা দেখিয়াই মুগ্ধ হইতে হইবে—এ বড় আশ্চর্য্য কথা! দুর্ভাগ্য আর কাহাকে বলে,—দুর্গতি আর কাহাকে বলে,—অবনতি আর কাহাকে বলে! আমাদের যাহা ছিল, তাহা দেখিব না—বুঝিব না—বুঝিবার চেষ্টাও করিবনা;—তাহা ভাল কি মন্দ ছিল, তাহার বিচার করিব না, একটা সূচ-আলপিন্ দেখিয়াই পরের গৌরব করিব,—এ বুদ্ধির বালাই লইয়া মরিতে ইচ্ছা হয়! বৈদেশিকেরা আমাদের বেদ-উপনিষদ, স্মৃতি-দর্শন, পুরাণ-ইতিহাসের অর্থ করিয়া দিতেছেন, তাঁহাদের বুদ্ধির মাপ-কাঠিতে মাপিয়া-জুখিয়া যাহা সিদ্ধান্ত করিয়া

দিতেছেন, তাহাই আমরা মাথা-পাতিয়া লইতেছি। তাঁহারা যাহার অর্থ বুঝিয়া বলিতেছেন—"ইহার অর্থ নাই,—ইহা আধুনিক,—ইহা প্রক্ষিপ্ত,—এটা কল্পিত,—এটা ভ্রম-প্রমাদ,—এটা কুসংস্কার,—শ্রম-বিনোদনে ইহা চাষার গান,"—আর অমনি আমরা তাহাই বুঝিতেছি;—ভাগ্য! যাহা আমাদের নিতান্ত নিজস্ব—নিতান্ত ঘরের কথা,—নিত্য-নৈমিত্তিক ক্রিয়া-কাণ্ডের কথা, যে কথা আমাদের জীবন-মরণের সহিত জড়িত, যাহা আমাদের অতি প্রয়োজনীয় কথা—যে কথা আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ বলিয়া গিয়াছেন—বুঝাইয়া গিয়াছেন, সে কথার অর্থ আজি আমরা নিজের বুঝিতে পারি না—বুঝিবার চেষ্টাও করি না, এ দুঃখের কথা বলিই বা কাহাকে—শুনেই বা কে? যে কথা শুনিবার জন্য—বুঝিবার জন্য—এক দিন সহস্র সহস্র লোকের আগ্রহ-আকুলতা ছিল, সহস্র সহস্র লোক সেই-তপোনিষ্ঠ আচার্য্য-সন্নিধানে সমবেত হইয়া তত্ত্বার্থ জিজ্ঞাসু হইত, সেই কথা শুনিবার জন্য এখন আমরা বিদেশীর মুখপানে চাহিয়া আছি! দুর্ভাগ্য কি আমাদের অল্প! এক্ষণে যদি কেহ আমাদের সেই কথা শুনাইবার—বুঝাইবার জন্য অগ্রসর হয়, চেষ্টা-যত্ন করে, তবে সে সহজেই উপ-হাসাস্পদ হয়,—মতিচ্ছন্ন আর কাহাকে বলে? আজি আর অন্য কথা বলিব না—তুলিব না; বর্ত্তমানে যাহা আমাদের বড় প্রয়োজনীয় কথা, আমাদের মরণ-জীবনের কথা, সেই আয়ুর্ব্বেদ সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিয়া এ প্রবন্ধের উপসংহার করিব, পরে আমার যাহা বক্তব্য, তাহা ক্রমশঃ প্রকাশ করিব।

যদি সুস্থ-শরীরে বাঁচিয়া থাকি, তবেই অন্য বিষয়ের প্রয়োজন হয়, নচেৎ কিছুরই প্রয়োজন নাই। আমি বাঁচিলে তবে দর্শন-বিজ্ঞান-সাহিত্য, কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য, রাজনীতি-সমাজ-নীতি-অর্থনীতির প্রয়োজন; এমন কি, যে ধর্ম্ম আমাদের ইহ-পরকালের সহচর, শরীর সুস্থ-সবল-কর্ম্মক্ষম না থাকিলে সে ধর্ম্ম-সাধন অসম্ভব হইয়া পড়ে। জন্ম হইতে মরণ পর্য্যন্ত কখনও রোগাক্রান্ত হয় নাই,—মৃত্যু সময়ে সহসা একদিন রোগ আক্রমণ করিল—আর মৃত্যুমুখে পতিত হইল, এমন দেহধারী জীব জগতে নাই; সকলকেই জীবিতকাল মধ্যে বহুবারই রোগ-কবলে পতিত হইতে হয়। রোগ যখন আক্রমণ করিবেই, তখন যে সদুপায় দ্বারা সেই রোগের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়, তাহাই অবলম্বন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যে জ্ঞান দ্বারা সেই সদুপায় নির্দ্দিষ্ট হয়, তাহাই চিকিৎসা। এই চিকিৎসা যে শাস্ত্র নির্দ্দেশ করে, তাহাকে আয়ুর্ব্বিজ্ঞান বা আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র বলে। এই আয়ুর্ব্বেদের রক্ষা কল্পে,—শিক্ষা কল্পে,—প্রচার কল্পে এই ভারতবর্ষে অনাদি কাল হইতে চেষ্টা চলিতেছে। ব্রহ্মা বিষ্ণু-রুদ্র-অশ্বিনী কুমারদ্বয়-ধন্বন্তরি প্রভৃতি দেবগণ; দক্ষ প্রভৃতি প্রজাপতিগণ, আত্রেয়, অঙ্গিরা, চ্যবন, চরক, সুশ্রুত প্রভৃতি ঋষিগণ এই পবিত্র লোকহিতকর আয়ুর্ব্বিজ্ঞান শিক্ষা ও প্রচার করিয়া জীবকুলকে রোগমুক্ত ও দীর্ঘায়ু যুক্ত করিতে যত্নপর হইলেন। তাঁহাদের সে চেষ্টা—সে যত্ন—সে সাধনা সার্থক হইল; আয়ুর্ব্বেদ জীব-জগতে বরণীয় হইল; আয়ুর্ব্বেদের উপকারিতা লোকে হৃদয়ঙ্গম করিল; আয়ু-র্ব্বেদ জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য দ্বিতীয় দেহরক্ষাপঞ্জীরূপে পরিগৃহীত হইল। যে মহাপুরুষগণ আপনাদের স্বার্থ উপেক্ষা পূর্ব্বক

লোকহিতার্থে সেই আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া, জীবকুলকে রোগমুক্ত করিতে আত্ম-নিয়োগ করিলেন. প্রাচীন ঋষিগণ তাঁহাদের এই স্বার্থত্যাগ, পরোপকারিতা, অধ্যবসায় দর্শনে প্রীত হইয়া পরম পবিত্র অমূল্য সমগ্র আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র তাঁহাদের হস্তে সমর্পণ করিলেন এবং তাঁহাদের আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যায় বংশানুক্রমিক উন্নতি-কামনায়—আয়ুর্ব্বেদ বিদ্ করিবার অভিপ্রায়ে "বৈদ্য" এই বিজ্ঞান-বিদ্[৩] অভিধান প্রদান করিয়া গৌরবান্বিত করিলেন। তদবধি প্রধানতঃ বৈদ্যগণই এই শাস্ত্রের অধ্যয়ন-অধ্যাপনা দ্বারা এবং স্বয়ং শাস্ত্র সম্মত চিকিৎসাবিধান করিয়া আসিতেছেন। ইঁহাদের সাতিশয় যত্নে এই এই চিকিৎসার যথেষ্ট উন্নতিও হইয়াছিল। উন্নতি হইবারই কথা। ইহা আমাদের দেশের লোকের ধাতুর সম্পূর্ণ উপযোগী, বিশেষতঃ আমাদেরই গৃহ পার্শ্বে, পল্লী-প্রাঙ্গনে, পর্ব্বতে-কাননে দেশের যত্র-তত্র ঔষধের উপাদান সকল ছড়ান রহিয়াছে, অনায়াসেই এই সকল উপাদান চিকিৎসক-গণ সংগ্রহ করিতে পারেন। আমরা যেমন চিরদরিদ্র, আমাদের চিকিৎসার ব্যয়ও সেইরূপ অল্প হইল। কেবল ইহাই নহে, এক পক্ষে এই বৈদ্য বা আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণ যেমন অভিজ্ঞ ও বিলাস-বিহীন থাকিয়া সন্তুষ্ট হইলেন, অন্যপক্ষে ঔষধাদির ব্যয়ও তেমনি স্বল্প হইল, সুতরাং মণিকাঞ্চন যোগের ন্যায় হওয়াতে এই চিকিৎসা-প্রণালীর যথেষ্ট উন্নতি হইতে লাগিল, কিন্তু কেমন যে বিধাতার অভিশাপ, উন্নতি হইতে না হইতে ঘোর অবনতি আরম্ভ হইল! যেমন ভারতের জ্ঞান-ধর্ম্ম দর্শন-বিজ্ঞান-শিল্প-সাহিত্যের অবনতি হইল, তেমনি আয়ুর্ব্বেদের ও অবনতি হইল! প্রদীপ্ত প্রাতঃসূর্য্য উদয় মাত্রেই চির মেঘাবৃত হইল! সত্যবটে কাল-ধর্ম্মে উন্নতির পরে অবনতি অবশ্যম্ভাবী, আবার অবনতির পরে উন্নতিও অবশ্যম্ভাবী; কিন্তু ভারতের যে অবনতি ঘটিল, তাহার আর পরিবর্ত্তন হইল না। তাই বলিতে ছিলাম, ভারতের উন্নতিতে বুঝি দেবকুলেরও ঈর্ষা হইয়াছিল, সেইজন্য দেবশ্রেষ্ঠ বিধাতার অভিসম্পাতে আজ আমাদের এ দারুণ দুর্গতি,—এ অপ্রতিবিধেয় অবনতি।

অনেকে বলেন যে, আজ কাল আবার আমরা ক্রমশঃ উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছি, কিন্তু হায়, কোথায় সে উন্নতি! যদি উন্নতিই হইতেছে, তবে সে একতা কৈ—সে এক প্রাণতা কৈ,—সে বিশ্বজনীন হিতৈষণা কৈ,—সে জ্ঞান কৈ? ধর্ম্মে সে আস্থা কৈ,—আপ্তবাক্যে সে বিশ্বাস কৈ,—সে ত্যাগ কৈ,—সে তিতিক্ষা কৈ,—সে ব্রহ্মচর্য্য কৈ?—কৈ সে স্বজাতি-প্রীতি? কৈ সে স্বদেশ-প্রীতি? মুখের কথায় যদি উন্নতি সম্ভব হয়, তবে সেটা আমাদের যথেষ্টই হইয়াছে, তাহাতে সংশয় নাই। কথায় আমরা কি করিতে না পারি? কথার চটকে আমরা লোকের মন ভুলাইতে পারি,—লোক মজাইতে পারি,—কথায় আমরা দিগ্বিজয় করিতে পারি;—আকাশের চাঁদ পাড়িয়া হাতে দিতে পারি,—কথার উন্নতি আমাদের যথেষ্ট হইয়াছে! কিন্তু কার্য্যতঃ আত্মোদারপরায়ণতা ব্যতীত আর আমাদের কিছুই শিক্ষা হয় নাই; আত্মোদরপূরণে এতটুকু বিঘ্ন ঘটিলে আমরা অস্থির হই। আমরা আপনার কাহিনী আপনি লিখি,

৩—আয়ুর্ব্বেদ

আপনার ধ্বজা আপনি কাঁধে করি, আপনি আপনার ঢাক বাজাই, আপনার কথাই "পাঁচ কাহন" করি! ইহাই আমদের জ্ঞান, ইহাই আমাদের শিক্ষা, ইহাই আমাদের বুদ্ধি, আর ইহাই আমাদের বর্ত্তমান উন্নতি!

যাক্‌, বলিতেছিলাম—আয়ুর্ব্বেদের অবনতির কথা। আয়ুর্ব্বেদের অবনতিতে আমাদের যতটা ক্ষতি হইয়াছে, অন্য কিছুতে বোধ হয় এত ক্ষতি হয় নাই। বলিয়াছি ত, যদি আমাদের আয়ু বল-আরোগ্য অক্ষুণ্ণ থাকে, তবেই আমাদের অন্য বিষয় আলোচনার অবসর হয়—প্রয়োজন হয়; সুতরাং ধর্ম্মার্থ কামমোক্ষের নিদান স্বরূপ আয়ু-বল-আরোগ্যহীন হইয়া আমরা সকল হারাইতে বসিয়াছি। যাঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ সর্ব্বলোকরক্ষাকর এই আয়ুর্ব্বিজ্ঞানের বিজয়-বৈজয়ন্তী মালা গলদেশে ধারণ করিয়া সগৌরবে জীবরক্ষাব্রতে আত্মশক্তির সম্পূর্ণ নিয়োগ করিয়াছিলেন, আজ তাঁহাদের বংশধরগণ পূর্ব্বগৌরব সম্পূর্ণ রূপে বিস্মৃত। সেই প্রাণাচার্য্যগণের সন্ততি আজি আর প্রাণিগণের প্রাণ রক্ষায় যত্নশীল নহেন।

এ দেশে একটা প্রবাদ আছে,— "বৈদ্যগণ বড় স্বজাতিপ্রিয়।" বর্ত্তমানে কৈ, তাহারও ত সার্থকতা দেখিতে পাই না। যদি পরস্পরে সে সহানুভূতি থাকিত, তবে আজি সমুদয় বৈদ্য-চিকিৎসক-সমাজকে "অষ্টাঙ্গ-আয়ুর্ব্বেদ-বিদ্যালয়ের" প্রাঙ্গনে সমবেত দেখিতাম। এই আয়ুর্ব্বেদ-বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ-আয়োজন করিয়া ইহার উদ্যোক্তৃগণ যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তাহার যে গুরুত্ব কত, তাহা সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন। আজ আমাদের দেশে হাকিমি, এলোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি প্রভৃতি নানা প্রকার চিকিৎসার ছড়াছড়ি;—এই সময়ে অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদের প্রতিষ্ঠা! ব্যাপার বড়ই গুরুতর! কোথায় পাশ্চাত্য-বিজ্ঞানসম্মত, রাজাধিরাজের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে প্রতিষ্ঠিত পরিরক্ষিত চিকিৎসাগার—পরীক্ষাগার—শিক্ষাগার—যেখানে বর্ত্তমান সময়ের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানবিদ্‌ পণ্ডিতমণ্ডলী—তাঁহাদের জীবনব্যাপী শিক্ষা-উদ্যম-অধ্যবসায় লইয়া শিক্ষা-পরীক্ষা-চিকিৎসা-ব্যপদেশে নিযুক্ত, আর কোথায় সহায়-সহানুভূতি বিহীন আয়ুর্ব্বেদ-কলেজ! অবস্থা বুঝিয়া অনেকেই বলিবে—'আয়ুর্ব্বেদ-কলেজের প্রতিষ্ঠা—পাগলামীর পরিচয়।" আমরা কিন্তু তাহা বলি না। আমরা বলি, ঠিক উপযুক্ত সময়েই ইহার কার্য্যারম্ভ হইয়াছে। প্রতিদ্বন্দ্বিতা না থাকিলে জিনিসের ভাল মন্দ বুঝা যায় না, প্রতিযোগি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পারিলে জিনিষের আদর হয় না। এই ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক্ষেত্রে আয়ুর্ব্বেদের প্রাধান্য রক্ষা করিতে যাঁহারা অগ্রসর হইবেন, তাঁহারা সমগ্র দেশবাসীর নিকট বরেণ্য হইবেন—দেব-ঋষিগণের আশীর্ব্বাদ-ভাজন হইবেন।

আমার আয়ুর্ব্বেদ বলিয়া আমি গৌরব করিতে পারি, কিন্তু অপরের নিকট তাহার শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিতে না পারিলে তাহার গৌরব রক্ষা হইবে কেমন করিয়া? প্রতিযোগিতার তুলনায় দেখাইতে হইবে যে, আমার আয়ুর্ব্বেদই শ্রেষ্ঠ চিকিৎসা-শাস্ত্র, আমার আয়ুর্ব্বেদই সকল প্রকার চিকিৎসার নিদান—অন্যান্য দেশের চিকিৎসা-প্রণালী আমার আয়ুর্ব্বেদ হইতেই সমুদ্ভূত।

কেবল বক্তৃতামুখে—প্রবন্ধে-নিবন্ধে একথা বলিলে চলিবে না,—এ বিজ্ঞানের যুগে—এ পরীক্ষা-প্রতিদ্বন্দ্বিতার যুগে—মুখের বৃথা আস্ফালন কেহ শুনিবে না—মানিবে না। তাই বলিতেছিলাম, আজি ঠিক্ উপযুক্ত সময়েই "অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ কলেজের" প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। কিন্তু এ প্রতিষ্ঠাকে যথোপযুক্তভাবে রক্ষা করা নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে। ইহাতে এক পক্ষে যেমন প্রচুর অর্থের প্রয়োজন, অন্যপক্ষে তেমনি প্রত্যেক আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ পণ্ডিতগণের ঐকান্তিক সাহায্যেরও প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে আমরা বলি, যিনি শাস্ত্র মানেন, দেবতা মানেন, ঋষি মানেন, ঋষিদিগের বংশধর বলিয়া আপনার পরিচয় প্রদানে কুণ্ঠিত নহেন, তিনিই আসুন,—এই দেব-ঋষি রচিত আয়ুর্ব্বেদের মহিমা রক্ষা করিতে অগ্রসর হউন। এই আয়ুর্ব্বেদ-বিদ্যালয়ের সর্ব্ববিধ কার্য্য সুচারুরূপে সম্পাদনার্থ যত্ন-প্রকাশে—আয়াস স্বীকারে—সাহায্য সহানুভূতিতে পুরস্কার নাই—অথচ না করিলে প্রত্যবায় আছে—এইরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া যিনি এ ক্ষেত্রে কার্য্য করিবেন, তিনি যথার্থ ত্যাগশীল-ঋষি-সন্তান, তিনি দেশের সুসন্তান, তিনি ধন্য।

ইহার উদ্যোক্তৃগণের কার্য্যকলাপে—বিধি-ব্যবস্থায় ভ্রম-প্রমাদ আছে, তোমরা আসিয়া সে ভ্রম-সংশোধন করিয়া দাও, "অষ্টাঙ্গ-আয়ুর্ব্বেদ-বিদ্যালয়কে" আপনাদের নিজ প্রতিষ্ঠিত কার্য্য বলিয়া গ্রহণ কর, দেশে-দেশে ভারতের বৈদ্য-কুলের যশঃ বিঘোষিত হউক, দেশে দেশে আয়ুর্ব্বেদের মহিমা প্রচারিত হউক, দেশে-বিদেশে আয়ুর্ব্বেদের গৌরব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হউক; স্বর্গ হইতে দেশের সুসন্তানগণের মস্তকে—অষ্টাঙ্গ-আয়ুর্ব্বেদ প্রচারের অনুষ্ঠাতৃ-গণের মস্তকে পুষ্পাশিস্ বর্ষিত হউক। সাধনায় সিদ্ধি আছে, কে তাহা অস্বীকার করিবে? অষ্টাঙ্গ-যোগ-সাধনায় যদি সর্ব্বেষ্ট সিদ্ধিলাভ সম্ভব হয়, তবে অষ্টাঙ্গ-আয়ুর্ব্বেদের সাধনাও ব্যর্থ হইবে না।—সাধনা কর, সিদ্ধিলাভ নিশ্চিত।

ডাঃ শ্রীকালীকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

শঙ্খ।

হিন্দুর গৃহে শঙ্খ বড় পবিত্র জিনিষ। শঙ্খের ধ্বনিতে হিন্দুর দেবতা তুষ্ট। হিন্দুর সকল মঙ্গল কার্য্যেই শঙ্খ-ধ্বনির প্রয়োজন। শাঁখা-সাড়ী ও সিন্দুরের প্রসাদে, হিন্দু রমণী দেবীর মহিমায় মহিমান্বিতা। যে বিষ্ণু হিন্দুর সর্ব্বপ্রধান দেবতা, পুরাণে তিনি শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী রূপে বর্ণিত।

এক সময় এ দেশে শঙ্খের আদর যথেষ্ট ছিল। এ দেশের রথি-মহারথিগণ শঙ্খনাদে সমর ঘোষণা করিতেন। এক জোড়া শাঁখার জন্য মা দুর্গা শিবের সঙ্গে কতই না ঝগড়া করিয়াছিলেন! শাঁখা পরিবার জন্য —দেবী মানবী সাজিতেন! শঙ্খ নির্ম্মিত অলঙ্কার হাতে না থাকিলে, মেয়ে মানুষের হাতের জল শুদ্ধ হইত না। যে নারীর হাতে শঙ্খ শোভা পাইত না, তাহার হস্ত হইতে

ভিখারী ভিক্ষা লইত না। শঙ্খ মধ্যস্থিত জলকে হিন্দুগণ তীর্থ-সলিলের মত অতি পবিত্র ভাবিয়া থাকেন। "মহাভারতে" শঙ্খের অনেকগুলি নাম দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণ, "পাঞ্চজন্য" শঙ্খ বাজাইতেন, অর্জ্জুনের হস্তে "দেবদত্ত" নামক শঙ্খ শোভা পাইত। বীর-হস্তের শঙ্খ—"পৌণ্ড্র" "অনন্ত" "বিজয়" "সুঘোষ" "মণিপুষ্পক" প্রভৃতি আখ্যায় অভিহিত হইত।

প্রাচীন কালে বঙ্গরমণীগণও শাঁখা পরিতে ভাল বাসিতেন। তাঁহাদের এই শঙ্খ-প্রীতির প্রতি কটাক্ষ করিয়া ইতালী দেশের পরিব্রাজক "গার্সিয়া" তদীয় ভ্রমণ-বৃত্তান্তে লিখিয়াছেন—"শঙ্খ উপঢৌকন পাইলে বাঙ্গালীর মেয়ে উপহার-প্রদাতার হস্তে অনায়াসেই নিজের সতীত্ব অর্পণ করিতে পারে।" এ কথা সাহেব কৌতুক করিয়া লিখিয়াছেন কি না জানি না, এখন কিন্তু এ দেশে শঙ্খ নির্ম্মিত অলঙ্কারের তত আদর নাই। "বেলোয়ারী চুড়ী" এখন শঙ্খের স্থলে অভিষিক্ত হইয়াছে। যদিও কোন কোন ভদ্র-মহিলার হাতে ঢাকার শাঁখার বালা—এখনও দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু আমার মনে হয় সেটা বাদলার দিনে বড়লোকের মুড়ী খাওয়ার মত—কেবল সখের খাতিরে। কিছু দিন পরে হয় ত শাঁখার আদর একবারেই উঠিয়া যাইবে।

শাঁখার আদর এখনও আসাম প্রদেশের বন্য জাতিদের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। কুকি, মিকির, মালা, প্রভৃতি বর্ব্বর জাতিরা—স্ত্রী-পুরুষে মিলিয়া এখনও নানাবিধ শাঁখার গহনা পরিয়া থাকে। এখনও তাহারা সভ্য হয় নাই।

পুরাণে শঙ্খধ্বনির অনন্ত মহিমা উক্ত হইয়াছে। "শঙ্খশব্দো ভবেৎ যত্র তত্র লক্ষ্মীশ্চ সুস্থিরা"—যে স্থানে শঙ্খধ্বনি হয়, লক্ষ্মী সেখানে সুস্থিরা হইয়া থাকেন, এইজন্যই আমাদের গৃহলক্ষ্মীগণ সন্ধ্যাকালে শাঁখ বাজাইয়া মা কমলার অভ্যর্থনা করিয়া থাকেন। কিন্তু আমাদের শাস্ত্রকারগণ—মেয়ে মানুষকে শাঁখ বাজাইতে বারণ করিয়াছেন যথা,—

স্ত্রীণাঞ্চ শঙ্খধ্বনিভিঃ শূদ্রাণাঞ্চ বিশেষতঃ।
ভীতা রুষ্টা যাতি লক্ষ্মীঃ স্থলমন্যৎ স্থলাত্ততঃ॥

অর্থাৎ স্ত্রীজাতি ও শূদ্রজাতি যদি শাঁখ বাজায়, তাহা হইলে লক্ষ্মী ভয় পাইয়া ও রাগ করিয়া সে স্থান পরিত্যাগ করেন। পূর্ব্বে বোধ হয়—পুরুষেরাই শাঁখ বাজাইতেন, কাল ক্রমে ব্রত নিয়মানুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে শঙ্খধ্বনির ভারটাও পুরুষদের হাত হইতে মেয়েদের হাতে আসিয়া পড়িয়াছে। অতি প্রাচীন কাল হইতেই এদেশে শঙ্খবাদ্যের ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে। ইহা কখনই কুসংস্কার নহে। নিশ্চয়ই পুরাকালের আর্য্য ঋষিগণ শঙ্খধ্বনির কোন অলৌকিক শক্তির বিষয় অবগত ছিলেন। কিছুদিন পূর্ব্বে বঙ্গের দিগ্বিজয়ী বৈজ্ঞানিক আচার্য্য শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় শঙ্খধ্বনির অলৌকিক ক্ষমতার প্রমাণ দিয়া দেশবাসিগণকে চমৎকৃত করিয়াছেন। এস্থলে সে ঘটনার সংক্ষেপে উল্লেখ করিতেছি—

কীট পতঙ্গ ধরিয়া জীবিত রাখিবার জন্য এক রকম কাচপাত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই কাচপাত্র এরূপ ভাবে নির্ম্মিত, যে ইহার মধ্যে বায়ু অনায়াসে চলাচল করিতে পারে, অথচ ইহার ভিতরে রক্ষিত কীট বা জীবাণু কোনওরূপে বাহিরে বাহির হইয়া পলাইতে

পারে না। রাসায়নিক পরীক্ষাগারে শত শত ছাত্রের সম্মুখে, এইরূপ একটী কাচপাত্র বহু সংখ্যক জীবাণু দ্বারা পূর্ণ করিয়া, আচার্য্য জগদীশচন্দ্র তন্মধ্যে শঙ্খের শব্দ প্রবেশ করাইয়াছিলেন। শঙ্খধ্বনি প্রবিষ্ট হইবার অল্পক্ষণ পরেই দর্শকবৃন্দ দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন—পাত্রস্থিত অসংখ্য জীবিত জীবাণু পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। একমাত্র শঙ্খধ্বনিই যে জীবাণুগুলির মৃত্যুর কারণ—পরীক্ষায় ইহা স্থিরীকৃত হয়। শঙ্খধ্বনির এই অপূর্ব্ব শক্তির কথা আর্য্য ঋষিদের অজ্ঞাত ছিলনা। শঙ্খস্তুতি স্থলে তাঁহারা বলিয়া গিয়াছেন—

গর্ভা দেবারিনারীণাং বিনশ্যন্তি সহস্রধা।
তব নাদেন পাতালে পাঞ্চজন্য নমোঽস্তুতে॥

পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে, এদেশে যখন জনপদ-বিধ্বংসী মহামারীরূপে বিউবনিক প্লেগ রোগ দেখা দিয়াছিল, তখন জনৈক সাধু দেশবাসিগণকে শঙ্খধ্বনি করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন।

শঙ্খের যে রোগনাশিকা শক্তি আছে, আমাদের জীবন্ত বিজ্ঞান "আয়ুর্ব্বেদ"ই তাহার একমাত্র সাক্ষী। অনেক রোগেই কবিরাজ মহাশয়েরা শঙ্খভস্ম ব্যবহার করিয়া থাকেন। শঙ্খ—বহু ঔষধেরই উপাদান। নিম্নে দুই চারিটীর উল্লেখ করিতেছি।

জ্বরে শঙ্খ প্রয়োগ—

দগ্ধশঙ্খং ত্রিকটুকং টঙ্গনং সমভাগিকং।
বিষঞ্চ পঞ্চভিস্তুল্য মার্দ্রতোয়েন মর্দ্দয়েৎ।
বারত্রয়ং রক্তিকাভাং বটীং কুর্য্যাৎ বিচক্ষণঃ।
কফকেতুঃ কণ্ঠরোগ, শিরোরোগঞ্চ নাশয়েৎ॥

শঙ্খভস্ম, শুঠ, পিপুল, মরিচ, সোহাগার খৈ, প্রত্যেক এক ভাগ, শোধিত কাঠবিষ ৫ ভাগ, আদার রসে মাড়িয়া ১ রতি বটী করিবে। ইহার নাম "কফকেতু"। ইহাতে শ্লেষ্মঘটিত জ্বর, কণ্ঠরোগ ও শিরোরোগ নষ্ট হয়।

জ্বরাতিসারে শঙ্খ প্রয়োগ—

শঙ্খং মোচরসং লোধ্রং ধাতকী বটশুঙ্গকং।
পিষ্ট্বা তণ্ডুলতোয়েন গুড়িকাশ্চাক্ষসম্মিতাঃ।
ছায়া শুষ্কাঃ পিবেৎ ক্ষিপ্রং জরাতিসারশান্তয়ে।

শঙ্খভস্ম, মোচরস, লোধকাষ্ঠ, ধাতকীফুল এবং বটের ঝুরি, সমভাগে তণ্ডুল জলে বাটিয়া অক্ষ তুল্য গুড়িকা প্রস্তুত করিয়া ছায়ায় শুকাইবে। এই গুড়িকা সেবনে জ্বরাতিসার ভাল হয়।

শূলরোগে—শঙ্খ প্রয়োগ—

শঙ্খচূর্ণং সলবণং সহিঙ্গুব্যোষসংযুতং।
উষ্ণোদকেন তৎপীতং শূলং হন্তি ত্রিদোষজং।

শঙ্খভস্ম, সৈন্ধবলবণ, ভাজা হিং, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ প্রত্যেক দ্রব্য চূর্ণ করিয়া সমভাগে লইয়া মিশাইয়া রাখিবে। এই চূর্ণ গরম জল সহ সেবনে তৎক্ষণাৎ শূল রোগের যন্ত্রণা দূর হয়।

চর্ম্মরোগে—শঙ্খ প্রয়োগ—

দগ্ধশঙ্খং মনঃশিলা প্রপুন্নাড়শ্চ লাঙ্গলী।
গোমূত্রে বারণালৈর্বা পিষ্ট্বা লেপঞ্চ কারয়েৎ।
দদ্রুমণ্ডল-কণ্ডুঞ্চ বিচর্চ্চাঞ্চ বিনাশয়েৎ॥

শঙ্খভস্ম, মনছাল, চাকুন্দের বীজ ও ঈশলাঙ্গলার মূল গোমূত্র অথবা কাঞ্জিক দ্বারা বাটিয়া প্রলেপ দিলে, দদ্রুমণ্ডল, কণ্ডু এবং বিচর্চ্চী রোগ নষ্ট হয়।

স্ত্রীরোগে—শঙ্খপ্রয়োগ—

শঙ্খং ত্রিকত্রয়যুতং ধাত্রীরসবিভাবিতং।
হন্তি ঋতুশূলং পীতং ত্র্যহং তণ্ডুলবারিণা॥

শঙ্খ ভস্ম ও ত্রিকত্রয় (শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরিতকী, বহেড়া, আমলা, চিতা, মুথা, বিড়ঙ্গ—এই নয়টী দ্রব্য ত্রিকত্রয় নামে বৈদ্যক শাস্ত্রে অভিহিত) আমলকীর রসে ভাবনা দিবে। এই চূর্ণ—তণ্ডুল জল সহ তিন দিন সেবনে ঋতুশূল নষ্ট হয়।

লোম-শাতনে—শঙ্খ প্রয়োগ

দগ্ধশঙ্খং ক্ষিপেদ্রম্ভাস্বরসে তপ্ত পেষিতং।
* * * লেপতো হন্তি লোম গুহ্যাদিসম্ভবম্॥

এইরূপে—আয়ুর্ব্বেদের বহু রোগাধ্যায়ে—শঙ্খ ভস্ম ঔষধ রূপে কল্পিত হইয়াছে। বাহুল্য ভয়ে সে সকল উদ্ধৃত করিতে বিরত হইলাম। অনুসন্ধিৎসু পাঠক, "ভৈষজ্য রত্নাবলী," "সার কৌমুদী" "সার কণিকা" প্রভৃতি বৈদ্যকগ্রন্থ দেখিয়া লইবেন।

"শঙ্খ-দ্রাবক" প্লীহা যকৃৎ-গুল্মাদি রোগের একটী প্রসিদ্ধ ঔষধ। শঙ্খভস্ম—যক্ষ্মা, কাস, ক্রিমি, পাণ্ডু, ও অজীর্ণ রোগে—বিশেষ ফলপ্রদ। "শঙ্খ বটী" "মহাশঙ্খ বটী" "শঙ্খ রস গুড়িকা" প্রভৃতি—নামজাদা ঔষধ—কবিরাজ মহাশয়গণ সর্ব্বদাই ব্যবহার করেন। অম্ল রোগে—শঙ্খভস্ম ঠিক্ Sodi Bi Carbএর মত উপকারী।

বৈদ্যশাস্ত্র মতে—শঙ্খ শোধন করিয়া পরে ভস্ম করিয়া লইতে হয়। শঙ্খকে গোঁড়ালেবুর রসে সিদ্ধ করিয়া উষ্ণ জল দিয়া ধৌত করিয়া লইলেই শঙ্খ শোধিত হইল। এইরূপ শোধিত শঙ্খ—শরার মধ্যে পুরিয়া উপরে আর একখানি শরা চাপা দিয়া উভয় শরার সন্ধিস্থানে কর্দ্দমের লেপ দিয়া, ঘুঁটের আগুনে পোড়াইলেই উত্তম শঙ্খভস্ম প্রস্তুত হয়। ঔষধার্থে এইরূপ শঙ্খভস্মই ব্যবহার করা উচিত।

শঙ্খের উৎপত্তি সম্বন্ধে পুরাণে অনেক আশ্চর্য্য গল্প প্রচলিত আছে। কিন্তু সে সকল গল্প—এ যুগের লোক বিশ্বাস করিতে চাহিবেন না। সংহার-কর্ত্তা শঙ্কর "শঙ্খচূড়" নামক অসুরের প্রাণ বধ করিলে সেই অসুরের অস্থিখণ্ড হইতে শঙ্খের উৎপত্তি হইয়াছে। পুরাণের মতে ক্ষীরোদ সমুদ্রের নীরেই শঙ্খের জন্মস্থান। পূর্ব্বে সৌরাষ্ট্র [সুরাট্] দেশে প্রচুর পরিমাণে শঙ্খ পাওয়া যাইত। এখন সেতুবন্ধের সমুদ্রগর্ভ হইতে প্রতিবৎসর অসংখ্য শঙ্খ উত্তোলিত হইয়া থাকে। টুটিকোরিণ ও সিংহলের সমুদ্র ভাগেও যথেষ্ট শঙ্খ পাওয়া যায়। সমুদ্র গর্ভে—প্রায় ৪০ হাত গভীর জলে—শঙ্খ বাসক রে, ইহা রা বালির মধ্যে লুকাইয়া থাকে। শঙ্খ দলবদ্ধ হইয়া এক সঙ্গে থাকিতে ভাল বাসেনা,—ইহারা 'শ্বেতাঙ্গ' কিনা!—বোধ হয় তাই একানুবর্ত্তী প্রথার বিরোধী।

অগ্রহায়ণ মাস হইতে আরম্ভ করিয়া জ্যৈষ্ঠ মাস পর্য্যন্ত ডুবুরীগণ শঙ্খ উত্তোলন কার্য্যে নিযুক্ত থাকে। এক হাজার শাঁখ তুলিলে, তাহারা ২০৲ টাকা পারিশ্রমিক পায়।

সমুদ্রতীরের খানিকটা স্থান প্রাচীর দিয়া ঘিরিয়া রাখা হয়,—ইহার নাম "কোট্টু"। শাঁখ তোলা শেষ হইলে, শাঁখগুলিকে আগে বাছাই করিয়া পরে এই "কোট্টুতে" রাখা হয়! বড়, মাঝারী, ছোট—সকল শাঁখের জন্য পৃথক্ পৃথক্ "কোট্টু" নির্দ্দিষ্ট আছে। যে শাঁখ গুলি খুব ছোট, সেগুলিকে আবার জলে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। উদ্দেশ্য—সেগুলি আবার বড় হইবে। কিন্তু নর-করস্পর্শে—জলে পড়িয়াও তাহারা পুনর্জীবিত হয় কি না সন্দেহ। কিছুদিন কোট্টুতে' থাকিলে, শঙ্খের মধ্যস্থিত মাংস বা শাঁস পচিতে আরম্ভ করে। সে সময় সেস্থান হইতে

ভয়ানক দুর্গন্ধ বাহির হইয়া থাকে। মাংস পচিয়া গেলে শাঁখগুলিকে জল দ্বারা ধৌত করিয়া পরিষ্কার করা হয়। তাহার পর সেই সকল পরিষ্কৃত শঙ্খ নীলামের ডাকে বিক্রীত হইয়া থাকে।

শঙ্খের অনেক রকম জাতি আছে। সকল জাতীয় শঙ্খেরই দুইটী শ্রেণী দেখিতে পাওয়া যায়—"বামাবর্ত্ত" ও "দক্ষিণাবর্ত্ত"। যে শঙ্খের চক্র বাম দিকে হেলিয়াছে—তাহার নাম "বামাবর্ত্ত", আর যাহার চক্র দক্ষিণাভিমুখী, তাহার নাম "দক্ষিণাবর্ত্ত"। "দক্ষিণাবর্ত্ত" শঙ্খ—দুষ্প্রাপ্য। শ্রীহরির পাঞ্চজন্য "দক্ষিণাবর্ত্ত"ছিল। এই শঙ্খ গৃহে থাকিলে, গৃহের অমঙ্গল দূর হয়—অনেক গৃহস্থের মনে এইরূপ ধারণা আছে। শুনিয়াছি—দু'একটী "দক্ষিণাবর্ত্ত" শঙ্খ নাকি লক্ষাধিক মুদ্রায় বিক্রীত হইয়াছে। সিংহলের জাফ্না নামক স্থানে—১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে একটী লোক একটী "দক্ষিণাবর্ত্ত" শঙ্খ পাইয়াছিল,—সেটী মাত্র ৭০০৲ সাত শত টাকায় বিক্রীত হইয়াছিল।

শ্রীসতীশচন্দ্র দে, এম্ এ।

[প্রফেসর]

আহার ও স্বাস্থ্য।

আহারই প্রাণ রক্ষার মূল। ভুক্তদ্রব্য পরিপাক হইয়া দেহী দিগের দেহ রক্ষা করিতেছে। জীব-জগতে বিশ্বনিয়ন্তার ইহাই অপূর্ব্ব বিধান। শাস্ত্রকার বলিয়া গিয়াছেন, যেরূপ যথা সময়ে দহনীয় পদার্থ প্রাপ্ত না হইলে বাহ্যাগ্নি মন্দবল হইয়া থাকে, সেইরূপ, ক্ষুধার সময় আহার না করিলে দৈহিক পাচকাগ্নিও হীনশক্তি হইয়া থাকে। অগ্নি প্রথমে ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক করে, তাহার অভাবে কফাদি দোষ সকলকে, তদভাবে রসাদি ধাতু সমস্তকে এবং তৎপরে জীবন পর্য্যন্ত পরিপাক করিয়া থাকে। আহার দ্বারা প্রীতি, সত্ত্ব:বল-সঞ্চার, দেহ-রক্ষা এবং স্মরণশক্তি বর্দ্ধিত হয়।

কিন্তু তাই বলিয়া যখন তখন যা' তা' দ্রব্য আহার করিলে চলিবে না। নিয়ম পূর্ব্বক উপযুক্তকালে এবং বিশুদ্ধ দ্রব্য আহার করা কর্ত্তব্য। যে কাল পর্য্যন্ত আমাদের দেশের লোক এ সকল কথা বুঝিয়াছিল, সে কাল পর্য্যন্ত নানারূপ আধিব্যাধি এবং অকালমৃত্যু আমাদের দেশে উপস্থিত হইতে পারে নাই।

মনুষ্য প্রকৃতি ত্রিবিধ—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক—মিশ্র প্রকৃতিযুক্তও মানুষ দেখা যায়। শাস্ত্রে ত্রিবিধ প্রকৃতি ও লক্ষণ এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে—

সত্ত্ব গুণ সম্পন্ন ব্যক্তিগণ সাধু স্বভাব এবং ধর্ম্ম, মোক্ষ ও পরলোকে শ্রদ্ধাবান হন। ইঁহারা অক্রোধি ও সত্যবাদী। মেধা, বুদ্ধি, ধৃতি, ক্ষমা এবং দয়া—এইগুলিকে হৃদয়ে রক্ষা করিয়া ইঁহারা আত্ম-তত্ত্বান্বেষী হইয়া থাকেন। রজোগুণ সম্পন্ন ব্যক্তিরা অত্যন্ত সুখান্বেষী হওয়ায় ক্রোধ, দুঃখ, অধীরতা, দম্ভ, অভিমান এবং ঐশ্বর্য্যের দাস। মিথ্যাবাক্য-প্রয়োগ ইহাদিগের অঙ্গের ভূষণ, কামুকতায় ইঁহারা দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য। তমোগুণযুক্ত ব্যক্তিরা

নিতান্তই দুষ্ট বুদ্ধি সম্পন্ন। নিন্দিত-কর্ম্মজনিত সুখেই ইহাদিগের তৃপ্তি। ইহাদিগের মূর্খতা এবং ক্রোধান্ধতা সর্ব্বদা প্রকাশমান হইয়া থাকে।

খাদ্যবিচার সম্বন্ধেও ঐ ত্রিধাতুর ব্যক্তি দিগের ভিন্ন ভিন্ন রূপ প্রবৃত্তি জন্মিয়া থাকে।

সত্বগুণ প্রকৃতির যে মহাপুরুষগণ দেশ রক্ষার ব্রতী হইয়াছিলেন, যাঁহারা ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা ও সমাজের হিতের জন্য বিবিধ শাস্ত্র-গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই সাত্বিক ও পরিমিতভোজী ছিলেন—কেহই মৎস্য-মাংস-পলান্নে উদরপূর্ত্তি করিতেন না। যে সকল দেশের লোকের আচার-ব্যবহার দেখিলে মনে হয়, যেন তাহারা আহার করার জন্যই বাঁচিয়া আছে, সেই জাতির মধ্যেও যাঁহারা জ্ঞান ও ধর্ম্ম প্রচারে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, তাঁহারাও "উচ্চ জ্ঞানচর্চ্চা ও সাদাসিদে আহারের" পক্ষপাতী। দেশ, প্রকৃতি ও কর্ম্মভেদে লোকের আহারের পার্থক্য অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু যিনি যাহাই আহার করুন, খাদ্য বস্তুর বিশুদ্ধতা সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বকালে যে নিতান্ত আবশ্যক, এ বিষয়ে মতভেদ নাই! আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য বলিয়াছেন—"শরীরাস্তু অন্নপানমূলা" সমস্ত শারীর রোগ অন্নপান দোষে জন্মিয়া থাকে। সুতরাং এই অন্নপানের বিশুদ্ধতা ব্যাধি হইতে রক্ষা পাইবার কবচ স্বরূপ।

সত্বগুণবর্দ্ধক দুগ্ধ-ঘৃত আমাদের দেশের লোকে প্রচুর পরিমাণে ভোজন করিয়া থাকে কিন্তু সংপ্রতি এই সকল বস্তু আর বিশুদ্ধ পাওয়া যাইতেছে না—অধুনা আমাদের নিত্য ব্যবহার্য্য খাদ্যদ্রব্যগুলির সংগ্রহ-প্রণালীর ঘোরতর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। সেকালে ভদ্র-ইতর, দরিদ্র-মহৎ—সকল সংসারেই গাভী-পালনের ব্যবস্থা ছিল। সেই গাভী পালনের ফলে সকল গৃহেই বিশুদ্ধ দুগ্ধ এবং ঘৃত যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন হইত; গৃহজাত দ্রব্য অস্বাস্থ্যকর হইবার কোন কারণই ছিল না। আটা বা ময়দা এমন কি চাউল পর্য্যন্ত এখনকার মত সে কালে বিপণীস্থান হইতে ক্রয় করিবার ব্যবস্থা ছিলনা,—গম কিনিয়া জাঁতায় পিষিয়া ইতর ভদ্র—সকল গৃহের রমণীরাই আপনাপন সংসারে আটা প্রস্তুত করিতেন। ঢেঁকি গৃহস্থমাত্রেরই গৃহস্থলীতে প্রতিষ্ঠিত থাকিত। নিজ তত্ত্বাবধানে ধান ভানিয়া চাউল প্রস্তুত করা হইত। সেই বিশুদ্ধ তণ্ডুলের অন্ন ও আটার রুটি বা লুচি গৃহললনাগণ স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়া স্বামী-পুত্র-আত্মীয় বর্গকে আহার করিতে দিতেন। সে ব্যবস্থা ক্রমশঃ হ্রাস পাইলেও এখনও অনেক পল্লীগৃহস্থ এইরূপেই অন্ন সংগ্রহ করিতেছে। কলিকাতার অনেক সম্ভ্রান্ত মাড়োয়ারী-পরিবারের বাটীর স্ত্রীলোকেরাই গম পিষিয়া আটা প্রস্তুত করেন, ইহাতে ব্যায়াম ও বিশুদ্ধ ভোজ্য সংগ্রহ দুইই নির্ব্বাহ হয়। সর্ষপ তৈলও এখনকার মত তখন বাজার হইতে ক্রয় করিবার ব্যবস্থা ছিল না, সর্ষপ কিনিয়া, উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিয়া, কলুদিগের নিকট হইতে সকলে ঘানিতে ভাঙ্গাইয়া লইতেন। ইক্ষু চাষ সেকালে অধিকাংশ গৃহস্থেরই ছিল, খর্জ্জুর বৃক্ষের চাষের জন্য সেরূপ কেহ মনঃসংযোগ না করিলেও গৃহ সন্নিহিত বৃক্ষ-বাটিকায় প্রায় সকল গৃহস্থেরই অল্পাধিক পরিমাণে অযত্ন সম্ভূত খর্জ্জুর বৃক্ষ বিদ্যমান থাকিত। ফলে ইক্ষু গুড় এবং খর্জ্জুর গুড় ক্রয় করিবার জন্য সেকালে প্রায় কাহাকেও পণ্য-বিক্রেতার

আলয়ে গমন করিতে হইত না। মাঠে চাষ হইত, বাগানে তরকারি হইত, হয় তো অনেকের গৃহ-প্রাঙ্গনেই শাক সব্জি উৎপন্ন হইত। ইহা ভিন্ন এখনকার মত তখনকার দিনে পল্লীগ্রামে জল-কষ্ট উপস্থিত হয় নাই, অনেক গৃহস্থই দীর্ঘিকা-পুষ্করিণী-প্রতিষ্ঠায় যত্নপর ছিলেন। তদ্দ্বারা উৎকৃষ্ট পানীয়ের ব্যবস্থা তো হইতই, অধিকন্তু ঐ জলাশয়গুলি হইতে গৃহস্থের মৎস্যের ব্যবস্থা হইত। ফলে এইরূপ ব্যবস্থায় সেকালে এক দিকে অর্থ-ব্যয়ের হ্রাস হইত, অপর দিকে শরীর রক্ষার উপযোগী পুষ্টিকর দ্রব্য সকল আহার করিতে পাইয়া আমরা নীরোগ ও সুস্থ শরীরে দীর্ঘায়ু লাভে সমর্থ হইতাম। কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন,—এ ব্যবস্থা তো পল্লীগ্রামেই সম্ভব ছিল,—সহরে তখনকার দিনে এ ব্যবস্থা কিরূপ ভাবে চলিত? ইহার উত্তর অতি সহজ। সে কালের সহর গুলি এরূপ অন্তঃসারশূন্য বাহ্যিক-সম্পদে বিভূষিত ছিল না, পল্লীগ্রামের এই আব্‌হাওয়া সেকালে সহরেও বহমান ছিল।

যাহা হউক ক্রমশঃ এ সকল ব্যবস্থা দেশ হইতে লুপ্ত হইল। ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত-দেশে আমরা সভ্যতার শিক্ষা পাইয়া স্বাস্থ্য-হিতকর দীক্ষা বিস্মৃত হইলাম। কাঞ্চনের পরিবর্ত্তে কাচের আদর করিতে শিখিলাম। কি করিলে,—কিরূপ নিয়মে থাকিলে—কিরূপ দ্রব্য আমাদের শরীরপুষ্টির উপযোগী—এ সকল কথা ভুলিয়া গিয়া আমরা একটু আলস্য-পরতন্ত্র হইয়া পড়িলাম। জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্য স্ব স্ব ব্যবসায়-বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইবার স্পৃহাটা অনেকেরই বলবতী হইল। ফলে নগদ অর্থের মুখ আমরা বেশী করিয়া দেখিতে লাগিলাম বটে, কিন্তু তাহাতে অর্থকৃচ্ছ্রতা বৃদ্ধি হইয়া পড়িল। স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম পালন কিরূপে করিতে হয়,—হিন্দুর দেশে—হিন্দু-সন্তানের কিরূপ আহার করা কর্ত্তব্য—এ সকল কথা তো ক্রমশঃ ভুলিতেই ছিলাম, অর্থ কৃচ্ছ্রতার জন্য সেই বিস্মৃতিটা আরও অধিক হইয়া পড়িল। চাকরিগত-প্রাণ ভারতবাসীর রুচি তো পরিবর্ত্তিতই হইয়াছিল, এক্ষণে সৎ-প্রবৃত্তিও লোপ পাইল। এমনই করিয়া দেশের অধঃপতন আরম্ভ হইল।

ক্রমশঃ সে অধঃপতনটা অল্প দূর গড়াইল না। করণীয় বিষয় তো ভারতবাসী ইতঃ-পূর্ব্বেই ভুলিয়া গিয়াছিল, এক্ষণে ধর্ম্ম ও ভুলিল। যে গোপ জাতি গো-মাতার সেবা-ব্রতে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন বলিয়া এবং নন্দবংশ সম্ভূত বলিয়া সমাজে প্রতিপত্তি লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, সেই গোপ-নন্দনগণ সুযোগ বুঝিয়া—ধর্ম্ম ভুলিয়া—তাহাদিগের বিক্রেয় দুগ্ধে প্রচুর পরিমাণে জল মিশাইতে আরম্ভ করিল, ঘৃতে নানারূপ ভেজাল মিশাইতে লাগিল, অন্যান্য ব্যবসায়ী-রাও ইহাদিগের অনুকরণে আটা এবং ময়দায় জীর্ণশক্তির অপকারী পাথর এবং কত কি মিশাইতে লাগিল। দেশের দীর্ঘিকা-পুষ্করিণী মজিয়া আসিল, কাজেই দেশের লোক পচা জল পানে অভ্যস্থ হইল। আমরা শুধু সারাদিন প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া—চাকরি করিয়া অর্থ আনিতে শিখিয়াছি; ঐ অর্থ দ্বারা কিরূপভাবে দেহ রক্ষা করিতে হয়, তাহা আমরা আদৌ শিক্ষা করি নাই, কাজেই আমাদের দুর্গতি হইবে না তো দুর্গতি হইবে

কাহাদের? আজ যে পণের আনা বাঙ্গালী-সন্তান অম্ল, অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্যে জর্জ্জরিত হইয়া অস্বস্তি-হৃদয়ে কালাতিপাত করিতেছে, ইহা তো তাহাদেরই—কৃত কর্ম্মের ফল! কবি কি সাধ করিয়া বলিয়াছিলেন,—

"কারো দোষ নয় গো মা,
আমি স্বখাদ-সলিলে ডুবে মরি শ্যামা।"

বাঙ্গালীর চক্ষু ফুটে নাই, কিন্তু এ দুর্দ্দিনে একটা আশার অলোক দেখা দিয়াছে। মারওয়ারি সম্প্রদায় ভেজাল ঘৃতের ব্যবসায়ী-দিগকে শাস্তি দিবার জন্য ভাগীরথী-তীরে যে উপবাস ব্রত করিয়াছিলেন, দ্বারবঙ্গের মাহারাজা প্রমুখ দেশের ধর্ম্ম প্রাণ হিন্দুগণ সে ব্রতের উদযাপন করিয়া ঐ দুর্ব্বৃত্ত ব্যবসায়ী দিগকে অর্থ এবং সামাজিক দণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। মারওয়ারি-সমাজে এখনও সামাজিক দণ্ডের ভয়ে সকলে ভীত হইয়া থাকেন, সেইজন্য এ দণ্ড অপরাধীগণ ঘাড় পাতিয়া মানিয়া লইয়াছে। বাঙ্গালীর এ দণ্ড-ভয় নাই, বাঙ্গালী এ দণ্ড-ভয় রাখেও না, বাঙ্গালীসমাজ যে উৎসন্ন গিয়াছে, সুতরাং বাঙ্গালী দণ্ড-ভয় রাখিবে কেন? মারওয়ারি সমাজে তো এত কাণ্ড হইল, কিন্তু কলিকাতার খাবারওয়ালার দোকান গুলিতে বাঙ্গালী গ্রাহকের দ্রব্য ক্রয় কি কম হইয়াছে? সে কালের বাঙ্গালী কচুরি-জিলিপিতে জলযোগ করিতনা। সে কালে ঐ ধরণের দোকানও ছিলনা,—সমাজভয়ে বাঙ্গালীর ঐ সকল দ্রব্য ক্রয় করিয়া রসনার পরিতৃপ্তি সাধনের প্রবৃত্তিও হইত না। সেকালের বাঙ্গালীর জলখাবার ছিল—আদা-ছোলা, গুড়-মুড়ি, চালভাজা-মুড়্কি বা নানারূপ ফল। এখনকার দিনে ফল খাইবার প্রবৃত্তি কাহারও কাহারও থাকিতে পারে, কিন্তু আদা-ছোলা বা মুড়ি-মুড়্কি, কি গুড়-চালভাজা খাইলে তো তোমাকে ভদ্র-সমাজে স্থানই দেওয়া হইবেনা।

এই দুর্দ্দিনে সেকালের আহারের বিশুদ্ধতা স্মরণ করিয়া ভাবি, কি করিলে দেশের লোকে আবার সেইরূপ বিশুদ্ধ খাদ্য পাইতে পারে? অবশ্য পাঠক-পাঠিকাগণ মনে করিবেন না যে, আমরা আবার সেকালের মত সকল গৃহস্থ-কেই ধান ভানিয়া, কলায় ভাঙ্গিয়া খাইবার ব্যবস্থা দিতেছি,—কারণ দেশকালভেদে এখন হয় ত তাহা কার্য্যকর হইবে না, কিন্তু তাহা না হইলেও খাদ্যের বিশুদ্ধতার জন্য তখন যে যথেষ্ট শ্রম করা হইত, সে কথা আমরা চিরকালই মনে করিব। গৃহস্থ আর জাঁতায় ভাঙ্গিয়া দাল করেনা, ফলে দালের কারবার, দালের দোকান অনেক হইয়াছে, কিন্তু কলিকাতার যে কোনো দালের আড়তে গিয়া দেখুন—কি বিভীৎস ব্যাপার, অতি কদর্য্য-স্থানে পর্ব্বতপ্রমাণ ভাল মন্দ মিশ্রিত ভাঙ্গা কলায় রহিয়াছে, বহুসংখ্যক স্ত্রীপুরুষে কলায় ভাঙ্গিতেছে, আর সেই দালের স্তূপের উপর কত থু থু পড়িতেছে, পিষণওয়ালীর শিশু সন্তান মলমূত্র ত্যাগ করিতেছে, ইহা ভিন্ন তাহাদের শ্রমজাত ঘর্ম্ম-মিশ্রণের ত কথাই নাই। এরূপ ত হইবেই, তাহাদের ত কোন কদর নাই, ইহা তাহাদের ব্যবসা। এই দাল আমরা আনিয়া বাছিবার ও ধুইবারও অবসর পাই না—হাঁড়িতে দিয়া তাহাই আহার করিতেছি।

চাউলের ও ঘৃতের আড়তে, তৈলের ও ময়দার কলে, সন্দেশের-খাবারের দোকানে—যাহা যাহা থাকে, তাহাতে ঐ সকল দ্রব্যের পবি,

ত্রতা ও বিশুদ্ধতা কিছুমাত্র রক্ষিত হইতেছে না। এখন চর্ব্বিও তৈল-ঘৃত বলিয়া বিক্রীত হইতেছে। বিভিন্ন তৈল-যোনি-বীজ হইতে তৈল নিষ্কাশিত হইয়া সার্ষপ তৈল নামে চলিয়া যাইতেছে,—তেলের কলের ট্যাঙ্ক ও এক নরক বিশেষ—ময়লার কথা ছাড়িয়া দাও, ইহাতে ২।৫ টা পচা ইন্দুরও না পাওয়া যায় এমন নহে। বণিক্‌গণের অর্থলোভ অতিরিক্ত-বর্দ্ধিত হওয়ায় এই সকল অনর্থ-পরম্পরা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছে। ইহার উপর খাদ্যের বিশুদ্ধতা ও পবিত্রতা রক্ষার প্রতি আমাদের উদাসীনতা মিলিত হওয়ায় স্বাস্থ্য-নাশের পক্ষে মণিকাঞ্চন যোগ উপস্থিত হইয়াছে। অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, পশ্চিমে খোট্টা-চাপরাসী সমস্ত দিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পরেও আপনার খাবার—চা'ল-দাল-গুলি এক একটী করিয়া খুঁটিয়া-বাছিয়া তবে পাক করে, সমস্ত পাকপাত্র রোজ মাজিয়া-ঘসিয়া পরিষ্কার করে. কারণ পবিত্রতা রক্ষা ইহাদের স্বভাবসিদ্ধ। প্রকৃতই পবিত্রতা রক্ষায় অনেক ব্যাধি হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। আমাদের আজকালকার মধ্যবিত্ত গৃহস্থের স্ত্রীলোকগণ (বড় মানুষদের ত কথাই নাই) খাদ্যের পবিত্রতা রক্ষার দিকে তত নজর দেন না, শরীরের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রতি কিন্তু বেশ দৃষ্টি আছে, ছেলেকে সাবান মাখান, পোষাক-পরাণর জন্য যত যত্ন লওয়া হয়, তাহাদের আহারের পবিত্রতা রক্ষার জন্য তাহার চতুর্থাংশের একাংশও যত্ন নাই! খাবার জিনিষ দোকান হইতে আসিতেছে, নিযুক্ত ভৃত্যে পাক করিতেছে! দেহটী ফিট্‌ফাট্ রাখা এবং আহারের পবিত্রতার প্রতি এতাদৃশ উদাসীন হওয়া—এই ভাবটী ইংরাজি অনুকরণের বিষময় ফল। উহাদের রান্নাঘরটী নরক বিশেষ হউক তাহাতে আপত্তি নাই, কিন্তু বাবুর্চ্চি উত্তম শুভ্রবস্ত্রধারী হইয়া খাবার সরবরাহ করিলেই হইল—পাচক হয়ত সপ্তাহাধিক কাল স্নানই করে নাই—তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু পাণিতল ও অঙ্গুলি মাত্র সাবান-বিধৌত হইলেই হইল।

এদেশে এই যে অজীর্ণ ও ক্ষয় রোগের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইতেছে, আহারের অবিশুদ্ধতাই যে ইহার অন্যতম কারণ—একথা বিজ্ঞ লোক মাত্রেই স্বীকার করিতেছেন। কিন্তু প্রতীকারের উপায় কি? অনেকেরই ধারণা, কঠোর-রাজশাসন প্রবর্ত্তিত না হইলে খাদ্যে ভেজালের এই সর্ব্বনাশকর প্রথা রহিত, হইতে পারেনা। কিন্তু, আমরা যদি অবিশুদ্ধ ঘৃত-তৈলাদি সর্ব্বান্তঃকরণে পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করি, তাহা হইলেই ত ভেজালের প্রতিকার হইতে পারে। এবং প্রজা যাহা আন্তরিকতার সহিত প্রার্থনা করে, তদ্বিষয়ক রাজশাসন প্রবর্ত্তিত হইতেও বিলম্ব হয়না, সংপ্রতি সেইজন্যই আইনের ব্যবস্থাও হইয়াছে। যাহা হউক কলিকাতার মাড়োয়ারী এবং অন্যান্য ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের অনশনপূর্ব্বক অশুদ্ধ ঘৃত বর্জ্জনের প্রতিজ্ঞা আমাদের চিরস্মরণীয় হউক এবং ইহার সুফল স্থায়ী হইয়া দেশবাসীর স্বাস্থ্য সম্পূর্ণরূপে রক্ষিত হউক—ইহাই আমরা দেখিতে ইচ্ছা করি।

ম্যালেরিয়া ও পল্লীগ্রাম

কি কুক্ষণে জানিনা,—ম্যালেরিয়া বিষ বাঙ্গালার পল্লীগুলিতে প্রবেশ করিয়াছিল! এই বিষের জ্বালায় বাঙ্গালার কত পল্লীরই যে সর্ব্বনাশ সাধিত হইয়াছে, তাহা ভাবিলে ও বুক ফাটিয়া যায়। কত ধনীর কত অর্থ এই বিষ ঝাড়াইতে গিয়া নষ্ট হইয়াছে, কত গৃহস্থ অর্থাভাবে বিষ ঝাড়াইবার প্রকৃষ্ট ব্যবস্থা করিতে পারে নাই, ফলে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া ইহার দংশনে কালকবলিত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। এক কথায় সুজলা-সুফলা-শস্য-শ্যামলা আমাদের পল্লী-মাতার দুর্গতি যে ম্যালেরিয়া হইতেই আরম্ভ হইয়াছে, ইহা নির্ভাজ সত্য কথা। যখন পল্লীবাসিগণ দেখিল, ম্যালেরিয়া-রাক্ষসী বিকট-বদন-ব্যাদানপূর্ব্বক গ্রামের পর গ্রাম—পল্লীর পর পল্লী—এক ঘর গৃহস্থের পর আর এক ঘর গৃহস্থ গ্রাস করিতে বসিয়াছে, তখন উপায়ান্তর রহিত হইয়া, জননী-জন্মভূমি-পল্লীমাতাকে চিরদিনের মত প্রণাম করিয়া, পল্লী-সন্তানগণ সহরের সম্পদ-বৃদ্ধি করিতে লাগিল। শুধু কলিকাতার কথা নহে, এমনই করিয়া দেশের জেলা এবং মহকুমাগুলিও আজি জনবহুল হইয়া পড়িয়াছে। কলিকাতা ও মফঃস্বলের জেলা এবং মহকুমাগুলির বর্ত্তমান বাসিন্দাদিগের নিকট পূর্ব্ব নিবাসের তথ্য সংগ্রহ করিলে আমাদের কথিত বিষয়ের প্রমাণ সহজেই নির্ণীত হইতে পারিবে। ফলে বাঙ্গালার সহরগুলিও জনবহুল হওয়ায় সহরেও রোগ-বাহুল্য ঘটিতেছে। পল্লীগ্রাম অপেক্ষা সহরে ম্যালেরিয়ার আক্রমণ কম হইলেও অন্য রোগের আধিক্য—জন-বাহুল্য-নিবন্ধন অনেক বেশী। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পল্লীগ্রামের ম্যালেরিয়া-বৃদ্ধিই সহরের জন-বাহুল্যের কারণ। এ অবস্থায় ম্যালেরিয়াই যে আমাদের স্বাস্থ্যোন্নতির সর্ব্বপ্রধান অন্তরায় ঘটাইতেছে, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে।

নানা কারণে এখন অনেকের আবার পল্লীবাস-স্পৃহা জাগিয়া উঠিয়াছে শুনিতে পাই। কিন্তু উহা জাগিলে কি হইবে? পাছে আবার ম্যালেরিয়ার আক্রমণে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয়—এই ভয়ে সে স্পৃহা অনেকের মনে-মনেই বিলয়প্রাপ্ত হইতেছে। ম্যালেরিয়ার বিষ তো যেমন-তেমন নহে,—এ বিষে আক্রান্ত হইলে সদ্যঃমরণের আশঙ্কা সকল স্থলে থাকুক বা না থাকুক, ইহার দ্বারা যে শনৈঃ-শনৈঃ পরমায়ুর হ্রাস হইয়া থাকে, তাহা অবিসংবাদিত। একটী প্রবাদ আছে—"কাচা লম্বা কোঁচা টান, বাড়ী জেন বর্দ্ধমান" সেইরূপ পেট জোড়া-প্লীহা, উদর-জোড়া-যকৃৎ এবং বক্ষঃস্থলের নিম্নদেশ জোড়া কড়া বা অগ্রমাস দেখিলেই বুঝিতে হইবে, ইহার পরমায়ুর কতকাংশ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে। অম্ল, অজীর্ণ, অক্ষুধা বা ইংরাজী মতে ডিস্‌পেপ্‌সিয়া নামক যে ব্যাধি আজি বাঙ্গালার চিরসহচর হইয়া পড়িয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না, অনেকস্থলে ইহার মূলীভূত কারণও ম্যালেরিয়া। কোন কোন স্থলে থাইসিসের সূচনাও এই ম্যালেরিয়া হইতে আরম্ভ হয় দেখা গিয়াছে।

অনেক বৈজ্ঞানিক-পণ্ডিতের মতে অনেকগুলি কারণের মধ্যে প্রধানতঃ বাঙ্গালার

শক বংশের আধিক্যই ম্যালেরিয়া-বিস্তৃতির কারণ। কথাটা অসঙ্গত বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায়না। বর্ষার ধারাসিক্ত-কর্দ্দমাক্ত পল্লী-পথ,—বন-বহুল-পল্লীপার্শ্বস্থ অটবী সকল—বহুকালাবধি অসংস্কৃত পঙ্কিল-ডোবা-পুষ্করিণীর পার্শ্বস্থ অবিন্যস্ত জঙ্গলগুলি—যে মশক উৎপন্নের স্বভাব-সুলভ-সুখদ স্থান এবং তাহা হইতে যে বাঙ্গালার পল্লীগুলির ম্যালেরিয়া বর্দ্ধিত হইয়া থাকে, ইহা তো সুনিশ্চয়। কিন্তু তাহার জন্য আমরা করিতেছি কি ?

পল্লী ছাড়িয়া সহরে বাস করিলে তো দেশ হইতে ম্যালেরিয়ার উচ্ছেদ-সাধন করা হইবে না। দেশ ছাড়িয়া আমরা আত্মরক্ষার উপায় করিতে পারি বটে, কিন্তু পল্লী-জননীর সমগ্র সন্তানেরই তো পল্লী ছাড়িয়া সহর-বাসের উপায় নাই। আর সকলেই যদি সহরে বাস করিতে থাকে, তাহা হইলেই বা চলিবে কেমন করিয়া! সহরের অনায়াস-লভ্য কলের জল পাইয়া বা মফঃস্বলের যে সকল সহরে জলের কলের প্রতিষ্ঠা হয় নাই—সে সকল সহরে ইন্দারা হইতে জল তুলিয়া লইয়া আমরা পিপাসার শান্তি করিতে পারি বটে, কিন্তু সকলেই যদি সহরবাসী হয়, তাহা হইলে আমাদের আহারীয় সংগ্রহ হওয়া যে ভার হইয়া পড়িবে। আমাদের অন্ন-সংস্থানের জন্য—আমাদের জীবনব্যাপী চিরন্তন সুহৃদ—আমাদের কৃষিজীবি—পল্লী-সন্তানদিগকেও তো অন্ততঃপক্ষে অধঃপতিত—দুর্দ্দশাগ্রস্ত পল্লী-প্রান্তরে পড়িয়া থাকিয়া আমাদের আহার্য্য-সংস্থানে সচেষ্ট থাকিতে হইবে! বুদ্ধি দান করিয়া—উপদেশ প্রদান করিয়া—নানারূপ প্রলোভন দেখাইয়া আমরা তো তাহাদিগকে আমাদের মত সহরবাসী হইবার করিতে পারিব না! কাজেই ম্যালেরিয়ার জন্যই হউক, বা যে কারণেই হউক, আমরা পল্লীভূমি পরিত্যাগ করিলেও পল্লী-মায়া পরিত্যাগ করিতে পারিবনা,—পল্লী চিন্তায় আমাদিগকে ব্যাপৃত থাকিতেই হইবে। আমরা নিষ্কামধর্ম্মী হইতে পারি বা না পারি,—অন্ততঃপক্ষে আমাদের স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য ও পল্লী-চিন্তা আবশ্যক। সেজন্য সর্ব্বাগ্রে আমাদের চিরত্যক্ত পল্লীগুলিকে ম্যালেরিয়ার হস্ত হইতে রক্ষা করিতে হইবে। পল্লী-মাতাকে রক্ষা করিতে পারিলে তবে আমরা নিজেরা রক্ষা পাইতে পারিব।

পল্লীগ্রামগুলি ম্যালেরিয়ার লীলা-নিকেতন হইয়াছে বলিয়া পল্লী পরিত্যাগ করিলে চলিবেনা, পল্লী-রক্ষার জন্য চেষ্টাশীল হইতে হইলে দেশ-মাতার সুসন্তানগণকে আবার পল্লীগ্রামে ফিরিয়া যাইতে হইবে। মাতৃ-সন্নিধানে ফিরিয়া গিয়া, অর্থে পার,—সামর্থ্যে, পার—যত্ন লইয়া—চেষ্টা করিয়া,—কতক নিজেরা চাঁদা তুলিয়া—কতক বা লোকাল-বোর্ড-ডিষ্ট্রিক্‌বোর্ডের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া, যাহাতে গ্রামের বন-জঙ্গলগুলি বিদূরিত হয়—রাস্তাঘাটগুলির সংস্কার-সাধন করা হয়—সুপেয় জল-সংস্থানের ব্যবস্থা হইতে পারে,—তাহার জন্য প্রাণপাত পরিশ্রমপূর্ব্বক চেষ্টা করিতে হইবে, তবেই পল্লী-রক্ষা হইবে, এবং সে রক্ষায় আমরা নিজেরা রক্ষা পাইব। দেশ রক্ষা করিতে হইলে—সমাজ রক্ষা করিতে হইলে—বাঙ্গালীজাতির অস্তিত্ব রক্ষা করিতে হইলে, এরূপ ব্যবস্থা ভিন্ন আমাদের গত্যন্তর নাই।

ম্যালেরিয়া বড় সহজ ব্যাধি নহে, কেবল যে শুধু মশক হইতেই ম্যালেরিয়ার উৎপত্তি

হয়—এমনও নহে,—ম্যালেরিয়াগ্রস্ত ব্যক্তির শরীর হইতেও ম্যালেরিয়া-বিষ অন্য দেহে প্রবেশ করিয়া থাকে। সংপ্রতি আমেরিকার একজন বিচক্ষণ ডাক্তার স্পষ্টতঃই এই কথা বলিয়াছেন। তাঁহার মতে মশক হইতে ম্যালেরিয়া উৎপত্তির কোন কারণই নাই, ম্যালেরিয়া-বিষ মানবের শরীর হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। সে যাহা হউক, ক্রমাগত ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া-ভুগিয়া যাঁহারা জীর্ণতনু হইয়াছেন, তাঁহারা যে বাজারের 'আর্সেনিক', 'কুইনাইন' প্রচুরভাবে মিশ্রিত কতকগুলি উগ্রবীর্য্য পেটেণ্ট ঔষধ সেবন করিয়া আরও স্বাস্থ্যহানি ঘটাইতেছেন, তাহা সত্য কথা। আমরা ইহার পূর্ব্বে বলিয়াছি, কুইনাইনের অপব্যবহার কোনক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। ম্যালেরিয়া জ্বর পুরাতন হইলে তো আর একজ্বরি থাকে না, অনেক সময় প্রাতঃকালে সে জ্বর আপনা আপনই ছাড়িয়া যায়। সেই সময় অনেকে কোন একটা পেটেণ্ট ঔষধ বা যথেষ্ট পরিমাণে কুইনাইন সেবন করিয়া জ্বর বন্ধ করিতে চেষ্টা করেন। তাহার ফলে দুই চারিদিন জ্বর চাপা থাকে, কিন্তু দুই চারিদিন পরেই পূর্ব্ববৎ স্বীয় প্রভাব বিস্তার করে। এজন্য ওরূপ ভাবে জ্বর চাপা দিবার চেষ্টা করায় কুইনাইনের অপব্যবহারেও দৌর্ব্বল্য উপস্থিত হইয়া থাকে। এরূপ অবস্থায় নিজের মতে কার্য্য না করিয়া সুচিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

তৈল-মর্দ্দন।

শরীরে তৈল-মর্দ্দন পদ্ধতি ভারতবর্ষে অতি প্রাচীন সময় হইতে চলিয়া আসিতেছে। ধর্ম্মসংহিতা, পুরাণ, ইতিবৃত্ত ও প্রাচীন কাব্যাদির পর্য্যালোচনায় ইহার প্রচুর নিদর্শন পাওয়া যায়। আর্য্যঋষিগণ তৈল-মর্দ্দনের বিশেষ গুণপাতী ছিলেন, সুতরাং তৎপ্রয়োগ বিষয়ে নানা প্রকার উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। তৈল-ব্যবহার বহু প্রকারে বিধিবদ্ধ আছে, কিন্তু বর্ত্তমান প্রবন্ধে শরীরে তৈল মর্দ্দনের উপকারিতা ও তদানুসঙ্গিক বিধি-ব্যবস্থাই আলোচিত হইবে।

তিল হইতে জাত এই অর্থে তৈল শব্দটী ব্যুৎপাদিত হইলেও সাধারণতঃ যে কোন বস্তুর স্নেহভাগই তৈল নামে অভিহিত হইয়া থাকে। সম্ভবতঃ অন্যান্য স্নেহ অপেক্ষা তিলনিষ্পন্ন স্নেহে স্নিগ্ধতা এবং ব্যবহারোপযোগিতা অধিকভাবে থাকার জন্যই তিল জাত স্নেহই মুখ্যভাবে তৈল নামে কথিত হইয়াছে। সে যাহা হউক শব্দ ব্যুৎপত্তি-বিচারে দ্রব্যগুণের কোন তারতম্যের শঙ্কা নাই, সুতরাং উপস্থিত প্রস্তাবে উহা নিষ্প্রয়োজন।

শরীরে তৈল-মর্দ্দনের আবশ্যকতা নির্দ্ধারণ করার জন্য আমাদের শাস্ত্র নির্দ্ধারিত যুক্তিপ্রমাণ অনুসন্ধানের পূর্ব্বে বাহ্য জগতে তৈলের

সাধারণ প্রয়োগ ও উপকারিতার প্রতি একটু লক্ষ্য করিলেই বোধ হয় এতদ্বিষয়ে অনেকটা অভিজ্ঞতা লাভ হইতে পারে।

যে সমস্ত যন্ত্র বা শস্ত্রাদি প্রতিনিয়ত ব্যবহার করিতে হয়, তাহাকেই কার্য্যক্ষম রাখিবার জন্য তৈলসিক্ত করা হইয়া থাকে। ইঞ্জিনের সন্ধানভাগে মাঝে মাঝে তৈল-নিষেক ব্যতীত উহা পূর্ণবেগে চলিতে সমর্থ হয় না এবং বহুকাল কার্য্যোপযোগীও থাকেনা। স্নেহাভ্যক্ত না থাকিলে শকট-চক্র বেগে ঘুরিতে পারে না। ফলতঃ যেখানেই আকুঞ্চন-প্রসারণ ক্রিয়ার আবশ্যক, সে খানেই মাঝে মাঝে তৈল-সেক প্রয়োজনীয়।

আমাদের দৈহিক-যন্ত্রগুলির পরিচালনার জন্যও উক্ত কারণে ঠিক ঐ ভাবেই তৈলের আবশ্যক করে। তৈলসিক্ত না থাকিলে শারীরিক যন্ত্র সবল ও কার্য্যক্ষম থাকিতে পারেনা। অধিকাংশ দৈহিক যন্ত্রই আকুঞ্চন-প্রসারণ ব্যাপার দ্বারাই স্ব স্ব প্রয়োজন সম্পাদন করে।

তৈল স্বাভাবিক প্রসারণ শক্তির আধিক্য গুণে অল্পকাল মধ্যেই সর্ব্বশরীর গত শিরা সমূহ দ্বারা দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারে এবং স্নিগ্ধতা গুণে সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে দৃঢ়, কার্য্যক্ষম ও কষ্ট-সহিষ্ণু করিয়া থাকে। ইহার সম্পর্কে চর্ম্মের প্রসন্নতা, সর্ব্বেন্দ্রিয়ের পরিপুষ্টি ও বাতাদি দোষের আনুলম্য সাধিত হয়। স্নায়ুমণ্ডলী দোষমুক্ত ও পরিষ্কৃত থাকার জন্য রক্ত-সঞ্চালন ক্রিয়া সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়।

প্রথমে পদদ্বয়ে পরে অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গে তৈলমর্দ্দনের ব্যবস্থা আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ পদদ্বয়ের স্নিগ্ধতাগুণে সর্ব্বশরীরই স্নিগ্ধ হইতে পারে বলিয়া এরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

পৃথক্ পৃথক্ অবয়বে তৈলমর্দ্দনে যে সমস্ত উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়, তদ্বিষয়ে সাধারণ ভাবে কিছু বলা যাইতেছে। মস্তকে তৈল মর্দ্দন করিলে শিরঃশূল, খালিত্য (টাক), অকালে কেশ-পকতা প্রভৃতি রোগ প্রায়ই জন্মিতে পারেনা এবং ইহাতে কেশ সকল দৃঢ়মূল, দীর্ঘ ও কৃষ্ণবর্ণ হয়, মস্তিষ্ক সবল থাকে, ঊর্দ্ধগত জত্রুইন্দ্রিয় সকল স্নিগ্ধতা সম্পন্ন হওয়ায় নিজ নিজ বিষয়-গ্রহণে অধিক সামর্থ্য লাভ করে, সুনিদ্রা হয়, এবং তন্নিবন্ধন দৈহিক সমস্ত যন্ত্রের ক্রিয়াই অব্যাহত ভাবে কার্য্য করিতে পারে। শ্রুতি-বিবরে তৈল-প্রয়োগে বায়ুর প্রকোপজনিত কর্ণনাদ প্রভৃতি রোগ জন্মিতে পারে না এবং মন্যাস্তম্ভ, হনুগ্রহ প্রভৃতি বাতব্যাধিরও আশঙ্কা দূরীভূত হয়, কর্ণস্রোত বিশুদ্ধ ও সবল থাকায় বধিরতা অথবা শ্লেষ্মাদি জনিত মল সঞ্চয় হইতে পারেনা। পদতলে তৈল-মর্দ্দনে পাদ-সুপ্তি (স্পর্শানভিজ্ঞতা) পাদশোষ প্রভৃতি ব্যাধি নষ্ট হয় এবং সৌন্দর্য্য ও কার্য্য ক্ষমতাগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। অধিকন্তু পদগত স্নায়ুমণ্ডলী সঙ্কুচিত হয়না বলিয়া পাদস্ফুটন, গৃধ্রসী প্রভৃতি অতি কষ্টদায়ক বাতব্যাধি জন্মিতে পারেনা। পাদাঙ্গুষ্ঠের কণ্ডরার সহিত চক্ষুর সম্বন্ধ থাকায় ঐ কণ্ডরার স্নিগ্ধতাগুণে দৃষ্টি শক্তিও প্রবল থাকে। নাভি মণ্ডলে তৈল-মর্দ্দনে কোষ্ঠগত বায়ুর আনুলম্য হয়, তাহাতে আধ্মানাদি রোগ জন্মিতে পারে না এবং সহজে ও সুচারুরূপে ভুক্ত পদার্থ জীর্ণ হয়। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গত তৈল মর্দ্দনে পৃথক্ পৃথক্ উপকার আমরা

প্রাপ্ত হইয়া থাকি। তৈল ব্যবহার সম্বন্ধে একটি প্রাচীন উপদেশ আছে, যথা—"ঘৃতাদষ্ট গুণং তৈলং মর্দ্দনাৎ নতু ভোজনাৎ" তৈল-মর্দ্দনে ঘৃত-ভোজনের অপেক্ষা আটগুণ উপকার হইয়া থাকে। বাস্তবিক আমাদের দেশে আহারার্থ তৈলের এরূপ ব্যবহার প্রাচীন সময়ে কখন ছিলনা। পূর্ব্বে তৈল মর্দ্দনের জন্যই প্রায় ব্যবহৃত হইত। কালক্রমে আহারের রুচি-পরিবর্ত্তন সহ তৈল-সংস্কৃত ও ভর্জ্জিত দ্রব্যাদির ব্যবহার ক্রমে ক্রমে বাহুল্য রূপে প্রবেশ করিয়াছে। তাহাতে আমাদের স্বাস্থ্যেরও যথেষ্ট হানি হইতেছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। সময়ান্তরে তদ্বিষয়ক আলোচনার ইচ্ছা রহিল।

আমরা সাধারণতঃ তিল, সর্ষপ ও নারিকেল জাত তৈলই অভ্যঙ্গের জন্য ব্যবহার করি, সুতরাং এস্থলে উক্ত ত্রিবিধ তৈলের গুণাগুণ প্রকাশ করা আবশ্যক। ইহাতে ব্যবহারকারীগণ নিজ নিজ প্রকৃতি অনুসারে তৈলের উপকারিতা বুঝিতে পারিবেন।

প্রায় সর্ব্ববিধ তৈলই স্বীয় উপাদান দ্রব্যের গুণানুবর্ত্তী হয়। তন্মধ্যে **তিল তৈল** গুণে অন্যান্য তৈলাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ইহা তীক্ষ্ণ, শীঘ্র প্রসারণশীল, চর্ম্মদোষ নাশক (কিন্তু ভোজনে বিপরীত) সূক্ষ্ম স্রোত প্রবেশক্ষম, নেত্র রোগীর অহিতকর, স্নিগ্ধ অথচ শ্লেষ্মার অপ্রকোপক, স্থূলতানাশক অথচ কৃশতা হারক, মলস্তম্ভক, ক্রিমি-বিনাশক। ইহার আর একটী বিশেষ গুণ এই যে, যে দ্রব্যের সহিত পাকাদি দ্বারা ইহা সংস্কৃত হয়—তাহারই গুণ গ্রহণ করিতে পারে। এই জন্যই আয়ুর্ব্বেদোক্ত অধিকাংশ তৈল ইহার দ্বারা প্রস্তুত হইয়া থাকে।

নারিকেল তৈল—অতি স্নিগ্ধ, ধাত্বাদির পোষক, মালিন্য হারক, শ্লেষ্মবর্দ্ধক, কেশের সৌন্দর্য্যকারী, কফপ্রকৃতি ও কফ-প্রধান রোগীর অহিতকর।

সর্ষপ তৈল—কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, লঘু, রক্তপিত্তকারী, কফ, শুক্র, বায়ু, কুষ্ঠ, অর্শ, ব্রণ ও ক্রিমি নাশক।

কবিরাজ শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত
কাব্যতীর্থ-কবিভূষণ।

শিশুর কণ্ঠরোগ চিকিৎসা।

—:*:—

(ঠাকুরমা ও বড়বৌ।)

বড়-বৌ। আমি ত আর পেরে উঠিনে ঠাক্‌মা।

ঠা। নতুন নতুন একটু কষ্ট হ'বে, দিন কতক পরে অভ্যাস হ'য়ে গেলে আর কষ্ট হ'বে না।

ব। আমার যে রকম কষ্ট হয় ঠাক্‌মা, তা'তে সে অভ্যাস হ'তে হ'তে প্রাণ বেরিয়ে যা'বে। তুমি একটা বামন কি বামনী ঠিক্ ক'রতে বল।

ঠা। দেখ বড় বউ, আমি বেঁচে থাকতে

এ বাড়ীর ভেতর বামুন ঢুকবে, তা' মনেও করিস্‌নে। কল্‌কাতায় যা'রা বামুন-বাম্‌নী ব'লে পরিচয় দেয়,—তা'র পনর আনা তিন পাই অন্য জাত্‌। চাকর থাকার চেয়ে বেশী রোজগার হ'বে ব'লে বামুন সাজে। তা'দের হাতে খেয়ে কি জাতের মাথা—ধর্ম্মের মাথা খাবি?

ব। কেন?—দেশেও জানা শুনা ত কত গরীব-দুঃখী-বামুন-বামনী আছে!

ঠা। আছে বটে, কিন্তু তা'রা না খেতে-পেয়ে ম'র্‌বে সেও স্বীকার,—তবু লোকের বাড়ী মাইনে নিয়ে রাঁধতে আসবেনা, তা'দের মধ্যে দৈবাৎ কেউ কখন এ কাজ করে।

ব। আচ্ছা ঠাক্‌মা, তুমি ব'ল্‌ছ যে, অচেনা-বামুনের হাতে খেলে জাত যায়, কিন্তু এই ক'লকাতা সহরে কাজ কর্ম্ম উপলক্ষে ত বামুনেরাই রাঁধে!

ঠা। দেখ, জগন্নাথের মহিমায় শ্রীক্ষেত্রে যেমন জাত-বিচার নেই, কলির মহিমায় ক'ল্‌কাতায়ও তেমনি জাত-বিচার নেই। এখনকার যেমন ব্রাহ্মণ—তেমনি ব্রাহ্মণ-ভোজন!

ব। তা'র মানে কি ঠাক্‌মা।

ঠা। ব্রাহ্মণেরা ব্রাহ্মণের মত সম্মানের সহিত খায় না,—কাঙ্গালীর মত খায়। আমরা আগে দেখেছি—ব্রাহ্মণ-ভোজন করা'তে হ'লে ব্রাহ্মণদের কত সম্মান ক'রতে হ'ত, বাড়ীর কর্ত্তা সর্ব্বদা তটস্থ—পাছে কোন ত্রুটি হয়, আর যতক্ষণ না ব্রাহ্মণ-ভোজন শেষ হয়,—ততক্ষণ কর্ত্তার আহার করা হ'ত না।

ব। আর এখন কি হয় ঠাক্‌মা?

ঠা। এখন কোথায় কর্ত্তা—আর কোথায় সম্মান! কর্ত্তা খেয়ে-দেয়ে নিদ্রা দিচ্ছেন, ব্রাহ্মণেরা কাঙ্গালীর মত খেতে বসে। যে কর্ত্তার ব্রাহ্মণদের ওপর বড় দয়া, তিনি এক-বার দেখা দিয়ে যান, দৈবাৎ দু'টো-একটা মিষ্টি কথা বলেন। তা' ছাড়া—সব একাকার, পরস্পর চেনা নেই—ব্রাহ্মণ-শূদ্র এক সঙ্গে খাচ্চে! আগে শূদ্রদের দিয়ে, পরে সেই পাত্র থেকে ব্রাহ্মণদের দেওয়া হ'চ্চে। ঐ সেদিন পাশের বাটীর বাবুটী ব'লছিলেন যে, সকালে ব্রাহ্মণ-ভোজন হ'বে, আর রাত্রে 'ভদ্রলোকদে'র খাওয়ান হবে। এতেই বোঝনা—যে ব্রাহ্মণে কত ভক্তি।

ব। আচ্ছা ঠাক্‌মা, তুমি যে বল্‌লে,—কলির মহিমায় জাত-বিচার নেই, কিন্তু পাড়াগাঁয়েও ত জাত-বিচারের এখনো ব্যতিক্রম হয়নি!

ঠা। তা' হয়নি বটে, কিন্তু তা'ও আর থাকে না। প্রথমে ক'ল্‌কত্তায় আড্ডা গেড়ে কলি এখন পাড়াগাঁয়ের দিকে হাত বাড়া-চ্ছেন। পাড়াগাঁয়েও এখন বামুন ঢুকেছে।

ব। আচ্ছা ঠাক্‌মা, পাড়াগাঁয়ে আগে কাজকর্ম্ম হ'লে কা'রা রাঁধত?

ঠা। রাঁধ্‌ত—গ্রামের ভদ্রঘরের মেয়েরা,—যারা ভাল রাঁধ্‌তে পা'রত। তা' আবার কেমন কড়াকড়ি। রান্না চড়া'বার আগে গ্রামের কোন প্রবীন লোক কি বাড়ীর কর্ত্তা গিয়ে জিজ্ঞেসা ক'র্‌তেন—হেঁসেলে কে কে আছে? তা'র পর দরকার বুঝে নাম জেনে একজনকে ডেকে বল্‌তেন, কে ক্ষীরো, তুমি এখানে কেন? সঙ্গে সঙ্গে হাত দিয়ে ইসারা করতেন, পালা পালা। ক্ষীরোদা লজ্জায় অধোবদন হ'য়ে পালা'ত। কেন জান?

ক্ষীরোদার কোন দোষের কথা শোনা যেত ব'লেই এমনটা ক'র্‌তে হ'ত।

ব। আর পরিবেশন কা'রা করত?

ঠা। পুরুষদের পরিবেশন ক'রত—গ্রামের কিশোর আর যুবকের দল। আর মেয়েদের পরিবেশন মেয়েরাই কর্‌ত।

ব। আচ্ছা লুচিও কি মেয়েরা ভাজ্‌ত?

ঠা। না, লুচি হ'লে গ্রামের মধ্যে যুবক বা প্রৌঢ়—যা'দের লুচি ভাজার ভাল শিক্ষা ছিল, তা'রাই ভা'জ্‌ত, শূদ্রেরা ময়দা মেখে—বেলে দিত।

ব। কিন্তু খাজা, গজা, পান্তুয়া—এ সব ত আর হালুইকর-বামুন ভিন্ন হ'বার যো নেই।

ঠা। ও সকলের আগে বড় চল্‌তি ছিল না। পরমান্ন হ'ত, গোয়ালা দই-ক্ষীর দিত, আর ময়রা সন্দেশ দিত। আমাদের সময়ে পান্তুয়া-বোঁদেও আরম্ভ হ'তে দেখেছি, আর সে গুলি হালুইকর বামুনেই ক'রত বটে, কিন্তু কলি তখন ব্রাহ্মণকে ব্রাহ্মণের আচার পরিত্যাগ ক'র্‌তে আর অন্য নীচ জাতকে বামুন সাজ্‌তে শিখিয়ে উঠতে পারেননি।

(লীলার প্রবেশ)

ব। এই যে ঠাকুরঝি এয়েছে, এখুনি তোমাদের শাস্ত্রালাপ হ'বে। আমার কি ক'রবে বল?

ঠা। তুই মেজ বৌ আর ছোট বৌকে ডেকে নিয়ে আয়, আমি বন্দোবস্ত ক'রে দিচ্ছি।

ব। আচ্ছা তোমাদের কথা শেষ হোক, আমি একটু পরে ডেকে নিয়ে আস্‌ছি।

ঠা। আয় লীলা, ব'স। সব খবর ভালত?

লী। খবর আর ভাল কই ঠাক্‌মা, খুকির আলজিব ফোলা রোগ হয়েছে, ঘং-ঘং ক'রে কাশে, গা-টাও একটু ছ্যাঁক্-ছ্যাঁক্ ক'রে। আর ছোট খোকার গলার ভেতর ফুলেছে, কাশি আছে, আর গলায় ব্যথা হ'য়েছে।

ঠা। তাই ত তোর ছেলে-পিলের যে নিত্যই অসুখ দেখ্‌তে পাই। তা', ওষুদ কিছু দিয়েছিস?

লী। হাঁ, আজ চার পাঁচ দিন হ'ল হোমিওপ্যাথিক ওষুদ দেওয়া হ'চ্ছে, তা'তে কিছুই হ'ল না। সেই জন্যে তোমার কাছে এসেছি।

ঠা। এ বড় বিশ্রী রোগ, অনেক সময় ওষুদে ভাল হয়না। অস্ত্র ক'রতে হয়। তা', প্রথমে ওষুদ দিয়েই দেখ্।

লী। সে কি ঠাক্‌মা, তুমি যে ব'ল্‌তে—কবিরাজী ওষুধেই সব রোগ ভাল হয়।

ঠা। তা' কবিরাজীতেই ত এ রোগে অস্ত্র ক'রবার নিয়ম আছে।

লী। তা, কই কবিরাজেরা ত অস্ত্র করে না?

ঠা। কবিরাজীতে অস্ত্র-চিকিৎসা খুব ভালই ছিল, এখন সেটা লোপ পেয়ে গেছে। কাজেই এখন অস্ত্র কর্‌তে হ'লে ডাক্তারের কাছেই যেতে হ'বে।

লী। কচি ছেলে—অস্ত্র করবার নাম শুনেই যে ভয় করে ঠাক্‌মা।

ঠা। না ভয় কিছু নেই। আর অস্ত্র ক'রতেই হবে—তা'রও মানে নেই; ওষুদেও সা'রতে পারে।

লী। আচ্ছা ওষুদ আর পথ্য কি দেব তা' বল।

ঠা। আগে পথ্যির কথা বলি, দু'জনকে প্রায় একই রকম পথ্যি দিতে হ'বে। জ্বর—

কি জ্বরভাব আর খুব সর্দ্দি-কাস থা'কলে ও সব রোগে দিন কতক ভাত বন্ধ ক'রে যব কি বার্লির রুটী দেওয়াই ভাল।

লী। আর যদি জ্বর না থাকে ?

ঠা। জ্বর না থা'কলে—কি খুব সর্দ্দি-কাসি না থা'ক্‌লে,—এক বেলা দুটি পুরাণ চা'লের ভাত দেওয়া চলে। সাধারণ চা'লের বদলে কাঙ্গনি ধানের চা'লের ভাত দিতে পা'রলে ভাল হয়।

লী। কাঙ্গনি ধানের চা'ল আবার কি, সে কোথায় পাওয়া যায়।

ঠা। শ্যামা ঘাসের বীচির চেয়ে একটু বড় দে'খতে। বড় বড় পাচনওয়ালা-বেনের দোকানে পাওয়া যায়।

লী। দাল-তরকারী কি দেওয়া যেতে পারে ?

ঠা। দালের মধ্যে মুগের দালের যূষ। উচ্ছে করলা, কচিমূলো আর পটোল এই কয় রকম তরকারী।

লী! মাছ কি দেওয়া যায় ?

ঠা। এ রোগে মাছ কুপথ্যি, তবে কচি ছেলে—যদি কান্না-কাটি করে, কুপথ্যি হ'লেও একটু-আধটু খল্‌সে, শিঙ্গি, কি মাগুর মাছ দিতে হবে। অমনি ভুলুতে পারিস্ ত ভালই।

লী। দুধ কি রকম দেব ?

ঠা। যা খায়, তার অর্দ্ধেক, আগে যেমন ব'লিছি—পিপুল দিয়ে সিদ্ধ ক'রে দিবি মিছরী ও মরিচের গুড়ো দিয়ে দুধ দিলেও হয়।

লী। জলখাবার কি দেব ?

ঠা। একটু দেশী চিনির মিছরী, বেদানা কিসমিস্, দু' একটা খেজুর—এই দিস্।

লী। আর কি দেওয়া যেতে পারে ?

ঠা। আবার কি দিবি ? তবে গরম জল একটু-একটু ক'রে দিন—তিন চা'র বারে খাওয়াতে পার্‌লে ভাল হয়। আর যখন জল খেতে চা'বে, তখন ঠাণ্ডা জল না দিয়ে গরম জল দেওয়াই ভাল। তবে যদি গরম জল না খাওয়াতে পারিস, তা' হ'লে গরম জল ঠাণ্ডা ক'রে দিস্। কিন্তু দিনমানের গরম করা জল রাত্রে, কি রাত্রের গরম করা জল দিনে দেওয়া হ'বে না আর গরম জল ঠাণ্ডা হ'য়ে গেলে, সে জল আর গরম ক'রে দেওয়া হ'বে না।

লী। খাবার সম্বন্ধে আর কোন নিয়ম আছে ?

ঠা। সব খাবারই গরম-গরম খেতে দিবি, ঠাণ্ডা জিনিষ কিছুই দিস্‌নে, আর বেশী ক'রে না খাইয়ে বরং কম ক'রে খাওয়া'বি।

লী। আচ্ছা, এখন ওষুদ কি দেবে বল ?

ঠা। ছোট খুকির আলজিব্ ফুলেছে বল্‌ছিস্ ? তা' বাহ্যে কেমন হয় ?

লী। বাহ্যে ভাল হয়না। প্রায় এক-বার ক'রেই কঠিন মল বাহ্যে ক'রে', এক আধ দিন মোটেই বাহ্যে হয় না।

ঠা। হুঁ, দেখ্, বাহ্যেটা যা'তে রোজ দু'বারের কম আর তিন বারের বেশী না হয়—তা' ক'রতে হ'বে। এক কাজ করিস্; সোঁদালের পাকা ফলের ভেতর যে আফিনের মত আটা থাকে—তাই দু' আনা ভ'র নিয়ে গরম দুধে গুলে একবার সকালে খাইয়ে দিস। যদি তা'তে বাহ্যে হয়—ভালই, নয় ত দু' আনার জায়গায় তিন আনা—কি এক সিকি সোঁদালের আটা দিতে হ'বে।

লী। আচ্ছা খাবার ওষুদ কি দেব বল।

ঠা। আগে লাগাবার ওষুদের কথা বলি। রান্নাঘরের ধোঁয়ায় যে ঝুল হয়—

সেই ঝুল, সৈন্ধব আর মধু এক সঙ্গে বেশ ক'রে মেড়ে তাই, আলজিবের ওপরে আর চা'র পাশে লাগিয়ে দিবি, আর মুখ হাঁ ক'রে হেঁট হ'য়ে ব'সে লাগা'বি। খানিকক্ষণ পরে অনেক লালা কেটে প'ড়বে।

লী। ক'বার ক'রে দেব ?

ঠা। সকালে বিকালে দু'বার দিলেই হ'বে।

লী। আর কোন লালা কাটার ওষুদ নেই ?

ঠা। আছে, কিন্তু এইটে খুব সহজ। আর একটা বলি শোন্,—মরিচ, বচ, আতইচ, আকনাদি, কুড়, সোণাছাল আর সন্ধব—সমান ভাগে নিয়ে, মধু মিশিয়ে—আগে যেমন ব'লেছি তেমনি ক'রে লাগালেও হয়, নয় ত ঐ সব দিয়ে বাতির মত ক'রে—সেই বাতি আলজিবের উপর আর তা'র চারদিকে ঘ'সে দিলেও হয়। বাতি কিন্তু খুব গরম হওয়া দরকার।

লী। আচ্ছা হাত দিয়ে যদি লাগা'বার অসুবিধা হয় ?

ঠা। তা' হ'লে পাতলা কাদার মত ক'রে তুলোর তুলিতে মাখিয়ে লাগা'লেও চলে।

লী। আর লাগাবার ওষুধ কিছু আছে ?

ঠা। আছে অনেক, তবে এখন এইটাই দিগে যা'। আর একটা কুলকুচো ক'রবার ওষুধ আছে, তা' বড্ড ছেলেমানুষ,—পা'র্‌বে কি ?

লী। তুমি বল, আমি চেষ্টা ক'রে দেখবো।

ঠা। তবে শোন্। বচ, আতইচ, আকনাদি, রাস্না, কটকী আর নিমছাল—এইগুলো সমানভাগে নিয়ে কাথ তৈয়ের ক'রে, একটু একটু গরম থাক্‌তে কুলকুচো ক'রতে হয়। যেমন তেমন কুলকুচো নয়—খুব এক মুখ নিয়ে খানিকক্ষণ রেখে তা'রপর ফেলে দিতে হয়। আবার নিয়ে ঐ রকম ক'র্‌তে হয়। এই রকম ৪।৫বার ক'র্‌তে হয়।

লী। আচ্ছা ঠাকমা, লাগা'বার ওষুদ—কি কুলকুচা ক'রবার ওষুদ একটু-আধটু পেটে গেলে কি কিছু দোষ হয় ?

ঠা। বিশেষ দোষ কিছু হয়না, তবে যে সব ওষুদ গলায় লাগাবা'র নিয়ম থাকে, সে সব ওষুদ পেটে যত না যায়, ততই ভাল। কেননা, ওগুলো পেটে যাবার জন্যে ত দেওয়া হয়না।

লী। আচ্ছা এখন খা'বার ওষুদ কি দেব তা' বল।

ঠা। খুকির বয়স কত হ'ল।

লী। এই যেটের কোলে চার বছরে পা দিয়েছে।

ঠা। তিনবার ক'রে ওষুদ দিতে হ'বে। ওষুদ ক'টাও এমন কিছু নয়—হরীতকী, শুঁঠ আর দেবদারুর গুঁড়ো সমান ভাগে মিলিয়ে তা'র তিন রতি ক'রে নিয়ে সকালে, বিকালে আর সন্ধ্যায়—তিনবার ক'রে মধুর সঙ্গে মিশিয়ে চেটে খেতে দিবি।

লী। দেবদারু কি এই দেবদারু ?

ঠা। না এ দেবদারু নয়। এর কাঠ হাল্‌কা আর গন্ধ নেই। সে দেবদারু সদ্গন্ধ যুক্ত। বেণের দোকানে কিন্‌তে পাওয়া যায়।

লী। আচ্ছা খুকীর ব্যবস্থা ত হল, এখন খোকার কি করবো বল।

ঠা। খোকার কি হ'য়েছে ভাল ক'রে বল্ দেখি।

লী। তার গলার ভেতর—জীবের নীচে ফুলে উঠেছে, বড্ড ব্যথা আর কাসি আছে।

ঠা। সর্দ্দি আছে খুব ?

লী। না সর্দ্দি বেশী নেই। নাকে ত নেইই, কাসির সঙ্গে একটু-আধটু গয়ের ওঠে।

ঠা। বাহ্যে কেমন হয় ?

লী। বাহ্যে ভাল হয়না। কোন দিন একবার হয়—কোন দিন বা হয় না।

ঠা। বাহ্যেটা যা'তে পরিষ্কার হয়—তা' ক'রতে হ'বে।

লী। তুমি আগে পথ্যির কথা বল।

ঠা। খুকিকে যেমন পথ্যি দিতে বলিছি, একেও সেই রকম দিতে হ'বে। তবে এর যখন সর্দ্দি কি জ্বর নেই, তখন এক বেলা দুটি পুরাণ চালের ভাত, আর একবেলা বার্লি কি যবের রুটী দিস্।

লী। আচ্ছা ঠাকমা বার্লি কি যবের রুটী যদি কোন দিন না যোগাড় হয়, তা' হ'লে সুজির রুটী কি পাউরুটী দেওয়া চলেনা।

ঠা। যবের রুটীই উপকারী। তবে যদি কোন দিন নেহাত না যোগাড় ক'র্‌তে পারিস্, তা'হলে সুজির রুটী দিস্। পাউরুটীতে আর দরকার কি ?

লী। আচ্ছা ঠাকমা বিসকুট দু' একখানা দেওয়া চলে না ?

ঠা। ওগুলো বড় ভাল জিনিস নয়, ওগুলো না দেওয়াই আমাদের উচিত। লোকনাথ বদ্দি দুঃখ ক'রে বলতেন, বড় গিন্নি, সময়ের গতি রোধ করবা'র সাধ্য কা'রও নেই। আমাদের চোদ্দ পুরুষ—চোদ্দই বা বলি কেন, হাজার হাজার পুরুষ এই দেশের পথ্যি আর অন্ন খেয়ে সুস্থ শরীরে দীর্ঘজীবী হ'য়ে কাটিয়ে গেছেন, কিন্তু আমাদের ছেলে-পিলেকে আমাদের দেশের খাবার দিয়ে বাঁচিয়ে রাখবার ক্ষমতা আর আমাদের জননী জন্মভূমির নেই ; বিলেতের যব-গম আর সুইজারলণ্ডের গাইয়ের দুধ পেটে না প'ড়্‌লে এরা যেন এখন মানুষই হয় না।

লী। সে কথা ঠিক ঠাক্‌মা, আবশ্যক হ'লেও অপকারী জেনেও আমরা দেশের উপকারী জিনিষ ছেড়ে বিদেশী জিনিষ ব্যবহার করি ! আমার কিন্তু সেটা একেবারেই ইচ্ছে নয় ঠাক্‌মা, কিন্তু কি করবো ছোট খোকা অন্য বাড়ীর ছেলেদের বিস্কুট খেতে দেখে এমন আবদার করে যে, দু' এক খানা না দিয়ে থাকা যায় না। তা' তুমি কি বল ?

ঠা। আমি আর বলবো কি ? না দিলে যদি নেহাৎ না চলে, তা' হ'লে দু' এক খানা দিস্, আর ত উপায় নেই। তবে পৈতে হ'বার পর থেকে এ রকম অনাচার যা'তে না হয়, তা' করিস্।

লী। সে আর তোমায় ব'লতে হ'বেনা ঠাক্‌মা। পৈতে হ'বার পর থেকে আমি আর কোন রকম অনাচার ক'র্‌তে দেবনা। তা' ছেলে বাঁচুক আর মরুক।

ঠা। ছেলেপিলের মন কাদার মত নরম, যেমন গ'ড়বে, তেমনি হ'বে। ওদের যা' শেখাবে তাই শিখ্‌বে। তা' দু একখানা বিস্কুট দিস্। অনেক বামুন-বিস্কুট-ওয়ালার দোকানে বাতাসার মত ছোট ছোট খুব হাল্কা এক রকম এরারুটের বিস্কুট পাওয়া যায়, সে গুলো খুব সহজে হজম হয়। আর তা' না হয়তো—এক রকম এরারুটের পাতলা বিলিতী বিস্কুট পাওয়া যায়, তাকে কি বলে—দূর ছাই—ও সব বিলিতী নাম মনেও আসেনা, পাকা পরাণের বিস্কুট বলে বুঝি।

লী। (হাসিয়া) পাকা পরাণ নয় ঠাক্‌মা ; পিক্‌ফ্রিয়াণ্‌।

ঠা। হাঁ তাই হ'বে, সেই পাতলা এরা-রুটের বিস্কুট গুলো যা'দের পেট নরম—তা'দের পক্ষেই ভাল, ওতে একটু বাহ্যে কম করে। তবে দু' এক খানা দিলে দোষ নেই।

লী। আচ্ছা ঠাক্‌মা, দু' এক খানায় দোষ কিছু নেই ব'লছ, কিন্তু একে এদের বাহ্যে কম, তা'তে যদি আবার কম পথ্যি দেওয়া যায় তা' হ'লেত আরও বাহ্যে কমে যা'বে।

ঠা। এত দিনে তোর একটু জ্ঞান হ'য়েছে দেখ্‌ছি। তবে একটা উপলক্ষ্য ক'রে বুঝিয়ে দিই শোন। দেখ এই গুরুপাক জিনিষ দু' রকম; এক স্বভাব গুরু আর মাত্রা গুরু। স্বভাব গুরু বলি কা'কে? -না যে জিনিষ স্বভাবতঃ গুরুপাক, যেমন কালিয়া, পোলাও, ক্ষীর চিড়ে, দাল—এই সব জিনিষ খাওয়া; আর মাত্রা গুরু বলি কাকে—না যে সব জিনিষ লঘুপাক,—যেমন সাগু, খৈ, ভাত প্রভৃতি জিনিষ বেশী ক'রে খাওয়া। তা' দেখ্, মাত্রা গুরু জিনিষ যদি রোগী খুব কম খায়—যেমন অজীর্ণ রোগী যদি একটা ছোলা খায়, তা' হ'লে তা'র অপকার করেনা, আবার লঘু পাক জিনিষ যদি মাত্রা গুরু হয়, যেমন ধর—একটা সুস্থ লোক যদি পাঁচ সের খৈ কি সাগু খায়, তা' হ'লেও তা'র অপকার হয়। সেই জন্যে বল্‌ছি—যে দু' এক খানা বিস্কুটে ওদের কিছু অনিষ্ট হবে না।

লী। ঠিক বল্‌ছ ঠাক্‌মা, আমি এতটা ভাবিনি। তা' দেখ ঠাক্‌মা, তুমি আগে ব'লেছিলে যে, মেলিন্সফুডে বাহ্যে পরিষ্কার হয়। মেলিন্স ফুডের এক রকম বিস্কুট হয়—তা' এক আধ্‌খানা দিতে পারি?

ঠা। মেলিন্স ফুড মিষ্টি। এ সব রোগে মিষ্টি, নোন্‌তা আর টক জিনিষ কুপথ্যি। মিষ্টির মধ্যে মিছরী আর নুণের মধ্যে সন্ধব—তা'ও কম ক'রে দিতে হয়। কাজেই মেলিন্স-ফুড না দেওয়াই ভাল।

লী। আচ্ছা ঠাক্‌মা, পথ্যির কথাত হ'ল নাওয়ার ব্যবস্থা কি রকম করবো?

ঠা। নাওয়া এখন বন্ধ থাক কিছু দিন। তবে মধ্যে মধ্যে গরম জলে গামছা ভিজিয়ে, নিংড়ে—সেই গামছা দিয়ে গা মুছিয়ে দিস্। একটা ঘরের মধ্যে গা মুছিয়ে দিবি, সে সময় কি তা'র পরে যেন ঠাণ্ডা হাওয়া না লাগে। আর গা মোছানর পরেই একটা মোটা জামা গা'য়ে দিয়ে দিস।

লী। কতদিন অন্তর গা মুছিয়ে দেব।

ঠা। সেটা বিবেচনা ক'রে দিতে হ'বে। মোটামুটি ৩।৪ দিন অন্তর দিলেই হ'বে। শরীরের অবস্থা বুঝে এর চেয়ে দেরী করেও দেওয়া যেতে পারে।

লী। আচ্ছা আর কোন নিয়ম ক'রতে হ'বে।

ঠা। দিনমানে ঘুমানটা এ রোগে বড় ভাল নয়। আর গলায় একটা গরম কাপড় জড়িয়ে রাখা ভাল। আর গরম জল যে ঠাণ্ডা ক'রে দিবি, তা'তে একটু কর্পূর দিয়ে দিস।

লী। পথ্যি ত হ'ল, এখন ওষুদের কথা বল।

ঠা। বাহ্যে ভাল হয়না ব'লছিস্। তা' বাহ্যেটা যা'তে দু'বার ক'রে হয়, তা' ক'র্‌তে হ'বে। তা' রাত্রে শোবার সময় তেউড়ীর শিকড়ের গুড়ো এক আনা আর কাশীর চিনি এক আনা এক সঙ্গে মিশিয়ে জলের সঙ্গে খেতে দিস।

লী। তেউড়ী কি ঠাক্‌মা?

ঠা। তেউড়ী এক রকম লতানে গাছ

বেদেদের কাছে পাওয়া যায়। সেই তেউড়ীর শিকড়ের ভিতরকার কাঠটা ফেলে দিয়ে, ছাল শুকিয়ে গুড়ো ক'রে নিতে হয়। আর এ ছাড়া বেণের দোকানে পশ্চিমে-তেউড়ী এক রকম পাওয়া যায়, টুক্‌রো টুকরো ছাল। তা'তে যে কাঠ থাকে, তা' ফেলে দিয়ে গুঁড়ো ক'রে নিতে হয়।

লী। কোন তেউড়ী ভাল ঠাক্‌মা ?

ঠা। পশ্চিমে-তেউড়ীর চেয়ে দেশী তেউড়ীতেই কাজ হয় বেশী।

লী। আর তেউরী যদি না পাই।

ঠা। তা' হলে জাঙ্গীহরীতকী দু' আনা আর পিপুল তিন রতি বেটে গরম জলের সঙ্গে খাইয়ে দিস।

লী। এখন ওষুধ কি দেব বল।

ঠা। দেখ্, খুকিকে যে ওষুদ দিতে ব'লেছি খোকাকে তা'র একটু বেশী মাত্রায় দেওয়া চাই। শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, উননের পোড়া মাটি—এক ক'রে বেটে জাল দিয়ে গরম কোরে সেই গরম জল—আগে যেমন কুলকুচো ক'রতে বলিছি, একেও সেই রকম রোজ কুলকুচো ক'রতে দিবি। কুলকুচো এমন ভাবে করা চাই—যেন গলায় তাব্‌টা লাগে, —বুঝলি।

লী। হাঁ তা ত বুঝলাম। খুকীর আর খোকার ওষুদের তফাৎ কি ব'লবে বলেছিলে ?

ঠা। হাঁ ব'ল্‌ছি! এই খোকার জন্যে কুলকুচো করবার যে ওষুদ ব'ললাম এটায় শুঁঠ পিপুল, মরিচ আছে ব'লে বড্ড ঝাল হ'বে। খুকি বড্ড কচি ব'লে অত ঝাল সহ্য ক'রতে পারবেনা। সেই জন্য তাকে এটা দিতে নেই। আর খোকাও ত ছেলে মানুষ, তা'কেও এমন করে দিবি—যেন খুব ঝাল না হয়।

লী। তাই দেব, আমি নিজে আগে মুখে ক'রে দেখব। যদি বেশী ঝাল বোধ হয় আরও খানিক গরম জল মিশিয়ে নেব। তা' তুমি কুলকুচো করবার এমন আর একটা ওষুদ বল—যেটা ঝাল না হয়।

ঠা। বচ, আতইচ আকনাদি, রাস্না, কটকী আর নিমপাতা সিদ্ধ ক'রে কুলকুচো ক'রলে হয়।

লী। আচ্ছা ঠাক্‌মা; ডাক্তারে একবার একজনের এই অসুখে একটা যন্ত্রের মধ্যে কি রেখে তার ধোঁয়া গলায় লাগা'তে দিয়েছিল। কবিরাজীতে কি তা' নেই।

ঠা। আছে, ধোঁয়া লাগান আর তাপ নেওয়া এরোগে উপকারী, কিন্তু খুকি কচি ব'লে তা'কেত দেওয়া চলবেনা। তবে খোকাকে দিতে পার। মরিচের গুড়ো, দারচিনির গুঁড়ো আর কর্পূর—জলে গুলে একটী ঘটী কি হাঁড়িতে রেখে জ্বালে চড়া'তে হয়। আর তা' থেকে যে ধোঁয়া ওঠে, হাঁ করে সেটা গলার ভেতর লাগা'তে হয়।

লী। সে কি সুবিধে হ'বে ঠাক্‌মা ?

ঠা। না হয় একটা গাড়ুর মুখ ঢাকা দিয়ে তাইতে সিদ্ধ ক'রবি, আর নল দিয়ে যে ধোঁয়া বেরুবে—সেইটে যা'তে গলায় লাগে—তাই ক'রবি।

লী। আর কোন ভাল উপায় নেই ?

ঠা। আছে বৈকি,—ওষুদ মিশান জল একটা হাঁড়ির মধ্যে রেখে তা'র মুখে একখানা সরা ঢাকা দিয়ে যোড়ের মুখ—মাটী কি ময়দা দিয়ে লেপে দিবি। সরার মাঝখানে আগেই একটা ফুটো ক'রে রাখতে হয়। তা'র

পর পাতার একটা লম্বা নল ক'রে ত'ার এক মুখ সেই ফুটোয় বসিয়ে দিতে হয়, আর অন্য মুখ দিয়ে গলায় ধোঁয়া লাগাতে হয়।

লী। আর কি কোন রকম ক'রে ধোঁয়া লাগান যায়না ?

ঠা। আর এক রকম উপায়ে যায়, বলি শোন্; ইঙ্গুদী, লতাফট্‌কী, দন্তী, তেউড়ী আর দেবদারু সমান ভাগে নিয়ে অল্প তেজপাতা আর দারচিনি মিশিয়ে ছোট ছোট বাতির মত ক'রতে হয়। ত'ার পর শুকিয়ে সেই বাতি একটা নলের একমুখে রাখতে হয়, আর তা'তে আগুণ ধরিয়ে দিয়ে নলের অন্য মুখ দিয়ে চুরুটের মত ধোঁয়া টানতে হয়। আর তা' না হ'লে একটা শুকনো আট আঙ্গুল ন্যাকড়া জড়িয়ে, তা'র ওপর ওষুদ্ লাগা'তে হয়, তা'র পরে শুকিয়ে চুরুট খাওয়ার মত খেতে হয়।

লী। বাবা, কবিরাজীতে এত আছে ঠাক্‌মা ?

ঠা। এ আর কি শুনলি ? আমি লোক-নাথ-বদ্দির মুখে শুনিছি যে, বুকের, গলার, মুখের, মাথার, কাণের আর চোখের অনেক রোগে ধূমপান খুব উপকারী, আর অনেক রকম ধূমপানের ব্যবস্থা আছে। আর আগে ঐ সকল রোগ যা'তে না জন্মায়—তা'র জন্যেও ধূমপানের ব্যবস্থা ছিল।

লী। ঠিক্ কথা ঠাক্‌মা, কাদম্বরী ব'লে একখানা সংস্কৃত বই আছে, তা'র বাঙ্গালা প'ড়ে দেখিছি ধূমপানের কথা আছে। আমি ভেবেছিলাম—বুঝি তামাক, তা' নয় এই ওষুদের ধোঁয়া। এ সব উঠে গেল কেন ঠাক্‌মা ?

ঠা। কালের গতিতে ওলট-পালট হওয়াটা সংসারের নিয়ম। আর একটা কথা, সব ওষুদই যেমন ঠিক্ বুঝে দিতে না পা'রলে অনিষ্ট হয়, ধূমপানও ঠিক্ মত না হ'লে অপ-কারী হয়, সে জন্যেও কতকটা উ'ঠে গেছে বটে। তা' তুই জিজ্ঞাসা করলি, তাই বললাম, কচি ছেলে-পিলেকে চুরটের মত ধোঁয়া না খাইয়ে আগে যা' গলায় লা'গাবার কথা বলেছি তাই দেওয়াই ভাল।

লী। আচ্ছা ঠাক্‌মা, আগে যে নাসের কথা ব'লেছিলে—সে কিসের নাস বলনা ?

ঠা। নাস এ রোগে খুব উপকারী বটে, তবে ছেলে মানুষ। তা' সপ্তায় দু তিন দিন ক'রে দিস না হয়। পিপুল, সজ্‌নের বীচি, মরিচ, শুঁঠ, বচ—এর যে কোন একটা জিনিষের গুঁড়ো অল্প ক'রে দিস, যাতে ২।৪ টা হাঁচি হয়।

লী। আচ্ছা এখন খাবার আর গলায় লাগাবার কি ওষুদ দেব বল ?

ঠা। খুকির অসুখের জন্য যা' ব'লেছি, তা' দিতে পারিস। তা' ছাড়া আরও দুটো একটা বলছি শোন্। হরীতকী বেশ মিহি ক'রে বেটে গলার ভিতর লাগা'তে পারিস। আদার রস, মরিচের গুঁড় আর সন্ধব—এক সঙ্গে মিশিয়ে লা'গাতে পারিস। আর গলার চা'রদিকে টুটীর উপর একটা প্রলেপ দিস্।

লী। কিসের প্রলেপ দেব ?

ঠা। উননের পোড়া মাটী, সমুদ্রফেনা আর গোল মরিচ—আদার রস কি ধুতরো-পাতার রসে বেটে গরম ক'রে প্রলেপ দিস।

লী। ক'বার প্রলেপ দেব ? আর সমুদ্র ফেনা কি ?

ঠা। দিনে ৩।৪ বার দিলেই হ'বে।

সমুদ্রফেনা এক রকম হাল্‌কা শাদা জিনিষ, বেণের দোকানে পাওয়া যায়।

লী। সমুদ্রফেনা যদি না পাওয়া যায়?

ঠা। তা' হ'লে সমুদ্রফেনার বদলে কাল-কাশুন্দের পাতা দিলে চ'লবে।

লী। আচ্ছা এখন খাবার ওষুধ কি দেব বল?

ঠা। আগেই ব'লেছি যে, খুকিকে যে ওষুদ দিতে ব'লেছি তা' একটু বেশী মাত্রায় খোকাকেও দিতে পারিস, তা' ছাড়া আরও দু' একটা বলি শোন্। দারচিনি, লবঙ্গ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ আর কুড় সমান ভাগে মিশিয়ে, গুঁড়ো ক'রে, তা'র ৪৫ রতি মধু দিয়ে মেড়ে চেটে চেটে খেতে দিবি। আর একবার বচ, খই, শুঁঠ আর পিপুল এই চা'রটে জিনিষের গুঁড়ো সমান ভাগে মিশিয়ে ৩।৪ রতি মাত্রায় মধুর সঙ্গে মেড়ে চেটে খেতে দিবি। আর এক টুক্‌রো বচ আর দেশী চিনির মিছরি মুখে রেখে দিতে ব'লবি।

লী। আর কোন কিছু ক'রতে হ'বে ঠাক্‌মা?

ঠা। পারিস্ ত খোকাকে ভাত খা'বার শেষে দু'আনি ভ'র পুরাণ ঘি অল্প একটু গরম দুধে গুলে খেতে দিস্। আর ভাত খেয়ে উঠেই যাতে জল না খায়, আর জল কি দুধ খেয়েই না শোয়—তা'র ব্যবস্থা করিস।

লী। আচ্ছা ঠাক্‌মা, তুমি অনেক রোগেই পুরাণ ঘি—খাবার—নয় মালিষ ক'রবার ব্যবস্থা কর, পুরাণ ঘি কি এমন ভাল জিনিষ?

ঠা। অমন ভাল জিনিষ কি আছে? লোকনাথ বলতেন, শাস্ত্রে আছে যে, পুরাণ ঘিয়ে না সারে—এমন রোগ নেই।

(বড় বৌ, মেজ বৌ ও ছোট বৌয়ের প্রবেশ)

বড় বৌ। এই বড়দি-মেজদিকে ডেকে এনেছি ঠাক্‌মা।

ঠা। হ্যাঁরে, বৌমা নেই ব'লে তোরা কি ক'টা দিন তিন জায়ে রান্না ক'রতে পা'র্‌বি নে?

লী। পারবে না কি ঠাক্‌মা, পার্‌তেই হ'বে।

ছোট বৌ। তা' তোমাদের দু'জনকে এক জায়গায় দেখেই বুঝেছি।

লী। তা' বুঝেছিস যদি তো তিন জায়ে গিয়ে রাঁধ্‌গে।

মেজ বৌ। আমার যে আগুন-তাতে গেলে মাথা ঘোরে ঠাকুরঝি।

লী। মাথাটা খুব ক'রে দড়ি-দড়া দিয়ে বেঁধে আগুন তাতে যাস, তাহ'লে আর ঘুরবে না। আর তাতেও যদি ঘোরে,—মাথাটা কেটে রেখে যাস্।

মেজ বৌ। তুমি এমনি মাথা-কাটা-ঠাকুরঝিই বটে।

লী। আর তোমরা এমন গুণের ভাজ যে, রাঁধতে পারবেনা, একটা অজাতের হাতে খাইয়ে সকলের জাত মার্‌বে। বেঁধে পাঁচ জনকে খাওয়াবে—এও যে ভাগ্যির কথা।

ঠা। শোন্ বলছি। বড় বৌ তিন দিন,—মেজ বৌ দুদিন—আর ছোট বৌ এক দিন,—পালটা-পালটা ক'রে রাঁধবি। যদি এর মধ্যে কারও অসুখ করে, কি কোথাও যাওয়া হয়, তা' হ'লে তা'র পর যা'র পালা, সেই রাঁধবে। কিন্তু তা'কে আবার পরে সেই ক'দিন পুষিয়ে দিতে হবে।

মেজ বৌ। তা' আমরা যে রান্নার কিছু জানি নে, দু'এক দিন দেখিয়ে না দিলে কি ক'রে হ'বে।

ঠা। চল্ আমি দেখিয়ে দিচ্ছি।

লী। আমিও যাই চল ঠাক্‌মা।

(সকলের প্রস্থান)

মুষ্টিযোগ ও টোট্‌কা ঔষধ

—:*:—

বমন রোগের যোগ।—(১) খেতচন্দন ঘসা ২ তোলা ও আমলকীর রস ২ তোলা একত্র করিয়া মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বমন নিবারণ হয়। (২) ভাজামুগ ৪ তোলা, পাকার্থ জল এক সের, আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া খৈচূর্ণ ৪ তোলা দু' তিন ফোঁটা মধু ও চিনি মিশাইয়া পান করিলে বমন, তৃষ্ণা ও দাহ নিবারণ হয়। (৩) অশ্বত্থবৃক্ষের শুষ্কছাল দগ্ধ করিয়া কোন মাটির পরিষ্কার জলে রাখিয়া দিবে। শীতল হইলে উপরিতন স্বচ্ছজল পান করিলে সর্ব্বপ্রকার বমন প্রশমিত হয়। (৪) আমলকী ২ তোলা ও কিস্‌মিস্‌ ২ তোলা আধপোয়া শীতল জলের মধ্যে রগ্‌ড়াইয়া ছাঁকিয়া ২ তোলা পরিষ্কার চিনি মিশাইয়া অল্প অল্প পান করিলে বমন রোগের শান্তি হয়।

ক্রিমি নিবারণের উপায়।—(১) কট্‌কী।০ সিকি তোলা, দাড়িম মূলের ছাল ॥০ তোলা, বিড়ঙ্গ ॥০ আধ তোলা আপাঙ্গের পাতা ॥০ আধ তোলা ও দারুচিনি।০ সিকি তোলা। আধ সের জলে সিদ্ধ করিয়া এক ছটাক থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ৪।৫ ফোঁটা তার্পিন তৈলের সহিত পান করিলে কোষ্ঠে আবদ্ধ সমস্ত ক্রিমি নিশ্চিত সমূলে নষ্ট হয়। (২) বিড়ঙ্গ ৵০ আনা, পলাশ পাঁপ্‌ড়া ৵০ আনা একত্রে জলের সহিত বাটীয়া প্রতিদিন প্রাতঃকালে সেবন করিলে ক্রিমি নাশ হয়। (৩) ভাঁট্‌ পাতা ও আনারসের পাতা এক সঙ্গে মিশাইয়া সেই রস দুই তোলা লইয়া ৩।৪ রতি বিটলবণের সহিত সেবন করিলে নানা প্রকার ক্রিমি বিনষ্ট হয়। (৪) পালিধামাদারের ছাল পরিষ্কার চুণের জলে ছেঁচিয়া তাহার রস সেবন করিলে বিশেষ উপকার হয়। (৫) পালিধামাদারের পাতার রস মধু সহ সেবন করিলে বিশেষ ফল দর্শে।

কর্ণশূলে ব্যবস্থা।—(১) হুড়হুড়ে পাতার রস গরম করিয়া কর্ণের ভিতর দিলে প্রবল কর্ণশূল আরোগ্য হয়। (২) অল্প উষ্ণ নারিকেল তৈলের মধ্যে ১ রতি আফিং ঘসিয়া কর্ণবিবরে প্রদান করিলে কর্ণশূলের নিবারণ হয়। (৩) পাকা আকন্দ পাতায় ঘৃত মাখাইয়া আগুণে সেকিয়া তাহা হইতে রস বাহির করিয়া সেই ঈষদুষ্ণ রস পুনঃ পুনঃ কর্ণে পূরণ করিলে শীঘ্র শীঘ্র বেদনার শান্তি হয়। (৪) ছাগমূত্রের সহিত সৈন্ধবলবণ চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া উষ্ণ করিয়া পুনঃ পুনঃ কর্ণে প্রদান করিলে কর্ণশূলের শান্তি হইয়া থাকে, (৫) সরিষার তৈল, মধু ও আদার রস একত্রে অগ্নিতে পাক করিয়া গরম গরম ২।৪ বিন্দু কর্ণ বিবরে প্রদান করিলে তৎক্ষণাৎ যন্ত্রণা দূর হইয়া থাকে।

শূলবেদনার মহৌষধ।—(১) শামুকের খোলা ভস্ম ১ তোলা, সৈন্ধবলবণ ২ তোলা, বিটলবণ ৩ তোলা ও যোয়ান

৪ তোলা,—গাছ পাকা ঝুনা নারিকেল ছিদ্র করিয়া তন্মধ্যে উক্ত চারি দ্রব্য প্রবেশ করাইয়া নারিকেলের ছিদ্রমুখে, সেই নারিকেলের মালা ভাঙ্গার টুকুরা বসাইয়া কাদা মাখা বস্ত্রখণ্ড জড়াইয়া কাদা দ্বারা গোলাকার করিয়া শুষ্ক হইলে, বহ্নি সংযুক্ত ঘুঁটের আগুনে পোড়াইয়া লইবে। শীতল হইলে যন্ত্রটী বাহির করিয়া সেই নারিকেলের দগ্ধ শস্য ও ঔষধ বাহির করিয়া একত্রে পেষণ পূর্ব্বক কাঁচ পাত্রে রাখিবে। এই ঔষধ দুই আনা মাত্রায় প্রতিদিন প্রাতঃকালে এবং সন্ধ্যায় গরম জলসহ সেবন করিলে শূল বেদনা সারিয়া যাইবে। (২) কর্পূর, বড় এলাচের দানা ও মিশ্রী এক টুকরা মুখের মধ্যে রাখিয়া চুষিলে শূল বেদনার উপশম হয়। (৩) শুঁঠ চূর্ণ ৬ তোলা, জাঙ্গীহরীতকী চূর্ণ ৬ তোলা, বিটলবণ চূর্ণ ৯ তোলা, সোহাগার খৈ চূর্ণ ৬ তোলা, যোয়ান চূর্ণ ৬ তোলা, মৌরীচূর্ণ ৩ তোলা, জীরাচূর্ণ ৩ তোলা, হরিদ্রা চূর্ণ ৩ তোলা—এই সমস্ত চূর্ণ একে একে মিশাইয়া বহুক্ষণ মাড়িয়া উপযুক্ত পাত্রে রাখিয়া দিবে। ইহার দুই আনা, তিন আনা বা চারি আনা মাত্রায়—শীতল জলের সহিত দুইবার আহারান্তে সেবন করিলে শূল বেদনা অল্পকাল মধ্যে আরোগ্য হইয়া থাকে।

দন্তশূলে ব্যবস্থা।—কাঁচা পাখুরিয়া কয়লায় অগ্নি সংযোগ করিয়া সুদগ্ধ হইলে যে কোমল সাদা ভস্ম হয়, সেই ছাই গাবভেরেণ্ডার পাকা গাকা গাছের আঠা সংগ্রহ করিয়া সিক্ত করতঃ রৌদ্রে শুকাইবে। তা'রপর উত্তমরূপে গুঁড়া করিয়া সেই গুঁড়া দিয়া প্রত্যহ ২।৩ বার দাঁত মাজিয়া মুখ ধুইলে দাঁতবেদনা, দাঁতের গোড়া ফুলা, দাঁতের গোড়া হইতে রক্তস্রাব ও পূয়স্রাব আরোগ্য হইয়া দন্তমূল দিন দিন দৃঢ় হইতে থাকে।

কবিরাজ শ্রীগোষ্ঠবিহারী গোস্বামী
ভিষগাচার্য্য।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

গ্রাহকদিগের প্রতি কৃতজ্ঞতা।—গ্রাহক বৃন্দের অনুকম্পাই সাময়িক পত্রের জীবন। নানা বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া আমাদের আয়ুর্ব্বেদ ২য় বর্ষে পদার্পণ করিল। আমাদের গ্রাহক মণ্ডলীর নিকট এই শুভ সুযোগে আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। তাঁহাদের কৃপা-দৃষ্টি না থাকিলে আমরা ইহার পরিচালন কার্য্যে কখনই সক্ষম হইতামনা। অধুনা আয়ুর্ব্বেদের এই ঘোর দুর্দ্দিনে আমাদের এই ক্ষুদ্র "আয়ুর্ব্বেদ"র প্রতি তাঁহাদিগের করুণদৃষ্টি যেন পূর্ব্ববৎ অক্ষুণ্ণ থাকে, ইহাই আমরা এই নববর্ষের আরম্ভকালে তাঁহাদিগের নিকট প্রার্থনা করিতেছি।

মৃত্যুর হিসাব।—সরকারি বিবরণ পাঠে অবগত হওয়া যায়, গত ১৯১৬ খৃঃ অব্দে বাঙ্গালা দেশে মড়কের হার অনেক কম হইয়াছিল। ঐ বৎসর সমগ্র বঙ্গদেশের মৃত্যুর সংখ্যা ১২, ৪১, ২, ৪১, উহার পূর্ব্ববৎসর

মরিয়াছিল ১৪, ৮৮, ৫, ৬৭। ইহার মধ্যে আলোচ্য বর্ষে জ্বর এবং ম্যালেরিয়ায় মরিয়াছে, ৯,৯,৮৮০ জন। তৎপূর্ব্ব বৎসর জ্বর এবং ম্যালেরিয়ায় মরিয়াছিল—১০,৬৪,১,৫৯ জন। আলোচ্য বর্ষে কলেরায় মরিয়াছে ৭০,৮,৩৬ এবং তৎপূর্ব্ব বৎসর মরিয়াছিল—১৩০,৬,৭৯। বসন্তে মৃত্যু ১৯১৫ খৃঃঅব্দে ৩২,৭,৮৫ এবং ১৯১৬ খৃঃঅব্দে ঐ রোগের মৃত্যুর সংখ্যা ১৩,৮,৯০। ১৯১৫ সালে প্লেগে মরিয়াছিল ১৯৯ জন। ১৯১৬ সালে ১১০। হিসাব দৃষ্টে জানা যায়, গত বৎসর বঙ্গে শিশু-মৃত্যুও কিছু কম হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন—মৃত্যু অপেক্ষা জন্মের সংখ্যা গত বৎসর অনেক বেশী হইয়াছিল। ১৯১৫ সালে জন্ম-সংখ্যা ১৪,৪১,৩,২৮ এবং ১৯১৬ সালে জন্ম-সংখ্যা ১৪,৪৫,৫,৯২। উভয় বৎসরের তুলনায় জন্ম-সংখ্যা খুব বেশী না হইলেও গত বৎসর জন্ম অপেক্ষা মৃত্যু-সংখ্যা ছাড়াইয়া গিয়াছিল, আলোচ্য বর্ষে মৃত্যু অপেক্ষা জন্ম-সংখ্যা অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। আশার কথা সন্দেহ নাই।

স্বাস্থ্যরক্ষায় সার্ আশুতোষ।—বাল্যকালে স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য পিতা-মাতার চেষ্টা থাকিলে ভবিষ্যৎ সন্তানের অকালে যে স্বাস্থ্যভঙ্গ হইতে পারেনা—আমাদের দেশপূজ্য সার্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী মহাশয় তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত স্থল। নানারূপ কঠোর পরিশ্রম সত্বেও ভগবৎ কৃপায় ইহার স্বাস্থ্যভঙ্গের কথা এ পর্য্যন্ত শুনিতে পাওয়া যায় নাই। ইহার প্রধান কারণ, শিশুকালে ইনি যখন বিদ্যালয়ে পাঠ করিতেন, ইহার স্বর্গীয় পিতৃদেব সেই সময় হইতেই নিয়ম করিয়াছিলেন,—'টিফিনে'র সময় ইহাকে বাজারের খাবারের জন্য পয়সা দেওয়া হইবেনা। উহার পরিবর্ত্তে ১ গ্লাস দুগ্ধ এবং দু' একটি সন্দেশ দিয়া ঝিকে পাঠাইয়া দেওয়া হইবে। ইহা ভিন্ন ইহার পিতৃদেব ব্যায়ামের জন্য ইহাকে নিয়মিত প্রাতঃকালীন ভ্রমণে অভ্যস্ত করাইয়াছিলেন, সার আশুতোষ অদ্যাপি সে অভ্যাস পরিত্যাগ করেন নাই। যাহা হউক সার আশুতোষ অদ্যাপি কর্ম্মবীর হইয়া দেশের—দশের—সমাজের সর্ব্ববিধ কর্ম্মেই অগ্রণীর আসন অধিকারে সমর্থ হইতেছেন; আর তাঁহার সম-সাময়িক দেশের ভবিষ্যৎ ভরসাস্থল কত ছাত্র অকালে কাল-কবলিত হইয়াছে। বালকাল হইতে বাজারের খাবার খাওয়া এবং ব্যায়াম অভ্যাস না করার জন্য আমাদের যে স্বাস্থ্যরক্ষার অন্তরায় ঘটিতেছে, তাহারই ফলে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমরা নানারূপ আধিব্যাধি লইয়া এক এক জন অকর্ম্মণ্যের অবতার হইয়া পড়িতেছি। প্রত্যেক অভিভাবকই সার্ আশুতোষের পিতৃদেবের পন্থা অনুসরণ করিলে তাঁহাদিগের বংশধরদিগের সর্ব্ববিধ কল্যাণ সাধিত হইতে পারিবে।

ম্যালেরিয়ার নূতন ঔষধ।—ডাক্তার হেরেস্ উইলিশ নামক ব্রহ্মদেশের এক পুলিশ ডাক্তার পুরাতন উর্দ্দু-চিকিৎসা পুস্তকগুলি হইতে এক নূতন ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন। এক প্রকার লেবু হইতে ক্যালশিয়ম নামক ধাতুর তিনপ্রকার লবণ মিশ্রিত করিয়া এই ঔষধ প্রস্তুত করিতে হয়। ম্যালেরিয়া জ্বর পুরাতন হইলে কুইনাইনে ফল হয়না, কিন্তু উক্ত ডাক্তার সাহেব যে সকল ম্যালেরিয়া গ্রস্থ রোগীকে তাঁহার আবিষ্কৃত ঐ ঔষধ প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহার সকল গুলিই আরোগ্য লাভ করিয়াছে। ঐ

ডাক্তারের মতে কুইনাইন সেবনে রক্তকণা নষ্ট হইয়া যায়, তাঁহার আবিষ্কৃত এই নূতন ঔষধে উহা তো নষ্টহ য়ই না, বরং রক্ত-বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। উক্ত ডাক্তার এখনও এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিতেছেন। এসম্বন্ধে তাঁহার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানিবার জন্য আমরা উৎসুক রহিলাম।

বিবাহের বয়স।—বিবাহের বয়ঃ-নির্দ্ধারণ লইয়া সংপ্রতি একটা আন্দোলন চলিতেছে। এক পক্ষ বলেন, কন্যা এবং পুত্র উভয়েই বয়স্থ হইলে বিবাহ দেওয়া কর্ত্তব্য, অপর পক্ষের মতে কন্যা-পুত্র—সকলের পক্ষেই বিবাহটা অল্প বয়সেই প্রশস্ত। ১ম পক্ষের মত লইয়াই ছাত্র-মহলে ষোড়শী-বিবাহের হুজুগ আরম্ভ হয়। বর্ত্তমান সময়ে সহযোগী "বেঙ্গলী"তে বাল্য-বিবাহ কল্যাণকর বলিয়া একটী মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে। যাহা হউক এ সকল আন্দোলন শুভজনক বলিয়া আমরা মনে করি। ত্রেতা-দ্বাপরে যে সময় স্বয়ম্বরা হইবার প্রথা প্রচলিত ছিল, সে সময় অধিক বয়সে বিবাহ হইত আমরা গ্রন্থাদিতে দেখিতে পাই, কিন্তু বর্ত্তমানযুগের প্রারম্ভ কাল হইতে বরাবরই বাঙ্গালী-সন্তান অষ্টম বর্ষে কন্যাকে পাত্রস্থ করিয়া গৌরী-দানের ফললাভ করিত। সে ফললাভে দেশের—দশের—সমাজের অমঙ্গল ত হইত না। অষ্টম বা নবম বর্ষের কন্যা এবং অষ্টাদশ কি বিংশ বর্ষীয় পুরুষের বিবাহ-ক্রিয়া সে কালে সমাজে চলিত। ইহার ফলে বালক মণ্ডলী কুপথগামী হইবার সুযোগ না পাওয়ায় এখন-কার মত নানারূপ কুৎসিত ব্যাধিও তাহা-দিগের শরীরে প্রবেশ করিতনা। স্ত্রী লোকেরাও এখনকার মহিলা কুলের মত নানা রূপ রোগে আক্রান্ত হইতেননা। কি স্ত্রী, কি পুরুষ—সকলেই তখন সংযম-ধর্ম্ম পালন করিয়া নীরোগ ও দীর্ঘায়ু লাভে সক্ষম হইতেন। কাজেই বাল্য-বিবাহের দোষ দিব কেমন করিয়া। বাল্য-বিবাহের উপকারিতা উপলব্ধি করিয়াই শাস্ত্রকারগণ 'গৌরীদানে'র ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

ম্যালেরিয়া নিবারনের চেষ্টা।—বঙ্গের বিখ্যাত স্বাস্থ্য-কমিশনার ডাক্তার বেণ্টলী মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গী-পুর-রঘুনাথগঞ্জের অধিবাসীদিগকে ম্যালে-রিয়ার হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য কতক গুলি উপায় প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। ঐ স্থানের ডোবা এবং নিম্নভূমি গুলি জলপূর্ণ করিয়া রাখিবার জন্য পয়ঃ প্রণালী নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। গঙ্গার জল এই পয়ঃ প্রণালীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া ঐ ডোবা ও নিম্নভূমি গুলি সর্ব্বদা জল পূর্ণ করিয়া রাখিবে—এই রূপ বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। বর্ষাকাল গত হইলে আবার সমস্ত জল ঐ প্রণালীর দ্বারা বাহির করিয়া দেওয়া হইবে, সুতরাং এই সকল স্থান হইতে মশকের উৎপত্তি হইতে পারিবেনা। ডাক্তার সাহেব বলিয়াছেন, বর্ত্তমান বর্ষেই ইহার ফল জানিতে পারা যাইবে। দেখা যাউক, ফল কি হয়।

ভেজালঘৃত।—ব্যবসায়ীগণ ঘৃতে চর্ব্বি এবং নানারূপ ভেজাল মিশ্রিত করিয়া জন সাধারণের ধর্ম্ম এবং স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়া আসিতেছিল বলিয়া কলিকাতা ভাগীরথীতীরে মারওয়ারি-ব্রাহ্মণগণ কয়েকদিন অনশনে থাকিয়া যজ্ঞ কার্য্যের বৃহদনুষ্ঠান করিয়া-ছিলেন। দ্বারবঙ্গের মহারাজা প্রমুখ—ধর্ম্ম-প্রবণ মহাত্মাগণের তদ্দর্শনে আসন টলিল,

তাঁহারা সকলকে আহ্বান করিয়া, সভা করিয়া ব্যবসায়ী দিগকে অর্থ এবং সামাজিক দণ্ডে দণ্ডিত করিলেন। বর্ত্তমান যুগে ইহা এক অভূত পূর্ব্ব ঘটনা। যাহা হউক সংপ্রতি বর্দ্ধমানের মহারাজ প্রমুখ কয়েক জন হিন্দু-সন্তান আইনের বাধনে ইহার প্রতীকারপ্রার্থী হইয়া বঙ্গেশ্বর রোনাল্ডসের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালীর প্রধান পর্ব্ব দুর্গোৎ-সবের আর বিলম্ব নাই—ইহারই মধ্যে আইনটা যাহাতে দৃঢ়ীভূত হয়—তাহার জন্যও সাক্ষাৎকারীরা প্রার্থনা করিয়াছিলেন। বঙ্গেশ্বর এ কথায় কর্ণপাত করিয়া আইনের প্রবর্ত্তন দেশবাসীর আশা পূর্ণ করিয়াছেন।

সুচিকিৎসকের পরলোক।—গত ৫ই আষাঢ় বহরমপুরের স্বনামধন্য চিকিৎসক হরচরণ সেন মহাশয় পরলোক গমন করিয়াছেন। ইনি ভারতের শেষ ঋষি গঙ্গাধরের শিষ্য ছিলেন। ইঁহার পরলোক গমনে বহরমপুর হইতে গঙ্গা-ধরের শিষ্য লোপ পাইল। ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণার বিদগাঁ নামক গ্রামে ১২৫১ সালের ৩রা ভাদ্র ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম ৺ অভয়চন্দ্র সেন। ১৪ বৎসর বয়সে বিক্রমপুর—ভরাকর নিবাসী ৺বিশ্বেশ্বর দাশ গুপ্তের দশম বর্ষীয়া কন্যা নিত্যতারা দেবীর সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। এক্ষণে তাঁহার পাঁচটি পুত্র ও দুইটি কন্যা বর্ত্তমান। আমরা তাঁহার শোক সন্তপ্ত পরিবার-বর্গের সহিত সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি।

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় ও ধন্বন্তরি।—অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের উন্নতি কল্পে গত শ্রাবণ মাসের "ধন্বন্তরি" লিখিয়াছেন,—

"আজ কাল ইংরাজীভাষা সমগ্র সভ্য জগতের প্রচলিত ভাষা। ইংরেজী ভাষায় কথা বার্ত্তা বলিতে—বুঝিতে অসমর্থ, সমগ্র সভ্য জগতে এরূপ স্থান নাই বলিলেই হয়। অতএব যদি আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা প্রণালীর ক্ষেত্রের বিস্তৃতি সাধন করিতে হয়, এবং এই চিকিৎসা-প্রণালীর প্রয়োজনীয়তা সর্ব্বত্র প্রতিপন্ন করিবার বাসনা থাকে, তাহা হইলে এই অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ে সংস্কৃত ও বাঙ্গালার সঙ্গে ইংরাজী ভাষায় আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের অধ্যাপনার ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন। আমাদের বিশ্বাস, এরূপ ব্যবস্থায় এই বিদ্যালয়ের আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার্থীর অভাব হইবে না।" আমরা ইহার উত্তরে ধন্বন্তরি-সম্পাদক মহাশয়কে জানাইতেছি যে,—আমরাও এ সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া দেখি-য়াছি—সমগ্র জগতে পূর্ব্ববৎ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার প্রসার বৃদ্ধি করিতে হইলে, ইংরাজী ভাষায় শিক্ষা দান ভিন্ন সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবেনা। আমাদের ঐ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্য আমরা যথেষ্ট আয়োজনও করিতেছি, সাধারণের সহানুভূতি পাইলে অচিরেই ঐ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারিব। ধন্বন্তরি-সম্পাদক যে বিদ্যালয়ের শ্রীবৃদ্ধিকল্পে চিন্তা করিয়াছেন, সেজন্য আমরা তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

পদক ও ছাত্রবৃত্তি দান।—অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে উৎসাহিত করিবার জন্য ভবানীপুর নিবাসী এবং কলিকাতা হাইকোর্টের বদান্যবর উকীল শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় একটি রৌপ্য পদক ও মাসিক চারি টাকা করিয়া একবৎসরের জন্য বৃত্তি বা স্কলারশিপ

দান করিয়াছেন। ১ম বার্ষিক শ্রেণীর পরীক্ষার্থী ছাত্রদিগের মধ্যে যে ছাত্র সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিবে, তাহার জন্য ঐ বৃত্তি এবং অঙ্গবিনিশ্চয় বা অ্যানাটমী বিদ্যাতে উত্তীর্ণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছাত্র রৌপ্য পদক পুরস্কার পাইবে। এই পদক ও বৃত্তি মোহিনীবাবুর স্বর্গীয়া জননী বিন্ধবাসিনী দেবীর স্মৃতি কল্পে "বিন্ধ্যবাসিনী পদক" এবং "বিন্ধ্যবাসিনী বৃত্তি" নামে অভিহিত হইবে। মোহিনী বাবু ইহা ভিন্ন মাসিক পঁচিশ টাকা হিসাবে এই বিদ্যালয়ের উন্নতি কল্পে সাহায্য করিয়া থাকেন। আমরা এজন্য যে মোহিনী বাবুর নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ, তাহা বলাই বাহুল্য। দেশের দানশীল ব্যক্তিগণ মোহিনী বাবুর দানের অনুসরণ করুন—ইহাই আমরা তাঁহাদিগের নিকট প্রার্থনা করিতেছি।

সমালোচনা।

ম্যালেরিয়া।—শ্রীশৌরীন্দ্রমোহন গুপ্ত এল-এম্-এস্ প্রণীত। শ্রীকিরণচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত, মুঙ্গের। মূল্য ১৲ টাকা মাত্র। ম্যালেরিয়ায় বাঙ্গালা দেশ ছার খারে যাইতে বসিয়াছে। এ দুর্দ্দিনে এরূপ পুস্তকের প্রয়োজনীয়তা খুবই বেশী। ম্যালেরিয়ার ইতিবৃত্ত হইতে আরম্ভ করিয়া, কিরূপ ব্যবস্থায় দেশ হইতে ম্যালেরিয়ার নিবৃত্তি হইতে পারে, গ্রন্থকার সে সম্বন্ধে অনেক কথাই ইহাতে বিবৃত করিয়াছেন। শুধু ম্যালেরিয়ার কথা নহে, স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধেও এ গ্রন্থে অনেক কথার উল্লেখ করা হইয়াছে। দু'এক স্থল উদ্ধৃত করিতেছি,—

"আমাদের দেশে এত রোগ কেন? দ্বাদশী ত্রয়োদশীর পরই আমাদের দেশে যুবতীরা কেন অমাস্যায় ঢলিয়া পড়ে? পুরুষের "বয়স না হ'তে কুড়ি আগে পাকে কেশ কেন? "ইহার কারণ কি! স্বাস্থ্য প্রকৃতির দান। মাতার দান বলিয়া কখনই আমরা শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করি নাই, ধর্ম্মভ্রষ্ট—আচার ভ্রষ্ট আমরা বরং পদে পদে প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া চলিয়াছি। তাঁহার নির্ম্মল বায়ু রুদ্ধদ্বার ও জানালায় আবদ্ধ করিয়াছি, সর্ব্বশক্তি দাতা ও সর্ব্বপাবন সূর্য্যালোক আমাদের কুটীরের রুদ্ধদ্বার দেখিয়া চলিয়া যান, গৃহের কলুষ গৃহেই রহিয়া যায়। বিছানাপত্র, আসবাব প্রভৃতি প্রত্যহ রোদে দেওয়ার আবশ্যক মনে করিনা।"

"তা'র পর জল; জলের একটী নাম জীবন, আর একটি নাম নারায়ন। ইহা হইতেই ইহার উপকারিতা ও পবিত্রতা সূচিত হইতেছে। পুষ্করিণী হাজিয়া মজিয়া উঠিতেছে, কেহ পঙ্কোদ্ধার করেনা, পাড়ে বসিয়া অনেকে মলমূত্র ত্যাগ করে, বর্ষার জলে তাহা ধুইয়া আবার পুষ্করিণীতেই পড়ে। পানা ও আগাছায় ভরা সেই এক পুষ্করিণী, যেখানে দন্তধাবন, ধৌতিকার্য্য, গাত্র মার্জ্জনা ও সর্ব্ববিধ রোগের মল মূত্রাদিময় কাপড় কাচা হয়, অথচ তাহা স্বল্পজলা, এবং কস্মিনকালে তাহার পঙ্কোদ্ধার হয় না; সেই জল উত্তপ্ত মাত্র না করিয়া আমরা পান করি, পরিণাম, উদরাময়, অতিসার, জ্বরাতিসার, বিসূচিকা এবং অজস্র লোকের মৃত্যু।"

"জমিদারেরা গোচারণ ভূমি জমা বিলি করিয়া দিয়া ভোগ-বিলাসের আয় যথারীতি বর্দ্ধিত করিতেছেন। এদিকে গ্রামের গাভী কুল কঙ্কাল সার হইতেছে, দুধ কম দেয়, বৎসরা দুর্ব্বল হয়, নয় অকালে মারা পড়ে। দুধের যোগান কম, কিন্তু চাহিদা বেশী, গয়লারা কাজেই প্রাণপণে যেখান-সেখানকার জল মিশায়। দুধের মাখন তুলিয়া লয়। মহিষ দুধে ও গরুর দুধে মিশায়। সেই দুধ খাইয়া আমাদের ছেলেরা মানুষ হয়। সকলে আবার দুধের দুর্ম্মূল্যতার জন্য তাহাও পেট ভরিয়া খাইতে দিতে পারে না, ভাত হজম করিবার শক্তি না হইতে-হইতেই তাহারা ভাত ও অন্যান্য দুষ্পাচ্য দ্রব্যাদি খাইতে সুরু করে, পরিণাম—যকৃৎ রোগ, উদরাময় ও অকাল মৃত্যু।"

এই রোগ-প্রবণ দেশের প্রত্যেক ব্যক্তি-রই এ গ্রন্থ পাঠ করিলে অনেক উপকার হইবে। ছাপা ও কাগজ উৎকৃষ্ট।

আয়ুর্ব্বেদ বিকাশ। মাসিক পত্র। শ্রীসুধাংশু ভূষণ সেন কাব্যতীর্থ বাচস্পতি সম্পাদিত। মূল্য ২৲ টাকা। ৫ম বর্ষ, ৪র্থ ও ৫ম সংখ্যা। বসন্ত-চিকিৎসার যে মুষ্টিযোগগুলি প্রকাশিত হইতেছে তদ্দারা পাঠকের উপকার হইতে পারিবে। "আয়ুর্ব্বেদ বিষয়ক প্রস্তাব" চিন্তা প্রসূত। "আয়ুর্ব্বেদ" শীর্ষক প্রবন্ধটিও মন্দ হয় নাই। ছাপা ও কাগজ কিন্তু আর একটু ভাল হওয়া উচিত। এবারের ২ সংখ্যার কাগজ যাহা দেখিলাম, তাহাতে আকারও বৃদ্ধি করা উচিত। "অশ্বিনীকুমার সংহিতা"র অসম্পূর্ণ বাক্যে যে সংখ্যা শেষ করা হইয়াছে, তাহাও অসঙ্গত বলিয়া আমাদের বিবেচনা হয়।

পরীক্ষার ফল

নিম্নলিখিত ছাত্রগণ অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় হইতে ২য় বার্ষিক শ্রেণীতে উন্নীত হইয়াছে।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত
„ বিশ্বনাথ সেন গুপ্ত
„ যতীন্দ্রকুমার মজুমদার
„ রজনীকান্ত গুপ্ত
„ মণীদাস রাজপক্ষ
„ সতীশচন্দ্র সেন গুপ্ত
„ প্রফুল্লচন্দ্র রায়
„ জ্ঞানচন্দ্র গুপ্ত
„ সারদাকান্ত দাশ গুপ্ত
„ ধনঞ্জয় সেন গুপ্ত
„ বিমলা প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়
„ রাজেন্দ্রচন্দ্র দাশ গুপ্ত
„ যোগেশচন্দ্র সেনগুপ্ত
„ কিরণ্ময় দাশ গুপ্ত
„ মোহিত কুমার সেন গুপ্ত
„ ভোলানাথ রায়
„ দেবনাথ মজুমদার
„ বিশ্বনাথ তালুকদার
„ বিজয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়
„ হেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
„ প্রমথনাথ দত্ত গুপ্ত
„ নরেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত
„ গৌরদাস অধিকারী
„ পি, এম, অভয় সিংহ
„ ফণিভূষণ সেন গুপ্ত

আয়ুর্ব্বেদ

মাসিকপত্র ও সমালোচক।

২য় বর্ষ। বঙ্গাব্দ ১৩২৪—কার্ত্তিক। ২য় সংখ্যা।

এস মা।

—:০:—

এস মা জগজ্জননি,—তোমার আগমনের সাড়া পাইয়া আমার বঙ্গভূমি আবার মাতিয়া উঠিয়াছে। বর্ষব্যাপি দারিদ্র-দুঃখ আমার বঙ্গজননী আজি সকলি ভুলিয়া গিয়া, তোমার দর্শন আকাঙ্ক্ষায় হর্ষ-সুখ অনুভব করিতেছে। তুমি আসিতেছ—এই গর্ব্বে দিগ্বধূগণ শারদ-শুভ্র-জ্যোৎস্না-কিরণ অঙ্গোপরি তুলিয়া লইয়া সেই কিরণ রাশি যেন সমগ্র বঙ্গদেশ খানিতে ছড়াইয়া দিয়াছে। দিগ্বধূগণের এবম্বিধ গর্ব্ব দর্শনে রাগালস-লোচনে রক্তজবা ফুটিয়া উঠিয়াছে। রক্তজবার দেখা দেখি ঈর্ষাভরে পদ্মগুচ্ছও তোমার শ্রীপদযুগলে লুটাইয়া কৃতকৃতার্থ হইবার জন্য প্রাণভরা হাসির উৎস ঢালিয়া দিয়াছে। এস মা, বাঙ্গালীর শোকোত্তপ্ত প্রাণের ভিতরও আজি বড় আনন্দের দিন। বাঙ্গালীর মা—বাঙ্গালীর পূজা লইতে আসিতেছেন, বাঙ্গালীর এ আনন্দের বুঝি আর তুলনা নাই।

'মা'কে দেখিলে সন্তানের সকল কথা ফুটিয়া উঠে। সকল দুঃখ, সকল কষ্ট, সকল অশান্তির কাহিনী 'মা'য়ের নিকট বলিয়া যে কত সুখ—কত তৃপ্তি, তাহা মাতৃবৎসল-সন্তান ভিন্ন আর তো কাহারও বুঝিবার শক্তি নাই। নৈরাশ্যের ঘোরঘনান্ধকার যখন হৃদয় আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া তুলে, দৈন্য-দুঃখের দীন চাহনিটির ভিতর শুষ্ক ভ্রুকুটির ভঙ্গিমাটুকু যখন বিদ্যুৎ-প্রভার মত নিমেষ কালের জন্য'ও নেত্রপথে পতিত হয়, রোগে-শোকে-জীর্ণতনু হইয়া, জাগতিক সকল আশায় জলাঞ্জলি দিয়া, নিষ্ফলকাম-মানব যখন সংসারের অসারতা সর্ব্বপ্রকারে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়, তখন প্রাণের আবেগে আকুল হইয়া মর্ম্মগ্রন্থির ভিতর হইতে ক্ষীণ কণ্ঠে 'মা' 'মা' বুলি উচ্চারণ করিয়া থাকে। তোমার অকৃতি সন্তান আমাদেরও তো মা এখন সেই অবস্থা। সেই অবস্থায় পতিত হইয়াছি বলিয়াই আজি আমাদের কাতর কণ্ঠ হইতে ধ্বনিত হইতেছে —এস মা।

সেই অবস্থায় পতিত হই নাই তো কি? অবস্থার দীনতায় আমাদের বাকী তো আর কিছুই নাই মা! ম্যালেরিয়া-রাক্ষসী বা ঙ্গালার পল্লীগুলির সকল টুকু গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। ম্যালেরিয়ার জ্বালায় অনেকে পল্লী-মায়া পরিত্যাগ করিয়াছে মা, কিন্তু পল্লী ছাড়িয়াও সুখ নাই,—সহরে অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য এবং যক্ষ্মারোগীর হিসাব প্রতি নিয়তই বর্দ্ধিত। ফলে সেকালের মত তোমার সন্তানগণের আর সে বলবীর্য্য নাই, সে কান্তি-ধৃতি নাই, সে প্রভা-প্রতিভা নাই,—নানারূপ আধিব্যাধি-পরিপূর্ণ দেহে প্রতি পলে তাহাদের আয়ু ক্ষয় হইতেছে। ধর্ম্ম তো দেশ হইতে লোপই পাইয়াছে, সমাজের নিয়মও এখন কেহ আর মানিতে চাহেনা। পুরুষ স্বেচ্ছাচারী,—রমণী কর্ত্তব্যচ্যুতা,—বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিগণ বালক মণ্ডলীর কর্ত্তব্য-পথ প্রদর্শনে অক্ষম, যুবকগণ স্বাধীন পন্থা চিনিয়া কাহারও অনুজ্ঞা পাইবার অপেক্ষা রাখে না। ফলে কি করিয়া স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে হয়—তাহা বৃদ্ধগণও চিন্তা করেন না, বালকগণও শিখিতে চাহে না, যুবক-যুবতীগণও সে সংযম হারাইয়া আত্মোন্নতির পথ রুদ্ধ করিতেছেন। ধর্ম্ম বল, অর্থ বল, কামনা বল, মোক্ষ বল,—স্বাস্থ্যই তো মা সকল সুখের মূল। সে স্বাস্থ্য-সুখই যখন তোমার সন্তানদের নাই মা, তখন তাহাদের আর অধঃপতনের বাকী কি! তাই তোমায় এই দুর্দ্দিনে তোমার এই বাঙ্গালী সন্তানের জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণে তোমার অমোঘ আশীর্ব্বচনে ক্ষীণ-দেহে সঞ্জীবনী-শক্তি আনিবার উদ্দেশ্যে ডাকিতেছি—এস মা!

অধঃপতনটা কি কম হইয়াছে মা! ধর্ম্মবিগলিতপ্রাণ-আর্য্য-ঋষিমণ্ডলী আমাদের ভবিষ্যৎ শুভেচ্ছা পরবশ হইয়া রাশি রাশি গ্রন্থের যে সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, আমাদের দৈহিক উন্নতি বা স্বাস্থ্য রক্ষাই তো সে সকল গ্রন্থের মূলীভূত বিষয়। সমাজ-বন্ধনের জন্য, স্বদেশ রক্ষার জন্য তাঁহাদের ঐকান্তিক চেষ্টার ফল প্রসূত যে পুস্তকাবলী,—তাহারও তো উদ্দেশ্য মা এই স্বাস্থ্যরক্ষা। তিথি-বিশেষে দ্রব্য-বিশেষেরনিষিদ্ধ-ভক্ষণের ব্যবস্থায় যে স্বাস্থ্য-রক্ষার কল্যাণকর বিধিটুকু অলক্ষিতভাবে লুকায়িত রহিয়াছে, তাহা অনুসন্ধিৎসু-ব্যক্তিগণ ভিন্ন কেহ তো মা বুঝিতে পারিবেননা। সম্প্রদায় বিশেষের লোলুপ-লালসায় তৃপ্তিপ্রদ হইলেও নিষ্ঠাবান আর্য্য-সন্তানের পক্ষে এই জন্যই অনেক দ্রব্য আহারই নিষিদ্ধ বলিয়া শাস্ত্রবিধি হইয়াছে। ব্রাহ্মণ-শুদ্র,—ভদ্র-ইতরের শ্রেণী-বিন্যাসে এই জন্যই আর্য্য জাতির সমাজ ভিত্তি গঠিত। সে ভিত্তি-গঠনে গঠন-কর্ত্তার কৃতিত্বের পারদর্শীতা পূর্ণ ভাবে ছিল বলিয়াই সমাজস্থ আচার ভ্রষ্ট ব্যক্তিগণের সকল ঝঞ্ঝাবাৎ সহ্য করিয়াও অদ্যাপি ইহা বিলয় প্রাপ্ত হয় নাই, নতুবা অনেক কাল পূর্ব্বেই ইহার অস্তিত্বের চিহ্ন লুপ্ত হইয়া যাইত।

যাক্,—এক কথায় তোমার সন্তানগণের অবস্থা বড়ই ভীষণ হইয়াছে মা! স্বধর্ম্ম হারাইয়া অধুনা আমরা সমাজমধ্যে একাকারের স্রোত পূর্ণভাবে প্রবাহিত করিয়াছি। সে শিক্ষালাভের প্রবৃত্তিও আমাদের নাই, সে দীক্ষা-দানের যোগ্য ব্যক্তিরও সমাজমধ্যে অভাব হইয়াছে। সে সামর্থ্য ও আমাদের ঘুচিয়া গিয়াছে, সে সামর্থ্য আনয়নের চেষ্টাও আমাদের লুপ্ত হইয়াছে। ফলে অধঃপতনটা ক্রমেই যে ভীষণ হইতে ভীষণতর হইতে চলিল

মা! তুমি বর্ষে বর্ষে যেমন আসিয়া থাক,—এবারও তো তেমনি করিয়া আসিতেছ মা! তুমিই আমাদের বলদাও, বুদ্ধি দাও, আমাদের অজ্ঞান-তমঃ অপনয়ন করিয়া আমাদিগকে স্বাস্থ্যবান্ ও দীর্ঘজীবি হইবার জন্য একটা অদম্য স্পৃহা আবার আমাদের হৃদয় মধ্যে জাগরিত করিয়া তুল মা। অতীত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া লোক-হিতবৎসল-ঋষি-প্রদর্শিত শাস্ত্ররূপ সরণী অন্বেষণে আবার যেন আমরা অবহিত চিত্ত হই, ভূঃ—ভুবঃ—স্বঃ—ত্রিলোকের সৃষ্টি-স্থিতি পালনকর্ত্রী—জননী আমার,—তোমার চরণে ইহা ভিন্ন এই দুর্দ্দিনে আর আমাদের অন্য প্রার্থনা নাই।

শরতে—শারদা।

(১)

নিরাশ-কাতর প্রাণে চেয়ে শুধু উর্দ্ধ পানে,
কতদিন আছি যে গো! দুঃখ জ্বালা স'য়ে
একে একে "শুভক্ষণ" গেল কত ব'য়ে!
লক্ষ্মী সরস্বতী গুহ গজাননে ল'য়ে—
অসময়ে, আজ কেন এলি মা! অভয়ে?
কুবের ভাণ্ডারী যা'র—সন্তান—ভিখারী তা'র
বিশ্ব—এ ভীষণ দৃশ্য—দেখে সবিস্ময়ে!
তাই কি এলি মা! আজ 'দশভুজা' হ'য়ে?

(২)

এ দীন-দরিদ্র-দেশে—আরো কতবার এসে—
দেখে গেছ তনয়ের ঘোর অমঙ্গল,
তোমার চরণ পূজে, কে পেয়েছে ফল?
কা'রে বা সুমতি দিলে, কা'রে দিলে বল?
কোন্ ভাগ্যবান্—পেলে আশার সম্বল?
সেই মুহুঃ অশ্রুপাত, সেই বিঘ্ন ঝঞ্ঝাবাত,
সেই হিংসা লোভে পাপে ম্লান মহীতল!
গাছেতে ফলেনা ফল—মেঘে নাই জল!

(৩)

ভাই—মারে বুকে ছুরি, বন্ধু করে নারী চুরী
বিধবা—করেনা ব্রহ্মচর্য্যের পালন,
নিত্য নিত্য আত্মহত্যা অকাল মরণ।
অন্নকষ্ট—চিরস্থায়ী—দুর্ভিক্ষ-তাড়ন—
সৃষ্ট ছাড়া সৃষ্টি—এ কি তোমারি সৃজন?
কোথা তোর পুত্র সব? এরা তো নির্জ্জীব-শব
কা'র গৃহে পূজা খেতে কর আগমন?
ধনী, দীন—সবাই ত বিলাসে মগন!

(৪)

তোর এ সাধের ধরা—দারুণ অশান্তি ভরা,
মরীচির অভিশপ্ত মরুভূমি প্রায়!
বল্ মা! দাঁড়াবি কোথা? বসিবি কোথায়?
ডেকে এনে, পথ থেকে ফিরাব কি হায়!
মাটির আসনে—ব্যথা বাজিবে যে পায়!
চিতা-বহ্নি জ্বলে বুকে, 'দেহি দেহি' শব্দ মুখে,
মৃত্যু-ছায়া অন্ধকারে ব'সে আছি ঠায়!
তা'র মাঝে, মা তোমারে বসানো কি যায়?

(৫)

"রাজ রাজেশ্বরী" বেশে—
কেন দেখা দিলি এসে?
'মা' ব'লে ডাকিতে যে মা! বড় ভয় করে,
হাতে ধ'রে আনিতে কি পারি ভাঙা ঘরে?
মাতা-পুত্রে—কাছা কাছি কতদিন পরে—

বল্‌মা ! একটী কথা—সুধাই কাতরে—
অমৃতান্নে পরিপূর্ণা—মা যা'দের "অন্নপূর্ণা"—
কোন্ মহাপাপে তা'রা অন্নাভাবে মরে ?
বস্ত্রাভাবে—কেন তা'রা ছিন্ন-বাস পরে ?

(৬)

ছি ছি মা ! হৃদয় তোর
কি পাষাণ ! কি কঠোর !
কন্যা অন্তরীপ হ'তে হিমাদ্রি শিখর—
ঘরে ঘরে মহামারী ম্যালেরিয়া জ্বর !
মরণে আহ্বান করে কোটি নারী-নর,
এরাই কি—হা জননি—আর্য্য বংশধর ?
বিধাতার বজ্র রোষে,
মুষ্টি ভিক্ষা, গোষ্ঠী পোষে—
শোণিতে শোণিমা নাই, শুষ্ক ওষ্ঠাধর !
রোগে অস্থি চর্ম্মসার—কম্র-কলেবর !

(৭)

কি দিয়ে গো দশভুজা ! করিব ও পদ পূজা ?
দেবতার যোগ্য আছে কি উপকরণ ?
পুষ্পে কীট, গন্ধে স্প্রীট, দূষিত পবন,
ভুজঙ্গের সহবাসে, বিষাক্ত চন্দন,
শশাঙ্কের অঙ্গে মাখা রাহুর বমন ;
নিজ হস্তে বস্ত্র বোনা—ভুলে গেছি ত্রিনয়না !
তীক্ষ্ণ কাঁটা বিল্বদলে, কে করে চয়ন ?
গঙ্গাজলে "সেপ্টিকট্যাং" ব্যাধি-নিকেতন !

(৮)

দুগ্ধে সে মাধুরী নাই, ঘৃতে ঘৃণ্য-চর্ব্বি পাই,
গোহাড়ে শর্করা-শুভ্র—উজ্জ্বল প্রভায় !
রবিকরে কৃষি-জাত জ্ব'লে পুড়ে যায় !
ধনরত্ন সবই গেছে—বিলাসের দায় !
জননী কি উপচারে তুষিব তোমায় ?
দেহ ? সে ত রোগে ক্ষীণ, হৃদয় কলুষে লীন,
মন ?—সেও অপবিত্র—স্বার্থের চিন্তায় ;
ভক্তি—কুকার্য্যের প্রতি, আসক্তি নেশায়

(৯)

যুগান্তের চিন্তা রাজি, একত্র করিয়া আজি,
চিনেছি তোমায় ওমা ! এতক্ষণ পরে,
তুমিই যে "আয়ুর্ব্বেদ" বিশ্ব চরাচরে !
অষ্টাদশ কোটি ব্যাধি বিনাশের তরে—
দশ হাতে "দশমূল" ধ'রেছ সাদরে।
কাম-ক্রোধ শত্রু-বলে—দলিয়া চরণ-তলে—
রোগরূপী অসুরের স্কন্ধের উপরে,
"স্বাস্থ্য"রূপে "মহাশক্তি" আনন্দে বিহরে !

(১০)

এতদিন—মোহ ঘোরে—
চাহিয়া দেখিনি তোরে,
সকল সংশয় মাগো ! ঘুচিল এখন,—
তুমি "আয়ুর্ব্বেদ" নিত্য সত্য-সনাতন !
"যুক্তি" "দৈব"ব্যপাশ্রয় বক্ষে দু'টি স্তন,
"বায়ু পিত্ত কফ" তিন, তোরই ত্রিনয়ন!
অষ্ট-অঙ্গ পূর্ণ করি'—এসো তুমি হে শঙ্করি !
"বৈদিক" "তান্ত্রিক" তোর দু'খানি চরণ,
বিপন্ন-জগৎ-শিরে করুক ধারণ।

শ্রীব্রজবল্লভ রায় কাব্যতীর্থ,
কাব্যকণ্ঠ বিশারদ।

কাজের কথা।

স্ত্রীসমাজে স্বাস্থ্য-হানি।—অধুনা নানা কারণে দেশের পুরুষ মণ্ডলীর মত বাঙ্গালীরমণীগণেরও স্বাস্থ্যহানি ঘটিতেছে। অম্ল এবং অজীর্ণ রোগে বাঙ্গালী পুরুষ দিগের মত অনেক মহিলাই ভুগিতেছেন। ইহা ভিন্ন 'হিষ্টিরিয়া' বা মূর্চ্ছা রোগটি অনেকের তো জীবন ব্যাপী হইয়া পড়িয়াছে। 'ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা যাওয়া'র কথা এখন আর কাব্য-পুস্তকে পড়িয়া অনুমান করিবার দরকার হয়না,—আমাদের মহিলা সমাজে লক্ষ্য করিলেই উহার যাথার্থ্য প্রত্যক্ষীভূত হইয়া থাকে। একটু সামান্য অভিমান হইলেই,—একটু সামান্য দুঃখ পাইলেই,—একটু সামান্য কথান্তর হইলেই—এখন আমাদের মেয়েরা 'মূর্চ্ছা' গিয়া থাকেন। শারীরিক সামর্থ্য এবং মানসিক দৃঢ়তার অভাবই ইহার সর্ব্ব প্রধান কারণ। সেকালে স্ত্রীসমাজে এই দুইটি বিষয়েরই অভাব ছিলনা। ভোরে উঠিয়া ছড়া ঝাঁট দেওয়া হইতে আরম্ভ করিয়া, রন্ধন-পরিবেশন প্রভৃতি সাংসারিক সকল কার্য্যই সেকালে আমরা স্ত্রীজাতির উপর নির্ভর করিতাম,—ইহাতে তাঁহাদিগের গৃহস্থলীর সহিত ব্যায়ামকার্য্যও সিদ্ধ হইয়া যাইত। অবকাশ-কালে বৃদ্ধ মহিলা দিগের নিকট বসিয়া যুবতীরা রামায়ণ-মহাভারত পাঠ করিতেন, কখন বা ঠানদিদির নিকট উপকথা বা গল্প শুনিতেন। মনোবৃত্তির দার্ঢ্য সেই রামায়ণ-মহাভারত পাঠ বা গল্প শ্রবণে সিদ্ধ হইত। আদর্শ যেরূপ, অনুকরণও সেইরূপ হইত। এখন ছড়া ঝাঁট দেওয়া, থালা বাসন পরিষ্কার করা, রন্ধন-পরিবেশন করা—এ সকল তো অনেক সংসার হইতে উঠিয়াই গিয়াছে, রাঁধুনি-চাকরাণীতে অনেক সংসারে এখন সে সকল কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে! নূতন নূতন নাটক-নভেল এখন রামায়ণ-মহাভারতের স্থল অধিকার করিয়াছে। ঠাকুমার নিকট গল্প শোনা—সে প্রথা তো দেশ হইতে একেবারেই বিলুপ্ত। সে ঠাকুমাও এখন নাই, সে গল্প শুনিবার জন্য যুবতীগণেরও ইচ্ছা নাই। ফলে শারীরিক এবং মানসিক দুর্ব্বলতার অভাবে অধুনা আমাদের রমণী-সমাজের যেরূপ ক্ষতি হইতেছে, তাহা চিন্তা করিবার বিষয়।

*　　*　　*

ভবিষ্যৎ চিন্তা।—আমাদের স্বাস্থ্য অক্ষুন্ন থাকিলে তবে আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধর দিগের স্বাস্থ্য যে উন্নত হইতে পারিবে, এ বিষয়ে বোধ হয় কাহারও সহিত মতদ্বৈধ ঘটিবার কারণ নাই। বীজ যেরূপ, চারাও সেইরূপ হইবে,—ইহা তো চলতি কথা। অস্বাস্থ্যকর পিতামাতার শুক্র-শোণিত মিলিত হইয়া কখন 'ভীম অর্জ্জুনে'র মত সন্তান উৎপন্ন করিতে পারেনা। প্রত্যেক পিতার—প্রত্যেক মাতার ইহার জন্য ও স্বাস্থ্যবান ও স্বাস্থ্যবতী হইতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। পিতার রক্তদুষ্টি এবং পারদ-বিকৃতির ফলভোগ—সন্তানকে যে করিতে হয়, ইহা তো সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। এই জন্যই আমাদিগকে সদাচার ও সদ্বৃত্তি-পরায়ণ হইবার জন্য আমাদের শাস্ত্রকারগণ রাশি রাশি উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। সেকালে আমাদের গৃহস্থলীর সকল

কার্য্য যেরূপ ভাবে নির্ব্বাহিত হইত, তাহার সহিত সে উপদেশের যথেষ্ট সম্বন্ধ ছিল। আমাদের করণীয় সকল বিষয়েই সুকৌশলে শাস্ত্র বা শাসন-প্রণালী বিজড়িত। আমরা সে সকল এখন ভুলিয়া গিয়াছি এবং তাহারই ফলে যে আমাদের স্বাস্থ্যের দুর্গতি ঘটিয়াছে —একথা ধ্রুব সত্য।

* * *

আমাদের কর্ত্তব্য।—স্বাস্থ্য-রক্ষার জন্য আমাদের সদাচার পালন যেরূপ কর্ত্তব্য, বংশধর দিগকে সুশিক্ষা দিবার জন্য ও আমাদের সেইরূপ সদ্বৃত্তি-পরায়ণ হওয়া উচিত। তাহারা তো যেরূপ দেখিবে, সেইরূপই শিখিবে। কিন্তু সেই শিক্ষার সহিত তাহাদের যে জীবন-মরণের সম্বন্ধ নিহিত রহিয়াছে। এখানে একটা গল্পের উল্লেখ করিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবেনা। কতকগুলি মুনিকুমার এক বিটপিস্থ কুলায়ে দুইটী পক্ষী-শাবকদেখিয়া একটীকে কুটীরে লইয়া গেলেন। ঐ শাবকটী ঋষিকুমারদিগের ব্যবহার-দর্শনে ঋষি-স্বভাব প্রাপ্ত হইল। অতিথি অভ্যাগত কুটীরে আগমন করিলে পক্ষী—ঋষিদিগের মত মিষ্ট বচনে অভ্যর্থনা করিতে শিখিল। মুনিকুমারগণ তদ্দর্শনে চিন্তা করিলেন,—কুলায় মধ্যে যে আর একটি পক্ষী আছে, তাহাকেও লইয়া আসা যাউক। ফলে তাঁহারা কুলায় মধ্যে পক্ষীটি না পাইয়া পথিমধ্যে আসিতে আসিতে এক চর্ম্মকার-গৃহের নিকটবর্ত্তী হইবা-মাত্র শুনিতে পাইলেন, কে তাঁহাদের উদ্দেশে গালি-বর্ষণ করিতেছে। ফিরিয়া দেখিলেন, একটি শুকপক্ষী। তাহার পর কুটীরে ফিরিয়া গিয়া নিজেদের পালিত শুকপক্ষীর নিকট ইহার কারণ জিজ্ঞাসু হইলে, পক্ষী বলিল,—

"মাতাপ্যেকঃ পিতাপ্যেকো মম তস্য চ পক্ষিণঃ।
অহং মুনিভিরানীতঃ সচানীতো গবাশনৈঃ।
অহং মুনীণাং বচনং শৃণোমি
গবাশনানাং বচনং শৃণোতি সঃ,
ন তস্য দোষোঃ ন চ মে গুণো বা
সংসর্গজা দোষগুণা ভবন্তি॥"

অর্থাৎ—"আমাদের পিতা এবং মাতা একই, কিন্তু আমি মুনিদিগের দ্বারা আনীত এবং সে চর্ম্মকারের দ্বারা নীত। আমি মুনি-দিগের বাক্য শিক্ষা করিয়াছি, আর সে চর্ম্ম-কারদিগের বাক্য শিখিয়াছে। অতএব তাহা-রও কোন দোষ নাই, আমারও কোন গুণ নাই, সংসর্গ ই এই দোষ এবং গুণের কারণ-ভূত।"

আমাদের সংসর্গে আমাদের বংশধরগণ যাহাতে মুনিবৃত্তি প্রাপ্ত হইতে পারে, তাহা কি আমাদের করা কর্ত্তব্য নহে। সেই মুনি-বৃত্তিলাভ করিলেই তো তাহাই তাহাদিগের স্বাস্থ্যরক্ষার কারণ জন্মাইতে পারিবে।

* * *

সংযম শিক্ষা।—স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য আমাদের চেষ্টা করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে আমা-দিগকে সংযম শিক্ষা করিতে হইবে। সংযম শিক্ষা করিতে পারিলেই মনোবৃত্তির আবিলতা আমাদিগের নিকট হইতে অন্তর্হিত হইতে পারিবে। সাংখ্য বল, পাতঞ্জল বল, বৈশে-ষিক দর্শনের কথাই উত্থাপন কর—এই সংযম শিক্ষা-দানই তো দর্শনশাস্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য। দর্শনশাস্ত্র যোগ কি বুঝাইতে গিয়া প্রথমেই তো বলিয়াছেন, — "যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ" — অর্থাৎ "চিত্তের বৃত্তির নিরোধ করার নামই যোগ।" এই একটি মাত্র উপদেশ যদি আমরা মানিয়া চলি,—তাহা হইলে আর

কোন বিষয়েরই বিশৃঙ্খলার সম্ভাবনা থাকেনা, ঐ একই কথা গুরুমন্ত্রের মত মানিতে পারিলে তাহারই ফলে আমাদের দেশরক্ষা,—ধর্ম্মরক্ষা,—স্বাস্থ্যরক্ষা—সকলই রক্ষা হইতে পারিবে।

* * *

ব্রহ্মচর্য্যের অভাব।—আমরা সংযম ভুলিয়াছি, সদাচারভ্রষ্ট হইয়া অপকর্ম্মে অভ্যস্ত হইয়াছি। আমাদের কুদৃষ্টান্তে আমাদের বংশধরগণ কুপথগামী হইতেছে। ফলে ব্রহ্মচর্য্য বলিয়া দেশে যে সর্ব্বরোগের হস্ত হইতে অব্যাহত থাকিবার একটা উৎকৃষ্ট বিষয় ছিল, তাহার নাম দেশ হইতে লোপ পাইতে বলিয়াছে। চৌদ্দ-পনের বৎসরের বালকদিগের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলে দেখা যায়, তাহাদিগের গণ্ডদ্বয়ে ব্রণ সঞ্চার আরম্ভ হইয়াছে, চক্ষুদ্বয়ের নিম্নভাগে—কালিমা-রেখা দেখা দিয়াছে। এই অবস্থা হইলেই বালজীবনের ব্রহ্মচর্য্য ভঙ্গ আরম্ভ হইয়াছে, সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। পিতামাতার এদিকে লক্ষ্য নাই,—বিদ্যাধ্যয়নের জন্য তাড়না করিলেই তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য পালিত হইল বলিয়া তাঁহারা মনে করেন। ফলে এমনই করিয়া বাঙ্গালী জাতির অস্তিত্ব ক্রমে লুপ্ত হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

* * *

বংশরক্ষার চিন্তা।—বাস্তবিক বালকবৃন্দকে এই ব্রহ্মচর্য্যার পদস্খলন হইতে রক্ষা করিবার জন্য আমাদের উপায়-চিন্তন কর্ত্তব্য। বালকবৃন্দকে রক্ষা করিতে পারিলে তবে বাঙ্গালীর বংশরক্ষার ব্যবস্থা করা হইবে। "শৈশব-যৌবন দুঁহু মিলি গেল"—বালকদিগের যখন এই অবস্থা উপস্থিত হয়, তখনই তাহাদিগের কুসুম-কোমল-প্রাণে কাল-কীট দংশনের সূচনা আরম্ভ হয়। এই সময়ই তাহাদিগকে রক্ষা করিবার উপযুক্ত কাল। এ সময় যদি উপেক্ষার হাসি হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে সারাজীবন চেষ্টা করিয়াও আর তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারা যায়না। কিশোর কাল অতিক্রম করিয়া যৌবনের সমস্ত বৃত্তি স্ফুরিত হইলে, তখন তো নাটকীয় নায়িকা লাভের ইচ্ছা তাহাদিগের যে বলবতী হইবে, ইহা স্বতঃ সিদ্ধকথা। সে অবস্থা উপস্থিত হইলে, তখন আর ঔষধে রোগ সারাইবার চেষ্টা না করিয়া বিবাহ দিলে কতকটা সুফল ফলিতে পারে। কিন্তু ঘুণ ধরা বাঁশের সহন-ক্ষমতা যেরূপ অল্প, কীটদষ্ট-যুবকমণ্ডলীর অবস্থাও তদ্রূপ। সেই জন্য ছেলে বিগড়াইতেছে জানিবা মাত্র পিতা-মাতা যদি তাহাদিগের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি প্রদান করেন, সেই সময় হইতে কাছে কাছে রাখিয়া যাহাতে তাহারা ব্রহ্মচর্য্যের অন্তরায় না ঘটাইতে পারে, সর্ব্ব কর্ম্ম ফেলিয়া তাহার জন্য চেষ্টাশীল হইতে পারেন, তাহা হইলে বালক রক্ষা—তথা বংশ-রক্ষার ব্যবস্থা সুগম হইতে পারে। দেশের বালকবৃন্দের পিতা-মাতাগণ এ সকল কথা চিন্তা করিবেন কি !

চিকিৎসা-তত্ত্ব।

(ভূমিকা অংশ)

বাড়ীর কোন ব্যক্তি পীড়াক্রান্ত হইলে রোগীর আত্মীয়-স্বজন অনেক সময় কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পড়েন। হয়ত একমাত্র উপার্জ্জন-ক্ষম কর্ত্তা, কি লক্ষ্মীস্বরূপিণী গৃহিণী, স্নেহের সহোদর, প্রাণাধিক পুত্রকন্যা যে কেহই হউক না,—রোগযন্ত্রণায় কাতর হইলে বাড়ীর সকলেরই বিচলিত হইবার কথা। ইহার ফলে অনেক সময় চিকিৎসা-বিভ্রাট ঘটিয়া পীড়িতের যন্ত্রণা বৃদ্ধি ও বৃথা অর্থব্যয় হইয়া থাকে; এমন কি অনেক সময় রোগীর জীবন-সংশয়ও হইয়া পড়ে। সুতরাং যাহাতে চিকিৎসা-বিভ্রাট না ঘটে, তাহার জন্য পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত থাকা আবশ্যক।

কলিকাতার ন্যায় চিকিৎসক-বহুল-নগরীতে এইরূপ চিকিৎসা বিভ্রাট-ফলে যে বিষময় ফল আমার শ্রুতি গোচর হইয়াছিল, তাহা আমার মানস-পটে চিরাঙ্কিত রহিয়াছে। ঘটনাটি,—কলিকাতার কোন সম্ভ্রান্ত ধনীর একমাত্র পুত্র বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হন; রোগ প্রকাশ হইবা মাত্র বালকের পিতা অতিমাত্র কাতর হইয়া তাঁহার পারিবারিক চিকিৎসকের নিকট সংবাদ পাঠাইলেন, এদিকে তাঁহার বাড়ী অপেক্ষাকৃত দূর বলিয়া নিকটস্থ অপর একজন চিকিৎসককে আহ্বান করিলেন। নবাগত চিকিৎসক রোগ-পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থাপত্র লিখিয়া দিলেন, ঔষধ আনা হইল, কিন্তু উহা সেবন করাইবার পূর্ব্বেই তাঁহার পারিবারিক ডাক্তার আসিলেন, তিনি ব্যাধি-পরীক্ষা করিয়া পূর্ব্বপ্রদত্ত ঔষধের পরিবর্ত্তন আবশ্যক বোধে নূতন ব্যবস্থা করিলেন। পুনরায় ঔষধ আনাইবার ব্যবস্থা হইল। এদিকে রোগীর পিতা ডাক্তার বাবুর নিকট পীড়ার জটিলতার বিষয় অবগত হইয়া, অপর একজন প্রসিদ্ধ ডাক্তার আনাইবার বন্দোবস্ত করিলেন। পারিবারিক চিকিৎসকের ব্যবস্থামত ঔষধ সেবনের পূর্ব্বে পুনর্ব্বার নূতন ডাক্তার ও নূতন ব্যবস্থায় রোগীর ঔষধ সেবনের বিঘ্ন উপস্থিত হইল

রোগীর মাতামহও কলিকাতার অপর একজন ধনবান ব্যক্তি। তিনি দৌহিত্রের কঠিন পীড়ার বিষয় জ্ঞাত হইয়া তাঁহার বিশ্বাসী একজন হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার সঙ্গে লইয়া উপস্থিত হইলেন। তখন তৃতীয় বারের আনীত ঔষধ ব্যবহার না করাইয়া কোন্ মতে চিকিৎসা চলিবে পরামর্শ করিতে কিয়ৎক্ষণ অতীত হইল। এইরূপে চারিজন চিকিৎসক আসিলেন, অজস্র টাকা ব্যয় হইল, অথচ অচিকিৎসায় রোগ উত্তরোত্তর প্রবল হইয়া যখন রোগীর অবস্থা নিতান্তই শঙ্কাজনক হইল, তখন যৎকিঞ্চিৎ হোমিওপ্যাথী ঔষধ রোগীর ভোগে আসিল। রোগীর উপস্থিত অবস্থা দেখিয়া ডাক্তার বাবু সেখানে অবস্থান করা সমিচীন বোধ করিলেননা। তিনি কয়েক মাত্রা ঔষধ ও সেবনের নিয়মাদি বলিয়া দিয়া যেমন থাকে—সংবাদ দিবার জন্য উপদেশ দিয়া বাড়ীর বাহির হইলেন; কিয়ৎক্ষণ পরেই ক্রন্দনের রোল উঠিল।

এই ঘটনায় বাহিরের লোকে দুঃখ প্রকাশ করিয়াছে,—"যা'র আয়ু নাই তা'কে কে বাঁচাবে বল। এত ডাক্তার এল, পয়সা-টাই কি কম খরচ হ'ল, চিকিৎসার ক্রটী কিছুই হয়নি, দিন ফুরাইয়াছে, চলে গেল" ইত্যাদি। সত্য,—ডাক্তার বা ব্যবস্থা-পত্রের ক্রটী কিছু না থাকিতে পারে, কিন্তু আত্মীয়-স্বজনের কাতরতায় কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় পিতা-মাতার বুদ্ধির দোষে এক প্রকার বিনা ঔষধেই বালকের মৃত্যু হইল। ইহা অপেক্ষা মর্ম্মান্তিক ঘটনা আর কি হইতে পারে? অনেক সময় মেহ, উপদংশ প্রভৃতি লজ্জাকর কুৎসিত পীড়াক্রান্ত হইয়া অনেকে আত্মীয়-স্বজনের নিকট গোপন করিতে গিয়া চিকিৎসা-বিভ্রাটে নিজে চিরদিন জীবন্মৃত হইয়া থাকেন, এবং ভবিষ্যৎ সন্তানগণেরও জীবন দুর্ব্বিসহ এবং বিষময় করিয়া রাখেন।

এই সমুদয় বিপত্তি হইতে উদ্ধারের উপায় পূর্ব্ব হইতে সাধারণকে বুঝাইয়া দেওয়া চিকিৎসক মাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। এই উদ্দেশ্যেই এই প্রবন্ধের অবতারণা। যখন প্রিয় পরিজন রোগ-যন্ত্রণায় কাতর হইয়া বাড়ীর সকলকেই কাতর করিয়াছেন,—মানবের সেই সর্ব্বাপেক্ষা বিপত্তির কালে এ সকল তত্ত্ব অবগতি থাকিলে সদ্বন্ধু ও সুচিকিৎসকের উপদেশ পাইবেন।

ব্যাধি প্রতিকারের সময়।—চরকাদি আয়ুর্ব্বেদ তন্ত্র ঋষি প্রণীত। প্রাচীন ঋষিগণ নির্লোভ, জিতেন্দ্রিয়, সত্যপ্রিয় ও পরোপকার-পরায়ণ ছিলেন। সুতরাং তাঁহাদের বাক্যে কোন প্রকার স্বার্থপরতার বিষয় নিহিত আছে, ইহা কাহারও মনে উদয় হওয়া সম্ভবপর নহে। আমার এ প্রবন্ধ তাঁহাদেরই আদর্শ উপদেশের মর্ম্ম লইয়া লিখিত।

চরকসংহিতায় একস্থানে উল্লিখিত হইয়াছে,—বুদ্ধিমান ব্যক্তি বাহ্য অথবা অভ্যন্তরস্থ রোগ উৎপন্ন হইবামাত্র তাহার প্রতিকারে যত্নশীল হইবেন। নির্ব্বোধ ব্যক্তি-রাই অজ্ঞানতা অথবা অনবধানতা বশতঃ রোগের প্রথমোৎপত্তিকালে তাহাকে শত্রু বলিয়া বুঝিতে পারেনা। ব্যাধি সমূহ প্রথমে অল্পভাবে উৎপন্ন হইয়া, ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ও জাতমূল হইয়া নির্ব্বোধ ব্যক্তির বল ও আয়ুনাশ করে। মূঢ় ব্যক্তিগণ অতি-পীড়িত না হইলে তাহার প্রতিকারে যত্নশীল হয়না, আর অতি পীড়িত হইলে তখন ব্যাধি নিগ্রহে যত্নশীল হইয়া,—

"অথ পুত্রাংশ্চ দারাংশ্চ জ্ঞাতীশ্চাহুয় ভাষতে
সর্ব্বস্বেনাপি মে কশ্চিদ্ ভিষগানীয়তামিতি॥"

অর্থাৎ পুত্র, পরিবার, আত্মীয়বর্গকে ডাকিয়া বলে,—"আমার সর্ব্বস্ব দিয়াও কোন একজন চিকিৎসক আনিয়া দাও।" কিন্তু ঐ প্রকার ব্যাধি-পীড়িত, দুর্ব্বল, কৃশ, ক্ষীণেন্দ্রিয়, ক্লান্তচিত্ত-মুমূর্ষুকে কোন্ চিকিৎ-সক রোগ মুক্ত করিতে সমর্থ হইবেন! এই কারণে জগতের হিতাকাঙ্ক্ষী মহর্ষিগণ। বলিয়াছেন—

তস্মাৎ প্রাগেব রোগেভ্যো রোগেষু তরুণেষু বা
ভেষজৈঃ প্রতিকুর্ব্বীত য ইচ্ছেৎ সুখমাত্মনঃ॥

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আপনার সুখ অর্থাৎ স্বাস্থ্য লাভে ইচ্ছুক, তিনি রোগের পূর্ব্বাবস্থায় অথবা তরুণাবস্থায় ঔষধের সাহায্যে প্রতি-কার-পরায়ণ হইবেন।

তরুণাবস্থায় চিকিৎসিত হইলে যে সহজে আরোগ্যলাভ ঘটিয়া থাকে তাহা নহে, যন্ত্রণার

অল্পতা এবং অর্থের সাশ্রয়ও ইহার ফলে হইয়া থাকে। সুতরাং বুদ্ধিমান ব্যক্তি—ব্যাধি অল্প হইলেও অবহেলা না করিয়া সত্বর প্রতিকারে যত্নশীল হইবেন।

ঔষধ।—যে সমুদয় ঔষধ আমাদের উপস্থিত ব্যাধি নষ্ট করিতে পারে, অথচ ভবিষ্যৎ ব্যাধির কারণ হয় না, সেই ঔষধই আমাদের হিতকর।

বয়স, প্রকৃতি, ঋতু, দেশ, স্ত্রী, পুরুষ প্রভৃতি ভেদে আমাদের যেরূপ অন্ন-বস্ত্রাদির পার্থক্য রক্ষার আবশ্যক হইয়া থাকে, ঔষধ সম্বন্ধেও সেই প্রকার পার্থক্য-রক্ষার আবশ্যক হইয়া থাকে। এইজন্যই শিশু, বৃদ্ধ, গর্ভিণী, যুবক ভেদে, শীতোষ্ণাদি কালভেদে, আর্দ্র-শুষ্কাদি দেশভেদে, ঔষধের পৃথক পৃথক প্রয়োগ-ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে এদেশবাসীর সম্পূর্ণ অনুপযোগী শীতপ্রধান দেশীয় ঔষধ সকল বিনা বিচারে সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হইতেছে। এই জাতীয় ঔষধ কোন কোন ক্ষেত্রে উপস্থিত কার্য্যকরী হইলেও ভবিষ্যৎ স্বাস্থ্যের উপযোগী কিনা তাহা বিবেচনা করিয়া দেখা সকলেরই কর্ত্তব্য।

ভিন্ন ভিন্ন দেশের জল-বায়ু প্রভৃতি হইতে খাদ্যাদির গুণান্তর হইয়া মানবের বল, বর্ণ, আকৃতি, প্রকৃতির কত তারতম্য হইয়া থাকে, ইহা আমরা সর্ব্বদা দেখিবার সুযোগ পাই। এক ভারতবর্ষের মধ্যেই জল-বায়ুর বিভিন্নতা বশতঃ বহু বিভিন্ন প্রকৃতি, বল, বর্ণাদি যুক্ত মানব দেখিতে পাওয়া যায়।

খাদ্য হইতে যখন এইপ্রকার বিচিত্র পার্থক্য সম্পাদিত হয়, তখন শক্তিশালী ঔষধ হইতে যে আরও অধিক পরিমাণে ভিন্ন ফল ফলিবার সম্ভাবনা, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না। এই ফল বিভিন্নতা জন্যই আয়ুর্ব্বেদের ঔষধগুলি ভারতের সর্ব্বত্র সমান ফলদায়ক হয় না। যে ঔষধ এক প্রদেশের অত্যন্ত হিতকর, তাহাই আবার অন্য প্রদেশের পক্ষে সেরূপ কার্য্যকর হয় না। এইজন্যই আয়ুর্ব্বেদের অগণ্য শক্তিশালী ঔষধের মধ্যে স্থান-বিশেষের হিতকর ঔষধগুলি বিশেষ ভাবে সেই সেই প্রদেশে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এক ভারতবর্ষের মধ্যেই যখন এই প্রকার বিভিন্ন ভাব উপস্থিত হয়, তখন সম্পূর্ণ বিভিন্ন জল-বায়ু সম্পন্ন বিদেশীয় ঔষধগুলি আমাদের স্বাস্থ্যের কিরূপ বিরোধী, তাহা সহজেই অনুমেয়। ইহা যে শুধু আমাদেরই অনুমানের কথা তাহা নহে, ইহা সত্যানুসন্ধি ঋষিগণের পরীক্ষিত সত্য; তাই তাঁহারা বলিয়াছেন,—

"যস্য দেশস্য যো জন্তু তজ্জন্তস্যৌষধং হিতং।"

অর্থাৎ যে দেশের যে প্রাণী, তাহার পক্ষে সেই দেশের ঔষধই হিতকর।

পথ্য।—বিদেশীয় চিকিৎসায় যে কেবল ঔষধই বিরুদ্ধ হয়, তাহা নহে, অনেক ক্ষেত্রে পথ্যও বিরুদ্ধ হইয়া থাকে। অথচ এই পথ্য অর্থাৎ হিতকর আহার-বিহার সুস্থ-রোগী কাহারও উপেক্ষার বস্তু নহে। প্রথম যে ব্যাধি উৎপন্ন হয়, তাহা কেবল স্বাস্থ্য-বিরুদ্ধ পথ্য অর্থাৎ অহিত আহার-বিহার উপভোগ জন্য। যদি পীড়িত অবস্থাতেও পুনরায় বিরুদ্ধ আহার-বিহার হয়, তবে তাহা আরও বিষময় হইবে। অল্প ব্যাধি অনেক সময় পথ্য বা হিতকর আহার-বিহার সাহায্যে দূরীভূত হয়, কিন্তু বিরুদ্ধ পথ্যসেবী শত শত ঔষধেও আরোগ্য লাভ করিতে

পারেনা। তাই আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণ দেশ, কাল, রোগ, বয়স প্রভৃতি ভেদে পীড়িতের আহার-বিহারের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। কিন্তু বিদেশীয় চিকিৎসায় উষ্ণ প্রধান দেশের একান্ত উপযোগী ডাবের জলের পরিবর্ত্তে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 'সোডা' পানীয়রূপে ব্যবহৃত হয়। স্বাস্থ্য ও দেশোপ-যোগী যবমণ্ড পথ্য হয় না, কৌটায় ভরা বিলাতী বার্লি (যব চূর্ণ) পথ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। বিশুদ্ধ সন্তঃপ্রাপ্ত দুগ্ধের পরিবর্ত্তে দেশান্তর হইতে আনীত সমধিক ব্যয় সাপেক্ষ জমাট দুগ্ধ পথ্য বলিয়া বিবেচিত হয়। চির-দিনের অভ্যস্ত দেশ-হিতকর পথ্যের পরিবর্ত্তে আমাদের অনভ্যস্ত ও অনুপযোগী খাদ্যগুলি কি সমধিক ফলপ্রদ হইতে পারে? দুঃখের বিষয় সুস্থ—পীড়িত—সকলেই এক্ষণে বিদেশীয় আহার আচারের অনুষ্ঠানে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন, কিন্তু তাহাতে দেশের স্বাস্থ্য বৃদ্ধি হইতেছে কোথায়? এই প্রকার অনুপযোগী আহার আচারে আমাদের উপকার ত হইতেই পারে না, বরং অনিষ্টই হইতেছে। পথ্য সম্বন্ধে উদাসীনতা অবলম্বন বুদ্ধিমান ব্যক্তির পক্ষে কখনই উচিত নহে। কারণ,—

"বিনাপি ভৈষজৈর্ব্যাধিঃ পথ্যাদেব নিবর্ত্ততে।
নতু পথ্য বিহীনস্য ভেষজানাং শতৈরপি॥"

ঔষধ-পথ্য সম্বন্ধে বিশেষ বক্তব্য।—বিদেশীয় ঔষধ ও পথ্যের অপ-কারিতা সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, তাহাতে বিদেশী-ঔষধ-প্রিয় ব্যক্তিবর্গ মনে করিতে পারেন যে, আমি সাধারণের হিতের পরিবর্ত্তে এ ক্ষেত্রে দেশীয় ঔষধ প্রচারের চেষ্টাই করিতেছি। সে জন্য এ সম্বন্ধে আরও কিঞ্চিত বলিতে ইচ্ছুক হইয়াছি। অনেকে বলেন, তরুণক্ষেত্রে ডাক্তারী ঔষধে শীঘ্র উপকার পাওয়া যায় এবং পুরাতন ও জটিল রোগেই কবিরাজী ঔষধ বেশী কার্য্যকরী হয়। কিন্তু পরীক্ষা করিলে একথার কোনও সার্থকতা দেখিতে পাওয়া যায়না। অতিসার, পাণ্ডু, গুল্ম, মূত্রাশয়পীড়া, মেহ, কাস, হৃদ্‌রোগ, আমবাত, বাতরক্ত, অম্লপিত্ত, বাধক, মৃতবৎসা প্রভৃতি কোন পীড়াতেই আয়ু-র্ব্বেদীয় চিকিৎসার ন্যায় জগতের কোন চিকিৎসায় সত্বর ও সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভের শক্তি নাই। হইতে পারে, একটি পুরাতন গ্রহণী, বাধক বা কাসের পীড়ার চিকিৎসা করাইতে হইলে একমাস বা ততোধিক কাল কবিরাজী ঔষধ সেবন করিতে হয়, কিন্তু অন্য যে কোন মতের চিকিৎসায় উক্ত কালের মধ্যে আরোগ্য করিবার ক্ষমতা দূরে থাক, বিশেষ উপকার পর্য্যন্ত হইবেনা—ইহা সর্ব্বদা দেখিতে পাওয়া যায়। এক মাত্র নবজ্বরের চিকিৎসায় কুইনাইন প্রয়োগে ডাক্তারি মতে শীঘ্র জ্বর রোধ হয়, কিন্তু প্রকৃত আরোগ্য সম্পাদন হয় না। কুইনাইন অপেক্ষা তীব্র ও অল্প সময়ে জ্বররোধকারক ঔষধ আয়ুর্ব্বেদে অভাব নাই, কিন্তু দোষ পরিপাক না করিয়া আয়ুর্ব্বেদ মতে জ্বর-রোধের চেষ্টা বিশেষভাবে নিষিদ্ধ হইয়াছে। দেশীয় চিকিৎসায় জ্বর বন্ধের চেষ্টা না করিয়া প্রথম হইতে দোষ হানিরই চেষ্টা করা হয়, ডাক্তারি মতে প্রথম হইতে জ্বর বন্ধের চেষ্টা করা হয়। এই চেষ্টার ফলেই দেশে লোকের প্রধান ব্যাধিই

এখন দাড়াইয়াছে—একমাত্র জ্বর। যদি ডাক্তারি চিকিৎসা আমাদের উপযোগী হইত, কুইনাইনের প্রকৃত জ্বরারোগ্য শক্তি থাকিত, তবে পুনঃ পুনঃ একই ব্যক্তির জ্বর হইবার কারণ ছিল না। যাঁহারা ৭।৮ দিন ধৈর্য্য রাখিয়া দেশীয় ঔষধে দোষের পরিপাকের পর আরোগ্যলাভ করেন, তাঁহাদের এইপ্রকার পুনঃ পুনঃ জ্বর হইতে দেখা যায়না। আয়ুর্ব্বেদে বিশেষভাবে উল্লেখ হইয়াছে যে, লালাস্রাব বমনভাব, হৃদয়ে অশুদ্ধি, অরুচি, তন্দ্রা, আলস্য, অপরিপাক, মুখের বিরসতা, গাত্রের গুরুতা, ক্ষুধার অভাব, মূত্রের আধিক্য স্তব্ধতা এবং জ্বরের প্রাবল্য—এইগুলি আমজ্বরের চিহ্ন। এই চিহ্ন যে কাল পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যাইবে, সেকাল পর্য্যন্ত বুঝিতে হইবে—জ্বরারম্ভক দোষের পরিপাক হয় নাই এই সমস্ত লক্ষণ বিদ্যমান থাকিতে জ্বররোধক ঔষধ প্রয়োগ আয়ুর্ব্বেদ মতে বিশেষভাবে নিষিদ্ধ হইয়াছে, এসময়ে মুখ্য অর্থাৎ জ্বর শান্তিকারক ঔষধ প্রয়োগ করিলে, পুনর্ব্বার জ্বর বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু ডাক্তারি চিকিৎসায় এই সমস্ত লক্ষণ বিদ্যমান সত্বেও জ্বর কম দেখিলেই কুইনাইন-সাহায্যে রোধ করিতে দেখা যায়। আয়ুর্ব্বেদ মতে অন্নলিপ্সা জ্বর মুক্তির একটি বিশেষ লক্ষণ। যাঁহারা আয়ুর্ব্বেদ মতে দোষের হানি করিয়া আরোগ্যলাভ করেন, তাঁহাদের জ্বরমুক্তির পর ক্ষুধা এবং খাইবার ইচ্ছা বেশ প্রবল হয়, কিন্তু কুইনাইনে যাঁহাদের জ্বররোধ হয়, তাঁহারা বহুদিন পর্য্যন্ত অরুচি ও অক্ষুধার কথা বলিয়া থাকেন। সুতরাং এপ্রকার আরোগ্যে আমাদের সার্থকতা কি থাকিতে পারে? কুইনাইন সাহায্যে জ্বর রোধ করা ভিন্ন যখন কোন ব্যাধিতেই দেশীয় চিকিৎসার ন্যায় নির্দ্দোষ ও সত্বর আরোগ্য অন্য কোন চিকিৎসায় দেখিতে পাওয়া যায় না, এবং একমাত্র এই চিকিৎসার অবলম্বনেই যখন প্রাচীন ভারতবাসিগণ বর্ত্তমানকাল অপেক্ষা নির্দ্দোষ আরোগ্য ও অক্ষুণ্ণ স্বাস্থ্যলাভ করিয়া দীর্ঘায়ু প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তখন কোন্ গুণে আমরা ঘরের অর্থ বিদেশে পাঠাইয়া সম্পূর্ণ বিজাতীয় চিকিৎসার আশ্রয় গ্রহণ করি, তাহা ভাবিবার সময় আসে নাই কি? আর যে কুইনাইনের জন্য আজ বিদেশীয় চিকিৎসার এত আদর, তাহা আমাদের কিরূপ উপযোগী তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিয়া আমার এসম্বন্ধে বক্তব্য শেষ করিব। ইহা আমাদের কথা নহে, বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের স্বাস্থ্য বিবরণীতেই প্রকাশ,—

"The Governor in council is also disappointed to find that despita the employment of Sub-Assistant Surgeons in the distribution of quinine in the District of Nadia and Murshidavad there has been no diminution in fever mortality but the reverse."

The Government Resolution on the Sanitary Reports for the year 1912.

ইহার মর্ম্ম,—নদীয়া এবং মুর্শিদাবাদ জেলায় ম্যালেরিয়া জ্বরে মৃত্যু সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায় কুইনাইন বিতরণের জন্য ডাক্তার নিযুক্ত করিয়া কোন ফল পাওয়া যায় নাই, উপরন্তু মৃত্যু সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

কবিরাজ শ্রীজীবনকালী রায়
বৈদ্যরত্ন।

সদ্বৃত্ত।

প্রথমাধ্যায়।

"শরীরেন্দ্রিয়সত্ত্বাত্মসংযোগবৎ-পুরুষ" অর্থাৎ জীয়ন্ত মানুষ নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারেনা,—হয় কিছু করে, নয় কিছু বলে অথবা কিছু ভাবে। সকলকেই কায়বাঙ্মানস-ব্যাপারে ব্যাপৃত রহিয়া জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হয়। কায়বাঙ্মনসী চেষ্টা সাধু হইলে, নিয়মিত কাল সুখায়ুঃ উপভোগ করিয়া অক্লেশে জীর্ণ-শরীর পরিত্যাগ পূর্ব্বক সদ্‌গতি লাভ করা যায়; অসাধু হইলে দুঃখায়ুঃ উপভোগ করিতে হয়, অকাল মৃত্যুর পরও দুঃখ ভোগের হাত হইতে নিস্কৃতি লাভ করা যায় না। সুখে সুদীর্ঘকাল সুখায়ুঃ উপভোগ করিতে হইলে পরম সাবধানে অসদাচরণ পরিত্যাগ করিয়া পরম যত্নে সদ্বৃত্তি পরায়ণ হওয়া উচিত। সদ্বৃত্তি পরায়ণ হইতে হইলে আদৌ সুশিক্ষা লাভ করিয়া, শিক্ষানুরূপ কর্ম্মাভ্যাস করিতে হয়। যে শিক্ষার গুণে ইহকালে আত্ম-হিতে রত রহিয়া পরহিত পরায়ণ হইয়া এবং জীবন-যাত্রার উপযোগী উপকরণ উপার্জ্জনে সামর্থ্য লাভ করিয়া, স্বচ্ছন্দে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করা যায়, পরন্তু পরকালে সদ্‌গতি লাভ ঘটে,—তাহার নাম সুশিক্ষা। সুশিক্ষিত, সৎকর্ম্মে অভ্যস্ত এবং অক্লিষ্ট পুরুষেরা যেরূপ আচরণ করিয়া জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করেন, তাহার নাম সদ্বৃত্ত।*

* সন্তিরিন্দ্রিয়-পঞ্চকেন মনসা বাচা কায়েন প্রবৃত্তেহস্মিন্ কর্ম্মনীতি তৎ সদ্বৃত্তং। কল্পকল্পতরুঃ।

এই প্রবন্ধে আমরা নানা শাস্ত্র হইতে কায়বাঙ্মানস সদ্বৃত্ত সঙ্কলন করিয়া, সেই সমস্তের বিশদ ব্যাখ্যা করিতে প্রয়াস পাইব। প্রথমতঃ শারীর সদ্বৃত্ত বলা যাইতেছে।

শারীর সদ্বৃত্ত।—বিধি বিহিত আহার, ব্যায়াম, ব্যবায়, নিদ্রা স্নানাদি, শৌচকর্ম্ম এবং অপরাপর বিধি বিহিত শারীরিক কর্ম্মকে শারীর-সদ্বৃত্ত বলে। শরীর পরিচালন করিয়া, এই সকল সদাচার সম্পাদন করিতে হয়, এইজন্য এই সমস্ত সদ্বৃত্তের সাধারণ নাম শারীর-সদ্বৃত্ত। তন্মধ্যে আহার শরীর ধারণের মূল। তজ্জন্য শারীর-সদ্বৃত্ত-নিচয়ের মধ্যে আহার অগ্রগণ্য। এই নিমিত্ত অগ্রে আহার-বিধি বলা যাইতেছে।

আহার—আহার প্রবিচার।—ঋষি বলিয়াছেন—"ইষ্টবর্ণ রস-গন্ধ-স্পর্শং বিধি বিহিতমন্ন পানং প্রাণিনাং প্রাণসংজ্ঞ-কানাং প্রাণ মাচক্ষতে কুশলাঃ। প্রত্যক্ষফলদর্শনাৎ। তদিন্ধনাৎ হ্যন্তরগ্নেঃ স্থিতিঃ। তৎসত্ত্বমূর্জ্জয়তি, তচ্ছশরীর ধাতুব্যূহ বল বর্ণেন্দ্রিয় প্রসাদ করং যথোক্ত মুপসেব্যমানং।"

ইহার ভাবার্থ এইরূপ;—যে সমস্ত বিধি বিহিত অন্ন-পানের বর্ণ মনোজ্ঞ, গন্ধ মনোরম, রস অভীপ্সিত এবং স্পর্শ প্রীতিকর, চিকিৎসা-কুশল পণ্ডিতগণ বলেন, প্রত্যক্ষ ফল-দর্শন হেতু, সেই সকল অন্ন পান, মনুষ্যের এবং অপর প্রাণিগণের প্রাণ স্বরূপ। তথাবিধ অন্নপান ইন্ধন (জাল দিবার কাষ্ঠ) স্বরূপ। সেই

ইন্ধন-যোগে অন্তরগ্নি সুস্থিত থাকে। যাবতীয় অন্ন পান যথা বিধানে নিষেবিত হইলে, জীবের সত্ত্ব সম্বর্দ্ধিত হয় এবং শরীরের রসাদি ধাতু সমূহ, বল, বর্ণ ও ইন্দ্রিয় সকল সুপ্রসন্ন হইয়া উঠে।

"প্রাণাঃ প্রাণভৃতামন্নং তদযুক্ত্যা হিনস্ত্যসূন্।" অর্থাৎ যুক্তিযুক্ত অন্ন প্রাণিগণের প্রাণ স্বরূপ। বিধি গ্রাহ্য না করিয়া, যথেচ্ছ আহারে প্রবৃত্ত রহিলে, নানা রোগ-ভোগ করিয়া অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হয়। তজ্জন্য সকলকেই সর্ব্বাগ্রে আহার-নির্ব্বাচনে মনোনিবেশ করিয়া, আহার-বিধি-পালন করা উচিত। নিম্নে প্রয়োজনীয় আহার-বিধি সকল উদ্ধৃত হইল।

১। হিতাশী স্যাৎ। যদাহার জাত মগ্নিবেশ। সমাংশ্চৈব শরীর ধাতূন্ প্রকৃতৌ স্থাপয়তি, বিষমাংশ্চ সমীকরোতি তদ্‌হিতং বিদ্ধিঃ তদ্‌বিপরীতস্ত্বহিতং।

হিতাহার পরায়ণ হইবে। হে অগ্নিবেশ! যে সমস্ত আহার, রস-রক্তাদি ধাতুগণের সমতা রক্ষা করে অর্থাৎ স্বস্থানেস্বমনে এবং স্বভাবে রাখে, কোন ধাতুর বৈষম্য ঘটিলে সমতা বিধান করে, তাহাকে হিতাহার বলিয়া জানিও।

সকল নর-নারীর প্রকৃতি একরূপ হয় না। কেহ বাত প্রকৃতি, কেহ পিত্ত প্রকৃতি, কেহ শ্লেষ্ম প্রকৃতি, কেহ কেহ বা মিশ্র প্রকৃতি। তজ্জন্য সকলের পক্ষে একই প্রকার আহার হিতকর হয়না। যাহার যেরূপ প্রকৃতি, তদ্বিপরীত গুণসম্পন্ন আহারই তাহার পক্ষে হিতাহার। যেমন পিত্ত প্রকৃতি পুরুষের পক্ষে পিত্তঘ্ন আহারই হিতাহার।

সকল ঋতুতে একই প্রকার আহার হিতকর হয় না। ঋতু-গুণ-বিপরীত-গুণ বিশিষ্ট আহারই হিত সাধন করে। যেমন বসন্ত ঋতুতে কফঘ্ন আহার, শরৎকালে পিত্তনাশক খাদ্য, বর্ষা ঋতুতে বায়ু-প্রশমন অন্ন-পানীয় ঋতুজন্য দোষ প্রশমন করিয়া স্বচ্ছন্দে শরীরের পুষ্টি সাধন করে।

দেশভেদে আহার্য্য দ্রব্য হিত সাধন করে। যে খাদ্য একদেশীয় লোকের পক্ষে হিতকর, হয় ত সেই দ্রব্য অন্য দেশীয় লোকে আহার করিলে বিসদৃশ ফল লাভ করে।

বয়ঃক্রম ভেদেও আহার্য্য দ্রব্যে ভেদ এবং পরিমাণ কল্পনা করিতে হয়। এই সকল বিবেচনা করিয়া প্রকৃতিসাত্ম্য, ঋতুসাত্ম্য, দেশসাত্ম্য, বয়ঃসাত্ম্য এবং অভ্যাসসাত্ম্য আহার করা উচিত। এই অনুচিত কার্য্যে উদাসীন হইলে আহার-দোষ জন্য ক্লেশভোগ করিতে হয়।

২। মাত্রাশী স্যাৎ। পরিমিত আহার গ্রহণ করিবে।

কথিত আছে—"আহার মাত্রা পুনরগ্নিবলাপেক্ষিণী। যাবদ্‌ধ্যস্যাশনমশিতমনুপহত্য প্রকৃতিং যথা কালং জরাং গচ্ছতি তাবদস্য মাত্রা প্রমাণং বেদিতব্যম্ভবতি।"

ইহার তাৎপর্য্য এইরূপ—সকলের পরিপাক শক্তি একরূপ নহে। কেহ বা সমাগ্নি, তজ্জন্য উপযুক্ত পরিমিতাহার সুখে জীর্ণ করিতে পারে। কোন কোন ব্যক্তি মন্দাগ্নি, তজ্জন্য তাহার পরিপাক শক্তিও দুর্ব্বল। কেহ বা তীক্ষ্ণাগ্নি, যা খায় তাহা সহসা জীর্ণ করিয়া ফেলে অথচ পুষ্টি তুষ্টি লাভ করে না। কেহ কেহ বিষমাগ্নি, কখন তাহার জঠরে খাদ্য দ্রব্য অনায়াসে পরিপাক পায়, কখনও বা সম্যক্ পরিপাক পায় না। তজ্জন্য ঋষি

বলিয়াছেন,—"আহার মাত্রাগ্নিবলাপেক্ষিণী।" যাহার যে পরিমিত আহারে শারীর ভাবের কোন ব্যতিক্রম ঘটেনা, অথচ যথাকালে জীর্ণ হইয়া যায়, সেই পরিমিত আহারই তাহার পক্ষে উচিত মাত্রাহার। আপনার পরিপাক শক্তির বলাবল বিবেচনা করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় হিতাহার সেবন করা উচিত।

অতিমাত্রাহার অহিতকর। হীনমাত্র আহারও অনিষ্ট সাধন করে। অল্পাহারে শরীরের ধাতু সকল সম্যক্ পুষ্টি লাভ করিতে পারেনা। তন্নিবন্ধন শরীর দুর্ব্বল হইতে থাকে। দুর্ব্বল শরীরে ক্রমশঃ নানা প্রকার রোগ দেখা দিতে থাকে। তজ্জন্য—"মাত্রাশী-স্যাৎ" এই বিধি সর্ব্বতোভাবে পরিপালন করা উচিত।

৩। কালভোজীস্যাৎ। যথাকালে ভোজন করিবে, কদাচ অসময়ে আহার করিবে না।

কথিত আছে—"যামমধ্যে ন ভোক্তব্যং যামযুগ্মং ন লঙ্ঘয়েৎ।" অর্থাৎ এক প্রহর বেলা না হইলে আহার করিবেনা; দুই প্রহরের মধ্যেই ভোজন করা কর্ত্তব্য। রাত্রিকালেও এক প্রহরের পর দুই প্রহরের পূর্ব্বেই আহার করা উচিত। অধুনা নানা কারণে এই উচিত কাজের বিঘ্ন ঘটিতেছে। বাধ্য হইয়া বহু লোককে অসময়ে আহার করিতে হয়। পূর্ব্বে এদেশে প্রাতঃকালে ও বৈকালে কাজের সময় নির্দ্দিষ্ট ছিল। দেশের উপযোগী প্রথাই ছিল। শিক্ষার্থী পূর্ব্বাহ্নে এবং অপরাহ্নে বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেন; রাজকার্য্যালয়েও দু'বেলা কাজ করিবার সময় নির্দ্দিষ্ট ছিল; শ্রমজীবীরাও দু'বেলা কাজ করিত। অধুনা অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং আর আর কাজের সময় পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। অনেক স্থলে শ্রমজীবীরাও দু'বেলা কাজ না করিয়া, পূর্ব্বাহ্ন ১০টা হইতে অপরাহ্ন ৫টা পর্য্যন্ত কাজ করে। এই নিয়মে বাধ্য হইয়া কাজের লোকদিগকে অসময়ে আহার করিতে হয়। বিশেষতঃ রেল-ষ্টিমারযোগে প্রতিদিন আবাস ক্ষেত্র হইতে কর্ম্মক্ষেত্রে যাইয়া যাঁহাদিগকে কাজ করিতে হয়, তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ অতি প্রত্যূষে কেহ কেহ বা ৭টা ৮টার মধ্যে আহার করেন। আহার-বিধি-লঙ্ঘনের ফলও হাতে হাতে ফলিতেছে। অজীর্ণ, অম্লাজীর্ণ এবং গ্রহণী প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হইয়া বহুলোক যৌবনে জরাগ্রস্ত হইতেছেন, অনেকে অকালে কালকবলে পতিত হইতেছেন। নিদান পরি-বর্জ্জন না করিলে আরোগ্যের আশা করা যাইতে পারা যায়না; কাজের দায়ে সকলে তাহা পারেননা। তজ্জন্য বিশিষ্ট চিকিৎসাও তত্তদ্ রোগের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা দুর্ঘট হইয়া উঠে।

৪র্থ। জীর্ণে হিতং মিতং চাদ্যাৎ। অর্থাৎ পূর্ব্বভুক্ত অন্ন-পানীয় সুজীর্ণ হইলে হিত এবং পরিমিত আহার করিবে।

"অজীর্ণে ভোজনং বিষং।" কথাটা অতি প্রসিদ্ধ। প্রায় সকলেই জানেন, অজীর্ণে ভোজন করা বিষপানের তুল্য অনর্থকর। বিধি জানিয়া পালন না করা অনর্থের হেতু। অনেকেই অজীর্ণে ভোজন করিয়া বিপদ্গ্রস্ত হইয়া থাকেন দেখিতে পাই। অজীর্ণে ভোজন বহুরোগের কারণ। তজ্জন্য আহারা জীর্ণের লক্ষণ উপলব্ধি না করিয়া কদাচ ভোজন করিবেনা।

উদ্‌গার শুদ্ধিরুৎসাহো বেগোৎসর্গ যথোচিতঃ। লঘুতা ক্ষুৎ পিপাসেচ জীর্ণাহারস্য লক্ষণং।" যে সময়ে উদ্‌গত উদ্‌গারের গুরুত্ব থাকেনা, নির্গত উদ্গারে কোন প্রকার গন্ধ অনুভূত না হয়, সঞ্চিত মল-মূত্র নিঃশেষে আপন পথে নিঃসৃত হইয়া যায়, শরীর বেশ হাল্‌কা বোধ হয় এবং ক্ষুধা তৃষ্ণা উপস্থিত হয়; তখন বুঝিবে যে,আহার সুজীর্ণ হইয়াছে। জীর্ণাহারের লক্ষণ বুঝিলে, ভোজন করা উচিত।

আমরা আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের কোন কোন স্থানে, অজীর্ণে ভোজন এবং অধ্যশন এই দুইটি কথার একত্র সমাবেশ দেখিতে পাই অধ্যশন শব্দের অর্থ পূর্ব্বদিনের আহারাজীর্ণে ভোজন। ৪ সংখ্যক নিষেধ বিধির অর্থ অধ্যশন করিবে না। যে স্থানে দুইটী কথার একত্র সমাবেশ থাকে, সেখানে অজীর্ণে ভোজনের অর্থ স্বতন্ত্র। তথায় অজীর্ণ শব্দের অর্থ পরিপাক যন্ত্রের কোন না কোন নির্ম্মাণ বা ক্রিয়া বিকার ঘটিত ব্যাধি বিশেষ। তাদৃশ অজীর্ণে চিকিৎসকের উপদেশ লইয়া আহার গ্রহণ করিতে হয়।

৫ম। উষ্ণমশ্নীয়াৎ। সুখোষ্ণ অন্ন ভোজন করিবে।

শূকধান্য এবং শমীধান্য জাত চা'ল, ডা'ল এবং নানা প্রকার কন্দ, মূল ফল, শাক, মাছ, মাংস প্রভৃতি আহরণ করিয়া আমরা খাদ্যোপযোগী অন্ন-ব্যঞ্জন প্রস্তুত করি। জল ও অনল যোগে অন্ন এবং উপযুক্ত পরিমিত তৈল, ঘৃত, লবণ আর নানা প্রকার মসল্লা মিশাইয়া ব্যঞ্জন সংস্কার করিতে হয়। অন্ন-ব্যঞ্জনার্থ গৃহীত দ্রব্যে যে কোন প্রকার শরীরের অনিষ্টকর জীবাণু অথবা অন্য কোন প্রকার অপদার্থের যোগ থাকে, বিধি বিহিত সংস্কার দ্বারা তাহা নষ্ট হইয়া যায়। যতক্ষণ উষ্ণ থাকে, ততক্ষণ তাহা নিঃশঙ্কচিত্তে আহার করা যাইতে পারে। জুড়াইয়া গেলে মক্ষিকা-সর্পণাদি দোষ-দুষ্ট হইতে পারে, পরন্তু দুর্জ্জর হইয়া উঠে। তজ্জন্যই সুখোষ্ণ অন্ন-ব্যঞ্জন ভোজন করা উচিত। পরন্তু উষ্ণ অন্ন তৃপ্তিকর, অগ্নিবলবর্দ্ধক, সুখপাচ্য, বায়ুর অনুলোমন এবং কফনাশক। কিন্তু অত্যুষ্ণ অন্ন-ভোজন করা উচিত নহে। কথিত আছে;—অত্যুষ্ণান্নং বলংহন্তি শীতশুষ্কঞ্চ দুর্জ্জরং। অতি ক্লিন্ন গ্লানি করং যুক্তিযুক্তং হি ভোজনং।

৬। স্নিগ্ধমশ্নীয়াৎ। স্নিগ্ধ অন্ন-পানীয় নিষেবন করিবে।

ঘৃত, তৈল, বসা এবং মজ্জা—এই চারি দ্রব্যের সাধারণ নাম স্নেহ। স্নেহযুক্ত ভক্ষ্যের নাম স্নিগ্ধাহার। শীতগুণযুক্ত দ্রব্যকেও স্নিগ্ধদ্রব্য বলে। মৎস্য, মাংস, বাদাম, পেস্তা এবং নারিকেল প্রভৃতি অনেক প্রকার দ্রব্য স্বভাবতঃ স্নিগ্ধ। দধি, দুগ্ধও স্নেহবদ্ দ্রব্য। সুশীতল পানীয় প্রভৃতিও স্নিগ্ধ দ্রব্যের মধ্যে পরিগণিত। যে সকল আহার্য্য দ্রব্য গুণবৎ অথচ পরিপাকের উপযোগী স্নেহ বিদ্যমান থাকে, সেই সকল আহার্য্য গ্রহণ করা উচিত। আবশ্যক হইলে ঘৃত, তৈল এবং মাখন যোগে রুক্ষান্নকে স্নিগ্ধ করিয়া লইয়া খাইতে হয়। সমস্ত পুরুষই স্নেহসাত্ম্য। তজ্জন্য স্নিগ্ধাহার সকলের পক্ষে হিতকর।

স্নিগ্ধাহার সুস্বাদু; স্নিগ্ধাগার উপযুক্ত মাত্রায় ভক্ষণ করিলে ঔদর্য্যাগ্নি সন্ধুক্ষিত হয়, মেদোমাংস মজ্জধাতু পরিপুষ্ট হয়, শরীরের বর্ণ উজ্জল হয় এবং মস্তিষ্ক পুষ্ট হয় ও সুস্থির থাকে।

৭। বীর্য্যাবিরুদ্ধ মশ্নীয়াৎ। অবিরুদ্ধ বীর্য্য আহার করিবে।

বীর্য্য দ্রব্যনিষ্ঠ ধর্ম্ম বিশেষ। "যেন কুর্ব্বন্তি তৎবীর্য্যং।" অর্থাৎ যাহার প্রভাবে কর্ম্ম সমাধা হয়, তাহার নাম বীর্য্য। বীর্য্য দুই প্রকার এক শীতবীর্য্য অপর উষ্ণবীর্য্য। কাহারও পক্ষে উষ্ণবীর্য্য অন্ন-পানীয় হিতকর, কাহারও শরীরে অহিতকর। শীতবীর্য্য দ্রব্যও শরীর ভেদে হিতাহিত সাধন করে। যেরূপ বীর্য্যবদ্‌দ্রব্য দেহের অনিষ্ট সাধন করে, তাহারই নাম বিরুদ্ধ বীর্য্যদ্রব্য। কোন কোন দ্রব্য স্বভাবতঃ বিরুদ্ধবীর্য্য, যেমন গোমাংস প্রভৃতি। দুই বা তদধিক দ্রব্য মিলিত হইলে কখন কখন সংযোগ-বিরুদ্ধ হয়। যেমন লবণ যোগে উষ্ণ দুগ্ধ, মৎস্য যোগে দুগ্ধ ইত্যাদি। বীর্য্য-বিরুদ্ধ দ্রব্য ভক্ষণ করিবেনা। করিলে কুষ্ঠ, বিসর্প এবং অন্ধতা প্রভৃতি রোগগ্রস্ত হইতে হয়।

৮। নাতিদ্রুত মশ্নীয়াৎ। অতিদ্রুত ভোজন করিবেনা।

চর্ব্ব্য, চুষ্য, লেহ্য এবং পেয় ভেদে আহার্য্য দ্রব্য চারি প্রকার। চতুর্ব্বিধ খাদ্যের কোন খাদ্যই অতিদ্রুত গলাধঃকরণ করিবেনা। বিশেষতঃ চর্ব্ব্য বস্তু ধীরে ধীরে চর্ব্বণ করিয়া খাইতে হয়। নতুবা খাদ্য পাচক রসে সহসা দ্রবীভূত হয় না, কোন খাদ্য আদৌ দ্রবীভূত হয় না। তজ্জন্য প্রথমতঃ দন্তদ্বারা ছেদ-ভেদ এবং পেষণ করিয়া, লালাসংজ্ঞক রসযোগে ক্লিন্ন করত গলাধঃকরণ করিলে কোষ্ঠস্থ পাচক রসে অনায়াসে পরিপাক পাইতে পারে। ভাত এবং রুটি প্রভৃতি শ্বেতসারযুক্ত খাদ্য উত্তমরূপে চর্ব্বিত এবং লালা সংযোগে মধুরীভূত হইলে খাওয়া উচিত। তাহা না হইলে ঐ সকল দ্রব্য ভালরূপে পরিপাক পায় না। অন্ন জল অতি দ্রুত নিষেবন করিলে বিমার্গগত হইয়া বিষম পীড়া উপস্থিত হইতে পারে। ভুক্তদ্রব্য আমাশয়ে সুস্থিত হয়না, তজ্জন্য পরিপাক কার্য্যে বিঘ্ন উপস্থিত হয়। ইত্যাদি কারণে অতিদ্রুত আহার করিবেনা।

৯। নাতি বিলম্বিত মশ্নীয়াৎ। অনাবশ্যক বিলম্ব করিয়া ভোজন করিবেনা।

দীর্ঘকাল বসিয়া খাইলে আহার গুরুতর হয়। আহার-সামগ্রী জুড়াইয়া যায়, তজ্জন্য দুর্জ্জর হইয়া উঠে।

১০। অজল্পন্নহসন্ তন্মনা ভুঞ্জীত। কথা বলিতে বলিতে, হাসিতে হাসিতে ভোজন করিবে না। তন্মনা হইয়া ভোজন করিবে।

"উচ্চারে মৈথুনে চৈব প্রস্রাবে দন্তধাবনে। স্নানে ভোজন কালে চ ষট্‌সু মৌনং সমাচরেৎ।" অর্থাৎ মলত্যাগ কালে, মৈথুন সময়ে, প্রস্রাব ত্যাগ কালে, দাঁত মাজিবার সময়, স্নান করিবার সময়ে এবং ভোজন কালে মৌনাবলম্বন করিবে। মৌনাবলম্বন করত মনোযোগ পূর্ব্বক উক্ত কার্য্যগুলি করিলে, কাজগুলি সুসম্পাদিত হয়। হাসিতে হাসিতে, কথা বলিতে বলিতে বা অন্যমনে খাইলে চর্ব্বণের ব্যাঘাত ঘটে, অন্ন-পানীয়ের স্বাদ-গ্রহণে সুপ্রীত হওয়া যায় না, ভক্ষ্যদ্রব্যের সহিত যদি অন্য কোন দ্রব্যের মিশ্রণ থাকে, তাহা বুঝা যায় না, অন্নপানীয় বিপথগামী হইতে পারে এবং অপরিমিত অন্ন উদরস্থ হইবারও সম্ভাবনা।

১১। ইষ্টেদেশেঽশ্নীয়াৎ। মনোজ্ঞস্থানে ভোজন করিবে।

অনাবৃত, অপরিস্কৃত এবং দুর্গন্ধযুক্ত কদর্য্য স্থানে বসিয়া আহার করা অতিগর্হিত কর্ম্ম।

তাদৃশ স্থানে দৃশ্য এবং চক্ষুর অগোচর বহুতর কীট-পতঙ্গ সঞ্চরণ করে। তৎসম্পর্কে অন্ন-জল দূষিত হয়। হয় ত চক্ষুর অগোচর নানা রোগের হেতু বিবিধ প্রকার দোষবীজ জীবাণু অন্নের সহিত মিশিয়া উদরস্থ হয়। অনিষ্ট দেশে বসিয়া আহার করিলে মনও অপ্রসন্ন হইয়া উঠে, পরন্তু ঘৃণার উদয় হয়। মনো-বিষাদ বহুরোগের কারণ। তজ্জন্য সুপরিস্কৃত এবং মনোজ্ঞ গন্ধ বিশিষ্ট স্থানে আহার করা উচিত। সুশ্রুত বলেন—ভোক্তারং বিজনে রম্যে নিঃসম্পাতে শুভে শুচৌ। সুগন্ধি পুষ্প রচিতে সমে দেশেঽথ ভোজয়েৎ।"

১২। তথেষ্ট সর্ব্বোপকরণশ্চাশ্নীয়াৎ। ভোজনের সমস্ত উপকরণই মনোজ্ঞ হওয়া উচিত।

১৩। নাশ্নীয়াৎ সন্ধিবেলায়াং। রাত্রি-দিবার সন্ধিক্ষণে ভোজন করিবেনা।

অপরাহ্লে সমস্ত নরনারীর শরীরে স্বভা-বতঃ বায়ু প্রকুপিত হয়, রাত্রিকালের প্রথম প্রহর শ্লেষ্মা প্রকোপের প্রাকৃত সময়। সন্ধ্যাকালে কালের স্বভাবানুসারে বায়ু প্রশমিত হয়, শ্লেষ্ম-ধাতু প্রকুপিত হইতে থাকে। রাত্রিকালের শেষ যাম বায়ু প্রকোপের সময়। প্রত্যুষে বায়ু প্রশমিত হয় এবং শ্লেষ্মা প্রকুপিত হইতে আরব্ধ হয়। উভয় সন্ধি কালে, উভয় দোষের প্রকোপ-প্রশমন সন্ধিস্থলে পরিপাক যন্ত্র—আমাশয়াদি সম্যক্ সক্রিয় থাকে না, শরীর কিঞ্চিৎ অবসন্ন এবং চিত্ত ন্যূনাতিরেক পরিমাণে অপ্রসন্ন হইয়া উঠে। তজ্জন্য সেই সেই সময়ে আহার করা অনুচিত। যখন কফ প্রশমিত হয়, শরীর এবং মনঃ সুস্থির হয়, ক্ষুধা-তৃষ্ণা উপস্থিত হয়, তখনই আহার করিবে।

১৪। উদ্ধৃত-স্নেহং ন ভুঞ্জীত। স্নেহবদ্ দ্রব্যের, স্নেহ মন্থন করিয়া উঠাইয়া ফেলাইয়া অথবা স্নেহ নিষ্পীড়ন করিয়া সেই দ্রব্য ভক্ষণ করিবেনা। যেমন মাখন তোলা দুধ, তিলের খইল প্রভৃতি।

অধুনা তিলের খইল, কেহ আহার্য্য-রূপে ব্যবহার করেননা। পূর্ব্বে নিষ্পীড়িত স্নেহ তিলকল্ক খাদ্য রূপে ব্যবহৃত হইত। মাখন তোলা দুধ নিঃসার পানীয়, তজ্জন্য শরীরের পুষ্টি এবং মনের তুষ্টি বিধান করে না। তবে রোগের কোন কোন অবস্থায় মাখন তুলিয়া দুধ পথ্য দিতে হয়। ঘোল এবং তক্র উদ্ধৃত স্নেহ হইলেও অনেক স্থলে এবং অনেক রোগে উত্তম পথ্য।

১৫। নাতি সৌহিত্যমাচরেৎ। দিবা ভাগে, বিশেষতঃ রাত্রিকালে অতি তৃপ্তি পূর্ব্বক ভোজন করিবে না।

"জঠরঃ পূরয়েদর্দ্ধমন্নৈর্ভাগং জলেন চ।
বায়োঃসঞ্চলনার্থঞ্চ চতুর্থমবশেষয়েৎ।"

ভোজনকালে উদরের অর্দ্ধভাগ অন্নে, এক চতুর্থাংশ জলীয় দ্রব্যে পূরণ করিয়া অবশিষ্ট পাদাংশ বায়ুর চলাচলের জন্য খালি রাখিবে। এই নিয়ম অতিক্রম করিয়া ভোজন করিলে তাহাকে সৌহিত্য বলে।

দিবাভাগে গুরু ভোজন করিলে, রাত্রি-কালে অনশনে থাকা উচিত। সকলেরই স্মরণ রাখা উচিত যে, "একাহারঃ সুখ-জরানাং" অর্থাৎ ভুক্ত অন্ন অনায়াসে সুজীর্ণ করাইবার যতগুলি উপায় আছে, তন্মধ্যে একাহারই শ্রেষ্ঠ উপায়।

১৬। শয়নস্থো ন ভুঞ্জীত। শুইয়া আহার করিবে না।

একই ভাবে শরীরের অবয়ব বিন্যাস

করিয়া সকল কাজ করা চলেনা, করাও উচিত নহে। কার্য্য-বিশেষে অঙ্গের স্থিতি-বিশেষের প্রয়োজন। আহারে, ব্যায়ামে, মৈথুনে, গমনে, উপবেশনে এবং শয়নে বিশেষ বিশেষ ভাগে অঙ্গ-বিন্যাসের আবশ্যক। যে কাজের জন্য যেরূপ অঙ্গবিন্যাস করা উচিত, তাহার ব্যতিক্রম করিয়া কাজ করিলে শরীরের বাধা উপস্থিত হয়। বাধামাত্রেই পীড়াদায়ক। তজ্জন্য যথা-প্রয়োজন সুস্থিত না হইয়া কাজ করিবেনা। কাজে বাধা না পাওয়া এবং কষ্টানুভূতি না হওয়াও সুস্থিতির লক্ষণ। সুখাশনে সুস্থিত হইয়া আহার করিলে আহার্য্য দ্রব্যও আমাশয়ে সুস্থিত হয় এবং আহার-পরিপাকার্থ পাচক রস নিঃসরণেরও কোন বাধা হয়না।

১৭। আত্মানমভিসমীক্ষ্য ভুঞ্জীত সম্যক্। এই পরিমিত এবং এই প্রকার আহার পানীয় আমার শরীরের হিত সাধন করে; এতদতি-রিক্ত পরিমাণে আহার আমার পক্ষে অনিষ্ট-কর, পরন্ত এবম্বিধ আহার আমার শরীরের অনুকূল নহে। ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করিয়া আহার করা উচিত।

"ব্যক্তি নিয়তত্ব" সম্ভবতঃ অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। এমন লোক আছেন, ডিম খাইলে তাঁহার বমন হয়। অথচ অনেক লোক ডিম খাইয়া অনায়াসে পরিপাক করিতে পারেন এবং ডিম্ব ভক্ষণ জন্য ফলও লাভ করেন। ডিমের ন্যায় আরও অনেক খাদ্য ব্যক্তি-বিশেষের অনিষ্ট সাধন করে। কিন্তু জনসাধারণের পক্ষে অহিতকর হয়না। ডিম্ব প্রভৃতি ভোজন জন্য বমনাদি "ব্যক্তি নিয়তত্ব।" "ব্যক্তি নিয়তত্বের" অপর নাম "প্রতি পুরুষত্ব।" বিশেষ বিবেচনা করিয়া, প্রতিপুরুষত্ব অবধারণ করিয়া আহার্য্য নির্ব্বাচন পূর্ব্বক আহার করা উচিত।

'ব্যক্তি নিয়তত্বের' ন্যায় 'জাতি-নিয়তত্বও' প্রমাণসিদ্ধ। একজাতির সমস্ত আহার অপর জাতির পক্ষে হিতকর হয়না। যাঁহারা উভয় নিয়তত্ব অগ্রাহ্য করিয়া অন্য পুরুষের বা অপর জাতির অনুকরণে আহার করেন, তাঁহাদিগকে বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে দেখা যায়। তজ্জন্য আত্ম-সাত্ম্য এবং জাতিসাত্ম্য অন্ন জল গ্রহণ করা উচিত।

১৮। নাশ্নীয়াৎ ভার্য্যয়া সার্দ্ধং। ভার্য্যার সঙ্গে ভোজন করিবেনা। স্ত্রী-পুরুষে এক সঙ্গে আহার করিতে থাকিলে—"অজল্পন্নহসন্ তন্মনা ভুঞ্জীত।" এই বিধি নিশ্চয়ই লঙ্ঘন করিতে হয়। আরও দোষ ঘটে। চরক বলেন—

"কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহের্ষা-হ্রী-শোক-মনোদ্বেগ ভয়োপতপ্তেন মনসা বা যদন্নপান মুপযুজ্যতে তদপ্যামমেব প্রদুষয়তি।" অর্থাৎ কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, ঈর্ষা, লজ্জা, শোক, অন্যবিধ মনোদ্বেগ এবং ভয়যুক্ত হইয়া যে সকল অন্ন-পান সেবন করা যায়, তাহা পরিপাক পায় না, আমাবস্থায় রহিয়া শরীরকে দূষিত করে। স্ত্রীর সহিত একাসনে এক ভাজনে বসিয়া আহার করিবার সময় অনেকের মনঃ কামমোহিত হইতে পারে। তজ্জন্য অষ্টাদশ সংখ্যক বিধি পালন করা উচিত।

১৯। না প্রক্ষালিত পাণি-পাদ বদনোহন্ন মাদদীত। হাত, পা, এবং মুখ ভালরূপে না ধুইয়া আহার করিবেনা।

উক্ত বিধির যুক্তিবাদ অনাবশ্যক। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হইয়া আহার করার

যৌক্তিকতা সকলেই অবগত আছেন। বিশেষতঃ ভোজনের অব্যবহিত পূর্ব্বে হাত-মুখ ভাল করিয়া ধুইয়া লইতে হয়। নখের মধ্যে কত জীবাণু আশ্রয় গ্রহণ করে, অনু-বীক্ষণ দ্বারা দেখিলে তাহা প্রত্যক্ষ করা যাইতে পারে। তজ্জন্য আহারের পূর্ব্বে হস্ত-নখ-মল ভাল করিয়া ধুইয়া লইতে হয়। মুখমধ্যে যে সকল মল সঞ্চিত থাকে, তাহা অন্নপানের সহিত উদরস্থ হইলে, নানা প্রকার অনিষ্ট ঘটিতে পারে।

২০। আদ্র্ পাদস্তু ভুঞ্জীত। ভিজা-পা'য়ে ভোজন করিবে।

ভগবান্ মনু বলেন—আদ্র্ পাদস্তু ভুঞ্জানঃ শতং বর্ষাণি জীবতি।"

আরও কথিত আছে—"আদ্র্ পাদস্তু ভুঞ্জানো দীর্ঘমায়ুরপাপ্নুয়াৎ।"

কি জন্য ভিজা পায়ে ভোজন করিলে আয়ুবর্দ্ধিত হয়, তাহা আমরা অদ্যাপি অবগত হইতে পারি নাই। তবে আপ্তোপদেশের তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিলেও প্রতিপালন করা উচিত।

শ্রীশীতলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কবিরত্ন।

মহিলাগণের চিকিৎসা শিক্ষা

(অগ্নিদগ্ধে ব্যবস্থা)

সে অনেকদিনের কথা। আমার স্বামী তখন মুর্শিদাবাদে নবাব-সরকারে চাকরি করিতেন। এখনকার মত পরিবার লইয়া বিদেশবাসী হইবার ব্যবস্থা তখন 'চাকুরে পুরুষ'দের মধ্যে বড় প্রচলিত হয় নাই। স্বামীও আমার সেই পন্থা অনুসরণ করিয়াছিলেন। তিনি মুর্শিদাবাদে চাকরি করিতেন, মাসটি গত হইলে যাহা পারিতেন, পাঠাইয়া দিতেন, আমি একটি ছেলে, একটি মেয়ে এবং এক বিধবা পিসীমাকে লইয়া সুখে-দুঃখে দিন অতি-বাহিত করিতাম। আমার বয়স হইয়াছিল তখন আঠার' বৎসর। ছেলেটি যেটের কোলে তিন বছরে পা দিয়াছিল, মেয়েটি এক বছর উত্তীর্ণ হইয়াছিল মাত্র,—হামাগুড়ির সহিত তখন কখন কখন দাঁড়াইয়া উঠিবার চেষ্টা করিত। আর পিসীমা,—তাঁহার বয়সটা যে কত হইয়াছিল, তাহা তাঁহাকে দেখিয়া বুঝিবার শক্তি আমার ছিলনা, তিনি বলি-তেন, তিন কুড়ি পার হইয়া আর তিন বৎসর হইয়াছে, কিন্তু সাত বৎসর আমি পিতৃগৃহ হইতে আমার এই নূতন সংসারে আসিয়াছি, আমি ইহার মধ্যে তাঁহার বয়সের পরিবর্ত্তন কখন বুঝিতে পারি নাই। তাঁহার সঙ্গিনীরা তাঁহাকে পরিহাস করিয়া এই জন্যই বোধ হয় বলিত—"তারা! তুই চিরকালই কুমারী থাকিলি।" পিসীমার নাম ছিল তারাসুন্দরী। এখনকার মত নামের ভিতর রূপ-মাধুরী বুঝাইবার চেষ্টা তখন হয় নাই। যাহাহউক পিসীমা তারাসুন্দরীর রূপ-রাশির ভিতর হইতে তেষট্টি বৎসর বয়সেও যে সৌন্দর্য্যের

দিব্য-জ্যোতিঃ বাহির হইত, তাহার নিকট রূপ-গর্ব্ব-মোহিতা অনেক সুন্দরী যুবতীও তখন হারি মানিতেন।

সন্ধ্যায় রাগোদ্দিপ্ত-সূর্য্যকিরণ যখন পশ্চিম গগনে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, সমস্ত দিনের কর্ম্ম-নিরত-শ্রান্ত-হৃদয়ে তাবৎ প্রাণীই যখন আলস্যের আবিলতাটুকু সম্বল করিয়া স্ব স্ব কক্ষ প্রান্তে ধাবমান হইয়াছে, এক কথায় কার্য্য-কুশলা-প্রকৃতিরাণী যে সময় বিশ্রাম-সুখ-লালসায় স্তব্ধ ভাব অবলম্বনের প্রয়াস করিতেছেন, ঠিক সেই সময় একদিন আমি রন্ধনগৃহে বসিয়া ছেলে মেয়ে এবং নিজের জন্য উননের জ্বালে ফুঁ পাড়িতেছিলাম। পিসীমা দাওয়ায় বসিয়া হরিনামের মালা লইয়া জপ করিতেছিলেন। আমাকে উদ্দেশ করিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন,—"বউমা, এ বড় অন্যায় কথা, এই ভর্ সন্ধ্যেবেলা রান্না-বান্নার কাজে কখন ব্যস্ত থেকনা মা—এ তোমায় কত দিন ব'লেছি। এ সময়ট 'রাক্ষসী বেলা'। এ সময় রান্না-বান্না কি খাওয়া-দাওয়ার কার্য্যটা ভুলে যেতে হয়। তোমায় এত ক'রে বলি, তুমি কিছুতেই শিখ্‌লেনা!'

আমি একটু অপ্রতিভ হইলাম,—আমি একালের শিক্ষা তো পাই নাই, সুতরাং কেহ তিরস্কার করিলে অপ্রতিভ হইতে হয়—ইহা আমার আবাল্য অভ্যাস ছিল। অপ্রতিভ হইয়া আমি বলিলাম,—"এমন কর্ম্ম আর ক'রবনা পিসীমা,—আজ যা' হ'ল তা' হ'ল। যাই এখন ঘর-দুয়োরে সন্ধ্যে দিই গে।" এই বলিয়া আমি রন্ধন-গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলাম।

সন্ধ্যা জ্বালিয়া সকল ঘর গুলিতে প্রদীপ লইয়া দেখাইলাম। শাঁখ বাজাইলাম, ঘরে নারায়ণ শিলার অধিষ্ঠান ছিল, গললগ্নী কৃত-বাসে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া স্বামীর মঙ্গল কামনা করিতেছি, এমন সময় শব্দ পাইলাম,—খুকীটি আমার বিকট স্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল। কিন্তু চীৎকার করিয়াই সে থামিয়া গেল, আর কোন সাড়া শব্দ পাইলাম না। নারায়ণ শিলাকে প্রণাম করিয়া তুলসী তলায় প্রণাম করিতে যাইতেছি এমন সময় তাড়াতাড়ি পিসীমা ডাকিলেন,—"বউমা, শিগ্‌গির্ এস, খুকী পুড়িয়া গিয়াছে।"

রান্নাঘরে যখন উননে ফুঁ পাড়িতেছিলাম, তখন খুকীটি মাই খাইতে-খাইতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। আমি তাহাকে সেই ঘুমন্ত অবস্থায় এক পার্শ্বে শোয়াইয়া প্রদীপ জ্বালিতে আসিয়াছিলাম। ইহার মধ্যে খুকী উঠিয়া হামাগুড়ি দিয়া উননের পাশে গিয়া আগুণের মধ্যে হাত ঢুকাইয়া দিয়াছে, তাহাতেই এই বিভ্রাট। আমি তাড়াতাড়ি ছুটিয়া গেলাম।

গিয়া দেখিলাম,—ডান হাতখানির আঙ্গুল গুলি এবং তলদেশের সকলটুকু পুড়িয়া গিয়াছে, ফোস্কা হয় নাই, কিন্তু যন্ত্রণা এতই বেশী হইয়াছে যে, সেই যন্ত্রণার ঘোরে তাহার অজ্ঞানতা আসিয়া পড়িয়াছে। ভাবিলাম, কি সর্ব্বনাশই হইল। অধীর হইয়া পিসী-মাকে বলিলাম,—"পিসীমা উপায় কি হইবে?" আমার দুই চক্ষু জলে ভাসিয়া গেল।

পিসীমা বকিয়া উঠিলেন। বলিলেন,—"মিছামিছি চীৎকার ক'রে সব গুলিয়ে দিস্‌নে। তুই কোলে তুলে মাই মুখে দিতে চেষ্টা কর্ দেখি। তা'র পর আমি উপায় ক'রে দিচ্ছি।"

আমি খুকীকে ক্রোড়োপরি তুলিয়া লইলাম। কিন্তু কাঁদিতে কাঁদিতে আবার বলিলাম,—"মাই কা'কে দেবো পিসীমা! মাই

খা'বার শক্তি কি আর আছে?" পিসীমা বলিলেন,—"শক্তি এখনি হ'বে, তুই মাই মুখে দেবার চেষ্টা কর্‌তো। আর এই পাখা খানা নে, পাখা খানা নিয়ে আস্তে আস্তে বাতাস কর্।" আমি তাহাই করিতে লাগিলাম। পিসীমা ইত্যবসরে করিলেন কি,—রান্নাঘরের একপার্শ্বে কতকগুলি আলু ছিল, শিলের নুড়িটি লইয়া তাহার কতকগুলি ছেঁচিয়া আনিয়া অগ্নিদগ্ধ স্থানে লাগাইয়া তাহার উপর এক টুক্‌রা পরিষ্কার ধপ্‌ধপে নেকড়া আনিয়া এক ফর্‌দা করিয়া আস্তে আস্তে জড়াইয়া দিলেন। আমি বলিলাম,—পিসীমা, একি হইতেছে, ডাক্তার-বড়ঠাকুরকে ডাক্‌লে ভাল হ'তনা।" পিসীমা বলিলেন,—"ডাক্তার এসে কি মন্তরে ভাল ক'রে দেবে নাকি! ডাক্তার-বদ্দিরাও তো এই সবই ব্যবস্থা ছাড়া আর কিছুই ক'র্‌তে পা'র্‌বেনা। আর তোমার ডাক্তারবড়ঠাকুরের বাড়ীও তো এ পাড়ায় নয়। তাঁ'কে খবর দিলে তাঁ'র আস্‌তে যে সময় লাগবে,—সে সময়টা চুপ ক'রে ব'সে থেকে তোমার মত কান্নাকাটি না ক'রে—যা' দু' একটা টোট্‌কা-মুষ্টিযোগ জানি, তা'র ব্যবস্থা ক'র্‌লে লাভ ভিন্ন তো ক্ষতি নাই। দেখ্‌না এতে কি হয়।

বাস্তবিক পিসীমার ব্যবস্থা ব্যর্থ হইল না। মাই মুখে দিতে-দিতে, বাতাস করিতে করিতে খুকীর অজ্ঞানের ভাব অপনোদিত হইল। নেকড়া খুলিয়া হাতের পাতা এবং আঙ্গুল কয়টির দিকে চাহিয়া দেখিলাম—একটিও ফোস্কা হয় নাই। আমি খুকীকে চুম্বন করিয়া পিসীমার দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিলাম।

খুকী যখন মাই খাইতে খাইতে শান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িল, তখন আমি বলিলাম, "পিসীমা, এ আলু পোড়া লাগাইলে আগুণে পোড়ার যন্ত্রণার শান্তি হয়—এ কথা তুমি কোথায় শিখিয়াছিলে,—এ যে অপূর্ব্ব ঔষধ।"

পিসীমা একটু হাসিয়া বলিলেন,—এখন এ সকল ব্যবস্থা লোপ পাইতেছে বউমা। এ সকল ব্যবস্থা আগে শুধু আমিই শিখিতাম না,—আমার বয়সের অনেক স্ত্রীলোকই আমার মত এ সকল টোট্‌কা-ওষুদ বৃদ্ধা স্ত্রীলোকদের কাছ থেকে মন দিয়ে শিক্ষা ক'র্‌ত। সে শিক্ষায় সময় অসময়ে বড়ই সুন্দর ফল ফ'লত।

আমি বলিলাম,—"আচ্ছা পিসীমা, তা' যেন হ'ল, কিন্তু আলু তো আমাদের দেশের জিনিস নয়; আমাদের দেশে আগে রাঙ্গা আলু ছিল, আলু বা গোল আলু তো আমাদের দেশে ইংরাজ জাতির আসার পর লোকে দেখ্‌তে পেয়েছে। তা' হ'লে আমাদের দেশে যখন আলু ছিলনা, তখন এ রকম পুড়িয়া গেলে কি দেওয়ার ব্যবস্থা হ'ত পিসীমা।"

পিসীমা আবার হাসিলেন। হাসিয়া বলিলেন,—কি দেওয়া হ'ত? এক আলু দেখেই ভাব্‌লে বুঝি বউমা—এর মতন ওষুদ আর নেই! এ রকম ওষুদ আমাদের আনাচে-কানাচে যে কত প'ড়ে র'য়েছে, তা'র সংখ্যা করা যায় না।"

রান্নাঘরের দাওয়ার নীচে এক পার্শ্বে কতকগুলি পাথরকুচির গাছ ছিল। পিসীমা কথা শেষ করিয়া আমাকে বলিলেন,—ওরই দু'চারটে পাতা তুলিয়া আনগে দেখি।" আমি তুলিয়াআনিলাম। পিসীমা বলিলেন—"ঈশ্বর না করুন, এরূপ ঘটনা যদি আর কখন হয়,—তা' হ'লে এই হিমসাগর বা পাথরকুচির পাতা থেঁতো ক'রে লাগিয়ে দিলে তখনি যন্ত্রণার

নিবৃত্তি হ'বে জেনে রেখে দাও। এও একটা ভাল ওষুদ।"

আমি চুপ করিয়া থাকিলাম। পিসীমা আবার বলিতে লাগিলেন,—"ডিমের যে সাদা অংশ সে জিনিসটাও পোড়া ঘায়ের মহৌষধ। পুড়িয়া যাইবা মাত্র ঐ সাদা অংশটা লাগাইলে তখনি যন্ত্রণার শান্তি হইয়া থাকে।"

আমি বলিলাম—"ডিম সব সময় কোথায় পাওয়া যা'বে? ডিম তো আর সকল সংসারে সব সময় থাকে না! আর একটা কথা, তুমি যে হিমসাগরের কথা ব'ল্‌লে, সে হিমসাগর বা পাথরকুচিও যদি সব সময় পাওয়া না যায়? যা'রা সহরে থাকে, তা'দের পক্ষে তো এটিও যখন-তখন পা'বার উপায় নেই! তা'রপর যদি আলুও ঘরে না থাকে? আসল কথা, তুমি, যে তিনটি জিনিষের কথা ব'ল্‌লে, এই তিন-টের কোন একটাও যদি তখনি না পাওয়া যায়, তা' হ'লে কি ব্যবস্থা করা উচিত?"

পিসীমা বলিলেন,—"তা'হ'লে খানিকটা মধু নিয়ে আস্তে আস্তে লাগিয়ে দিলে যন্ত্রণার নিবৃত্তি হ'বে। ছেলে পিলে নিয়ে যা'রা ঘর-সংসার ক'রে, হঠাৎ দরকার হ'লে ওষুধ খাওয়াবার জন্য তা'দের সকলের ঘরেই একটু আধটু মধু থাকে। আর যদি বল,—তাও যদি না পাওয়া যায়, তা'হ'লে খানিকটা মাই-য়ের দুধ গেলে নিয়ে লাগিয়ে দিও—উপকার হ'বে। আরও যদি বল, স্তনের দুধও যদি সে সময় শুকিয়ে যায়,—তা'হ'লে মুখের থুঁতু তো আর শুকায় না, সেই থুঁতু খানিকটা লাগিয়ে দিও, তা'তেই উপশম বুঝ্‌তে পা'র্‌বে।"

পিসীমা আবার বলিলেন,—"পুঁইশাকের পাতার রস, ঘরের চা'লের পচা খড়, ইংরাজী কালী, ছাগল দুগ্ধ—এ সকলের যেটি পাওয়া যায়, মাখাইয়া দিলেও যন্ত্রণার উপশম হয় আর ফোস্কা হয় না। এগুলিও ভাল ক'রে মনে রেখ।"

আমি পিসীমার বিচক্ষণতা দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম। বলিলাম,—"গৃহস্থলীর সকল বিষয়ের শিক্ষাতেই তো তুমি আমাকে শিষ্যা করিতেছ পিসীমা। এই টোট্‌কা-শিক্ষার শিষ্যা করিবে?"

পিসীমা বলিলেন,—"করিব। কিন্তু তুমি তাহার বিনিময়ে আমাকে কি দিবে বল।"

আমি বলিলাম,—— "আমি আর কি দিব,—আমি রোজ রোজ তোমার মাথার পাকা চুল তুলিয়া দিব। দিনের বেলায় পাকা চুল তুলিয়া দিব, আর রাত্রে যখন শুইবে, তখন পায়ের তলায় তেল মালিস করিয়া দিব, গ্রীষ্ম বোধ হইলে পাখা লইয়া বাতাস করিব। আমি এই করিতে পারি, এ ছাড়া আমার আর কিছু তো ক্ষমতা নাই পিসীমা।"

চিরসুন্দরী-পিসীমা আমার কথার ভঙ্গিমা দেখিয়া হাসিয়া ফেলিলেন। হাসিয়া বলি-লেন,—"আচ্ছা শিখাইব"। আমি আশ্বস্তা হইলাম।

বহুমূত্র ও বাঙ্গালী।

—:*:—

ম্যালেরিয়ার চেয়েও "বহুমূত্র" বাঙ্গালীর পরম শত্রু। ম্যালেরিয়ায় ছোট, বড়, ভদ্র, অভদ্র, শিক্ষিত, অশিক্ষিত—সকল রকম লোক মরে, কিন্তু বহুমূত্র রোগে যাঁহারা মরেন, তাঁহারা এ দেশের গণ্যমান্য সম্ভ্রান্ত বাছা বাছা লোক। যে সকল মহাত্মা দীর্ঘজীবী হইলে বাঙ্গালীর মুখ উজ্জ্বল হইত, বাঙ্গালার সমাজ শ্রীসম্পন্ন হইত,—এই কালোপম কঠোর রোগ দেশের সেই অমূল্য রত্নগুলি একে একে আত্মসাৎ করিতেছে! বহুমূত্রের আক্রমণে বঙ্গ জননীর ক্রোড় শূন্য হইয়া পড়িতেছে, সমাজের অস্থিপঞ্জর খসিয়া যাইতেছে, ঘরে ঘরে আর্ত্তনাদ ও মর্ম্মভেদী হাহাকার উঠিতেছে! যাঁহাদের লইয়া দেশের গৌরব,—যাঁহাদের ভরসায় বিদেশীয়কে আমরা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করি, বহুমূত্র রোগে তাঁহাদের শোচনীয় অকাল মৃত্যু ঘটিতেছে। বহুমূত্র রোগ শুধু আমাদের দেশেরই যে ক্ষতি করিতেছে এমন নহে, বহুমূত্রের প্রভাবে আমাদের ভাষা-জননী ও সাহিত্যেরও সর্ব্বনাশ হইতেছে। আমাদের বড় বড় কবি, বড় বড় দার্শনিক, বড় বড় সাহিত্যিক—বহুমূত্র রোগেই প্রাণ হারাইতেছেন। দুঃখের বিষয়—জানিয়া শুনিয়াও এ বিষয়ের জন্য কাহাকেও চিন্তিত দেখিতেছি না! কেহই এ মহা অনিষ্টের প্রতিকারের চেষ্টা করিতেছেন না।

বহুদিন হইতেই আমরা দেখিয়া আসিতেছি—সাহিত্যসেবী, হাকিম, উকীল, চিকিৎসক—অর্থাৎ যাঁহাদিগকে অতিরিক্ত মস্তিষ্ক চালনা করিতে হয়, তাঁহারাই এ রোগে আক্রান্ত হ'ন। ইহার কারণ,—তাঁহারা শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারেননা। দেশ-হিতকর কার্য্যে লিপ্ত হইতে হইলে, দীর্ঘ-জীবনের আবশ্যকতা আছে। দীর্ঘজীবী না হইলে ব্রত-ধারণ সার্থক হয়না। এই জন্য দেশের বিদ্বান ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের প্রতি আমার বিনীত অনুরোধ—তাঁহারা যেমন মানসিক পরিশ্রম করিবেন, সেই সঙ্গে কিছু কিছু শারীরিক-পরিশ্রমও অভ্যাস করিবেন। তাহা হইলে আর বহুমূত্র রোগ হইবার ততটা আশঙ্কা থাকিবেনা।

বহুমূত্র—প্রতিষেধ যোগ্য রোগ। যিনি মানসিক পরিশ্রমের সহিত কায়িক-পরিশ্রমের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিতে পারেন, এবং স্বাস্থ্যকর নিয়মগুলি প্রতিপালন করেন, এ রোগ কখনই তাঁহাকে আক্রমণ করিতে পারে না।

বিশেষতঃ যে রোগ একবার দেহে আশ্রয় গ্রহণ করিলে, দেহ অন্তঃসার-শূন্য ও মৃত্যু-ভঙ্গুর হইয়া পড়ে, সে রোগ যাহাতে শরীরে প্রবেশ করিতে না পারে—তৎপ্রতি সকলেরই দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য নহে কি?

ঔষধ প্রয়োগ অপেক্ষা পথ্যের সুব্যবস্থায় বহুমূত্র রোগের উপশম হইয়া থাকে। আমি স্বয়ং বহুমূত্রের আক্রমণে বহুকষ্ট পাইয়াছি, শেষে বৈদ্য মতের প্রভাবে প্রাণে-প্রাণে বাঁচিয়া গিয়াছি। সুতরাং বহুমূত্র রোগ সম্বন্ধে আমার মত লোকের মতামত নিতান্ত উপেক্ষার বিষয় নহে। কিন্তু সে কথা বলিবার পূর্ব্বে—বহুমূত্র রোগের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে চাই। কেননা রোগের প্রকৃতি না বুঝিতে

পারিলে তাহাকে উন্মূলিত করা কঠিন সমস্যার কথা!

কেবল বেশী মাত্রায় বা বেশী বার প্রস্রাব হইলেই তাহাকে বহুমূত্র রোগ ভাবিয়া ভীত হওয়া অনুচিত। অথবা প্রস্রাব পরীক্ষা করিয়া তাহাতে চিনী দেখিতে পাইলে, তাহাতেও আশঙ্কার কারণ নাই। যাঁহারা অতিরিক্ত মিষ্টান্ন ভোজন করেন, তাঁহাদের মূত্র পরীক্ষা করিলে প্রায়ই শর্করার অস্তিত্ব জানিতে পারা যায়। আবার "মূত্রাতিসার" নামক রোগে—বারম্বার মূত্র পরিত্যাগ করিতে হয়, এরূপ রোগীর মূত্রে চিনীর নামগন্ধও থাকে না। তবে বহুমূত্র রোগ ধরিবার উপায় কি? উপায় অতি সহজ। যথা—

১। প্রস্রাবের পরিমাণ বেশী হইবে।

২। তাহাতে শর্করা থাকিবে।

৩। সঙ্গে সঙ্গে শরীরের বলক্ষয় এবং মাংস ক্ষয় হইবে।

৪। প্রবল গাত্রদাহ থাকিবে।

৫। অত্যন্ত পিপাসা হইবে।

এই পাঁচটী লক্ষণ যুগপৎ উপস্থিত হইলেই, তাহাকে মারাত্মক বহুমূত্র বা Diabetes বলিয়া স্থির করিবেন। এই পঞ্চলক্ষণাক্রান্তব্যক্তি যদি রোগের প্রতিকার করিতে অবহেলা করেন, তাহা হইলে পরিণামে ক্ষয়, ব্রণরোগ, [পৃষ্ঠব্রণ, উরুস্তম্ভাদি] বিসর্প [ইরিসিপ্ল্যাস্], মূত্রগ্রন্থির পীড়া, প্রভৃতি সাংঘাতিক আনুসঙ্গিক রোগে—তাঁহার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।

আমাদের দেহে যকৃৎ নামক যে যন্ত্রটী আছে, কেবল পিত্ত নিঃসরণ বা ভুক্তদ্রব্যের পরিপাকই তাহার এক মাত্র কার্য্য নহে। এই যকৃৎকে মানব-দেহের ভাণ্ডারী বলিতে পারা যায়। আমরা ভাত, রুটী, আলু প্রভৃতি শ্বেতসারময় যে সকল খাদ্য আহার করি, তাহাদের সারাংশ শর্করায় পরিণত হইয়া যকৃতের কাছে সঞ্চিত থাকে। রক্তাদিতে যখন শর্করার প্রয়োজন হয়, যকৃৎ তাহা নিজের ভাণ্ডার হইতে বাহির করিয়া দেয়। কোন কারণে যকৃত বিকৃত হইলে, সে আর আবশ্যক মত শর্করা যোগাইতে পারেনা, কেননা সে শর্করা স্ব-ভাণ্ডারে সঞ্চিতই রাখিতে পারেনা। সুতরাং আহার জাত শর্করা সমস্তই রক্তের সঙ্গে মিশ্রিত হয়। শর্করার গুণ—মূত্রকারক, এই জন্যই মূত্রের ভাগ বৃদ্ধি হয়,—তাহার সঙ্গে শরীরস্থ শর্করাও বাহির হইতে থাকে। সেই সময় পিপাসা, গাত্রদাহ প্রভৃতি উপসর্গ দেখা দেয়। খাদ্য দ্রব্যের যে যে অংশ শরীর-পোষণের সাহায্য করে, যদি প্রস্রাব-দ্বার দিয়া তাহা বহির্গত হইয়া যায়, তাহা হইলে বল ও মাংস ক্ষয় অনিবার্য্য।

কেহ কেহ বলেন—এ রোগের বলবৎ কারণ—মানসিক আঘাত। সর্ব্বশরীর ব্যাপি স্নায়ুমণ্ডলের আকস্মিক আঘাত প্রাপ্তিতে, Depression এবং শোক-মোহাদি মনোবিকারে, বহুমূত্র রোগ জন্মিবার যথেষ্ট সম্ভাবনা। যে কোন প্রকারে হউক, স্নায়ুমণ্ডল আহত হইলেই এ রোগ মানব-দেহে প্রবেশলাভ করে। যাহারা অন্নাদি শ্বেতসারময় দ্রব্য আহার করে, অথচ কায়িক-পরিশ্রম একেবারে করিতে চাহেনা, যদি কোন কারণে তাহাদের স্নায়ুমণ্ডল সহসা আঘাত প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহারা বহুমূত্র কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইবে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি—বহুমূত্র রোগ ঔষধের

চেয়ে পথ্যের ব্যবস্থাতেই শমতা প্রাপ্ত হয়। এ রোগে প্রস্রাবে চিনি বাহির হয়। সুতরাং যে সকল খাদ্য-ভক্ষণে শরীরে চিনি উৎপন্ন হইয়া থাকে—সেরূপ খাদ্য বহুমূত্র রোগীর বর্জ্জন করা উচিৎ! চাউল, চিনী ও শ্বেতস্বারময় দ্রব্য—এ রোগে এই সকল জিনিষ সর্ব্বাগ্রে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। আপনারা হয়ত বলিবেন, অন্নগতপ্রাণ-বাঙ্গালী অন্ন না খাইয়া কয়দিন থাকিবে? কিন্তু ইহা ধ্রুব, সত্য, নিশ্চিত—যে বহুমূত্র-রোগী যদি অন্নের মায়া না ছাড়িতে পারেন, তাহা হইলে অচিরেই তাঁহাকে প্রাণের মায়া পরিত্যাগ করিতে হইবে। যাঁহারা বহুমূত্র রোগের আক্রমণ ব্যর্থ করিতে চাহেন, তাঁহারা নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গুলি যথাসাধ্য পালন করিবেন।

প্রতিদিন নিয়মিতরূপে ব্যায়াম করিতে হইবে। যিনি অন্যরূপ ব্যায়াম করিতে পারিবেননা, তাঁহাকে অন্ততঃ ৪ মাইল পদব্রজে ভ্রমণ করিতে হইবে।

মেদোময় ও যবক্ষারজানময় দ্রব্য—মাংস, মৎস্য, ডিম্ব, ঘৃত, মাখন, শাক সব্‌জি, পটোল, ডুমুর, কুম্‌ড়া (দেশী) শশা, মোচা, থোড় প্রভৃতি—ভোজন করিবেন।

ফলের মধ্যে—ঈষৎ অম্লরসযুক্তফল ব্যবহার করা চলে। কিন্তু মিষ্টফল একেবারেই নিষিদ্ধ। ফলসা, আমড়া, আনারস, কালো জাম, পিয়াল, করমর্দ্দী, আমপিচ—এই সকল ফলই এ রোগে খাইতে পারা যায়।

কেহ কেহ এ রোগে দুগ্ধ খাইবার উপদেশ দেন। কিন্তু ডাক্তার জগবন্ধু বসু মহাশয় দুগ্ধ ব্যবহারে আপত্তি করিতেন। তাঁহার আপত্তির কারণ;—দুগ্ধে শর্করার অংশ আছে। তবে যিনি অত্যন্ত শ্রমশীল, তিনি অল্প পরিমাণে দুগ্ধ ব্যবহার করিতে পারেন, আর এ রোগে যাঁহারা অহিফেন-সেবী হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহারাও দুগ্ধ পান করিতে পারেন। বহুমূত্র রোগে, কেবল মাত্র দুগ্ধ পথ্য দিয়া এক প্রকার চিকিৎসা-প্রণালী প্রচলিত আছে। এই চিকিৎসা-পদ্ধতির নাম—Skimmed milk treatment. এই মতে রোগীকে নবনীত-শূন্য-দুগ্ধ পান করিতে দেওয়া হয়। দুগ্ধ হইতে মাখন তুলিতে গেলে তাহার শর্করাংশ Lactic Acid এ পরিণত হয়, এই এসিড্ বহুমূত্র রোগে উপকারী।

ছোলাকে জাঁতায় পিষিয়া আটা প্রস্তুত করিবেন। ইহার নাম "বেশম্"। এই বেশমের রুটী কিম্বা লুচি ভক্ষণ করিবেন। এমন উপকারী পথ্য আমি আর দেখি নাই। ১দিন খাইলেই প্রস্রাব কমিয়া যায়।

প্রত্যহ প্রাতে ৪ আউন্স আন্দাজ জলে, ১০।১৫ ফোঁটা লেবুর রস (কাগজী বা পাতি) দিয়া পান করিবেন। ইহাতে প্রস্রাবের চিনী কমিয়া যায়।

প্রত্যহ ১ বার মেরুদণ্ডের উপর শীতল জল মাখাইবেন।

যে দ্রব্য সহজে পরিপাক হয়, অথচ পুষ্টিকর, তাহাই ভক্ষণ করা উচিত। যাহাতে পরিপাক-শক্তির ব্যাঘাত না হয়, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবেন।

লবণ সংযুক্ত ঘোল পান করিলে অনেক সময় বিশেষ উপকার হয়।

চিন্তার কার্য্য বাড়িলে, সঙ্গে সঙ্গে কায়িক পরিশ্রম অবশ্য বাড়াইতে হইবে।

এই নিয়ম গুলি পালন করিলে, যাঁহারা।

এ রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন, তাঁহারা অনেকটা ভাল থাকিবেন, যাঁহারা আক্রান্ত হ'ন নাই—ভবিষ্যতে তাঁহাদের আক্রান্ত হইবার ভয় থাকিবেনা।

এ রোগে—সকল চিকিৎসার চেয়ে কবিরাজী-চিকিৎসাই উৎকৃষ্ট। আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রে বহুমূত্র রোগের অব্যর্থ ঔষধ আছে। বারান্তরে আমি তাহার উল্লেখ করিব।

শ্রীক্ষেত্রমোহন চট্টোপাধ্যায়,
এল, এম, এস্।

গ্রহণী কাহাকে বলে ?

যে নাড়ী অন্নকে গ্রহণ করে, আয়ুর্ব্বেদ মতে তাহার নাম—"গ্রহণী"। সুতরাং গ্রহণী অগ্নিরও অধিষ্ঠাত্রী। সংক্ষেপে—ইহাই গ্রহণীর সংজ্ঞা, কিন্তু গ্রহণীর অবস্থান বুঝাইতে গেলে—আরও দুই চারিটী কথা বলিতে হইবে।

সাধারণতঃ আমাশয় ও পক্কাশয়ের মধ্যস্থিত পিত্তধরা-কলাকে গ্রহণী নামে নির্দ্দেশ করা হয়। আমরা যে আহার করি, তাহা পরিপাক হয় আমাশয়ে ও পক্কাশয়ে। আমাশয়ে অন্ন আম বা অপক্কাবস্থায় থাকে বলিয়া ইহার নাম "আমাশয়।" পক্কাশয়ের অনেক স্থলেই অন্ন পরিপাক হয়—সুতরাং ইহার "পক্কাশয়" নাম সার্থক এবং সঙ্গত। কবিরাজেরা যাহাকে আমাশয় বলেন, ডাক্তারী মতে তাহার নাম Stomach এবং কবিরাজী মতের পক্কাশয়কে ডাক্তারেরা—Small Intestine বলিয়া থাকেন। এই আমাশয় ও পক্কাশয়ের মধ্যেই 'পিত্তধরা-কলা' বর্ত্তমান। আমাশয় ও পক্কাশয় উভয়ের ভিতর হইতেই রস গৃহীত হইয়া থাকে।

সে দিন একখানি চিকিৎসা সম্বন্ধীয় পুস্তক পড়িতেছিলাম। ঐ গ্রন্থে Deodenum কে গ্রহণী নামে অভিহিত করা হইয়াছে। আমার কিন্তু এ আখ্যা সঙ্গত বলিয়া মনে হইলনা। গ্রহণী অর্থে আমি যাহা বুঝিয়াছি, বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহারই উল্লেখ করিব। আমার ভ্রম-প্রমাদ—যোগ্যতর হস্তে সংশোধিত হইবে,—এই টুকুই আমার আশা।

Deodenum নামক নাড়ীর অংশ প্রত্যেক লোকেরই স্ব-হস্তের দ্বাদশাঙ্গুলি পরিমিত। ঐ দ্বাদশাঙ্গুলি পরিমিত স্থান, আমাশয়ের (Stomach) শেষ প্রান্ত হইতে আরম্ভ হইয়া Jejunumas এ গিয়া শেষ হইয়াছে। Deodenum এর ভিতর পিত্তনিঃসরণের মার্গ অবস্থিত, যকৃৎ হইতে পিত্ত নিঃসৃত হইয়া সেই স্থানে গিয়া পতিত হয়। আবার Pancrens হইতেও ঐ যন্ত্রের রস Deodenum এ আসিয়া সম্মিলিত হইয়া থাকে। ভাবমিশ্র বলেন—নাভিমণ্ডলস্থিত সমান বায়ু দ্বারা রস প্রেরিত হইয়া গ্রহণীতে উপনীত হয়। আমাশয় ও পক্কাশয়ের মধ্যবর্ত্তী পাচক নামক পিত্তের দ্বারা আহার্য্য দ্রব্য পরিপাক পাইয়া থাকে। পাচক পিত্তই—অগ্নির অধিষ্ঠান,—গ্রহণী সেই পিত্তকে ধারণ করে বলিয়াই তাহার আর একটী নাম—"পিত্তধরকলা"।

ডাক্তারী মতে Gastric juice. Pancreatic juice. Bile (পিত্ত) এবং ক্ষুদ্রান্ত্রের রস—এই কয়টী পদার্থ হইতে অন্নের পরিপাক-ক্রিয়া সাধিত হয়। যে যে স্থান হইতে এই সকল রস নিঃসৃত হইয়া থাকে, বৈদ্যমতে সেই সেই স্থানের নামই পিত্তধরাকলা বা গ্রহণী।

শারীর-বিজ্ঞানে অসাধারণ পণ্ডিত মহর্ষি সুশ্রুত—মানবদেহে সাতপ্রকার কলার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। তন্মধ্যে পিত্তধরা কলার নামই গ্রহণী। ইহা আমাশয় ও পক্কাশয়ের মধ্যস্থিত শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লী। গ্রহণীতে যে শক্তি পরিপাক করে, সেই শক্তির নাম ও গ্রহণী। সুশ্রুত বলেন—

ষষ্ঠী পিত্তধরা নাম যা কলা পরিকীর্ত্তিতা।
পক্কাশয় মধ্যস্থা গ্রহণী সা প্রকীর্ত্তিতা।
গ্রহণী বলমগ্নির্হি সা যাপি গ্রহণী মতা।
তস্মাদগ্নৌ প্রদুষ্টেতু গ্রহণ্যপি প্রদুষ্যতি॥

ষষ্ঠী পিত্তধরা নাম যা চতুর্ব্বিধং অন্নপান মুপযুক্তং আমাশয়াৎ প্রচ্যুতং পক্কাশয়োপস্থিতং ধারয়তি। অর্থাৎ এই পিত্তধরা কলা, চতুর্ব্বিধ [চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়] আহার্য্য পদার্থ যখন আমাশয় হইতে বাহির হইয়া পক্কাশয়ে উপস্থিত হয়—তখন সেই সকল খাদ্য সম্যক পরিপাক না হওয়া পর্য্যন্ত পিত্তধরা কলাই ধারণ করিয়া থাকে, পরে পরিপক্ক আহারের সারভাগ স্বরূপ যে রস, তাহা সমান-বায়ু কর্ত্তৃক হৃদয়ে প্রেরিত হয় এবং গ্রহণীস্থিত অবশিষ্টাংশ মলদ্রব নামে অভিহিত হইয়া থাকে। মলদ্রবের জলীয় ভাগ বস্তিদেশে নীত হইয়া মূত্ররূপে পরিণত হয়। অবশিষ্ট কীট্টপুরীষ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই পুরীষ সমান বায়ুকর্ত্তৃক মলাশয়ে (Large intestine) উপস্থিত হয়।

চরকও বলিয়াছেন—

অগ্ন্যধিষ্ঠান মন্নস্য গ্রহণাদ্ গ্রহণী মতা।
নাভেরুপরি সা হ্যগ্নি বলোপস্তম্ভ বৃংহিতা।
অপক্কং ধারয়ত্যন্নং পক্কং ত্যজতি চাপ্যধঃ॥

গ্রহণী অগ্নির অধিষ্ঠান অন্নকে গ্রহণ করে বলিয়াই ইহার নাম "গ্রহণী"। ইহা নাভির উপরে অবস্থিত। অধিকন্তু ইহা পাচকাগ্নি ও বলের আশ্রয় স্বরূপ, ইহার কার্য্য অপক্ক অন্নকে গ্রহণ করা এবং পক্ক অন্নকে অধঃপ্রেরণ করা।

সুতরাং দেখা যাইতেছে—সমগ্র আয়ুর্ব্বেদের প্রতিনিধি সুশ্রুত এবং চরক—উভয়েরই মতে—গ্রহণী পিত্তধরা-কলা অর্থাৎ পাচকাগ্নির স্থান। এই কলাকে আশ্রয় করিয়াই জীবের পরিপাক শক্তি "বৈশ্বানর অগ্নি" রূপে উদ্ভাসিত।

অন্ন গ্রহণ—গ্রহণীর প্রধান কার্য্য। এই কার্য্য আমাশয় ও পক্কাশয়ের অভ্যন্তরস্থিত শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লির দ্বারাই সাধিত হইয়া থাকে। এই শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে Lacteals [সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রস বাহিনী শিরা] এবং Portal veinএর সূক্ষ্মাগ্রভাগ দ্বারা গৃহীত রস সমান-বায়ুর সাহায্যে হৃদয়ে নীত হয়। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় বিজ্ঞানেরই ইহাই অভিমত। কিন্তু ১২শ অঙ্গুলি পরিমিত Deodenumকে গ্রহণী বলিলে, চরক সুশ্রুতের কথার তাৎপর্য্যই থাকে না। কেননা, আমাশয় এবং পক্কাশয় এই উভয় স্থলেই ত অন্নের পরিপাক এবং উভয় স্থল হইতেই ত অন্নরস গৃহীত হইয়া থাকে। যদি Deodenumএ পরিপাকের সমস্ত কার্য্যই হইত, এবং ইহা আহারের অসারাংশকে মল-মূত্ররূপে অধঃপ্রেরণ

করিতে পারিত, তাহা হইলেও Deodenum কে না হয় গ্রহণী বলিতে পারিতাম। অতএব এস্থলে অনায়াসেই বলিতে পারি—Dcodenum কখনই গ্রহণী নহে।

কেহ কেহ আমাশয়ের Pyloric প্রান্তকে গ্রহণী বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু ইহাও একটী গুরুতর প্রমাদ! কেননা, Pyloric প্রান্ত-পাচক পিত্তের আধার হইতে পারে না। চরক বলিয়াছেন—গ্রহণী অন্নরস গ্রহণ করে। কেবল মাত্র Pyloric প্রান্ত হইতে একার্য্য হয় না—সমস্ত আমাশয় এবং পক্কাশয় দ্বারা একার্য্য হইয়া থাকে। "গ্রহণী অপক্ক অন্ন গ্রহণ করে এবং পক্ক অন্নকে অধঃপ্রেরণ করে"—চরকের এই নির্দ্দেশে আমরা বুঝিতে পারি—যতক্ষণ পর্য্যন্ত অন্ন সম্যক্ পরিপাক না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সেই অন্নকে আমাশয় ও পক্কাশয়ের ঝিল্লীর সংস্পর্শে গ্রহণী ধারণ করিয়া রাখে। ইহাতে অন্ন গ্রহণীস্থ পাচকাগ্নির প্রভাবে পরিপাক পায় এবং পরিপাকের পর সারাংশ গৃহীত ও অসারাংশ অধঃপ্রেরিত হইয়া থাকে। অতএব গ্রহণীর তিনটী কার্য্য—১। অপক্ক অন্ন পরিপাক, ২। সারাংশ গ্রহণ, ৩। অসার ভাগকে অধঃপ্রেরণ। গ্রহণীতে যে বায়ু কার্য্য করে, তাহার নাম সমান বায়ু। যে ধমনী-মণ্ডলে সমান বায়ুর কার্য্য প্রকাশ পায়—তাহার ইংরাজী নাম Solarplexces,—এই সোলার প্লেক্সেস্‌ই গ্রহণীর অবস্থিতি স্থান।

ডাঃ শ্রীঅমরনাথ চট্টোপাধ্যায়
এম্, বি।

বাল্য-বিবাহের বৈজ্ঞানিক যুক্তি

-:*:-

বৈদিক যুগের আর্য্য সমাজে—নারীগণ যৌবনাবস্থায় পরিণীতা হইতেন। তখন ত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত—রমণীদের যুবতী সংজ্ঞা দেওয়া হইত।

রামায়ণ-মহাভারত ও পুরাণের যুগেও সমাজে যৌব-বিবাহ প্রচলিত ছিল। সাবিত্রী, দময়ন্তী, রুক্মিণী, শকুন্তলা প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয়া-মহিলাগণ—পূর্ণ যৌবনে স্বামী-সঙ্গে সম্মিলিতা হইয়াছিলেন।

প্রথম স্মার্ত্তযুগেও—যৌবন কালেই স্ত্রীলোকদের বিবাহ হইত। তবে তখন ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণ—বয়সের একটা বাঁধাবাঁধি নিয়ম করিয়া দিয়াছিলেন। যথা,—

"ত্রিংশদ্বর্ষঃ ষোড়শাব্দাং ভার্য্যাং বিন্দেত নগ্নিকাং" ইহার অর্থ—ত্রিশ বৎসরের বর ষোড়শী কন্যাকে বিবাহ করিবে।

মনুর আমলে—কন্যার বিবাহের বয়স আরও কমিয়া গিয়াছিল। ষোল বৎসর,—বার বৎসরে নামিয়াছিল। মনুর উপদেশ—"ত্রিংশদ্বর্ষো বহেদ্ ভার্য্যাং হৃদ্যাং দ্বাদশ বার্ষিকীং।" তখন ত্রিশ বৎসরের বর, বার বছরের কন্যাকে বিবাহ করিত।

ইহার পরবর্ত্তী যুগে—শাস্ত্রকারগণের মত পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। সমাজে বাল্য-বিবাহের আদর বাড়িয়াছিল। এ সময় শাস্ত্রকারগণও ব্যবস্থা দিয়াছিলেন—

"দশ-বর্ষাষ্ট বর্ষাবা ধর্ম্মে সীদতি সত্বরঃ।
অতোঽপ্রবৃত্তে রজসি কন্যাং দদ্যাৎ পিতা সকৃৎ।"

অর্থাৎ কন্যার দশবর্ষ কিম্বা আটবর্ষ বয়সে বিবাহ হইলে, সে গার্হস্থ্যধর্ম্মের বিশেষ সহায় হইয়া থাকে। অতএব রজস্বলা হইবার পূর্ব্বেই পিতা একবার মাত্র কন্যাদান করিবেন।

যৌবন-বিবাহ কিরূপে বাল্যবিবাহে পরিণত হইয়াছিল, প্রবন্ধের সূচনাতে অতি সংক্ষেপে তাহা বিবৃত হইল। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য, বিবাহ সম্বন্ধে-ঋষিগণের এরূপ মত-পরিবর্ত্তনের উদ্দেশ্য কি? হিন্দুর বিবাহ-বন্ধন বড় কঠোর, অতি কঠিন; দম্পতির মধ্যে একের মরণেও তাহা শিথিল হইবার নহে। এ বন্ধন পরলোকেও অবিচ্ছিন্ন থাকে। এমন স্থলে কন্যার পক্ষে স্বয়ং পাত্র নির্ব্বাচন করিয়া লওয়াই ত স্বাভাবিক, অভিভাবকের কথায় নির্ভর করিয়া একজন অজ্ঞাত ব্যক্তির হস্তে চিরদিনের জন্য আত্ম-সমর্পণ—কখনই যুক্তি সঙ্গত হইতে পারে না। এই জন্যই বোধ হয় সেকালে স্বয়ম্বর বা গান্ধর্ব্ব-বিবাহ সমাজে যথেষ্ট প্রচলিত ছিল। কন্যা যুবতী না হইলে কেমন করিয়া বর পছন্দ করিবে! সুতরাং যৌবনাবস্থায় বিবাহ, দম্পতির জীবনে ভাবী সুখের হিসাবে—বৈধ। আট দশ বৎসরের কন্যা—বর নির্ব্বাচনের ভার গ্রহণ করিতে অক্ষম। অতএব বাল্য-বিবাহ প্রথা—সমাজে শুভকরী হইতে পারে না। স্বাস্থ্যের দিক দিয়া ধরিলেও—বাল্য-বিবাহ প্রথার সমর্থন করা চলেনা। পৃথিবীর প্রথম বিজ্ঞান "আয়ুর্ব্বেদে"ও বাল্য বিবাহের ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায় না। কেননা বাল্য বিবাহের বিষময় ফলে—সন্তান-সন্ততি অল্পায়ু হয়, দম্পতির সংসার-সুখ ও অকাল-বার্দ্ধক্যে পর্য্যবসিত হইয়া পড়ে।

তবে ত্রিকালদর্শী, সর্ব্বজ্ঞ ঋষিগণ বাল্য-বিবাহের এত পক্ষপাতী হইলেন কেন? হিন্দু সমাজে, ক্রমশঃ বাল্য-বিবাহই বা প্রচলিত হইল কেন? ইহার কি কোনও উদ্দেশ্য নাই? ইহার কি কোনও বৈজ্ঞানিক যুক্তি নাই? আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিব—নিশ্চয়ই আছে। আর্য্য ঋষিগণ যে আট নয় দশ বৎসর বয়সে কন্যার বিবাহ দিবার জন্য ব্যবস্থা দিয়াছেন,—শুধু ব্যবস্থা নহে—ঐরূপ বয়সে কন্যাকে পাত্রস্থা করিতে না পারিলে, কন্যার পিতৃপুরুষের নরক-সম্ভাবনারও ভয় দেখাইয়াছেন, শাস্ত্রের অনুশাসনকে কঠিন শপথগর্ভ করিয়া তুলিয়াছেন, নিশ্চয়ই ইহার কারণ আছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমি সেই কারণনির্ণয়েরই প্রয়াস পাইব। ইহাতে পাঠকগণও বুঝিতে পারিবেন—নিষ্প্রয়োজনে ঋষিগণ কিছুই করেন নাই। তাঁহাদের সকল মতই "বৈজ্ঞানিক" যুক্তির উপর একদা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল,—ভ্রান্ত, অন্ধ, মোহমুগ্ধ আমরা—সে কথা ভাবিয়া দেখিবারও চেষ্টা করি না।

যুক্তি তর্কের দ্বারা—ঋষি-বাক্যের ব্যাখ্যা করা উচিত কিনা?

আমি ত ঋষি-বাক্যের বৈজ্ঞানিক অর্থ আবিষ্কার করিতে বসিতেছি, কিন্তু আমার এ স্পর্দ্ধা নিতান্তই অজ্ঞানোচিত। আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ যোগ-বলে যাহা বুঝিয়াছেন, যোগের অণুবীক্ষণে যে সকল সূক্ষ্ম তত্ত্ব দেখিয়াছেন, আমাদের মত ক্ষুদ্র কীটাণু কি তাহার সকল তত্ত্ব বুঝিতে পারে? এই জন্যই হিন্দু,

ঋষি-সিদ্ধান্ত অবনত শিরে বরাবরই মানিয়া আসিতেছে। ঋষি-বাক্যে হিন্দুর কখনই সংশয় হয় নাই, ঋষিরা যাহা মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন, হিন্দুর যুগান্তরের বিশ্বাস—সে মীমাংসা অভ্রান্ত, অতর্কনীয়, তাহার কারণ অনুসন্ধান করা, তাহা লইয়া বাদ-প্রতিবাদ করা—প্রকৃত হিন্দুর পক্ষে মহাপাপ। যোগ বলে বলীয়ান্-ঋষি—এমন অনেক অনুশাসন লিখিয়া গিয়াছেন, লৌকিক বিজ্ঞান বা যুক্তিতে তাহার রহস্য বুঝিতে যাওয়া, কেবল মানবের ধৃষ্টতা মাত্র। তাই মানবধর্ম্ম-শাস্ত্র-প্রণেতা মনু বলিয়াছেন—

"হৈতুকান্ বকবৃত্তিংশ্চ বাঙ্ মাত্রেণাপি নার্চ্চয়েৎ।"

যাহারা ঋষি-নির্ণীত তত্ত্বের হেতু অনুসন্ধান করিবে, তাহারা নাস্তিক ; তাহাদের সহিত কখনও কথা কহিও না। বাচস্পতি মিশ্র ইহার যুক্তিও দেখাইয়াছেন—"আর্যস্ত যোগিনাং বিজ্ঞানং লোকাবুৎপাদনায়নালং" যেমন অণুবীক্ষণের সাহায্যে অতি সূক্ষ্ম দ্রব্যও দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে, চর্ম্মচক্ষুতে তাহা দেখা যায় না, সেইরূপ ঋষিগণের যোগ-নেত্র-দৃষ্ট পদার্থ,মানবের দর্শনযোগ্য হইতে পারেনা।

তবে আবার ঋষিবাক্যের বিজ্ঞান তত্ত্ব বাহির করিতে চেষ্টা করিতেছি কেন? ইহার উত্তর—এখন আর সেকাল নাই। এখন আমরা সভ্যতাগর্ব্বী হইয়া, আমাদের চিরাচরিত ধর্ম্ম-কর্ম্মেরও বৈজ্ঞানিক যুক্তি জানিতে চাই। এখন যুগ ফিরিয়াছে, "কেন"র যুগ আসিয়াছে। অতএব বাল্য বিবাহের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আলোচনা করিতে গিয়া আমি যে অপরাধী হইতেছি, পাঠকগণ তাহা ক্ষমা করিবেন।

দেহে—বিষ প্রবাহ।—তন্ত্র-শাস্ত্রে লিখিত হইয়াছে—"ব্রহ্মাণ্ডে যে গুণাঃ সন্তি তে তিষ্ঠন্তি কলেবরে" অর্থাৎ বৃহদ্ ব্রহ্মাণ্ডে যাহা দেখিতে পাওয়া যায়, আমাদের শরীরেও তাহা বর্ত্তমান আছে। বৃহদ্ ব্রহ্মাণ্ডে যেমন চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, গিরি, নদী, বন, পর্ব্বত, উদ্ভিদ, জীব, বিষ, অমৃত, স্বর্গ, নরক, প্রভৃতি স্থূলরূপে বিরাজিত, আমাদের দেহরূপ ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডেও সেইরূপ গ্রহ-নক্ষত্রাদি সূক্ষ্মরূপে অবস্থিত। কথাটা আরও একটু স্পষ্ট করিয়া বলি। আমাদের চক্ষু দু'টী, দেহ ব্রহ্মাণ্ডের চন্দ্র-সূর্য্য। জিহ্বা—জলময়ী নদী, জঠরানল—অগ্নি, কেশশ্মশ্রু-লোম—উদ্ভিদ, অরণ্য মৃগাদির বিহার ক্ষেত্র, আমাদের কেশ ভূমিও উৎকুনাদির বিচরণ স্থান ;—এইরূপ সমস্ত বিষয়েই ব্রহ্মাণ্ডের সহিত দেহের সাদৃশ্য দেখিতে পাইবেন। বহির্জগতে যেমন অমৃত ও বিষ আছে, মানব দেহেও সেইরূপ অমৃত ও বিষের অস্তিত্ব আছে। মানবের নখাগ্রে ও দশনাগ্রে বিষের প্রভাব উত্তমরূপেই উপলব্ধি হইয়া থাকে। ইহা ভিন্ন—শরীরের রক্ত, মজ্জা, বসা, শুক্র, মূত্র, বিষ্ঠা, শ্লেষ্মা, অশ্রু, ঘর্ম্ম—সমস্তই বিষ।

"বিষস্য বিষমৌষধং"—বিষের ঔষধ বিষ—একথা বৈজ্ঞানিকের সিদ্ধান্তের কথা। পূর্ব্ববঙ্গের অনেক দেশে দেখা গিয়াছে—কেহ বিষ পান করিলে বিষ-বৈদ্য তাহাকে বিষ্ঠা খাওয়াইয়া দেন। আমাদের দেশেও দেখিয়াছি—কাহারও মুখমণ্ডলে 'যুবান্ পীড়কা' বা ব্রণ হইলে, তাহাতে নাসিকার শ্লেষ্মার প্রলেপ দেওয়া হয়। ইহাতে ২।১ দিনের মধ্যেই পীড়কার স্ফীতি ও বেদনা কমিয়া যায়। দেহমলে বিষ না থাকিলে,—এরূপ উপকার কখনই হইত না।

সেই বিষ বিশেষ অসাধু ব্যক্তির শরীরে "পাপ" নামে অভিহিত হইয়া থাকে। অসাধু শরীরের সেই পাপ আবার আলাপ, গাত্রস্পর্শ, নিঃশ্বাস, একত্র ভোজন, একত্র উপবেশন, ইত্যাদি কারণে অপরের দেহে সংক্রমিত হইয়া থাকে। এইরূপে অসাধু-শরীরের পাপসংসর্গ-কারীকে অসাধু করিয়া তোলে ; ক্রমে সংসর্গ-কারী বিকৃত স্বভাব ও ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে।

সাধুর শরীরেও এরূপ বিষ আছে, কিন্তু পুণ্যকর্ম্মের অমৃত সেচনে তাহা স্নিগ্ধ ও মৃদু-বীর্য্য হইয়া পড়ে, তাহা আর অপর দেহে প্রবেশ করিয়া বিষক্রিয়া উৎপাদন করিতে পারেনা।

অনেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, কোন কোন ব্যক্তি কাহারও কাহারও সংসর্গে যেন জীর্ণ শীর্ণ হইয়া পড়ে। ইহার কারণ আর কিছুই নহে—যাহার শরীরে বিষ-প্রবাহ বেশী, তাহার সংস্পর্শে থাকিলে সংসর্গকারী ক্ষীণ-পুণ্য ও হৃত বল হইয়া যায়। কাহার শরীরে বিষ-প্রবাহের আধিক্য আছে, আর্য্য ঋষিগণ তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের লক্ষণাদি দেখিয়া ইহা বুঝিতে পারিতেন। কাহার সংসর্গ কাহার সহ্য হইবে, কাহার বা সহ্য হইবে না, দেহের চিহ্ন দেখিয়াই তাঁহারা ইহার নির্দ্দেশ করিয়া দিতেন। বিবাহের পূর্ব্বে—বর কন্যার রাশি-বিচার, গণ-বিচার, লক্ষণালক্ষণ-বিচার প্রভৃতি বিষয় যিনি মনোযোগের সহিত আলোচনা করিবেন, তিনিই আর্য্যঋষির অভিজ্ঞতার প্রশংসা করিবেন।

এখন লোকে বরং কন্যার লক্ষণালক্ষণ কতকটা দেখে, বর-সম্বন্ধে কোনও বিচার করেনা। পূর্ব্বে এরূপ ছিল না। তখন কন্যাপক্ষ বরের লক্ষণালক্ষণ দেখিতেন, বর পক্ষও কন্যাকে যাচাই করিয়া লইতেন। জ্যোতিষশাস্ত্র, সামুদ্রিকশাস্ত্র স্মৃতিশাস্ত্র—এই পরীক্ষা কার্য্যের সহায়ক হইত।

এখন বরপক্ষ দেখেন—কন্যার রূপ ও কন্যার পিতার ঐশ্বর্য্যসম্পদ, আর কন্যাপক্ষ দেখেন—বরের পাশ বা ডিগ্রীর গৌরব। ইহাতে যে দেশের শোচনীয় সর্ব্বনাশ হইতেছে, বড় বড় বংশ ধ্বংসমুখে অগ্রসর হইতেছে, পুত্রকন্যার দাম্পত্য-জীবন বিঘ্ন-সঙ্কুল হইয়া উঠিতেছে—স্বার্থমুগ্ধেরা তাহা ভাবিয়াও দেখিতেছে না।

বালিকা বিবাহের গুণ ও যুবতী বিবাহের দোষ।—যে সকল রমণীর দেহে বিষের প্রবাহ বেশী থাকিত, সেকালে তাহারা "বিষকন্যা" নামে অভিহিত হইত। বিষকন্যার সংসর্গে—পুরুষ জীর্ণশীর্ণ হইয়া প্রাণ হারাইত। এ কথা পৃথক প্রবন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিব। এক্ষণে আমার বক্তব্য শেষ করিয়া যাই।

বিষকন্যার সৌন্দর্য্যে আত্মহারা হইয়া, অনেকেই তাহাদিগকে বিবাহ করিবার জন্য লালায়িত হইত। ফলে এইরূপ বিবাহের বিষময় ফলে সমাজের অত্যন্ত অনিষ্ট হইত। এই অনিষ্ট নিবারণের জন্যই—আর্য্য ঋষিগণ বাল্যবিবাহ-প্রথার প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। যুবতীর দেহে বিষপ্রবাহের আধিক্য লক্ষ্য করিয়া, তাঁহারা বালিকা অবস্থায় কন্যার বিবাহ দিতে সমাজকে বারংবার উপদেশ দিয়া ছিলেন। সংক্রামক বিষ-দোষ হইতে পুরুষকে রক্ষা করিবার জন্যই—বালিকা-বিবাহের ব্যবস্থা। ঋষিগণ বুঝিয়াছিলেন—বালিকা অবস্থায় কন্যাকে বিবাহ করিলে বিষক্রিয়ার

ততটা সম্ভাবনা থাকিবে না। যেমন আধপক্ক অজাত-সার বিষতরুর বিষভক্ষণে, কথঞ্চিৎ ক্লেশ হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহাতে মৃত্যুর ভয় থাকে না। ক্রমশঃ অল্পপরিমাণ হইতে আরম্ভ করিয়া পরে অধিক পরিমাণ আফিম্ অভ্যাস ও প্রযুক্ত ভক্ষণকারিকে মারিতে পারে না, সেই প্রকার যে বালিকার শরীরে বিষের অঙ্কুরোদ্গম হইয়াছে মাত্র,—সেই নব বিবাহিতা-বালিকা-বধূর সংসর্গে তাহার স্বামী বিষদোষ আক্রান্ত হয় না! যুবতী-বিবাহে এ সুবিধা নাই। যুবতী প্রবল বিষময়ী, পতি গৃহে আসিয়াই সে পতিকে আয়ত্ত করিয়া ফেলে, বিবাহের কন্যা হইলেও—সে ততটা লজ্জাশীলা হয় না, সকলকে অতিক্রম করিয়া সে একেবারেই স্বামীর সহচরী হইয়া পড়ে। কিন্তু বালিকা-বধূর এতটা স্বাধীনতা থাকেনা, লজ্জায় জড়সর হইয়া—পতিগৃহে আসিয়া সে কিছু দিন কাহারও সঙ্গে তত কথাবার্ত্তা কহে না, কন্যার মত স্নেহের পাত্রী ও আদরিণী হইয়া শাশুড়ীর কাছে কাছে থাকে, তাঁহার কাছেই রাত্রে শোয়, দিবাভাগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহকর্ম্মে রত থাকে। ক্রমে যত শ্বশুর বাড়ীতে তাহার কর্ম্মক্ষেত্র বিস্তৃত হয়। সে শাশুড়ীকে রন্ধনকালে সাহায্য করে, স্বামীর ছাড়া-কাপড় কাচিয়া শুকাইতে দেয়,—পাদ-প্রক্ষালনের জল রাখে, স্বামীর ভোজনান্তে উচ্ছিষ্ট ভোজন করে। এইরূপে সেই বালিকার শারীরিক উষ্মা অল্পে অল্পে তাহার স্বামীর সহ্য হইয়া যায়। প্রথম বিষের বেগ শ্বশুর-শাশুড়ী-ননদী ও দেবর প্রভৃতি পরিজনের সম্পর্কে অনেকটা সাম্য লাভ করে, পতির দেহে প্রবেশ করিয়া আর ততটা বিকৃতি জন্মাইতে পারে না। প্রথমে, অল্পে অল্পে সহিয়া সহিয়া অভ্যস্ত হইয়া গেলে, শেষে গুরুতর সংসর্গেও ততটা অনিষ্ট হয় না। বরং অহিফেনের মতই অভ্যস্ত ব্যক্তির দেহের উপকারই করিয়া থাকে।

মানুষের শরীরগত উষ্মা বা তাড়িত শক্তি স্বভাবতঃ ইতস্ততঃ বিচ্ছুরিত হইয়া থাকে। কিন্তু আলাপ-গাত্রস্পর্শাদি সংসর্গে পাপ নামক দৈহিক বিষ উক্ত তাড়িত-প্রবাহের সঙ্গে—এক দেহ হইতে অন্য দেহে প্রবিষ্ট হয়। এই জন্যই "প্রায়শ্চিত্ত বিবেকে"র পতিত সংসর্গ প্রকরণে লিখিত হইয়াছে—

আলাপাদ গাত্র সংস্পর্শান্নিঃ শ্বাসাৎ
সহ ভোজনাৎ।
সহশয্যাসনাধ্যায়াৎ পাপং সংক্রমতেনৃণাং॥

পরস্পর আলাপ, গাত্র-স্পর্শ, নিঃশ্বাস, একত্র ভোজন, শয়ন, উপবেশন ও অধ্যয়ন—এই সকল কারণে এক দেহের পাপবৃত্তি অন্য দেহে প্রবেশ করিয়া থাকে। দেবল ও পরাশরের মতে—যাজন, অধ্যাপন, যৌন-সংসর্গ, যানারোহণ—ইত্যাদি কারণেও এক দেহ হইতে অন্য দেহে দোষ বা পাপ অন্য শরীরে সংক্রমিত হইয়া থাকে।

স্ত্রীলোকের রজঃনিঃস্রাবের সঙ্গে তাহার শরীর গতবিষ চতুর্দ্দিকে বিচ্ছুরিত হইতে থাকে, তখন তাহার সহিত অল্পমাত্র সংস্রবও ভয়ানক অনর্থের সৃষ্টি করে। এই জন্যই—ধর্ম্ম-শাস্ত্রে রজঃস্বলা স্ত্রীকে স্পর্শ করা মহাপাপ বলিয়া বর্ণিত। চরক সুশ্রুত প্রভৃতি বিজ্ঞানাচার্য্যগণও—রজঃস্বলা নারীর সংসর্গ হইতে পুরুষকে দূরে থাকিবার পরামর্শ দিয়াছেন।

এই জন্যই রজঃপ্রবৃত্তির পূর্ব্বে বালিকাকে বিবাহ করিবার ব্যবস্থা। শাস্ত্রের অনুশাসন —"যৌবনের সঙ্গে সঙ্গে বিষবেগ পরিস্ফুট

ভাবে উচ্ছ্বলিত হইয়া উঠিয়া থাকে, অতএব যে ব্যক্তি দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া সুখ-শান্তিতে থাকিতে ইচ্ছা করে, সে কখনও বয়োধিকা-কন্যার পাণিপীড়ন করিবে না" * "ঘর্ম্ম, মূত্র, আর্ত্তবাদি দূষিকা বা বিষে করাল কবল হইতে আত্মরক্ষার জন্য, নারী-দেহস্থ বিষ প্রচ্ছন্ন ভাবে অঙ্কুরাবস্থায় থাকিতে থাকিতে বালিকা কন্যাকেই বিবাহ করা উচিত।"

অনেক দেখিয়া-শুনিয়াই—লোক চরিত্রজ্ঞ, ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ, এবং শরীর তত্ত্বজ্ঞ ঋষিগণ এক-বাক্যে বলিয়া গিয়াছেন—"অষ্টম, নবম ও দশম বর্ষ বয়স্কা বালিকাই বিবাহযোগ্যা।"

এদিকে সামাজিক ব্যাপারের হিসাবে দেখিতে গেলেও—বালিকা বিবাহই প্রশস্ত মনে হয়। কেন না, পুষ্পবতী প্রমদার মানসিক চাঞ্চল্য অনিবার্য্য। সুতরাং সে অবস্থায় তাহারা পঞ্চশরের পাড়নে উৎপথবর্ত্তিনী হইয়া, পিতৃকুল কলুষিত করিতে পারে। অতএব রজঃপ্রবৃত্তির পূর্ব্বেই বালিকাকে পাত্রসাৎ করিলে, পিতামাতা নিশ্চিন্ত হইতে পারেন।

যদি নিতান্ত ভদ্র কুলের কন্যা—লোক লজ্জায় এবং অন্যান্য কারণে, পুষ্পিতা হইয়াও উৎপথবর্ত্তিনী না হয়, কিন্তু মানসিক কুপ্রবৃত্তির উত্তেজনায় অস্বাভাবিক উপায়ে নিজেরই আর্ত্তব জরায়ু মধ্যে নিহিত করিয়া, হংসের অসংযোগে হংসীর অসার ডিম্ব প্রসবের মত —সর্প বৃশ্চিক-কুষ্মাণ্ডাকৃতি বিকৃত-প্রসব জন্মাইতে পারে। এরূপ ঘটনা ঘটা অসম্ভব ও নহে। শারীর তত্ত্ববিদ্ অসাধারণ পণ্ডিত ভগবান্ সুশ্রুত অপ্রাকৃত গর্ভের যে আভাষ দিয়াছেন, তাহা অপূর্ব্ব জ্ঞান-গবেষনার বড়ই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। শারীর স্থানের দ্বিতীয় অধ্যায়ে আচার্য্য যে উপদেশ দিয়াছেন, পাঠকগণের অবগতির জন্য নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল।

রজঃস্বলাচ যা নারী বিশুদ্ধা পঞ্চমে দিনে।
পীড়িতা কামবাণেন ততঃ পুরুষমীহতে॥
যদানার্য্যাকুপেয়াতাং বৃষস্যন্ত্যৌ কথঞ্চন।
মুঞ্চন্ত্যৌ শুক্র মন্যোন্য মনস্থি স্তত্র জায়তে॥
ঋতুস্নানাতু যা নারী স্বপ্নে মৈথনমাচরেৎ।
আর্ত্তবং বায়ুরাদায় কুক্ষৌ গর্ভং করোতি হি॥
মাসি মাসি বিবর্দ্ধেত গর্ভিণ্যা গর্ভ লক্ষণং।
কললং জায়তে তস্যা বর্জ্জিতং পৈত্রিকৈ গুণৈঃ।
সর্প-বৃশ্চিক কুষ্মাণ্ড বিকৃতাকৃতয়শ্চ যে।
গর্ভাস্ত্বেতে স্ত্রিয়াশ্চৈব জ্ঞেয়াঃ পাপকৃতা ভৃশং॥

অধিকন্তু, বালিকা অবস্থায় বিবাহ হইলে বধূকে শিক্ষাদ্বারা সুগঠিত করিয়া পতিকুলের অবস্থানুরূপ স্বভাবা করিয়া লইতে পারা যায়। অতএব যে দিক দিয়াই বিচার করুন না কেন, বালিকা বিবাহই যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হইবে।

শ্রীরাম সহায় কাব্যতীর্থ
বেদান্ত শাস্ত্রী।

* পণ্ডিত জয়চন্দ্র সিদ্ধান্ত ভূষণের "বৈবাহিক বিজ্ঞান" পড়ুন।

সদ্যঃ গাভী দুগ্ধ অপেক্ষা বৈদেশিক পর্য্যুষিত জমাট দুগ্ধে তাহার বড়ই আদর, নারিকেল জলের পরিবর্ত্তে সোডাওয়াটার তাহার অধিকতর প্রিয় বস্তু হইয়াছে। হস্ত মৃত্তিকা ও তৈল মর্দ্দনের পরিবর্ত্তে সে সাবানের উপকারিতা বুঝিয়াছে, পিতল বা কাঁসার বাসনের পরিবর্ত্তে সে কাঁচের বা লোহার (এনামেলের) বাসনের আদর করে, গোময়ের পরিবর্ত্তে সে ফেনাইনকে ভাল বলে। ফলতঃ যাহা কিছু সাত্ত্বিক বা পবিত্র—সকলই তাহার চক্ষে এক্ষণে বিষবৎ প্রতীত হইতেছে। সুতরাং জনপদ ধ্বংসীয় কারণ সমূহের একত্র সমাবেশের আর বাকী কি রহিয়াছে, সকলই পূর্ণ মাত্রায় প্রকাশ পাইয়াছে।

অতএব হে দেব! হে সর্ব্বাময় নিসূদন! তুমি আবার জাগ্রত হও, আবির্ভূত হও, তুমি আবার ভারত বাসীর কর্ণকুহরে বেদমন্ত্রের অমৃতময় ধারা ঢালিয়া দিয়া তাহাদের অন্ধকারময় অন্তঃকরণে সত্ত্বগুণের উজ্জ্বল আলোক জ্বালিয়া দাও শান্তিময় গন্তব্য পথ দেখাইয়া দাও, এবং বুঝাইয়া দাও যে, সত্ত্ব, রজঃ, তম যেমন তিনই আত্মার গুণ, তদ্রূপ বায়ু, পিত্ত, কফ—এই তিনই আয়ুস্তত্ত্বের মূল, এই তিনেরই বিষমাবস্থায় সমুদয় রোগের উৎপত্তি, অতএব এই তিনেরই প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আমাদের আহার্য্য-বিচার ও ঔষধ-বিচার করিতে হইবে, কিন্তু এক্ষণকার সমাজে এই সকল সূক্ষ্মতম তত্ত্ব ধারণা করিবার সামর্থ্যই বা কোথায়? কাল, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ার্থের যোগ, অযোগ ও মিথ্যাযোগ যে সমুদয় রোগোৎপত্তির হেতু, মানব সমাজের অধর্ম্মেই যে, সূর্য্য, চন্দ্র, জল, বায়ু, ওষধি বনস্পতি প্রভৃতি সমুদয় বিকৃতি প্রাপ্ত হয়, এই জগৎ যে মনোময়, রোগের যে সাধ্যত্ব অসাধ্যত্ব ও যাপ্যত্ব আছে, কতকগুলি রোগ যে, পূর্ব্বজন্ম কৃত কর্ম্মজ, কতকগুলি যে ইহজন্মজ বা অভিশাপাদি জনিত, কাল যে রোগ আরোগ্য বা রোগ প্রবর্ত্তনের প্রধান কারণ,—সকলে যাহাতে আমরা বিশদ রূপে উক্ত সূক্ষ্মতম তত্ত্ব সকল বুঝিতে পারি, হে ভগবন্! তুমি আমাদিগকের প্রতি সেই শুভ বুদ্ধি প্রেরণ কর। যে দেশের জল বায়ুতে যে রোগ জন্মে, সেই দেশের ওষধি-বনস্পতিতে সেই রোগ আরোগ্য হয়, বেদানুমোদিত পথ্যে যাহাদের আহার বিহার স্নান, পান ও আচার-ব্যবহারাদি সম্পন্ন হয়,স্নান পান আহার বিহারাদির সময় নিশ্চিত করিয়া আমরা যে আয়ুর্ব্বেদের কৃপায় জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করি, সেই আয়ুর্ব্বেদ উপর নির্ভর করিয়া আমদের রোগযাত্রা নির্ব্বাহ করাও উচিত, এই তথ্য হে দেব! আমাদিগকে বুঝাইয়া দাও, হে দেব! এই সেই সময় উপস্থিত হইয়াছে—যাহাতে তোমার উপদিষ্ট স্বাস্থ্যের তত্ত্ব, আহার তত্ত্ব, দ্রব্য তত্ত্ব, কৌমার ভৃত্য, শল্য শাস্ত্র, অগদতন্ত্র প্রভৃতি অষ্টাঙ্গের বিচার হয়। অতএব তুমি আবার জাগ্রত হও, ভারতবাসী তোমাকে নতশিরে বারম্বার নমস্কার করিতেছে, তুমিই ভারতের আদিগুরু, ভারতবাসী তোমার শরণাপন্ন হইতেছে, দেশরক্ষকগণ দেশের হিতার্থে যত্নবান হইয়া, স্বাস্থ্যতত্ত্বান্বেষী হইয়া রোগ নিবারণোপায় সকল আবিষ্কারে যত্নবান হইয়াছেন, এ সময়ে হে ধন্বন্তরি! তুমি আমাদের বুদ্ধিগত করিয়া তোমার বেদবাণী সকল প্রচার পূর্ব্বক আমাদিগকে রোগ শোক, পাপ তাপ হইতে পরিত্রাণ কর,—এই আমাদের প্রার্থনা।

শ্রীবারাণসীনাথ গুপ্ত
বৈদ্যরত্ন, ভিষগাচার্য্য।
ভূতপূর্ব্ব "বৈদ্য সঞ্জীবনী" সম্পাদক।

শৌচাশৌচ ও সদাচার সেবনই দীর্ঘায়ুর মূল-কারণ।

হে দেব! তুমি আবার লোক সকলকে বুঝাইয়া দাও যে, "উৎপদ্যন্তে ব্যবন্তে চ যান্য-নানি কানিচিত। তান্যর্ব্বাক্‌ কানিকতয়া নিষকনান্য নৃতানি চ" বেদ বহিষ্কৃত শাস্ত্র সকল নিষ্ফল ও তমোনিষ্ঠ। প্রাচীন কাল হইতে এ পর্য্যন্ত কি গ্রীক্, কি রোম, কি মিসর কত দেশে কত প্রকার চিকিৎসা শাস্ত্রের উদ্ভাবন ও লয় হইয়া গেল তাহা বলা যায় না। এক্ষণে সেই সকল শাস্ত্রের কার্য্যকারিতা আর নাই, তাহারা সকলেই নিষ্ফল হইয়া গিয়াছে। পরন্তু আমাদের আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র অপরিবর্ত্তিত ও নিত্যরূপে থাকিয়া তাহার কার্য্যকারিতা আজও সমানভাবে দেখাইয়া বেদের অপৌ রুষেয়ত্ব প্রমাণ ও ঘোষণা করিতেছে। প্রাচীন কেন, বর্ত্তমান কালের ও অন্যান্য দেশের চিকিৎসা পুস্তক সকল ও তাহাদের অনুমোদিত ঔষধাদির বিচার কর, দেখিবে যে, আজ যাহাকে কার্য্যকর বলিয়া পুস্তক প্রণেতাগণ যুক্তি সহকারে প্রমাণ করিতেছেন—কল্য আবার তাহাদেরই স্বতন্ত্র যুক্তি বলেই তাহাই আবার নিষ্ফল ও অকিঞ্চিৎকর বলিয়া নির্ণীত হইতেছে। কখনও বা যুক্তি বলে প্রমাণীকৃত হইতেছে—সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করা ভাল, প্রাতঃস্নান করা ভাল, শবদাহ প্রথা ভাল, ক্যালামেল প্রয়োগ, রক্ত-মোক্ষণ ক্রিয়া, বিরেচক ঔষধ প্রয়োগ ইত্যাদি ভাল, আবার হয়ত পরদিনেই যুক্তি বলে বুঝান হইতেছে যে, সূর্য্যোদয়ের পর গাত্রোত্থান করা ভাল। শবদাহ অপেক্ষা সমাধি প্রথা ভাল। ক্যালামেল প্রয়োগ বা রক্তমোক্ষণ ক্রিয়ায়, দেহের অনিষ্ট করে অথবা কুইনাইন অপেক্ষা ফেনাসিটি-প্রয়োগে জ্বর আশু নিবারিত হয়। এইরূপ যুক্তিমূলক শাস্ত্রের অকিঞ্চিৎকরতা দেখাইয়া হে দেব! তুমি লোক-সমাজকে দেখাইয়া দাও যে, আয়ুর্ব্বেদ প্রতিপাদ্য-স্বাস্থ্যতত্ত্ব ও রোগতত্ত্বই যথার্থ সত্য। কিন্তু একালে আর সে ব্রহ্মচর্য্য নাই, সে তপস্যা নাই প্রকৃত সে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম নাই, যাহাতে লোকে বেদ-বাণীর যাথার্থ্য উপলব্ধি করিয়া তন্মতানুবর্ত্তী হইবে, এক্ষণে তমোগুণের আতিশয্য হেতু জনপদোধ্বংশীয় কারণ সমূহের অনুশীলনে সমাজ দিন দিন অগ্রসর হইতেছে, পূজ্যপূজা-ব্যতিক্রম সমাজের এক্ষণে যশও গৌরবের কারণ হইয়াছে, জীবন্ত দেবতা মাতা-পিতাকে বা স্নেহাস্পদ ভ্রাতা-ভগ্নিকে অন্ন বা আশ্রয় দেওয়া কর্ত্তব্য বলিয়া লোক আর মনে করেনা। সত্ত্বগুণের আধার দেবতা, ব্রাহ্মণ সমাজে আর পূজা পায়না, নিতান্ত আসুরিক ভাবে উন্মত্ত হইয়া সমাজ এক্ষণে সত্ত্বগুণের যাহা কিছু বিপরীত, জন-পদোধ্বংসের যত কিছু কারণ,—সেই সকলের অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত রহিয়াছে। শাঠ্য ও কাপট্য, লাম্পট্য প্রভৃতি এখন সমাজের ভূষণ স্বরূপ ব্যাপৃত রহিয়াছে! পবিত্র চন্দনের পরিবর্ত্তে অপবিত্র দ্রব্যসকল অঙ্গে লেপন করিয়া সমাজ এক্ষণ নিজেকে পবিত্র মনে করিতেছে। বিল্ব-পত্র বা তুলসী পত্রের উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া সমাজ এক্ষণে ক্রোটন রোপিত করিয়া ভদ্রা-শনের শোভা বাড়াইতেছে। দুগ্ধ ও ঘৃতের উপর তাহার দিন দিন অশ্রদ্ধা বাড়িতেছে। এমন এক তরঙ্গ আসিয়াছে যে, তাহার প্রভাবে কে প্রকৃত আত্মীয়, কে প্রকৃত পর, এক্ষণে সে তাহা চিনিতে পারিতেছে না। সমাজ এক্ষণে ঘৃত দুগ্ধের পরিবর্ত্তে মাংস ভাল বাসে,

আবার ভারতবাসীকে স্বাস্থ্যতত্ত্ব ও রোগ-তত্ত্বের উপদেশ প্রদান কর।

করুণাময় ইংরেজরাজ ভারতবাসীর এই শোচনীয় দশা দর্শন করিয়া সর্ব্বতোভাবে যাহাতে ভারতবর্ষের রোগনিকর নিবারণ হয় এবং ভারতবাসী সুস্থ থাকে বিধিমত প্রকারে তাহার চেষ্টা করিতেছেন। রাজনীতির চর্চ্চা, শিক্ষা বিস্তারের চর্চ্চা, শাসন-ব্যবস্থা প্রভৃতি রাজ্যের অপরাপর বিষয় চিন্তা করা অপেক্ষা প্রজার স্বাস্থ্যচিন্তা করা যে সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য, রাজা এক্ষণে তাহা বুঝিয়াছেন, এই কারণে ম্যালেরিয়া-কমিশন প্লেগ-কমিশন্, খালখনন্, হেল্থ আফিসার নিয়োগ, প্রভৃতিতে প্রতিবৎসর অসংখ্য অসংখ্য মুদ্রা ব্যয় করিতেছেন, কিন্তু কিছুতেই কোন উপায় উদ্ভাবন বা রোগাদি নিবারিত হইতেছে না। লক্ষ লক্ষ টাকা জলের ন্যায় ব্যয় করিয়া রাজা কখনও স্থির করিতেছেন,—মূষিকের বাহুল্য প্লেগের কারণ,—মশকের দৌরাত্ম্যে ম্যালেরিয়ার বীজ সংক্রামিত হইতেছে বা গোময়ের ব্যবহারে রোগের উৎপত্তি হইতেছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। এইরূপ বহুল পরিমাণে রোগ নিবারণের চর্চ্চা হইতেছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এপর্য্যন্ত কিছু নিশ্চিত বা স্থির হইল না, বা হইতেছে না। মনুষ্যসাধ্য যতটা যত্ন ও চেষ্টা হইতে পারে রাজা তাহা করিতে পশ্চাৎপদ হইতেছেন না। কিন্তু কিছুতেই ফলোদয় হইতেছে না, পরন্তু এত যত্ন, এত চেষ্টা, কিজন্য ব্যর্থ হইতেছে,—কেন ফলোদয় হইতেছে না, এ প্রশ্নের উত্তর ভারতবাসী তুমি কি আজ দিতে পার? পার না ভারতবাসী,—তুমি যে এক্ষণে স্বাবলম্বন ও স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, ধর্ম্মবুদ্ধি বিনষ্ট করিয়াছ, সেই অধর্ম্ম সঞ্চয়েই আজি ব্যাধি ও বিপত্তি প্রাদুর্ভাবের একমাত্র কারণ হইয়া পড়িয়াছে। ভারতবাসী আজি ইহা ভুলিয়া গিয়াছে।

অতএব হে ধন্বন্তরি! তুমি আবার জাগ্রত হও, আবার তুমি "অহংহি ধন্বন্তরি রাদিদেবো জরারুজোমৃত্যুহরোঽমরাণাং" বলিয়া অনাথ-ভারতবাসীর হৃদয়কে আশ্বস্ত করিয়া তাহাদিগকে দেহতত্ত্বও স্বাস্থ্যতত্ত্ব, আয়ুতত্ত্ব ও আহারতত্ত্ব, ভেষজতত্ত্ব ও ধর্ম্মতত্ত্ব ইত্যাদির উপদেশ দান কর। তুমি আবার বুঝাইয়া দাও যে, ধর্ম্ম সহায় ব্যতীত কেবল মনুষ্যসাধ্যে যত্নে দেহতত্ত্ব বা স্বাস্থ্যতত্ত্ব জানিবার উপায় নাই। পরন্তু যাঁহারা "রজস্তমোভ্যাং নির্ম্মুক্তা স্তপোজ্ঞানবলেন যে। যেষাং ত্রৈকাল মমলং জ্ঞানমব্যাহতং সদা। আপ্তাঃ শিষ্টা বিবুদ্ধাস্তে তেষাং বাক্যমসংশয়ং। সত্যং বক্ষ্যন্তি তে কষথান্ নাসত্যং নীরজ স্তমাঃ॥ যাঁহারা জ্ঞান ও তপোবলে রজঃ ও তমোগুণ হইতে মুক্ত হইয়াছেন, যাঁহারা ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান এই ত্রিকালজ্ঞ, সেই আপ্ত পুরুষগণ স্বাস্থ্যতত্ত্ব ও রোগতত্ত্ব সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহাই সত্য। হে দেব! তুমি আবার দেশবাসিবর্গকে বুঝাইয়া দাও যে, বাহ্য জল বায়ু, বা বলকর আহার বিহারাদির দ্বারা কেবল নীরোগ হইতে পারা যায় না। পরন্তু সমুদয় স্বাস্থ্যের মূল কারণ ধর্ম্ম ও সমুদয় রোগের মূল কারণ প্রজ্ঞাপরাধ বা অধর্ম্ম। এখনকার উচ্চ শিক্ষিতগণ বর্ণাশ্রমধর্ম্ম, শৌচাচার বা সদাচার প্রভৃতি রোগ নিবারণের কারণ বলিয়া স্বীকার করেন না, কিন্তু হে ধন্বন্তরি, তুমি আবার বুঝাইয়া দাও যে, বর্ণভেদ প্রথাই সংক্রামক রোগনিবৃত্তির প্রকৃত উপায়। ম্লেচ্ছত্ব হইতেই সংক্রামক ব্যাধির সৃষ্টি এবং

প্রার্থনা।

সমুদ্র মন্থনকালে বিশ্বসংসারের হিতের জন্য যে দেব, অমৃতপূর্ণ কমণ্ডলু হস্তে বপুষ্মান ধন্বন্তরি মূর্ত্তিতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, যিনি বিশ্বসংসারের অমঙ্গলময় বিষপান করিয়া শিবনাম ধারণ করিয়াছেন সেই সর্ব্বসুখ দাতা সর্ব্বরোগ নিবারক শিবস্বরূপ আদিদেব ধন্বন্তরিকে নমস্কার। হে দেব! "ভেষজমসি" তুমিই ভবসংসারের ভেষজ স্বরূপ,—"ভেষজম্ গবেঽশ্বায়, পুরুষায় ভেষজম্" তুমি গো অশ্বাদি প্রাণীসকল এবং মনুষ্যগণের ভেষজ স্বরূপ, তোমাকে নমস্কার করি। "অধ্যবোচদধিরক্তা প্রথমো দৈব্যো ভিষক" তুমিই অধিরক্তা সর্ব্বাদৌ তুমিই আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের উপদেশ দিয়াছিলে, অতএব আয়ুর্ব্বেদ গুরো! তোমাকে নমস্কার করি।

দেব, বর্ত্তমান বিপদে তুমিই আমাদের একমাত্র শরণ্য, তাই আমাদের হৃদয় তোমার জন্য বড়ই ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। আমরা বারম্বার তোমাকে অহ্বান করিতেছি, তুমি আমাদের পুত্র ও পৌত্র যুবা ও বৃদ্ধ, গো ও অশ্ব প্রভৃতি—আমাদিগকে রক্ষা কর।

দেব! "কালশ্চায়ং আয়ুর্ব্বেদোপদেশস্য" এই সেই আয়ুর্ব্বেদের উন্নতির যথার্থ কাল উপস্থিত হইয়াছে, এই ভারতবর্ষের ত্রিশকোটী প্রজার মধ্যে এমন একজনও নাই যে, তাহার দেহ কোন না কোন রোগে আক্রান্ত নয়, অম্ল, অজীর্ণ জ্বর যক্ষ্মা, ধাতুদৌর্ব্বল্য, মেহ, মহামারী বিসূচিকা প্রভৃতি কত প্রকারের ভীষণ রোগ সমূহ যে এই ভারতবর্ষে আবির্ভূত হইয়া ভারতবাসীর দেহ, প্রাণ অকালে হরণ করিতেছে তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। একা এই বঙ্গদেশেই কেবলমাত্র জ্বর রোগে বৎসর বৎসর অসংখ্য লোক মৃত্যু মুখে পতিত হইতেছে। উদরে অন্ন নাই পরিধানে বস্ত্র নাই, তার উপর এই সকল সাক্ষাৎ কৃতান্তের অনুচর রূপ রোগের দৌরাত্ম্যে লোক সমূহ অস্থির হইয়া পড়িয়াছে, সম্বাদপত্রের বিজ্ঞাপন স্তম্ভগুলিতে দেখিতে পাওয়া যায়, কেবল মাত্র ঔষধের বিজ্ঞাপনেই সম্বাদপত্র পরিপূর্ণ। যেন এদেশের লোক আর কোন কিছু চায় না, কেবল ঔষধ ঔষধ করিয়াই চারিদিকে চীৎকার করিতেছে। হে অমরাময়-নিসূদন, ভগবান, ধন্বন্তরি! কি পাপে ভারতবাসীর এরূপ দুর্দ্দিন উপস্থিত হইল! ধর্ম্মপ্রাণ ভারতবাসীর পক্ষে এরূপ দুর্দ্দিন বুঝি আর কোন কালে হয় নাই। এলাহাবাদ, পঞ্জাব, নর্ম্মদাতীর, দার্জ্জিলিং প্রভৃতি যে সকল পৃথিবীর সর্ব্বোত্তম স্বাস্থ্যকর স্থান ছিল, যে সকল স্থানের মনুষ্যেরা পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট দেহ ধারণ করিয়া যাবতীয় জাতির মধ্যে প্রধানতম বীর জাতীয় বলিয়া খ্যাত ছিল। সে সকল স্থান এক্ষণে সর্ব্বপ্রকার ব্যাধির আবাসভূত হইয়া উঠিয়াছে। এবং সেই সকল স্থানের লোকেরা এক্ষণে নিজ নিজ দেহ ও প্রাণ লইয়া ব্যতিব্যস্ত। হে কাশিরাজ! হে আদিদেব! ভারতবর্ষে প্রতিদিন যেরূপ লোকক্ষয় হইতেছে, তাহাতে এক্ষণে খণ্ড প্রলয় উপস্থিত হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অতএব তুমি আবার জাগ্রত হও, জাগ্রত হইয়া

ম্যালেরিয়া নিবারণের উপায়।

ম্যালেরিয়া আমাদের দেশে ছিলনা, ইহা কিরূপভাবে আমাদিগকে আক্রমণ করিল, তাহার তথ্যও কেহ বলিতে পারেন। ১৮০৪ খৃঃঅব্দে মুর্শিদাবাদ ও কাশিমবাজারে এই রোগের প্রথম আবির্ভাব হয়। তাহার ২০ বৎসর পরে ইতিহাস প্রসিদ্ধ রাজা সীতারাম রায় প্রতিষ্ঠিত যশোহর জেলার মহম্মদপুর ম্যালেরিয়ার আক্রমণে বিধ্বস্তপ্রায় হইয়াছিল —ম্যালেরিয়ায় ইতিবৃত্তে জানিতে পারা যায়। ঐ আক্রমণে মহম্মদপুরের পাঁচ হাজার লোক কাল-কবলিত হইয়াছিল। এই সময় হইতেই বাঙ্গলাদেশের লোক ম্যালেরিয়ার নাম ভাল করিয়া জানিতে পারে। মহম্মদপুর ধ্বংসপ্রায় করিয়া নলডাঙ্গা, গদখালি প্রভৃতি যশোহরের চিত্রা নদীর উভয় পার্শ্বস্থ গ্রামগুলির লোক ধ্বংস করিয়া ম্যালেরিয়া-রাক্ষসী নদীয়ায় প্রবেশ করিল। এই সময় উলা বা বীরনগরের ৯০০০ লোক ইহার শুভাগমনে একই সঙ্গে মৃত্যুমুখে পতিত হইল।

তাহার পর ২৪ পরগণায় ইহার প্রভাব—বিস্তারও বড় কম হইল না। কাচড়াপাড়ার লোক সংখ্যা ৩০০০ এর মধ্যে ১৩৫৫ জন ইহার আক্রমণে কাল-কবলিত হইল। ১৮৫৭ সালে নৈহাটি ও হালিসহর গ্রাম দুইখানি ম্যালেরিয়ার আক্রমণে বিধ্বস্ত হইয়া পড়িল। ১৮৬১ সালে হুগলি নিবাসীগণ ইহার প্রকট মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিল। হুগলি জেলার ত্রিবেণীতে ম্যালেরিয়া আরম্ভ হইয়া দ্বার-বাসিনী আক্রমণ পূর্ব্বক বারাসত অধিকার করিল।

ইহার কয়েক বৎসর পরে ১৮৬৫ খৃঃঅব্দে কাঁটোয়া, মেহেরপুর এবং গোবরডাঙ্গার লোকে ইহার তাণ্ডবলীলা প্রত্যক্ষ করিয়া ম্যালেরিয়া কি—জানিতে পারিল। ক্রমে সমগ্র বঙ্গদেশে ম্যালেরিয়া—সকল রোগকে ছাড়াইয়া উঠিয়া স্বীয় আধিপত্য প্রবলভাবে বিস্তার করিতে সমর্থ হইল।

এই ম্যালেরিয়া কি এবং কি কারণে বাঙ্গালাদেশে অবাধ আধিপত্য বিস্তারে সমর্থ হইল, এইবার সে সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা যাউক।

বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন, "ম্যালেরিয়া জীবাণু পররুহ উদ্ভিদ শ্রেণীর অন্তর্গত।" ১৮৮০ খৃঃঅব্দে ফরাসী দেশীয় ডাক্তার ল্যাভেরণ অনুবীক্ষণ দ্বারা ম্যালেরিয়া-ক্রান্ত রোগীর শোণিতে এই জীবাণু সকল অবলোকন করেন। তাহার পর ১৮৯৭ খৃঃ-অব্দে ডাক্তার ম্যান্‌সন্ মশক হইতে এ জীবাণু সকলের উৎপত্তি হইয়া থাকে—এ কথা দেশ মধ্যে প্রচার করেন। ১৮৯৯ খৃঃঅব্দে ডাক্তার 'রস'ও এই মতের পোষকতা করেন। তিনি পরীক্ষা দ্বারা স্থির করেন যে, মশক—নর শোণিত হইতে জীবাণু ভ্রূণ উদ-রস্থ করিয়া জীবাণু সকল নরদেহে বৃদ্ধি প্রাপ্ত করিয়া জীবকোরক রূপে মশকের হুলের গোড়ায় বংশ বিস্তার করিতেছে।

ইটালীতে যখন ম্যালেরিয়া বিস্তৃত হইয়া পড়িল, তখন 'লো' এবং 'সামবিল' নামক দুই-জন ডাক্তার মশকের আক্রমণ হইতে অব্যাহত থাকিবার জন্য লৌহ-তারের জাল ঘেরা

বাড়ীতে অবস্থিতি পূর্ব্বক ম্যালেরিয়ার আক্রমণ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছিলেন। করমোসা দ্বীপে ম্যালেরিয়ার বিস্তৃতিকালে জাপান গবর্ণমেণ্ট মশক-দংশনেই ম্যালেরিয়ার উৎপত্তি হয় কিনা—ইহা নির্ণয় করিবার জন্য ঐ দ্বীপে দুই দল সৈন্য প্রেরণ করেন। একদল ইটালিতে ডাক্তার 'লো'য়ের মত—ঘেরা-যায়গায় বাস করিয়াছিল, আর একদলের লোকের মশক হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য কোনরূপ বন্দোবস্ত ছিল না। উভয় সৈন্যই ১৬ দিন কাল ঐরূপভাবে অবস্থান করে। ফলে যাহারা জালদ্বারা ঘেরা স্থানে অবস্থিত ছিল, তাহাদের কাহারও ম্যালেরিয়াজ্বর হয় নাই, অন্যদলের ২৫৯ জন ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হইয়াছিল।

আমাদের বাঙ্গালা দেশে ম্যালেরিয়ার আধিক্যের কারণ যে আমরাই উপস্থিত করিয়াছি, ইহা বলিলে অসঙ্গত হইবে না। যে মশক হইতে ম্যালেরিয়ার উৎপত্তি হয়, সে মশক-ধ্বংসের জন্য আমাদিগের কোনরূপই চেষ্টা নাই। আগে আমাদের দেশে প্রকৃতির বিকৃতি ভাব পরিলক্ষিত হইতনা, সময়ে বৃষ্টি হইত, সে বৃষ্টিরফলে পল্লী-পথের আবর্জ্জনা সকল উত্তমরূপে ধৌত হইয়া পল্লীভূমির লোকসঙ্কুল স্থানগুলি হইতে প্রান্তর ভূমিতে চলিয়া যাইত, ফলে সময়ের সুবৃষ্টি হইতেই পল্লীগ্রামের জলনিকাশের কার্য্য সম্পন্ন হইত। এখন সময়েও সুবৃষ্টি হয় না, জল-নিকাশের সুবন্দোবস্ত করিবারও আমাদের মতিগতি নাই। দেশে মশক বংশের বৃদ্ধি এই জন্যই হইতেছে, এবং ম্যালেরিয়ারও প্রাদুর্ভাব বিলক্ষণ বাড়িয়াছে। ইস্‌ম্যালিয়া এবং সুইট্‌হেম বন্দরে এই জল নিকাশের বন্দোবস্ত করিয়াই ম্যালেরিয়ার আক্রমণ হইতে সে অঞ্চলের লোক রক্ষা পাইয়াছিল। ১৯০২ সালে ইসমালিয়া'তে ১৫৫১ জন ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হয়। জলনিকাশের বন্দোবস্ত করিয়া ১৯০৫ সালে ৩৭ জনের বেশী ম্যালেরিয়াক্রান্ত রোগী সেখানে দেখা যায় নাই। ক্ল্যাং এবং সুইটেনহামে ১৯০১ সালে ৩১০ জন ম্যালেরিয়া রোগী দেখা যায়, ১৯০৫ সালে ঐরূপ চেষ্টায় ২৩ জনের অধিক ম্যালেরিয়াক্রান্ত হয় নাই। হংকংয়ে ১৯০১ সালে ১২৯৪ জন ম্যালেরিয়া রোগী ছিল, ১৯০৫ সালে জলনিকাশের বন্দোবস্তের ফলে ৪১৯ জন মাত্র ম্যালেরিয়াক্রান্ত হইয়াছিল জানিতে পারা যায়। জল-নিকাশের বন্দোবস্ত করিয়া ইটালি, হল্যাণ্ড, আলজিরিয়া এবং আমেরিকার অনেক স্থানই স্বাস্থ্যকর হইয়াছে। আমাদের সে চেষ্টা নাই, আমরা ম্যালেরিয়ার ভয়ে পল্লী ছাড়িয়া সহরে আবাসস্থান নির্ণয় করিলেই কর্ত্তব্য সাধিত হইল বলিয়া মনে করি, সুতরাং আমাদের দেশ হইতে ম্যালেরিয়া নষ্ট হইবে কি করিয়া? ম্যালেরিয়ার আক্রমণ হইতে অব্যাহত থাকিতে হইলে জল-নিকাশের বন্দোবস্ত করিতে হইবে, কোন পল্লীই যাহাতে বনবহুল হইয়া মশক বৃদ্ধির কারণ উপস্থিত করিতে না পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে, বাড়ীর নিকটে যে সকল ডোবা বা গর্ত্ত আছে, তাহা বুজাইয়া ফেলিতে হইবে, জলাশয় গুলি যাহাতে কলুষিত না হয়, তাহার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। ইহা ভিন্ন মশক দংশন হইতে অব্যাহত থাকিবার জন্য সন্ধ্যার পর নগ্নগাত্রে থাকা হইবে না, জামা বা কাপড় গায়ে দিয়া এবং শয়ন কালে মশারি খাটাইয়া দেহরক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। মশকের আক্রমণ

হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ঘরের জানালাগুলি তার দ্বারা ঘিরিয়া লইলে ভাল হয়।

ইহা ভিন্ন সন্ধ্যাকালে গৃহমধ্যে ধূপ-ধুনা দিবার ব্যবস্থা যাহা আমাদের বরাবর চলিয়া আসিত, এখন অনেক গৃহস্থ তাহা ভুলিয়া যাই-লেও নূতন করিয়া আবার তাহার প্রবর্ত্তন করিতে হইবে। ধূপ-ধুনার গন্ধ মশকগণ সহ্য করিতে পারেনা। ইহা বোধ হয় সক-লেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

হিন্দু সংসারে আগে তুলসী এবং কৃষ্ণচূড়া ফুলের গাছ যত্নপূর্ব্বক পুঁতিয়া রাখা হইত। ইহারা রস টানিয়া স্যাঁৎসেতে জমি শুষ্ক করে বলিয়া ইহাদিগকে পুঁতিয়া রাখায় হিন্দুসন্তান ধর্ম্ম ভিন্ন স্বাস্থরক্ষার সুখও অনুভব করিতে সক্ষম হইত। এখন এ প্রথাও দেশ হইতে বিলুপ্ত। কিন্তু ম্যালেরিয়া হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইলে আবার সে প্রথা প্রচলিত করিতে হইবে।

ম্যালেরিয়ার আক্রমণ হইতে রক্ষা পাই-বার জন্য আরও কতকগুলি নিয়ম পালন করিবার প্রয়োজন। শয়ন-ঘরে খাট-পালঙ্ক তক্তাপোষ ভিন্ন আর কিছুই রাখা হইবে না। আলনা-বাক্স-সিন্দুক, এ সকল অন্য ঘরে রাখাই প্রশস্ত। তরকারি, গুড় এবং ঘৃত-তৈলাদির ভাণ্ডও শয়ন-গৃহ হইতে তফাৎ করিতে হইবে। সাবান মর্দ্দনে অঙ্গ পরি-ষ্কারের ব্যবস্থাটি ছাড়িয়া দিয়া বাঙ্গালী-সন্তানকে আবার তৈল মর্দ্দনে অভ্যস্ত হইবে। দেহের লঘুতা সম্পাদক, ত্বকের স্বাস্থ্যরক্ষক, বাতশ্লেষ্মকনাশক—তৈলের মত এরূপ আর একটি দ্রব্যও নাই আমরা এই তৈলের ব্যবহার এখন যে ভুলিয়াছি, ম্যালেরিয়ার হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য আবার তাহার প্রচলন করিতে হইবে। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণও স্থির করিয়াছেন, উত্তমরূপে তৈল মর্দ্দনকারী ব্যক্তিদিগের ম্যালেরিয়ার আক্রমণ অনেক কম হইয়া থাকে। কিন্তু দেশের যেরূপ রুচি-বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে, তাহাতে এ সকল যুক্তি কেহ শুনিবেন কি !

পরিপাক।

অগ্নি আহার পরিপাক করে, আহার না পাইলে দোষ পরিপাক করে, ধাতুর অভাবে প্রাণ পরিপাক করে। ১ম আহার পরিপাক, ২য় দোষ পরিপাক, ৩য় ধাতু পরিপাক, ৪র্থ প্রাণ পরিপাক।

আহার পরিপাক অর্থাৎ আমরা যে ভাত, দা'ল, শাক, মাছ প্রভৃতি খাদ্য গ্রহণ করিয়া থাকি, তাহারা আমাদের পাচক অগ্নির সাহায্যে রূপান্তরিত হইয়া রসে পরিণত হয়। তখন ঐ খাদ্য সকলের শ্যাব, কৃষ্ণ, অরুণ প্রভৃতি বর্ণ, লম্বা, গোল, চ্যাপ্টা প্রভৃতি আকৃতি, কটু তিক্ত, অম্ল প্রভৃতি রস সমস্তই পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। কারণ রস শুভ্রবর্ণ তরল গতিশীল মধুর ভূয়িষ্ঠ দ্রব্য।

ঐ রস আবার পরিপক্কতা লাভ করিয়া রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র নামক ধাতুতে পরিণত ও শরীরস্থ তৎ তৎ ধাতুর সহিত মিশিয়া যায়। রক্ত, মাংস মেদ, অস্থি

প্রভৃতি ধাতু সকল রস হইতে পৃথক পদার্থ ও তাহাদের একটী অপরটীর সহিত সমজাতীয় নহে। তবেই দেখা যাইতেছে যে ভৌম্য, আপ্য, বায়ব্য, তৈজস ও নাভস এই পঞ্চ অগ্নির সাহায্যে, ভৌম, আপ্য, তৈজস প্রভৃতি পঞ্চবিধ আহার্য্য পদার্থ রূপান্তরিত হইয়া রসে ও ধাতুতে পরিণত হয়, সেই যে প্রক্রিয়া-বলে আহার্য্যের এই পরিণতি সুসম্পন্ন হয়, তাহাকে আহার পরিপাক কহে।

আহার্য্য পদার্থ পরিপাক হইলে, তাহা আর শরীরে বাহ্য পদার্থ রূপে বর্ত্তমান থাকে না, তখন তাহারা শারীর-পদার্থের সহিত সম্পূর্ণভাবে এক হইয়া যায়। আহার্য্য সম্পূর্ণরূপে পরিপাক প্রাপ্ত হইলে শরীরে যে লক্ষণ উৎপন্ন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল। যথা—

উদ্গারশুদ্ধিরুৎসাহোবেগোৎসর্গ যথোচিত।
লঘুতা ক্ষুৎপিপাসা চ জীর্ণাহারণ্য লক্ষণম্॥
(ইতি ভাব)

উদ্গার শুদ্ধি (ধুমোদ্গার বা আহার দ্রব্যের গন্ধোস্বাদ বিবর্জ্জিত উদ্গার) শরীরের প্রসন্নতা অর্থাৎ চক্ষু ও মুখের বর্ণ ও স্বরের স্বাভাবিক ভাব। মনের প্রসন্ন ভাব বা সুখীভাব, মলমূত্রাদির যথোচিত প্রবর্ত্তন, দেহের লঘুতা ক্ষুধা ও পিপাসা রোধ হইলে ভুক্তাহার জীর্ণ হইয়াছে বুঝা যায়।

দোষ পরিপাক।—দোষ অর্থে বায়ু পিত্ত কফ। নানারূপ অহিতকর দ্রব্য যথা, অতি গুরু অর্থে অজীর্ণকর দ্রব্য, অতি স্নিগ্ধ যাহাতে বেশী পরিমাণ ঘৃত তৈল আছে—এমন পদার্থ, অতি শীতল, অতি উষ্ণ দ্রব্য। পচা দ্রব্য অপরিষ্কার দ্রব্য। ধূলা, ধুম, বিষ বাষ্প, হাম, বসন্ত, কলেরা, মেলেরিয়া প্রভৃতির জীবাণু, পান-ভোজন-শ্বাস গ্রহণ প্রভৃতি কার্য্য দ্বারা বাহ্যজগত হইতে শরীর ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়া তত্রস্থ দোষ সকলকে অতি মাত্রায় বর্দ্ধিত ও বিকৃত করে। ঐ সমস্ত দূষিত পদার্থসমূহ-সংশ্লিষ্ট দোষই অশেষ প্রকার পীড়ার কারণ। এখন আমাদের শারীর-প্রকৃতি যে প্রক্রিয়ার দ্বারা বায়ু, পিত্ত, কফ হইতে ঐ সমস্ত দূষিত পদার্থকে পৃথক করিয়া তাহাদিগকে পুনরায় বাহ্যজগতে নিক্ষেপ করে, সেই প্রক্রিয়াকে দোষ-পরিপাক-ক্রিয়া কহে। এই বিক্ষেপ কার্য্য ফুস্‌ফুস্‌, স্বেদনাড়ী, মূত্রগ্রন্থি, মলভাণ্ড প্রভৃতি যন্ত্রের সাহায্যে নিষ্পন্ন হইয়া থাকে সেইজন্য ঐ যন্ত্র সকলকে সংশোধন যন্ত্র ও বলা যাইতে পারে।

দোষ পরিপাকের লক্ষণ যথা—

দোষ প্রকৃতি বৈকৃত্যং লঘুতা দেহয়োঃ।
ইন্দ্রিয়নাথ বৈমল্যং মলানাং পাক লক্ষণম।

দূষিত বায়ুপিত্ত কফের যে প্রকৃতি, তাহার বিপরীত ভাব হইলে অর্থাৎ বায়ু দূষিত হইলে যেমন কম্প, মুখশোষ গাত্র-বেদনা উপস্থিত হয়, পিত্ত দূষিত হইলে যেমন শরীর উষ্ণ হয়, দাহ, পিপাসা, ঘর্ম্ম, দেহে ক্ষত—প্রভৃতির উৎপত্তি হয়; দূষিত কফের প্রকৃতি যেমন শরীর ভার হওয়া ক্ষুধারাহিত্য, অরুচি, কাস, সর্দ্দি প্রভৃতি দেখা দেওয়া—এই সমস্ত লক্ষণের বিপরীত লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, জ্বরের অল্পতা হইলে ইন্দ্রিসমূহের বিমলতা হইলে, অর্থাৎ চক্ষের লালবর্ণতা, পীতবর্ণতা ও শুক্লবর্ণতা না থাকিলে চক্ষের দৃষ্টি পরিষ্কার হইলে, কর্ণে কোন অস্বাভাবিক শব্দ প্রভৃতি না থাকিলে বা শব্দবোধ্য পরিষ্কার না হইলে, জিহ্বার কোন ময়লা না থাকিলে, স্বাদ গ্রহণশক্তি

হইলে, ত্বকে গুড় গুড় শিড় শিড় অনুভূতি না হইলে, স্পর্শশক্তি অব্যাহত থাকিলে, দোষ পরিপাক হইয়াছে জানিবে।

ধাতু পরিপাক। জীবগণের নিমেষ, উন্মেষ, ধাবন, কুর্দ্দন, হাসন, ভাষন উত্থান, পতন, চিন্তন, প্রভৃতি কার্য্যে পঞ্চভূত সম্বয়োৎপন্ন রস, রক্ত, অস্থি, মজ্জা প্রভৃতি ধাতুগণ অনবরত ক্ষয় হইতেছে। অর্থাৎ ঐ সমস্ত ক্রিয়া দ্বারা তাহারা পুনরায় ক্ষিত্যপ-তেজ, মরুদ্দেশ রূপে পরিণত হইয়া বাহ্য জগতস্থ স্বজাতীয় গণের সহিত মিলিয়া যাইতেছে। যে প্রক্রিয়া বলে ঐরূপ কার্য্য সুসম্পন্ন হইতেছে, তাহাকে ধাতুপাক ক্রিয়া কহে। ধাতু পরিপাক ক্রিয়া যে সকল সময়েই শারীর প্রকৃতির প্রতিকুলতা করে, তাহা নহে, বরং অনেক সময় ইহার অনুকুলতাই করিয়া থাকে। এইরূপ পরিপাক ক্রিয়া-বলে শরীর হইতে ধাতুগণ অনবরত বহির্গমন করিতেছে বলিয়াই আহার পরিপাক ক্রিয়া বলে তাহারা পুনরায় সৃষ্ট হইয়া দেহ ধারণ করিতেছে। এইরূপ ক্ষয় কার্য্য না হইলে পুরণ কার্য্য হয় না। ক্ষয় ও পুরণ এই দুই প্রক্রিয়ার উপরই প্রাণ শক্তির ক্রিয়া নির্ভর করিতেছে। ইহাদের একের ক্রিয়ার উপরেই অন্যের ক্রিয়া নির্ভর করিতেছে, একের অভাবে অন্যের বিকাশ অসম্ভব। কিন্তু যখন এই দুই ক্রিয়ার সামঞ্জস্য লোপ পায়, অর্থাৎ পুরণ অপেক্ষা ক্ষয় বেশী হয়, অথবা ক্ষয় অপেক্ষা পুরণ বেশী হয়, তখনই শরীর অসুস্থ হইয়া উঠে। এইরূপ ধাতু পাককে লক্ষ্য করিয়া এখানে ধাতু পাকশব্দ লিখিত হইয়াছে। নিম্নে ইহার লক্ষণ লেখা যাইতেছে, যথা—

"নিদ্রা নাশঃ হৃদিস্তম্ভো বিষ্টম্ভ গৌরবারুচি।
অরতির্ব্বল হানিশ্চ ধাতুনাম পাক লক্ষণম" ॥

নিদ্রা নাশ হয়, হৃদয় স্তম্ভিত হয় অর্থাৎ হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন অল্প হইয়া যায়, উদরের বিষ্টম্ভ হয়। বল হ্রাস বশতঃ পরিপাক অল্প হইয়া যায়, তাহাতে পেট ফাঁপিয়া থাকে এবং পেটের ভিতরকার বায়ু নিঃসরণ হয়না। শরীর ভার হয় অর্থাৎ বলক্ষয় জন্য রোগী নিজ শরীরকে সফলিত করিতে কষ্ট বোধ করে বলিয়াই তাহাকে ভারী বলিয়া বোধ করে। বস্তুতঃ তাহার শরীর ক্ষয় জন্য লঘুই হয়। তাহার অরতি হয় অর্থাৎ কোন বিষয়েই তাহার ভাল ইচ্ছা বোধ হয় না ও বলক্ষয় হয় এবং দৃষ্টিশক্তি, আস্বাদশক্তি, ঘ্রাণশক্তি অন্নপাকশক্তি প্রভৃতি সমস্ত শক্তির ক্ষয়বশতঃ তাহার দৈহিক কোন কার্য্যই সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় না।

কবিরাজ শ্রীউমাচরণ ভারতী ভূষণ

ব্যায়াম।

—০—

স্বাস্থ্যরক্ষার্থে যে শারীরিক পরিশ্রম আবশ্যক, তাহাকেই সাধারণতঃ ব্যায়াম বলা যায়। ব্যায়াম নানাবিধ—যথা পথভ্রমণ, অশ্বারোহণ, নৌকাচালন, সন্তরণ, মুগুর বা ডম্বল ভাঁজা, কুস্তি, ডন্‌ফেলা, দৌড়াদৌড়ি, হাডুডু ডু, কপাটি, ফুটবল, ক্রিকেট, হকি, ব্যাড্‌মিংটন, রগ্‌বি, টেনিস্ ইত্যাদি। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি আধুনিক। ফুটবল, ক্রিকেট,

হকি প্রভৃতি কতকগুলি ইউরোপীয়গণ কর্ত্তৃক এদেশে প্রচলিত হইয়াছে সুতরাং এগুলি আধুনিক। ব্যায়াম সমূহকে দুইটী প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে, যথা সাধারণ বা অবিমিশ্র ব্যায়াম এবং ক্রীড়া-সংযুক্ত ব্যায়াম বা ব্যায়াম ক্রীড়া। ব্যায়াম দ্বারা মাংসপেশী সমূহের পুষ্টিসাধন হয়। ব্যায়াম দ্বারা মাংসপেশী সমূহের নিয়মিত পরিচালনা হয়, তজ্জন্য ঐ সকল স্থানে রক্তসঞ্চালনের আধিক্য হয়, সুতরাং মাংসপেশী সমূহ সমধিক পরিপুষ্ট ও সবল হয়। জগতে সকল পদার্থের নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট ক্রিয়া আছে। জীবদেহস্থ যন্ত্র ও উপাদান সমূহেরও তদ্রূপ স্ব স্ব ক্রিয়া আছে। যদি কাহাকেও তাহার ক্রিয়া-সম্পাদনে ব্যাঘাত দেওয়া হয় অর্থাৎ তাহাকে কোন ক্রিয়া করিতে না দেওয়া হয়, তাহা হইলে ক্রমে ক্রমে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। মাংসপেশী সম্বন্ধেও ঠিক এই নিয়ম। যদি কোন মাংসপেশীকে নিষ্ক্রিয় রাখা হয়, তাহা হইলে উহা ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ ও অকর্ম্মণ্য হয়। ঊর্দ্ধবাহু সন্ন্যাসিগণের ঊর্দ্ধোত্থিত বাহু ইহার একটী সুন্দর দৃষ্টান্ত। উহা ক্ষীণ ও অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়, নাড়িতে চাড়িতে পারা যায় না তদ্রূপ অপর দিকে ক্রিয়া দ্বারা উহারা পুষ্ট, সবল ও কর্ম্মঠ হয়। শ্রমজীবীদের মধ্যে উপজীবীকার ক্রিয়ানুযায়িক মাংসপেশী-বিশেষের পুষ্টির আধিক্য ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এইজন্য ভার বাহকেদের গ্রীবার মাংসপেশী, যান-বাহকদের স্কন্ধের মাংসপেশী, নর্ত্তক-নর্ত্তকীদের চরণের মাংসপেশী, দাঁড়ি-মাজিদের বাহুর মাংসপেশী, অপর সাধারণ অপেক্ষা অধিকতর পুষ্ট, স্থূল ও সবল।

এক্ষণে কেহ বলিতে পারেন যে, আমার ধনের অভাব নাই, আমাকে খাটিয়া খাইতে হইবে না, পদব্রজে পথভ্রমণও করিতে হইবে না, সুতরাং আমার মাংসপেশীর পরিপুষ্টির বা কি আবশ্যক এবং ব্যায়ামেরই বা কি আবশ্যক?

ইহার উত্তর এই যে ব্যায়ামের দ্বারা যে কেবল হস্তপদাদির মাংসপেশীর পরিপুষ্টি সাধন হয়—তাহা নহে। হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, পাকাশয়, অন্ত্র, যকৃৎ মূত্রগ্রন্থি প্রভৃতি আভ্যন্তরিক যন্ত্র-সমূহের মাংসপেশীর ও পুষ্টিসাধন হয়। ব্যায়ামকালে হস্তপদাদির ন্যায় আভ্যন্তরিক যন্ত্রসমূহের ও পরিচালনা হয়। সেইজন্য ঐ সকল যন্ত্রের ক্রিয়ার ও উৎকর্ষসাধন হয়। ক্ষুধামান্দ্য ও অজীর্ণরোগে ইহার দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক সময় ঔষধ দ্বারা কোনও উপকার উপলব্ধি হওয়া না কিন্তু কেবল ব্যায়াম দ্বারা ক্ষুধা ও পরিপাক-শক্তি বৃদ্ধি হইতে দেখা যায়।

ব্যায়াম স্বাস্থ্যের পক্ষে হিতকর বটে, কিন্তু ব্যায়ামের আতিশয্য বা ক্লেশকর ব্যায়াম দ্বারা আবার স্বাস্থ্যহানি হয়। যদি স্বাস্থ্য-রক্ষার্থ প্রয়োজনীয় শারীরিক শ্রমকে ব্যায়াম নামে অভিহিত করা হয়, তাহা হইলে ক্লেশ শূন্য শ্রমই প্রকৃত ব্যায়াম। অধুনা ছাত্রবৃন্দ মধ্যে ব্যায়ামের বিশেষ প্রচলন হইয়াছে। যুবক কর্ম্মচারিগণও অনেকে ব্যায়ামপ্রিয়। পিতামাতা প্রভৃতি কর্ত্তৃপক্ষেরা বালকদের ব্যায়াম শিক্ষার জন্য উৎসাহ দিয়া থাকেন। বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণও তত্ত্বাবধায়কগণও ব্যায়ামের বিশেষ পক্ষপাতী। আজকাল সকল বিদ্যালয়েই ব্যায়ামের বন্দোবস্ত আছে। কিন্তু ব্যায়ামের পরিমাণের দিকে প্রায় কাহারও লক্ষ্য নাই। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে

যে ব্যায়াম দুই প্রকার, সাধারণ বা অবিমিশ্র ব্যায়াম এবং ক্রীড়াসংযুক্ত ব্যায়াম বা ব্যায়াম ক্রিয়া। অধুনা শেষোক্ত ব্যায়ামই সচরাচর লোকে শিক্ষা করিয়া থাকে, কিন্তু ক্রীড়াসংযুক্ত হওয়ায় উহা স্বাস্থ্যের পক্ষে হিতকর না হইয়া বরং অহিতকর হইয়া থাকে। কিসে খেলায় জিতিব, কিসে আমার খেলা সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও প্রশংসনীয় হইবে—এই আশায় শ্রমাতিশয্য ঘটিয়া থাকে। শুধু তাহা নহে, আবার ছাত্রদের মধ্যে কেহ কেহ জল খাবারের পয়সা জমাইয়া বা খোরাকির ব্যয় সংকোচ করিয়া খেলার সরঞ্জাম ও ক্লাবের চাঁদা জোগাড় করিয়া থাকে। ইহাদের পক্ষে ব্যায়ামক্রীড়া অত্যন্ত অনিষ্টদায়ক। একদিকে শ্রমাতিশয্য ও অপরদিকে খাদ্যের অনাটন। সুতরাং উপযুক্ত পরিপোষণের অভাবে শরীর সত্বর দুর্ব্বল ও রোগাক্রান্ত হইয়া পড়ে। ফুটবল, ক্রিকেট প্রভৃতি যে সকল ব্যায়াম পাশ্চাত্য অনুকরণে এদেশের সহর ও পল্লীগ্রাম সকল স্থানেই বহু প্রচলিত হইয়াছে, সেগুলি কেবল বিলাসিতা মিশ্রিত, স্বাস্থ্যের পক্ষে হিতকর বলিয়া বোধ হয় না, কাজেই অর্থনাশক ও বিলাসিতাবর্দ্ধক। দেশকালঅবস্থা—ভেদে ব্যায়ামের প্রকারভেদ হওয়া আবশ্যক। যে ব্যায়ামে অর্থক্ষয় না হইয়া বরং অভাব আরম্ভ হয় সেরূপ ব্যায়াম অভ্যাস কি যুক্তি-সঙ্গত! পল্লীগ্রামবাসী বালক ও যুবক-বৃন্দ ফুটবলক্ষেত্রে নৃত্য করিয়া হাত পা ভাঙ্গার পরিবর্ত্তে যদি কৃষিক্ষেত্রে একটু একটু নিয়মিত পরিশ্রম করেন, তাহা হইলে স্বাস্থ্যরক্ষা ও তৎফলাধিক্য—এককালে উভয় কার্য্যই সমাধা হয়। সহরবাসীরাও ইচ্ছা করিলে সময়ে সময়ে নিকটবর্ত্তী পল্লীগ্রামে গিয়া এইরূপ হল চালনাদি ব্যায়াম অভ্যাস করিতে পারেন।

ডাঃ শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাস।

"নবেগান্ ধারণীয়"।

স্বাভাবিক নিয়ম লঙ্ঘন করিলেই রোগোৎপাদন হইয়া থাকে—ইহা স্বতঃসিদ্ধঃ। আমরা বহু সময় স্বাভাবিক নিয়মের প্রতি লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইয়া বহুবিধ উৎকট ব্যাধিগ্রস্থ হইয়া থাকি, স্বাস্থ্যরক্ষার কতকগুলি নিয়ম সাধারণ রূপে সকলেরই জ্ঞাত হওয়া উচিত।

আমাদিগের বর্ত্তমান বিষয়ের আলোচ্য বিষয়—"নবেগান্ ধারণীয়" অর্থাৎ মল-মূত্রাদির বেগ ধারণ করিবেনা। এ সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য মহর্ষি চরক যাহা উপদেশ দিয়াছেন এস্থলে ঐ মূল্যবানীয় শ্লোক উদ্ধৃত করিলাম—

"নবেগান্ ধারয়েদ্ধীমান জাতান্ মূত্রপুরীষয়োঃ
ন রেতসো নবাতস্য নবম্যাঃ ক্ষবথোর্নচ॥
নোকারস্য ন জৃম্ভায়া ন বেগান্ ক্ষুৎপিপাসয়োঃ।
ন বাষ্পস্য ন নিদ্রায়া নিশ্বাসস্য শ্রমেনচ।
এতান্ ধারয়তো জাতান্ বেগান্ রোগা
ভবন্তিয়ে॥

(চরক)

অস্যার্থ ধীমান ব্যক্তি মূত্র, পুরীষ (মল) অধোবায়ু, বমি, ক্ষবথু (হাঁচি) উদ্গার, জৃম্ভা (হাইতুলা) ক্ষুধা, পিপাসা, অশ্রু (চোখের জল) নিদ্রা কিম্বা শ্রমজন্য নিশ্বাসের বেগ

ধারণ করিবে না। ঐ সমস্ত ধারণ করিলে বেগরোধ জন্য ব্যাধি জন্মে।

বেগরোধ জনিত যে সকল ব্যাধি জন্মে, আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে তাহাকে "উদাবর্ত্ত" বলে,—উদাবর্ত্তে বায়ুর প্রাধান্য অধিক থাকে।

ভাবমিশ্র বলিয়াছেন—

বাতবিন্মূত্র জিম্ভাশ্রু ক্ষবোদ্গার বমীন্দ্রিয়ঃ।
ক্ষুত্তৃষ্ণোচ্ছ্বাস নিদ্রানাং ধৃত্যোদাবর্ত্তসম্ভবঃ॥
(ভাবপ্রকাশঃ)

উল্লিখিত শ্লোকের অর্থও চরোক্ত শ্লোকের অনুরূপ।

এক্ষণ কোন্ কোন্ বেগধারণ করিলে কোন্ কোন্ ব্যাধি জন্মিতে পারে ক্রমশঃ তাহার উল্লেখ করা যাইবে এবং ঐ সমস্ত কারণ জাত ব্যাধির চিকিৎসা-তত্ত্বও পরে বলা হইবে।

চরক-ঋষি বলিয়াছেন বেগধারণ জন্য যক্ষা রোগ জন্মিয়া থাকে।

অধোবায়ুর বেগধারণে—মূত্র ও মলের রুদ্ধতা, উদরাধ্মান (পেট ফাঁপা) ক্লান্তি বোধ, উদরে বেদনা ও সূঁচ ফুটার ন্যায় যাতনা, এবং গুল্মাদি দুঃসাধ্য ব্যাধি সকল উৎপন্ন হইয়া থাকে।

পুরীষ (মল) বেগধারণে—পেটে বেদনার সহিত গুড়্গুড় শব্দ, পক্বাশয়ে (পাকস্থলীতে) শূলবৎ বেদনা, গুহ্যদ্বারে কর্ত্তন বং পীড়া অনুভব, মল রুদ্ধতা, উদ্গার, এবং কখনও কখনও মুখের দ্বারা মল নির্গত হইয়া থাকে।

মূত্রবেগ ধারণে—বস্তি ও (তল পেটের নিম্নভাগ) শিশ্নে বেদনা, মূত্রকৃচ্ছ্র, মস্তকে বেদনাপ্রযুক্ত দেহ বক্র, এবং বঙ্ক্ষণদেশে (কুচ্কি) বেদনা হইয়া থাকে।

জৃম্ভা (হাই) বেগধারণে—মন্যা (গ্রীবার পশ্চাৎ ভাগের শিরা) ও গলদেশের স্তব্ধতা, বায়ু প্রধান তীব্র শিরোরোগ, চক্ষুরোগ, নাসারোগ, মুখরোগ, ও কর্ণরোগ জন্মিয়া থাকে।

অশ্রু (নেত্রজল) বেগধারণে—আনন্দাশ্রু অথবা শোকাশ্রু রোধে মস্তক ভারবোধ, তীব্র চক্ষুরোগ ও সর্দ্দি উৎপন্ন হয়।

হাঁচি বেগধারণে-মন্যার—(ঘাড়) স্তব্ধতা, শিরঃশূল, অর্দ্দিত (মুখ বাঁকিয়া যাওয়া) অর্দ্ধাবভেদক (আধকপালে মাথা ধরা) ও ইন্দ্রিয় সকলের দুর্ব্বলতা হইয়া।

উদ্গার বেগধারণে—কণ্ঠ ও মুখের পূর্ণতা, হৃদয় ও আমাশয়ের সূঁচী বিদ্ধ বৎ অত্যন্ত বেদনা, কণ্ঠে অব্যক্ত শব্দ, উচ্ছ্বাসাদিরোধ, হিক্কা, প্রভৃতি বায়ুজনিত ব্যাধি জন্মে।

বমি বেগধারণে—শরীরে কণ্ডু (চুল্কান) স্ফোট (বোলতা দংশনের ন্যায় ফুলিয়া উঠা) অরুচি, মুখ-বিকৃতি, শোথ, পাণ্ডু, জ্বর, কুষ্ঠ, হৃল্লাস ও বিসর্প (কুষ্ঠের প্রকার ভেদ রক্ত দুষিত ব্যাধি) রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

শুক্র বেগধারণে—মূত্রাশয়ে মলদ্বারে ও অণ্ডকোষে শোথ, বেদনা জন্মে, মূত্র রোধ হয়, শুক্রাশ্মরী (পাথরী) বৃথা শুক্র স্রাব ও বাত কুণ্ডলিকা (বাধিয়া বাঁধিয়া মূত্র নির্গত) প্রভৃতি বিবিধ কঠিন রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ক্ষুধা বেগধারণে—তন্দ্রা, শারীর-বেদনা, অরুচি, শ্রান্তি বোধ এবং চক্ষুর দীপ্তি হ্রাস হইয়া থাকে, ইহাতে পিত্তও বিকৃতি হইয়া ক্ষুধামান্দ্য হয়।

তৃষ্ণা বেগধারণে—কণ্ঠশোষ, মুখশোষ, শ্রবণশক্তির হ্রাস, হৃদয়ে বেদনা, জিহ্বার জড়তা হইয়া থাকে।

শ্বাস বেগধারণে—(পরিশ্রান্ত ব্যক্তির দীর্ঘ শ্বাস ধারণে) হৃদ্‌রোগ, মোহ এবং গুল্ম প্রভৃতি কঠিন রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

নিদ্রা বেগধারণে—জৃম্ভা (হাঁই তোলা) শরীর বেদনা, তন্দ্রা এবং দেহ, চক্ষু ও মস্তকে অত্যন্ত জড়তা হইয়া থাকে।

উল্লিখিত কারণ সমূহ ব্যতীত রুক্ষ অন্নাদি ভোজন জন্য বায়ু বৃদ্ধি হেতু উদাবর্ত্ত রোগ জন্মিয়া থাকে।

এখন পাঠক পাঠিকাগণ বুঝিয়া দেখুন যে সমস্ত নিয়ম রক্ষা আমরা সামান্য জ্ঞানে অবহেলা করি, ঐ সমস্ত নিয়ম লঙ্ঘনের কুফল কত দূর পর্য্যন্ত হইতে পারে। সামান্য কারণে উৎকট ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া স্বাস্থ্য হারাইতে হয়।

বর্ত্তমান কালে সভ্যতার অন্তরালে, সভ্যতার খাতিরে আমরা যে কত প্রকারে স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া ব্যাধিগ্রস্ত হইতেছি, তাহার ইয়ত্তা নাই, দেখা যায় কোন সভ সমিতিতে উপস্থিত হইলে হাঁচি, কাসি, অধোবায়ু নিরোধ পূর্ব্বক ৪।৫ ঘণ্টাকাল অতিবাহিত করিতে হয়, সময় সময় মল-মূত্রের বেগ ধারণ করিতে ও হইয়া থাকে। ইহাতে কি স্বাস্থ্যহানি হইয়া থাকে না!

চাকরী বৃত্তি যাহাদিগের অভ্যাস, তাহাদিগের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তি অনেক সময় মল মূত্রের বেগ রোধ করতঃ কত দূর শারীরিক অনিষ্ট সাধিত করিয়া থাকেন, তাহা আমরা বলিলাম, আশাকরি আমাদিগের "আয়ুর্ব্বেদ" পাঠক পাঠিকাগণ বেগ ধারণের কুফল বুঝিয়া বিশেষ সতর্ক থাকিবেন। অতঃপর আমরা বেগ ধারণ জন্য ব্যাধি সমূহের চিকিৎসা তত্ত্ব আলোচনা করিব।

কবিরাজ শ্রীহরিপ্রসন্ন রায় কবিরত্ন

সমালোচনা।

কলিত চিকিৎসা বিধান। কবিরাজ শ্রীরাখালচন্দ্র দত্ত প্রণীত। শ্রীশশীভূষণ দত্ত কবিরাজ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। পোঃ সাভার, কবিরাজবাটী, ঢাকা। মূল্য ৩৲ টাকা। এই গ্রন্থে প্রত্যেক রোগের নিদান এবং রোগ প্রশমনের জন্য ঔষধগুলি বাঙ্গালা-ভাষায় লিখিত হইয়াছে। বিশাল আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে চিকিৎসা পুস্তকের অভাব নাই, কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় সকল গুলির সারসঙ্কলন পূর্ব্বক যদি কোন গ্রন্থ প্রকাশ করা যায়, তাহা হইলে এখনকার দিনে অল্প শিক্ষিত চিকিৎসক মণ্ডলীর তাহা বিশেষ উপকারে আসিতে পারে। আমাদের দেশে এখনকার সংস্কৃত ভাষানভিজ্ঞ চিকিৎসক যথেষ্ট, পরলোকগত ডাক্তার যদুনাথ মুখোপাধ্যায় এই জন্যই অশিক্ষিত ডাক্তারগণের শিক্ষা-উদ্দেশ্যে "সরল জ্বর চিকিৎসা" প্রণয়ণ করিয়াছিলেন। সে গ্রন্থের প্রচারে তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধও হইয়াছিল, অনেক হাতুরে চিকিৎসক সে পুস্তকের কৃপায় অনেক স্থলে চিকিৎসার কৃতিত্ব দেখাইতে সমর্থও হইয়াছিল। হাতুরে চিকিৎসক দিগের জন্য এক দিকে সমাজের ক্ষতি হইতেছে সত্য, অপর দিকে কিন্তু দেশে যে পর্য্যন্ত সুচিকিৎসকের সংখ্যা পূরণ যথেষ্ট ভাবে না হইতেছে, সে পর্য্যন্ত তাহাদের আবশ্যকতাও আছে। ভারতবর্ষের লোক সংখ্যা এবং সুশিক্ষিত চিকিৎসকের তুলনায় এখনও আটচল্লিশ হাজার চিকিৎসকের প্রয়োজন। সেই আটচল্লিশ হাজারের সংখ্যা পূরণ না হওয়া পর্য্যন্ত হাতুরে চিকিৎসকদিগকে সমাজে স্থান

না দিলে আপাততঃ উপায় নাই। আর এক কথা, যে সময় দেব ভাষা বা সংস্কৃত ভাষা দেশ মধ্যে প্রচলিত ছিল, সেই সময় আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র সংস্কৃত ভাষাতেই রচিত হয়। সাধারণ লোকের মধ্যেও সে সময় সংস্কৃত ভাষায় কথোপকথন চলিত, সেজন্য আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষার্থির পক্ষে সংস্কৃত ভাষায় আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষায় কাহারও অসুবিধা হইত না। এখন দেশ-কালোপযোগী আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত হওয়া আবশ্যক হইয়াছে; শুধু বাঙ্গালায় কেন, আয়ুর্ব্বেদের উন্নতি করিতে হইলে—ইংরাজীতেও আয়ুর্ব্বেদের অনুবাদ প্রকাশিত হওয়া উচিত। কিন্তু সে অনুবাদ গ্রন্থ মূলের সহিত ঠিক থাকা কর্ত্তব্য। "কলিত চিকিৎসাবিধান"—প্রণেতার উদ্দেশ্য মন্দ নহে, তিনি শাস্ত্র অবলম্বনে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা অনেকের উপকারে আসিবে, কিন্তু যে সকল স্থলে নিজের মত চালাইয়াছেন, সে গুলি সাহস করিয়া সকলে মানিতে পারিবে কিনা—সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। এক এক স্থলে শাস্ত্রীয় মত ছাড়িয়া এরূপই নিজের মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, তাহা কোন ক্রমে গ্রহণ যোগ্য নহে। ৩য় পৃষ্ঠায় সততক জ্বরের চিকিৎসায় "হরীতকী বটী" ব্যবহারের পর প্রত্যহ প্রাতঃস্নান করিবার পরামর্শ দিয়াছেন, ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় "প্রবাহিকারি লেহ" প্রস্তুতে স্পিরিট মিশাইতে উপদেশ দিয়াছেন—এ সকল মত কেমন করিয়া গ্রহণ করা যাইবে? ৫০ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন,—যে জ্বর উৎপত্তি মাত্রেই বিষমে পরিণত হয় তাহা অসাধ্য। আমাদের মতে উহা দুঃসাধ্য।" এ স্থলে শাস্ত্রীয় মত ছাড়িয়া তাঁহাদের মত গ্রহণ সুবুদ্ধির পরিচায়ক নহে। এক এক স্থলে নিজেদের ঔষধ প্রচারের বিজ্ঞাপনের মত "এইরূপ বেদনায় আমাদের বাতকুলান্তক ঘৃতমালিস করিলে সদ্য সদ্য ফল দর্শিয়া থাকে"—প্রভৃতি কথাগুলি ব্যবহার না করিলেই ভাল হইত। যাহা হউক গ্রন্থ-প্রচারের উদ্দেশ্য যে সাধু, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ব্রহ্মচর্য্য সাধন।—শ্রীযোগেশচন্দ্র সেন, এল, এম, এস এবং শ্রীহেমচন্দ্র সেন এল, এম, এস প্রণীত। কলিকাতা ৭৮ নং রসারোড্ (নর্থ) হইতে গ্রন্থকারদ্বয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ১৲ টাকা। ব্রহ্মচর্য্য পালনে শারীরিক সামর্থ যেরূপ বর্দ্ধিত হয়, ইহা দ্বারা সেইরূপ মানসিক পবিত্রতাও সাধিত হইয়া থাকে। বাল্যকাল হইতেই ইহাতে অভ্যস্ত হওয়া উচিত। সেকালে গুরু গৃহে অধ্যয়ন নিরত বালকমণ্ডলী ইহাতে অভ্যস্তও থাকিত লোকে সুস্থকায় এবং দীর্ঘজীবিও হইত, এখন তাহা লোপ পাইয়াছে। ফলে অপরিণত বয়স হইতে অযথা শুক্রক্ষয়ে বাঙ্গালার যে ভীষণ সর্ব্বনাশ হইতেছে, তাহা ভাবিলেও শিহরিতে হয়। শাস্ত্রকার বলিয়াছেন,—'মরণং বিন্দুপাতেন জীবনং বিন্দুধারণাৎ"। অর্থাৎ শুক্রক্ষয়ের ফল মৃত্যু এবং শুক্র ধারণের ফল দীর্ঘজীবন। এই দীর্ঘজীবন লাভ করিবার জন্য সকল সময়ে প্রকৃতি-পুরুষের মিলনের ব্যবস্থা শাস্ত্রে কোন স্থানেই নাই। এ গ্রন্থে এ সকল কথার আলোচনা অতি উত্তমরূপে করা হইয়াছে। আমরা এ সকল বিষয়ের আলোচনা খুব বেশী পরিমাণেই করিয়া থাকি। ব্রহ্মচর্য্যার অভাবে মহিলামহলেও যে ক্ষতি হইতেছে, তাহার কথাও গ্রন্থ মধ্যে দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু উহা বড় সংক্ষিপ্ত। শুক্রমেহ এবং পুরুষত্ব হানির কারণই যে অপরিণতঃ বয়সে ব্রহ্মচর্য্যার অভাব সে বিষয়ে আর কথা কি? প্রত্যেক অভিভাবকের এ সকল কথা যত্নপূর্ব্বক মনে রাখিয়া এই গ্রন্থের উপদেশ পালন করা উচিত। ব্রহ্মচর্য্যের ফল-কীর্ত্তন ব্যপদেশে গ্রন্থমধ্যে অমর কবি বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতাপ, সত্যানন্দ, জীবানন্দ, মহেন্দ্র সিংহের নামোল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার প্রথমে মহাভারতের দেবব্রত বা ভীষ্মের নাম উল্লেখ করিলে কিন্তু আমরা বেশী সুখী হইতাম। ওরূপ আদর্শ ব্রহ্মচারী-চিত্র আর যে একটিও পাওয়া যায় না। যদি আমরা এই ব্রহ্মচর্য্য পালনই তাঁহার ইচ্ছা-মৃত্যুর কারণ নির্দ্দেশ করি, তাহা হইলেই বা দোষ কি! যাহা হউক এই দুর্দ্দিনে এরূপ একখানি সর্ব্ব প্রধান প্রয়োজনীয় গ্রন্থের প্রচারে সমাজের মঙ্গল হইবার আশা করা যায়। প্রত্যেক বালক, প্রত্যেক যুবক এবং প্রত্যেক বৃদ্ধ ব্যক্তি এই গ্রন্থ পাঠ করুন। কাগজ এবং ছাপা উৎকৃষ্ট।

মাসিকপত্র ও সমালোচক।

২য় বর্ষ। | বঙ্গাব্দ ১৩২৪—অগ্রহায়ণ। | ৩য় সংখ্যা।

বিজয়া-সম্মিলন।

আমাদের গ্রাহক, অনুগ্রাহক, পাঠক, পৃষ্ঠপোষক এবং অভিভাবকগণকে আমরা বিজয়ার যথাযোগ্য প্রণাম, নমস্কার, আশীর্ব্বাদ ও সম্ভাষণ জানাইতেছি।

বিজয়াদশমা চুকিয়া গিয়াছে—সে ত অনেক দিন; আজ তবে "বিজয়ার সম্ভাষণ" কেন? কিন্তু সত্য করিয়া ব'ল দেখি ভাই! এই কয়টী দিনের ব্যবধানে কি "বিজয়ার" সম্বন্ধ ফুরায়? আমাদের বিজয়াই যে চিরদিন! আমাদের শত সাধের মহিমময়ী মহাসপ্তমী দেখিতে দেখিতে চলিয়া যায়; অষ্টমী—চ'ক্ষের পলকে কালের কোলে ঢলিয়া পড়ে, নবমী—বিদায়ী নিঃশ্বাসে কাঁপিয়া উঠে; যষ্ঠী আলোক-পুলকের উদ্বোধন—"আগমনীর" আকাঙ্ক্ষাময়ী সাহানায়, বেহাগের বিরহ ঢালিয়া মুহূর্ত্তেই নিস্পন্দ হয়; থাকে কেবল—বেদনা-বিদ্ধ—"বিজয়াদশমী" আমাদের উৎসব দুর্দ্দিনের জন্ম, আমাদের উল্লাস প্রকৃতির তীব্র বিদ্রূপ; আমাদের দুঃখ দৈন্যের মধ্যে জাগিয়া থাকে—কেবল সেই শুভ্রবসনা উদাসিনী "বিজয়া দশমী!"

মা আসিয়াছিলেন—তিনটী দিনের জন্য। মা আসিয়াছিলেন—সন্তানকে কর্ম্মক্ষেত্রে শিক্ষা দিতে। সে শিক্ষা বুঝিয়াছ কি ভাই? অসি-পাশ-মেখলা রত্নোজ্জ্বল-কিরীটিনী আনন্দময়ী মা—সাক্ষাৎ "দেব শক্তি," পাশব বলের প্রতিকৃতি পশুরাজ সিংহের পৃষ্ঠদেশে—মা'র পূর্ণ স্ফুরণ রাতুল চরণ! কাম ক্রোধাদি পশু শক্তিকে সংযম বলে পদ-দলিত করিতে পারিলে,—তোমার হৃদ্-কমলে দেবশক্তি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে। সে মহাশক্তি তোমারই স্বাস্থ্যরূপে—তোমায় ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান জ্যোতির্ম্ময় করিয়া তুলিবে। জগজ্জননীর ইহাই ত শিক্ষা!

মা'র দক্ষিণে রাজরাজেশ্বরী লক্ষ্মী, বামে—বিজ্ঞান-বিদ্যা-রূপিণী সর্ব্বশুক্লা সরস্বতী। ইহাতে

কি বুঝিলে ভাই? শুধু শক্তিতে কাজ হয় না। বিপুল-বিসার কর্ম্মক্ষেত্রে—শক্তির সঙ্গে ধনও বিদ্যা থাকা চাই। শক্তি, ধন ও বিদ্যা এই তিনটি থাকিলেই জগতে কার্য্য সিদ্ধি হয়। তাই মার সঙ্গে—সিদ্ধিদাতা গণ-নায়ক। কিন্তু, তুমি ক্ষীণ-পুণ্য দীনবুদ্ধি মর্ত্ত্যের মানব—যদি শক্তি ধন ও বিদ্যার গর্ব্বে—উচ্ছৃঙ্খল হও—তোমার শাসনের জন্য পুঙ্খিতশর দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়। তোমার দেশ—ঋষির দেশ,—শান্তির নিকুঞ্জবন, এখানে রক্তমাংসের দুর্নিবার ক্ষুধা—ভোগের ইন্ধনে জ্বলিয়া উঠে না। এখানে লালসার তাড়নায় শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ ব্যাকুল হইয়া ছোটে না, এখানে অসংযমের দীপ্ত আকাঙ্ক্ষায় খাদ্য খাদকে বিরোধ ফোটে না। এখানে ভগবতীর চরণ প্রান্তে, মুষিক, সর্প, ময়ূর একসঙ্গে বিহার করে। হায় রে! মাতৃদত্ত এমন শিক্ষাও আমরা বুঝিতে পারি না! মার বিশ্বব্যাপিনী বিরাট প্রতিমা—আমরা ত চাহিয়া দেখি না! আমরা শুধু দেখি—চিণ্ময়ীর মৃন্ময়ী ঠাট, শুনি অর্থশূন্য অসার মন্ত্র পাঠ।

তোমার সকল শাস্ত্রের একমাত্র কেন্দ্র "আয়ুর্ব্বেদ"—তোমার শূন্য "চণ্ডী-মণ্ডপ",—তোমার মুহূর্ত্তের প্রমাদ-উৎসব ব্যসনের ক্ষণিক লোভে—তোমার স্বাস্থ্য সমুজ্জ্বল,—"শক্তির" প্রতিষ্ঠাকে বিস্মৃতির জলে বিসর্জ্জন দিয়াছে। তোমার সকল ঐশ্বর্য্য সকল সুখ—স্বপ্নেরই মত শেষ হইয়া গিয়াছে! তোমার বুকের ভিতর "বিজয়া" আসিয়াছে। তবে, বিজয়ায় ব্যথা পাও কেন? বিজয়ার দীর্ঘশ্বাসে—মিলনের আনন্দ ভুলিয়া যাও কেন? কে বলে তোমার বিজয়া দশমী বিষাদময়ী? তুমি হিন্দু সন্তান, ঋষি বংশধর,—"বিজয়া দশমী" তোমার মহাপর্ব্ব, তোমার মিলনের পর্ব্ব, সিদ্ধির পর্ব্ব, আনন্দের পর্ব্ব। বিজয়ায় তোমার নবজীবনের আরম্ভ, সাধনার নব সূচনা; বিজয়ার পবিত্র স্মৃতি বুকে করিয়া আজ তোমায় অগ্রসর হইতে হইবে। আজ তোমায় সকল জীর্ণতা পরিত্যাগ করিয়া পুরাতন হিংসা দ্বেষ ভুলিতে হইবে। সিদ্ধির হর্ষ-ধারায় মনের মালিন্য মুছিয়া ফেলিয়া, শান্তিজল গ্রহণ করিতে হইবে। আজ তুমি—বাধা বিঘ্নহীন,—চাপল্য-বর্জ্জিত সাধক; তোমার বোধনের উল্লাস থামিয়া গিয়াছে, আরত্রিকের বাদ্য-ভাণ্ড নীরব হইয়াছে, সপ্তমীর স্বপ্ন টুটিয়াছে, অষ্টমীর জ্যোতির্ম্ময়ী দীপমালা নিবিয়াছে, নবমীর উৎসবানন্দ অতীতে মিশিয়াছে;—আজ তোমার সম্মুখে—মাধুর্য্যময়ী "বিজয়া"। দালানে মা'র প্রতিমা নাই, উৎসবে কোলাহল নাই,—"বিসর্জ্জন আসিয়া আজ হর্ষ প্রতিষ্ঠাকে লইয়া গিয়াছে।" আজ আর তোমার কিছু নাই. কিন্তু আজ যাহা তুমি লাভ করিয়াছ, তাহা অতি অপূর্ব্ব; সে জিনিষ—সপ্তমী অষ্টমী নবমীর উৎসব-কোলাহলের মধ্যে তুমি ত খুঁজিয়া পাও নাই।

"নব পত্রিকা"—তোমার পল্লী-প্রীতির শেষ স্মৃতি, দুর্গাপ্রতিমা তোমার স্বাস্থ্যরূপা মহাশক্তি। আজ তোমার মণ্ডপ শূন্য, কিন্তু তোমার নাই কি? আকাশে এখনও সেই কৌতুকতরল জ্যোৎস্নালোক, বাতাসে বিকশিত পদ্মের মৃদু সুরভি, জলে—কামনার বীচি-চাঞ্চল্য, স্থলে সুপক্ক শস্যের স্বর্ণ সঞ্চয়। তোমার কিসের অভাব? আজ তোমার "বিজয়া দশমী,"—শূন্য মণ্ডপে দাঁড়াইয়া, শত্রু-মিত্রকে আলিঙ্গন করিয়া, আজ তোমাকে বিজয়ার মহামন্ত্র পাঠ করিতে হইবে,—

পুনরাগমনায় চ—

হে আমার আয়ুর্ব্বেদ! হে আমার স্বাস্থ্য-রূপা মহাশক্তি! হে আমার "আমিত্বের"-অধ্যায়! স্বাবলম্বনের বিকাশ! তুমি আবার আসিও। আমি তোমায় বুঝি আর না বুঝি, তোমার সেবা করি আর না করি—তুমি আবার আসিও। যে মূর্ত্তিতে—সরস্বতী-দৃষদ্বতীর কূলে ঋষি-পরিষদের অক্লান্ত সাধনায়—তুমি স্বর্গ হইতে মর্ত্ত্যে নামিয়াছিলে,—আবার তুমি সেই মূর্ত্তিতে প্রকট হইও। আমরা তোমায় প্রণাম করিব—

"য ওষধীষু যো বনস্পতিষু
তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ।"

নাগার্জ্জুন

ভারতীয় চিকিৎসা-ক্ষেত্রে—"নাগার্জ্জুনের" নাম সুবিদিত, তাঁহার জীবন-কাহিনী তাদৃশ সুপরিচিত নহে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমি সংক্ষেপে নাগার্জ্জুনের পরিচয় লিপিবদ্ধ করিব।

"নিবন্ধ-সংগ্রহ" নামক টীকা-কার ডল্লনা-চার্য্যের মুখেই আমরা নাগার্জ্জুনের নাম প্রথম শুনিতে পাই। "প্রতিসংস্কর্ত্তাপি ইহ নাগার্জ্জুন এব"—অর্থাৎ নাগার্জ্জুন সুশ্রুত সংহিতার প্রতি-সংস্কার করিয়াছিলেন। আয়ুর্ব্বেদ-তন্ত্রকর্ত্তা বাগ্‌ভটও নাগার্জ্জুনের নামোল্লেখ করিয়াছেন। চক্রপাণি দত্তের "চক্র-দত্ত" নামক প্রসিদ্ধ সংগ্রহ পুস্তকে "নাগার্জ্জুনাঞ্জন" এবং "নাগার্জ্জুন যোগ" নামক দুইটী ঔষধ উদ্ধৃত হইয়াছে। ঐ দুইটী ঔষধ নাকি—পাটলীপুত্র নগরে স্তম্ভে নাগার্জ্জুন স্বয়ং উৎকীর্ণ করাইয়াছিলেন।

"কক্ষপুট" নামক একখানি চিকিৎসাগ্রন্থ —নাগার্জ্জুন কর্ত্তৃক বিরচিত বলিয়া বিখ্যাত। নাগার্জ্জুন যেখানে যাইতেন, গ্রন্থখানি সঙ্গে লই-তেন। কক্ষপুটে ধারণ করিতেন বলিয়াই "কক্ষ-পুট" নামে উক্ত গ্রন্থের নামকরণ হইয়াছে।

অতএব দেখা যাইতেছে - নাগার্জ্জুন এক-জন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। চিকিৎসাবিজ্ঞানে তাঁহার অসাধারণ অধিকার ছিল।

এক্ষণে দেখা যাউক নাগার্জ্জুন কোন্ শতাব্দির লোক? কাশ্মীরের ইতিহাস "রাজ তরঙ্গিনী" একখানি প্রাচীন গ্রন্থ। এই রাজ তরঙ্গিনীর মতে—কাশ্মীর দেশ নাগার্জ্জুনের জন্ম-ভূমি। যথা—

"ততঃ ভগবতঃ শাক্যসিংহস্য পুর-নিবৃতেঃ॥
অস্মিন্ সহলোক ধাতৌ সার্দ্ধং বর্ষশতং হ্যগাৎ
বোধিসত্বশ্চ দেশেহস্মিন্ একভূমীশ্বরোহভবৎ।
স তু নাগার্জ্জুনঃ শ্রীমান্ ষড়র্হ বনসংশ্রয়ী॥"

ভগবান বুদ্ধদেবের পরি নির্ব্বাণের দেড়শত বৎসরের পর, কাশ্মীর দেশে নাগার্জ্জুন প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।

প্রসিদ্ধ তিব্বতীয় গ্রন্থ "জাম—পাল—র্চ—গ্যুই" প্রামাণিক বলিয়া বিখ্যাত। এই গ্রন্থে একটী শ্লোক দেখিতে পাওয়া যায়।

দে—সিন্ শেগ—প-ঙ-দেস্—নেস্
লো—নি—ষি—গ্যু লোন্—প ন।
গে—লোঙ—লু-ষিস্ দো—বোদ্ জুঙ
তন্—প—ল—দদ্ চিঙ্ কন্॥

ইহার অর্থ বুদ্ধদেব ইহ জগৎ হইতে মহা-প্রস্থান করিবার চারিশত বৎসর পরে ভিক্ষু—নাগার্জ্জুন জন্মগ্রহণ করিয়া বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের অনেক উপকার করিয়াছিলেন। এই তিব্বতীয়

গ্রন্থের মতে—দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত বিদর্ভ দেশ—নাগার্জ্জুনের জন্মভূমি। তিনি ব্রাহ্মণকূলে আবির্ভূত হইয়া, প্রথম যৌবনেই বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হন। তাঁহার উপদেশে মুগ্ধ হইয়া—বহু সহস্র নর নারী বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল। নাগার্জ্জুন রাজার মত সম্মান লাভ করিয়াছিলেন, বৈদিক ধর্ম্মের উপর বৌদ্ধ-প্রভাব সংস্থাপন করিয়াছিলেন, পর্য্যটকের ব্রতগ্রহণ করিয়া সমগ্র এসিয়ায় ভারতের গৌরব প্রচার করিয়াছিলেন। কত দেশের কত পণ্ডিত তাঁহার কাছে পরাজয় স্বীকার করিয়াছিল। কত রত্ন-কিরীটী রাজমস্তক তাঁহার পদতলে বিলুণ্ঠিত হইয়াছিল। তাহার কর স্পর্শে—কত জীর্ণ দেহে নবজীবনের সঞ্চার হইয়াছিল, কত অনাথ আতুর ব্যাধি-যন্ত্রণা ভুলিয়াছিল, কত তাপিত তৃষিত ব্যথিত হৃদয়ের আকুল বেদনা জন্মের মত ঘুচিয়া গিয়াছিল।

কিন্তু এমন যে নামজাদা নরনারায়ণ নিত্য-নিরত-কীর্ত্তি নির্ব্বেদ মুক্ত নাগার্জ্জুন—এদেশে তাঁহার পবিত্র জীবনের ধারাবাহিক কোনও ইতিহাস দেখিতে পাওয়া যায় না। কবিরাজ মহাশয়েরা তাঁহার কোনও খবর রাখেন না। নাগার্জ্জুনের জীবন কাহিনী জানিতে হইলে, আমাদিগকে তিব্বত চীন বা জাপানে গিয়া তথাকার মনীষিবৃন্দের শরণাগত হইতে হয়! ইহার চেয়ে বিস্ময়-কর ব্যাপার আর আছে কি?

বৌদ্ধযুগে—ভারতবর্ষে একজন প্রবল পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন—তাঁহার নাম "ভোজ ভদ্র।" ইনি অত্যন্ত "বৌদ্ধ বিদ্বেষী" এবং চণ্ড-স্বভাব শাসন কর্ত্তা ছিলেন। চিকিৎসক রূপে নাগার্জ্জুন—এই ভোজভদ্রের রাজধানীতে আহূত হন। প্রথমে—নাগার্জ্জুনের চিকিৎসা-কৌশলে—ভোজভদ্রের শ্রদ্ধা জন্মিলে, নাগার্জ্জুন ধর্ম্মোপদেশ দানে রাজার মতের পরিবর্ত্তন করেন। রাজা—বৌদ্ধধর্ম্মী, নাগার্জ্জুনের শিষ্য হন। এই ব্যাপারে—রাজ সংসারে নাগার্জ্জুনের এতদূর প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল যে অনেকে নাগার্জ্জুনকেই প্রকৃত রাজা বলিয়া জানিত। ক্রমাগত ৭ বৎসর ধরিয়া চেষ্টা করিয়া, নাগার্জ্জুন ভোজভদ্রকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন।

নাগার্জ্জুন—বৌদ্ধাচার্য্য শরহের শিষ্য ছিলেন। নালন্দের বিশ্ববিদ্যালয়ে নাগার্জ্জুন বিদ্যাশিক্ষা করেন। বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া—পরোপকার-বৃত্তি-প্রণোদিত হইয়া তিনি আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র ও পাঠ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিভা-বলে—আয়ুর্ব্বেদের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। তিনি রাসায়নী বিদ্যায় বহু রহস্যই আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এই জন্য "রসরত্ন সমুচ্চয়" নামক রসগ্রন্থের রচয়িতা—নাগার্জ্জুনের প্রতি যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা দেখাইয়াছেন।

অভিধানে নাগার্জ্জুনের অনেক গুলি নাম দেখিতে পাওয়া যায় যথা;—

নাগার্জ্জুনঃ সুরানন্দো
নাগবোধির্যশোধনঃ।
খণ্ড কাপালিকো ব্রহ্মা
গোবিন্দো লপকো হরিঃ॥

তিব্বতীয় গ্রন্থে * নাগার্জ্জুন সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতে পারা যায়। কিন্তু—নাগার্জ্জুনের ঠিক আবির্ভাব কাল স্থির করা দুরূহ ব্যাপার। এখন কেহ কেহ প্রমাণ করিতে চাহেন—সুশ্রুত সংহিতা খৃষ্ট পূর্ব্ব তৃতীয় কিম্বা চতুর্থ শতাব্দিতে রচিত হইয়াছিল। নাগার্জ্জুন এই সুশ্রুতের প্রতি সংস্কার এবং উত্তর তন্ত্র রচনা করেন। আবার কেহ কেহ বলেন—নাগার্জ্জুন খৃষ্টীয় প্রথম বা দ্বিতীয় শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। পঞ্চম শতাব্দিতে রচিত "Bower

Manuscript" হইতে জানা যায়—পঞ্চম শতাব্দির মধ্যেই সুশ্রুত একখানি অতি প্রাচীন গ্রন্থ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিল।

বাগ্‌ভট রচিত গ্রন্থে নাগার্জ্জুনের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, সুতরাং নাগার্জ্জুন বাগ্‌ভটের পূর্ব্ববর্ত্তী। বাগ্‌ভট তৃতীয় বা চতুর্থ শতাব্দির লোক—ইহাই অনেকের অনুমান। নাগার্জ্জুন ইহার বহু পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন।

রসায়ন শাস্ত্রের তির্য্যগ্‌পাতন-প্রণালী—নাগার্জ্জুন কর্ত্তৃক প্রথম উদ্ভাবিত হইয়াছিল। তির্য্যগ্ পাতনের ইংরাজী নাম—Distillation. নাগার্জ্জুন বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী হইলেও তাঁহার-আমলে এদেশে উন্নত প্রণালীর অস্ত্র চিকিৎসা ও সম্মোহিনী (Anæsthetic) বিদ্যার প্রভৃত প্রচলন ছিল। তিনি "আরোগ্য শালা" (Hospital) ও "ভেষজাগার" (Dispensary) স্থাপন করিয়া প্রকৃতি-পুঞ্জের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন।

খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দিতে চীন দেশীয় পরিব্রাজক হিয়াংসাং তদীয় ভ্রমণ বৃত্তান্তে লিখিয়াছেন "যে চারিটী সূর্য্যের উদয়ে সমস্ত জগৎ আলোকিত হইয়াছে—"নাগার্জ্জুন" তাহাদের একটী।" চীন ভাষায় নাগার্জ্জুনের একখানি জীবন চরিত রচিত হইয়াছিল। একজন জাপানী পণ্ডিত বলেন—ঐ-জীবন চরিত, সংস্কৃত ভাষায় রচিত নাগার্জ্জুন কাহিনীর অনুবাদ। খৃঃ ৪০০ অব্দে বহু ভাষাবিদ্ পণ্ডিত কুমার-জীব ঐ গ্রন্থ চীন ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন।

শতক-শাস্ত্র প্রণেতা আর্য্যদেব নাগার্জ্জুনের অতিপ্রিয় ছাত্র ছিলেন।

নাগার্জ্জুন বহু গ্রন্থই রচনা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলিই সর্ব্বত্র সমাদৃত হইয়া আসিতেছে।

১। নাগার্জ্জুন কক্ষপুট। ২। সুশ্রুতের প্রতি সংস্কার ও উত্তর তন্ত্র। ৩। প্রজ্ঞা পার-মিতা টীকা। ৪। দ্বাদশ নিকায় শাস্ত্র। ৫। ধর্ম্ম সংগ্রহ। ৬। প্রজ্ঞাদণ্ড। ৭। প্রজ্ঞাশতক। ৮। মাধ্যমিক সূত্র।

শেষোক্ত মাধ্যমিক সূত্রের—টীকাকার—নাগার্জ্জুনকে প্রণিপাত করিয়াছেন—

নাগার্জ্জুনায় প্রণিপত্য তস্মৈ
তৎ কারিকাণাং বিবৃতিং করিষ্যে।

চন্দ্রকীর্ত্তি রচিত মাধ্যমিক বৃত্তি।

সংস্কৃত ভাষায় রচিত নাগার্জ্জুনের যে জীবন চরিত কীট-দষ্ট অবস্থায় পাওয়া যায়, তাহার অনুবাদ এই প্রবন্ধ লেখক কর্ত্তৃক আরম্ভ হইয়াছে। এই অনুবাদ মুদ্রিত হইলে—অনেকে নাগার্জ্জুনের অনেক কথা জানিতে পারিবেন।

তন্ত্রে নাগার্জ্জুনকে "মুনি" নামে অভিহিত করা হইয়াছে। শৈবসিদ্ধান্ততন্ত্রে বাধক রোগের একটী যোগ দেখিতে পাওয়া যায়। সেই যোগটী নাগার্জ্জুন-পরিকল্পিত। তন্ত্রকার নিম্নলিখিত শ্লোকে তাহা স্বীকার করিয়াছেন—যথা শিব পার্ব্বতী সংবাদে শিব বলিতেছেন—

"ইত্যুচে রুচিরালাপে! নাগার্জ্জুনোমুনিঃ স্বয়ং।"

ইহাতে বেশ বুঝিতে পারা যায়—তান্ত্রিক যুগেও বৌদ্ধ নাগার্জ্জুনের প্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল। শাবর-তন্ত্রে দ্বাদশ শিবের মধ্যে নাগার্জ্জুনের নামও উল্লিখিত হইয়াছে। এইজন্য কেহ কেহ বলেন—নাগার্জ্জুন দুইজন ছিলেন, একজন বৌদ্ধ নাগার্জ্জুন, অপর নাগার্জ্জুন সিদ্ধ-নাগার্জ্জুন নামে তন্ত্রশাস্ত্রে বিখ্যাত।

বারান্তরে আমরা ইহার মীমাংসা করিবার চেষ্টা করিব।

পণ্ডিত—শ্রীবিনোদবিহারী কাব্যতীর্থ।

শর্করা-তত্ত্ব।

—:o:—

"রাজা অশোকের ক'টা ছিল হাতী,
টোডর মল্লের ক'ছেলে, ক' নাতি?
যুধিষ্ঠিরের বাবা কোন্ জাতি?
এ সব করিয়া বাহির,
ক'রেছি বিদ্যা জাহির!"

কবি এ সকল কথা কৌতুক করিয়াই লিখিয়াছেন; আমরা কিন্তু পদে পদে তাঁহার অমর বাক্যের সার্থকতা অনুভব করিতেছি। দেশে যেন একটা আবিষ্কারের যুগ আসিয়াছে। নিত্য নিত্য নূতন নূতন প্রত্নতত্ত্ব বাহির করিয়া সকলেই বাহাদুরী দেখাইতে চাহেন। কেহ হিন্দুর ধর্ম্মকর্ম্ম আচার ব্যবহার রীতি নীতির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বাহির করিতেছেন, কেহ বিক্রমপুরের বল্লালসেনকে বর্দ্ধমানে ভূমিষ্ঠ হইতে দেখিতেছেন,—কেহবা রাম রাবণের ব্যক্তিত্ব ভুলিয়া রামায়ণকে কৃষিকর্ম্ম বলিয়া বক্তৃতা দিতেছেন; কালিদাসকে বাঙ্গালী করিয়া তুলিতে পারিলে, রামপ্রসাদের জাতি মারিলে,- আত্ম গৌরব খ্যাপনের সুবিধা হয়। যাঁহারা এরূপ কার্য্য করেন, তাঁহাদের উদ্দেশ্য আমরা অনায়াসেই বুঝিতে পারি। কিন্তু যাঁহারা এ দেশের যুগযুগান্তরের আপনার ধনকে —নিজের ক্ষুদ্র অনুমানের সাহায্যেই অপরিচিত ও পর করিয়া দিতে চাহেন—তাঁহাদের মহৎ উদ্দেশ্য তো আমার মোটা বুদ্ধিতে বুঝিতে পারি না। তাই, "ভারতবর্ষে পূর্ব্বে চিনি ছিল না"—নামজাদা লোকের মুখে এরূপ কথা শুনিলে আমরা বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া পড়ি।

আসল কথাটা হইতেছে এই—একখানা বড় কাগজে একজন বড় লেখক লিখিয়াছেন —"ভারতবাসীরা পূর্ব্বে চিনি প্রস্তুত করিতে জানিত না, ভারতে চিনি ছিল না; চিনি চীন দেশ হইতে ভারতে আসিয়াছে—সেইজন্য ইহার নাম "চিনি"। সেইরূপ মিসর দেশ হইতে ভারতে যে মিষ্ট দ্রব্য আসিয়াছে তাহার নাম "মিশ্রী"।"

চিনি ও মিছরীর ব্যুৎপত্তিবাদ এইরূপ। অতএব আমাদিগকে বুঝিতে হইবে - আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ চিনি কিম্বা মিছরী প্রস্তুত করিতে জানিতেন না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়—ঋষি যুগে এ দেশে চিনি ও মিছরীর অত্যন্ত ব্যবহার ছিল। ভারতের আয়ুর্ব্বেদে চিনি মিছরীর গুণ বর্ণিত হইয়াছে। সে কালের বৈদ্যগণ - কথায় কথায় "সিতা" ও "শর্করার" ব্যবস্থা করিতেন। "সিতোপল" ও মৎস্যণ্ডিকা"— তাঁহাদের আদরের জিনিষ ছিল। আমাদের বিশ্বাস সেই সুদূর অতীতের আচার্য্য যুগে - ভিন্ন দেশ-জাত, কোনও পদার্থই আয়ুর্ব্বেদে গৃহীত হয় নাই। চিনি ও মিছরী যখন বহু ঔষধের উপাদান স্বরূপ ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, তখন নিশ্চয়ই ঋষিগণ চিনি ও মিছরী প্রস্তুত করিতে পারিতেন।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমি "চিনির" গুণ কিছু সবিস্তারে প্রকাশ করিব। আমাদের খাদ্য দ্রব্যের ভিতর এমন অল্প জিনিসই আছে, যাহা উপকারিতায় চিনির সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারে। আমাদের স্বাস্থ্য রক্ষায় চিনির শক্তি বড় বেশী। মানব জাতির জীবন ধারণে— চিনি একটী অনুকূল সহচর। চিনি সকল খাদ্যের শ্রেষ্ঠ।

চিনির সংস্কৃত নাম—"সিতা" ও "শর্করা।" অতি প্রাচীন কাল হইতেই ভারতে চিনির আদর দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বে মধু হইতে শর্করা প্রস্তুত হইত তাহার নাম ছিল—মধু-সিকতা অর্থাৎ মধু জাত বালুকা। চিনি বালির মতই ঝরঝরে জিনিষ, তাই মধু-জাত চিনির "মধু সিকতা" নাম সঙ্গত ও স্বাভাবিক।

ইহার পর, ইক্ষুরস হইতে চিনি প্রস্তুত প্রণালী আবিষ্কৃত হইয়াছিল। কিন্তু কোন্ রাসায়নিক ইহা প্রথম আবিষ্কার করিয়াছিলেন,—এখন তাহা বলিতে পারা যায় না।

ইতিহাস পড়িলে জানা যায় মহাবীর আলেকজাণ্ডার যখন ভারত আক্রমণ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার সর্ব্ব প্রধান সেনাপতি "নিয়ার্ক্যস"—ভারতবর্ষ হইতে গ্রীক দেশে ইক্ষু-বৃক্ষ লইয়া গিয়াছিলেন। সেই সময় হইতেই য়ুরোপের কৃষিক্ষেত্রে—মধুর রসের অবতার ইক্ষুর আবাদ আরম্ভ হয়।

এক্ষণে—ইক্ষু ভিন্ন, খর্জ্জুর তাল ও নারিকেল বৃক্ষের রস এবং বিটপালম্ প্রভৃতি কন্দ হইতে চিনি প্রস্তুত হইয়া থাকে।

ম্যাকগ্রাফ্ নামক একজন জার্ম্মান্ বৈজ্ঞানিক ১৭৪৭ খৃষ্টাব্দে বিটপালম্ হইতে প্রথম চিনি বাহির করেন। নেপোলিয়নের আমলে—ফ্রান্স দেশে—বিট্ চিনির অত্যন্ত আদর বাড়িতে থাকে। এখন—বিটের চিনি সর্ব্বত্র ছাইয়া ফেলিয়াছে। এখন ঔষধের অনুপান স্বরূপ চিনির আবশ্যক হইলে কবিরাজ মহাশয়কে "ইক্ষু চিনি" এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়া দিতে হয়। এদিকে খাঁটী ইক্ষুজাত চিনি খুঁজিয়া বাহির করা—এক্ষণে বড় সহজ সাধ্য ব্যাপার মনে হয় না।

পাশ্চাত্যমতে চিনির উপকারিতা।

পাশ্চাত্য রাসায়নিকের পরীক্ষায় স্থির হইয়াছে চিনি কার্ব্বন, হাইড্রোজেন্ ও অক্সিজেন—এই তিন মৌলিক পদার্থের সংমিশ্রণে উৎপন্ন। চিনি ভক্ষণ করিবামাত্র—উহা আমাদের রক্তের সহিত মিশ্রিত হয়, তাহার পর মৃদুভাবে দগ্ধ হইয়া, কার্ব্বণিক এসিড্ বাষ্প ও জলে পরিণত হয়। এই দগ্ধ হইবার সময়েই, চিনি কর্ত্তৃক যে তাপের উদ্ভব হইয়া থাকে—সেই তাপের কিয়দংশই শরীরের শক্তিতে পরিণত হয়। সুতরাং শর্করাজাত তাপ হইতে আমাদের শারীরিক তাপ সংরক্ষিত হইয়া থাকে। সেই তাপজাত শক্তির সাহায্যেই আমরা কর্ম্মক্ষেত্রে সকলই কার্য্যই করিতে পারি।

ভক্ষিত চিনি পাকস্থালীতে উপস্থিত হইলে, তাহার কিয়দংশ পাকস্থালীর রসের সঙ্গে মিলিয়া Grape Sugarএ রূপান্তরিত হয়, তাহার পর অন্ত্রের মধ্যে উপস্থিত হইলে, অন্ত্রস্থিত রসের সহিত মিলিত হইয়া অবশিষ্টাংশও Grape Sugarএ পরিণত হয়। ঐ গ্রেপ সুগার রক্তের সহিত মিলিত হইয়া রক্তবাহিনী শিরার সাহায্যে যকৃত নামক যন্ত্রে গমন করিয়া Glycogenএর রূপ ধরিয়া, যকৃতের মধ্যেই বাস করে। আবশ্যক হইলে এই গ্লাইকোজেন শারীরিক তাপও শক্তির সাহায্য করিয়া থাকে। সংক্ষেপে ইহাই চিনির উপকারিতা।

চিনির বিশেষ গুণ।

১। অতি সহজে পরিপাক হয়। ২। শরীরমধ্যে অতি সত্বর শোষিত হয়। ৩। তাপ ও শক্তি বৃদ্ধি করিয়া শরীরের পোষণ করিয়া থাকে। চিনির আরও গুণ—

প্রথমতঃ। আমরা ডাল ভাত, আলু, গম প্রভৃতি যাহা কিছু শ্বেতসারময় দ্রব্য আহার করি,—ঐ সকল পদার্থ মুখের লালা ও অন্ত্রের পাচক রসের সাহায্যে চিনিতে পরিণত হইয়া শরীরে শোষিত হয়। কিন্তু চিনি খাইলে— উহা একেবারেই শরীরে শোষিত হইয়া থাকে, সুতরাং শারীর যন্ত্রগুলিকে অকারণে অধিক পরিশ্রম করিতে হয় না।

দ্বিতীয়তঃ। আমরা ডাল ভাত—ফল মুল যাহা কিছু ভক্ষণ করি, সে সকল জিনিযের সমস্ত টুকু হজম হয় না, তাহার অপরিপাচ্য অংশ, মলমূত্রের সহিত শরীর হইতে বাহির হইয়া যায়। চিনি খাইলে, চিনির সমস্ত অংশই জীর্ণ হইয়া দেহ মধ্যে অবস্থিতি করে। এজন্যও শারীরযন্ত্র গুলিকে বেশী পরিশ্রম করিতে হয় না।

তৃতীয়তঃ। চিনি হইতে মেদ [চর্ব্বি— Fat] উৎপন্ন হইয়া থাকে সেই মেদ দেহের ভিতর সঞ্চিত থাকিয়া আবশ্যক মত তাপ ও শক্তির উৎপাদন করে। একজন বিচক্ষণ পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক চিনির গুণ পরীক্ষা করিয়া নিম্নলিখিত অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন ;—

(ক) চিনি খাইলে মাংস পেশীর ক্ষমতা বাড়ে। (খ) শরীর যন্ত্রের অযথা ক্ষয় নিবারিত হয়। (গ) মুখরোচক বলিয়া শীঘ্র পরিপাক হয়। (ঘ) চিনি—বহুদিন অবিকৃত থাকে। (ঙ) চিনি মিশ্রিত খাদ্য পচিয়া নষ্ট হয় না।

চিনির এই সকল গুণের একে একে উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে।

(ক) চিনি খাইলে মাংসপেশীর ক্ষমতা বাড়ে। সেই জন্য চিনি ভক্ষণকারী খুব পরিশ্রম করিতে পারে, কষ্ট সহ্য করিতে পারে, উদ্যমশীল হয়। আরব দেশের মানুষ এবং আরব দেশের পশু উষ্ট্র—অত্যন্ত খর্জ্জুর ভক্ষণ করে। খর্জ্জুরে শত করা ৫৮ ভাগ চিনি বর্ত্তমান। এই জন্য আরব দেশের লোক কষ্ট সহিষ্ণু, উষ্ট্রও অত্যন্ত পরিশ্রমী। সুমাত্রার নাবিকেরা যথেষ্ট ইক্ষুরস পান করে, তাই তাহারা দাঁড় টানিতে ক্লান্তি বোধ করে না। ইংরাজ জাতি খুব চিনি খায়, তাই তাহারা উদ্যম শীলতার আদর্শ।

(খ) গুরুতর পরিশ্রমে মাংস পেশীর দৌর্ব্বল্য জন্মে। চিনি খাইবামাত্র সে দৌর্ব্বল্য তৎক্ষণাৎ নষ্ট হয়। য়ুরোপের বিখ্যাত ভ্রমণ কারিগণ—চিনির ডেলা মুখে করিয়া চুষিতে চুষিতে দীর্ঘ পথ এবং উচ্চ পর্ব্বত অতিক্রম করিতে কোনও কষ্ট বোধ করেন না।

(গ) শিশুরা চিনি খাইতে ভাল বাসে, —এই জন্য শিশুর পাকস্থালীতে শীঘ্রই খাদ্যাদি পরিপাক হইয়া থাকে। মুহুর্মুহুঃ তাহাদের ক্ষুধারও উদ্রেক হয়।

(ঘ) মিছরী, বাতাসা, ওলা প্রভৃতি জিনিষ—চিনিরই রূপান্তর। এসব দ্রব্য অনেক দিন পর্য্যন্ত নষ্ট হয় না।

(ঙ) মোরব্বা, জেলী, জ্যাম প্রভৃতি খাদ্য গুলিতে অতিরিক্ত চিনি মিশ্রিত থাকায় নষ্ট হয় না। দিল্লীর হালুয়াসান্ নামক উপাদেয় মিষ্টান্ন, ৩ মাস পর্য্যন্ত ব্যবহার যোগ্য থাকে। তাহার স্বাদ গন্ধ সমস্তই টাট্‌কা প্রস্তুতের মত মনে হয়।

প্রাচ্যমতে চিনির গুণ।

আর্য্য ঋষিগণ—চিনির অনেক গুণ জানিতেন। "আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে" ইহার যথেষ্ট প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়।

চিনি পুষ্টি কারক। অতি কৃশ ব্যক্তি ও চিনি ভক্ষণ করিয়া মোটা হইতে পারে। এই জন্য—"অশ্বগন্ধা ঘৃত" "অমৃতপ্রাশ" "মদনানন্দ মোদক" প্রভৃতি বলকারক ঔষধে চিনির বহুল প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়।

চিনি ক্ষয় নিবারক। যক্ষ্মা রোগী ও জীর্ণজ্বর রোগীকে চিনি খাওয়াইলে,—তাহাদের শরীরের ক্ষয় নিবারিত হইয়া ওজন বৃদ্ধি হয়। এইজন্য "তালীশাদি চূর্ণ"-"সিতোপলাদি চূর্ণ"-"সমশর্করচূর্ণ" "ভার্গীগুড়" "চ্যবনপ্রাশ" "বাসাবলেহ"-"কুষ্মাণ্ডখণ্ড"-প্রভৃতি ক্ষয়রোগ-নাশক ঔষধ গুলির—চিনি একটী প্রধান উপাদান।

চিনি—রক্তরোধক। কোনও স্থান কাটিয়া গেলে, চিনির প্রলেপ দিলে তৎক্ষণাৎ রক্ত বন্ধ হয়। চিনির নস্য গ্রহণ করিলে—নাসিকা হইতে রক্ত স্রাব বন্ধ হয়। চিনির পানকপানে—মুখ দিয়া রক্ত উঠা রোগ প্রশমিত হয়।

চিনি—রক্তহীনতা ও ব্যাধিজনিত দৌর্ব্বল্যে বিশেষ উপকারী পথ্য। এইরূপ অবস্থায় ডাক্তারগণ মল্ট ব্যবস্থা করেন। মল্ট এর উপাদান যব-শর্করা। মল্টের কাজ চিনিতেই চলিতে পারে; অধিকন্তু চিনি মল্টের চেয়ে সস্তা।

চিনি ভক্ষণে প্রকুপিত বায়ু ও পিত্ত প্রশমিত হইয়া থাকে।

চিনি—শরীরের সপ্ত ধাতু বর্দ্ধক, অতএব শিশুদিগকে যথেষ্ট পরিমাণে চিনি খাইতে দেওয়া উচিত। চিনির দ্বারা শারীরিক তাপ বৃদ্ধি হয়, বৃদ্ধ বয়সে শারীর তাপ স্বভাবতঃই কমিয়া যায় বলিয়া, বৃদ্ধদের পক্ষে—চিনি একটী অত্যুৎকৃষ্ট খাদ্য। হিন্দুশাস্ত্রে যে -বৃদ্ধাবস্থায় বান-প্রস্থের ব্যবস্থা আছে, আমার মনে হয়—এইরূপ ব্যবস্থায় বনে থাকিয়া মিষ্ট ফল মূল খাওয়ার সুবিধা হয়। পাকা ফলে—চিনির অংশ যথেষ্ট থাকে, সুতরাং ফল ভক্ষণে চিনি ভক্ষণেরই কাজ হয়।

অনশন ব্রতধারী ভগবান্ বুদ্ধকে তাঁহার এক শিষ্যা গোপনে চিনি খাওয়াইত।

চিনির দোষ।

এইবার চিনির দুই চারিটী দোষের কথাও পাঠকগণের কাছে প্রকাশ করিব।

চিনি—শ্লেষ্মাকারক। সুতরাং নূতন সর্দ্দি কাসিতে চিনি খাওয়া উচিত নহে। নিতান্ত খাওয়া আবশ্যক হইলে—গরম করিয়া অথবা কোনও কটু পদার্থ (ঝাল) মিশাইয়া খাইতে হয়। মিছরী মরিচ সিদ্ধ গরম জল পানে সর্দ্দি কমে।

চিনি মেদো বর্দ্ধক। সুতরাং যাঁহারা অত্যন্ত স্থূলকায়, তাঁহারা চিনি খাইবেন না। কিছু দিন চিনি বা চিনিঘটিত খাদ্য পরিত্যাগ করিলে, মোটা মানুষের বিশাল ভুঁড়িও কমিয়া যায়। স্থূলব্যক্তির দেহে যদি বাত রোগের আবির্ভাব হইয়া থাকে,—তিনি চিনিকে বিষের মত পরিত্যাগ করিবেন।

যাঁহারা শারীরিক পরিশ্রম আদৌ করেন না, তাঁহারা যদি চিনি খান, তাহা হইলে সে চিনি শর্করা হইয়া সম্পূর্ণ দগ্ধ হইতে পারে না, মূত্রের সহিত নির্গত হইয়া যায়, মূত্রের সহিত চিনি নির্গত হইলে সেই রোগকে মূত্রশর্করা বা "গ্লাইকোশুরিয়া" বলে। এ রোগে চিনি ভক্ষণ পরিত্যাগ না করিলে—রোগ শীঘ্রই সাংঘাতিক ডায়েবিটিসে পরিণত হইতে পারে। ডায়েবিটিসে চিনি ও চিনি-উৎপাদক

খাদ্য (অন্ন, আলু প্রভৃতি শ্বেতসারময় দ্রব্য) —প্রাণঘাতী কালকূটের মত অনিষ্টকারী।

যাঁহারা অধিক চিনি বা চিনি জাতীয় খাদ্য ব্যবহার করেন,—তাঁহারা রীতিমত পরিশ্রম করিলে, চিনির উপকারিতা বুঝিতে পারিবেন। চিনি খাওয়া খুব ভাল, কিন্তু চিনির অল্প ব্যবহার কখনই ভাল নহে। আমাদের দেশের চিনির অপব্যবহারই ঘটিয়া থাকে।

উপবাসের পর—প্রথমেই চিনির পানা খাওয়া ভাল। ইহাতে পিত্ত প্রকৃতিস্থ হয়, মুখ-শোষ, শরীরের ক্লান্তি ও অবসাদ দূরীভূত হয়।

ঈষদুষ্ণ দুগ্ধের সহিত চিনি ভক্ষণ করিলে—হৃৎপিণ্ডের বলবৃদ্ধি ও শরীরে রক্তস্রোতের বেগ বৃদ্ধি হয়।

ঘৃতের সহিত চিনি খাইলে শুক্র বৃদ্ধি হইয়া থাকে। নবনীতের সহিত চিনি ভক্ষণে নার্ভের বল বাড়ে স্মরণ শক্তি প্রখর হয়।

দধির সহিত চিনী খাইলে কোনও উপকার হয় না। অধিকন্তু—দধি সেবনের গুণ নষ্ট হইয়া যায়। বাঙ্গালী বাবুদের মুখে কিন্তু চিনি পাতা দধি ভিন্ন রোচে না। দধির সহিত চিনি—চিনির অপব্যবহার মাত্র।

যাঁহাদের দেহে রক্তের বিকৃতি [খোস্ পাচড়া, কণ্ডু, ক্ষত, কুষ্ঠ প্রভৃতি] আছে. যাঁহারা জোলাপ লইয়াছেন. যাঁহাদের অন্ত্রে ক্রিমি সঞ্চিত আছে, যাঁহারা প্রায়ই যকৃতের পীড়ায় আক্রান্ত হন -তাঁহারা চিনি খাইবেন না। নবপ্রসূতা নারীর পক্ষেও চিনি ভক্ষণ নিষিদ্ধ।

চিনি প্রস্তুতের সহজ প্রণালী।

এক কলসী ইক্ষুগুড় লইয়া কলসীর তলদেশে ছিদ্র করিয়া উহা একখানি গামলার উপর ২৪ ঘণ্টা বসাইয়া রাখিবেন। ইহাতে ঐ গুড়ের সমস্ত তরলাংশ (মাত্) ঝরিয়া পড়িবে। তাহার পর কলসীর সারগুড় বাহির করিয়া ঝুড়ীতে কিম্বা ডালায় রাখিয়া—তাহার উপর জলজাত শৈবাল চাপা দিবেন। এইভাবে একদিন একরাত্রি থাকিলে, শৈবাল তুলিয়া দেখিবেন উপরের গুড় বেশ শুভ্রবর্ণ হইয়াছে। উহাই চিনি। যতটা গুড় শুভ্রবর্ণ হইয়াছে—ততটুকু গুড় চাঁচিয়া অন্যপাত্রে রাখিবেন। বাকী গুড়ের উপর আবার নূতন শৈবাল চাপা দিবেন। এইরূপ ভাবে পূর্ব্বে—আমাদের দেশে চিনি প্রস্তুত হইত। এখনও 'দলুই' উপাধিধারী একশ্রেণীর হিন্দুরা—এইরূপ প্রণালীতে চিনি প্রস্তুত করিয়া থাকে। সেই চিনিকে লোকে দলুই বা দোলো বলে। এইরূপে চিনিকে কাষ্ঠের পাটার উপর রাখিয়া—দলিয়া লইতে হয় বলিয়াও ইহার নাম "দোলো" হইতে পারে।

গুড়কে শুভ্র করিবার জন্য—পাচ প্রকার জলজ শৈবাল ব্যবহৃত হয়। তাহাদের নাম—"দাম"—(পাটা সেওলা), "শিয়াল লাঙলী"—(দেখিতে শৃগাল লাঙুলের মত) "ঝাঁজি" (অতি সূক্ষ্ম—অথচ লম্বা) পাতাড়ী (এই জাতীয় শেওলার ছোট ছোট গোলাকার পাতা হইয়া থাকে) "কোতোকৃয়া" (জলা জমীতে জন্মে—দেখিতে কলমীলতার মত অত্যন্ত কোমল) —এই সকল শেওলার সাহায্যে গুড় হইতে অনায়াসেই চিনি করিতে পারা যায়। প্রত্যেক গৃহস্থের পক্ষেই ইহা সহজ সাধ্য কাজ। কিন্তু আমাদের মধ্যে সে "স্বাবলম্বন" কোথায়? আমরা -।৵০ ছয় আনা মূল্য দিয়া—সহস্রহস্তের দ্বারা অপবিত্র চিনি অনায়াসেই কিনিয়া খাইব, তথাপি নিজে চিনি প্রস্তুত করিয়া লইতে

পারিব না। আমাদের এক সাধক গাহিয়া গিয়াছেন—

"চিনি হ'তে চাইনেকো মা!
আমি চিনি খেতে ভালবাসি"

এই গানটী—সারা বঙ্গের প্রতিধ্বনি। আমরা চিনি খাই—কিন্তু সে চিনি যোগাইবার ভার চিন্তামণির উপর।

শ্রীসতীশচন্দ্র দে এম্ এ।

রোগ-পরীক্ষা।

চিকিৎসা করিবার পূর্ব্বে চিকিৎস্য রোগীর রোগ পরীক্ষা করা উচিত। পরীক্ষাদ্বারা রোগ সুনিশ্চিত হইলে তাহার চিকিৎসা সম্ভব; নতুবা রোগ স্থির করিতে না পারিলে তাহার চিকিৎসা অসম্ভব। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে "রোগমাদৌ পরীক্ষেত" অর্থাৎ সর্ব্ব প্রথমে রোগ পরীক্ষা করিবে। বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া রোগ নির্দ্ধারণপূর্ব্বক চিকিৎসাকর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত।

রোগ পরীক্ষা সম্বন্ধে মহর্ষি সুশ্রুত বলেন "আতুর গৃহমভিগম্য উপবিশ্য আতুরমভিপশ্যেৎ স্পৃশেৎ পৃচ্ছেচ্চ। ত্রিভিরেতৈ বিজ্ঞানোপায়ৈ রোগাঃ প্রায়শো বেদিতব্যা ইত্যেকে। তত্তু ন সম্যক্, ষড়বিধোহি রোগানাং জ্ঞানোপায়াঃ। তদ্‌যথা পঞ্চভিঃ শ্রোত্রাদিভিঃ প্রশ্নেন চেতি"। অর্থাৎ আতুর গৃহে গমন করিয়া উপবেশনান্তর আতুরকে দেখিবে, স্পর্শ করিবে এবং প্রশ্ন করিবে। কেহ কেহ বলেন এই তিন প্রকার পরীক্ষা দ্বারা প্রায়ই রোগ জ্ঞান হয়; কিন্তু তাহা সম্যক্ নহে। রোগ জ্ঞানের উপায় ছয় প্রকার; শ্রোত্রাদি পঞ্চেন্দ্রিয় এবং প্রশ্ন।

১। তত্র শ্রোত্রেন্দ্রিয়বিজ্ঞেয়া বিশেষা রোগেষু ব্রণাস্রাববিজ্ঞানীয়াদিষু বক্ষ্যন্তে সফেনং রক্তমীরয়ন্ননিলঃ সশব্দো নির্গচ্ছতি ইত্যেবমাদয়ঃ।

অর্থাৎ শ্রোত্রেন্দ্রিয় বিশেষজ্ঞানযোগ্য, যেমন ব্রণবিজ্ঞানীয়াধ্যায়ে ব্রণস্রাব সম্বন্ধে বলা হইয়াছে 'সফেণ রক্তের সহিত শব্দযুক্ত বায়ু নির্গত হয়'। এখানে এই শব্দ শ্রোত্রেন্দ্রিয় গ্রাহ্য। এইরূপ উদ্গার অধোবায়ু, কাস, হিক্কা প্রভৃতির শব্দও শ্রোত্রেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য।

২। স্পর্শনেন্দ্রিয় বিজ্ঞেয়া শীতোষ্ণ-শ্লক্ষ্ণ-কর্কশ মৃদু-কঠিনত্বাদয়ঃ স্পর্শবিশেষা জ্বর-শোথাদিষু।

অর্থাৎ জ্বর, শোথ প্রভৃতি রোগে শৈত্য ঔষ্ণ্য শ্লক্ষ্ণতা, কার্কশ্য, মৃদুতা এবং কঠিনত্ব প্রভৃতি স্পর্শনেন্দ্রিয়গ্রাহ্য। নাড়ী পরীক্ষাও এই স্পর্শনেন্দ্রিয় জ্ঞানদ্বারা সম্পাদিত হয়।

৩। চক্ষুরিন্দ্রিয়বিজ্ঞেয়া শরীরোপচয়াপচয়ায়ুর্লক্ষণবলবর্ণ বিকারাদয়ঃ।

অর্থাৎ শরীরের স্থৌল্য, কৃশতা, আয়ুঃলক্ষণ, বল (উৎসাহ), বর্ণবিকৃতি প্রভৃতি চক্ষুরিন্দ্রিয় গ্রাহ্য। নেত্রপরীক্ষা, জিহ্বা পরীক্ষা, মূত্রের বর্ণ পরীক্ষা প্রভৃতিও চক্ষুরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য।

৪। রসনেন্দ্রিয়বিজ্ঞেয়াঃ প্রমেহাদিষু রস বিশেষাঃ।

অর্থাৎ প্রমেহাদি রোগে মূত্র প্রভৃতির রস-বিশেষ রসনেন্দ্রিয় গ্রাহ্য। যদিও মূত্রাদি চিকিৎসক স্বয়ং মুখে লইয়া রস গ্রহণ করিতে পারেন না কিন্তু মূত্রে মধুর রস থাকিলে তাহাতে

পিপীলিকাদির সঞ্চরণ দেখিয়া মূত্রে মধুর রসের অবধারণ করিতে পারেন। এখানে চিকিৎসকের রসনেন্দ্রিয়জ্ঞান না হইলেও পিপীলিকাদির রসজ্ঞান হইতেছে বলিয়া রসনেন্দ্রিয়বিজ্ঞেয় বলায় কোন দোষ হয় না।

৫। ঘ্রাণেন্দ্রিয়বিজ্ঞেয়া অরিষ্টলিঙ্গাদিষু ব্রণানামব্রণানাঞ্চ গন্ধবিশেষাঃ।

অর্থাৎ ব্রণ কিম্বা ব্রণেতর রোগের অরিষ্টাদি লক্ষণে (নিয়ত মরণাখ্যাপক লক্ষণকে অরিষ্ট কহে অর্থাৎ যে লক্ষণ প্রকাশ পাইলে জীব নিশ্চয়ই মরিবে বুঝা যায় তাহার নাম অরিষ্ট) যে সকল বিশেষ গন্ধ উপস্থিত হয় তাহা ঘ্রাণেন্দ্রিয় বিজ্ঞেয়।

৬। প্রশ্নেন চ জানীয়াৎ দেশং কালং জাতিং সাত্ম্যমাতঙ্কসমুৎপত্তিং বেদনাং সমুচ্ছ্রায়ং বলমন্তরগ্নিং বাতমূত্রপুরীষাণাং প্রবৃত্ত্যপ্রবৃত্তী কালপ্রকর্ষাদীংশ্চ বিশেষান্। আত্মসদৃশেষু বিজ্ঞানাভ্যুপায়েষু তৎস্থানীয়ৈর্জানীয়াৎ।

অর্থাৎ প্রশ্নদ্বারা নিম্নলিখিত বিষয় জানিতে হইবে।

(ক) আনুপ, জাঙ্গল এবং সাধারণভেদে যে ত্রিবিধ দেশ আছে ইহার কোন দেশে রোগের উৎপত্তি এবং শরীরের কোন দেশের পীড়া। দেশ বলিতে শরীর ও ভূমি উভয়ই বুঝায়।

"ভূমিদেহপ্রভেদেন দেশমাহুরিহ দ্বিধা।"
বাগ্‌ভট।

(খ) ক্ষণাদিরূপ কালের কোন সময়ের পীড়া; বাল্য, যৌবন এবং বার্দ্ধক্য ইহার কোন কালের পীড়া এবং ব্যাধির অবস্থা—যেমন কম্পের সময়, দাহের সময় পিপাসার সময় ইত্যাদি। "ক্ষণাদির্ব্যাধ্যবস্থাচ কালঃ" বাগ্‌ভট।

(গ) স্ত্রী, পুরুষ অথবা ক্লীব ইহার কোন জাতীয় রোগীর রোগ এবং ব্রাহ্মণাদি কোন জাতীয় রোগীর রোগ।

(ঘ) আহার এবং আচার যাহা সেবিত হইলে সুস্থ থাকা যায় তাহার নাম সাত্ম্য।

(ঙ) আতঙ্কসমুৎপত্তি অর্থে যে কারণে রোগ উৎপন্ন হয় সেই কারণ।

(চ) বেদনাসমুচ্ছ্রায় অর্থাৎ পীড়ার উদ্‌গতি। যে প্রকারে রোগ উৎপন্ন হইয়াছে তাহা।

(ছ) বল অর্থাৎ কার্য্য করিবার শক্তি এবং উৎসাহ।

(জ) সম, বিষম কিংবা মন্দভেদে পাচকাগ্নিকে অন্তরগ্নি কহে।

(ঝ) বাত মূত্র পুরীষের যথাকালে প্রবৃত্তি হওয়া না হওয়া। এস্থলে পুরীষের পর লুপ্ত আদিশব্দ উদ্ধার করিয়া স্বেদ, আর্ত্তব, রক্তপিত্ত প্রভৃতি বুঝিতে হইবে।

(ঞ) কতদিনের রোগ ইত্যাদিকে কাল প্রকর্ষাদি বলা হয়।

(ট) যে স্থানের পীড়া সেইস্থান কোন দোষের আশ্রয় এবং পূর্ব্বোক্ত ছয় প্রকার পরীক্ষা দ্বারা দোষেরও পরীক্ষা।

মহর্ষি চরক বলেন "ত্রিবিধং রোগবিশেষবিজ্ঞানং ভবতি। আপ্তোপদেশঃ প্রত্যক্ষমনুমানঞ্চেতি।" রোগের বিশেষ জ্ঞানোপায় তিন প্রকার যথা—আপ্তোপদেশ, প্রত্যক্ষ এবং অনুমান। "ত্রিবিধেন খল্বনেন জ্ঞানসমুদায়েন পূর্ব্বং পরীক্ষ্য রোগং সর্ব্বথা সর্ব্বমেবোত্তরকালমধ্যাবসানমদোষং ভবতি। নহি জ্ঞানাবয়বেন কৃৎস্নে জ্ঞেয়ে জ্ঞানমুৎপদ্যতে। ত্রিবিধেত্বস্মিন্ জ্ঞানসমুদায়ে পূর্ব্বমাপ্তোপদেশাদ্ জ্ঞানং ততঃ প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং পরীক্ষোপপদ্যতে। কিং হ্যনুপদিষ্টং পূর্ব্বং যৎ তৎ প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং পরীক্ষ্যমানো বিদ্যাৎ।"

অর্থাৎ এই তিন প্রকার জ্ঞান—সমুদায়ের দ্বারা পূর্ব্বে সর্ব্ব প্রকারে রোগ পরীক্ষা করিয়া

উত্তর কালে রোগ সম্বন্ধে যে জ্ঞান লাভ হয় তাহা সর্ব্বপ্রকারে অদোষ। জ্ঞানাবয়ব দ্বারা সকল জ্ঞেয় পদার্থের জ্ঞান লাভ অসম্ভব। এই তিন প্রকার পরীক্ষার মধ্যে পূর্ব্বে আপ্তোপদেশ দ্বারা যে জ্ঞান হয় তাহাই প্রত্যক্ষ এবং অনুমান দ্বারা পরীক্ষা করা চলে। অনুপদিষ্ট বিষয়কে প্রত্যক্ষ ও অনুমান দ্বারা পরীক্ষার বিষয়ীভূত করা অসম্ভব।

রোগ বলিলে যাহা বুঝায় তাহার দুইটী অবস্থা; প্রকৃতি ভূত ব্যাধ্যবস্থা এবং বিকৃতি ভূত ব্যাধ্যবস্থা। নিদান সেবন জন্য স্বস্থানে দোষের সঞ্চয় হয়; পরে দোষ-প্রকোপক নিদান সেবন জন্য সেই সঞ্চিত দোষের প্রকোপ হয়। প্রকোপের পর প্রসর, অর্থাৎ দোষ তখন স্বস্থান ত্যাগ করিয়া অন্যস্থানে যাইতে থাকে। এই অবস্থা পর্য্যন্ত যে শারীরিক পীড়া অনুভূত হয় তাহার নাম প্রকৃতিভূত বিকার। প্রসরের পর দোষ কোন স্থান সংশ্রয় করিয়া কতকগুলি লক্ষণ প্রকাশ করে যাহাদ্বারা ভবিষ্যতে কোন বিশিষ্ট রোগ হইবে ইহা বুঝা যায়। ইহাকে রোগের পূর্ব্বরূপ কহে। পরে পূর্ব্বরূপাবস্থা দূর হইয়া কতকগুলি লক্ষণ প্রকাশিত হয় যাহা দ্বারা বুঝা যায় যে কোন বিশিষ্ট রোগ উৎপন্ন হইয়াছে। তাহার পর আর একটী অবস্থা আইসে যখন ব্রণশোথ ফাটিয়া গিয়া ব্রণ ভাব প্রাপ্ত হয় কিংবা জ্বরাতিসারাদি রোগ দীর্ঘ কালানুবন্ধী হয়। এই দুই অবস্থার নাম ব্যাধির রূপাবস্থা। পূর্ব্বরূপ ও রূপাবস্থায় যে পীড়া অনুভূত হয় তাহার নাম বিকৃতিভূত ব্যাধি। যখন প্রকুপিত দোষ হইতে কোন রোগ উৎপন্ন হয় তখন সেই প্রকুপিত দোষকে নিদানার্থ-কর বলা হয়। অর্থাৎ নিদান যেমন দোষ প্রকোপরূপ প্রকৃতিভূত ব্যাধির উৎপাদক; সেইরূপ প্রকুপিত দোষ বিকৃতিভূত ব্যাধি-উৎপাদক। বিকৃতিভূত ব্যাধি আবার অপর বিকৃতিভূত ব্যাধি উৎপাদনে সমর্থ, যেমন জ্বর সন্তাপ হইতে রক্তপিত্ত, রক্তপিত্ত হইতে জ্বর, উভয় হইতে যক্ষ্মা এবং প্লীহা বৃদ্ধি হইতে জঠর রোগ ইত্যাদি।

নিদান, পূর্ব্বরূপ, রূপ, উপশয় এবং সম্প্রাপ্তি দ্বারা রোগের উপলব্ধি হয়।

নিদান :—যে কারণে রোগের উৎপত্তি হয় সেই কারণকে নিদান কহে।

কালবুদ্ধীন্দ্রিয়ার্থানাং যোগো মিথ্যা নচাতি চ।
দ্বয়াশ্রয়ানাং ব্যাধীনাং ত্রিবিধো হেতু সংগ্রহঃ।
চরক

অর্থাৎ কাল বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়ার্থের অযোগ, অতিযোগ ও মিথ্যাযোগ সর্ব্ব প্রকার শারীর ও মানস রোগের হেতু অর্থাৎ নিদান। হেতু বা নিদান সাধারণতঃ তিন প্রকারের দৃষ্ট হয় যথা দোষ হেতু, ব্যাধি হেতু এবং দোষ ব্যাধি উভয় হেতু। ১ যেখানে নিদান দোষবৈষম্য উৎপাদন করে কিন্তু তজ্জন্য কি রোগ হইবে তাহা বুঝা যায় না তাহাকে দোষহেতু বলা হয়। যেমন মধুর রসাদি (২) যেখানে নিদান আদৌ ব্যাধি উৎপাদন করিয়া পশ্চাৎ দোষানুবন্ধী হয় তাহাকে ব্যাধিহেতু কহে। যথা ভূতাভিষঙ্গ, অভিঘাত প্রভৃতি। (৩) যেখানে নিদান পূর্ব্বে দোষবৈষম্য উৎপাদন করিয়া বিশিষ্ট রোগ উৎপাদন করে, তাহাকে উভয় হেতু বলা হয় যেমন মক্ষিকা ভক্ষণ ছর্দ্দিরোগের, মৃদ্ ভক্ষণ পাণ্ডুরোগের এবং হস্তি, অশ্ব বা উষ্ট্রে গমন বাতরক্ত রোগের নিদান। এখানে নিদান সেবন জন্য পূর্ব্বে দোষবৈষম্য হইলেও অন্যান্য দোষ-বৈষম্যকারক নিদানের ন্যায় না হইয়া ইহারা দোষ-বৈষম্যের নিদান হইতেছে এবং

তজ্জন্য বিশিষ্ট রোগেরও কারণ হইতেছে বলিয়া ইহাদিগকে উভয়হেতু বলা হয়। কোন টীকাকার মক্ষিকা ভক্ষণ ছর্দ্দিরোগের এবং মৃদ্ ভক্ষণ পাণ্ডু রোগের নিদান বলিয়া ইহাদিগকে ব্যাধিহেতু বলিয়াছেন। কিন্তু তাহা সঙ্গত নহে; কারণ ছর্দ্দি ও পাণ্ডুরোগ আগন্তু ব্যাধি নহে নিজব্যাধি। নিজ ব্যাধি উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে দোষ বৈষম্য থাকা অনিবার্য্য। সুতরাং মৃদ্ভক্ষণ ও মক্ষিকাভক্ষণ যেমন নির্দ্দিষ্ট ব্যাধির হেতু সেই প্রকার দোষবৈষম্যেরও হেতু সুতরাং ইহাদিগকে উভয় হেতু বলাই সঙ্গত।

পূর্ব্বরূপ;—যে যে লক্ষণ প্রকাশ পাইলে ভবিষ্যতে কোন বিশিষ্ট রোগ হইবে বুঝা যায় তাহার নাম ব্যাধির পূর্ব্বরূপ। এই পূর্ব্বরূপ দুই ভাগে বিভক্ত। একের নাম সামান্য পূর্ব্বরূপ এবং অপরের নাম বিশিষ্ট পূর্ব্বরূপ। সামান্য শব্দের অর্থ জাতি। যে যে লক্ষণ দ্বারা মাত্র কোন্ জাতীয় রোগ হইবে ইহার উপলব্ধি হয় তাহার নাম সামান্য পূর্ব্বরূপ। আর যে যে লক্ষণ দ্বারা ভবিষ্যৎ রোগের বিশেষ অবধারণ হয় তাহার নাম বিশিষ্ট পূর্ব্বরূপ। সামান্য পূর্ব্বরূপের দ্বারা ভবিষ্যতে অমুক ব্যাধি হইবে ইহা জানা যায়: কিন্তু ইহা কোন্ দোষজ হইবে তাহার উপলব্ধি হয় না। বিশিষ্ট পূর্ব্বরূপের দ্বারা তাহার অবধারণ করা যায়।

রূপ;—যে যে লক্ষণ প্রকাশ পাইলে রোগ উৎপন্ন হইয়াছে বুঝা যায় তাহার নাম ব্যাধির রূপ বা লক্ষণ। রূপ দ্বারা বর্ত্তমান ব্যাধি নির্দ্দেশ করা যায়। পূর্ব্বরূপের ন্যায় রূপও দুইভাগে বিভক্ত। যে যে লক্ষণের দ্বারা অমুক জাতীয় রোগ হইয়াছে ইহা নির্দ্দেশ করা যায় তাহাকে সামান্যরূপ এবং যে যে লক্ষণের দ্বারা বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, দ্বন্দ্বজ বা সান্নিপাতিক ইহার কোন বিশিষ্টাবস্থা—এরূপ নির্দ্ধারিত হয় তাহাকে বিশিষ্টরূপ কহে। যেমন স্বেদাবরোধ, সন্তাপ এবং সর্ব্বাঙ্গ গ্রহণ জ্বরের সামান্যরূপ; সেইরূপ অংস-পার্শ্বাভিতাপ, হস্ত ও পদের সন্তাপ এবং সর্ব্বাঙ্গগ জ্বর যক্ষ্মার সামান্যরূপ। যে দোষ হইতেই উৎপন্ন হউক না কেন জ্বর এবং যক্ষ্মারোগে এ লক্ষণগুলি থাকিবেই থাকিবে। অপর যে লক্ষণ আছে দোষ ভেদে তাহার ভেদ হয় এবং সেই লক্ষণ দ্বারা ব্যাধির দোষাবধারণ হয় বলিয়া ইহাদিগকে বিশিষ্টরূপ বলা হয়।

উপশয়;—হেতু বিপরীত, ব্যাধি বিপরীত এবং হেতুব্যাধি উভয় বিপরীত অথবা হেতু বিপরীতার্থকারী, ব্যাধি বিপরীতার্থকারী, অথবা হেতুব্যাধি উভয় বিপরীতার্থকারী ঔষধ, অন্ন এবং বিহারের যে সুখানুবন্ধ তাহাকে উপশয় বলে। অর্থাৎ যে প্রকার ঔষধ, অন্ন কিংবা বিহারের উপযোগ তাহা যদি হেতুর বিপরীত ধর্ম্মী, ব্যাধির বিপরীত ধর্ম্মী কিংবা হেতু ব্যাধি উভয়ের, বিপরীত ধর্ম্মী অথবা হেতুর সমান ধর্ম্মী হইয়াও বিপরীত অর্থকারী, ব্যাধির সমান ধর্ম্মী হইয়াও বিপরীত অর্থকারী কিংবা উভয়ের সমান ধর্ম্মী হইয়াও বিপরীত অর্থকারী, তাহা দ্বারা যদি আরোগ্যলাভ হয় তবে তাহাকে উপশয় বলা যায়। যে রোগে কতকগুলি লক্ষণ একত্রে মিলিয়াছে বলিয়া কিংবা লক্ষণগুলি গূঢ় আছে বলিয়া রোগের সম্যক্ উপলব্ধি হয় না, সেখানে উপশয় দ্বারা রোগজ্ঞান হয়। উপশয় দ্বারা ভবিষ্যৎ এবং বর্ত্তমান ব্যাধির বোধ হয়। পূর্ব্বরূপাবস্থায় প্রযুক্ত হইলে ভবিষ্যৎ এবং রূপাবস্থায় প্রযুক্ত হইলে বর্ত্তমান ব্যাধিবোধক।

সম্প্রাপ্তি ;—ব্যাধির উৎপত্তিকে সম্প্রাপ্তি কহে। সম্প্রাপ্তি, সংখ্যা, প্রাধান্য, বিধি, বিকল্প এবং বলকাল বিশেষে ভেদ হয়।

(১) সংখ্যা যেমন আটটী জ্বর, এবং অষ্টাদশটী কুষ্ঠ ইত্যাদি।

(২) প্রাধান্য—দ্বন্দজ এবং সান্নিপাতিক স্থান দোষের তর এবং তম দ্বারা প্রাধান্য নির্দ্দিষ্ট হয় অর্থাৎ দুই দোষের মধ্যে প্রধানকে তর এবং তিন দোষের মধ্যে প্রধানকে তম কহে ; দোষের এই তর কিংবা তমভাব দ্বারা প্রাধান্য নির্ণীত হয়। অথবা যে দোষ স্বতন্ত্র অর্থাৎ নিজেই প্রধান তাহারই প্রাধান্য এতদ্ভিন্ন যাহা পরতন্ত্র অর্থাৎ যাহা অপর দোষের অধীনে থাকে তাহার অপ্রাধান্য।

(৩) বিধি অর্থে প্রকার। রোগ নিজ ও আগন্তুক ভেদে দুই প্রকার, ত্রিদোষ ভেদে তিন প্রকার ; অথবা সাধ্য, অসাধ্য, মৃদু এবং দারুণ ভেদে চারি প্রকার।

(৪) বিকল্প—মিলিত দোষের অংশাংশ নির্দ্ধারণকে বিকল্প কহে। যেমন রুক্ষ, সূক্ষ্ম, লঘু, শীত চল, বিশদ ও খর এইগুলি বায়ুর ধর্ম্ম। ঈষৎ স্নেহ, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, দ্রব, অম্ল, সর ও কটু এইগুলি পিত্তের ধর্ম্ম। গুরু, শীত, মৃদু, স্নিগ্ধ, মধুর, স্থির ও পিচ্ছল এইগুলি শ্লেষ্মার ধর্ম্ম। দ্বন্দজ এবং সান্নিপাতিক দোষে কোন দোষের কোন ধর্ম্মের প্রকোপ তাহার নির্দ্ধারণকে বিকল্প কহে।

(৫) বলকাল বিশেষ—ঋতু, দিন, রাত্রি ও আহার—কালভেদে ব্যাধির বলভেদ হয়। যেমন শরৎ ঋতু পিত্তজ ব্যাধির বলকাল। প্রাতঃকাল কফজ ব্যাধির, মধ্যাহ্ন পিত্তজ ব্যাধির এবং অপরাহ্ণ বাতজ ব্যাধির ; রাত্রির প্রথমভাগ কফজ ব্যাধির, মধ্যভাগ পিত্তজ ব্যাধির এবং শেষভাগ বাতজ ব্যাধির ; আহারের প্রথমভাগ কফজ ব্যাধির, মধ্যভাগ পিত্তজ ব্যাধির বলকাল বিশেষ।

সম্প্রাপ্তি না জানিলে সংখ্যাদি এবং দোষের অংশাংশাদি জ্ঞান ভিন্ন রোগের বিশেষ জ্ঞান লাভ অসম্ভব। সংপ্রাপ্তি বর্ত্তমান ব্যাধিবোধক। নিদানাদি যে পাঁচ প্রকার রোগ জ্ঞানের উপায় কথিত হইল, রোগ জ্ঞানের জন্য এই পাঁচটীরই আবশ্যকতা আছে। নিদানের দ্বারা ভবিষ্যতে রোগ হইবে বুঝা যায়। বহু রোগের নিদান এক প্রকার বলিয়া সর্ব্বত্র কোন রোগ হইবে তাহার নিশ্চয়াবধারণ করা যায় না ; এইজন্য পূর্ব্বরূপাদিরও আবশ্যকতা আছে। পূর্ব্বরূপ দ্বারা কোন রোগ হইবে ইহা জানিতে পারিলেও দোষের বিশেষ অবধারণ হয় না বলিয়া রূপ জানা আবশ্যক। রূপ দ্বারা রোগ জ্ঞান হইলেও সর্ব্বত্র চলে না ; যেখানে তুল্য লক্ষণ দৃষ্ট হয় সেখানে পূর্ব্বরূপ স্মরণের আবশ্যকতা আছে। যেমত রক্তপিত্ত এবং রক্ত প্রমেহ সন্দেহস্থল।

হারিদ্রবর্ণং রুধিরঞ্চমূত্রং
বিনা প্রমেহস্য হি পূর্ব্বরূপৈঃ।
যো মূত্রয়েৎ তং ন বদেৎ প্রমেহং।
রক্তস্য পিত্তস্য হি স প্রকোপঃ॥

ব্যাধির সাধ্যত্বাসাধ্যত্বও জ্ঞাত হওয়া যায় না।

পূর্ব্বরূপাণি সর্ব্বাণি জ্বরোক্তান্যতিমাত্রয়া।
যংবিশন্তি বিশত্যেনং মৃত্যুর্জ্বরপুরঃসরঃ॥
অন্যস্যাপি চ রোগস্য পূর্ব্বরূপাণি যং নরম্।
বিশত নেন কল্পেন তস্যাপি মরণং ধ্রুবম্॥

পূর্ব্বরূপ এবং রূপ দ্বারা রোগ জ্ঞান হইলেও গূঢ়লিঙ্গ ব্যাধি জ্ঞান হয় না এইজন্য উপশয়ও অবশ্য জ্ঞাতব্য। "গূঢ়লিঙ্গং ব্যাধিমুপশয়ানুপশয়াভ্যাং পরীক্ষেত।" পূর্ব্বরূপ, রূপ, উপ-

শয় দ্বারা পরীক্ষিত হইলেও সংখ্যাদি এবং দোষের অংশাংশাদির কোপ অবধারণ করা যায় না। বলিয়া সম্প্রাপ্তি জ্ঞান ও আবশ্যক।

পূর্ব্বরূপ, রূপ, উপশয় এবং সম্প্রাপ্তি দ্বারা রোগ জ্ঞান হইলে নিদান জানা না থাকিলে চিকিৎসা অসম্ভব; "সংক্ষেপতঃ ক্রিয়াযোগো নিদানপরিবর্জ্জনম্।" নিদানত্যাগই সংক্ষেপ চিকিৎসা। যেমন সন্তর্পণোত্থে ব্যাধিতে অপ-তর্পণ প্রয়োজন এবং অপতর্পণোত্থে সন্তর্পণ প্রয়োজন। এই সকল নিদান পরিবর্জ্জন। তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে যে, রোগ জ্ঞানের পক্ষে নিদান, পূর্ব্বরূপ, রূপ, উপশয়, সম্প্রাপ্তি এই পাঁচটীরই কারণতা বিদ্যমান। বুদ্ধিমান বৈদ্য প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং আগমের সাহায্যে এই পাঁচটী উপায় দ্বারা রোগ পরীক্ষা করিলে রোগ সম্বন্ধে যে জ্ঞান জন্মে তাহা অভ্রান্তই হইয়া থাকে।

শাস্ত্রে বহু প্রকার রোগের বিবরণ আছে এবং সেই সকল রোগের নিদান, পূর্ব্বরূপ, রূপ, উপশয় এবং সম্প্রাপ্তি লিখিত হইয়াছে। কিন্তু বেদনা, বর্ণ, নিদান, স্থান, লক্ষণ এবং নাম-ভেদে ব্যাধির অসংখ্য ভেদ হয়; সেইজন্য সকল রোগের বিবরণ দেওয়া অসম্ভব। সেরূপ স্থলে যে প্রকারে রোগ নির্দ্দেশ সম্ভব হয় তজ্জন্য নিম্নলিখিত উপদেশ দেওয়া হইয়াছে—

তত্রব্যাপরিসংখ্যেয়া ভিদ্যমানা ভবন্তি হি।
রুজাবর্ণ-সমুত্থান-স্থান সংস্থান-নামভিঃ॥
ব্যবস্থাকরণং তেষাং যথাস্থূলেষু সংগ্রহঃ।
তথা প্রকৃতিসামান্যং বিকারেষূপদিশ্যতে॥
বিকারনামাকুশলো ন জিহ্রীয়াৎ কদাচন।
নাহি সর্ব্ববিকারাণাং নামতোঽস্তি ধ্রুবা স্থিতিঃ॥
সএব কুপিতো দোষঃ সমুত্থানবিশেষতঃ।
স্থানান্তরগতশ্চৈব জনয়ত্যাময়ান্ বহূন্॥
তস্মাদ্বিকারপ্রকৃতী রধিষ্ঠানান্তরাণিচ।
সমুত্থানবিশেষাংশ্চ বুদ্ধা কর্ম্ম সমাচরেৎ॥
যো হ্যেতৎ ত্রিতয়ং জ্ঞাত্বা কর্ম্মাণ্যারভতে ভিষক্।
জ্ঞানপূর্ব্বং যথান্যায়ং স কর্ম্মসু ন মুহ্যতি॥

অর্থাৎ বেদনা, বর্ণ, নিদান, স্থান, লক্ষণ ও নাম ভেদে ব্যাধির অসংখ্য ভেদ হয়। মোটামুটি নির্দ্দেশ করিয়া তাহাদের সংগ্রহ করা গেল। অনুক্তস্থলে প্রকৃতি-সাদৃশ্য দেখিয়া অর্থাৎ যে ব্যাধির প্রকৃতি বায়ু তাহাকে বাতিক, যাহার প্রকৃতি পিত্ত তাহাকে পৈত্তিক এবং যাহার প্রকৃতি শ্লেষ্মা তাহাকে শ্লৈষ্মিক ইত্যাদি নির্দ্দেশ করিতে হইবে। জ্বর, রক্তপিত্তাদিবৎ সকল রোগের নাম করণে অসমর্থ হইলেও লজ্জিত হইবার কোন কারণ নাই; যেহেতু সর্ব্ব প্রকার রোগের নাম শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট নাই। একই দোষ, বিশেষ বিশেষ কারণে কুপিত ও বিশেষ বিশেষ স্থান প্রাপ্ত হইয়া বহুবিধ রোগ উৎপাদন করিতে পারে। অতএব রোগের প্রকৃতি, অধিষ্ঠান (যে স্থানে রোগ উৎপন্ন হয়) ও নিদান লক্ষ্য করিয়া চিকিৎসা করিতে হয়। যে চিকিৎসক এই তিনটী অর্থাৎ রোগের প্রকৃতি, অধিষ্ঠান ও নিদান লক্ষ্য করিয়া চিকিৎসা করেন; তিনি চিকিৎসা কার্য্যে কখন মোহগ্রস্ত হয়েন না।

এ বিষয়ে একটী উদাহণ লইলে বিষয়টি বেশ সুগম হইবে। আজকাল একটী রোগ দেখা যায় তাহার কোন উল্লেখ আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় না। আর্য্যজাতির এরোগ ছিল না। পর্ত্তুগিজ নাবিকগণের সহিত উহা এদেশে আমদানি হয় এই রোগকে ডাক্তারগণ Gonorrhœa কহেন। দুষ্ট যোনি-সম্মিলন জন্য দূষিত বিষ এক শরীর হইতে অন্য শরীরে সংক্রমিত হইয়া এই রোগ উৎপাদন করে।

সংক্রমিত বিষই এরোগের নিদান। পুরুষের মূত্রনালী এবং স্ত্রীলোকের যোনিমার্গ এ রোগের স্থান। বিষ সংক্রমণের তিন কিংবা চারিদিনের দিন, সাধারণতঃ রোগের সূত্রপাত হয়। দুই দিনের পর দশ দিনের মধ্যেও কখন কখন রোগের সূত্রপাত দৃষ্ট হয়। প্রথমতঃ লিঙ্গস্ফীতি, প্রদাহ, বেদনা, মূত্রাবরোধ, মূত্রত্যাগকালে অসহ্য যন্ত্রণা এবং জ্বরভাব বা প্রকৃত জ্বর হয়। কখন কখন রক্তাগম দেখা যায়। তৎপরে রূপাবস্থা দৃষ্ট হয়। এই সময় আপনা হইতে পূযের ন্যায় স্রাব, মূত্রত্যাগকালে জ্বালা ও বেদনা উপস্থিত হয় এবং অতিকষ্টে মূত্রত্যাগ করিতে হয়। এ অবস্থায় যদি রোগের প্রতীকার করা না হয় তবে রোগ দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়; তখন জ্বালা যন্ত্রণা আর বড় থাকে না, একপ্রকার স্বচ্ছস্রাব (glairy discharge) হয় এবং মূত্রমার্গের অবরোধ (stricture) উপস্থিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে দুর্ব্বলতা, বাত (Gonorrhœal Rheumatism) (অভিষ্যন্দ Gonorrhœal opthalmia) প্রভৃতি উপদ্রব আইসে। স্ত্রী শরীরে অধিকন্তু জননেন্দ্রিয়ের প্রদাহ উপস্থিত হয়।

আয়ুর্ব্বেদমতে এই রোগ নির্দ্দেশ করিতে হইলে যাহা করা উচিত তাহা দেখা যাউক।

১। লিঙ্গস্ফীতি—শ্লেষ্মার লক্ষণ।

২। প্রদাহ—পিত্ত ও শ্লেষ্মার লক্ষণ।

৩। বেদনা—বায়ুর লক্ষণ।

৪। মূত্রাবরোধ—বায়ুর লক্ষণ।

৫। জ্বরজ্বরভাব বা জ্বর—ত্রিদোষের লক্ষণ।

৬। মূত্রত্যাগকালে অসহ্যযন্ত্রণা—বায়ু ও পিত্তের লক্ষণ।

৭। রক্তাগম—পিত্তের লক্ষণ।

এই সকল লক্ষণ দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে শরীরে বিষ সংক্রমণজন্য বায়ু, পিত্ত ও কফ প্রকুপিত হইয়া লিঙ্গাভ্যন্তরে স্থান সংশ্রয় পূর্ব্বক যে রোগ উৎপাদনের চেষ্টা পাইতেছে তাহা ভবিষ্যতে একটী ত্রিদোষজ ব্যাধিরূপে প্রকাশ পাইবে। উক্ত লক্ষণগুলি ইহার পূর্ব্বরূপ।

ইহার পর যে যে লক্ষণ দেখা যায় তাহা দ্বারা নিম্নলিখিতভাবে অবধারিত হয়।

১। পূয—কফের লক্ষণ।

২। পাক—পিত্তের লক্ষণ।

৩। স্বভাবতঃ পূযের স্রাব—বায়ুর লক্ষণ।

৪। মূত্রত্যাগকালে জ্বালা—পিত্তের লক্ষণ।

এই সকল লক্ষণের দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে যে রোগ উৎপন্ন হইয়াছে তাহা ত্রিদোষজ। ইহার পরের অবস্থা—

১। জ্বালা যন্ত্রণা কমিয়া যাওয়া—ক্ষীণপিত্তের লক্ষণ।

২। স্বচ্ছস্রাব—বায়ু ও শ্লেষ্মার লক্ষণ।

৩। মূত্রমার্গের অবরোধ—বায়ু ও শ্লেষ্মার লক্ষণ।

এই দুই অবস্থার লক্ষণগুলি ইহার রূপ। তাহা হইলে এই সকল পরীক্ষার দ্বারা জানা যাইতেছে যে (১) দুষ্ট যৌন সম্মিলন জন্য বিষ সংক্রমণ এই রোগের হেতু অর্থাৎ নিদান।

(২) পুরুষের মূত্রনালী এবং স্ত্রীলোকের যোনিমার্গ এই রোগের অধিষ্ঠান অর্থাৎ বিষ সংক্রমণ জন্য দোষ প্রকুপিত হইয়া এই স্থান আশ্রয় করিয়া রোগ উৎপাদন করে।

(৩) লিঙ্গের স্ফীতি, লিঙ্গের প্রদাহ, লিঙ্গের বেদনা, মূত্রাবরোধ, মূত্রত্যাগকালে অসহ্য যন্ত্রণা, লিঙ্গপথে রক্তাগম এবং জ্বরভাব বা জ্বর এইগুলি ইহার পূর্ব্বরূপ।

(৪) (ক) আপনা হইতে পূযের স্রাব, মূত্রত্যাগ কালে জ্বালা ও বেদনা এবং অতি কষ্টে মূত্রত্যাগ। (খ) রোগ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে জ্বালা যন্ত্রণা কমিয়া যাওয়া, স্বচ্ছ স্রাব (Glairy discharge) এবং মূত্রমার্গের অবরোধ (stricture) এইগুলি ইহার রূপ। দুর্ব্বলতা, বাত (Gonorrhœal Rheumatism), অভিষ্যন্দ (Gonorrhœal opthalmia) এবং স্ত্রীলোকের জননেন্দ্রিয়ের প্রদাহ (Inflamation of the productive organs) এইগুলি এই রোগের উপদ্রব।

এক্ষণে এই রোগকে যে নামেই অভিহিত করা হউক না কেন তাহাতে কিছু আসে যায় না। এইরূপে সকল প্রকার অমুক্ত রোগের—যেমন প্লেগ, বেরিবেরি, সিফিলিস্ ইত্যাদির নির্দ্দেশ করা আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকের পক্ষে অসম্ভব নহে। এক্ষণে পাঠক বিচার করিয়া দেখুন আয়ুর্ব্বেদ মতে রোগপরীক্ষার কেমন সুন্দর ব্যবস্থা রহিয়াছে।

পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত এবং তাঁহাদের অনুচিকীর্ষু অনেকের নিকট শুনিতে পাই যে কবিরাজগণ রোগ নির্দ্ধারণে একেবারে অসমর্থ। কারণ শারীর জ্ঞান লাভের জন্য শব-ব্যবচ্ছেদ তাঁহারা করেন না সুতরাং শরীরের ভিতর কোথায় কোন রোগ হইয়াছে তাঁহারা নির্দ্দেশ করিতে পারেন না। আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে রক্ত, মল, মূত্র, থুতু প্রভৃতির রাসায়নিক এবং আণুবীক্ষণিক পরীক্ষা তাঁহাদের নাই। শরীর পরীক্ষার জন্য থার্ম্মমিটার, ষ্টেথিস্কোপ, স্পেকিউলাম প্রভৃতি যন্ত্র তাঁহাদের নাই এবং রনজেন্ লাইট যাহার সাহায্যে ভিতরের যান্ত্রিক বিকৃতির জ্ঞান হয়, তাহা নাই সুতরাং কিসের বলে তাঁহারা রোগ নির্ণয়ে সমর্থ? এতদুত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে প্রাচ্য-বিজ্ঞান চিরকালই প্রাচ্যবিজ্ঞান এবং পাশ্চাত্য বিজ্ঞান চিরকালই পাশ্চাত্য বিজ্ঞান। রোগ সম্বন্ধে প্রাচ্য মনীষিগণ এক প্রকার স্থির করিয়াছেন; পাশ্চাত্য মনীষিগণ অপর প্রকার স্থির করিতেছেন। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের মতে রোগ কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে আবদ্ধ নহে। যে স্থানেই তাহার প্রকাশ হউক না কেন, রোগ মাত্রেই সর্ব্বাঙ্গীন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে নিদান সেবন জন্য দোষের চয় হয়, পরে সেই চিত দোষ প্রকুপিত হইয়া গতিশীল হয়; পরে সেই প্রকুপিত দোষ কোন স্থান সংশ্রয় করিয়া রোগ উৎপাদন করে। ব্যাধি মাত্রেই প্রকুপিত দোষের কার্য্য এবং ধর্ম্মের সমষ্টি; তাহা যেখানেই উৎপন্ন হউক না কেন, স্থান ও লক্ষণভেদে ব্যাধির নাম ভেদ হয় মাত্র। যে কোন ব্যাধি উৎপন্ন হউক না কেন তদ্দ্বারা সমস্ত শরীর ও মন উপতপ্ত হয়, তখন সর্ব্বাঙ্গ প্রবাহী রক্তের গতির প্রকার উপলব্ধি করিয়া এবং পূর্ব্বোক্ত চরক ও সুশ্রুতের মতানুযায়ী পরীক্ষায় রোগের যে জ্ঞান লাভ হয় আয়ুর্ব্বেদমতে চিকিৎসা করিতে হইলে তাহাই যথেষ্ট। রক্তের গতির প্রকার উপলব্ধিকে নাড়ী পরীক্ষা কহে। নাড়ী পরীক্ষার দ্বারা রোগের যে সর্ব্ব প্রকার জ্ঞান হয় তাহা অনেক

পাশ্চাত্য চিকিৎসকেও স্বীকার করেন। এমন কি অনেক ডাক্তার নাড়ী পরীক্ষার দ্বারা কবিরাজ কর্ত্তৃক রোগ নির্ণয় দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছেন, পাশ্চাত্য শিক্ষিত লোক এ সকল কিছু বুঝিতে পারেন না; কারণ তাঁহারা এরূপ শিক্ষা পান নাই। ডাক্তার এক প্রকারে রোগ নির্দ্ধারণ করেন; কবিরাজ অন্য উপায়ে রোগ নির্দ্ধারণ করেন। উভয় বিজ্ঞানে যখন রোগও তাহার পরীক্ষা ভিন্ন তখন ঐ সকল যন্ত্রদ্বারা আমাদের কি উপকার হয় পাঠক তাহা আমাদিগকে বুঝাইয়া দিতে পারেন? ডাক্তার বলিলেন রোগীর অমুক অঙ্গের অমুক স্থানের এই বিকৃতি হইয়াছে। কবিরাজকে যদি সেই রোগের চিকিৎসা করিতে হয় এবং ডাক্তার তাঁহাকে রোগের কথা বলিয়া দেন যে অমুক রোগ হইয়াছে; তাহা দ্বারা কবিরাজের কোনই উপকার হইবে না তাঁহাকে আবার নিজের মত করিয়া পরীক্ষা করিয়া লইতে হইবে নতুবা আয়ুর্ব্বেদ মতে চিকিৎসা অসম্ভব।

কবিরাজ শ্রীশচীন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ।

চিকিৎসা তত্ত্ব।

(পূর্ব্বপ্রকাশিত অংশের পর)

দেশীয় চিকিৎসায় অনাস্থা।

দেশীয় ঔষধ পথ্যের উপযোগিতা সম্বন্ধে সঙ্ক্ষেপে যাহা বলা হইল, বুদ্ধিমান আরোগ্য-কামি তাহার সাহায্যে আপনাদের কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে পারিবেন। এক্ষণে যাঁহাদের শিক্ষা ও সংস্কার বশতঃ দেশীয় চিকিৎসায় আস্থা নাই, তাঁহাদের উদ্দেশে বলিতে হইবে। অনেকের বিশ্বাস বেরি-বেরি (Beri-Beri) নিমোনিয়া (Pneumonia) প্রভৃতি ব্যাধিগুলি বিদেশের নূতন আমদানি, সুতরাং প্রাচীনতম আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রে তাহার কোন প্রতিকার থাকিতে পারে না। ইহা তাঁহাদের আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের অনভিজ্ঞতার ফল। আয়ুর্ব্বেদের রোগ-নিরূপণ ও তাহার প্রতিকার পদ্ধতি অতি সুকৌশলে গ্রথিত; এ প্রণালীতে নূতন হউক, পুরাতন হউক, দেশীয় হউক, বিদেশীয় হউক সকল প্রকার ব্যাধিরই অনিন্দিত চিকিৎসা করিতে পারা যাইবে। ইহা আমাদের নিজের কথা নহে। আয়ুর্ব্বেদের অন্যতম প্রাচীন ও শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ চরকসংহিতায় সূত্রস্থানের বিংশ অধ্যায়টি ভালরূপ আলোচনা করিলে ইহার সত্যতা সম্যক্ উপলব্ধি হইবে অন্য এ সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া সাধারণ বোধ্য "চিকিৎসা তত্ত্বে"র জটিলতা বৃদ্ধি করিব না। তবে এই মাত্র বলিতে পারি, আয়ুর্ব্বেদে বিজাতীয়

এ সম্বন্ধে প্রবন্ধান্তরে বিস্তৃত আলোচনা করা হইবে।

'বেরি বেরি' শব্দ না থাকিলেও উক্ত ব্যাধির সমলক্ষণ বিশিষ্ট রোগের নাম রহিয়াছে। আয়ুর্ব্বেদের 'বাতবলাসক' জ্বরের লক্ষণ,—নিত্য মন্দ মন্দ জ্বর থাকিবে, পদাদিতে শোথ অর্থাৎ ফোলা দেখা যাইবে এবং তজ্জন্য শরীর অত্যন্ত অবসন্ন হইবে। শরীর রুক্ষ, স্তব্ধ ও শ্লেষ্মাবহুল হইবে। আধুনিক বেরি বেরি রোগেও ঠিক এই সকল লক্ষণই দেখা যায়। এই রোগে কবিরাজি চিকিৎসায় সমধিক ফল লাভও হইয়া থাকে। এই যে নিমোনিয়া রোগে এ দেশে সহস্র লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে, এই জ্বর সংযুক্ত শ্লৈষ্মিক কাস রোগ শীতপ্রধান ইউরোপবাসীর নিকট করালকৃতান্ত স্বরূপ হইলেও উষ্ণপ্রধান দেশে মারাত্মক হয় না। ইউরোপীয় চিকিৎসায় এই রোগের মৃত্যুর হার দেখিয়া ভালরূপ প্রতিকার আছে বলিয়া মনে হয় না, তথাপি এ দেশের অনেকেই উক্ত রোগে অনুপযোগী ডাক্তারি চিকিৎসায় মৃত্যুপথের পথিক হইতেছেন। অথচ এরূপ অনেক রোগেরই প্রতিকারে আয়ুর্ব্বেদীয় ভেষজের আরোগ্যকারিতা অনেক বেশী দেখিতে পাওয়া যায়। কেবল অন্ধ সংস্কারবশে এদেশের অনেক ব্যক্তির বিদেশীয় চিকিৎসায় ধন ও প্রাণহানি হইয়া থাকে।

অনেকের আবার দেশীয় চিকিৎসায় আস্থা আছে, কিন্তু ঔষধে বিশ্বাস নাই, ইহারও কোন মূল্য নাই। শাস্ত্রজ্ঞ, কর্ম্মনিপুণ, চিকিৎসা ব্যবসায়ীর ঔষধে অবিশ্বাসের কোন কারণ থাকিতে পারে না। সন্ধান না লইয়া অবিশ্বাস করিলে সর্ব্বত্রই অবিশ্বাসের কারণ রহিয়াছে। এইযে ডাক্তারি ঔষধ, ইহাতে কি অবিশ্বাসের কোন কারণ নাই? ভিন্ন ভিন্ন কারখানায় প্রস্তুত একই ঔষধের এরূপ মূল্যের তারতম্য হয় কেন? এক কুইনাইনই পৃথক্ পৃথক্ মূল্যে বিক্রয় হয় কেন? বিভিন্ন প্রস্তুতকারকের প্রস্তুতপ্রণালীর পার্থক্য হইতে ঔষধের ভালমন্দজন্য এরূপ মূল্য পার্থক্য নহে কি? বাজারে যখন ভালমন্দ দুই প্রকার ঔষধই বিক্রয় হইতেছে, দেশীয় ডাক্তারেরা অপকৃষ্ট ঔষধটিও যখন খরিদ করিয়া রোগিদের খাওয়াইতেছেন, তখন মাত্র কবিরাজি ঔষধে অবিশ্বাস করিলে চলিবে কেন?

বলিতে পারেন, চেষ্টা ও অর্থব্যয় করিলে ভাল ডাক্তারি ঔষধ সংগ্রহ করিতে পারা যায়, সেরূপ করিলে কবিরাজি ঔষধও বিশ্বাসের সহিত পাওয়া যাইত; সে কথা পরে বলিতেছি। এখন যাঁহারা কবিরাজি ঔষধের অবিশুদ্ধতা সম্বন্ধে দৃঢ় বিশ্বাসী তাঁহাদিগকে একবার দেশীয় ডাক্তারি ঔষধালয় গুলির ভিতরের অবস্থা গোপনে অনুসন্ধান করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি। আধুনিক উন্নত প্রণালীতে অ-হস্তস্পৃষ্ট যন্ত্রপ্রস্তুত ঔষধগুলির দেশীয় ডাক্তারখানায় কি অবস্থা হয়, ভেষজমিশ্রণগৃহে "সাধারণের প্রবেশ নিষেধ" থাকায় অনেকেই জানিতে পারেন না। আমি একটি বড় ডাক্তারি ঔষধালয়ে যে পাত্র হইতে জল লইয়া ঔষধে মিশাইতে দেখিয়াছি, স্বচক্ষে দেখিলে বোধ হয় কোন ব্যক্তিরই সে ঔষধ সেবনে প্রবৃত্তি হইত না। অনেক ঔষধালয়েই পুরাতন বীর্য্যহীন ঔষধ পরিত্যক্ত না হইয়া ব্যবহৃত হয়। কোন একটি ঔষধ উপস্থিত না থাকিলে তাহা যে বাদ দেওয়া হয় না, তাহাই বা কে বলিতে পারে? ব্যবস্থাপত্রের নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ ঔষধ হইতে

মিশ্রকারিগণ অনেক সময় কিছু কিছু ঔষধ কম দিয়া নিজেরা গোপনে দু'পয়সার সংস্থান করিয়া থাকে, এরূপ কথাও কোন কোন ক্ষেত্রে শুনিতে পাওয়া যায়। সুতরাং অবিশ্বাস করিবার কারণ সর্ব্বত্রই রহিয়াছে।

দেশীয় চিকিৎসকগণের সহিত এক শ্রেণীর ঔষধ বিক্রয়কারি মিশিয়া গিয়া দেশীয় ঔষধে অবিশ্বাসের কারণ কিছু বেশী হইয়াছে। এই শ্রেণীর ঔষধ বিক্রয়কারিগণ কেবলমাত্র বিজ্ঞাপনের সাহায্যে ঔষধ বিক্রয় করিয়া থাকে, যাহার যত বিজ্ঞাপনের অধিক আড়ম্বর, তাহার বিক্রয় ও সেই অনুপাতে অধিক। সেই জন্য ইহারা ঔষধের বিশুদ্ধতা রক্ষায় অর্থ ব্যয় করা অপেক্ষা বিজ্ঞাপনের জন্য অর্থ ব্যয় করাই সঙ্গত মনে করে। অবশ্য এই শ্রেণীর অব্যবসায়িগণের উপর নিজেদের চিকিৎসাভার অর্পণ করিতে সাধারণেও সাহসী হয় না; সে কারণেই ইহারা পীড়িতের উপযোগী ঔষধ প্রচার করা অপেক্ষা মকরধ্বজ, চ্যবনপ্রাশ প্রভৃতি সুস্থ শরীরেও সর্ব্বদা ব্যবহারোপযোগী ঔষধগুলির প্রচারেই সমধিক সচেষ্ট, কিন্তু এই সকল সুপরিচিত ঔষধগুলিও অব্যবসায়ীকে বিক্রয় করিতে হইলে সাধারণকে এমন একটা সুবিধা দেওয়া আবশ্যক, যাহাতে তাহাদের ন্যায় অচিকিৎসকের নিকট ঔষধ খরিদ করিতে প্রবৃত্তি হয়। তাই ইহারা সুলভের প্রলোভনে সাধারণকে এই সকল বিষতুল্য অনৌষধগুলি খরিদ করিতে প্রলুব্ধ করিতেছে। এই ঔষধের মূল্যনির্দ্দেশেও তাহাদের অনেক প্রকার চাতুরী দেখিতে পাওয়া যায়, সর্ব্বদা, ব্যবহৃত ঔষধগুলির মধ্যে যেগুলি উচ্চ মূল্যের ঔষধ, সেগুলিকে ইহারা অতি সুলভে দিয়া সস্তা বিক্রেতা সাজিয়া আবার অনেক অল্প মূল্যের ঔষধ উচ্চ মূল্যে বিক্রয় করিয়া থাকে।*

আর এক শ্রেণীর পীড়িতের উপর বিজ্ঞাপনে ঔষধ বিক্রয়কারিদিগের অত্যন্ত প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। যে সকল অপরিণামদর্শি ব্যক্তি অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়দোষে মেহ, ধাতুদৌর্ব্বল্য, উপদংশ প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত, তাহাদের অনেকে লজ্জাবশতঃ স্থানীয় চিকিৎসকের সাহায্য না লইয়া গোপনে ও ২৪ ঘণ্টায় আরোগ্য লাভের আশায় ইহাদের ঔষধ ব্যবহার করিয়া থাকে। ঔষধ বিক্রেতাগণ এই সকল পীড়ার লক্ষণগুলি সকৌশলে লিখিয়া ও হাতেহাতে ফল লাভের লোভ দেখাইয়া ইহাদের ধন, প্রাণ উভয়ই নষ্ট করিতেছে। একথাটা লোকে একবার ভাবিবার সময় পায় না যে, ইহাদের সস্তা ঔষধে অসম্ভব অল্প সময়ে, প্রকৃতই যদি ব্যাধি আরোগ্য হইত, তবে সহস্র সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়া এত বিজ্ঞাপনের আড়ম্বর করিবার আবশ্যকতা কি ছিল? কোন চিকিৎসক ত কখনও বিজ্ঞাপন দেন না, কিন্তু তাঁহাদের

* দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা ঢাকার বিজ্ঞাপনে ঔষধ বিক্রয়কারি মথুর বাবুর সুলভ মূল্যের মকরধ্বজ, চতুর্ম্মুখ প্রভৃতি এবং উচ্চ মূল্যের বৃঃ গুড়পিপ্পলী, পুরাতন গুড় প্রভৃতির কথা উল্লেখ করিতে পারি। আমি তাহাদের মকরধ্বজের হিসাব লইয়া প্রথমে তাঁহাদের সহিত পত্র ব্যবহার, করিয়াছিলাম, কিন্তু যথাযথ উত্তর না পাওয়ায় গত জৈষ্ঠ মাসের ধন্বন্তরি পত্রে ইহাদের ঔষধগুলির প্রস্তুত খরচা ও মূল্য নির্দ্ধারণ লইয়া প্রকাশ্য আন্দোলন করিয়াছি। তথাপি তাঁহারা নিজেদের পক্ষ সমর্থন করিতে পারেন নাই। যাঁহারা বিজ্ঞাপনের সুলভ ঔষধের ভক্ত, তাঁহাদিগকে উক্ত প্রবন্ধ পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

কার্য্যনৈপুণ্যই বিজ্ঞাপন অপেক্ষাও দেশ বিদেশে তাঁহাদিগকে পরিচিত করিতেছে। দেশের কোন শিক্ষিত বুদ্ধিমান ব্যক্তি বিজ্ঞাপন দেখিয়া ঔষধ ব্যবহার করেন না, যদি বিজ্ঞাপনের ঔষধ ভাল হইত, তবে তাঁহারা অধিক অর্থ ব্যয় করিয়া চিকিৎসকের নিকট ব্যবস্থা ও উচ্চ মূল্যের ঔষধ লইবেন কেন? মনে রাখিবেন বিজ্ঞাপনের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া ও সুলভে যাহাদিগকে ঔষধ বিক্রয় করিতে হয়, তাহারা ঔষধের জন্য আর সেরূপ অর্থ ব্যয় করিতে পারে না, আর এই সকল মূল্যবান-উপাদান-হীন ঔষধে কোন উপকার হয় না, বলিয়াই প্রতিবৎসরই বহু অর্থ ব্যয় করিয়া নিত্য নূতন রোগী সংগ্রহ করিতে হয়।

আরও এক কথা রোগ বা স্বাস্থ্যভঙ্গ যেজন্যই হউক না কেন, ঔষধ ব্যবহার করিতে হইলে চিকিৎসকের পরামর্শ মত ঔষধ ব্যবহার করাই কর্ত্তব্য। কারণ; দেশ, কাল, বয়স, প্রভৃতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয়, এজন্য একই রোগে এক প্রকার ঔষধ সকলের পক্ষে সমান ফল দায়ক হয় না। চ্যবনপ্রাশ মকরধ্বজ প্রভৃতি রসায়ন ঔষধগুলি বিবিধগুণকর ও স্বাস্থ্যোপযোগী হইলেও সকলের পক্ষে সমান ফলদায়ক হয় না। এজন্য বিজ্ঞাপনের গুণাগুণ দেখিয়া বা অচিকিৎসকের পরামর্শ শুনিয়া কোনও ঔষধ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নহে। মনে রাখিবেন অশেষ গুণকর ঔষধও অপ্রযুক্ত হইলে উপকারের পরিবর্ত্তে ক্ষতিকর হইয়া থাকে। শাস্ত্রেও উল্লেখ আছে,—

"ভেষজং রাপি দুর্য্যুক্তং তীক্ষ্ণং সম্পদ্যতে বিষম্॥"

অর্থাৎ উত্তম ঔষধ ও অপ্রযুক্ত হইলে তীক্ষ্ণ বিষের ক্রিয়া সম্পাদন করে। সুতরাং এই সকল অচিকিৎসক ঔষধ বিক্রয়কারিগণের জন্য আয়ুর্ব্বেদের চিকিৎসা বা ঔষধের প্রতি দোষারোপ করা বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য নহে। যাঁহাদিগকে রোগী আরোগ্য করিয়া যশঃ ও অর্থ উপার্জ্জন করিতে হয়, কার্য্যনৈপুণ্যই যাঁহাদের উন্নতিসোপান, তাঁহারা কোন্ লাভের আশায় ঔষধের পবিত্রতা ও শক্তি হানি করিবেন। যে কার্য্যে চিকিৎসক সম্প্রদায়ের কোন ইষ্ট নাই, বরং সম্পূর্ণ অনিষ্ট, তাঁহারা সে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া নিজের সর্ব্বনাশের পথ মুক্ত করিতে পারেন না।

চিকিৎসক।

শাস্ত্রে উল্লেখ আছে, রোগ শান্তির নিমিত্ত ভিষক্, ঔষধ, পরিচর্য্যাকারক ও রোগী এই চারিটিই সগুণ যুক্ত হওয়া আবশ্যক। ইহাদের মধ্যে আবার চিকিৎসকই প্রধান, কারণ শাস্ত্রজ্ঞ, কার্য্যনিপুণ চিকিৎসকই প্রকৃত ঔষধ প্রদান এবং রোগীও সুশ্রূষাকারিকে সদুপদেশ দ্বারা পরিচালিত করিতে পারেন।

ব্যাধি মানব মাত্রেরই অবশ্যম্ভাবী, সুতরাং প্রত্যেক গৃহস্থেরই পূর্ব্ব হইতে একজন পারিবারিক চিকিৎসক স্থির করিয়া রাখা কর্ত্তব্য। চিকিৎসক স্থির করিবার পূর্ব্বে তাঁহার শিক্ষা ও কার্য্য কুশলতার পরিচয় বিশেষরূপে সন্ধান লইতে হইবে। যিনি গুরুর নিকট শাস্ত্র ও কর্ম্মাভ্যাসী, স্বয়ং দৃষ্টকর্ম্মা ও কর্ম্মনিপুণ এবং শাস্ত্র বিশ্বাসী ও পবিত্রাচারী তিনিই প্রকৃত আরোগ্যদাতা। চিকিৎসক কর্ম্মনিপুণ হইলেও দয়ালু, নির্লোভও ও জিতেন্দ্রিয় হওয়া আবশ্যক।

মমতাহীন, স্বার্থপর, অর্থলোলুপ চিকিৎসকের দ্বারা চিকিৎসা করান কর্ত্তব্য নহে।

সদ্বংশজাত, দয়ালু, কার্য্যকুশল, শাস্ত্রজ্ঞ চিকিৎসকের দ্বারা চিকিৎসিত হইলে কোন কালে মনস্তাপের কারণ হয় না।

চিকিৎসকের নিকট রোগ ও আর্থিক অবস্থা গোপনের চেষ্টা করা উচিত নহে। চিকিৎসা যাহাদের জীবিকার উপায় তাহাদিগকে সাধ্যমত অর্থদানে কৃপণতা করা উচিত নহে। অকারণ চিকিৎসকের ক্ষোভ জন্মাইলে লাভের পরিবর্ত্তে ক্ষতিই হইয়া থাকে। প্রকৃত অর্থহীন ব্যক্তি দয়াবান চিকিৎসকের করুণা নিশ্চয়ই পাইবেন।

রোগী ও তাঁহার আত্মীয় স্বজন সর্ব্বদা চিকিৎসকের উপদেশ মানিয়া চলিবেন। চিকিৎসকের উপদেশ পালন, ঔষধের তিক্ত, কষায়াদি স্বাদ, রোগকালীন পথ্য তৎকালে সুখকর না হইলেও পরিণামে শুভকর হয়।

দাস দাসী অপেক্ষা আত্মীয় জনেরই রোগীর পরিচর্য্যার ভার গ্রহণ করা কর্ত্তব্য ধৈর্য্যশীল ব্যক্তি ভিন্ন অন্যের হাতে সুশ্রূষার ভার দেওয়া উচিত নহে। মধুরভাষী, রোগীর প্রতি অনুরক্ত, জ্ঞানবান, কর্ম্মকুশল, প্রত্যুৎপন্নমতি, রোগীর সুশ্রূষাভার গ্রহণ করিবেন। বালক, বৃদ্ধ, দুর্ব্বল, অল্পে কাতর, কর্কশভাষী, নির্ব্বোধ, লোভী, অহিতচারী ব্যক্তির হস্তে রোগীর ভারার্পণ করা কর্ত্তব্য নহে। বহুব্যক্তি একত্র হইয়া পরিচর্য্যাভার গ্রহণ করিলে অনেক সময় বৃথা গোলযোগ হইয়া থাকে। রোগীর অপ্রিয় ব্যক্তিকে নিকটে যাইতে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। অতি সঙ্কটাবস্থায় সমুপস্থিত প্রিয় পরিজনেরও অকস্মাৎ রোগীর নিকট যাওয়া উচিত নহে।

এক্ষণে চিকিৎসা ও চিকিৎসক সম্বন্ধে সাধারণের উদ্দেশে আরও কয়েকটি কথা বলিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিব। যে চিকিৎসার আশ্রয় সর্ব্বদা গ্রহণ করিতে হইবে, তাহার মতবাদ সম্বন্ধে যতটুকু পারা যায় অভিজ্ঞতা লাভের চেষ্টা করা সকলেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। এজন্য অবকাশ মত তৎ সম্বন্ধীয় গ্রন্থ ও পত্রিকাদি পাঠ করিতে হইবে, চিকিৎসকের সহিত আলাপ, প্রশ্নাদি করিয়া শাস্ত্রের অন্তর্নিহিত তথ্য বুঝিতে হইবে। ইহাতে স্বাস্থ্যরক্ষা ও সুশ্রূষা-প্রণালী অবগত হইতে পারা যাইবে।

আলাপ পরিচয় হইতে লোকের সদ সৎ-প্রবৃত্তি জানিতে পারা যায়, চিকিৎসকের সহিত শাস্ত্র ও ভেষজাদি সম্বন্ধে আলাপ পরিচয় করিলে, তাঁহার কর্ম্ম নৈপুণ্য বিশুদ্ধ ঔষধ প্রস্তুত অনুরাগ বুঝিতে পারা যাইবে।

আবার আলাপ পরিচয়ে চিকিৎসককে শাস্ত্রচর্চ্চাহীন, অসৎকর্ম্মী, লোভী, কদাচার, কর্ত্তব্য কর্ম্মে অর্থ ব্যয়ে কুণ্ঠিত, ঔষধ প্রস্তুত প্রণালী অনভিজ্ঞ বুঝিলে, সুপণ্ডিত হইলেও তাহার দ্বারা চিকিৎসিত হইবে না। সকল সময়ে সকল দেশেই কতকগুলি ভিষক্-বেশধারী কপট ব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায়, এই সকল কুবৈদ্য মৃত্যুর অগ্রদূত। সুতরাং ইহাদের সম্বন্ধে সাবধান হওয়া সকলেরই কর্ত্তব্য। এই সকল কুবৈদ্যগণ নিজেদের বৃথা প্রশংসা করিয়া লোকের শ্রদ্ধা আকর্ষণের চেষ্টা করে, রোগের সংবাদ পাইলেই গৃহস্থের বাটীর সন্নিকটে ঘুরিয়া বেড়ায়, অথবা আহ্বান না করিলেও স্বয়ং উপস্থিত হইয়া নিজের কার্য্য প্রশংসা করিতে থাকে। কেহ না বলিলেও নিজেই রোগীর ঔষধ পথ্যের

ব্যবস্থা করে এবং কোনরূপে ঔষধ ব্যবহার করাইবার জন্য সচেষ্ট হয়। ইহাদের নিকট শাস্ত্র প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেই অন্য কথায় চাপা দিবার চেষ্টা করে, কিম্বা বিরক্তির সহিত অসংলগ্ন উত্তর দিয়া থাকে। অচিকিৎসিত থাকাও ভাল, কিন্তু এরূপ কুবৈদ্যের দ্বারা চিকিৎসা করান উচিত নহে।

ধনজনবহুল স্থান ব্যতীত সুচিকিৎসকগণ থাকিতে পারেন না, এজন্য ক্ষুদ্র পল্লীতে অনেক সময় চিকিৎসকের অভাব দেখিতে পাওয়া যায়। এ সকল স্থানে কুচিকিৎসক ও বিজ্ঞাপন ব্যবসায়িদিগের প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। পল্লীর জনসাধারণ দলাদলি মামলা মোকর্দ্দমার জন্য অর্থব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হয় না, কিন্তু স্বাস্থ্যরক্ষা বা আরোগ্যের জন্য অর্থ ব্যয় করিতে কষ্ট বোধ করেন। অনেক পল্লীবাসী ঔষধের যে, কোন মূল্য দিতে হয় তাহাও জানেনা, এ জন্যই পল্লীতে কোন ভাল চিকিৎসক থাকিতে চাহেন না,—আর থাকিলেও উপযুক্ত মূল্যের অভাবে ব্যয়সাপেক্ষ কোন ঔষধই প্রস্তুত রাখিতে পারেন না।

এরূপ ক্ষেত্রে পল্লীর অবস্থাপন্ন ও শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের কর্ত্তব্য, সমগ্র গ্রামবাসিগণের সহিত একত্র হইয়া গ্রামের লোকসংখ্যানুযায়ী একজন বা দুইজন চিকিৎসা-নিপুণ ভিষক্‌কে স্বগ্রামে প্রতিষ্ঠিত করা,—এবং ধনিগণের নিজের অর্থ ব্যয় করিয়া ও বিশেষ প্রয়োজনীয় ঔষধগুলি প্রস্তুত করিয়া রাখা। কোন জটিল রোগে গ্রাম্য-চিকিৎসকের চিকিৎসায় উপকার না পাইলে অথবা ঔষধের অভাব হইলে নিকটবর্ত্তী নগর—মহকুমা বা জেলায় যে সকল চিকিৎসকের চিকিৎসায় সুখ্যাতি আছে, তাঁহাদিগকে আহ্বান করিয়া বা তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া গ্রাম্য-চিকিৎসকের সহিত পরামর্শ পূর্ব্বক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা উচিত। বঙ্গের কোন কোন পল্লীতে ভাল চিকিৎসকের অভাব থাকিলেও জনবহুল নগর, মহকুমা বা জেলায় সুচিকিৎসকের অভাব নাই। চিকিৎসার জন্য সাধ্যমত অর্থ ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হওয়া বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে, কারণ সামান্য অর্থের জন্য স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হইলে চিরদিনের জন্য অর্থাগমের পথ রুদ্ধ হয়। আরোগ্য—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের মূল। সুতরাং নির্দ্দোষ আরোগ্যের জন্য কিঞ্চিৎ অধিক অর্থ ব্যয় হইলেও তাহাতে অর্থাগমের পথ মুক্ত হইবে। যাঁহারা নির্দ্দোষ আরোগ্য, অর্থের সাশ্রয় ও অক্ষুণ্ণ স্বাস্থ্যলাভে ইচ্ছুক, তাঁহারা কখনও কুবৈদ্যের অথবা বিজ্ঞাপনের ঔষধ ব্যবহার করেন না, কারণ ইহাদের অশাস্ত্রীয় ও অব্যবস্থা প্রদত্ত ঔষধগুলি আরোগ্যদান করিতেত পারেই না, অনেক সময় ভবিষ্যৎ ব্যাধির কারণ হইয়া চির জীবনের মত ভগ্নস্বাস্থ্যের ও অর্থনাশের কারণ হয়।

শ্রীজীবনকালী রায় বৈদ্যরত্ন।

আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার উন্নতি সম্বন্ধে আমাদের কর্ত্তব্য।

—— :০: ——

আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার উন্নতি সম্বন্ধে আমাদের কর্ত্তব্য কি—তাহা এখন ভাবিবার সময় আসিয়াছে। মুসলমান রাজত্বে ইউনানি বা হেকিমি চিকিৎসার পূর্ণসমাদর লাভ ঘটিলেও আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার প্রাধান্য-হানি ঘটে নাই। বাদসাহ এবং আমীর ওমরাহগণ চিকিৎসাব্যপদেশে সুদক্ষ হেকিম চিকিৎসকদিগকেই আহ্বান করিতেন সত্য কিন্তু হিন্দু বংশধরগণ পারত্‌পক্ষে হেকিম চিকিৎসকের শরণাপন্ন না হইয়া আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকদিগেরই শরণ গ্রহণ করিতেন। কাজেই হেকিমি চিকিৎসা রাজকীয় সাহায্য প্রাপ্ত হইলেও প্রকৃতি পুঞ্জের অনুরাগাধিক্য বশতঃ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসাই দেশে যে সমুজ্জ্বল হইয়া পড়িয়াছিল, তাহারই ফলে তাহার ঔজ্জ্বল্যের কিয়দংশ এখনও পর্য্যন্ত বাত্যাবিক্ষুব্ধ হইয়াও নষ্ট হইতে পারে নাই। এই জন্যই মুসলমান রাজত্বের অবসান এবং ব্রিটিশ রাজত্বের অভ্যুদয় কালে প্রাতঃস্মরণীয় গঙ্গাধরের আয়ুর্ব্বেদসিদ্ধি জন সাধারণকে মুগ্ধ করিয়াছিল। গঙ্গাধরের শিষ্যগুলিও ইহার ফলে প্রভূত খ্যাতি প্রতি-পত্তি অর্জ্জন পূর্ব্বক যশস্বী হইতে পারিয়া-ছিলেন। কিন্তু সেদিন এখন চলিয়া গিয়াছে। সেই জন্যই এখন আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার পুনরুন্নতি সম্বন্ধে আমাদের কর্ত্তব্য কি,—তাহা ভাবিবার সময়ও আসিয়াছে।

কেমন করিয়া কিরূপভাবে সেদিন আমাদের চলিয়া গেল এক্ষেত্রে সে প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ইংরাজ রাজত্বের দৃঢ় ভিত্তি গ্রথিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জীবন যাত্রা পরিচালন ব্যাপারেও যেন একটা অভিনব ভাব আসিয়া প্রবেশ করিল। আমাদের সাহিত্য, আমাদের শিল্প, আমাদের কৃষি—এক কথায় আমাদের সকল বিষয়েরই শ্রীবৃদ্ধি কামনায় ইংরাজ রাজ যথেষ্ট চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ভাষা-জননী সংস্কৃত ভাষার শিক্ষা প্রচার উদ্দেশে, সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইল, চতুষ্পাঠিগুলিতে এইজন্য বৃত্তি নির্দ্ধারিত হইল, কৃষিকার্য্যের উন্নতির জন্য agriculture ফারম সকল স্থাপিত হইল। আমাদের রাজা এ সকল চেষ্টা করিতে লাগিলেন কিন্তু আমরা সে সকল চাহিলাম না,—আমরা চাহিলাম,—আমাদের নিজস্ব সম্পত্তি গুলিকে পদদলিত করিয়া,—আমাদের ধর্ম্ম,—আমাদের কর্ম্ম;—আমাদের জাতীয় ভাব,—আমাদের শিক্ষা,—আমাদের দীক্ষা,—সকলই জলাঞ্জলি দিয়া পরকীয় ভাবে আমরা গঠিত হই—ইহাই হইল আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। তাহারই ফলে আমাদের কি অশন,—কি বসন,—কি বিলাস, কি বাসনা—সকলই যেন পরকীয় ভাবে গঠিত হইতে লাগিল। ব্রাহ্মণের

পৌরহিত্যের স্পৃহা লুপ্ত হইল, বৈদ্যের পুঁটুলি বা মোড়কের অনুরাগ নষ্ট হইল, কর্ম্মকার-নন্দনের মনে ইংরাজী শিখিয়া চাকুরে পুরুষ হইবার আশা জাগিয়া উঠিল, কলু তৈলের ব্যবসায় ছাড়িয়া দিল, গোয়ালা দুগ্ধের কেঁড়ে পরিত্যাগ করিল,—এক কথায় সকল জাতির ভিতরই জাতীয় বৃত্তির স্পৃহা লোপ পাইল,—সকলেই এ-বি-সি-ডি'তে হাতে খড়ি দিয়া জজিয়তি বা ম্যাজেষ্টেট চাকরি পাইবার জন্য লালায়িত হইয়া পড়িলেন। আমাদের অবনতির পথ এমনই করিয়াই পরিষ্কার করিতে লাগিলাম।

শুধু ইহাই নহে, সমাজের ব্যবস্থা-বিপর্য্যয় তো এইরূপ ভাবে ঘটিলই, সংসারপরিচালনার বিষয়গুলির ভিতরও আমরা অভিনব ব্যবস্থা আনিয়া ফেলিলাম। এই জন্যই আমাদের কাঞ্চন ফেলিয়া কাচের আদর, এই জন্যই আমাদের টিকি কাটিয়া টেড়ির ব্যবস্থা,—এই জন্যই আমাদের তৈল-ভুলিয়া সাবানের স্পৃহা। অধুনা সুরাপায়ীর সংখ্যা অনেকটা কমিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু ইংরাজ রাজত্বের প্রথমাবস্থায় দেশের শিক্ষিত পুরুষদিগের ভিতর সুরার স্রোতটা পূর্ণভাবেই চলিয়াছিল। "সধবার একাদশী"তে "নিমচাঁদে"র প্রতিকৃতি সে কালের কবি কুল কেশরীর উজ্জ্বল চিত্র। সে চিত্র প্রকাশে যে শুভ ফল ফলিয়াছিল, এখনকার শিক্ষিত পুরুষদিগের চরিত্রোন্নতি তাহারই স্বাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। যাক্—যে কথা বলিতে-ছিলাম,—সমাজের মত সাংসারিক ব্যবস্থা-তেও আমরা অন্যভাব আনিয়া ফেলিলাম.—রোগাক্রমণে ঔষধ সেবন সম্বন্ধে ও বড়ি গুঁড়া ছাড়িয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দাগ কাটা শিশি হইতে লাল সবুজ রংয়ের তরল ঔষধের অনুরাগী হইলাম। ক্যাম্বেল এবং মেডিকেল কলেজের কৃপায় উত্তরোত্তর ডাক্তারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তাঁহাদিগের ষ্টেথেস্কোপ-থার্ম্মোমিটারের নিকট টিকিধারী বৈদ্যের নাড়ী টেপার ব্যবস্থা টিকিতে পারিল না।

এছাড়া আরও কতকগুলি কারণ ঘটিল। ১৮০৪ খৃঃ অব্দে মুর্শিদাবাদ এবং কাশিম বাজারে ম্যালেরিয়া জ্বরের যে নূতন সূত্র আরম্ভ হইল, ১৮২৪ সালে যশোহর নদীয়া এবং ২৪ পরগণায় তাহা পূর্ণভাবে প্রকুপিত হইয়া, পশ্চিম বঙ্গের অনেকগুলি পল্লী ধ্বংস করিয়া ফেলিল। ক্রমে পশ্চিম বঙ্গ ছাড়াইয়া পূর্ব্ববঙ্গে ইহা বিস্তৃতি লাভ করিল। সে ম্যালেরিয়া বিস্তৃতির বিশদ বিবরণ আমরা ইতঃপূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছি। ফলে বাঙ্গালা দেশে ম্যালেরিয়া প্রবেশে দেশীয় চিকিৎসায় তাহার আশু দমন হয় না দেখিয়া অনেকে বড়ি গুঁড়া ছাড়িয়া ডাক্তারি চিকিৎসার পক্ষ-পাতী হইল।

তাহার পর বিসূচিকা। বিসূচিকা নিবারণে আমাদের ঔষধ যথেষ্ট থাকিলেও ক্যাম্ফার এবং ক্লোরোডাইনে শীঘ্র কার্য্য হইতে লাগিল। তাহার পর আবার যখন লোকে আমেরিকার হোমিপ্যাথিতে কলেরা চিকিৎসার সুফল প্রত্যক্ষ করিল, তখন এলোপাথিক ছাড়িয়া তাহার গোঁড়া হইতে আরম্ভ করিল। আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসায় যে কলেরা আরোগ্য হইতে পারে, ক্রমশঃ এ কথাটা লোকে একবারে ভুলিয়া গেল।

তাহার পর "শস্ত্রচিকিৎসা।" "আসুরী মানুষী দৈবী চিকিৎসা ত্রিবিধা মতা।"—এ

বচন যখন প্রণীত হইয়াছিল, তখন অবশ্য ডাক্তারি চিকিৎসার কথা আর্য্য ঋষিমণ্ডলী অবগত ছিলেন না। এইজন্য "আসুরী" চিকিৎসাই যে আমাদের অস্ত্র চিকিৎসা—সে কথা বোধ হয় না বলিলেও চলিবে। যখন দেশ হইতে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার সমাদর হ্রাস পাইতে লাগিল তখন উপযুক্ত-ভাবে আয়ুর্ব্বেদ চর্চ্চা করিতে বৈদ্যদিগের প্রবৃত্তিও নষ্ট হইল। ফলে যে কোন কারণেই হউক শস্ত্র চিকিৎসাটি দেশ হইতে একবারে বিলুপ্ত হইল। সাধারণে দেখিল,—ম্যালেরিয়া জ্বরে ডাক্তারি ঔষধে যে সদ্যঃ সুফল হইয়া থাকে, কবিরাজীতে বহুদিন চিকিৎসা করিয়াও সে ফল পাওয়া যায় না। কলেরায় এলোপাথি বা হোমিওপ্যাথিতে যে ফল পাওয়া যায়, কবিরাজী চিকিৎসা তাহার অনেক পশ্চাতে পড়িয়া থাকে। আর শস্ত্র চিকিৎসা—ফোড়া কাটা, পোয়াতি খালাস—এ সকল চিকিৎসায় তো আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক ঘেঁসিতেই পারে না। সুতরাং কবিরাজ অপেক্ষা ডাক্তারের প্রাধান্য শুধু বেশভূষা এবং ব্যবহারিক যন্ত্রের চাকচিক্য নিবন্ধনই যে উপস্থিত হইল তাহা নহে, কার্য্যতঃ ও কবিরাজ অপেক্ষা ডাক্তারদিগের নিকট অতি শীঘ্র অধিকতর সুফল হইয়া থাকে দেখিয়া লোক ডাক্তারি চিকিৎসারই সমধিক অনুরাগী হইয়া পড়িল। অবস্থার ব্যবস্থায় বৈদ্য চিকিৎসকগণের দৈন্য বর্দ্ধিত হইল। তাঁহারাও আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার উন্নতির প্রতি আর মনোযোগ প্রদান না করিয়া নিজের জীবন কোনরূপে অতিবাহিত করিবেন এই সংকল্প করিয়া ভবিষ্যৎ বংশধর-দিগকে ইংরাজী শিক্ষায় সুশিক্ষিত করিয়া চাকরিজীবি সাজাইয়া তাহাদিগের উদরান্ন সংস্থানের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। ফলে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার আর উন্নতি হইল না,—এ চিকিৎসা জাগতিক সকল প্রকার চিকিৎসার মূল হইলেও ইহার উন্নতির পথে তো বাধা পড়িয়াছিলই, এক্ষণে তাবৎ চিকিৎসার নিম্নস্তরে পতিত হইয়া কেবল পূর্ব্ব সমৃদ্ধির উল্লেখ বিস্তারে আত্মতৃপ্তি লাভ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কেবল কতকগুলি রোগে ইহা ভিন্ন অন্য গতি নাই দেখিয়া সাধারণে ইহাকে ছাড়িল না; সেই-জন্য এখনো ইহার অস্তিত্ব একবারে লুপ্ত হয় নাই,—নতুবা অনেক কাল পূর্ব্বেই সমাজের সর্ব্বপ্রকার আভিজাত্যের মত অধুনা শিক্ষিতাভিমানী নব্যযুগে মিশিয়া ইহার অস্তিত্বও চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া কোন অতীত প্রদেশে মিলাইয়া যাইত—তাহা বলা যায় না।

আমরা যে বিষয় লইয়া অদ্য এই প্রবন্ধ আরম্ভ করিয়াছি—'আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার উন্নতি সম্বন্ধে আমাদের কর্ত্তব্য কি'—ইহা যদি স্থির করিতে হয়, তাহা হইলে যে যে কারণে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার অবনতি হই-য়াছে দেখাইলাম, সে গুলির উন্নতি করিতে হইবে। শল্য, শালাক্য, কায়-চিকিৎসা ভূতবিদ্যা, কৌমার ভৃত্য, অগদ তন্ত্র, রসায়ন তন্ত্র, বাজীকরণ তন্ত্র—সকল শাস্ত্রগুলি আবার আমাদিগকে আয়ত্ত করিতে হইবে। শুধু আলমারি সাজাইয়া, সাইনবোর্ড দিয়া লম্বা লম্বা বাক্য বিন্যাসে 'ছদ্মচর' সাজিয়া সাজিয়া রোগিসংগ্রহের চেষ্টা করিলে চলিবে না,—শাস্ত্র শিক্ষা পূর্ব্বক দৃষ্টকর্ম্মা হইয়া সর্ব্ব প্রকার চিকিৎসায় সিদ্ধিলাভ করিতে হইবে। দেশব্যাপী ম্যালেরিয়া—যাহা কুই-

নাইন ভিন্ন নিবারণ করিবার কোন উপায় নাই বলিয়া একবাক্যে স্থিরীকৃত হইয়াছে, 'নাটা'য় পার, 'গুলঞ্চে' পার, 'ভাঁটপাতা'র রস সেবন করাইয়াই পার,—তোমাদিগকে তন্নিবারণের ব্যবস্থা করিতে হইবে। কলেরা তাড়াইবার জন্য হোমিওপ্যাথের নিকট যাইবার স্পৃহা রহিত করিয়া বর্ত্তমান সময়ের রোগের প্রকৃতির গতি উপলব্ধি করিয়া ঔষধ নির্ব্বাচন করিতে হইবে। আর ফোড়া কাটা, পোয়াতি খালাস—এ সকলও আয়ত্ত করিবার জন্য এনাটমি, সার্জ্জারির পূর্ণ সাধনা করিতে হইবে। যদি এ সকল ব্যবস্থা করিয়া সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে পার,—এই প্রতিযোগিতার যুগে এলো পাথিক এবং হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা অপেক্ষা তোমাদের আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসায় যদি সর্ব্ব বিষয়ে কৃতিত্ব দেখাইতে পার, তাহা হইলে আয়ুর্ব্বেদের উন্নতির পথ আপনা হইতে এমনই উন্মুক্ত হইয়া পড়িবে যে, সহস্র ঝঞ্ঝাবাতেও কেহ তাহা রুদ্ধ করিতে পারিবে না।

সে উন্নতির পথ উন্মুক্ত হইবার সময়ও উপস্থিত হইয়াছে। তোমাদের "মকরধ্বজে"র গুণ পরিচয় এখন বিলাতী চিকিৎসকেরাও অবগত হইয়াছেন,—জ্বর বিকারের যে অবস্থায় 'গালিসাই' সেবন করাইয়া ফল পাওয়া যায় না, সে অবস্থায় তোমাদের 'মকরধ্বজ মৃগনাভি'র সত্তঃ কার্য্যকরী শক্তি দেখিয়া ডাক্তারগণ মুগ্ধ হইতেছেন। তোমাদের 'কালমেঘ,' তোমাদের 'অশোক', তোমাদের 'অশ্বগন্ধা'—তোমাদের 'কন্ট-কারি'—রোগ আরোগ্যে কিরূপশক্তি সম্পন্ন —ইহা যদি এক্ষণে বিলাতী চিকিৎসক মণ্ডলী অবগত না হইতেন, তাহা হইলে বেঙ্গল কেমিকাল ওয়ার্কসে আজি এ সকল প্রস্তুতের ব্যবস্থা হইত না। সেইজন্য বলিতেছি, আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার উন্নতির পথ এখন আর রুদ্ধ নাই,—এখন চেষ্টা করিলেই ইহার উন্নতি করা যাইতে পারে। কিন্তু সে চেষ্টার মূলীভূত বিষয় অষ্টাঙ্গ আয়ু-র্ব্বেদে সম্পূর্ণ শিক্ষা লাভ। সে শিক্ষায় সাফল্য লাভ করিলেই যে আয়ুর্ব্বেদের পুনরুন্নতি লাভ ঘটিবে—ইহা ধ্রুব সত্য কথা।

মহিলাগণের চিকিৎসা-শিক্ষা।

(২)

প্লীহা ও যকৃৎ রোগের ব্যবস্থা।

আমার একটি বাল্যসঙ্গিনী—তাহার নাম ছিল সুরমা। আমি যখন প্রথম শ্বশুর-ঘর করিতে আসিয়াছিলাম, তখন সুরমাই হইয়াছিল আমার সুখ-দুঃখের, আশা নিরাশার, কামনা-বাসনার এক মাত্র সহ-চরী। অন্যায় কার্য্যে গুরু গঞ্জনায় যখন আমার মুখে বিষাদের কালিমা প্রতিফলিত হইত, দারুণ অভিমানে আত্মহারা হইয়া যখন নৈরাশ্যের ঘনান্ধকার আমার বাহ্য মূর্ত্তিতে প্রকটমান হইত, মর্ম্মকথা মুখে

না ফুটিয়া যখন অন্তস্তল দেশে সিন্ধুবারির মত গুর্ গুর্ করিয়া বহিয়া যাইত, তখন সুরমা আসিয়া আমার সকল কথা জানিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিত। আমি বলিতে না চাহিলে সে সকল কথা খোঁচাইয়া খোঁচাইয়া জোর করিয়া আমার নিকট হইতে বাহির করিয়া লইত। সকল কথা বাহির করিয়া লইয়া কত সান্ত্বনার কথা বলিত। তখন বয়সটা খুবই অল্প ছিল, সংসারের রহস্য যে তখন কিছুই বুঝিতাম না, কাজেই প্রতিপদে কত ভুলই না করিয়া বসিতাম।

খুকীটি আমার যেদিন পুড়িয়া গিয়াছিল, তা'র পর দিন সকালে উঠিয়া শুনিলাম, সুরমা শ্বশুর বাড়ী হইতে পিত্রালয়ে আসিয়াছে। তাহার পিত্রালয় ছিল আমাদেরই বাড়ীর পার্শ্বে। আমি পিশিমার নিকট অনুমতি লইয়া সংবাদ শুনিবা মাত্র সুরমাকে দেখিবার জন্য ছুটিয়া গেলাম।

অনেক সুখ দুঃখের কথার পর সুরমা বলিল, "আমার ছেলেটি ভাই কিছুতেই সারিতেছে না, পেট জোড়া প্লীহা, লিভারটাও বড় হইয়াছে। জ্বর রোজ হয়না বটে কিন্তু এমন মাস নাই, যে মাসে দু'বার তিন বার করিয়া না হয়। কত চেষ্টা করা হইল, কিন্তু তাহাকে ভাল করিতে না পারিয়া মনের সুখ কিছুতেই পাইতেছিনা ভাই।

আমি বলিলাম—"ডাক্তার বদ্দিরা কেউ কিছু করিতে পা'রলনা।"

সুরমা বলিল—বদ্দি দেখাই নাই, কারণ বদ্দি-চিকিৎসার উপর ওঁদের বড় ভক্তি নাই, একবার নাকি কোন্ একটা বদ্দি আসিয়া ওঁর কি একটা অসুখে আস্ত একটা ভুল করিয়া বসিয়াছিল, সেই থেকে উনি বদ্দি চিকিৎসার উপর বড় চটা। ডাক্তার অনেক দেখান হইয়াছে কিন্তু তা'রা কেবল গাদা গাদা কুইনাইন দেয়, তা'খেয়ে জ্বর বন্ধ হয় বটে কিন্তু একবারে যায় না।

আমি বলিলাম,—তা' তোমার স্বামী তো ভাই বদ্দি চিকিৎসার উপর একেবারেই চটা। আমি কিন্তু তা'র চেয়েও একটা অন্যায় কাজ ক'রতে বলি, তা' তুমি ক'রবে কি!

সুরমা বলিল—কি!

আমি বলিলাম আমার পিসীমা, ডাক্তার বদ্দি না হ'লেও চিকিৎসার অনেক বিষয় জানেন। আমি বলি কি,—দিন কতক তাঁর উপর নির্ভর ক'রলে মন্দ হ'তনা।

সুরমা সম্মতি প্রকাশ করিল। বলিল, তা' ক্ষতি কি, তিনি তো এখানে নাই, ভাল দেখাই যা'কনা,—যদি পিসীমা সারাইতে পারেন, তখন তাঁকে সব্ কথা ব'লব, নইলে কিছুই ব'লবার দরকার নাই।

এই পরামর্শের পর আমরা দুইজনে পিসীমার নিকট আগমন করিলাম. সুরমার ছেলেটীও অবশ্য আমাদের সঙ্গে আসিল।

আসিয়াই আমি পিসীমাকে পাইয়া বসিলাম। বলিলাম,—পিসীমা আমাকে সেবার শিক্ষা করিবে বলিয়াছিলে. শুধু মুখের উপদেশে শিক্ষা দিলে চলিবেনা, চিকিৎসার ধরণ দেখাইয়া শিক্ষা করিতে হইবে।

এই বলিয়া সুরমার ছেলেটির অসুখের কথা তাঁহার নিকট প্রকাশ করিলাম।

পিসীমা সুরমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—খোকার বয়স কত হইয়াছে।

সুরমা বলিল—এই যেটের কোলে তিন বছরে প'ড়েছে।

পিসীমা জিজ্ঞাসা করিলেন,—মাইখায়। সুরমা বলিল—খায় বইকি? মাই না দিলে কচি ছেলে থাক্‌বে কি ক'রে?

পিসীমা বলিলেন—ওইটা আগে বন্ধ কর্‌তে হ'বে। যে সব ডাক্তারদের দেখাইয়াছিলে তাঁরা কি মাই বন্ধ ক'র্‌তে বলেনি!

সুরমা বলিল,—কেউ কেউ বলেছিল, কিন্তু খোকা মাই না পেলে যে অস্থির হ'য়ে উঠে. পিসীমা। কাজেই মাই বন্ধ ক'র্‌তে পারিনি।

পিসীমা বলিলেন,—যদি সহজে বন্ধ ক'র্‌তে না পার, তা'হ'লে মাইতে তেতো জিনিস মিশিয়ে দিতে হবে। নিমপাতা বেটে, ভাঁটপাতা বেটে কি বেনের দোকানে যে চিরতা পাওয়া যায়, তাই বেটে, কি কালমেঘের পাতা বেটে মাইতে লাগা'তে হয়, ওরই কোন একটা জিনিষ লাগা'লে মাইয়ের দুধের মিষ্টিভাব তেতো হ'য়ে যায়, তখন আর মাই খেতে চা'বেনা। এমনই ক'রে মাই বন্ধ ক'র্‌তে হ'বে। মাই বন্ধ না ক'র্‌লে হাজার ডাক্তার বদ্দি দেখা'লেও এ রোগ কিছুতেই সার্‌বেনা।

সুরমা বলিল,—আচ্ছা আমি ঐরূপ ক'রে বন্ধ ক'রব পিসীমা। এখন তার পর কি ক'রব—তা'বল।

পিসীমা বলিলেন,—আগে নিয়ম, তা'র পর ওষুধ। অনেক সময় ওষুধ না খাইয়েও শুধু নিয়মে রেখে অনেককে ভাল করা যায়। যা'হোক নিয়মগুলার কথা আগে বলি শোন। দুধ যা' দেবে, তাতে প্রত্যেকবারেই একটু পিঁপুলের গুঁড়া মিশিয়ে দেবে আর দুধ গরম ক'রবার সময় অর্দ্ধেক দুধ আর অর্দ্ধেক জল দিয়ে আর তা'তে একখানা আস্ত পিঁপুল ফেলে দিয়ে সিদ্ধ ক'রে নেবে। খাঁটি ঘন দুধ এ রোগে মোটেই ভাল নয়।

সুর। খাঁটি দুধ ভাল নয় কেন পিসীমা?

পিসী। খাঁটি দুধ ভাল নয় এইজন্য যে খাঁটি দুধ হজম ক'রতে যে শক্তি দরকার, পীলে নীবার বড় হ'লে সে শক্তি ক'মে যায়। পীলের দুধ দেওয়া চলে কিন্তু নীবারে দুধের মাত্রাটা যত কম দেওয়া যায় ততই ভাল।

সুর। তা' পিসীমা আমি দুধ না হয় কমই দেবো কিন্তু দুধ কম দিলে আরও তো কিছু খেতে দিতে হ'বে। তা' আর কি খেতে দেবো—তা'রও দু'একটা ব্যবস্থা ব'লে দাও।

পিসী। দেখ,—শঠীর পালো ব'লে আজকাল এক রকম খাবার বাজারে পাওয়া যায়। সেই শঠীর পালো দিয়ে দুধ সিদ্ধ ক'রে দিতে পর্‌লে এ রোগে খুব উপকার পাওয়া যায়।

সুর। শঠীর পালো পিসীমা ডাক্তারেরাও ব্যবস্থা ক'রেছিল। এখনো মাঝে মাঝে দিয়ে থাকি।

পিসী। মাঝে মাঝে নয়, ওটা রোজই দিও;—শঠী নীবারের একটা মস্ত ওষুধ। তা'ছাড়া দু'টি দু'টি পোরের ভাত দিতে পার্‌লে ভাল হয়।

সুর। তা' আর পা'রবনা কেন পিসীমা, তা' খুবই পারবো। তবে ভাত খাওয়ান এখনো অভ্যাস ক'রেনি—এই যা' কথা।

পিসী। ভাত খাওয়ান অভ্যাস ক'র্‌তে হ'বে। ভাত খাওয়ান এ রোগে খুব উপকারী। তবে সে ভাতটা পোরে'র

হওয়া চাই। আর তা'র সঙ্গে কাঁচা পেঁপে, মানকচু, ওল—এসব কিছু কিছু সিদ্ধ ক'রে খুব টিপে একটু আধটু খাইয়ে দেওয়া ভাল। পেঁপে, মানকচু আর ওল—এ তিনটি জিনিস আহার, ওষুধ—দুইই জান্‌বে। পাকা পেঁপেও একটু একটু দিতে পার। তাতেও বেশ উপকার হ'বে।

সুর। জল খাবারের সময় দু'টি কিস্‌মিস্, খেজুর, মিছরি এ সব দিতে পারি কি!

পিসী। খুব পার। ও গুলিও ও রোগের আহার ওষুধ। তবে মিছরিটা খুব বেশী দিওনা—মিছরি বা কোন মিষ্টি বেশী খেলে ক্রিমির সৃষ্টি হয় আর ছেলে বয়সে বেশী মিষ্টি অভ্যাস ক'র্‌লে তোত্‌লা হ'য়ে পড়ে।

সুর। পিসীমা, আমরা যেখানে থাকি, সেখানে আনারসটা খুব বেশী পাওয়া যায়, এইজন্য আমরা আনারসটা খেতে একটু বেশী ভালবাসি। খোকাকে কি সে আনারসের দু'এক টুক্‌রা দিতে পারি?

পিসী। জ্বর ভাল হলে আর খুব মিষ্টি আনারস হলে পার। আনারসে নীবারের ক্রিয়া ভাল হয় ক্রিমি থাক্‌লেও আনারস খেলে উহা নষ্ট হ'য়ে যায়। পীলে আর নীবার—এ দু'টী রোগে যাতে রোজ দাস্ত পরিষ্কার হয় এমন ব্যবস্থা করা দরকার। আনারসে কোন কোন ক্ষেত্রে সেটা সহজেই হ'য়ে থাকে ব'লে আনারস পীলে নীবারে উপকারী।

সুর। থাক্—তা'র পর এখন ওষুধের কথা বল।

পিসী। হাঁ এইবার তাই ব'ল্‌ব। কালমেঘের গাছ দেখেছিস্‌তো? সেই কালমেঘের ১০।১২টা পাতা আর আড়াইটে গোলমরিচ একসঙ্গে বেটে ৪টে ক'রে বড়ি ক'র্‌বি—তাই সকাল বেলা একটা, দু'পর বেলা একটা, আর সন্ধ্যাবেলা ১টা দুধের সঙ্গে কি জলের সঙ্গে গুলে খাইয়ে দিবি। এই শুধু কালমেঘই জান্‌বি নীবারের মহা ওষুধ। এই কালমেঘের আরক তৈরি ক'রে এখন নাকি অনেক ডাক্তারেও বিক্রি ক'র্‌ছে। তা' তার চেয়ে কিন্তু টাট্‌কা কালমেঘ তুলেনিয়ে বড়ি তৈরি ক'রে নেওয়া কি কালমেঘের রস খাওয়ান অনেক ভাল। এতে উপকার বেশী পাওয়া যায়।

সুর। মাঝে মাঝে যে জ্বর হয়, তা'র জন্য কি ক'রব?

পিসী। এতে জ্বরও যা'বে। তা' ছাড়া আর একটা কাজ ক'র্‌তে পারিস্। শিউলি-পাতা, ক্ষেৎপাপড়া আর গাঁট বাদ দিয়ে গুলঞ্চলতা—এক একটা জিনিস ।৶০ আনা ওজনে নিয়ে বেশ ক'রে থেঁতো ক'রে কলার পাতায় জড়িয়ে একখানা তাওয়া বা চাটুর ওপর আগুণের জ্বালে গরম ক'রে নিয়ে সমস্ত রাত্রি শিশিরে রেখে দেবে। তা'র পর সকাল বেলা কলার পাতাটা খুলে ফেলে নেকড়ার পুঁটুলি ক'রে রসটা নিঙ্‌ড়ে নেবে। এই রকম ভাবে যতটা রস হ'বে, তা'র অর্দ্ধেকটা ফেলে দেবে, বাকী অর্দ্ধেকটা খুব ভোরবেলা ঝিনুকে নিয়ে খাইয়ে দেবে। দিন কতক এই রকম ব্যবস্থা ক'রলেই জ্বর বন্ধ হ'য়ে যা'বে। এটাকে চল্‌তি কথায় 'ঘুসড়ো' ব'লে থাকে।

সুর। যে ক'টা জিনিসের নাম ক'র্‌লে ওর সব গুলিই যে বড় তেতো পিসীমা, অত তেতো জিনিস কচি ছেলে খা'বে কি ক'রে?

পিসী। একটুখানি মধু মিশিয়ে দিও, তা'হ'লে তেতোটা কিছু কম লাগ্‌বে। আর একটা কাজ ক'র্‌তে হবে,—রোজ একটু একটু চোণা খাওয়াতে হ'বে, তা' সে চোণা আবার যে সে গরুর হ'লে হ'বে না, কৈলে বাছুরের হওয়া চাই।

সুর। কৈলে বাছুরের ভাবনা নাই, কৈলে বাছুর আমাদের বাড়ীতেই আছে কিন্তু চোণা যে খেতে বড্ড খারাপ, খা'বে কি রকম ক'রে?

পিসী। ঝিনুকে নিয়ে ঢক্‌ ক'রে গিলিয়ে খাইয়ে দিবি,—আর খা'বে কেমন ক'রে? আর শুধু খাওয়ান নয়, একটা ভাঁড়ে ক'রে খানিকটা চোণা গরম ক'রে সেই ভাঁড়টা পীলে আর নীবারের উপর দু'বেলা সেঁকও দিতে হ'বে।

সুর। সে কি পিসীমা, কচিছেলে, গরম তাত্‌ সইতে পা'র্‌বে কেমন ক'রে?

পিসী। খুব পা'র্‌বে, যা'তে সয়, তাই ক'রে দিতে হ'বে। চোণার সেঁকতো নয়, আমরা ওকে সেঁক বলি কিন্তু বদ্যিরা ওকে স্বেদ বলে। চোণার স্বেদের মত উপকারী পীলে নীবারে আর অন্য জিনিস নাই।

সুর। ওষুদপত্তরের আর কি ব্যবস্থা ক'র্‌তে হ'বে?

পিসী। তোর ছেলের জন্য আর কিছু ব্যবস্থা ক'র্‌তে হ'বেনা, যে সব ব্যবস্থা ব'লে দিলাম, শুধু এই সব ক'র্‌লেই তোর ছেলে বেশ্‌ সেরে উঠ্‌বে। লোকনাথ বদ্দি ব'ল্‌ত শাস্তরে কচিছেলেদের জন্য নাকি বেশী ওষুদ দেওয়ার ব্যবস্থা নাই। কচি ছেলেদের যত অল্প ওষুদ খাইয়ে রোগ সারাতে পারা যায় তা'রই চেষ্টা করা উচিত।

সুর। তবু পিসীমা আরও গোটাকতক মুষ্টিযোগ ব'লে দাওনা, যদি এতে না সারে, তা'হ'লে সেই সকল ব্যবস্থা ক'রব।

পিসী। আচ্ছা তোর ছেলের জন্য যা বল্লুম আগে তা করে দেখ্‌—পরে ছেলে আরাম হলে যদি বদ্দিগিরি করবার জন্যে আরও কিছু জানিবার ইচ্ছা হয় তখন বল্‌বো।

সুরমা বলিল—আচ্ছা পিসীমা, তুমি আমার ছেলের জন্য যে সকল ব্যবস্থার কথা ব'লেছ, আমি সেই সকলই পালন কর'ব। এই বলিয়া সুরমা পিসীমাকে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল।

কিছুদিন পরে শুনা গেল, সুরমার ছেলেটি সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিয়াছে। আমার পিসীমার উপর আরও ভক্তি বাড়িয়া উঠিল। আমার অপেক্ষা আরও বাড়িল সুরমার স্বামীর। তিনি শ্বশুরালয়ে আসিয়া সমস্ত কথা অবগত হইলেন এবং সেই সময় হইতে স্থির করিলেন, যে কোন রোগই হউক না কেন, বৈদ্যচিকিৎসা ভিন্ন আর কিছুই করাইবেন না।

সাল্‌সার মস্‌লা।

দেশে আজকাল সাল্‌সার ছড়াছড়ি। যত-গুলি কবিরাজ—তত সংখ্যক "সাল্‌সা"তো আছেই তাহা ছাড়া—মুদী, পশারী, দোকানী, কোম্পানী, অনেকেই সাল্‌সার আবিষ্কারক। সাধুভাষায় সাল্‌সার এত নাম রচিত হইয়াছে যে. সে নামের "নামা-বলী" গায়ে দিয়া বঙ্গ-জননী কিছু ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। সাল্‌সার বিজ্ঞাপনেরই বা চটক কত! সকলেই বলিতেছেন—"আমার সাল্‌সাই আদি ও অকৃত্রিম, এমন সাল্‌সা এ পর্য্যন্ত মর্ত্ত্যধামে আর আবির্ভূত হয় নাই, ভবিষ্যতেও হইবে না।" সাল্‌সার গুণ শুনিয়া খরিদ্দার কোন্‌টা ছাড়িয়া কোন্‌টা কিনিবে,—তাহা স্থির করিতে পারে না। ফলশ্রুতির লিখন-ভঙ্গী এমন চমৎকার—যে, তুমি রোগী হও, নিরোগী হও, ভোগী হও, যোগী হও—কিছুতেই তোমার পরিত্রাণ নাই, তোমাকে সাল্‌সা কিনিতেই হইবে। বাল্‌সা হইতে বাঘী পর্য্যন্ত সকল রোগেই সাল্‌সার ব্যবহার। সাল্‌সার কাট্‌তি—বৈষ্ণবের মাল্‌সা ভোগকেও ছাড়াইয়া উঠিয়াছে।

আমিও আজ সাল্‌সা লইয়া পাঠকগণের সম্মুখে হাজির হইলাম। তবে আমার সাল্‌সা আমার আবিষ্কৃত নহে। আমার পিতামহ—এই সাল্‌সার ফর্দ্দখানি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তাঁহার মুখে শুনিয়াছি,—আমার পিতার আমলেও দেখিয়াছি—এই সাল্‌সা সেবন করিয়া অনেকে উৎকট রোগ হইতে মুক্ত হইয়াছেন। আমিও অনেককে এই সাল্‌সা ব্যবহার করাইয়া বিশেষ ফল পাইয়াছি।

সাধারণের উপকারের জন্য—নিম্নে সাল্‌সার ফর্দ্দখানি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

মস্‌লা।	ওজন।	গুণ।
অনন্তমূল	॥০ আধভরি	শোণিত শোধক
সাল্‌সা রুট্	।০ চারি আনা,	শোণিত শোধক
জাঙ্গী হরিতকী	৵০ আনা,	সারক,
বড় হরিতকী	৵০ "	"
যষ্টিমধু	৵০ "	বলকারক,
তোপচিনী	৵০ "	পারার দোষ নাশক, বাত নাশক,
সাচি ফরাস্	৵০ "	পিত্ত নাশক,
মিএন্	৵০ "	কফ নাশক,
ইশব্‌গুল	/০ "	ঠাণ্ডা ও বায়ুনাশক,
অশ্বগন্ধা	৵০ "	বলকারক রসায়ন,
গোয়াকম্	৵০ "	বেদনা নাশক,
আরবী গঁদ	/০ "	মেহ নাশক,
মৌরী	/০ "	ঠাণ্ডা, তৃষ্ণা নাশক,
পদ্মকাষ্ঠ	৩ রতি,	জ্বর ও দাহনাশক,
ছোট এলাচ	৩ "	গরম, কফ নাশক,
বড় এলাচ	৩ "	ঠাণ্ডা পিত্ত নাশক,
সফেদ্ মুষলী	/০ "	শুক্রবর্দ্ধক,
জৈত্রী	৩ রতি,	গরম, উত্তেজক,
তেজবল	/০ "	উত্তেজক,
তিখুর	৵০ "	পাচক,
কাবাব চিনী	২ রতি,	স্বপ্নদোষ ও মেহনাশক।
তোক্‌মারী	৩ রতি,	শুক্র কারক,

বিহীদানা ৩ রতি, মূত্রকারক,
সালম্ বিছরী /০ ,, বলকারক,
শ্বেত চন্দন /০ ,, মেহ নাশক,
রক্ত চন্দন /০ ,, পিত্ত নাশক,
তেজপাত ২ রতি, কফ নাশক,
জাফ্‌রাণ ১ রতি, উত্তেজক,
দারুচিনী ৩ রতি, উত্তেজক, কফনাশক,
জোলাফা ৩ ,, সারক,
তোক বলাঙ্গু ৩ ,, ক্ষত নাশক,
কাল্‌পিন্ ফুল ৩ ,, মেদোবর্দ্ধক,
রেউচিনি /০ ,, সারক,
লবঙ্গ /০ ,, কফনাশক, পাচক,
যোয়ান ৩ রতি, পাচক,
গোক্ষুর বীজ ৩ ,, মূত্র কারক
বংশলোচন ৩ ,, হৃদ্‌পিণ্ডের বল বর্দ্ধক,
গোলাপ ফুল /০ আনা, ঠাণ্ডা, সারক,
সোণামুখী ৩ রতি, সারক,
কালাদানা ৩ রতি, ঐ
ধনে /০ আনা, পিত্তনাশক,
পিপুল /০ ,, অগ্নি বর্দ্ধক।

মস্‌লাগুলি বেশ করিয়া ঝাড়িয়া হামামদিস্তায় কুটিয়া, মাটীর হাঁড়িতে কাঠের জ্বালে, তিন সের জলে সিদ্ধ করিতে হয়। তিন পোয়া থাকিতে নামাইয়া, ছাঁকিয়া বোতলে পুরিয়া রাখিতে হইবে। এক ছটাক মাত্রায় প্রত্যহ প্রাতঃকালে সেবন করিতে হইবে। এই সাল্‌সা, পুরাতন মেহ, রক্তদুষ্টি উপদংশ, বাত, ঘুষ্‌ঘুষে জ্বর, পুরাতন সর্দ্দি, কোষ্ঠবদ্ধতা, অনিদ্রা, দৌর্ব্বল্য; রক্তহীনতা, পুরুষত্ব হানি, অগ্নিমান্দ্য, প্রভৃতি রোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা ৪২ দিন খাইতে হয়। এই সালসার উপকরণগুলি কতক কবিরাজী কতক হাকিমী। আমি যতগুলি রোগীকে এ সালসা খাওয়াইয়াছি—সকলেই ইহার প্রশংসা করিয়াছেন।

এই সালসা সেবনে—দাস্ত, মূত্র ও ঘর্ম্ম হইয়া এক সপ্তাহেই শরীর গ্লানি-শূন্য হইবে। দ্বিতীয় সপ্তাহে—ক্ষুধা বাড়িবে, তৃতীয় সপ্তাহে—দূষিত রক্ত পরিষ্কৃত হইবে, চতুর্থ সপ্তাহে নূতন রক্ত-কণিকা জন্মিবে। পঞ্চম সপ্তাহে ব্যাধি নষ্ট হইবে। ষষ্ঠ সপ্তাহে শরীরের বল বৃদ্ধি হইবে।

সালসা সেবন কালীন—শাক- অম্ল, পিষ্টকাদি গুরুপাক দ্রব্য, ডিম্ব, মাংস. গুড়, দধি, পাকাকলা তৈলের তরকারী এবং কলায়ের দাল খাইতে পাইবে না। কাঁচা-পাকা জলে স্নান করিবে। রাত্রি জাগরণ, দিবা নিদ্রা ও স্ত্রী-সঙ্গ—পরিত্যাগ করিবে।

মুন্সী শ্রীআস্‌রাফ আলি হাকিম।

চূড়ান্ত-সস্তার চ্যবন প্রাশ।

-:০:-

[ভুক্তভোগীর ইতিহাস]

তিন বৎসর পূর্ব্বে বর্ষার আর্দ্র বাতাসে—আমার সর্দ্দী কাসি আরম্ভ হয়। ১০.১২ দিনেও যখন কাসি কমিল না, তখন আমাদের ফ্যামিলি ডাক্তারকে ডাকা হয়। ডাক্তার আসিয়া বলেন—"ও সামান্য ব্রঙ্কাইটিস্—দুইদিনে সারিয়া যাইবে।" কিন্তু

আমার ভাগ্যদোষে—দুই দিনের স্থানে দুই বৎসরেও রোগ সারিল না। স্থান-পরিবর্ত্তন, পেটেন্ট ঔষধ সেবন—কিছুই বাকি থাকিল না। কিছুতেই কিছু হইল না। আমার স্ত্রী কত দেশ হইতে কত মাদুলী আনাইয়া আমার কটী কণ্ঠ ও বাহু-যুগলে ঝুলাইয়া দিলেন, কত জাগ্রত দেবতার পাষাণ মন্দিরে 'ধন্না' দিয়া আসিলেন, কত "সোমবার" "মঙ্গলবার" "রবিবার" করিলেন, তাঁহার একাগ্র কামনা সমস্তই ব্যর্থ হইয়া গেল। কত 'কফ রেমিডি' 'কডলিভার' অতলে ডুবিল। আমার দেহ ও দিন দিন অস্থিচর্ম্ম-সার হইয়া পড়িল। গৃহে অবিবাহিতা দুই কন্যা—নিজে সামান্য কেরাণীগিরি করিতাম—পৈতৃক সম্বল কিছুই নাই—ছুটির অর্দ্ধ বেতনে সংসারই চলে না, কাজেই সজল নেত্রে সেই অগতির গতি ভগবানকেই ডাকিতে লাগিলাম।

এই সময় আমার এক মাতুল পুত্র আসিয়া বলিলেন—"দাদা! দিন কতক কবিরাজী চ্যবনপ্রাশ খাইয়া দেখনা কেন?" গৃহিণীও তাহার মতে সায় দিলেন। খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন পড়িয়া ভিঃ পিঃ ডাকে ঔষধ পাঠাইতে পত্র লিখিলাম। ৫।৬ দিন পরে দিব্য চক্‌চকে টিনের কৌটায় ভরা লেবেল আঁটা, ব্যবস্থাপত্র সম্বলিত নিকষ-কৃষ্ণ মেঘের বর্ণ 'চ্যবনপ্রাশ' আমার হস্তগত হইল। আমি আশ্বস্ত হৃদয়ে "চ্যবনপ্রাশ" সেবন আরম্ভ করিলাম। চাবণপ্রাশের গুণাবলী পাঠ করিয়া মনে হইল—এমন চমৎকার ঔষধ থাকিতে এতদিন বৃথাই কষ্ট পাইয়াছে। ইহার মূল্যই বা কত সুলভ—একসের ঔষধের "মূল্য ৩৲ টাকা" মাত্র। আহা! যাহারা এ ঔষধ বেচিতেছে—তাহারা প্রকৃতই নিষ্কাম ধর্ম্মী,—পরোপকারই তাহাদের জীবনের ব্রত!

একমাসে একপোয়া ঔষধ আমি খাইয়া ফেলিলাম। কিন্তু রোগের কিছুই উপশম হইল না। যাঁহারা ঔষধ পাঠাইয়াছিলেন তাঁহাদের কাছে রিপ্লাই কার্ডে পত্র লেখা হইল। উত্তর আসিল—"আপনার অসুখ অনেক দিনের, আরও কিছু দিন চ্যবনপ্রাশ সেবন করুন"। কথাটা সম্ভব বলিয়াই বিশ্বাস হইল। তৎক্ষণাৎ অর্ডার দিলাম আবার ঔষধ আসিল। আবার একমাস খাইলাম; কিন্তু রোগের অবস্থা "যথা পূর্ব্বম্ তথা পরং"! আবার পত্র লিখিলাম, শরীরের অবস্থার কথাও জানাইলাম। এবার চ্যবনপ্রাশের সঙ্গে এক রকম ঔষধ আসিল, তাহার নাম "চন্দ্রামৃত", ভাবিলাম—একা রামে রক্ষা নাই, সুগ্রীব তায় মিতে—আর আমার ভয় কি? এবার নিশ্চয়ই ভাল হইব। আমি আশায় বুক বাঁধিলাম। পত্নীর মুখ প্রফুল্ল হইল। আমাদের ভাগ্য-দেবী, অলক্ষ্যে একবার হাসিয়া লইলেন।

এই "চ্যবনপ্রাশ" ও "চন্দ্রামৃত"—ভক্তিপূর্ব্বক ৬ মাস কাল যথাবিধি সেবন করিলাম! ইহাতে লাভ এই হইল—আমলকী পিণ্ড খাইয়া খাইয়া আমার পেটের অসুখ দেখা দিল। দিনে রেতে ১০।১৫ বার করিয়া আমসংযুক্ত তরল ভেদ হইতে লাগিল। মাতুল পুত্র আমার অবস্থা দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। তখন স্থির হইল—"চ্যবনপ্রাশ" বিক্রেতার সঙ্গে—মাতুল পুত্র সাক্ষাৎ করিবেন। আমার এমন শক্তি ছিল না যে আমি নিজে যাই।

মাতুল পুত্র সন্ধ্যার পর ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার মুখে সংবাদ পাইলাম—"চ্যবনপ্রাশের' কারখানার মালিক আমার জন্য বিশেষ পরিশ্রম করিয়াছেন। তাঁহার ঔষধালয়ে ৫।৭ জন বৈদ্য কর্ম্মচারী আছেন, তাঁহারা এক একজন ঋষিতুল্য ব্যক্তি, আমার এই অসুখটী আরাম করিবার জন্য—তাঁহাদের অনন্ত—গবেষণা—প্রসূ বিরাট মস্তিষ্ক আন্দোলিত হইয়াছে। সেই আন্দোলনে—মহাসিন্ধু-আলোড়নে অমৃত উত্থানের মত 'শঙ্খবটী' ও "ভুবনেশ্বর" নামক দুইটী অমৃত আমার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। পেটের অসুখ না সারা পর্য্যন্ত আমি ঐ দুইটী ঔষধ আপাততঃ খাইব। তাহার পর আবার চ্যবনপ্রাশও চলিবে! আত্মীয় জনের অনুরোধে পড়িয়া—'শঙ্খবটী' ও "ভুবনেশ্বর" ৬ দিন সেবন করিলাম। আমাশয় বাড়িতেই লাগিল। শেষে ডাক্তার আসিয়া—'বিষমথ্' খাওয়াইয়া অকূলে কূল দেখাইয়া দিলেন। সে যাত্রা তাহাতেই বাঁচিয়া গেলাম। ঔষধ খাওয়া বন্ধ করিয়া দিলাম।

কিন্তু বেশীদিন চুপ্ করিয়া থাকা ভাল বোধ হইল না। কেন না—কাসি তখন বৃদ্ধি পাইয়া বারাণসীতে দাঁড়াইয়াছে। প্রতিবাসীরা পরামর্শ দিলেন—"একবার কলিকাতায় গিয়া কবিরাজ দেখাও।" বলাবাহুল্য আমাদের পল্লীগ্রামে একজনও কবিরাজ ছিল না।

কলিকাতায় গিয়া—একজন নামজাদা কবিরাজের শরণাপন্ন হইলাম। তিনি আমার নাড়ী পরীক্ষা করিয়া বলিলেন—"ভরসার মধ্যে জ্বর নাই। আপনি ভাল হইবেন।" তাঁহার ঔষধে আমার বিশেষ উপকার হইল। কিন্তু তিন সপ্তাহ পর্য্যন্ত,—অতি কষ্টে দাম যোগাইয়াছিলাম, আর পারিলাম না। কবিরাজ মহাশয়কে সকল কথা খুলিয়া বলিলাম। তিনি ঈষৎ হাস্য করিলেন। তাঁহার সহকারী এক ছাত্রকে বলিলেন—"এই ভদ্রলোক বড় গরীব, ইহাকে আধপোয়া চ্যবনপ্রাশ দাও—একটী টাকার বেশী মূল্য লইওনা।"

চ্যবনপ্রাশের নাম শুনিয়া ঘৃণায় আমার মুখ বিবর্ণ হইল। আমি বলিয়া ফেলিলাম—"দোহাই আপনার, আমায় 'চ্যবনপ্রাশ' আর দিবেন না। আমি তিন টাকা সেরের চ্যবনপ্রাশ—৯ মাস /২৷৹ পোয়া খাইয়াছি। তাহাতেই আমার পেট ভাঙ্গিয়াছিল। আপনি দয়া করিয়া আমার জীবন রক্ষা করিয়াছেন, চ্যবনপ্রাশ দিয়া আর আমায় হত্যা করিবেন না" কবিরাজ মহাশয় কৌতূহলী হইয়া—আমার চ্যবনপ্রাশ সেবনের ইতিহাস আনুপূর্ব্ব শুনিলেন। তাহার পর ধীরে ধীরে—তাঁহার ঔষধালয়ের সুসজ্জিত কক্ষে প্রবেশ করিলেন। অল্পক্ষণ পরেই একটী টীনের কৌটা আমার হস্তে দিয়া বলিলেন—'এই ঔষধ আপনি প্রত্যহ সন্ধ্যার পর আধতোলা ওজনে সেবন করিবেন। ঔষধ সেবনের পর একটু উষ্ণ দুগ্ধ পান করিবেন।" আমি তাঁহার কর্ম্মচারীর হাতে একটী টাকা দিয়া কৌটাটি লইয়া বাটীতে ফিরিয়া আসিলাম।

পরদিন ঔষধ খাইতে গিয়া দেখিলাম—কৌটার গাত্রে নাম লেখা রহিয়াছে—"ভার্গ্যাদি লেহ" কিন্তু ভিতরে সেই মসীকৃষ্ণ পিণ্ডাকার ঠিক চ্যবনপ্রাশের মতই

কিম্ভূত কিমাকার বস্তু! মনে সন্দেহ হইল—"চ্যবনপ্রাশই" বুঝি "ভার্গ্যাদি লেহ" নাম ধরিয়া আবার এই ভক্তাধমকে ছলনা করিতে আসিয়াছেন! হে অখণ্ড মণ্ডলাকার চ্যবনপ্রাশ! তুমি কি আমায় ছাড়িবে না?

পত্নী—আমার কোনও কথা শুনিলেন না, তিনি জোর করিয়া আমায় ঔষধ খাওয়াইলেন। বলিলেন—"এ চ্যবনপ্রাশ নয়, অন্য ঔষধ—তুমি খাও। কবিরাজদের কাছে—একরকম চেহারার অনেক ঔষধ থাকে ”

আমি ঔষধ খাইতে লাগিলাম। দুই তিন দিন পরেই ক্ষুধা বৃদ্ধি হইল, বেশ কোষ্ঠ পরিষ্কার হইতে লাগিল। একটু বলও যেন পাইলাম, ১০।১৫ দিন পরে—সকাল সন্ধ্যায় মাঠে দুই এক মাইল বেড়াইতে পারিলাম, ঔষধের উপর বড় ভক্তি হইল। কৌটাটি নিঃশেষ হইলে আবার একদিন কবিরাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলাম। একটী টাকা তাঁহার আসনের সম্মুখে রাখিয়া বলিলাম—"আমাকে আর একটু "ভার্গ্যাদি লেহ" দিন।" কবিরাজ মহাশয় হাস্য মুখে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেমন চ্যবন প্রাশে উপকার হইয়াছে কিনা? বল পাইয়াছেন কিনা?" আমি বলিলাম—চ্যবন প্রাশতো আমি খাই নাই। আপনি প্রথমে চ্যবন প্রাশ ব্যবস্থা করিয়া দিলেন বটে:—কিন্তু শেষে আমাকে "ভার্গ্যাদি লেহ" দিয়াছেন। উহাতে আমার বিশেষ উপকার হইয়াছে। কাসি—একদম নাই, ক্ষুধা ও বল বাড়িয়াছে। মনে হইহইতেছে—এইবার ভাল হইয়া গিয়াছি।

কবিরাজ মহাশয় বলিলেন—হাঁ—আপনি এবার ভাল হইয়া গিয়াছেন। চ্যবন প্রাশ আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের মধ্যে একটি উল্লেখ যোগ্য মহৌষধ। আপনার চ্যবন প্রাশে অভক্তি দেখিয়া—"ভার্গ্যাদি লেহ" নাম দিয়া, আমি আপনাকে সেই চ্যবন প্রাশই দিয়াছি। সুধু আপনি কেন? অনেকের মুখেই আমরা চ্যবন প্রাশের নিন্দা শুনিতে পাই, চ্যবন প্রাশের নকলে—দেশ ছাইয়া গিয়াছে। কাজেই অনেক স্থলে—আসল চ্যবন প্রাশকে নকল নাম দিয়া—আমরা ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হই।"

আমি অবাক্ হইয়া বৈদ্যরাজের মুখের পানে চাহিয়া রহিলাম। ভাবিতে লাগিলাম—আমাদের দেশে যেমন খাদ্য দ্রব্যগুলি ভেজালে পূর্ণ হইয়াছে,—জীবন রক্ষক ঔষধের ভিতরেও কি তেমনি ভেজাল চলিতেছে? শাস্ত্রীয় ঔষধের ভিতরেও এত প্রতারণা? দরিদ্র বাঙ্গালী জাতিকে—অল্প মূল্যের প্রলোভন দেখাইয়া—এমন সর্ব্বনাশ কি করিতে আছে?

হায়!—আমার এ কথা—কোন্ হৃদয়বান্ ভাবিয়া দেখিবেন? যাহারা বড়ী বেচা বাড়ির মহিমা বুঝিয়াছে, তাহারা আমার মত লোকের অনুরোধে—"ধর্ম্মের কাহিনী" শুনিবে কেন? তাহাদের ব্যবসায়ের "মূল" যে অক্ষয় বটের মত বহু শাখা প্রশাখায় দেশ ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে।

এবার অতি বর্ষার ফলে—অনেকেই কফ রোগে আক্রান্ত হইতেছেন, সম্মুখে—শীত ঋতু,—অনেকেই ফুস্‌ফুস-প্রদাহ ও কাসির পীড়ায়—কষ্ট পাইতে পারেন। তাই পাছে কেহ—রামা শ্যামার অপূর্ব্ব আবিষ্কার আমলকী পিণ্ড খাইয়া "চ্যবন প্রাশ" খাইতেছি মনে করেন,—সেইজন্য আমার চ্যবন

প্রাশ সেবনের ইতিহাস আজ সর্ব্বসমক্ষে প্রচার করিলাম।

আমার বিশ্বাস—কবিরাজী চিকিৎসার উপর সাধারণের যেমন দিন দিন শ্রদ্ধা বাড়িতেছিল, যা'র তা'র হাতের নকল ঔষধ—সে শ্রদ্ধা আর বেশী দিন থাকিতে দিবে না। আমরা অতি পশু জাতি, একদিকে আমরা ঘৃত বলিয়া বিষ খাইতেছি, ভেজাল খাদ্য ভক্ষণে স্বাস্থ্য হারাইতেছি;—অন্যদিকে—মকরধ্বজের পরিবর্ত্তে—পারা গন্ধক মনছালের সংযোগ, চ্যবন প্রাশের পরিবর্ত্তে 'আমলকী পিণ্ড' পাইতেছি। আমাদের ঔষধ পথ্য দুইই বিগড়াইয়াছে, অতএব আমাদের ভাগ্যে—'ফলং অপ মৃত্যুঃ'

কবিরাজী ঔষধ আমাদের প্রকৃতির প্রকৃত উপযোগী। কিন্তু আমার অনুরোধ—জীর্ণ জটিল ও দুশ্চিকিৎস্য রোগে যাঁহারা কবিরাজী চিকিৎসা করাইবেন,—তাঁহারা যেন বিজ্ঞাপনের চটকে বিড়ম্বিত হইয়া নিজের সর্ব্বনাশ নিজে না করেন। যাঁহারা—কবিরাজের বংশে জন্মিয়াছেন, কবিরাজের শিষ্য হইয়াছেন, কবিরাজী শাস্ত্র পড়িয়াছেন,—তাঁহারা ভিন্ন কবিরাজী ঔষধের গূঢ়রহস্য অপরের বোধগম্য নহে। রোগিগণ আমার এই কথা স্মরণ রাখিবেন।

আর কবিরাজ মহাশয়দের কাছে ও আবার একটী ভিক্ষা আছে।—তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ দেখিতেছি—কতকগুলা অর্থলুব্ধ অব্যবসায়ীর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে গিয়া সাধারণকে সস্তার প্রলোভন দেখাইতেছেন। তাঁহাদের জানা উচিত—শাস্ত্রীয় ঔষধ—এরূপ "হেলাফলা" সামগ্রী নহে। শাস্ত্রীয় ঔষধ—"নকড়া-ছকড়ার" নিলামী মাল নহে। শাস্ত্রীয় ঔষধ—সেই সত্য যুগ হইতে আজ পর্য্যন্ত—চিরদিন দেব-নির্ম্মাল্যের মতন পবিত্র।

অনুকরণের হনুকরণে—আয়ুর্ব্বেদের সর্ব্বনাশ করিও না। যাহারা চাকুরী জুটাইতে না পারিয়া, কবিরাজী ঔষধের ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছে—তাহারা সামান্য দোকানদার, জগতে তাহারা গৌরব-প্রতিষ্ঠার ধার ধারে না, তাহারা আয়ুর্ব্বেদের মহিমা বুঝে না, তাহারা—চায়—যেন তেন প্রকারেণ কর্ত্তব্যো ধনসংগ্রহঃ।—

আর তোমরা—বৈদ্য, ঋষি—বংশধর, আয়ুর্ব্বেদের প্রতিষ্ঠাতা, সমাজের শিরোভূষণ, জগজ্জীবের জীবনদাতা—ক্ষুদ্র দোকানদারের সঙ্গে তোমরা কেন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে চাও? তাহাদের সঙ্গে তোমাদের কি তুলনা হয়?

একজন সুরসিক সাহিত্যসেবীর মুখে গল্প শুনিয়াছিলাম—পি, সি, মার "দদ্রু দমন" নামক ঔষধের প্রচার দেখিয়া,—কেবলরাম নিজ পুত্রের নাম পীতাম্বর রাখেন। তাহার সাধু উদ্দেশ্য—পি, সি- মার ঔষধটীর নাম ও মার্কা আত্মসাৎ করা। শেষে পিনাল কোর্ডের ভয়ে—"পি সি, মার দদ্রু দমন মলম" ছাপাইয়া দিলেন। এবং পি, সি, মার দোকানের পার্শ্বেই একখানি দোকান খুলিলেন। পি, সি, মারের শুধু "দদ্রু দমন"—কেবল রামের—"দদ্রু দমনের" পর "মলম" প্রত্যয়। বিক্রী দেখে কে? ইহা দেখিয়া ক্রমে ক্রমে—অনেকেই দোকান খুলিতে লাগিল। 'মা' সি, মার,' "পি, সি, মার" পি, চ, মার, পি, এস, মার—একে একে মাটী ফুঁড়িয়া উঠিতে লাগিল। অবশেষে—স্থানীয় মিউনি-

সিপালিটী সে রাস্তাটীর নাম রাখিয়াছিলেন —"দদ্রু দমন রোড"। সস্তায় চ্যবন প্রাশ বিক্রয়ের ও অনেকগুলি দোকান হইয়াছে, এই দেখিয়া আমাদেরও মনেও ভরসা হইতেছে—শীঘ্রই সহরের একটী রাস্তার নাম হইবে—"চ্যবন প্রাশ রোড।" সেই দৃশ্য দেখা পর্য্যন্ত—ভগবান্ আমাকে বাঁচাইয়া রাখুন। প্রৌঢ়ত্বের শেষ সীমায় দাঁড়াইয়া—দিন কয়েকের জন্য আজ আমি জীবন ভিক্ষা চাহিতেছি।*

শ্রীকেদার নাথ মুখোপাধ্যায়।

* সত্য মিথ্যা জানি না। একজন অতি বিশ্বস্ত ভদ্রলোকের মুখে শুনিয়াছি, তাঁহার এক বন্ধু—কেরাণীগিরির সঙ্গে সঙ্গে একটু আধটু চিকিৎসা কার্য্যও করিতেন। এই বন্ধু—একজন সস্তায় চ্যবন প্রাশ বিক্রেতাকে—রাঙ্গা আলু সিদ্ধ করিয়া সেই রাঙ্গা আলুপিণ্ডকে তিল তৈলে ভাজিয়া, কিঞ্চিত আমলা চূর্ণ ও পিপুল চূর্ণ সহযোগে—চ্যবন প্রাশ প্রস্তুত করিতে দেখিয়াছেন।

—লেখক।

রক্তপিত্ত।

আজকাল আমাদের দেশে দিন দিনই যেন রক্তপিত্তরোগের প্রাদুর্ভাব বর্দ্ধিত হইতেছে বলিয়া অনুমান হয়। এই ভীষণ ব্যাধির আক্রমণে প্রতিবৎসর শত শত নরনারী অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়া জীবন বিসর্জ্জন দিতেছেন। ইহা চির বিবর্ত্তনশীল কাল-মাহাত্ম্যজনিত অথবা আহার, বিহার ও সামাজিক রীতিনীতির পরিবর্ত্তন সম্ভূত, তাহা তত্ত্বানুসন্ধিৎসু মহাত্মাগণ বিচার করিয়া নির্দ্ধারণ করিতে পারেন, ফলকথা, যাহাই হউক একটা কিছু কারণ ঘটিয়াছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। যদিও ব্যাধির হেতু নির্ণয় করতঃ তাহার পরিবর্জ্জন করাই প্রথম চিকিৎসা বলিয়া শাস্ত্রকারগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং রোগোৎপাদকহেতুর পরিহার ব্যতীত, আরোগ্যলাভ সম্ভবপর হইতে পারে না, তথাপি বর্ত্তমান সময়ে, দেশ ও সমাজের অবস্থা অনুসারে বিবেচনা করিলে, উক্ত কারণের পরিত্যাগ বিষয়ে, ব্যর্থ চিন্তা করিয়া হতাশ হওয়া অপেক্ষা সাক্ষাৎ কার্য্যকারণের আলোচনা অথবা ব্যাধিপ্রতীকার কল্পে সাধ্যমত কর্ত্তব্য নির্ণয় করাই সমিচীন ও সম্ভাবিত বলিয়া মনে হয়। সমাজের মতিগতি শিক্ষার অপ্রতিবিধেয় সংস্কার, কাল মাহাত্ম্যের অলঙ্ঘনীয়তা প্রভৃতি দুরতিক্রমনীয় কারণে যাহা ঘটিবার তাহাকে কে প্রতিরোধ করিবে? তথাপি যতদূর সাবধানতা অবলম্বন করা সম্ভবপর হইতে পারে, তৎপ্রতি সকলেরই মনোযোগ কর্ত্তব্য। ইহাতে সম্পূর্ণভাবে না হইলেও সমাজের ও দেশের কতকটা উপকার সাধিত হইতে পারে বর্ত্তমান সময়ে আমাদের জীবনযাত্রা, যেমত কার্য্য শৃঙ্খলার দ্বারা আবদ্ধ, তাহাতে শাস্ত্রীয় বিধির অনুসারে যথাযথ আচার ব্যবহার সর্ব্বসাধারণ পক্ষে কখনই সম্পাদ্য হইতে পারে না; সুতরাং তন্নিবন্ধন শারীরিক বা মানসিক বৈষম্য যাহা ঘটিবে, তাহা প্রতিরোধ করিবার সাধ্য কাহারও নাই, কিন্তু, তথাপি আমরা যদি অবান্তর ও প্রতিবিধান-

যোগ্য কারণগুলির প্রতি সাবধান থাকি, তাহা হইলেও অনেকটা সুখ শান্তিতে অবস্থান করিতে সমর্থ হইতে পারিব, সেই অভিপ্রায়েই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

রক্ত ও পিত্ত উভয়ের প্রকোপজনক যে সমস্ত কারণ, তাহা অত্যধিক পরিমাণে সেবিত হইলে রক্তপিত্ত রোগ জন্মিতে পারে। সাধারণতঃ অতিরিক্ত কটুদ্রব্য (মরিচ, পিপুল প্রভৃতি) অম্ল ও লবণরস-যুক্ত বস্তু, আদা, রসোন প্রভৃতি তীক্ষ্ণবীর্য্য পদার্থ, ক্ষারপদার্থ, অধিক রৌদ্র বা অগ্নি-সন্তাপ, অতিরিক্ত পথপর্য্যটন, গুরুতর শোকপ্রাপ্তি, অপরিমিত ব্যায়াম, অধিক স্ত্রীসংসর্গ প্রভৃতি কারণে পিত্তের প্রকোপ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। পূর্ব্ববর্ত্তি-কারণ বশতঃ বিদগ্ধভাবাপন্ন পিত্ত যদি এই সমস্ত হেতু জন্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে শরীরস্থ যাবতীয় রক্তকেও কুপিত ও বিদগ্ধ করে, এবং দ্রবস্বভাববশতঃ ঐ রক্ত ও পিত্ত উভয়েই মিলিত ও সমবর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বাবয়বে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। পিত্তের বৃদ্ধির সহিত ঐ দুষ্ট রক্তও বর্দ্ধিত হইতে থাকে। যেহেতু পিত্তই রক্তোৎপাদনের কারণ। সুতরাং তাহার প্রকোপ, দুষ্টি, ও বৃদ্ধিতে রক্তও কুপিত, দুষ্ট ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে ইহা স্বতঃসিদ্ধ। এবম্বিধ পিত্ত ও রক্ত প্রমাণাতিরিক্ত রূপে সঞ্চিত হইলে, রক্তবাহি শিরাসমূহের দ্বারা নাসা, কর্ণ, মুখ, পুরুষাঙ্গ, যোনিদেশ, গুহ্যদ্বার প্রভৃতি স্থান হইতে বাহিরে নির্গত হইতে থাকে। এই অবস্থাপন্ন ব্যাধির নাম রক্তপিত্ত।

এই রোগের উৎপত্তির প্রথমাবস্থায় নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি প্রায়ই উপস্থিত হয়, যথা মস্তকে ভারবোধ, আহারে অরুচি, শীতল বস্ত্র ব্যবহারে অভিলাষ, ধূমবৎ উদ্গার, বমি, নিজের বমন দর্শনে ঘৃণাবোধ, কাস, শ্বাস, ভ্রমি, শরীরের অবসন্নতা, মুখ ও নাসিকামধ্যে লৌহ, রক্ত বা মৎস্যের ন্যায় গন্ধানুভব, চর্ম্ম, চক্ষু, মল ও মূত্রাদিতে হরিদ্রা, রক্ত কিম্বা পীতবর্ণতা, স্বপ্নাবস্থায় সমস্ত দৃশ্যে রক্তবর্ণ দর্শন। উক্ত লক্ষণগুলি প্রকাশ পাইলেই অচিরভাবী রক্ত-পিত্তের আবির্ভাব বুঝিতে পারাযায়, এই জন্য এই সমুদয় লক্ষণ রক্তপিত্ত রোগের পূর্ব্বরূপ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

রক্তপিত্ত, ঊর্দ্ধ, অধঃ ও উভয়মার্গ ভেদে তিন প্রকার জন্মিয়া থাকে। ঊর্দ্ধ-গত রক্তপিত্তে নাসিকা, চক্ষু, মুখ ও কর্ণ দ্বারা রক্ত নির্গত হয়, অধোগত রক্তপিত্তে পুরুষাঙ্গ, যোনিদেশ ও গুহ্যদ্বার হইতে এবং উভয় মার্গগত রক্তপিত্তে একদা উক্ত উভয়বিধ মার্গ দ্বারা রক্ত বহির্গত হয়। রক্তপিত্ত রোগ অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে সমস্ত রোমকূপের ছিদ্র হইতেও রক্ত নির্গত হইয়া থাকে।

মুখ নাসিকাদির দ্বারা অমিত রক্তস্রাব, তৎসহচরিত জ্বর এবং রোগীর পাণ্ডুবর্ণতাদি লক্ষণ দেখিয়া আজকাল কোন কোন চিকিৎসক এই ব্যাধিকে ক্ষয়জ ব্যাধি মনে করতঃ বিষম ভ্রমে পতিত হয়েন, বস্তুতঃ রক্তপিত্ত রোগের সহিত যক্ষ্মা শোষ প্রভৃতি ক্ষয়জনিত ব্যাধির কোন কার্য্য কারণতা সম্বন্ধ নাই। এই রোগে যে রক্ত নিঃসৃত হয় তাহা সমস্ত রক্ত নহে, অধিকাংশই রঞ্জিত পিত্ত ও কতকাংশ দূষিত রক্ত। এ বিষয় রোগের উৎপত্তি বর্ণনকালেই বলা

হইয়াছে, পিত্তের বিকৃতি দোষেই বিকৃত ও পিত্তযুক্ত উদ্রিক্ত রক্তগুলি নিঃসৃত হইয়া থাকে। বাস্তবিক যদি ঐ রক্ত শরীরস্থ বিশুদ্ধ রক্তধাতু হইত তবে তৎপরিমিত রক্তস্রাবে রোগী অত্যল্প সময় মধ্যেই নিতান্ত অবসন্ন বা মৃত্যুমুখে পতিত হইত, সন্দেহ নাই। রক্তপিত্তে সময়ে সময়ে এক-সের বা ততোধিক পরিমাণে রক্তস্রাব দৃষ্ট হইয়া থাকে, রোগী যদিও স্রাবসমকালে কতকটা অবসন্নতা প্রাপ্ত হয়, কিন্তু সুপথ্য ও যথোচিত পরিচর্য্যাদিগুণে, সে অবস্থা দীর্ঘ সময় থাকে না।

আরও দেখা যায়, অনেক সময়ে রক্ত বা পিত্তের শমনকারী সাধারণ মুষ্টিযোগ ঔষধ ২।৪ বার সেবনেই রক্তস্রাব বন্ধ হইয়া যাওয়ায়, রোগী অল্পকাল মধ্যেই পূর্ব্ব স্বাস্থ্য ও স্বচ্ছ-ন্দতা লাভ করিতে সমর্থ হয়। ক্ষয়জনিত রোগে ঈদৃশ পরিবর্ত্তন কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না, ইহা সাধারণ জ্ঞানেই বুঝিতে পারা যায়। যদিও "কাসোজ্বরোরক্তপিত্তং ত্রিরূপেরাজযক্ষ্মণি" এই ভোজোক্ত বচন-প্রমাণে যক্ষ্মারোগ মধ্যে রক্তপিত্ত ও একটা লক্ষণ স্বরূপ কথিত হইয়াছে, কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে উহা দ্বারা রক্তপিত্তের রাজ-যক্ষ্মত্ব প্রতিপন্ন হয় না,—বরং স্বতন্ত্রতাই বুঝা যায়, তবে যক্ষ্মারোগের সহিত রক্ত-পিত্তাদি রোগ সংসৃষ্ট হইলে উহা অতি দুঃসাধ্য হয়, কিন্তু রক্তপিত্তে যদি কাসি বা জ্বর বর্ত্তমান থাকে, তাহা কখনই রাজযক্ষ্মা নামে অভিহিত বা অসাধ্য বলিয়া পরিগণিত নহে।

সর্ব্ববিধ রক্তপিত্ত মধ্যে উর্দ্ধগত রক্তপিত্ত অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য। কারণ উক্ত রোগে পিত্তের সহিত কফের অনুবন্ধ থাকে। পিত্ত-দোষ নিবারণের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা বিরেচনই প্রধান ঔষধ, অথচ বিরেচন প্রয়োগে উর্দ্ধগত রক্তপিত্তে যে কফের অনুবন্ধ থাকে তাহারও উপশম হয়, অধিকন্তু তিক্তকষায়-রসবিশিষ্ট বিবিধ ঔষধ পথ্যাদির প্রয়োগে ঐ পিত্ত ও শ্লেষ্মাকে সহজে উপশমিত করা যায়। অনেক সময়ে একমাত্র বিরেচন প্রয়োগেই এ অবস্থায় বিশেষ উপকার দেখা গিয়াছে।

এতৎ সম্বন্ধে চরক সংহিতায় উক্ত হই-য়াছে যে—

"সাধ্যং লোহিত পিত্তং তৎ যদূর্দ্ধং প্রতিপদ্যতে
বিরেচনস্য যোগিত্বাৎ বহুত্বাদ্ভেষজস্য চ।
বিরেচনং হি পিত্তস্য জয়ার্থে পরমৌষধং।
যশ্চ তত্রানুগঃ শ্লেষ্মা তস্য চানধমংস্মৃতম্॥
ভবেদ্ যোগাবহং তত্র কষায়ং তিক্তমেবচ।
তস্মাৎ সাধ্যতমং রক্তং যদূর্দ্ধং প্রতিপদ্যতে"॥

অর্থাৎ—উর্দ্ধগামী রক্তপিত্ত বিরেচনোপযোগী বলিয়া সাধ্য হইয়া থাকে। বিশেষতঃ উহার প্রতিবিধানার্থ নানাবিধ পিত্তকফনাশক যোগবাহী ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে, পিত্তদোষ হরণে বিরেচনই সর্ব্বোৎকৃষ্ট চিকিৎসা, উহাতে পিত্ত ও তৎসংসৃষ্ট শ্লেষ্মার ও উপশম হয় সুতরাং উর্দ্ধগরক্তপিত্তী সহজেই আরোগ্যলাভ করে।

অধোমার্গরক্তপিত্ত প্রায়ই যাপ্য (অর্থাৎ যথোপযুক্ত ঔষধ পথ্যাদি প্রয়োগে সাম্য-ভাবে) থাকে। এই রোগে পিত্তের সহিত বায়ুর অনুবন্ধ থাকায় প্রধানতঃ মধুর রস-বিশিষ্ট ঔষধপথ্যই উপযোগী। যদিও এ অবস্থায় বমনের দ্বারা চিকিৎসার বিধান উক্ত আছে, কিন্তু বমন ক্রিয়া সঞ্চিত পিত্তনাশে উপযোগী হইলেও পিত্তদোষ হরণে বিশেষ

ফলপ্রদ নহে। পিত্তহর তিক্তকষায় রস বায়ুর প্রকোপজনক সুতরাং ইহাতে প্রয়োগ করা যায় না। অপরন্তু এ অবস্থায় যে বায়ুর অনুবন্ধ থাকে, বমন দ্বারা তাহার উপশম হওয়া সম্ভবপর নহে। সুতরাং বায়ু ও পিত্তের উপশমকারী মধুররসাদিযুক্ত ঔষধ ও পথ্যাদি প্রয়োগে এবং অনুকূল স্বাস্থ্যকর দেশে অবস্থানাদির দ্বারা যতদূর সম্ভবপর হয় উক্ত ব্যাধিকে উপশান্ত রাখিতে চেষ্টা করিবে।

উভয় মার্গগত রক্তপিত্ত রোগ প্রায়ই অসাধ্য হয়। রোগজনক দোষ সমূহের পরস্পর বিপরীত ধর্ম্মবশতঃ একের প্রতীকারে অন্যের প্রকোপ বৃদ্ধি পায়, সুতরাং ঔষধাদির প্রয়োগে বিশেষ সুফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না। অতএব এ অবস্থায় দোষের বলাবল বিবেচনা পূর্ব্বক যথাযথ ঔষধ পথ্যাদির ব্যবস্থা দ্বারা রোগীকে কোন প্রকারে সাম্যাবস্থায় রাখাই চিকিৎসকের কর্ত্তব্য।

রক্তপিত্তে দোষের ও সাধ্যাসাধ্যত্বের পরিচয়।

উর্দ্ধগামী রক্তপিত্ত শ্লেষ্মসংসৃষ্ট। অধোগত রক্তপিত্ত বাতানুগত এবং উভয় মার্গগত রক্তপিত্ত, কফ-বাতানুগত হইয়া থাকে।

১। এক মার্গগামী (এস্থলে টীকাকার উর্দ্ধগামীকেই গ্রহণ করিয়াছেন এবং এই মতই সর্ব্বসম্মত ও সমীচীন) রক্তপিত্ত যদি প্রবল স্রাবযুক্ত না হয় ও রোগী সবল থাকে এবং শিশির বসন্তাদি সুখকর সময়ে যদি চিকিৎসার সুযোগ ঘটে ও রক্তপিত্তোক্ত উপদ্রবগুলি যদি উপস্থিত না থাকে তাহা হইলে সুখসাধ্য হয়।

২। এক দোষানুগত রক্তপিত্ত সাধ্য, দ্বিদোষানুগামী যাপ্য এবং সর্ব্বদোষযুক্ত হইলে অসাধ্য হয়।

৩। অগ্নিমান্দ্যরোগীর প্রবল বেগযুক্ত রক্তপিত্ত অসাধ্য।

৪। অন্য ব্যাধির দ্বারা ক্ষীণদেহ, বৃদ্ধ, অরুচিবশতঃ যথোচিত ভোজনে অসমর্থ ব্যক্তির রক্তপিত্ত অসাধ্য।

৫। যে সমস্তদৃশ্যপদার্থ বা নভোমণ্ডল রক্তবর্ণময় দর্শন করে, তাদৃশ রক্তপিত্ত রোগী অসাধ্য।

৬। রক্তপিত্তে যদি রোগীর চক্ষু লোহিত বর্ণ হয় এবং বমন বা উদ্গার সময়ে সমস্তই রক্তবর্ণ বলিয়া অনুভূত হয় তাহাকেও অসাধ্য বুঝিতে হইবে।

রক্তপিত্তের উপসর্গ।

দৌর্ব্বল্য, শ্বাস, কাস, জ্বর, বমন, মত্ততা, শরীরের পাণ্ডুবর্ণতা, দাহ, মূর্চ্ছা, ভুক্তান্নের বিদাহ, সর্ব্বদা অধীরভাব, বক্ষঃপ্রদেশে প্রবল ব্যথা, পিপাসা, তরল মলভেদ, মস্তকে সন্তাপবোধ, মুখ ও নাসিকার দ্বারা দুর্গন্ধযুক্ত শ্লেষ্মার নিঃসরণ, ভোজনে অরুচি, অন্নের অপরিপাক। এই সমস্ত উপদ্রবের ন্যূনতা ও আধিক্য অনুসারে রক্তপিত্ত কষ্টসাধ্য এবং অসাধ্য হয়। যদি উপদ্রব একেবারেই না থাকে তবে সুখসাধ্য হয়। ইহাব্যতীত উক্ত রোগের সাধ্যাসাধ্যত্ব নির্ণয়ের জন্য প্রস্রুতরক্তের ও প্রকারভেদ শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। যথা— এইরোগে রক্তেরবর্ণ মাংসধোয়া জলের ন্যায় অথবা কর্দ্দমার্দ্র জলের তুল্য হইলে

কিম্বা বসা, পূয, বা যকৃৎ খণ্ডের ন্যায় রক্ত নির্গত হইলে উহা অসাধ্য। যদি পক্ক জামফলের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, বা গাঢ় কৃষ্ণ-বর্ণ, নীলবর্ণ অথবা ইন্দ্রধনুর মত নানাবর্ণ বিশিষ্ট রক্তস্রাব হয় তাহা হইলে ও উহা অসাধ্য হইয়া থাকে। প্রস্রুত শোণিতের গন্ধ যদি শবের (মৃতদেহের) গন্ধবৎ অনুভূত হয় তবে উক্ত রক্তপিত্তও অসাধ্য বলিয়া জানিতে হইবে। বারান্তরে আমরা রক্ত-স্রাবমূলক অন্যান্য রোগের সহিত রক্তপিত্তের পার্থক্য নির্দ্দেশ এবং রক্তপিত্তের চিকিৎসা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিব।

(ক্রমশঃ)

কবিরাজ শ্রীঅমৃতলাল কবিভূষণ
কাব্যতীর্থ।

ম্যালেরিয়া ও বিষমজ্বর

—— ঃ০ঃ ——

অধুনা বাঙ্গালার পল্লীগুলি শুধু ম্যালেরিয়ায় উৎসন্ন যাইতেছে না, ম্যালেরিয়ার সহিত কালাজ্বরও বাঙ্গালার পল্লীগুলিতে প্রবেশ করিয়াছে। অনেক সময় এই দুইটি জ্বরে ভেদ নির্ণয় করা বাহ্যিক অবস্থা দেখিয়া বড় শক্ত হইয়া পড়ে,—অনেক চিকিৎসককেই এজন্য বিভ্রাটে পড়িতে হয়। সঠিক অবস্থা বুঝিতে না পারিয়া অনেকে কালাজ্বরকেও ম্যালেরিয়া জ্বর মনে করিয়া সেই ধরণের চিকিৎসা করিতে আরম্ভ করেন কিন্তু যথোপযুক্ত চিকিৎসার অভাবে যেরূপ চিকিৎসককেও ব্যর্থ মনোরথ হইতে হয়, সেইরূপ অচিকিৎসায় রোগীর অবস্থাও ক্রমশঃ শোচনীয় হইয়া উঠে। এজন্য ম্যালেরিয়ায় অগ্রে রোগনির্ণয় ভালরূপে করিয়া তাহার পর চিকিৎসায় হস্তক্ষেপ করা উচিত।

আমরা গতবারে বলিয়াছি—ম্যালেরিয়া-জীবাণু পররূহ উদ্ভিদ শ্রেণীর অন্তর্গত। ইহারা রক্ত কণিকার ভিতর এক পার্শ্বে অবস্থিতি করে। জীব শরীরে রক্তের তিনটি বিভাগ,—একটি রক্তকণিকা, একটি শ্বেতকণিকা ও অপরটি জলীয় পদার্থ। ম্যালেরিয়ার আক্রমণে রক্ত ও শ্বেত কণিকা—উভয়ই তুল্যরূপে ধ্বংস হইতেছে—পরীক্ষা করিলে বুঝিতে পারা যায়, কিন্তু কালাজ্বরে শ্বেত কণিকাই বেশী ধ্বংস হইয়া থাকে। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা পরীক্ষাদ্বারা স্থির করিয়াছেন,—কালাজ্বরে শ্বেত কণিকা $\frac{১}{২০০}$ হইতে $\frac{১}{২০}$ পর্য্যন্ত কমিয়া গিয়া থাকে। শ্বেত কণিকাগুলি রক্তের ভিতর অবস্থিত থাকিয়া সর্ব্বদাই আমাদের দেহ রক্ষার কার্য্য করিতেছে কাজেই উহারা কমিয়া গেলে শরীর নানারূপ ব্যাধি সঙ্কুল হইয়া পড়ে।

ম্যালেরিয়ার সকল জীবাণু এক রকমের নহে। সাদাসিদা জ্বর একরূপ জীবাণু হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। আর এক রকমের জীবাণু হইতে সাংঘাতিক জ্বরের উৎপত্তি হয়। সহজ জ্বর-জীবাণু আবার

কয়েক রকমের জ্বর উৎপন্ন করিয়া থাকে,—এক রকম প্রাত্যহিক, এক রকম তৃতীয়ক ও এক রকম চতুর্থক। ইহার নিদান আমরা অনেকটা বিষম-জ্বরের মত দেখিতে পাই। "রোগ বিনিশ্চয়" গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে—

"দোষোল্পো হহিত সংভূতো জ্বরোৎ স্বষ্টস্য বা পুনঃ।
ধাতুমন্যতমং প্রাপ্য করোতি বিষমজ্বরম্॥"

অর্থাৎ জ্বর-মুক্তির পর দেহের ক্ষীণতা থাকিতে অবৈধ আহার বিহার করিলে অনতি বল দোষও প্রবৃদ্ধ এবং বায়ু কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া রস রক্তাদি কোন ধাতুকে আশ্রয় করিয়া বিষমজ্বর উৎপাদন করে।

বর্ত্তমান সময়ে সেকালের মত রস পরিপাক করাইয়া চিকিৎসার বিধি একরূপ উঠিয়াই গিয়াছে। এমতাবস্থায় ম্যালেরিয়া জ্বর বা বিষমজ্বর উপস্থিত হইবার কারণ তো যথেষ্টই রহিয়াছে। তা' ছাড়া কখন কখন প্রথম হইতেই বিষমজ্বরের উৎপত্তি হইয়া থাকে—ইহার প্রমাণও চিকিৎসা গ্রন্থে পাওয়া যায়, সুতরাং ম্যালেরিয়া জীবানু রক্তকণিকায় মিশ্রিত হওয়ার জন্যই বিষমজ্বর বা ম্যালেরিয়া জ্বরের উৎপত্তি হইয়া থাকে—একথা বলা যাইতে পারে।

"রোগ বিনিশ্চয়" গ্রন্থে সতত, সন্তত, অন্যেদ্যুষ্ক, তৃতীয়ক, চতুর্থক—এই কয় শ্রেণীতে যে বিষমজ্বরের বিভাগ করা হইয়াছে, ম্যালেরিয়া জ্বরের লক্ষণ সম্বন্ধেও তাহার যথেষ্ট সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সহজ জ্বর-জীবানু হইতে অন্যেদ্যুষ্ক বা প্রাত্যহিক জ্বর এবং তৃতীয়ক ও চতুর্থক জ্বরের উৎপত্তি হইয়া থাকে। আর এক প্রকার জীবানু সততক ও সন্তত জ্বরের উৎপত্তি করিয়া থাকে। সততক জ্বরের জীবানু সুরক্ষিত, এজ্বর অতি সাংঘাতিক; ইহার অপর নাম দ্বৈকালিক,—এ জ্বর দিনে একবার ও রাত্রিতে একবার অথবা কেবল দিনেই দুইবার বা রাত্রিতেই দুইবার হইয়া থাকে। এ জ্বরের চিকিৎসা বিশেষ বিবেচনা করিয়া করা উচিত।

যে জ্বর সাতদিন, দশদিন ও দ্বাদশ দিন নিয়ত ভোগ করে তাহার নাম সন্তত। এ জ্বরটি বিষমজ্বর কি না, সে সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদ-বেত্তাদিগের মধ্যে মতভেদ থাকিলেও বর্ত্তমানের ম্যালেরিয়ার সহিত ইহার সম্বন্ধ যথেষ্ট নিহিত রহিয়াছে।

দোষ রসস্থ হইয়া সন্তত জ্বরের সৃষ্টি করিয়া থাকে। এই জ্বরে দেহের গুরুতা, বমনেচ্ছা, অবসাদ, বমি, অরুচিও চিত্তের ক্লান্তিভাব প্রকাশিত হয়। যে ম্যালেরিয়া জ্বরে দশ দিন বা দ্বাদশ দিন নিয়ত কাল ভোগ হইয়া থাকে, সে জ্বরের সহিত ইহার সৌসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হওয়ায় আমরা ইহাকে বিষম জ্বরের অন্তর্গত সন্তত জ্বর বলিয়া গণ্য করিতে পারি।

দোষ রক্তস্থ হইয়া সততজ্বরের উৎপত্তি হয়। এই জ্বরে মুখ হইতে রক্তোদ্গিরণ, দাহ, মোহ, বমন, বিভ্রম, প্রলাপ, পিড়কা ও তৃষ্ণা—এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। ম্যালেরিয়া জ্বরের যে অবস্থায় সমস্ত দিবা রাত্রির মধ্যে দুইবার করিয়া জ্বর হইতেছে দেখা যায়, সে জ্বরের লক্ষণও এইরূপ। এই জ্বরে ম্যালেরিয়া-জীবানু রক্তকণিকায় আশ্রয় করিয়া থাকে একথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। আয়ুর্ব্বেদ সেই

রক্তকণিকাকেই রক্তস্থ বলিয়াছেন। সুতরাং বুঝা গেল এশ্রেণীর ম্যালেরিয়া জ্বর ও আয়ুর্ব্বেদের বিষমজ্বর একশ্রেণীর অন্তর্নিহিত।

এইরূপ দোষ মাংসাশ্রিত হইয়া অন্যেদ্যুষ্ক, মেদোগত হইয়া তৃতীয়ক ও অস্থি মজ্জাগত হইয়া চতুর্থক জ্বর উৎপাদন করে। এই মাংসাশ্রিত বা অন্যেদ্যুষ্ক জ্বরে জানুর অধোজঙ্ঘা-মাংসপিণ্ডে অর্থাৎ পায়ের ডিমে দণ্ডাদি দ্বারা পীড়নবৎ বেদনা, তৃষ্ণা, মলমূত্রের অতিপ্রবৃত্তি, বাহিরে তাপ, অন্তরে দাহ, হস্তপদাদি সঞ্চালন ও গ্লানি—এই সকল লক্ষণ যাহা উপস্থিত হয় তাহাও ম্যালেরিয়া জ্বরের উপদ্রবের সদৃশ। মেদোগত জ্বরে অতিশয় ঘর্ম্ম, পিপাসা, মূর্চ্ছা, প্রলাপ, বমন, শরীরে দুর্গন্ধ, অরুচি, গ্লানি ও অসহিষ্ণুতা,—অস্থিগত জ্বরে অস্থিসমূহে ভঙ্গবৎ বেদনা, কুন্থন, শ্বাস, মলরোধ, বমন ও হাত-পা ছোড়া,—মজ্জাগত জ্বরে অন্ধকার দর্শন, হিক্কা, কাস, শীত, বমি, অন্তর্দাহ, মহাশ্বাস ও হৃদয়চ্ছেদবৎ বেদনা—ম্যালেরিয়ার জ্বর বিশেষের সহিত একই প্রকারের দেখিতে পাওয়া যায়।

কালাজ্বরও আয়ুর্ব্বেদের বিষমজ্বরের অন্তর্গত কিন্তু ইহা ম্যালেরিয়ার সহিত সম্পূর্ণ বিভিন্ন। যাহাহউক ম্যালেরিয়া জ্বরের নাম আমাদের দেশের লোকে আগে না জানিলেও ইহার সহিত আয়ুর্ব্বেদোক্ত বিষমজ্বরের যে সাদৃশ্য রহিয়াছে—সে সম্বন্ধে সন্দেহমাত্র নাই। সেই জন্য আমাদের মনে হয়, ম্যালেরিয়া জ্বরে যদি প্রথমেই সাবধানতাসহ আয়ুর্ব্বেদোক্ত পাচন এবং ঔষধ সকল সেবন করা যায়, তাহা হইলে রোগ আর ভীষণভাব ধারণ করিতে পারে না। কিন্তু জ্বরের বিরামকালে ডাক্তারেরা যেরূপ কুইনাইন প্রয়োগে উহা বন্ধ করিতে চেষ্টা করেন, সেইরূপ আয়ুর্ব্বেদোক্ত হরিতাল প্রভৃতি তীব্র ঔষধ ব্যবহারে উহা বন্ধ করিতে চেষ্টা করা উচিত, কিন্তু উহা কালাজ্বর কি না ইহা ঠিক বিবেচনা করিয়া তবে ম্যালেরিয়া নিবারণের ঔষধ দেওয়াও কর্ত্তব্য।

ফলপ্রদ মুষ্টিযোগ।

[নিম্নলিখিত মুষ্টিযোগগুলি আমাদের বাটীতে পুরুষ পরম্পরায় ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। সাধারণের উপকার হইবে ভাবিয়া "আয়ুর্ব্বেদে" ইহা মুদ্রিত করিলাম। এই সকল মুষ্টি যোগের মধ্যে—আমি স্বয়ং কতকগুলি পরীক্ষা করিয়াছি এবং চমৎকার ফল পাইয়াছি। আমার বিশ্বাস—পাঠকগণ ইহা ব্যবহার করিলে বুঝিতে পারিবেন, ঈশ্বরের অনুগ্রহে—কত সামান্য জিনিষে কত বড় উৎকট ব্যাধিও আরাম হইতে পারে॥

মুষ্টিযোগগুলি আমার পিতৃদেবের একখানি খাতায় লিপিবদ্ধ ছিল।]

আধ কপালে—

পেটারীর মূল ছেঁচিয়া, নেকড়ার পুঁটুলীতে বাঁধিয়া নস্য হইলে তৎক্ষণাৎ—আধ কপালে নামক শিরোরোগ নষ্ট হয়।

অনিদ্রায়—

কাকমাচী, পিপুল, মুগাই, এই তিনটী গাছের যে কোনও একটীর মূল—সূতায় বাঁধিয়া মাথায় বাঁধিলে নিদ্রাকর্ষণ হইয়া থাকে।

নিদ্রায়—

কান্দু কুড়িয়ার মূল সূতায় করিয়া মাথায় বাঁধিলে—সে দিন আর নিদ্রা হইবে না।

কাঞ্জিড়ার পাতা বাটিয়া চক্ষুর চতুর্দ্দিকে প্রলেপ দিলে—ঐ প্রলেপ যতক্ষণ থাকিবে, ততক্ষণ আর নিদ্রা হইবে না।

দন্তশূলে—

কুড়চীর ছাল বাটিয়া দাঁতের গোড়ায় দিলে তৎক্ষণাৎ দন্তশূল আরোগ্য হয়।

দাঁতের পোকায়—

হাঁচুটি কিম্বা কান্দু কুড়িয়ার শিকড় চিবাইলে দাঁতের পোকা মরে।

যে দাঁতে পোকা হইয়াছে—সেই দাঁতের পোকার স্থানে নির্জ্জল আদার রস পুরিয়া দিবে। পরে, ডানিগানার মূল চিবাইতে বলিবে। ইহাতে পোকা মরে।

দন্ত চালে—

হেজল গাছের ছাল গুঁড়া করিয়া দাঁত মাজিলে, নড়া দাঁত শক্ত হয়।

বকুলের ছাল বাটিয়া দন্তমূলে লেপ দিলে দাঁত খুব শক্ত হয়।

প্রত্যহ নীল ঝাটীর পাতা চিবাইলে দাঁত খুব শক্ত হয়।

পিপুলের মূল চিবাইলেও দাঁত শক্ত হয়।

দন্ত কড় মড়িকায়

কান্দড়ের পাতা দুগ্ধে বাটিয়া, পদতলে রাত্রিকালে প্রলেপ দিলে দাঁত কড়মড় করা ভাল হয়।

কাস রোগে—

পিপুলের গুঁড়া /৹ আনা শুঁঠের গুঁড়া /৹ আনা, সৈন্ধব লবণ /৹ আনা। একত্রে মিশাইয়া ভোজনের প্রথম গ্রাসের সহিত প্রত্যহ খাইলে শীঘ্রই কাস রোগ ভাল হয়।

রাম বাসকের মূল।৹ আনা, কাল তুলসীর পাতা ২১ খানা, মরিচ ৫টা একপোয়া জলে সিদ্ধ করিয়া এক ছটাক থাকিতে নামাইয়া গরম গরম ঠিক সন্ধ্যার সময় খাইবে। ইহাতে সকল রকম কাশি ভাল হয়।

অনুমৃতার কড়ি ১ কড়া, ছোট সবুজ রঙের মাকড়সা ১টা—একত্রে ন্যাকড়ায় বাঁধিয়া কণ্ঠে ধারণ করিলে সকল রকম কাসি ভাল হয়।

প্রত্যহ ভোজন শেষে এক আনা সৈন্ধব লবণ—একটু গরম জল সহ খাইলে বহুদিনের পুরাতন কাস রোগ ভাল হয়।

রক্ত পিত্তে—

গাম্ভারীর পাকাফল ৪।৫টী চুষিয়া খাইলে তৎক্ষণাৎ মুখ দিয়া রক্ত ওঠা বন্ধ হয়। টাট্‌কা ফল না পাইলে শুষ্কফল চূর্ণ করিয়া—মধুর সহিত চাটিয়া খাইতে হইবে।

লাক্ষার গুঁড়া ৷৹ আনা কিস্‌মিস্ ।৹ আনা, একত্রে বাটিয়া বড়ী করিবে। এই বড়ি চুষিয়া খাইলে—রক্ত ওঠা নিবারিত হয়।

অজীর্ণে—

শুঁঠের গুঁড়া ✓৹ আনা, ১ ঝিনুক গরম দুগ্ধ সহ রাত্রে আহারের পর খাইলে—অজীর্ণ ভাল হয়।

আধপোয়া ডাবের জলে—১০।১২টা পুদিনার পাতা, এক আনা মৌরী, এক আনা যোয়ান, ১ কুঁচ সৈন্ধব—রাত্রে ভিজাইয়া প্রাতঃকালে সেই ডাবের জলটুকু ছাঁকিয়া খাইলে সর্ব্বপ্রকার অজীর্ণ রোগ ভাল হয়।

বায়ু শূলে—

হিজলের ফল ১টা, মরিচ ১২টা—জল দিয়া বাটীয়া খাইলে বাই শূল ভাল হয়।

প্লীহায়—

কেয়া গাছের পাতা শুকাইয়া,—হাঁড়ির ভিতর পূরিয়া, অন্তর্ধূমে দগ্ধ করিবে। সেই ক্ষার ৩ রত্তি, একটু মাৎ গুড়ের সহিত খাইলে প্লীহা ভাল হয়।

নিসিন্দা গাছের শিকড়ের সূক্ষ্মচূর্ণ এক আনা; এক ঝিনুক বাছুরের চোনার সহিত এক মাস কাল ব্যবহার করিবে। ইহাতে প্লীহা, যকৃৎ ও জ্বর নিশ্চয়ই ভাল হইবে।

আম বাতে—

বিছাটী গাছের পাতা ৫।৬টী গব্য ঘৃতে ভাজিয়া ভাতের সঙ্গে খাইলে আমবাত ভাল হয়।

বাতে—

শিরীষ মূলের ছাল ২ ভরি, দেড় পোয়া জলে সিদ্ধ করিয়া দেড় ছটাক থাকিতে নামাইয়া সেই ক্বাথ পান করিলে বাতের বেদনা নষ্ট হয়।

আধ ছটাক—পাকা পুঁই মেটুলী, এক পোয়া রেড়ীর তৈলে চোঁয়া চোঁয়া করিয়া ভাজিবে। সেই তৈল বাতের বেদনা স্থানে মালিশ করিবে। ২।৩ দিবসেই উপকার জানা যাইবে।

প্রমেহ—

একখানি বাতাসায় ১ ফোঁটা বটের আটা দিয়া খাইলে, ৩ দিনে মেহ রোগের জ্বালা যন্ত্রণা নষ্ট হয়।

কাবাব চিনির গুঁড়া ।৹ আনা, কলমী সোরা আধ ভরি, সাদা চন্দনের গুড়া ✓৹ আনা, সকলের দ্বিগুণ মিছরীর গুঁড়া দিয়া ১৭ পুরিয়া করিবে। এই পুরিয়া ২ বেলা ২টী জল দিয়া গিলিয়া খাইবে। ইহাতে মেহ, প্রস্রাবকালীন অসহ্য জ্বালা, ফোটা ফোটা প্রস্রাব হওয়া, সপূয ধাতু নির্গম প্রভৃতি উপসর্গ—সত্বর প্রশমিত হয়।

রক্তামাশায়—

বেলশুঁঠা চূর্ণ ✓৹ আনা, আমের কোশী চূর্ণ ✓৹ দাড়িমা ফলের গুঁড়া ✓৹ শিমূল আঠা চূর্ণ ✓৹, মুথা চূর্ণ ✓৹ আনা, সাদা ধুনার গুঁড়া ॥✓৹ আনা, একত্র মিশাইবে। ১৪টী পুরিয়া বাঁধিবে। ২ বেলা ২ পুরিয়া ছাগল দুগ্ধ অনুপানে খাইলে অসাধ্য কষ্টকর রক্ত-আমাশয়ও আরোগ্য হয়। এই ঔষধটী আমাদের বংশে প্রায় ৬০ বৎসর ধরিয়া ব্যবহার হইয়া আসিতেছে এমন চমৎকার ঔষধ প্রায় দেখা যায় না।

আম ছাল বাটীয়া, পুরু করিয়া নাভিস্থানে প্রলেপ দিলে—আমাশয় ভাল হয়।

গ্রহণী রোগে—

বকুল ছালের রস, আমছালের রস, আধ ঝিনুক পরিমাণে লইয়া ঘোলের মথিত করিয়া খাইলে গ্রহণী ভাল হয়।

শঙ্কর জটার শিকড় ✓৹ আনা, পাঁচটা গোল মরিচ সহ বাটিয়া খাইলে গ্রহণী ভাল হয়।

হারিষে—

লাল আপাং গাছের শিকড় এক আনা, বাটিয়া ইক্ষুরস সহ ভক্ষণ করিলে হারিষের রক্ত পড়া বন্ধ হয়।

আফুলা শিমুলের মূল বাটিয়া ছাগল দুগ্ধে সহ সেবনে হারিষ ভাল হয়।

দন্তোৎপলের মূল ৵০, ২১ গোল মরিচ সহ বাটীয়া খাইলে রক্ত বন্ধ হয়।

বাতশিরা ও কুরণ্ডে—

মাল কাঁকড়া ঘাসের শিকড় দুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া খাইলে, বাতশিরা ভাল হয়।

কুমিরে পোকার বাসা—জলে গুলিয়া গরম করিয়া প্রলেপ দিলে কুরণ্ড ও একশিরার ফুলা এবং যন্ত্রণা সত্ত্ব সত্ত্ব কমিয়া যায়।

তৃষ্ণায়—

কাঁকড়ার গর্ত্তের মাটী লইয়া ৭টী ভাঁটা প্রস্তত করিবে। ঐ ভাঁটাগুলি আগুণে পোড়াইতে দিবে। লাল বর্ণ হইলে চিম্‌টায় দ্বারা তুলিয়া ভাঁটাগুলি গরম থাকিতে ২ একে একে তিন পোয়া জলে ডুবাইবে। সেই জল ছাঁকিয়া রোগিকে খাইতে দিবে। এক পোয়া আন্দাজ জল খাওয়ার পরই আর সে জল খাইতে চাহিবে না।

কলমী শাকের গাঁইট ২১টা মরিচ পাঁচটা —একত্রে বাটিয়া আধ পোয়া জলে গুলিবে। ওই জল ২।১ ঝিনুক খাইবামাত্র রোগীর অসহ্য পিপাসা নিবারিত হইবে।

হিক্কায়—

রজনী গন্ধ ফুল ৪।৫টা শিলে বাটিবে,—পরে তাহা আধ পোয়া জলে গুলিয়া, সেই জলে ২ তোলা চিনি মিশাইয়া সরবত প্রস্তত করিবে। এই সরবত পান করিলে, অজস্র উত্থিত হিক্কাও ভাল হয়। মৃত্যুকালে—বিদ্যাসাগর মহাশয়কে খাওয়ান হইয়াছিল।

কেশের (কসার) শিকড় শুকাইয়া গুঁড়া করিবে, এই গুঁড়া মধুর সহিত অবলেহ করিলে প্রবল হিক্কা নিবারিত হয়।

মূর্চ্ছায়—

ছোট্ট চাঁদরের পাতা হাতে রগড়াইয়া রোগির নাকের কাছে ধরিলে, মূর্চ্ছা ভাল হয়।

পা ফাটায়—

গুড় আধ ছটাক, সর্ষপ তৈল আধ ছটাক, সৈন্ধব লবণ ৵০ আনা, এক পোয়া চোনা—একত্রে মিশাইয়া ৭ দিন রৌদ্রে রাখিবে। চোনা শুকাইয়া গেলে মলমের মত হইবে। ইহা মাখাইলে পা ফাটা ভাল হয়।

পিত্ত বৃদ্ধিতে—

হিংচা শাকের রস ১ কাঁচ্চা, ধনের গুঁড়া ৴০ আনা, হরিতকী চূর্ণ ৴০, গুড় ।০, একত্র মিশাইয়া খাইলে, হাত পা চখ মুখ জ্বালা প্রশমিত হয়।

বায়ু বৃদ্ধিতে—

অম্ল দধি ও মাৎ গুড় একত্র মিশাইয়া—স্নানের পূর্ব্বে গাত্রে মাখিবে, পরে স্নান করিবে। ইহাতে উন্মাদ পর্য্যন্ত ভাল হয়।

স্নানের পর—পায়রার ডিমের শাঁস কাঁচা হলুদের রসের সহিত মিশাইয়া মাথায় লেপ দিলে মাথা ঠাণ্ডা হয়।

কামলা রোগে—(ন্যাবা)—

আঁকোতে মূল বাটিয়া নাশ লইবে। আমলার গুঁড়া ঘোল সহ খাইবে।

দারু হরিদ্রা—চন্দনের মত জলে ঘসিয়া খাইবে, চক্ষে কেশুরে পাতার রসের অঞ্জন দিবে। ইহাতে ন্যাবা ভাল হয়।

(ক্রমশঃ)

আয়ুর্ব্বেদ

মাসিকপত্র ও সমালোচক।

২য় বর্ষ। } বঙ্গাব্দ ১৩২৪—পৌষ। { ৪র্থ সংখ্যা।

স্বাস্থ্যকর স্থান।

[দার্জ্জিলিং]

প্রাকৃতিক পরিচয়—

ডাক্তার যখন রোগীকে কোথাও 'চেঞ্জে' যাইবার পরামর্শ দেন, তখন অনেকেই বলেন—"এটা ডাক্তারী মতের গঙ্গা যাত্রা!" কিন্তু এরূপ বিদ্রূপ—ব্যঙ্গ নিতান্ত অকারণ নহে। অনেক সময় দেখা যায়—চেঞ্জে গিয়া রোগীর স্বাস্থ্যের কোন উন্নতিই হইল না,—বরং রোগ বাড়িয়াই গেল, হয়ত তাহাতেই তাহাকে পৃথিবীর পান্থশালা পরিত্যাগ করিতে হইল। এরূপ ঘটনা প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। কিন্তু, জল-বায়ুর পরিবর্ত্তনে নষ্টস্বাস্থ্য ফিরিয়া আসা—ইহাও ত নিত্যদৃষ্ট ঘটনা। দেশে দীর্ঘ কাল ধরিয়া রোগ ভোগ করিলে অনেক সময়—"স্থানত্যাগেন দুর্জ্জনং," এই মহানীতির বলে জল বায়ু পরিবর্ত্তনের আবশ্যক হইয়া থাকে। আমাদের বিশ্বাস,—চেঞ্জে গিয়া যাঁহারা কোনও উপকার পান না, তাঁহারা হয়ত নিজের উপযোগী স্থান নির্ব্বাচন করিতে পারেন না। সকল স্থান সকলের পক্ষে স্বাস্থ্যকর হইতেই পারেনা। সেইজন্য আমরা সাধারণের উপকারার্থে—প্রসিদ্ধ স্থানগুলির স্বাস্থ্যকারিতার যথাসাধ্য পরিচয় দিব। ইহাতে—কোন্ স্থানে গেলে কিরূপ রোগীর উপকার হয়—সকলেই তাহা বুঝিতে পারিবেন। দেশের প্রকৃতি-নির্ব্বাচন দোষে কাহাকেও আর বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হইবে না।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা দার্জ্জিলিংয়ের স্বাস্থ্যকারিতার উল্লেখ করিব। সম্প্রতি আমাদের এক বন্ধু রোগ-মুক্তির পর দার্জ্জিলিংয়ে হাওয়া খাইতে গিয়াছিলেন। তিন মাসের পর তাঁহাকে রুগ্ন-ভগ্ন দেহ লইয়া ক্ষুণ্ণমনে ফিরিয়া আসিতে হইয়াছে। বন্ধুর যেরূপ শরীর, তিনি যেরূপ ব্যাধিতে কষ্ট পাইয়াছেন,—তাঁহার দার্জ্জিলিংয়ে যাওয়াই উচিত হয় নাই। অবশ্য দার্জ্জিলিং একটী

স্বাস্থ্যকর স্থান,—কিন্তু সকলের পক্ষে দার্জ্জিলিংয়ের বায়ু শুভকর নহে।

কলিকাতা হইতে প্রায় ৪০০ শত মাইল দূরে, ৭১৬৯ ফিট উচ্চে—হিমালয়ের একটী শৃঙ্গের উপর দার্জ্জিলিং অবস্থিত। যখন "দার্জ্জিলিং-হিমালয়ান্ রেলওয়ে" ছিল না, তখন দার্জ্জিলিং যাওয়ার অনেকটা অসুবিধা ছিল,—পয়সা খরচও কিছু বেশী হইত। তখন শিলিগুড়ি পর্য্যন্ত ট্রেণে গিয়া, পরে টোঙ্গা বা পাল্কীতে চড়িয়া দার্জ্জিলিং সহরে যাইতে হইত। এখনও প্রাচীনকালের পথের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। শুনিয়াছি, বর্দ্ধমানের মহারাজগণ তখন দার্জ্জিলিং যাত্রীদের জন্য যথেষ্ট সুবিধা করিয়া দিতেন। এখন দার্জ্জিলিং গমনের আর কোন কষ্ট নাই। বিকালে শিয়ালদহ ষ্টেশনে—দার্জ্জিলিং মেলে চড়িলে,—একেবারেই দার্জ্জিলিং যাওয়া যায়। বিশেষতঃ পথের উভয় পার্শ্বের প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিতে দেখিতে গেলে পথশ্রমের কথা মনেই থাকে না।

হিমালয়ের সিকিম গিরিশ্রেণীর মধ্যে দার্জ্জিলিং। স্থানটী তত প্রশস্ত না হইলেও অসংখ্য অট্টালিকায় পূর্ণ, দেখিতে অতি সুন্দর—যেন স্বর্গের নন্দন কানন! পর্ব্বতের যে ভাগে দার্জ্জিলিং সহর রচিত হইয়াছে, সে অংশ তত উচ্চ নহে। দার্জ্জিলিংয়ের বাজার দেখিবার জিনিষ। এখানে গ্রীষ্মকাল অতিবাহিত করিবার জন্য—মহামান্য বঙ্গেশ্বরের একটী প্রাসাদ আছে। দার্জ্জিলিংয়ে বর্দ্ধমান ও কুচবিহারের মহারাজার অনেক জায়গা জমী-দেখিতে পাওয়া যায়। ভাড়াটে বাড়ীরও এখানে অভাব নাই—তবে ভাড়ার হার বড় বেশী।

দার্জ্জিলিংয়ে বৃষ্টি পতনের মাত্রাটা অতিরিক্ত, আসাম, কুচবিহার ব্যতীত ভারতের আর কোনও দেশে এত বৃষ্টি হয় না। বৃষ্টিপাতের গড় পরিমাণ ১২০ ইঞ্চি থাকে। এত বৃষ্টি—কিন্তু বৃষ্টি ধরিয়া গেলেই পথ ঘাট খুব শীঘ্র শুকাইয়া যায়। কলিকাতার মত এক হাঁটু কাদা হয় না। সকল ঋতুতেই এখানকার বায়ু আর্দ্র—শীতে ও বর্ষায় আরও অধিক। এখানে বায়ুর তাপের মাঝামাঝি পরিমাণ, ৫৯, ৫১ ও ৩৬ ডিগ্রী। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ ৬৫, আষাঢ় শ্রাবণে ৭০, অগ্রহায়ণ পৌষে ৬২ ডিগ্রী হইয়া থাকে।

অতি চমৎকার পরিচ্ছন্ন সহর! ময়লা পরিষ্কারের বন্দোবস্ত এত সুন্দর যে, চক্ষে না দেখিলে বুঝানো যায় না। সহরের ড্রেণ—"রণজিৎ" নামক নদে মিশিয়াছে। জলের কল, বৈদ্যুতিক আলো—কিছুরই অভাব অপ্রতুল নাই। বাজারে সকল জিনিষই পাওয়া যায়। কিন্তু দাম বেশী। বিলাতী শাক সব্জী প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। প্রতি রবিবারে একটী হাট বসে। ভুটিয়া, নেপালী, লেপ্‌ছা, সিকিমী প্রভৃতি পাহাড়ী জাতিরা হাটের শোভা বৃদ্ধি করিয়া থাকে। কত ফুল, ফল, মধু, এলাচ, তরিতরকারীই যে আমদানী হয়, তাহার ইয়ত্তা হয় না।

পথে বেড়াইতে বেড়াইতে যখন,—উর্দ্ধে তুষার-মণ্ডিত অচল শ্রেণী, নিম্নে নেত্রোৎসব উপত্যকা ভূমির দিকে দৃষ্টি পতিত হয়, তখন প্রাণে এক অপূর্ব্ব ভাবের আবেশ হয়। প্রভাতে ও প্রদোষে উপত্যকাগুলি তিমিরাবৃত, শিখরগুলি রবিকর দীপ্তিতে স্বর্ণোজ্জ্বল, কি রমণীয় মহান্ দৃশ্য! আপনারা

যদি সেঞ্চালের প্যারেড্ হইতে তুষারাবৃত তুহিনাচলের মধুর দৃশ্য দেখেন, বোধ হয় জীবনে তাহা ভুলিতে পারিবেন না! ঐ গিরি-শ্রেণীর উপর—২৮ হাজার ফিট উচ্চ 'কাঞ্চন জঙ্ঘা' ভীমকান্ত মূর্ত্তিতে দণ্ডায়মান! পশ্চিম দিকের দৃশ্য—১২ মাইল দূরবর্ত্তী একটী পাহাড়ে অবরুদ্ধ, পূর্ব্ব দিকে তিস্তা অধিত্যকা! দক্ষিণে সেঞ্চালের নিবিড় বনালি—যেন তরঙ্গায়িত মহাসমুদ্রের ন্যায় অনন্তে মিলিয়া গিয়াছে! উত্তর দিকের দৃশ্য—উন্মুক্ত, কেবল পর্ব্বত শ্রেণী মেঘের ন্যায় থরে থরে সাজানো। ১০।১২ হাজার ফিট উর্দ্ধে আরোহণ করিয়া নেপাল ও সিকিমের মধ্যবর্ত্তী গিরি শিখরে দণ্ডায়মান হইলে দক্ষিণে অনন্ত সৌন্দর্য্যের আধার "কাঞ্চন জঙ্ঘা" এবং বামে পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ গিরি "এভারেষ্ট" দেখিতে পাওয়া যায়। যেখানে "রণজিতের" স্ফটিক-স্বচ্ছ-সলিলে তিস্তা শাখার হরিৎবর্ণ বারিরাশি মিশিয়াছে—সেখানকার দৃশ্য দেখিলে মনে হয়, এতদিনে আমার মানব জন্ম সার্থক!

দার্জ্জিলিংয়ে একটী অপূর্ব্ব উদ্যান আছে—পৃথিবীর সকল দেশের উদ্ভিদ্ তাহাতে সযত্নে সংগৃহীত হইয়াছে। দার্জ্জিলিংয়ের "সিন্‌কোনা" ক্ষেত্রও দেখিবার জিনিষ। এখানে মক্ষিকা ও মধু উৎপাদনের বিস্তৃত কারবার আছে।

দার্জ্জিলিং যে কিরূপ স্বাস্থ্যকর মনোরম স্থান, তাহা বুঝাইবার জন্যই আমি প্রাকৃতিক দৃশ্যের কথঞ্চিৎ আভাষ দিলাম, নহিলে দার্জ্জিলিংয়ের সকল চিত্রফটো, কেবল ভারতের কবি কালিদাসের এবং বাঙ্গালায় কবি বিহারীলালের ক্যামেরাতেই উঠিতে পারে।

জুলাই হইতে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত, এখানে প্রবল বারিবর্ষণ হইয়া থাকে। এই সময় এখানকার স্বাস্থ্য খুব ভাল। মার্চ্চ ও মে মাসে দার্জ্জিলিংয়ের জল বায়ু ঠিক ইংলণ্ডের মত হয়। বাঙ্গালী বাবুরা এই সময় দার্জ্জিলিংয়ে বেড়াইতে যান। যদিও বর্ষার শৈত্যেও এখানে স্বাস্থ্যহানির আশঙ্কা থাকে না, তথাপি নবেম্বর মাসেই এ দেশের স্বাস্থ্য সব সময়ের চেয়ে ভাল। নবেম্বর হইতে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত—প্রায়ই ঝড়বৃষ্টি দেখা যায় না। এই সময় দিবসে সূর্য্যোদয় দেখিতে পাওয়া যায়, রাত্রে সুনীল নভোমণ্ডলে তারা-সনাথ চন্দ্রদেব মজলিসি দরবার বসান।

জল বায়ু।

এইবার দার্জ্জিলিঙের জল বায়ুর কথা বলিব। যে সকল শিশু রোগে জীর্ণ ও অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়াছে, দার্জ্জিলিংয়ের জল বায়ুতে তাহাদের অত্যন্ত উপকার হয়। অল্প দিনের মধ্যেই তাহারা হৃষ্ট পুষ্ট ও বলিষ্ঠ হইয়া পিতামাতার আনন্দ বর্দ্ধন করে। বয়োপ্রাপ্ত ব্যক্তিরাও দার্জ্জিলিংয়ে আসিয়া নষ্ট স্বাস্থ্য পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। পর্ব্বতের "কঠিন শক্ত ঠাঁই" তথায় ম্যালেরিয়া সুন্দরী ঘেঁসিতে পারেন না।

আর্দ্র ভূমিতে বাস করিলে যে সকল রোগ জন্মিতে পারে, দার্জ্জিলিংয়ে সে সকল রোগের ভয় নাই। তবে খুব শীতের সময় একটু আধটু সর্দ্দী কাসি হয় বটে, কিন্তু সে সর্দ্দী প্রায়ই বুকে বসে না বা ফুস্ ফুস্ বিকৃত করে না।

যাঁহারা জর জ্বালায় ভুগিয়া ভুগিয়া অস্থি-চর্ম্ম সার হইয়াছেন, তাঁহারা অন্ততঃ দুই মাস কাল দার্জ্জিলিংয়ে বাস করিলে, জল বায়ুর গুণে নিশ্চয়ই নবজীবন লাভ করিবেন।

যাঁহারা অসুস্থ শরীর লইয়া দার্জ্জিলিংয়ে যাইবেন,—সে সময়টা যদি শীতকাল হয়,—তবে তাঁহারা পথিমধ্যে 'খরসান' নামক স্থানে কিছুদিন থাকিবেন। একেবারে ৭ হাজার ফিট উচ্চ দার্জ্জিলিংয়ে যাইবেন না।

দার্জ্জিলিংয়ে গেলে, ত্বকে অধিক পরিমাণে শোণিত সঞ্চালিত হয়। তাহাতে ত্বক পরিপুষ্ট হইয়া উঠে, শরীরেও বলাধান হইয়া থাকে। এইজন্য—এই হিমজাড্য দেশের অতিরিক্ত শৈত্য সেবনেও দেহের কোনও অপকার হয় না। আমাদের দেশে তাপাধিক্যের জন্য ত্বক স্বভাবতঃ শিথিল ও নিস্তেজ হইয়া পড়ে, ফলে এদেশে সামান্য ঠাণ্ডা লাগিলেই সর্দ্দী হয়। কিন্তু শীত-প্রধান দার্জ্জিলিংয়ে ত্বকের তেজ ও স্থিতিস্থাপকতা শক্তি অক্ষুণ্ন থাকে—সুতরাং শৈত্য সেবনে অপকার না হইয়া উপকারই হইয়া থাকে। আবার পর্ব্বতারোহণ কালে হৃদ্‌পিণ্ডের শোণিতস্রোত দ্রুতবেগে বহিতে থাকে। কি সুস্থ, কি অসুস্থ, দার্জ্জিলিংয়ে গেলে সকলেরই জঠরাগ্নি বৃদ্ধি হয়। সে ক্ষুধা কাহারও আগাগোড়া সমান থাকে, কাহারও বা দিন কতক পরে কমিয়া যায়। পরিপাক শক্তি ও ক্ষুধা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শরীরের বল ও মাংস বৃদ্ধি হয়, পেশী সমূহ এতদূর দৃঢ় হয় যে, গুরুতর পরিশ্রম করিয়াও লোকে ক্লান্তি বোধ করে না।

এদেশে নিদ্রা দেবীর সঙ্গে যাঁহার প্রণয় নাই, দার্জ্জিলিংয়ে গেলে নিদ্রা তাঁহার সহচরী হইয়া দাঁড়ান। আমাদের দেশে বায়ুর উত্তাপে ও মানসিক উদ্বেগে প্রায়ই নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে। দার্জ্জিলিংয়ের প্রাকৃতিক শোভা দেখিয়া মনে বিপুল আনন্দ জন্মে, এবং শৈত্য সেবনে মস্তিষ্কও শীতল হয়, এই উভয় কারণে দার্জ্জিলিংয়ে কুম্ভকর্ণের নিদ্রা মূর্ত্তিমতী হইয়া দেখা দেয়। কিন্তু এমন নিদ্রাকর স্থানে আসিয়াও দু'এক জনকে নিদ্রার জন্য আক্ষেপ করিতে শুনা যায়। দার্জ্জিলিংয়ে পৌঁছিবামাত্র—১০।১৫ দিন কাহারও কাহারও ভাল ঘুম হয় না, কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই এ কষ্ট ঘুচিয়া যায়।

কোন্ ব্যক্তির দার্জ্জিলিং যাওয়া উচিত নহে।

যে সকল ব্যক্তি বা রোগী জল-বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য দার্জ্জিলিংয়ে যাইবেন, তাঁহারা নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিবেন।

১। সমতলের বায়ু অবসাদক, পাহাড়ের বায়ু উত্তেজক। সুতরাং চেঞ্জে যাইবার পূর্ব্বে, সুযোগ্য চিকিৎসকের দ্বারা শারীরিক বল পরীক্ষা করান উচিত। যে রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল, দেহ কঙ্কাল-সার, তাহাকে কখনও দার্জ্জিলিংয়ে পাঠাইবেন না, পাঠাইলে উপকার ত হইবেই না, বরং এমন অপকারের সম্ভাবনা যে, দেশে ফিরিয়া আসিলে হয়ত তাহার মৃত্যুও ঘটিতে পারে। পর্ব্বতবাসে যে উত্তেজনা জন্মে, রোগীর তাহা সহ্য করিবার শক্তি থাকা চাই।

আমবাত রোগের পর, বসন্ত রোগের পর, কোন কারণে হৃদ্‌পিণ্ডের আকারগত

দোষ জন্মিলে, দার্জ্জিলিং অথবা কোন পার্ব্বত্য প্রদেশে যাওয়া উচিত নহে।

বৃদ্ধাবস্থায়, পুরাতন গ্রহণী বা আমাশয়াদি উদরাময়ে, যকৃৎ প্লীহার অতি বৃদ্ধিতে পুরাতন কাসে, ফুস্ ফুসের যান্ত্রিক বিকারে, দার্জ্জিলিং যাওয়া নিষিদ্ধ।

কাহার পক্ষে দার্জ্জিলিং যাওয়া উচিত ?

সমতল ক্ষেত্রে বাস করিয়া, অধিক পরিশ্রম বা জনতা-বহুল সহরে থাকিয়া শারীরিক ও মানসিক দৌর্ব্বল্য ঘটিলে, দার্জ্জিলিং যাওয়া কর্ত্তব্য।

দীর্ঘকালব্যাপী রোগ ভোগের পর শরীর দুর্ব্বল হইলে, 'ম্যালেরিয়া' বিষে রক্ত দূষিত হইলে, শিশুদিগের শরীর পোষণের যে কোন কারণে ব্যাঘাত ঘটিলে, দার্জ্জিলং যাওয়া কর্ত্তব্য।

অধিক শ্লেষ্মাস্রাব যুক্ত কাস রোগে, ক্ষয় রোগের প্রথমাবস্থায়—পর্ব্বত বাসের মত ঔষধ ও পথ্য আর নাই।

বহুমূত্র রোগে পর্ব্বতবাস বড়ই উপকারী। কিন্তু শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে, পর্ব্বতবাস অনুচিত। অন্ততঃ রোগীর দেহে ভ্রমণ করিবার সামর্থ্য থাকা চাই। পর্ব্বতারোহণে ৫।৭ দিনের জন্য প্রস্রাব বাড়িতে পারে, কিন্তু তাহাতে ভয় নাই, ইহা স্বাভাবিক।

ম্যালেরিয়া রোগী দার্জ্জিলিংয়ে গেলে, প্রথম প্রথম তাহার ২।৪ বার জ্বর হইতে পারে, সে জন্য ভয় পাইয়া চলিয়া আসিলে চলিবে না। কিছুদিন বাস করিলেই দার্জ্জিলিং বাস স্বর্গবাসে পরিণত হইবে।

শ্বাস রোগে—দার্জ্জিলিং গেলে কাহারও রোগ বাড়ে, কাহারও কমে।

স্থূলকায় ব্যক্তি পাহাড়ে উঠিলে তাহার হৃদ্রোগ হইতে পারে, কিন্তু কিছু দিন পরেই তাহা সারিয়া যায়।

দার্জ্জিলিংয়ে এক প্রকার উদরাময় হইয়া থাকে। ইহার কারণ—সেখানকার জলে এক রকম খনিজ পদার্থ মিশ্রিত থাকিতে দেখা যায়, সেই জল পান করিলে উদরাময় হয়। দার্জ্জিলিং যাত্রীর প্রথমে এই উদরাময় জন্মিতে পারে। কিন্তু পাষ্টারকৃত ফিল্‌টারের জল ব্যবহার করিলে, উদরাময় সারিয়া যায়। বেলা ৫ টার পর কোন তরল দ্রব্য পান না করিলেও উদরাময় নিবৃত্ত হয়।

দার্জ্জিলিং গিয়া খুব বেড়াইতে হয়। নহিলে স্বাস্থ্যের উন্নতি হয় না। তবে ক্ষমতার অতিরিক্ত পরিশ্রম করা কি বেড়ানো উচিত নহে।

সারাঘাট হইতে শিলিগুড়ি পর্য্যন্ত যাইবার সময়—প্রায়ই যাত্রীর নিদ্রাকর্ষণ হইয়া থাকে। নিদ্রা যাইবার সময় গাত্র অনাবৃত রাখা অনুচিত। তাহাতে শরীর অসুস্থ হইয়া পড়ে। তিন্ ধরিয়া ষ্টেশন হইতেই ভাল রকম শীত বস্ত্র ব্যবহার করা উচিত। খুব বলবান ও নীরোগ ব্যক্তিও যেন সোনাদহ ষ্টেশনের পর শীতবস্ত্র ব্যবহার করেন। কোনও রকমে ঠাণ্ডা না লাগে,—এ কথাটী সকলেই স্মরণ রাখিবেন।

দার্জ্জিলিংয়ে বেড়াইবার সময় যেরূপ বস্ত্রাদি ব্যবহার করিবেন, মুক্ত স্থানে বসিয়া থাকিবার সময়, তাহার চেয়ে মোটা কাপড় ব্যবহার করিতে হইবে।

দার্জ্জিলিংয়ে উপস্থিত হইয়াই, ঈষদুষ্ণ জলে বেশ করিয়া স্নান করিবেন, ইহাতে শরীর সুস্থ ও মন প্রফুল্ল হয়।

ডাক্তার শ্রীনগেন্দ্রকুমার দে।

(ক্যাম্বেলের ভূতপূর্ব্ব হাউস্ সার্জ্জন)

ব্রহ্মচর্য্য ও বিবাহ।

প্রবন্ধ লিখিবার সেই বিগত সুখ-শান্তির স্মৃতি হৃদয়কে ব্যাকুল করিয়া তুলে। যাহা গিয়াছে, আর কি তাহা ফিরিয়া আসিবে না?

মনে পড়ে প্রাচীন ভারতের কথা, বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের কথা, নিবৃত্তি পথ-গত প্রাচীন ভারতবাসীর কথা, ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের কথা, আর দেশব্যাপী সুখ শান্তির কথা। তখন ধর্ম্মনিষ্ট সর্ব্বত্যাগী ঋষিগণ সমাজের নিয়ামক ছিলেন, তাঁহাদের উপদেশ মস্তকে ধারণ করিয়া রাজা দেশ রক্ষা করিতেন, চতুর্ব্বর্ণ স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট উপায়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। তখন-রোগ-শোক অকাল মৃত্যুর প্রাদুর্ভাব ছিল না, নিত্য অভাব অনটনে লোকে উৎপীড়িত হইত না, প্রবৃত্তি-রাক্ষসীর মোহিনী রূপে মুগ্ধ হইয়া মানব ইহ ও পরলোকে শ্রেয়োলাভে বঞ্চিত হইত না।

মাতৃক্রোড়ে শিশু যেমন স্বচ্ছন্দে থাকে, নিবৃত্তি-জননীর ক্রোড়ে থাকিয়া প্রাচীন ভারতবাসীও সেইরূপ স্বচ্ছন্দে জীবন অতিবাহিত করিত।

প্রাচীন বিজ্ঞান নিবৃত্তিমার্গানুসারী ছিল, নবীন বিজ্ঞান প্রবৃত্তিমার্গানুসারী। এক্ষণে দেখা যাউক—কোন পথ শ্রেষ্ঠ, নিবৃত্তিমার্গ না প্রবৃত্তি মার্গ?

যাবতীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের জনক স্বরূপ মহর্ষি মনু বলিয়াছেন—

ন জাতু কামঃ কাম্যাণা মুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মে'ব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে।
যশ্চৈতান্ প্রাপ্নুয়াৎ সর্ব্বান্ যশ্চৈতান্ কেবলং ত্যজেৎ।
প্রাপণাৎ সর্ব্ব কামানাংত্যেভ্য এব বিশিষ্যতে॥

অনুবাদ—কাম্য দ্রব্যের উপভোগে কামনার শান্তি হয় না। পরন্তু অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিলে তাহা যেমন প্রবলতর হইয়া উঠে, কাম্য দ্রব্য পাইলে কামনাও সেইরূপ অধিকতর প্রকাশ হয়। যে ব্যক্তি কাম্য দ্রব্য সকল প্রাপ্ত হয়, তাহা অপেক্ষা যে ব্যক্তি কাম্য দ্রব্য সকল ত্যাগ করে সেই শ্রেষ্ঠ।

অপিচ—

ন মাংস ভক্ষণে দোষো ন মদ্যে নচ মৈথুনে।
প্রবৃত্তি রেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলঃ॥

অনুবাদ—মাংস ভক্ষণ, মদ্য পান এবং মৈথুনে কোন দোষ নাই। পরন্তু ভূত (মানব) গণের প্রবৃত্তি এইরূপ (মাংসাদিতে অনুরক্ত)। কিন্তু নিবৃত্তি অর্থাৎ ঐ সকল পরিত্যাগ মহা ফলপ্রদ। সে ফল কি? ইহাও পরলোকে শ্রেয়োলাভ।

ইহাই প্রাচীন ভারতের মূল মন্ত্র ছিল। আর সেই মন্ত্র বলেই প্রাচীন ভারতবাসী সুখে স্বচ্ছন্দে জীবন অতিবাহিত করিত। হায়! কুক্ষণে আমরা সে মন্ত্র বিস্মৃত হইয়াছি।

নিবৃত্তি ভোগ বিলাস চায় না, পরিণাম ভয়াবহ বলিয়া ভোগবিলাসকে দূরে রাখিতে চায়। সেইজন্য পূর্ব্বতন মনস্বিগণ এক্ষণকার ন্যায় বিবিধ ভোগ-বিলাসের দ্রব্য সৃষ্টি করেন নাই। কিন্তু এক্ষণে অল্প বুদ্ধি মানবগণ আপাতমধুর প্রবৃত্তির মোহে মুগ্ধ হইয়া বিবিধ বিলাসের দ্রব্য সৃষ্টি করিতেছে, যাহাতে জগৎ হাহাকারে পূর্ণ হইয়া পড়িয়াছে।

আধুনিক বিজ্ঞান এক্ষণে যে সকল বিস্ময়কর এবং মনোরম পদার্থ আবিষ্কার করিয়াছে ও করিতেছে, সে সকলের নিন্দা বাদ করিতেছি বলিয়া অনেকে প্রতিবাদ করিতে পারেন, কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত দ্রব্য সকল কি পরিমাণে জগতের হিত বা অহিত সাধন করিতেছে—প্রথমে তাহা দেখা কর্ত্তব্য।

মানুষ চায় কি? মানুষ চায়—সুখ ও শান্তি। এ বিষয়ে বোধ হয় কাহারও মত দ্বৈধ ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। আধুনিক বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত পদার্থ সকল জগতের সুখ ও শান্তি কিছু বর্দ্ধিত করিতে পারিয়াছে কি? জরা ও মৃত্যুর প্রভাব কিছু রোধ করিতে পারিয়াছে কি? মানবের জঠর-জ্বালা নিবারণের কোন উপায় উদ্ভাবন করিতে পারিয়াছে কি?

কেহ বলিতে পারেন যে, আধুনিক বিজ্ঞান দারুণ তৃষ্ণার সময় বরফ দেয়, দারুণ গ্রীষ্মে বৈদ্যুতিক পাখার সাহায্যে গ্রীষ্ম নিবারণ করে, আয়াস গম্য দূর দেশে বিনা আয়াসে সত্বর লইয়া যায়। তবে জগতের সুখ শান্তি কিছু বৰ্দ্ধিত করে নাই—ইহা কি করিয়া বলিব?

কিন্তু যিনি এরূপ বলেন তিনি ভ্রান্ত। সুখ দ্রব্য-সাপেক্ষ নহে। শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে:—

তস্মাৎ দুঃখাত্মকং দ্রব্যং নাস্তি কিঞ্চিৎ সুখাত্মকং।

মনসঃ পরিণামোঽয়ং সুখদুঃখোপলক্ষণঃ॥

সুখ দুঃখ দ্রব্য সাপেক্ষ নহে, উহা কেবল মনের পরিণতি মাত্র। একটা উদাহরণ দ্বারা বুঝান যাইতেছে।

আমরা যে গৃহে যেরূপ শয্যায় শয়ন করি, একজন বৃক্ষতলবাসী ভিক্ষুক যদি সেই শয্যায় শয়ন করে তবে তাহার কতই সুখবোধ হয়। কিন্তু একজন প্রাসাদবাসী মহার্ঘ শয্যায় শয়নে অভ্যস্ত ধনবান যদি সেই শয্যায় শয়ন করে তবে তাহার কতই কষ্ট বোধ হয়। পদার্থ সেই এক শয্যা কিন্তু ব্যক্তি ভেদে সুখ ও দুঃখ অনুভূতি হইয়া থাকে। সুতরাং সুখ ও দুঃখ পদার্থে আছে এরূপ বলা যায় না। সুখ মনে, প্রাচীন যুগে ভারতবাসী নিবৃত্তিমার্গের অনুসরণ করিয়া অনায়াসে সেই মানসিক সুখের অধিকারী হইতেন।

আধুনিক প্রবৃত্তিমার্গানুসারী বিজ্ঞান দ্রব্য সংযোগে সুখোৎপাদনের যতই চেষ্টা করিতেছে, লব্ধেন্ধন অগ্নির ন্যায় ততই প্রজ্বলিত হইয়া উঠিতেছে। বাষ্পীয় শকটের দ্রুত গমন এক্ষণে আর আমাদের সন্তুষ্ট করিতে পারে না, আমরা আরও দ্রুতগামী যান আকাঙ্ক্ষা করি। বৈদ্যুতিক পাখা সঞ্চালিত বায়ু, বরফ, লেমনেড প্রভৃতিতে আমরা অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি। অভ্যস্ত দ্রব্য সুখকর হয় না, কিন্তু তাহার অভাব দুঃখপ্রদ। প্রবৃত্তি অনাবশ্যক অসংখ্য বিলাসিতার উপকরণ সৃষ্টি করিয়া মানব-জাতিকে তাহাতে এমন অভ্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে যে, তাহাদের সংযোগে সুখ না হউক—অভাবে দুঃখ হইয়া থাকে। এইরূপে প্রবৃত্তি ক্রমশঃ বিলাসিতা ও তৎসহচর রোগ এবং অভাব, অনটন ও দুঃখের সৃষ্টি করিয়া মানব জাতির ঘোরতর অসুখ ও অশান্তি উৎপাদন করিয়াছে। শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে,—

সর্ব্বং আত্মবশং সুখং সর্ব্বং পরবশং দুঃখম্।

এই মহাবাক্য বিস্মৃত হইয়াই আমরা দুঃখভোগ করিতেছি। ভ্রমণে, আহারে, শয়নে, বিলাসে মানব এক্ষণে নিতান্ত পরবশ। এই পরবশতা এক্ষণে কেবল ব্যক্তিগত নহে পরন্তু জাতিগত ও দেশগত হইয়া পড়িয়াছে

মানব সমাজে শত অভাব অনটনের সৃষ্টি করিয়াই প্রবৃত্তি ক্ষান্ত হয় নাই। সুখ শান্তি বৃদ্ধির আশায়, রাজ্য রক্ষার আশায় কুহকিনী প্রবৃত্তি পাশ্চাত্য জাতিকে জল স্থল ও আকাশচারী অসংখ্য রণ সম্ভার নির্ম্মাণ করিতে প্ররোচিত করিয়াছিল। পাশ্চাত্য জাতি কোটি কোটি মুদ্রা ব্যয়ে তাহা সুসম্পন্ন করিয়াছিল। কিন্তু আজ তাহার ভীষণ পরিণাম দেখুন। হিতের চেষ্টায় তাহারা যাহা করিয়াছিল, আজ তাহা দ্বারা কি অহিতই না সঙ্ঘটিত হইতেছে। দেশের পর দেশ, গ্রামের পর গ্রাম ছারখার হইয়া যাইতেছে। কত ধর্ম্মমন্দির, পুস্তকাগার কল কারখানা ভূমিসাৎ হইতেছে। এই ভীষণ বিপ্লবে সমগ্র য়ুরোপ মহাদেশ বিধ্বস্ত এবং বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। ভবিষ্যতে আরও কি ঘটিবে তাহা কে বলিতে পারে? কিন্তু এই লোক-ক্ষয়কর মহান অনর্থের মূল কে? মূল প্রবৃত্তি। প্রবৃত্তি মূলক অযথা রাজ্যলিপ্সা এবং অসংখ্য রণসম্ভার নির্ম্মাণের ইহা অবশ্যম্ভাবী ফল।

রাজা দুর্য্যোধনের প্রবৃত্তি মূলক অযথা রাজ্য লিপ্সার ফলে ভারতেও এইরূপ কুরুক্ষেত্রের লোক-ক্ষয়কর মহাযুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল।

প্রবৃত্তি মানুষকে স্বার্থপর করে, নিবৃত্তি স্বার্থত্যাগ করিতে শিখায়। প্রবৃত্তির দাস আমরা এতই স্বার্থপর হইয়া পড়িয়াছি যে, গৃহপার্শ্বে দরিদ্র ভিক্ষুককে এক মুষ্টি অন্নের জন্য লালায়িত দেখিয়াও অক্লেশে বিবিধ সুখাদ্য আহার করিতে পারি। প্রতিবাসীর ঘোরতর অর্থকষ্ট উপেক্ষা করিয়া অনায়াসে প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করিতে পারি। ইহার ফলে জগতে স্বল্প সংখ্যক মানব প্রচুর বিভবশালী হইয়া, বিলাসিতায় লক্ষ লক্ষ মুদ্রা অপব্যয় করিতেছে, আর অপর দিকে অধিক সংখ্যক মানব অশন-বসন আবাসের অভাবে দারুণ কষ্ট পাইতেছে।

প্রবৃত্তি মূলক বিলাসিতার সহিত মানব সমাজে বিস্তারও লাঘব ঘটিয়াছে। ব্যাস, বাল্মিকী, কালিদাস, বরাহমিহির, গ্যালিলিও, সক্রেটিস, হোমার, নিউটন, সেক্সপীয়র এখন আর জন্মগ্রহণ করেন না। আড়ম্বরহীন খাকের কলম আর ভুর্জ্জপত্রই বোধ হয় ভারতীর প্রিয়। তাই আজ ষোড়শ মুদ্রা মূল্যের ফাউণ্টেন পেন এবং চিত্র বিচিত্র কাগজ দেখিয়া তিনিও ক্রমশঃ অন্তর্হিতা হইয়াছেন।

বাহুল্য ভয়ে আমরা এ সম্বন্ধে আর অধিক আলোচনা করিলামনা। ফলতঃ নিবৃত্তি মৃৎপাত্রে গঙ্গোদক, প্রবৃত্তি স্বর্ণপাত্রে কূপোদক, নিবৃত্তি হীন দীনবেশে সুখ ও শান্ত, প্রবৃত্তি মনোহর বেশে অসুখ ও অশান্তি। নিবৃত্তি পয়োকুম্ভ বিষমুখ, প্রবৃত্তি বিষকুম্ভ পয়োমুখ, নিবৃত্তি করুণাময়ী জননী; প্রবৃত্তি মনোহারিণী রাক্ষসী।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে মনুষ্য প্রবৃত্তির পথেই যাইতে চায়, কিন্তু নিবৃত্তি মহাফল প্রদ। তবে কি উপায়ে প্রাচীন ভারতবাসী প্রবৃত্তির কবল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া

নিবৃত্তির সেবা করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন? কিরূপ শিক্ষার বলে ঋষিগণ ভারতবাসীকে প্রবৃত্তি মূলক বিলাসিতা হইতে দূরে রাখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন? কোন্ দীক্ষার বলে ভারতবাসী শত সহস্র অনাবশ্যক বিলাসিতার দ্রব্য নির্ম্মাণ করিয়া দেশব্যাপী অভাব অনটনের সৃষ্টি করে? ইহার একমাত্র উত্তর ব্রহ্মচর্য্য।

খনিতে স্বর্ণ উৎপন্ন হয়, কিন্তু তাহা ভূষণ বলিয়া পরিগণিত হয় না। প্রথমে তাহাকে মল ভাগ হইতে বিযুক্ত করিতে হয়, পরে গলাইয়া আবশ্যক মত আকৃতি বিশিষ্ট করিতে হয়, তা'র পর তাহাতে কারুকার্য্য করিতে হয়। তবে সেই স্বর্ণ—অলঙ্কার বলিয়া পরিগণিত হয়। স্বর্ণপ্রসূ ভারতের সেই সোনার মানুষ বাল্যে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে এইরূপে পরিবর্ত্তিত ও গঠিত হইয়া মানব সমাজে শোভন অলঙ্কাররূপে শোভা পাইত।

বাল্যে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে থাকিয়াই ভারতবাসীর মন ও চরিত্র গঠিত হইত। ইহাতে তাহাদিগের দেহ ক্লেশসহিষ্ণু, দৃঢ়, কর্ম্মঠ, রোগহীন ও অকাল-বার্দ্ধক্য-বর্জ্জিত হইত এবং পরমায়ু দীর্ঘ হইত। মন—নিবৃত্তি-প্রিয়, পরদুঃখ-কাতর, সুখে বিগতস্পৃহ, দুঃখে অনুদ্বিগ্ন, কামক্রোধাদি রহিত, প্রশান্ত ও উদার হইত। ব্রহ্মচর্য্য ভারতের প্রাণ ছিল, ভারতের উন্নতির মূল ছিল, ভারতের সুখ-শান্তির হেতুভূত ছিল। ব্রহ্মচর্য্য ব্যতীত চিত্তস্থির হয় না এবং চিত্তের স্থিরতা ব্যতীত ধী, ধৈর্য্য ও আত্মজ্ঞান সম্যকরূপে জন্মিতে পারেনা। ভারতের চির আদৃত সেই ব্রহ্মচর্য্য বিসর্জ্জন দিয়াই আমাদের এতদূর শারীরিক ও মানসিক অধঃপতন ঘটিয়াছে।

নিবৃত্তিমার্গাশ্রয় ব্যতীত জগতে সুখ-শান্তি লাভ করা যায়না, আর ব্রহ্মচর্য্য ভিন্ন নিবৃত্তি-মার্গের অনুসরণ করিবার উপযুক্ত মানসিক বল জন্মিতে পারেনা। সেই জন্য সুখ-শান্তি লাভ করিতে হইলে ব্রহ্মচর্য্য পালন নিতান্ত আবশ্যক।

এক্ষণে ব্রহ্মচর্য্য কিরূপে পালন করিতে হয় তাহাই বলিব।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে ব্রহ্মচর্য্য একটী আশ্রম। আর্য্য শাস্ত্রমতে আশ্রম চারিটী, যথা—ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম, গার্হস্থ্যাশ্রম, বাণপ্রস্থাশ্রম এবং সন্ন্যাসাশ্রম। উপনয়নের পরে গুরু-গৃহে অবস্থান করিয়া বেদাধ্যয়ন করার নাম ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম। ইহা দুই প্রকার যথা, উপকুর্ব্বান এবং নৈষ্টিক। দুই প্রকার ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের নিয়ম একই। প্রভেদ এই যে, ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের শেষে বিবাহ করিয়া গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিলে তাহাকে উপকুর্ব্বাণ বলে। আর যাবজ্জীবন গুরুগৃহে থাকিয়া ব্রহ্মচর্য্য পালন করিলে তাহাকে নৈষ্টিক বলে।

কেবল ব্রাহ্মণগণই যে এই আশ্রমের অধিকারী তাহা নহে। ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যগণও ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম, গার্হস্থ্যাশ্রম এবং বাণপ্রস্থ আশ্রমের অধিকারী। কেবল সন্ন্যাসাশ্রমে একমাত্র ব্রাহ্মণেরই অধিকার। কিন্তু মতান্তরে ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যেরও সন্ন্যাসাশ্রমে অধিকার আছে এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়। রঘুবংশে "স কিলা শ্রমমন্ত্যমাশ্রিত" অর্থাৎ তিনি (রঘু) অন্ত্য আশ্রম (সন্ন্যাস আশ্রম) করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিলেই যে ব্রহ্মচর্য্য পরিত্যাগ করিতে হইবে তাহা নহে। ভগবান মনু বলিয়াছেন—

বেদান অধীত্য বেদৌ বা বেদং বাপি
যথাক্রমম্।
অবিপ্লুতব্রহ্মচর্য্যোব গৃহস্থাশ্রমমাবসেৎ॥

অনুবাদ—সমস্ত বেদ, দুই বেদ বা এক বেদ অধ্যয়ন করিয়া—ব্রহ্মচর্য্যের নিয়ম পালন করিয়া গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন করিবে।

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে যে সকল নিয়ম পালন করিতে হয়, গৃহস্থাশ্রমে তাহা পালন করা চলে না। কারণ গৃহীর পক্ষে অপত্যোৎপাদন, জীবিকা অর্জ্জন প্রভৃতি করিতে হয়। তবে এস্থলে ব্রহ্মচর্য্য শব্দের অর্থ কি? আয়ুর্ব্বেদেও কথিত হইয়াছে যে "ব্রহ্মচর্য্য মায়ুষ্যকরাণাং" অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য আয়ুষ্যকর পদার্থ সমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। অপিচ শরীর ধারণের উপায় তিনটী, যথা আহার, নিদ্রা ও ব্রহ্মচর্য্য। আয়ুর্ব্বেদ সর্ব্বসাধারণের জন্য। সুতরাং এখানেও ব্রহ্মচর্য্য অর্থে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে পালনীয় ব্রহ্মচর্য্য হইতে পারে না। তবে এ ব্রহ্মচর্য্য কি?

এক কথায় বলিতে গেলে এই ব্রহ্মচর্য্য-নিবৃত্তি মার্গের আশ্রয় গ্রহণ করা। হিন্দু বিধবারা যেরূপ সংযত ভাবে থাকেন, তাহাও এই ব্রহ্মচর্য্যের অন্তর্ভুক্ত। মদ্য, মাংস, মৈথুনপরিত্যাগ, ক্রোধ-লোভাদি পরিত্যাগ, সর্ব্বভূতে দয়া প্রভৃতি এই ব্রহ্মচর্য্যে পালন করিতে হয়। অনুসন্ধিৎসু পাঠক মনুসংহিতার তৃতীয় অধ্যায় পাঠ করিলে গৃহস্থাশ্রমে কিরূপ নিয়ম পালন করিতে হয়, তাহা অবগত হইতে পারিবেন।

গৃহস্থের পক্ষে পুত্রোৎপাদন যখন কর্ত্তব্য, তখন মৈথুন-পরিত্যাগ করা কিরূপে সঙ্গত? পরিত্যাগ অর্থে এক্ষণে অতিরিক্ত সংযতভাব বুঝিতে হইবে। তাহা একতণ্ডুলন্যায়ে একটী তণ্ডুল আহার করিলে যেমন সে ব্যক্তি আহার করিয়াছে বলা যায় না, সেইরূপ পরিত্যাগের মধ্যে গণ্য। এ বিষয়ে নিবৃত্তি এতদূর প্রবলা হইয়া উঠিয়াছিল যে, শাস্ত্রকার নিম্নলিখিত আইন জারী করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। যথা:—

ঋতুমতীন্তু যো ভার্য্যাং সন্নিধৌ নোপসর্পতি।
অবাপ্নোতি স মন্দাত্মা ভ্রূণহত্যা মৃতাবৃতৌ॥

অনুবাদ—ভার্য্যার ঋতুকালে নিকটে থাকিয়াও যে ব্যক্তি ভার্য্যাতে উপগত হয় না, ঋতুকাল শেষ হইলে সে ব্যক্তি ভ্রূণহত্যার পাতক গ্রস্ত হয়।

পাঠকগণ অবগত আছেন যে, প্রবৃত্তি মূলক বিলাসিতার ব্যয় নির্ব্বাহ করিবার অভাবে ফরাসী দেশের অনেকে বিবাহ করে না। এই জন্য পাছে লোক সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস পায় বলিয়া ফরাসী গবর্ণমেণ্ট অবিবাহিত ব্যক্তিগণের উপর করস্থাপন করিয়া তাহাদিগকে বিবাহিত করিবার প্রয়াস পাইতেছেন। আর আমাদের নিবৃত্তির দেশে ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ জিতেন্দ্রিয় পুরুষগণ পাছে পত্নীতে উপগত না হইয়া পুত্রোৎপাদন করিতে না থাকে সেই ভয়ে এইরূপ ধর্ম্মমূলক আইন রাখিতে হইয়াছে। এইরূপ নিবৃত্তি সম্বন্ধে অনেক কথা পুরাণাদিতে দেখিতে পাওয়া যায়। অগস্ত্য, জরৎকারু প্রভৃতি মুনিগণ পুত্রোৎপাদনে পরাঙ্মুখ ছিলেন বলিয়া তাঁহাদিগের পিতৃপুরুষদিগকে গর্ত্তমধ্যে হেঁটমুণ্ডে লম্বমান থাকিতে হইয়াছিল। সেই সকল পিতৃপুরুষকে উদ্ধার করিবার জন্য তাঁহারা বিবাহ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু পত্নীর গর্ভাধান করিয়াই তাহার সঙ্গ বর্জ্জন করিয়াছিলেন।

এ সম্বন্ধে একটী নাতি প্রাচীন ঘটনার

উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। ভামতী নামক ভাষ্যকার বাচস্পতিমিশ্র বাল্যকালে—বিবাহ করিয়াছিলেন, কিন্তু বিবাহের পরে গুরুগৃহে বাস করেন এবং বিবাহ সম্বন্ধে কোন চিন্তাই তাঁহার মনে উদিত হয় নাই। প্রৌঢ় বয়সে তিনি স্বগৃহে ফিরিয়া আসেন। তাঁহার স্ত্রী স্বামি-ভবনে বাস করিতেন, গৃহ কার্য্য করিতেন, রন্ধন করিতেন, কিন্তু স্বইচ্ছায় স্বামীকে দর্শন দিতেন না। বাচস্পতি মিশ্র মনে করিতেন যে, তাঁহার শিষ্যেরাই রন্ধনাদি করিয়া থাকে শিষ্যেরাও তাঁহাকে তাঁহার স্ত্রী সম্বন্ধে কোন কথা বলিত না। এইরূপে দীর্ঘকাল অতি বাহিত হইল। ভামতী অন্তরাল হইতে স্বামীকে দেখিয়া এবং তাঁহার অধ্যাপনা শুনিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতেন। ঘটনাক্রমে এক-দিন সমস্ত ছাত্র অন্যত্র গিয়াছিল। বাচস্পতি স্বয়ং রন্ধন করিয়া আহার করিতে হইবে বিবেচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু যথা সময়ে গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, অন্ন প্রস্তুত রহিয়াছে। তখন তিনি আপনার মনে বলিলেন,—এই অন্ন কেরন্ধন করিয়াছে না জানিলে আমি আহার করিতে পারিব না। তাঁহার স্ত্রী এই কথা শুনিয়া তাঁহার সমীপে আগমন পূর্ব্বক স্বামীকে প্রণাম করি-লেন। বাচস্পতি জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কে? ভামতী কহিলেন আপনার দাসী, পরিণীতা পত্নী। তখন বাচস্পতি বিস্মিত হইয়া কহিলেন, দেবি! আমি তোমাকে বিস্মৃত হইয়া বড়ই কুকার্য্য করিয়াছি। এক্ষণে তোমার কি প্রিয় কার্য্য সম্পাদন করিব বল। ভামতী আকার ইঙ্গিতে অপত্য কামনা করিলেন। বাচস্পতি বলিলেন, আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, পুত্রোৎপাদনের কাল অতীত হইয়াছে। তবে লোকে খ্যাতির জন্য পুত্র কামনা করে। আমি তোমার নামে যে টীকা রচনা করিব—তাহাতে তোমার খ্যাতি তাহাতেই বহুদিন স্থায়ী হইবে। হায়! সেই নিবৃত্তির দেশে আজ প্রবৃত্তির কি ভীষণ তাণ্ডব নৃত্য!

যে বর্ণের যে প্রকার কর্ম্ম, সূত্র, দণ্ড, মেখলা ও বসন উপনয়নকালে ধারণ করিতে হয়, ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে তাহাই পালন করিতে হয়। ব্রহ্মচারী গুরুর নিকটে বাস করিয়া স্বীয় তপস্যার বৃদ্ধির জন্য এই সকল নিয়মের অনু-ষ্ঠান করিবে। প্রতিদিন প্রাতে স্নান করিয়া, শুচি হইয়া, দেবতা, ঋষি ও পিতৃদিগের তর্পণ করিবে, দেবতাদিগের পূজা করিবে এবং সায়ং-প্রাতে সমিধের দ্বারা হোম করিবে। মধু, মাংস, কর্পূরাদি গন্ধদ্রব্য, ও মাল্য পরি-ত্যাগ করিবে, গুড়াদি আহার করিবে না, স্ত্রী সংসর্গ কবিবে না, শুক্ত (মধুর দ্রব্য ও জল-সংযোগে প্রস্তুত অম্লরস যুক্ত তরল পদার্থ) সেবন করিবেনা এবং প্রাণী হিংসা করিবে না। শরীরে তৈল মর্দ্দন করিবে না, চক্ষুতে অঞ্জন (কাজল) পরিবেনা, চর্ম্মপাদুকা ও ছত্র ব্যবহার করিবেনা, কাম (বিষয়াভি-লাষ, ভোগেচ্ছা), ক্রোধ, লোভ, নৃত্য-গীত-বাদ্য পরিত্যাগ করিবে। দ্যূত (অক্ষক্রীড়াদি ব্যসন), লোকের সহিত অকারণ-কলহ, পরের দোষের বিষয় কথন, মিথ্যা বাক্য, কামভাবে স্ত্রীলোক দর্শন বা আলিঙ্গন এবং পরের অনিষ্টাচরণ হইতে বিরত থাকিবে। নিম্ন শয্যায় একাকী শয়ন করিবে, কদাচ ইচ্ছাপূর্ব্বক শুক্রপাত করিবে না। কারণ ইচ্ছাপূর্ব্বক শুক্রপাত করিলে স্বকীয় ব্রত নষ্ট

হইয়া যায়। অকাম ব্রহ্মচারীর স্বপ্নে বা অনিচ্ছায় রেতঃপাত হইলে স্নান করিয়া সূর্য্যের অর্চ্চনা করিবে এবং "পুনর্ম্মাম্ এতু ইন্দ্রিয়ং" এই মন্ত্র তিনবার পাঠ করিবে। জল, কলস, পুষ্প, গোময় ও মৃত্তিকা যত প্রয়োজন হয় গুরুকে সংগ্রহ করিয়া দিবে, গুরুর অন্যান্য যে দ্রব্য প্রয়োজন হয় তাহাও সংগ্রহ করিয়া দিবে এবং নিত্য ভিক্ষা করিয়া অন্ন সংগ্রহ করিবে। যে সকল গৃহস্থ বেদবিহিত যজ্ঞাদি করিয়া থাকেন এবং সর্ব্বদা আপন কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, এইরূপ গৃহস্থের নিকট হইতে ব্রহ্মচারী প্রতিদিন পবিত্রভাবে সিদ্ধান্ন ভিক্ষা করিবে। গুরুকুলে, জ্ঞাতিকুলে ও বন্ধুকুলে ভিক্ষা করিবে না। অন্য গৃহের অভাবে প্রথমে বন্ধুকুলে, তদভাবে জ্ঞাতিকুলে এবং তদভাবে গুরুকুলে ভিক্ষা করিবে। পূর্ব্ব কথিত গুণ-সম্পন্ন গৃহস্থ না পাইলে শুচি ও মৌনী হইয়া সমস্ত গ্রামে ভিক্ষা করিবে। কিন্তু মহাপাতকগ্রস্ত গৃহস্থকে পরিত্যাগ করিবে। ব্রহ্মচারী দূরস্থিত বৃক্ষ হইতে সমিধ আহরণ করিয়া কুটীরের চালে অথবা কোন আবৃত স্থানে রাখিবে এবং সেই সমিধ দ্বারা নিরলস ভাবে সায়ং-প্রাতে হোম করিবে। রোগশূন্য ব্রহ্মচারী ক্রমাগত সপ্তদিন ভিক্ষার আহার এবং সমিধের দ্বারা হোম না করিলে তাহার ব্রত নষ্ট হয় ও তজ্জন্য অবকীর্ণি প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। ব্রহ্মচারী ভিক্ষান্ন একজনের নিকট না লইয়া বহু লোকের গৃহ হইতে সংগ্রহ করিবে। কারণ এইরূপ ভিক্ষা-সমূহ দ্বারা ও সংগৃহীত ভিক্ষান্ন দ্বারা জীবন ধারণ করাকে মহর্ষিগণ উপবাসের তুল্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু ব্রহ্মচারী দেবতার উদ্দেশে অথবা পিতৃ উদ্দেশে শ্রাদ্ধে শ্রাদ্ধকর্ত্তা-কর্ত্তৃক আহূত হইয়া যদি সেই একজনের নিকট হইতে মধুমাংসাদি বর্জ্জিত অন্ন আবশ্যকমত সংগ্রহ করেন, তাহা হইলে ব্রত লোপ হয় না। তবে কেবল ব্রাহ্মণের ব্রহ্মচারীর পক্ষেই এই বিধি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য ব্রহ্মচারীর পক্ষে একজনের অন্ন ভোজন করা বিহিত নহে। গুরু কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া অথবা আদিষ্ট না হইলেও স্বয়ং ইচ্ছা পূর্ব্বক নিত্য অধ্যয়নে এবং গুরুর হিত সাধনে যত্নবান হইবে। শরীর, বাক্য, বুদ্ধি ও মন সংযত-করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া গুরুর মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দণ্ডায়মান থাকিবে, গুরুর অনুমতি ব্যতীত উপবেশন করিবেনা। সদাচারসম্পন্ন শিষ্য উত্তরীয় দ্বারা শরীর-আচ্ছাদিত করিয়া দক্ষিণ-হস্ত বহিষ্কৃত রাখিবেন এবং গুরু "উপবেশন কর" বলিলে উপবেশন করিবেন। গুরুর নিকটে গুরু যেরূপ বস্ত্র পরিধান ও অন্ন আহার করেন, তাহা অপেক্ষা হীনবস্ত্র পরিধান ও হীন অন্ন আহার করিবে। রাত্রিশেষে গুরু শয্যা হইতে উঠিবার পূর্ব্বে—উঠিতে হইবে এবং রাত্রিতে গুরু শয়ন করিবার পরে শয়ন করিবে। শয়ন করিয়া, উপবেশন করিয়া, আহার করিতে করিতে অথবা গুরুর দিকে মুখ না রাখিয়া দণ্ডায়মান অবস্থায় গুরুর আজ্ঞা শ্রবণ বা গুরুকে সম্ভাষণ করিবেনা। গুরু আসনে উপবিষ্ট থাকিয়া আজ্ঞা করিলে, শিষ্য দণ্ডায়মান হইয়া, গুরু দণ্ডায়মান থাকিয়া আজ্ঞা করিলে, শিষ্য গুরুর দিকে কয়েকপদ গিয়া, গুরু আগমন করিতে করিতে আজ্ঞা করিলে, শিষ্য তাঁহার অভিমুখে

যাইয়া, গুরু বেগে গমন করিতে করিতে আজ্ঞা করিলে, শিষ্য তাঁহার পশ্চাৎ ধাবমান্ হইয়া, গুরুর আদেশ গ্রহণ করিবে এবং তাঁহার সহিত সম্ভাষণ করিবে। গুরু অন্য দিকে মুখ রাখিয়া আদেশ করিলে, শিষ্য তাঁহার সম্মুখে গিয়া, গুরু দূরে থাকিয়া আদেশ করিলে, শিষ্য প্রণত হইয়া, গুরু নিকটে থাকিয়া আদেশ করিলে শিষ্য অবনতভাবে আজ্ঞা শ্রবণ করিবে এবং সম্ভাষণ করিবে। গুরুর নিকটে তাঁহার আসন ও শয্যা অপেক্ষা নিম্নতর আসন গ্রহণ করিবে। গুরুর দৃষ্টির সম্মুখে কখন হস্তপদ বিস্তার করিয়া যথেষ্ট ভাবে অবস্থান করিবেনা। শিষ্য অন্যের নিকটেও গুরুর নামের পূর্ব্বে—আচার্য্য বা উপাধ্যায় না বলিয়া কেবল গুরুর নাম উচ্চারণ করিবে না এবং গুরুর গতি, হাস্য বা চেষ্টার অনুকরণ করিবেনা। যেখানে গুরুর পরীবাদ (বিদ্যমান দোষের বর্ণন) অথবা নিন্দা (অবিদ্যমান দোষের কথন) হয়, শিষ্য সেই স্থান হইতে চলিয়া যাইবে বা হস্ত দ্বারা কর্ণ-আচ্ছাদন করিবে। শিষ্য গুরুর পরীবাদ করিলে গর্দ্দভযোনি, নিন্দা করিলে কুক্কুরযোনি, অযথারূপে গুরুধন দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিলে কৃমি যোনি এবং গুরুর প্রশংসা সহ্য করিতে না পারিলে কীট যোনি প্রাপ্ত হয়। শিষ্য স্বয়ং গমনে অশক্ত না হইলে অন্যের হস্তে মাল্য-চন্দনাদি পাঠাইয়া গুরুর অর্চ্চনা করিবেনা, ক্রুদ্ধ হইয়া গুরুর অর্চ্চনা করিবে না; গুরু স্ত্রীলোকের নিকট—থাকিলে গুরুর অর্চ্চনা করিবে না এবং শিষ্য যান বা আসনে উপবিষ্ট থাকিলে তথা হইতে অবতরণ করিয়া গুরুর অর্চ্চনা করিবে। যে ভাবে উপবেশন করিলে বায়ু গুরুর দিকে যায় তাহাকে প্রতিবাত এবং যে ভাবে উপবেশন করিলে বায়ু শিষ্যের দিক হইতে গুরুর দিকে যায় তাহাকে অনুবাত বলে। এইরূপ প্রতিবাত বা অনুবাত ভাবে গুরুর সহিত উপবেশন করিবে না। শিষ্য গোযান অশ্বযান, বা উষ্ট্রযানে, প্রাসাদের উপরে, দীর্ঘ আসনে, তৃণ নির্ম্মিত আসনে, শিলাতলে, কাষ্ঠময় দীর্ঘ আসনে এবং নৌকায় গুরুর সহিত উপবেশন করিতে পারে। গুরুর গুরুর নিকটে গুরুর ন্যায় ব্যবহার করিবে। গুরুর গৃহে অবস্থান কালে পিতা, পিতৃব্য প্রভৃতি গুরুজনকে গুরুর অনুমতি ব্যতিরেকে অভিবাদন করিবে না। উপাধ্যায়াদি বিদ্যাদাতা গুরু দিগকে, পিতৃব্যদিগকে অধর্ম্মানুষ্ঠান হইতে নিষেধকারককে এবং ধর্ম্মানুষ্ঠানে উপদেশদাতাকে গুরুর ন্যায় ব্যবহার করিবে। বিদ্যা ও তপঃসম্পন্ন ব্যক্তিকে, শিষ্য ভিন্ন বয়োজ্যেষ্ঠ স্ববর্ণ ব্যক্তিকে, গুরু-পুত্রকে এবং গুরুর পিতৃব্যাদি জ্ঞাতিকে গুরুর ন্যায় সম্মান করিবে। কনিষ্ঠই হউন, সমান বয়স্কই হউন বা জ্যেষ্ঠই হউন, গুরু-পুত্র বেদজ্ঞ হইলে, যজ্ঞ ক্রিয়ায় অধিকারী; কিন্তু গুরুপুত্র যজ্ঞ কার্য্যে নিযুক্ত হউন বা না হউন গুরুর ন্যায় সম্মানিত হইবেন। গুরুপুত্রের গাত্রে বিলেপন প্রদান, স্নান করান, গুরুপুত্রের উচ্ছিষ্ট ভোজন বা পদ প্রক্ষালন করিবে না। গুরুর সবর্ণা স্ত্রী গুরুর ন্যায় পূজনীয়া কিন্তু অসবর্ণা স্ত্রী কেবল প্রত্যুত্থান এবং অভিবাদন দ্বারা পূজনীয়া। গুরুপত্নীর গাত্রে তৈলাদি মর্দ্দন করিবে না, তাঁহাকে স্নান করাইবে না, গাত্রে সুগন্ধ লেপন করিবে না এবং তাঁহার কেশ সংস্কার

করিয়া দিবে না, বিংশতি বর্ষ বয়স্ক যুবক-শিষ্য যুবতী-গুরুপত্নীর পাদগ্রহণ পূর্ব্বক অভিবাদন না করিয়া কেবল ভূমিতেই অভিবাদন করিবে। কিন্তু বালক-শিষ্য যুবতী-গুরুপত্নীর পদ গ্রহণ পূর্ব্বক অভিবাদন করিতে পারে। স্ত্রীলোকেরা স্বভাবতঃই মনুষ্যদিগকে দূষিত করিয়া থাকে। সুতরাং স্ত্রীলোক সম্বন্ধে পণ্ডিত ব্যক্তির বিশেষ সাবধান থাকা কর্ত্তব্য। অবিদ্বান ব্যক্তি বা বিদ্বান ব্যক্তি (আমি জিতেন্দ্রিয় মনে করিয়া) কেহই স্ত্রীলোকের নিকট অবস্থান করিবে না। কারণ দেহধর্ম্মবশতঃ কাম, ক্রোধযুক্ত পুরুষকে রমণীরা অনায়াসেই বিপথগামী করিতে পারে। মাতা, ভগিনী বা কন্যার সহিতও নির্জ্জন গৃহে বাস করিবে না। কারণ বলবান ইন্দ্রিয়সমূহ বিদ্বান ব্যক্তিকেও কুপথগামী করিতে পারে। যুবা-শিষ্য যুবতী গুরুপত্নীর পাদগ্রহণ না করিয়া "আমি অমুক" এই বলিয়া ভূমিতে যথাবিধি অভিবাদন করিবে। যুবা-শিষ্য বিদেশ হইতে সমাগত হইলে শিষ্টাচার স্মরণ করিয়া প্রথম দিন বয়োধিকা গুরুপত্নীর বামহস্তে বামপদ এবং দক্ষিণ হস্তে দক্ষিণ পদ গ্রহণ করিবে। কিন্তু তাহার পর প্রতিদিন ভূমিতে অভিবাদন করিবে।

(আগামী বারে সমাপ্য)

ঘৃত।

—:o:—

ঘৃত ভারতবাসীর প্রধান খাদ্য। পণ্ডিতেরা ঘৃতহীন ভোজনকে উপযুক্ত ভোজন বলিয়া স্বীকার করেন না। অনেকস্থলে ঘৃতহীন-ভোজনকে বারিহীন নদী প্রভৃতি অনুপযোগী পদার্থের সহিত তুলনা করিয়াছেন। ঘৃত শ্রেষ্ঠ পুষ্টিকর ও বলবর্দ্ধক খাদ্য। অধিক পরিমাণে খাইলে মেদো বৃদ্ধি হয়।

সাধারণতঃ দুই প্রকার ঘৃতের প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। মাহিষ ঘৃত ও গব্য ঘৃত। মাহিষ ঘৃত, গব্য ঘৃত অপেক্ষা অধিকতর শুভ্র, এবং ইহাতে দ্রবনীয় এসিড্ অপেক্ষাকৃত অধিক, অর্থাৎ ৫ গ্রাম মাহিষ ঘৃতে সাধারণতঃ ৩৪ কিউবিক সেণ্টিমিটর এসিড্ পাওয়া যায়, কিন্তু ঐ পরিমাণ গব্য ঘৃতে এসিডের পরিমাণ ৩২ কিউবিক সেণ্টিমিটার মাত্র। গব্য ঘৃত অতি সদ্‌গন্ধযুক্ত।

ঘৃত নানা প্রকারে ব্যবহার করা হয়। লুচি, কচুরি, গজা, মিঠাই প্রভৃতি খাবার প্রস্তুতের জন্য ঘৃত ব্যবহার হয়। ডাল, তরকারি প্রভৃতি রন্ধনের জন্য ঘৃত ব্যবহার হয়। রুটিতে ঘৃত মাখান হয়। ভাতের সহিত ঘি ব্যবহার হয়। হোম, যাগ প্রভৃতি দেবার্চ্চন ক্রিয়ার জন্য ঘৃত ব্যবহার হয়। দেবার্চ্চন ক্রিয়ার জন্য কেবল বিশুদ্ধ গব্যঘৃত ব্যবহার হয়। অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার জন্যও ঘৃত ব্যবহার হয়। পুরাতন গব্য ঘৃত আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসায় ঔষধ রূপে ব্যবহৃত হয়। দশবর্ষাধিকস্থিত কুম্ভকে

পুরাণ ঘৃত বলে। ঔষধার্থে ঘৃত যত অধিক পুরাতন হয়, ততই উহার গুণাধিক্য হয়।

অধুনা ঘৃত প্রস্তুতকরণের জন্য দুই প্রকার উপায় অবলম্বন করা হয়। প্রথম দধি হইতে, দ্বিতীয় কাঁচা দুধ হইতে। সাধারণতঃ দধিতে জলমিশ্রিত করিয়া মন্থন করিলে মাখন বাহির হইয়া উপরে ভাসিতে থাকে। পরে ঐ মাখন তুলিয়া লইয়া একটী পাত্রে সংগ্রহ করিতে হয়। এইরূপে সংগৃহীত মাখন লৌহ-কটাহে করিয়া অগ্নিতে পাক করিতে হয়। মাখন তুলিয়া লইয়া যে তরল অংশ অবশিষ্ট থাকে তাহাকে তক্র বা ঘোল বলে। প্রথমতঃ অগ্নির তাপে মাখন গলিয়া গিয়া ছানার অংশ ও জল কটাহের তলদেশে পতিত হয়। পরে ক্রমশঃ অধিক তাপযোগে জল বাষ্পাকারে পরিণত হয় এবং ছানার অংশগুলি খাঁকরিরূপে পরিণত হয়। পরে ঘৃত ছাঁকিয়া লইয়া খাঁকরি ফেলিয়া দেওয়া হয়। ইহাকে পাকা ঘি বলে। কাঁচা ঘৃতের জল বাষ্পাকারে পরিণত করা হয় না এবং ঘৃতেও প্রখর তাপ প্রয়োগ করা হয় না। পাকা ঘি সর্ব্বাপেক্ষা ভাল। ইহা যে কেবল খাবার প্রস্তুতের জন্য ব্যবহার হয় তাহা নহে, অন্ন বা অন্যান্য খাদ্যে মাখিয়াও খাওয়া হয়।

কাঁচা ঘি খাবার প্রস্তুতের জন্য ব্যবহার হয়। যদি কাঁচা ঘি ক্রয় করা হয় ও উহা ভোজনকালে ভাতে বা রুটিতে মাখিয়া খাইবার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে উহা লৌহ পাত্রে উত্তপ্ত করিয়া লইলে পাকা হয়।

ঘৃত প্রস্তুত করণের দ্বিতীয় উপায়ে দধি না করিয়া কাঁচা দুধ হইতে মন্থন করিয়া মাখন উঠাইয়া ঐ মাখনের ঘৃত প্রস্তুত হয়। গোয়ালারা সাধারণতঃ এই উপায় অবলম্বন করে। তাহারা কাঁচা দুধ মন্থন করিয়া কিয়ৎপরিমাণ মাখন তুলিয়া লইয়া অবশিষ্ট অংশ দুধ বলিয়া বিক্রয় করে। মাহিষ দুগ্ধে ঘৃত অধিক, সেইজন্য মাহিষ ঘৃত সাধারণতঃ এইরূপে প্রস্তুত হয়। বাজারের অধিকাংশ দুগ্ধই মাখন তোলা দুধ।

বাজারে যে সুলভ মূল্যের ঘৃত বিক্রয় হয়, উহা সাধারণতঃ ভেজাল বা অন্য দ্রব্য মিশ্রিত। ঘৃতে সচরাচর মাটকলাই বা চীনাবাদামের তৈল, বসা, মৌয়া তৈলের ভেজাল দেওয়া হয়। মাট কলাইয়ের তৈলে এক প্রকার গন্ধ পাওয়া যায়, মৌয়া তৈলের কিয়দংশ জমাট ও কিয়দংশ তরল, বসা ঠিক ঘৃতের মত, দেখিয়া প্রভেদ বুঝা যায় না, তবে আপেক্ষিক গুরুত্ব অধিক। এতদ্ব্যতীত নারিকেল, পোস্তদানা, তিল ও ভেরেণ্ডার তৈল ঘৃতে ভেজাল দেওয়া হয়। আজকাল ঘৃতের সহিত কেহ কেহ পেট্রোল মিশ্রিত করেন। ময়রারা প্রায় ভেজাল ঘৃতে খাবার প্রস্তুত করে। সেইজন্য দোকানের খাবার খাইয়া অম্ল ও অজীর্ণ রোগ উৎপন্ন হয়।

ঘৃত মেদো বর্দ্ধক, সুতরাং ক্ষয়রোগ নিবারক। অজা ঘৃত অর্থাৎ ছাগীদুগ্ধ হইতে প্রস্তুত ঘৃত ক্ষয়রোগে বিশেষ উপকারী।

ঘৃত স্বাস্থ্যের পক্ষে এতই উপকারী যে "ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ" কথার বহুকাল হইতে প্রচলন আছে। এ কথার উদ্দেশ্য এই যে, যতই কেন দুরবস্থা হউক না, তথাপি ঘি খাইতে বিরত থাকিবে না। ঘৃতের পুষ্টি-কারিতা এত অধিক যে, সামান্য পরিমাণ খাইলেই অধিক পরিমাণ শস্যাদি খাওয়ার

কাব হয়। সেই কারণ চলিত কথায় বলে "পরে তসর, খায় ঘি, তার আবার দুঃখ কি?" অর্থাৎ তসর দীর্ঘকাল স্থায়ী, সুতরাং তসর পরিলে কাপড়ের খরচের সাশ্রয় হয়, এবং ঘি অত্যন্ত পুষ্টিকর, সুতরাং ঘৃতপায়ীদের অন্যান্য খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা কম হয়।

কিছুদিন হইল মাড়োয়ারী সম্প্রদায় বসা মিশ্রিত ঘৃত খাইয়া ধর্ম্মহানি হইয়াছে বিবেচনা করিয়া দলে দলে প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন, এবং ঘৃত ও ঘৃতপক্ক মিষ্টান্নাদি ত্যাগ করিয়াছেন। উক্ত সম্প্রদায়স্থ ঘৃত-ব্যবসায়িগণ বসামিশ্রিত ঘৃত বেচিবেন না বলিয়া ধর্ম্মঘটও করিয়াছেন। কেবল বসামিশ্রিত ঘৃত বন্ধ করিলেই যে অবিশুদ্ধ ঘৃতের অপকারিতা দমন হইবে তাহা নহে। বসা নিরামিষ-ভোজীদের অপবিত্র বটে এবং মৎস্যমাংস-ভোজী হিন্দুসমাজে আবার বিরুদ্ধ খাদ্য বটে কিন্তু স্বাস্থ্য সম্বন্ধে তত দূষণীয় নহে। কারণ ঘৃত মেদের রূপান্তর মাত্র; সুতরাং বসা ও ঘৃত ধরিতে গেলে একই পদার্থ। তবে মৃত বা পীড়িত জন্তু বা সর্পাদির বসা অস্বাস্থ্যকর। যাহা হউক ধর্ম্মঘটের ফলে যদি দেশে পবিত্র ও বিশুদ্ধ ঘৃতের প্রচলন হয়, তাহা হইলে হিন্দুসমাজ কেন—সমগ্র ভারতবাসীর মহদুপকার সাধিত হইবে দেশের লোকের স্বাস্থ্যরক্ষা ও রোগ নিবারণ হইবে। পবিত্রতা দেখিলে চলিবে না, বিশুদ্ধতার দিকে লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। কারণ ঘৃতে এমন সব দ্রব্য মিশান যাইতে পারে যাহা অপবিত্র না হইলেও অস্বাস্থ্যকর।

কিন্তু একটী কথা উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। ঘৃতে চর্ব্বি মিশ্রণের কথা বালক কাল হইতে শুনিয়া আসিতেছি, এবং আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই একথা জানেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, মাড়োয়ারী ঘৃত-ব্যবসায়িগণ কি এ সম্বন্ধে এতদিন অনভিজ্ঞ ছিলেন? তাই আজ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া ধর্ম্মরক্ষা করিতেছেন? যাহা হউক ইহার ফলে যদি অবিশুদ্ধ ঘৃতের চলন বন্ধ হইয়া বিশুদ্ধ ঘৃতের প্রচলন হয়, তাহা হইলে দেশবাসীর পক্ষে নিশ্চয়ই হিতকর বটে। কিন্তু যদি পবিত্রতার ভানে ঘৃতের মূল্যবৃদ্ধি হইয়া যায় ও অবিশুদ্ধতা রহিয়া যায়, তাহা হইলে পরিণাম বড়ই বিষময় হইবে। যাহাতে দেশে বিশুদ্ধ ঘৃত অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয় ও পাওয়া যায়, তদ্বিষয়ে যত্নবান হওয়া উচিত। গোহত্যা-নিবারণ করিতে পারিলে ইহার প্রতিকার হইতে পারে, কিন্তু তাহা দুঃসাধ্য; তবে যদি কৃষক, গোপালক, গোপ, গো-রক্ষকগণ সকলেই ধর্ম্মঘট করিয়া কষাইদের গো-বিক্রয় বন্ধ করেন তাহা হইলে কতকপরিমাণে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। আর যদি সমগ্র ভারতবাসী খৃষ্টান, মুসলমান প্রভৃতি সকলেই গোমাংস ত্যাগ করেন, তাহা হইলে গোকুল বর্দ্ধিত হইয়া বিশুদ্ধ ঘৃতের অভাব নিশ্চয় মোচন হইতে পারে। যাহাহউক বিশুদ্ধ ঘৃতের প্রচলনের জন্য দেশবাসীর যে চেষ্টা চলিয়াছে তাহা স্থায়ী হউক। আমাদের চিররুগ্ন-বাঙ্গালী সন্তান বিশুদ্ধ ঘৃতের মর্য্যাদা বুঝিয়া চা-সরবৎ পরিত্যাগপূর্ব্বক নিয়ম পূর্ব্বক প্রতিদিন ঘৃত সেবনে অভ্যস্ত হউন। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রবেত্তাগণ ঘৃতের গুণ বর্ণনে বলিয়া গিয়াছেন,—

ঘৃতং রসায়নং স্বাদু চক্ষুষ্যং বহ্নি দীপনম্
শীতবীর্য্যং বিষালক্ষ্মী পাপপিত্তা নিলাপহম্।
অল্পাভিষ্যন্দি কান্ত্যোজঃ তেজো লাবণ্যবৃদ্ধিকৃৎ
স্বর স্মৃতিকরং মেধামায়ুষ্যং বলকৃদ্ গুরু।

উদাবর্ত্ত জ্বরোন্মাদ শূলানাহ ব্রণান্ হরেৎ।
স্নিগ্ধং কফকরং রুক্ষং ক্ষয় বীসর্প রক্তনুৎ॥

অর্থাৎ ঘৃত রসায়ন, স্বাদু, চক্ষুষ্য, অগ্নি-দীপ্তিকারক, শীতল বীর্য্য, বিষঘ্ন, দারিদ্র্যনাশক, পাপধ্বংসী, পিত্তনাশক, বায়ু শান্তিকারক, অল্প অভিষ্যন্দী, লাবণ্যজনক, ওজোবর্দ্ধক, তেজস্কর, কান্তিকারক, বুদ্ধি উৎপাদক, স্বর বিশোধক, স্মরণশক্তি বৰ্দ্ধক, বায়ু বৃদ্ধিকর, বলকারক, গুরু, স্নিগ্ধ ও শ্লেষ্মাজনক। ঘৃত পান করিলে উদাবর্ত্ত, জ্বর, উন্মাদ, শূল, আনাহ, ব্রণ, উরক্ষত, বীসর্প ও রক্তদোষ উপশমিত হয়।

শাস্ত্রে কথিত স্বাস্থ্যের পক্ষে এরূপ উপকারী দ্রব্যের ব্যবহারে সকলেই অভ্যস্ত হউন—ইহাই আমাদিগের বক্তব্য।

ডাঃ শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাস।

হামজ্বরে কবিরাজ চিকিৎসা।

:o:

গত ফাল্গুন মাসে আমাদের বাড়ীতে একটী মেয়ের হাম হয়। মেয়েটীর বয়স চারি বৎসর। প্রথমে খুব জ্বর হয়। তিন চারি দিন প্রবল ১০২ ডিগ্রি হইতে ১০৫ ডিগ্রি পর্য্যন্ত উঠিতে থাকে। সেই অবস্থায় তিনদিনের পর হাম দেখা দেয়, অনেকক্ষেত্রে প্রবল জ্বর ছাড়িয়া যাওয়ার পর হাম দেখা দেয়। কিন্তু এক্ষেত্রে তাহা না হইয়া জ্বরের উপরই হাম দেখিতে পাওয়া গেল। যখনই হাম দেখা দিল, সেই সময় হইতে পেটের অসুখও আরম্ভ হইল। দিনে রাত্রিতে দশ বার, বার করিয়া মল হইত। মলের রং বিভিন্ন প্রকারের। কখনও সবুজ, কখন হলদে, কখনবা মিশ্রিত রঙের এবং সেই সঙ্গে আমও ছিল এবং ফেণা ফেণা মল হইত। এই ভাবে জ্বর ও পেটের অসুখের উপর হামও ভীষণ মূর্ত্তিতে প্রকাশ পাইতে লাগিল। সমস্ত শরীর লেপিয়া হাম বাহির হইলেও জ্বর এবং পেটের অসুখ কিছুমাত্র কমিল না। বরং সেই সঙ্গে পিপাসা ও গায়ের জ্বালায় কন্যাটী খুব ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। এইরূপ ভাবে পাঁচ ছয় দিন কাটিয়া গেলেও যখন রোগের কিছুমাত্র উপশম বুঝিতে পারা গেল না, তখন একজন ডাক্তার বন্ধুকে ডাকিলাম। তিনি আসিয়া বিশেষ করিয়া দেখিয়া-শুনিয়া ঔষধ দিয়া গেলেন। আমরাও তাঁহার উপর নির্ভর করিয়া সে সময়কার মত নিশ্চিন্ত হইলাম।

বন্ধু ডাক্তারটী তিন চারিদিন চিকিৎসার পর একদিন বলিলেন,—বুকের দক্ষিণদিকে একটু সর্দ্দি বসিয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে। সেজন্য একটু চিন্তার কারণও ইঙ্গিত করিয়া গেলেন। আমরা তো কন্যাটিকে লইয়া বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িলাম। এবং অন্য প্রকার নূতন কিছু ব্যবস্থা না করিয়া পূর্ব্ববৎ ডাক্তারী চিকিৎসা চালাইতে লাগিলাম। তবে ভগবানের কৃপায় ইতিমধ্যে হামগুলি ক্রমশঃ মিশাইয়া যাইতে লাগিল। হামগুলি মিলাইতে লাগিল বটে, কিন্তু আবার এক আগন্তুক রোগ আসিয়া আমাদিগকে

হতাশ করিয়া দিল। ডাক্তার বাবু বলিলেন,—বুকের দুই দিকেই নিউমোনিয়া দেখা দিয়াছে। কন্যাটীকে লইয়া শুধু আমরা নয়, ডাক্তার বাবুও চিন্তিত হইয়া পড়িলেন; তথাপি আমরা তাঁহারই হাতে রোগী রাখিয়া দিয়া ভগবানের করুণায় প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম।

কিন্তু যখন পাঁচ ছয় দিন কাটিয়া গেল, অথচ জ্বর, পেটের অসুখ, পিপাসা, ও নিউমোনিয়া কিছুই কমিল না, তখন আমাদের মনও বিশেষ চঞ্চল হইয়া উঠিল। একদিন বৈকালে কন্যাটী জ্বরের আধিক্যে খুব অভিভূত হইয়া পড়িলে, আমি কলিকাতার একজন বহুদর্শী কবিরাজ মহাশয়ের নিকটে গিয়া কন্যাটীর সমস্ত অবস্থা বলিলাম। তিনি শুনিয়া বলিলেন,—"কাল সকালে দেখিয়া ব্যবস্থা করিব।"

পরদিন কবিরাজ মহাশয় আসিয়া একটী পাচনের ব্যবস্থা করিয়া গেলেন। তখন ডাক্তার বাবুটীও ভাগ্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন,—তিনি বলিলেন;—আমাদের মতে কন্যাটীর বাঁচিবার আশা খুব কম। তদুত্তরে কবিরাজ মহাশয় আমাদিগকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন,—কোন ভয় নাই,—এই পাচনটী খাওয়াইতে থাক ইহাতেই সারিয়া যাইবে—অন্য কোন ঔষধ-পত্র দিতে হইবে না।

কবিরাজ মহাশয় যে পাচনটী বলিয়া দিলেন,—তাহা এই,—যোয়ান, বাবুইতুলসী, মেথী ও সাদা পেঁয়াজ, প্রত্যেকটী আধতোলা পরিমাণে লইয়া ছেঁচিয়া দুইসের জলে সিদ্ধ করিয়া একসের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সেই জল একটু একটু করিয়া পিপাসার সময় অথবা অন্য সময় খাওয়াইতে হইবে। একসের জলে সমস্ত দিন ও রাত্রি চলিবে। সমস্ত না খাইতে পারিলেও ক্ষতি নাই। পথ্য দুধ সাগু।

আমরা যথা নিয়মে উক্ত জিনিস কয়টী সিদ্ধ করিয়া খাওয়াইতে লাগিলাম। প্রথম দিনে পিপাসার আধিক্যে সমস্ত পাচনটাই দিনে রাতে শেষ হইয়া গেল। পরদিন সকালে দেখা গেল, অন্যদিন অপেক্ষা জ্বর কম; রাত্রিতে মলের সংখ্যাও কম হইয়াছিল। এইরূপে একই পাচন আমরা পাঁচ ছয় দিন চালাইয়া গেলাম। দিনের পর দিন কাটার সঙ্গে সঙ্গে—জ্বর, পেটের অসুখ, নিউমোনিয়া, পিপাসা প্রভৃতি সবই কমিয়া গেল। ডাক্তারবাবুও অনুগ্রহ করিয়া প্রতিদিন আসিয়া দেখিয়া যাইতেন। তিনিও কবিরাজী চিকিৎসার—অত্যাশ্চর্য্য ফল দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গেলেন।

তা'রপর আমাদের বাড়ীতে আবার দুইটী ছেলের হাম দেখা দিল। একটীর বয়স দুই বৎসর, অপরটীর বয়স এক বৎসর। এবার প্রথম হইতে উক্ত কবিরাজ মহাশয়কে সংবাদ দিলাম। তখনও হাম বাহির হয় নাই। কেবলমাত্র জ্বর দেখা দিয়াছে। তিনি জ্বর শুনিয়াই হাম হইবে স্থির করিয়া ব্যবস্থা বলিয়া দিলেন,—আধ তোলা আন্দাজ ব্রাহ্মী শাকের রস প্রত্যেক ছেলেটীকে খাওয়াইয়া দাও এবং পথ্য সাগু দাও। এইরূপে তিনদিন প্রাতে একবার করিয়া ব্রাহ্মীশাকের রস খাওয়াইলাম। হামও খুব বাহির হইয়া গেল। কন্যাটীর মত ছেলে দুইটীরও জ্বর, পেটের অসুখ ও অত্যন্ত পিপাসা ছিল। তার মধ্যে ছোটটীর বুকে একটু সর্দ্দি দেখা দিল

এবং চক্ষু দুইটীর মধ্যেও অত্যন্ত হাম দেখা দিল। এবারেও আমরা তিন দিন ব্রাহ্মী শাকের রস দেওয়ার পর কবিরাজ মহাশয়ের আদেশক্রমে পূর্ব্ববৎ,—যোয়ান, বাবুইতুলসী, মেথী ও সাদা পেঁয়াজের জল তৈয়ারী করিয়া খাওয়াইতে লাগিলাম। ভগবানের কৃপায় ছেলে দুইটীও ক্রমশঃ আরোগ্য লাভ করিতে লাগিল।

ছোট ছেলেটীর চোকে যে হাম বাহির হইয়াছিল। সে জন্য তাহার বাম চক্ষুটী হাজিয়া যাওয়ার মত হইল এবং চোকের তারার মনিটার উপর একটা সাদা বিন্দুর মত দাগ দেখা যাইতে লাগিল। যদিও এই ছেলে দুইটীর চিকিৎসা কবিরাজী মতে চলিতেছিল, তথাপি ডাক্তার বন্ধুটী অনুগ্রহ করিয়া প্রত্যহ আসিয়া দেখিয়া যাইতেন। তিনি ছোট ছেলের চোকটী দেখিয়া ভয়ের কারণ বলিয়া গেলেন এবং একজন অভিজ্ঞ চক্ষু চিকিৎসককে ডাকিয়া দেখাইবার ব্যবস্থা করিতে বলিলেন এবং যতক্ষণ না চোকের ডাক্তার আসেন ততক্ষণ দুই তিন ঘণ্টা অন্তর "বোরিক্ এসিড" (ডাক্তারী ঔষধ, সোহাগা হইতে প্রস্তুত) গরম জলে গুলিয়া সেই জলে চোক ধুইয়া দিতে বলিলেন।

ইতিমধ্যে শ্রীযুক্ত কবিরাজ মহাশয়কেও একবার চোকের কথা জানাইলাম। তিনি যষ্টিমধু ও গুলঞ্চ ছেঁচিয়া রস করিয়া সেই রস দিনে তিন চারিবার ফোঁটা ফোঁটা করিয়া চোকে দিতে বলিলেন। এদিকে অভিজ্ঞ চক্ষুচিকিৎসক ডাকিতে এবং তাঁহার আসিতেও দুইদিন বিলম্ব ঘটিয়া গেল। এই দুইদিন আমরা উক্ত যষ্টিমধু ও গুলঞ্চ ছেঁচিয়া রস করিয়া দিতে লাগিলাম। দুইদিন পরে আমার বন্ধু ডাক্তারটী বলিলেন, চোকের অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল। যাহা হউক কবিরাজী ঔষধেই উপকার হইল বলিয়া আমরা আর ডাক্তারী ঔষধ না আনাইয়া ঐ কবিরাজী ব্যবস্থাই চালাইতে লাগিলাম। সপ্তম দিনে দেখা গেল,—চোকের আর কোন প্রকার দোষ নাই, সব সারিয়া গিয়াছে।

তা'রপর আমি বহুস্থলে উক্ত কবিরাজী পাচন প্রয়োগ করিয়া বিশেষ ফল লাভ করিয়াছি। হাম হইবার সম্ভাবনা থাকিলে অথবা সামান্য পরিমাণে হাম দেখা দিলে প্রথম তিন দিন প্রাতে একবার করিয়া ব্রাহ্মীশাকের রস দিতে হয়। তাহাতে ভিতরকার সমস্ত হাম বাহির হইয়া পড়ে। বাহির না হইলেও আর কোন ভয়ের সম্ভাবনা থাকে না। তা'রপর হামের অবস্থায় পেটের অসুখ, জ্বর, সর্দ্দি, কাসি প্রভৃতি যাহাই থাকুক না কেন,—সেই সময়ে যোয়ান, বাবুই তুলসী, মেথী ও সাদা পেঁয়াজ সিদ্ধ জল একটু একটু করিয়া সমস্ত দিন খাওয়াইয়া গেলে সব উপসর্গ ও হাম সারিয়া যাইবে এবং হাম অথবা বসন্ত চোকে বাহির হইলে, যষ্টিমধু ও গুলঞ্চ একটু জল দিয়া ছেঁচিয়া রস বাহির করিয়া চোকে ফোঁটা ফোঁটা করিয়া দিলে চক্ষুও নষ্ট হইবে না।

হাম একটী সাধারণ ব্যাধি। প্রতিবৎসরই উহা একবার করিয়া অনেক গৃহস্থের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসে। সেই সময় আমার লিখিত মত ব্যবস্থা করিয়া সকলেই দেখিতে পারেন। এই প্রসঙ্গে যে পাচনটীর কথা উল্লেখ করা গেল, উহা নির্দ্দোষ ভেষজ। উহা ব্যবহার করিয়া কোন প্রকার কুফল ফলিবে না। অধিকন্তু অল্প সময়ের মধ্যে রোগও সারিয়া যাইবে—ইহা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি।

শ্রীরাখালদাস সেন গুপ্ত।

আয়ুর্ব্বেদ বায়ু।

(তুলনা মূলক আলোচনা)

সে এক স্মরণাতীত যুগের স্বপ্নময়ী কাহিনী। ভারতের সুপবিত্র সাধনা-কুঞ্জ নৈমিষ-কাননে সমবেত ঋষিগণ জরাব্যাধিগ্রস্ত মানবের দুঃখ-কষ্ট মোচনকল্পে যে মহান তথ্য সমূহের আলোচনা করিয়াছিলেন—যে সনাতন চিকিৎসাতন্ত্রের প্রচারদ্বারা ভবিষ্যদ্বংশীয়দের জন্য অমূল্য রত্নপেটিকা সাদরে সঞ্চিত করিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহাই অবলম্বনে বহুশতাব্দীকাল ভারতের সিদ্ধ সাধকগণ অকাল মৃত্যুর কবল হইতে দেশবাসীদিগকে রক্ষা করিয়া তাহাদের ইহকালের ও সঙ্গে সঙ্গে পরকালেরও মঙ্গল বিধান করিয়া গিয়াছেন।

তা'রপর নানারূপ বিরুদ্ধভাবের তরঙ্গতাড়নায়, নানাপ্রকার সামাজিক আন্দোলন ও রাষ্ট্রীয়-বিপ্লব-প্লাবনে ভারতবর্ষ ওলটপালট হইয়া গেল। অত্যাচারের নির্ম্মম পেষণে ক্লিষ্ট—তাচ্ছিল্যের হিমানী প্রবাহে জড়ীভূত ভারত, আপনার অতীত কীর্ত্তির গরিমাময় স্মৃতিটুকুমাত্র আঁকড়াইয়া ধরিয়া নিস্ক্রিয়ভাবে পড়িয়া রহিল। সমগ্র ভারতবর্ষ যখন এমনি অবসাদ ক্লিষ্ট হইয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল, তখন বাঙ্গালার ভাব-সাগরে একটা চাঞ্চল্য পরিলক্ষিত হইল—একটা সুমধুর কলনাদে বাঙ্গালার আকাশ-বাতাস ধ্বনিত হইয়া উঠিল—বাঙ্গালীর অন্তরে একটা প্রবল কর্ম্মস্পৃহা জাগ্রত হইল। তাহারই ফলে বাঙ্গালায় গীতি কবিতার সৃষ্টি হইল—নব্য ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা হইল—আয়ুর্ব্বেদের বিরাট বিবৃতি আরম্ভ হইল।

যে স্পন্দন-প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়া সেই যুগের বাঙ্গালী এমনি জাগ্রত হইয়া এই তিনটি বিষয়কে গৌরবের উচ্চতম সৌধে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল—বাঙ্গালীর ভাগ্যদোষে সে স্পন্দন একেবারে থামিয়া গেল।

বাঙ্গালার সে দিন আর নাই! বাঙ্গালার গীতি কবিতা আর বাঙ্গালীর কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া, প্রাণ আকুল করে না—নবদ্বীপের পুণ্য প্রাঙ্গনের প্রজ্জ্বলিত জ্ঞান প্রদীপ জ্বলিয়া জ্বলিয়া নিবিয়া গিয়াছে। আয়ুর্ব্বেদ বলিতেও কেবল চরক ও সুশ্রুতের কঙ্কাল, মাধবকর ও চক্রদত্ত, বিজয় রক্ষিত ও শ্রীকণ্ঠের প্রাণহীন দেহগুলি জড়াইয়া ধরিয়া দেশমাতৃকার সুসন্তান কতিপয় প্রবীণ চিকিৎসক হিন্দুর গৌরবের এতবড় একটা জিনিষ সাদরে রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন।

আয়ুর্ব্বেদ যে কতবড় উচ্চাঙ্গের চিকিৎসা বিজ্ঞান, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য সুধীবচন উদ্ধৃত করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন হইতে পারে না। শত শত শতাব্দী ধরিয়া এত আবর্ত্তন, বিবর্ত্তন ও পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া আজও যে ইহার স্বাতন্ত্র রক্ষা করিয়া সনাতন শাস্ত্ররূপে পুজিত হইতেছে—ইহাই তাহার শ্রেষ্ঠতার চরম নিদর্শন। কিন্তু মধ্যাহ্ন তপনের উজ্জ্বল আলোক যেমন সঞ্চারমান জলদজালে আবৃত হয়, তেমনি স্বীকার করিতেই হইবে যে, আয়ুর্ব্বেদের গৌরবভাতি আজ ম্লান হইয়া গিয়াছে।

দীর্ঘকালের এই চিকিৎসাতন্ত্রের কোন্ কোন্ অংশে পরিবর্ত্তিত, পরিবর্দ্ধিত ও পরি-

ব্যক্ত হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা অতীব দুরূহ ব্যাপার,—তবে ইহা সুনিশ্চিত যে, আধুনিক গ্রন্থসমূহ ভ্রম-প্রমাদশূন্য নহে। মাঝে মাঝে এমন সব পরস্পর বিরোধী অসংলগ্ন প্রয়োগ লক্ষিত হয় যে, তাহাতে বর্ণিত বিষয়গুলি ত মীমাংসীত হয়ইনা—অধিকন্তু উহাদিগকে প্রহেলিকার মতই দুর্ব্বোধ করিয়া তোলে।

আধুনিক গ্রন্থসমূহে এইরূপ যে সকল ত্রুটি দেখা যায়, তাহার জন্য আয়ুর্ব্বেদ প্রচারকগণ দায়ী নহেন। পূর্ব্বপুরুষদিগের প্রতি ইহার জন্য অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিলে আমাদিগকে নিরয়গামী হইতে হইবে। তাঁহারা রক্ষা করিয়া আসিয়াছিলেন বলিয়া আজও আয়ুর্ব্বেদ বাঁচিয়া আছে—নতুবা ভারতের অন্যান্য বহু অমূল্য রত্নের ন্যায় ইহাও বহুদিন পূর্ব্বে লুপ্ত হইয়া যাইত।

আয়ুর্ব্বেদোক্ত কোন জটীল বিষয় মীমাংসা করিবার চেষ্টার মত ধৃষ্টতা আমার নাই, তবে অধ্যয়নকালে যে সকল প্রশ্নের সদুত্তর না পাইয়া পাশ্চাত্য-চিকিৎসা-বিজ্ঞানের সাহায্য গ্রহণ পূর্ব্বক একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, আয়ুর্ব্বেদের সিদ্ধসাধকগণ সমীপে তাহাই নিবেদন করিতেছি মাত্র। যদি কোন বিজ্ঞ চিকিৎসক কৃপা পূর্ব্বক আমার ভ্রম প্রদর্শন করতঃ বিষয়গুলির যথানুরূপ ব্যাখ্যা করিবার কষ্টস্বীকার করেন, তাহা হইলে এই দীন লেখক্ এবং অন্যান্য বহু আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার্থী তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবেন।

শাস্ত্রকারদিগের মতে 'দোষধাতুমলমূলং হি শরীরম্'। সুতরাং আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার্থীর সর্ব্ব প্রথমেই দোষত্রয়ের সহিত পরিচিত হওয়া আবশ্যক। বাতাদি দোষত্রয়ের মধ্যে বায়ুই সর্ব্বাপেক্ষা বলবান ও সর্ব্বকর্ম্ম নিয়ন্তা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে; সুতরাং বক্ষ্যমান প্রবন্ধে আমরা বায়ুসম্বন্ধেই আলোচনা করিব

"বায়ুস্তন্ত্র যন্ত্রধরঃ প্রাণোদানসমানব্যানাপানাত্মা, প্রবর্ত্তকশ্চেষ্টানাম্......" প্রভৃতি চরক বর্ণিত বায়ুর কার্য্যাবলী পর্য্যালোচনা করিলে পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ—ব্যাখ্যাত 'নার্ভের' ক্রিয়ার অনুরূপ বলিয়াই মনে হয়। আমাদের এই ধারণা যে নিতান্ত অমূলক নহে তাহাই দেখাইবার জন্য তুলনা-মূলক আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। বলা আবশ্যক যে, পশ্চাত্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানের তুলাদণ্ডে ওজন করিয়া আমরা আয়ুর্ব্বেদের মূল্য নিরূপন করিতে প্রবৃত্ত হই নাই। বিদেশীয় পণ্ডিত দিগের নব-লব্ধ-জ্ঞানালোকের সাহায্যে অধুনাতন কুহেলিকা সমাচ্ছন্ন আর্য্যরত্নরাজি সন্ধানের প্রয়াস পাইয়াছি। প্রতীচ্যবুধমণ্ডলীর সাধনার ফল এত তুচ্ছ ও এত অকিঞ্চিৎকর নয় যে, আমরা তাহার দিকে ফিরিয়াও চাহিবনা। চিকিৎসা-বিজ্ঞানে উন্নতিলাভ করিয়া প্রতীচির পণ্ডিতগণ যে, আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের জ্ঞানসীমা অতিক্রম করিয়া বহুদূরে অগ্রসর হইয়াছেন, এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই; তবে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, শরীর ও শরীরতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহাদের গবেষণা গভীর ও ব্যাপক। যাহা হউক, ঋষিগণ শারীর বায়ুকে পঞ্চধা বিভক্ত করিয়া তাহাদের যে সকল কার্য্য নিরূপণ করিয়া গিয়াছেন একণে আমরা তাহার সহিত প্রতীচ্য মতের সামঞ্জস্য দেখাইবার চেষ্টা করিব।

১। প্রাণবায়ু।—চরক প্রাণবায়ুর স্থান মস্তক, কর্ণ, জিহ্বা মুখ ও নাসিকা এবং তাহার কার্য্য "ষ্ঠীবনক্ষবথূদ্গার শ্বাসাহারাদি কর্ম্মচ" বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন মহাশয় প্রাণবায়ুকে অম্লজান বাহক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।* পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ ষ্ঠীবন প্রভৃতি কার্য্য নিম্নলিখিত ভাবে সম্পন্ন হয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন :—

(ক) ষ্ঠীবন—Chorda Iympanii নামক মস্তিষ্কাভ্যন্তরস্থ "নার্ভ"-কেন্দ্রের উত্তেজনা বশতঃ সম্পন্ন হইয়া থাকে। কখনও কখনও ঘ্রানস্বাদের প্রতিক্রিয়া-জনিত কার্য্যের (Reflex action) দ্বারা সম্পাদিত হয়। যেমন দূষিত গন্ধ আঘ্রান করিলে অথবা বিরস দ্রব্য রসনাসংস্পর্শে আনয়ন করিলে নিষ্ঠীবন পরিত্যাগ করিতে হয়।

(খ) ক্ষবথু—নাসারন্ধ্রের কলা সমূহ উত্তেজিত হইয়া Superior Laryngeal ও vagus ফুস্‌ফুসের বায়ু সশব্দে নির্গত করে। এই বায়ুর সহিত শ্লেষ্মাও নির্গত হয়।

(গ) উদ্গার—বমনের বাচক শব্দ। কণ্ঠনালীর উত্তেজনা বশতঃ Fifth nerve ও Glosso-pharyngeal নার্ভদ্বয় উদ্রিক্ত হইয়া উদরের মাংসপেশী-সমূহের আকুঞ্চন দ্বারা পক্বাশয়ের দূষিত দ্রব্যের সঞ্চার হইলে Vagus নার্ভ দ্বারা বমন কার্য্য সম্পাদিত হয়। কখন কখন মস্তিষ্কের (Vomitting centre in the medulla) উত্তেজিত হইয়া বমন করায়। যেমন কোন ঘৃণাজনক পদার্থ দেখিলেই আমরা বমন করি। এখানে সাক্ষাৎভাবে পক্বাশয় অথবা উদরে মাংসপেশী সমূহের সঙ্কোচ হয়না। দুষ্ট পদার্থ আমাদের মনে যে ঘৃণার ভাব জাগাইয়া দেয়, তাহাই Vomitting centre কে উদ্রিক্ত করিয়া বমন করায়।

(ঘ) শ্বাস—ফুস্‌ফুসের নিজের আকুঞ্চন প্রসারনের শক্তি নাই। বক্ষ ও উদরের মাংসপেশী সমূহের আকুঞ্চনপ্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে ফুস্‌ফুস কুঞ্চিত ও প্রসারিত হইয়া থাকে। (The movements of the hug are therefore passive, not active, and depend upon the changes of shape of the closed cavity in which they are contained—Halliburton.)

Vagus, Splanchuick এবং Glosso-pharyngeal নামক নার্ভ'এর শ্বাস প্রশ্বাস কার্য্য সম্পন্ন করে।

(ঙ) আহার—অন্ন চর্ব্বণ ও অধঃকরণের সমবেত কার্য্যদ্বারা আহারক্রিয়া সম্পাদিত হয়। 5th Nerve, Glosspharyngeal Sup—Laryngeal এবং Hypoglossas 'নার্ভের' সাহায্যে খাদ্য দ্রব্য চর্ব্বিত হয়। চর্ব্বিত অন্ন অধঃকরণকালে যাহাতে নাসিকা বা ফুস্‌ফুস-পথে প্রবেশ না করে, তজ্জন্য উপজিহ্বা দ্বারা এই দুই ছিদ্র-পথ রুদ্ধ হইয়া যায় এবং অন্ননালীর আকুঞ্চন দ্বারা উহা পক্বাশয়ে পতিত হয়।

উপযুক্ত কার্য্যাবলী পর্য্যালোচনা করতঃ

* শরীর প্রত্যঙ্গাবলিনীভূতং হি শোণিতং ফুস্‌ফুসপ্রচারেণ প্রাণবায়ুসমানীত বিষ্ণুপদামৃত (oxygen) সংযোগাৎ শুদ্ধীভূতং হৃদয়েন বিক্ষিপ্যতে সর্ব্বতো ধমনীভিঃ—প্রত্যক্ষ শারীরম্।

আমরা দেখিতে পাইলাম যে, মস্তিষ্কাভ্যন্তরস্থ 4th Ventricle নামক স্থান কতগুলি 'নার্ভ' বাহির হইয়া শীর্ষোরঃ কর্ণ জিহ্বাগ্রে নাসিকায় ব্যাপ্ত হইয়া "জীবনরক্ষার্থ শ্বাসাহারাদি কর্ম্ম" সম্পাদন করে।

উদান বায়ু।—চরকে উদান বায়ুর স্থান "নাভ্যুরঃ কণ্ঠ" এবং তাহারকার্য্য 'বাক্‌প্রবৃত্তি প্রযত্নোর্জ্জবল বর্ণাদি কর্ম্ম' বলিয়া বিবৃত হইয়াছে। সুশ্রুতে 'প্রযত্নোর্জ্জ' বল বর্ণাদির উল্লেখ নাই। সুশ্রুতের মতে উদান বায়ু "ভাষিতগীতাদিবিশেষোঽভি-প্রবর্ত্ততে।"

পশ্চাত্য মতে মস্তিষ্ক স্থিতবাক্‌কেন্দ্রে (Speech Sup. Laryngeal ও vagus প্রবৃত্তির উদ্রেক হয় এবং 'নার্ভদ্বয়ের কার্য্যদ্বারা স্বর যন্ত্র ও উদরের মাংস পেশীর সঙ্কোচ-জনিত নিঃসৃত-বায়ুই শব্দে সৃষ্টি করে। বাক্‌কেন্দ্র কোনরূপে নিষ্ক্রিয় করিয়া ফেলিলে মানব-মূকত্ব প্রাপ্ত হয়। বাদকের চেষ্টা—যন্ত্র এবং বায়ু নির্গমের সমবেত কার্য্য দ্বারা যেরূপ বংশীবাদন সম্পন্ন হয় তেমনি বক্তার ইচ্ছা—স্বরযন্ত্র ও উদরের পেশীসমূহের সমবেত কার্য্যদ্বারা বাক্য নির্গত হয়। বায়ুকে স্বরযন্ত্র দিয়া বাহির করিতে হইলে নাভির উপরের মাংসপেশী সমূহ এবং মহাপ্রচারিকা পেশীর (Diaphgram) আকুঞ্চন আবশ্যক। এই সকল মাংসপেশীর কার্য্য তত্তৎ স্থানের নার্ভ সমূহের কার্য্য ব্যতীত সম্পাদিত হইতে পারে না। সুতরাং 'নাভ্যুরঃ কণ্ঠ' দেশের নার্ভের সাহায্যে 'ভাষিত গীতাদি' সম্পন্ন হয়।

৩। সমান বায়ু।—সমান বায়ুর স্থান আমাশয় ও পক্বাশয়। অন্নপাক ও পুষ্টিকর রস সমূহ এবং মূত্রপুরীষাদি যথাস্থানে প্রেরণ করা সমান বায়ুর কার্য্য। প্রতীচ্য পণ্ডিতগণের মতে ভুক্ত অন্ন পক্বাশয়ে প্রবেশ করিলে পক্বাশয়ের ঊর্দ্ধ ও অধঃ প্রদেশের ছিদ্রদ্বয় রুদ্ধ হইয়া যায় এবং পক্বাশয়ের সূক্ষ্ম পেশী সমূহ সঙ্কুচিত হইয়া ভুক্তদ্রব্যকে মৃদু পেষণ করে। অন্ন চর্ব্বণ ও অধঃকরণের সঙ্গে সঙ্গে পক্বাশয়ে Pepsin Hydrochoric acid' নামক এক প্রকার অম্ল-দ্রাবক রস ক্ষরিত হয়। এই দ্রাবক রস পক্বাশয়স্থ অন্ন কিয়ৎপরিমাণে জীর্ণ করে। অন্ন অর্দ্ধ জীর্ণ হইলে পক্বাশয়ের অধঃ দেশস্থ ছিদ্র উন্মুক্ত হয় এবং অর্দ্ধ জীর্ণান্ন আমাশয়ের ক্ষুদ্রান্ত্রে প্রবেশ করে। এই স্থানে অন্ন কিমে (clyle) পরিণত হইয়া Thorocic duel নামক প্রণালী বহিয়া রক্তের সহিত মিশ্রিত হয় এবং খাদ্যের অজীর্ণাংশ পুরীষে পরিণত হইয়া স্থূলান্ত্রে জমিয়া থাকে। (kidney) নামক যন্ত্র রক্ত হইতে মূত্র পৃথক করিয়া লয়। (The main function of the kidneys is to seperate the urine from the blood) পক্বাশয় ও আমাশয়ের এই সমস্ত কার্য্য vagus ও solar Plexus নামক Sympathetic nerves কর্ত্তৃক সম্পাদিত হয়। পাশ্চাত্য শারীরতত্ত্ববিদ্‌ পণ্ডিতগণ Solar Plexus কে Abdominal Brain (উদরের কর্ম্মকেন্দ্র) বলিয়া বর্ণনা করিয়া উহার স্থান পক্বাশয়ের পশ্চাতে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। চরকে সমানবায়ু স্বেদ, দোষ ও অম্বুবাহী বলিয়া কথিত হইয়াছে। Sympathetic নার্ভের বিকৃতিবশতঃ ঘর্ম্ম নির্গমের যে ব্যাঘাত ও ব্যতিক্রম হয়, তাহা প্রতীচ্য চিকিৎসকগণও স্বীকার করেন (...increase of temi

perature on the same side, alteration of the sweat secretion on the side, sometimes dimunition at other even an increase.) সুতরাং এক্ষেত্রেও সমান বায়ুর স্থান ও কার্য্যের সহিত পাশ্চাত্য নার্ভকেন্দ্র ও তাহাদের কার্য্যাবলীর সহিত কোন অসামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয় না।

৪। ব্যান বায়ু।—ব্যান বায়ু "দেহং ব্যাপ্নোতি সর্ব্বস্তু' এবং উহার কার্য্য গতি, প্রসারণ, আক্ষেপ ও নিমেষাদি ক্রিয়া। পাশ্চাত্যমতে শরীরের যাবতীয় কার্য্যই ত্রিবিধ নার্ভ-ক্রিয়াদ্বারা সম্পাদিত হয় (ক) Efferent (খ) Afferent ও (গ) Reflex অথবা প্রতিক্রিয়া জনিত কার্য্য পুনরায় Excito motor Excito-secretory Excito-accelerator এবং Excito Inhibitory—এই চারি প্রকারে কার্য্য করে। শেষোক্ত দুই প্রকার প্রতিক্রিয়া জনিত কার্য্যের উপর আমাদের "নাড়ী" বিজ্ঞানের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। রক্তবাহী প্রণালী সমূহ (arteries and veins) sympathetic nerves দ্বারা চালিত ও পুষ্ট হইয়া থাকে, প্রতীচ্যবুধমণ্ডলী এ বিষয় জ্ঞাত থাকিলেও, আর্য্য চিকিৎসকদিগের ন্যায় তাঁহারা এ সম্বন্ধে এখনো যে পূর্ণজ্ঞান লাভ করিতে পারেন নাই, তাহা তাঁহারাই স্বীকার করিয়াছেন। (Morbid his to logical changes, such as atrophy, pigmentary or patty deegenarations fibrosis and homorrohage, have been found in the ganglia of the sympathetic system, but little appears to be known of definite association between such changes and functional disturbauces or symptoms as a consequence —Joylor) সুতরাং গতিপ্রসারণ, আক্ষেপ, নিমেষাদি ক্রিয়া যে নার্ভদ্বারা সম্পাদিত হয় এবং ঐ সকল নার্ভ যে সর্ব্বদেহে ব্যাপ্ত রহিয়াছে সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। এখানেও ব্যান বায়ু ও Motor sensory নার্ভ সমূহের কার্য্যাবলীতে কোন পার্থক্য দেখা যায় না।

৫। অপান বায়ু।—অপান বায়ুর স্থান "বৃষণৌ বস্তি মেঢ়ুঞ্চ নাভ্যূরূ বংক্ষনৈ গুদম্" এবং তাহার কার্য্য শুক্র, মূত্র, পুরীষ, গর্ভ ও আর্ত্তব পরিত্যাগ করা। পাশ্চাত্য মতে মূত্র, পুরীষ ত্যাগ প্রভৃতি কখনো কখনো volition বা স্বতঃপ্রবৃত্তির দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। শিশুদিগের মূত্র, বিষ্ঠাত্যাগ, ক্রিমি অথবা অন্য কোন দ্রব্যের উত্তেজনার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ সম্পন্ন হয় (It also may be reflexly in children, who suffer from intestical worms, or other such irritation—Hallsburton) সাধারণতঃ শুক্র, মূত্র, পুরীষ, গর্ভ ও আর্ত্তব নির্গমের মার্গসমূহের মাংসপেশীগুলির আকুঞ্চনের দ্বারা উহারা নির্গত হইয়া থাকে। Lower dorsals, upper hunbers, sympathetics, Hypogastric, pudic ও sacoral নার্ভ সমূহ সাক্ষাৎভাবে মূত্র পুরীষ প্রভৃতি নির্গমের সাহায্য করে। উহাদের স্থান "বৃষণৌ বস্তি'..." ইত্যাদি। সুতরাং প্রকৃত প্রস্তাবে এখানেও প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মতের কোন বিরোধ বা ব্যতিক্রম দেখা যায় না। (ক্রমশঃ)

কবিরাজ শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত।

আজকাল কাস রোগের এত আধিক্য কেন ?

আয়ুর তত্ত্বজ্ঞান অর্থাৎ স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ক গুহ্য তত্ব সমূহ একমাত্র আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রেই আছে। ইহা তন্ত্রোক্ত শাস্ত্র এবং অথর্ব্ব ও যজুর্ব্বেদের অংশ। ভরদ্বাজ, বশিষ্ঠ, কশ্যপ, অত্রি প্রভৃতি ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণ ব্যাধি প্রপীড়িত জন সমূহের মঙ্গলার্থে ভারতবর্ষেই ইহা প্রথম প্রচার করেন। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে ব্যাধি চতুর্ব্বিধ,—যথা দোষজ, কর্ম্মজ, কুলজ ও পাপজ। দোষজ অর্থাৎ ইহ জন্মে পাপাচার জনিত বাতাদি দোষের প্রকোপ হেতু যে ব্যাধি। কর্ম্মজ অর্থাৎ ইহ জন্মে নিজকর্ম্ম দোষে অর্থাৎ জ্ঞানকৃত পাপাচরণ হেতু যে ব্যাধি। কুলজ অর্থাৎ বংশ পরম্পরা ক্রমে যে ব্যাধির উৎপত্তি। আর পাপজ অর্থাৎ পূর্ব্বজন্মের অপরাধ হেতু যে ব্যাধি। এই চতুর্ব্বিধ কারণে রোগোৎপত্তি হইয়া থাকে। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে মহাদেবকে (মহারুদ্রকে) সংহার কর্ত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই মহারুদ্রদেবের ক্রোধজনিত নিশ্বাস হইতে অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অসংখ্য রুদ্রানুচর উৎপন্ন হইয়া ব্যাধিরূপে পৃথিবীর সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিতেছে এবং অধর্ম্মাচারীদিগকে শাস্তি দিতেছে ও নাশ করিতেছে। তাই যজুর্ব্বেদে রুদ্রাধ্যায়ে উক্ত আছে যে "অসংখ্যাতা সহস্রানি যে রুদ্রা আধিভূম্যাম্। তেষাং সহস্র যোজনে অবধন্বানি তন্মসি" ইত্যাদি। অর্থাৎ হে ভগবন্, যে সকল অসংখ্য অসংখ্য অমঙ্গলময় রুদ্র মৃত্তিকার উপর (পৃথিবীতে) বিচরণ করিতেছে, আমরা যেন তাঁহাদিগের নিকট হইতে সহস্র যোজন দূরে থাকি। এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রুদ্রানুচর বা (সংহার বীজের) সহিত ডাক্তারদিগের বীজানুর কতকটা সাদৃশ্য আছে বলিয়া বোধ হয়। পাশ্চাত্য-বিজ্ঞানবিদ ডাক্তারদিগের মতেও অধিকাংশ রোগই বীজানু সমুদ্ভূত। আর আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের মতে পৃথিবী অধর্ম্ম বহুল হইলেই রুদ্রানুচরেরা অধর্ম্মচারীদিগকে বায়ু, জল, আকাশ প্রভৃতি নানামূর্ত্তি ধারণ করিয়া ধ্বংস করিয়া থাকেন। এজন্য আর্য্য ঋষিগণ, অযথা আহার-বিহার নিবারণ কল্পে শাস্ত্রের দোহাই দিয়া (অর্থাৎ অমুক তিথিতে অমুক দ্রব্য ভক্ষণ করিলে ব্রহ্মহত্যা পাতকগ্রস্ত হইতে হয় ইত্যাদি) সমুদায় কার্য্যই শুদ্ধাচার সম্পন্ন হইয়া নির্ব্বাহ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। এইজন্য আর্য্যগণ স্নান, পান, ভোজন, শয়ন প্রভৃতি সর্ব্ববিষয়েই সেকালে শুদ্ধাচার সম্পন্ন থাকিতেন, এবং স্পর্শাক্রামক রোগের ভয়ে নীচ জাতির কথা দূরে থাকুক, স্বজাতি ভিন্ন কোনও জাতির সহিত একাসনে উপবেশন করিতেন না, এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, শুদ্ধসত্বতা ও নিষ্ঠাবান থাকিয়া সমুদায় কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণ অধিকাংশ রোগই যে সংক্রামক, এ তথ্য জ্ঞাত ছিলেন বলিয়াই সংস্পর্শ দোষ ও শুদ্ধাচারের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে উপদেশ দিয়াছেন। আর এক্ষণে পাশ্চাত্য-বিজ্ঞানবিদ-ডাক্তারেরা চিকিৎসা বিজ্ঞান অপেক্ষা (হাইজিন) স্বাস্থ্য-

বিজ্ঞানেই বিশেষ মনোযোগী হইয়াছেন। ডাক্তারদিগের মতে সর্দ্দি-কাসি-নিউমোনিয়া প্রভৃতির বীজানু সর্ব্বদাই দেহ মধ্যে অবস্থান করিতেছে। আয়ুর্ব্বেদ মতে "প্রতিশ্যায়াদথোকাসঃ কাসাৎ সংজায়তে ক্ষয়ঃ।" উপেক্ষিত হইলে প্রতিশ্যায় অর্থাৎ নাসাস্রাব (সর্দ্দি) হইতে কাস এবং কাস হইতে ক্ষয়রোগ জন্মিয়া থাকে। কিন্তু হায়, কালস্রোতে আমাদিগের কি অধঃপতনই হইয়াছে! পেটের দায়ে অর্থোপার্জ্জনের জন্য আমরা এক্ষণে আহার, বিহার, শয়ন, উপবেশন প্রভৃতি সর্ব্ববিষয়েই নানা জাতীয় লোকের সংস্পর্শে থাকিয়া স্পর্শাক্রামক ব্যাধি সকল দ্বারা আক্রান্ত হইতেছি। ডাক্তারদিগের মতে লোক সংখ্যা যেখানে অধিক, তথায় বীজানু সংখ্যাও অধিক, এবং রোগ-বীজানু রোগী-দেহ হইতে সুস্থ ব্যক্তির দেহে সংক্রামিত হইয়া থাকে। আর আমাদিগের মতে অল্পস্থানে অধিক লোকের অবস্থান ও নানা জাতীয় লোকের সহিত সহবাসহেতু সংস্পর্শ দোষই কাস রোগের প্রধান কারণ, দ্বিতীয় কারণ বদ্ধ বায়ুতে অবস্থান, তৃতীয় কারণ চাকুরির জন্য অসময়ে ও অযথা আহার। এইজন্য কলিকাতা মহানগরীতে কাসরোগের এত আধিক্য দেখা যায়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিদ্ ডাক্তারদিগের মতে অধিকাংশ রোগই বীজানু সমুদ্ভূত। এই বীজানু আবার দুই অংশে বিভক্ত, জীবানু ও উদ্ভিজ্জানু। প্রাণীদেহের ন্যায় উদ্ভিদ-দেহও অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষ দ্বারা গঠিত। ম্যালেরিয়া প্রভৃতি কয়েকপ্রকার রোগ শুদ্ধ জীবানু কর্ত্তৃক উৎপন্ন। উদ্ভিজ্জানু হইতে অধিকাংশ রোগোৎপত্তি হইয়া থাকে। এই বীজানু দ্বারা আকাশ, বায়ু, জল প্রভৃতি পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্রই পূর্ণ। তবে যে স্থানে জল সংখ্যা অধিক, তথায় বীজানুর সংখ্যাও অধিক। এই বীজানু শ্বাস-প্রশ্বাস, পানীয় জল, আহার্য্যসামগ্রী, ধূলিকণা এবং মশামাছি ইত্যাদি দ্বারা মনুষ্যদেহে প্রবেশ করে। তবে সকল প্রকার বীজানু রোগোৎপাদন করে না। রোগোৎপাদনকারী বীজানু সংখ্যা অল্প। মানবদেহে দেহস্থ রসের এবং কোষ সমূহেরও বীজানু নাশক ক্ষমতা আছে, এজন্য সর্ব্বদা রোগাক্রমণ করিতে পারে না। কিন্তু কোন কারণ বশতঃ শরীরস্থ রোগ-প্রতিষেধক শক্তির হ্রাস হইলে, অর্থাৎ শারীরিক অত্যাচারবশতঃ বা অত্যধিক ইন্দ্রিয়সেবা বশতঃ অতিরিক্ত পরিশ্রম বা ব্যায়াম বশতঃ, অত্যধিক মানসিক পরিশ্রম বশতঃ এবং রাত্রি জাগরণ, অনুপযুক্ত আহার, রুদ্ধগৃহে অবস্থান, উদ্বেগ, ভয় ও মানসিক অবসন্নতা প্রভৃতি কারণে কোষ সমূহের বীজানু নাশক ক্ষমতার হ্রাস হইলে রোগোৎপত্তি হইয়া থাকে। সাধারণতঃ রোগ-বীজানু রোগীর দেহ হইতে সুস্থ ব্যক্তির দেহে সংক্রামিত হইয়া থাকে, এইজন্য রোগীর ব্যবহৃত বস্ত্রাদি, আহার্য্য-পাত্র প্রভৃতি ব্যবহার করা উচিত নহে। অধিক কি—রোগীর মল, মূত্র, থুথু, কফ, বমিত পদার্থ, এমন কি নখ লোমাদি কর্ত্তিত পদার্থের সহিত তাহার শরীরের অসংখ্য বীজানু নির্গত হইয়া দেহান্তরে আশ্রয় গ্রহণ করে। এইজন্য পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিদ ডাক্তারেরা আজকাল চিকিৎসা-বিজ্ঞান ছাড়িয়া স্বাস্থ্যবিজ্ঞানেই বিশেষ মনোযোগী হইয়াছেন। অর্থাৎ সুস্থাবস্থায়, কিরূপ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা

আবশ্যক, কিরূপ আচার ব্যবহারে থাকা কর্ত্তব্য, কিরূপ জলবায়ু ব্যবহার্য্য, কিরূপ আহারাদি আবশ্যক ও শ্রেয়স্কর এবং কিরূপ লোক সমূহের সংস্পর্শ ত্যাগ করা সর্ব্বতো-ভাবে কর্ত্তব্য ইত্যাদি বিষয়ের তথ্যানু-সন্ধানেই অধিকভাবে মনোযোগ প্রদান করিয়াছেন। ইঁহাদিগের মতে সর্দ্দি-কাসি-নিউমোনিয়া প্রভৃতি বীজাণু সর্ব্বদাই দেহ মধ্যে অবস্থান করিতেছে। হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিয়া বা অন্য কোন কারণবশতঃ দেহের রোগপ্রতিষেধক ক্ষমতার হ্রাস হইলেই কাস রোগোৎপত্তি হইয়া থাকে। *

শ্রীশশিভূষণ গুপ্ত।

আয়ুর্ব্বেদ-সমস্যা।

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধসমূহের ফল যেরূপ শাস্ত্রে বর্ণিত আছে, আজকাল অনেক ঔষধেই তাহার কিয়ৎপরিমাণও প্রত্যক্ষীভূত হয়না দেখিয়া, আমার মনে কতগুলি গুরুতর সমস্যার উদয় হইয়াছে। যে সর্ব্বরোগহর মহৌষধ জরামরণনাশন, তাহা অবিশ্রান্ত সেবন করিয়া আমরা সামান্য ব্যাধির উৎ-পীড়ন হইতেও অব্যাহতি পাইতেছিনা, এবং যে পরম রসায়নের প্রভাবে বিগতেন্দ্রিয় চ্যবন মুনি "সুবৃদ্ধোঽভূত পুনর্য্বা", তাহা অবিরত উদরস্থ করিয়া যৌবনেও আমরা আমাদের সামান্য শক্তিটুকু পর্য্যন্ত কয়েক দিন মাত্র অব্যাহত রাখিতে পারিতেছি না, এতদপেক্ষা বিস্ময় ও পরিতাপের বিষয় আর কিছু হইতে পারে কি! এই বৈচিত্র্যের নিশ্চয়ই কোন গূঢ় কারণ বিদ্যমান আছে। আর্য্যঋষির উক্তি যদি প্রমত্তের প্রলাপ না হয়, তাহা হইলে আমরা যে এখন ঠিক সেই ঔষধই পাইতেছি, অথচ উহাতে পূর্ব্ববৎ সুফললাভ হইতেছে না, এমন কথা কখনই অকুণ্ঠিতচিত্তে স্বীকার করিতে পারা যায় না। সত্য বটে, বর্ত্তমান সময়ে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার ফল যতটুকু দেখা যায়, তাহাও অনেকস্থলে অন্যান্য চিকিৎসা-প্রণালী অপেক্ষা

* সংস্পর্শ দোষই সংক্রামক রোগ বৃদ্ধির কারণ। এক হুঁকায় তামাকু সেবন, এক পেয়ালায় চা পান—এ সকল কারণেও যে দেশে কাস রোগের আধিক্য ঘটিতেছে না, তাহাই বা কে বলিতে পারে? ইতঃপূর্ব্বে আমাদের "কাজের কথা" শীর্ষক প্রবন্ধে আমরা এ সকল কথার উল্লেখ করিয়াছি। সিগারেটের প্রচলনাধিক্যও কাসরোগ বাড়িবার একটি কারণ। আমাদের এই যুক্তির সহিত মাধবের কাস নিদানের ও মতানৈক্য নাই। মাধব ত বলিয়াই গিয়াছেন,—

"ধূমোপঘাতাদ্রজসস্তথৈব ব্যায়াম রুক্ষান্ন নিষেবণাচ্চ
বিমার্গগত্বাচ্চ হি ভোজনস্য বেগাবরোধাৎ ক্ষবথোস্তথৈব।"

—আং সং

অধিক; কিন্তু আমার মনে হয়, আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধগুলি যদি যথোচিত ফলবিধানে সমর্থ হইত, তাহা হইলে তাহাদের আশ্চর্য্য প্রতীকার-শক্তি দর্শনে নিশ্চয়ই জগদ্বাসী স্তম্ভিত হইয়া যাইতেন।

অবশ্য কালধর্ম্মে বনজ ভেষজাদির কথঞ্চিৎ হীনবীর্য্য হওয়ার আশঙ্কা একেবারে অমূলক নহে; কিন্তু দ্রব্যাদির শক্তি কথঞ্চিৎ হ্রাসপ্রাপ্ত হইলেও তন্নিমিত্ত ফলের এত পার্থক্য কখনই সংঘটিত হইতে পারে না। অধিকন্তু, কালধর্ম্মের প্রভাব হইতে যখন আমরাও অব্যাহতি পাই নাই, তখন দ্রব্যাদির এই শক্তিহীনতা আমাদের তত ক্ষতির কারণ না ও হইতে পারে। বিগত কয়েক বৎসর যাবত আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধের প্রস্তুত-প্রণালী সম্বন্ধে সন্ধান লইয়া আমি যে সকল বৈচিত্র্যের পরিচয় পাইয়াছি, আমার বিশ্বাস, ঔষধের ফলহানির নিমিত্ত তাহাই প্রধানতঃ দায়ী; সুতরাং আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার উন্নতির নিমিত্ত সে সকল গোলযোগের মীমাংসা করিয়া, ঔষধপ্রস্তুতের প্রকৃতপ্রণালী-প্রচারই আমি এখন আয়ুর্ব্বেদ-হিতৈষিগণের প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি। এ সম্বন্ধে বহু বিষয়েরই আলোচনা করা আবশ্যক হইলেও, প্রধানতঃ যে সকল ব্যাপারে আয়ুর্ব্বেদব্যবসায়িগণের এবং দেশবাসী সর্ব্বসাধারণের সমান স্বার্থ বিজড়িত রহিয়াছে, তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমি নিম্নলিখিত বিষয় কয়টী মাত্র সংক্ষেপে আলোচনা করিতেছি:—১। ঔষধার্থ ব্যবহৃত ভেষজাদি, ২। মান-পরিভাষা, ৩। ঔষধের মাত্রা, ৪। ঔষধের উপাদান-বৈষম্য, ৫। ঔষধ-প্রস্তুত-প্রণালী, ৬। জারিত ধাতু, ৭। ঘৃত, ৮। মকরধ্বজ ও স্বর্ণসিন্দূর, ৯। চ্যবনপ্রাশ।

ঔষধার্থ ব্যবহৃত ভেষজাদি

—ঔষধ-প্রস্তুতের জন্য যে সকল দ্রব্য গৃহীত হয়, তৎসম্বন্ধে নানাপ্রকার গোলযোগ দৃষ্ট হইয়া থাকে। উপযুক্ত অভিজ্ঞতার অভাবে এখন অনেক আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকই উদ্ভিজ্জ ও খনিজ ভেষজাদি নিঃসংশয়িতরূপে চিনিতে সক্ষম নহেন; কাজেই ঔষধ-সরবরাহ-কারী "বেদে" ও "বেণে"দিগের উপর এ নিমিত্ত তাঁহাদিগকে নির্ভর করিতে হয়। এই বেদে এবং বেণেরা যে সকল সময় প্রকৃত জিনিষ আহরণ করিয়া থাকে, এমন কথা বোধ হয় কেহই শপথ করিয়া বলিতে প্রস্তুত হইবেন না।

ঔষধার্থ গৃহীত দ্রব্যাদির কথাই আমার এস্থলে বিশেষভাবে আলোচ্য। সকলেই জানেন, শার্ঙ্গধর বলিয়াছেন—

"শুষ্কং নবীনং যৎ দ্রব্যং যোজ্যং সকলকর্ম্মসু"।
"গুড়ূচী কুটজো বাসা কুষ্মাণ্ডশ্চ শতাবরী,
অশ্বগন্ধ সহচরৌ শতপুষ্পা প্রসারণী।
প্রযোক্তব্যা সদৈবার্দ্রা।"

সুতরাং শার্ঙ্গধরের মতে গুড়ূচী, কুটজ প্রভৃতি দশটী, এবং মতান্তরে "বাসানিম্বপটোলকেতকি" প্রভৃতি বচনানুসারে বাসকাদি উনিশটী দ্রব্য ব্যতীত ঔষধার্থ ব্যবহার্য্য অপর সমস্ত দ্রব্যই "নবীন অথচ শুষ্ক" হওয়া আবশ্যক। "শুষ্কদ্রব্যস্য যা মাত্রা আর্দ্রস্য দ্বিগুণা হি সা" এই বচন যে কেবল নিতান্ত প্রয়োজনের সময় অভাবপক্ষেই প্রযোক্তব্য, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই; বিভিন্ন ঔষধ সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন কাল নির্দ্দিষ্ট হওয়াতেই শাস্ত্রকার-

গণের উক্ত উদ্দেশ্য উত্তম রূপে উপলব্ধি করা যাইতে পারে। কিন্তু আমি বহু স্থলে দেখিয়াছি, উল্লিখিত তালিকার বহির্ভূত অনেক দ্রব্য কাঁচা অবস্থায়ই ঔষধে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, এবং কোন কোন প্রধান চিকিৎসকও আমাকে বলিয়াছেন যে, কাঁচা জিনিষই নাকি অধিকতর ফলপ্রদ। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দশমূলের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। দশমূলে মূলের পরিবর্ত্তে অনেক স্থলে যে কেবল বল্কলই প্রদত্ত হয়, এমন নহে, ঐ সকল দ্রব্যাদি উল্লিখিত তালিকার অন্তর্ভূত না হইলেও বেল, শোণা, গণিয়ারী, শালপানি প্রভৃতি প্রায় সকলই কাঁচা গৃহীত হইতে দেখা গিয়া থাকে। তা'রপর, যে কয়েটী জিনিষ কাঁচা ব্যবহার করার কথা উল্লিখিত বচনে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহার মধ্যেও যে কোন কোন জিনিষ শুষ্কই গ্রহণ করা হয়, অশ্বগন্ধাই তাহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। এতদ্ব্যতীত বেণেরা যে সকল বনজ ভেষজের সরবরাহকারী, সে সকল অতিশুষ্ক দ্রব্যের "নবীনত্বের" সীমা কোথায়, তাহা বোধ হয় কোন আয়ুর্ব্বেদব্যবসায়ীরই অবিদিত নহে। বেণের দোকানে ঐ সকল দ্রব্যাদি কিভাবে রক্ষিত হয়, তাহাও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। শিক্ষিত আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক ভেষজসরবরাহের ভার স্বহস্তে গ্রহণ না করিলে ইহার সমুচিতপ্রতিকারের আশা সুদূরপরাহত। এইরূপে শুষ্কদ্রব্যের স্থলে কাঁচা জিনিষ, কাঁচার স্থলে শুষ্ক পদার্থ ও অতিপুরাতন শুষ্ক দ্রব্যাদি এবং মূলের স্থলে বল্কল গ্রহণের ফলে ঔষধের গুণবৈষম্য ঘটিতেছে কি না এবং ঘটিলেই বা কিরূপে ইহার প্রতিকার করা যাইতে পারে, আশা করি, আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক মাত্রেই তাহা বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া দেখিবেন।

এ প্রসঙ্গে আমি আর একটী বিষয়েও চিকিৎসকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। আমি দেখিয়াছি, একই নামে বিভিন্ন জিনিষ বিভিন্ন স্থানে ব্যবহৃত হইয়া থাকে; দৃষ্টান্তস্বরূপ রাখাল-শশা, গাম্ভারী প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই সকল একই নামের বিভিন্ন জিনিষের মধ্যে কোন্‌টী প্রকৃত ভেষজ—তাহা নির্ণীত হওয়া আবশ্যক। এতদ্ব্যতীত একই জিনিষের বহু প্রকারভেদও দেখিতে পাওয়া গিয়া থাকে; যেমন "তুলসী", "ধুতুরা", "পান" প্রভৃতি। ইহাদের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে কোন্‌টী ঔষধে ব্যবহার্য্য, তাহা নির্দ্ধারিত এবং সাধারণের অবগতির নিমিত্ত প্রচারিত হওয়া আবশ্যক। প্রসিদ্ধ ভেষজ বিদারী সম্বন্ধেও নানা গোলযোগ চলিতেছে। এই বিদারী দুই প্রকার; ইহাদের লতা যেমন ভিন্ন রকমের, স্বাদও তেমনি বিভিন্ন, এবং সম্ভবতঃ গুণেও কতক বৈষম্য থাকিতে পারে। এদেশে সাধারণতঃ ইহার একটীকে ক্ষীরবিদারী এবং অপরটীকে ভূমিকুষ্মাণ্ড বলা হয়। আমি যতদূর দেখিয়াছি, ঔষধাদির বর্ণনায় প্রায় সর্ব্বত্রই "বিদারী" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, এবং কচিৎ দুই এক স্থলে "ভূকুষ্মাণ্ড" (যথা—সিদ্ধশাল্মলীকল্পে) এবং কোথায়ও বা "বিদারীদ্বয়ং" (যথা—শিবাগুড়িকায়) এইরূপ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। শাস্ত্রকার যে উভয় প্রকার বিদারীই গ্রহণ করিয়াছেন, "বিদারীদ্বয়ং" কথা হইতেই তাহা প্রকাশ পাইতেছে। এখন যে স্থলে কেবল বিদারী লিখিত আছে, তথায় উভয় প্রকার বিদারীর মধ্যে কোন্‌টি গ্রহণীয়,

তাহা নির্দ্ধারিত হওয়া আবশ্যক; নচেৎ যাহার যেটি ইচ্ছা, সেটি ব্যবহার করিলে, ঔষধের ফলবৈষম্য অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং কোন্ শ্রেণীর বিদারী কোন্ স্থলে গ্রহণ করিতে হইবে, চিকিৎসকগণ তাহা নির্ণয় না করিলে অসুবিধা দূরীভূত হইবেনা।

মান-পরিভাষা—ঔষধ প্রস্তুতের জন্য গৃহীত দ্রব্যাদির পরিমাণ সম্বন্ধে নানা স্থানে বিভিন্নমত দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। শাস্ত্রে আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধের মান অনেকস্থলে মাষা ও কর্ষ হিসাবে প্রদত্ত হইয়াছে, এই মাষা এবং কর্ষের পরিমাণ লইয়াই মতভেদ। মাগধ এবং কালিঙ্গ ভেদে আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থে দ্বিবিধ মানের পরিচয় পাওয়া যায়; এই মাগধ মানের পরিমাণ কালিঙ্গ মানের পরিমাণ অপেক্ষা অনেক অধিক। শার্ঙ্গধর মাগধ ও কালিঙ্গ মানের যে পরিভাষা দিয়াছেন, "পরিভাষা-প্রদীপ"—ধৃত বচনে তাহার কথঞ্চিৎ পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয়। শার্ঙ্গধরের মতে মাগধ মানে মাষার পরিমাণ ৬ রতি যথা—

ষড়্ভিস্তু রক্তিকাভিঃ স্যান্মাষকো হেমধান্যকৌ।"

কিন্তু পরিভাষাপ্রদীপে ঐ মাষার পরিমাণ ১০ রতি যথা:—

"গুঞ্জাভি র্দশভিঃ প্রোক্তো মাষকো ব্রহ্মণা পুরা।"

ইহার পর শার্ঙ্গধর এবং পরিভাষাপ্রদীপ উভয় গ্রন্থেই মাগধমানে ৪ মাষায় ১ শাণ, ২ শাণে ১ কোল এবং ২ কোলে ১ কর্ষ ধরা হইয়াছে। পরন্তু কালিঙ্গ মানে শার্ঙ্গধরের মতে ১ মাষার পরিমাণ ৮ কদাচিৎ বা ৭ রত্তি—

"মাষো গুঞ্জাভিরষ্টাভিঃ সপ্তভির্বা ভবেৎ কচিৎ"।

কিন্তু পরিভাষা প্রদীপে দেখা যায়, কালিঙ্গ-মানের মাষা ৬ রতি। কালিঙ্গ মানের কর্ষ শার্ঙ্গধরের মতে ১০ মাষায় (কর্ষ স্যাদ্দশমাষকঃ); কিন্তু পরিভাষা-প্রদীপের মতে এই মানের কর্ষ ১৬ মাষায় (মাষৈশ্চতুর্ভিঃ শাণঃ স্যাৎ * তদ্দ্বয়ং কোল উচ্যতে * কোলদ্বয়ঞ্চ কর্ষঃ স্যাৎ)। এই উভয় মতের মধ্যে কোন্‌টী প্রকৃত, তাহা বুঝিবার উপায় আমাদের নাই; তবে শার্ঙ্গধর মৌলিক গ্রন্থ বলিয়া উহাই প্রামাণ্য মনে হয়। দেশবাসীর অবস্থা বিবেচনা করিয়া শার্ঙ্গধর কালিঙ্গমানকেই এ কালের উপযুক্ত মান করিয়াছেন যথা—

যতো মন্দাগ্নয়ো হ্রস্বা হীনসত্ত্বা নরাঃ কলৌ।
অতস্তু মাত্রা তদ্যোগ্যা প্রোচ্যতে সুজ্ঞসম্মতা॥

চরক এবং সুশ্রুতের মান আবার অন্যরূপ। চরক ১০ রতিতে এবং সুশ্রুত তাহার অৰ্দ্ধ অর্থাৎ ৫ রতিতে মাষা নির্ণয় করিয়াছেন। কিন্তু এ দেশের আয়ুর্ব্বেদীয় ব্যবসায়িগণের মধ্যে কেহ বা চরক, কেহ বা শার্ঙ্গধর এবং কেহ বা পরিভাষা-প্রদীপের মত অনুসরণ করিলেও, অধিকাংশ চিকিৎসকই আর এক অভিনব মানের মাষা ব্যবহার করিয়া থাকেন; সেই হিসাবে ১ মাষার পরিমাণ ১২ রতি বা ৵০ আনা। মাষার পরিমাণের এইরূপ হ্রাসবৃদ্ধি দ্বারা ফলের কোনরূপ বৈষম্য ঘটে না, এমন কথা বোধ হয় কেহই দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারিবেন না।

চরকসংহিতার প্রণেতা যদি অগ্নিবেশ ঋষি হইয়া থাকেন, তাহা হইলে উহা নিশ্চয়ই শার্ঙ্গধর ও সুশ্রুতের পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থ। এ

অনুমান সত্য হইলে, চরকের মাষার মান-বৃদ্ধির একটা যুক্তিযুক্ত কারণ কল্পনা করা যাইতে পারে ; কারণ সে সময় মানবগণ অতিশয় বীর্য্যবান ছিলেন। পরবর্ত্তী সময়ে মানবগণের দুর্ব্বলতা দর্শন করিয়া, শার্ঙ্গধর ৬ রতিতে এবং সুশ্রুত ৫ রতিতে মাষা গ্রহণই সমীচীন মনে করিয়া থাকিবেন। আমাদের বর্ত্তমান বল-বীর্য্যাদি বিবেচনা করিয়া, বিশেষতঃ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা-বিজ্ঞান ঔষধের অত্যল্পতার যে অত্যধিক ক্ষমতা প্রতিপাদন করিয়াছেন, তদ্বিষয় চিন্তা করিয়া, এ কালে শার্ঙ্গধর কি সুশ্রুতের অনুসরণই সুসঙ্গত মনে হইলেও, এ দেশের আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণ ১২ রতিতে মাষা ধরার আবশ্যকতা অনুভব করিলেন কেন, তাহা বুঝিবার শক্তি আমার মত অবোধের নাই। কাযেই এই মানের গোলযোগে ঔষধের ফলবৈষম্য ঘটিতে পারে কি না, এবং ঘটিলেই বা তাহার কিরূপ প্রতিকার করা যাইতে পারে তাহা চিন্তা করিয়া দেখিবার নিমিত্ত আমি কবিরাজ মহাশয়দিগকে বিশেষভাবে অনুরোধ করিতেছি।

শ্রীমুকুন্দবিহারী চক্রবর্ত্তী।

পুরাতন চিকিৎসা শাস্ত্রগুলি সম্বন্ধে আলোচনা।

আধুনিক্ চিকিৎসা শাস্ত্র (Modern Medicine) প্রবর্ত্তন হইবার পূর্ব্বে জগতে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন চিকিৎসা শাস্ত্রের প্রবর্ত্তন হয়। তন্মধ্যে কতকগুলিও লোপ পাইয়া গিয়াছে, কতক গুলি কঙ্কালসার অবস্থায় পরিণত হইয়া কোন মতে জীবন ধারণ করিতেছে। ঐ পুরাতন চিকিৎসা শাস্ত্র গুলির মধ্যে আমরা অগ্র প্রধান গুলির উৎপত্তি বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। ১। পুরাতন "মিশর" দেশীয় চিকিৎসা শাস্ত্র (old Egyptian Medicine.) ২। পুরাতন "গ্রীক্" চিকিৎসা শাস্ত্র (old Greek Medicine) ৩। আরব চিকিৎসা শাস্ত্র যাহাকে আমাদের দেশে "হেকিমী" চিকিৎসা শাস্ত্র কহে এবং যাহার অপর একটীর নাম "ইউনানি" চিকিৎসা শাস্ত্র। (Arabian Medicine) ৪। আমাদের "আয়ুর্ব্বেদ"—চিকিৎসা শাস্ত্র। (Hindu Medicine) এইসব চিকিৎসা শাস্ত্রের উৎপত্তি—সম্বন্ধে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মনিষীগণের মধ্যে বিশেষ মতভেদ দৃষ্ট হয়। নিম্নে ভিন্ন ভিন্ন মতগুলি প্রদর্শিত হইল।

১। আয়ুর্ব্বেদ সর্ব্বপ্রথম চিকিৎসা শাস্ত্র। উহা হইতে মিশর, মিশর হইতে গ্রীক্ এবং গ্রীক্ হইতে আরব চিকিৎসা শাস্ত্রের উৎপত্তি। ২। আয়ুর্ব্বেদ ও প্রাচীন মিশর চিকিৎসা শাস্ত্র উভয়েই পরস্পরের সাহায্য ব্যতিরেকে উন্নত ও পরিবর্দ্ধিত। মিশর হইতে গ্রীক্ এবং গ্রীক হইতে আরব চিকিৎসা শাস্ত্রের উৎপত্তি। ৩। প্রাচীন মিশর চিকিৎসা শাস্ত্র—সর্ব্বপ্রথম চিকিৎসা শাস্ত্র। উহা

হইতে গ্রীক ও আয়ুর্ব্বেদের উৎপত্তি। গ্রীক হইতে আরব চিকিৎসা শাস্ত্রের উৎপত্তি। ৪। গ্রীক চিকিৎসা শাস্ত্র পুরাতন মিশর ও হিন্দু চিকিৎসা শাস্ত্র এই উভয়বিধ চিকিৎসা শাস্ত্র হইতে উৎপত্তি। গ্রীক হইতে আরব চিকিৎসা শাস্ত্রের উৎপত্তি। ৫। পুরাতন মিশর হইতে গ্রীক্, গ্রীক হইতে আরব এবং আরব চিকিৎসা শাস্ত্র হইতে আয়ুর্ব্বেদের উৎপত্তি।

পুরাতন মিশর চিকিৎসা শাস্ত্র সম্বন্ধে আমরা সামান্য অবগত আছি। পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ববিৎগণ মিশর হইতে চিকিৎসা শাস্ত্র সম্বন্ধে ছয়টী হস্তলিপি (papyrus) উদ্ধার করিয়াছেন।

১। ইবারর্স বা লিপ্‌জিক্ প্যাপিরাস্ অনুমান খৃষ্ট জন্মিবার সাড়ে পোনের শত বৎসর পূর্ব্বে লিখিত। ২। প্রধান বার্লিন বা লিডেন প্যাপিরাস্ অনুমান খৃষ্ট জন্মিবার চতুর্দ্দশ শত বৎসর পূর্ব্বে লিখিত। ৩। দ্বিতীয় বার্লিন প্যাপিরাস্। ৪। হিয়ার্ষ্ট প্যাপিরাস্। ৫। বৃটীশ মিউজিয়ামে রক্ষিত প্যাপিরাস্। ৬। প্যারিসে রক্ষিত প্যাপিরাস্।

উপরিউক্ত ছয়টী প্যাপিরাস্ মধ্যে "ইবারর্স প্যাপিরাস্" অতি পুরাতন এবং উহা হইতে পুরাতন মিশর দেশীয় চিকিৎসা সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হওয়া যায়। প্রধান বার্লিন প্যাপিরাসের সহিত আমাদের "অথর্ব্ববেদের" অনেক বিষয়ে ঐক্যতা দেখা যায়।

যাঁহারা বলেন যে প্রাচীন মিশর চিকিৎসা শাস্ত্র আয়ুর্ব্বেদ হইতে উদ্ভূত তাঁহাদের ঐরূপ মতের প্রধান কারণ যে ঐতিহাসিক যুগের পূর্ব্বে ভারতবাসী মিশরে যাইয়া সভ্যতার আলোক বিস্তার করেন। অপর পক্ষে বলেন যে আয়ুর্ব্বেদ ও পুরাতন মিশর চিকিৎসা শাস্ত্র পরস্পরের সাহায্য ব্যতিরেকে উন্নত ও পরিবর্দ্ধিত। আমাদের শেষোক্ত মতই বিশ্বাস যোগ্য বলিয়া মনে হয়, কারণ অধিকাংশ পণ্ডিতগণের মত এই যে, মিশরের সভ্যতা আমাদের সভ্যতা হইতে অতি প্রাচীন। আমাদের অথর্ব্ববেদ ও মিশরের প্যাপিরাস্ যদি সমসাময়িক বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলে সে সময়ের চিকিৎসা শাস্ত্র চিকিৎসার প্রাথমিক অবস্থা অর্থাৎ স্বাভাবিক বুদ্ধি প্রসূত; যুক্তি বা পরীক্ষাপ্রসূত নহে। "Primitive stage by Instinct"। অবশ্য মিশর চিকিৎসা শাস্ত্র প্রাথমিক অবস্থা হইতে অনেক অগ্রসর হইয়াছিল। কিন্তু আমাদের গৌরবের বিষয় এই যে, উহা আমাদের আয়ুর্ব্বেদের ন্যায় এত উন্নত হয় নাই এবং মিশরের সভ্যতার সহিত মিশরের চিকিৎসা শাস্ত্র কালের সুদূর-গর্ভে লীন হইয়া গিয়াছে। বাজ সাহেবের মত হইতেও জানিতে পারা যায় প্রাচীন মিশর-চিকিৎসা প্রাচীন গ্রীক বা আয়ুর্ব্বেদের ন্যায় উন্নতি সাধন করে নাই।

(২) প্রাচীন গ্রীক ও রোমক চিকিৎসা শাস্ত্র—এই শাস্ত্রের ক্রমোন্নতি চারিটী ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

১। প্রথম অবস্থা—primitive stage derived from instinct up to 1200 B.C.

৪। দ্বিতীয় অবস্থা—Sacred or mystic stage—Rise of Pythagorian school up to 500 B C.

৩। তৃতীয় অবস্থা—Philosophic stage—Rise of Hippocratic and other schools up to 300 B.C.

৪। চতুর্থ অবস্থা—Anatomic stage —up to Gahu is 200 A D.

গ্রীক্ চিকিৎসা শাস্ত্র, পুরাতন মিশর চিকিৎসা শাস্ত্র উদ্ভূত—ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত মত। এখন দেখা যাউক, আয়ুর্ব্বেদের সহিত গ্রীক্ চিকিৎসা সম্বন্ধে কি সম্পর্ক ? এ বিষয়ে তিনটী মতভেদ আছে।

১। গ্রীক্ চিকিৎসা শাস্ত্র মিশর ও হিন্দু উভয়বিধ চিকিৎসা শাস্ত্র হইতে উদ্ভূত।

২। গ্রীক্ ও আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসা পরস্পরের সাহায্য ব্যতিরেকে উন্নত ও পরিবর্দ্ধিত অর্থাৎ উভয়ই এক বৃক্ষের ফল।

৩। গ্রীক্ হইতে আরব এবং আরব হইতে হিন্দু চিকিৎসা শাস্ত্রের উৎপত্তি।

প্রাথমিক অবস্থা—কি মনুষ্য কি জীবজন্তু, প্রাণীমাত্রেরই চিকিৎসা সম্বন্ধে স্বাভাবিক বুদ্ধি প্রসূত একটী জ্ঞান ছিল। অসভ্য মানবদিগের এবং জাতি মাত্রেরই সভ্যতার পূর্ব্বে ঔষধাদির একটা জ্ঞান ছিল। সেই জ্ঞান সভ্যতার উন্নতির সহিত বর্দ্ধিত হইয়া চিকিৎসাশাস্ত্রের উৎপত্তি হয়। গ্রীক, হিন্দু প্রভৃতি সভ্যজাতির সভ্যতার প্রথম অবস্থায় কতকটা সাধারণ জ্ঞান ছিল।

দ্বিতীয় অবস্থা—এই অবস্থায় চিকিৎসা শাস্ত্রের সূত্রপাত হয়। এই সময়ে পণ্ডিত প্রবর পাইথেগোরাসের অভ্যুদয় হয়। তিনি চিকিৎসা শাস্ত্রের অনেক উন্নতি সাধন করেন। চিকিৎসা শাস্ত্রে তাঁহার প্রধান দান—রোগ ভোগের দিন নিরূপণ "the celebrated doctrine of numbers—the doctorin of critical days"—Encyclopardia Britannica.

রোগভোগের দিন সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদ বিশেষ-রূপে নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে, বায়ুজ্বরের ভোগ ৭ দিন, পিত্তজ্বরের ১০ দিন, কফ জ্বরের ১২ দিন প্রভৃতি।

আয়ুর্ব্বেদের ন্যায় হেকিমী চিকিৎসাশাস্ত্রেও রোগ-ভোগের দিন সম্যকভাবে নির্দ্ধারিত আছে। অবশ্য হেকিমগণ গ্রীক চিকিৎসাশাস্ত্র হইতে উহা গ্রহণ করিয়াছেন।

আধুনিক চিকিৎসা শাস্ত্র রোগভোগের নিরূপিত দিনের কথা বিশ্বাস না করিলেও একেবারে উহা বিস্মৃত হয় নাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ—নিউমোনিয়ার ক্রাইসিস্ (নিরাম অবস্থা) সাত দিনে হয় পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্রে লিখিত আছে—উল্লেখ করা যাইতে পারে। তিন দিনের জ্বর (Three day Fever) সাত দিনের জ্বর (seven day fever) প্রভৃতি আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষিত ডাক্তারগণও স্বীকার করেন।

ইলিয়ট সাহেব তাঁহার গ্রীক্ ও রোম্যান মেডিসিন্ নামক পুস্তকে স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন যে, নাইথেগোরাস, মিশর, ফিনিসিয়া, ব্যালডিয়া এবং সম্ভবতঃ ভারতবর্ষে জ্ঞান অর্জ্জন করিতে আসিয়াছিলেন।

তৃতীয় অবস্থা—এই সময়ে গ্রীক্ চিকিৎসা শাস্ত্রে দুইটী ভিন্ন মতাবলম্বী দলের অভ্যুদয় হয়। এক দলের নাম এম্পিরিক্স (Empiries)। উহাঁদের বিদ্যামন্দির সিনিডস্ (cenidos) নামক স্থানে অবস্থিত ছিল। অন্য দলের নাম ডগ্‌মেটিষ্ট (Dogmatists) ইহাঁদের বিদ্যামন্দির কস্ (cos) নামক স্থানে অবস্থিত ছিল।

১। **এম্‌পিরিক্স**—ইহাঁরা চিকিৎসার জন্য রোগের কারণ নির্ণয় বা শরীর ব্যব-

চ্ছেদ বিদ্যা (Anatomy) শিক্ষা আবশ্যক মনে করিতেন না। চিকিৎসার জন্য পর্য্যবেক্ষণ (observation) প্রত্যক্ষ লব্ধজ্ঞান (experience) এবং পরীক্ষিত ঔষধ সকল প্রকৃতির রোগে ব্যবহার করা চিকিৎসার উপায় বলিয়া যাইতেন।

২। ডগ্‌মেটিষ্ট (Dogmatists)—ইহাঁরা চিকিৎসার জন্য পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে রোগের "হেতু", "পূর্ব্বরূপ" (remote and proximate cause)হাওয়া, জল ও দোষের গুণাগুণ, রোগী যে কার্য্য করিতেন তাহা, আদ্য ঋতুর ক্রিয়া প্রভৃতি শরীরের উপর কিরূপ কার্য্য করে, তাহার অনুসন্ধান করিতেন। রোগের চিকিৎসার জন্য এম্‌পিরিক্সদের ন্যায় সাধারণ নিয়মানুযায়ী চিকিৎসা করিতেন না। প্রত্যেক রোগীর রোগোৎপত্তির বিশেষ কারণগুলি প্রত্যক্ষ করিয়া উপযুক্ত চিকিৎসা করিতেন। অবশ্য ইহাঁরা ইহা ব্যতীত এম্‌পিরিক্সদের ন্যায় পর্য্যবেক্ষণ. প্রত্যক্ষ লব্ধজ্ঞান প্রভৃতির সহায়তা চিকিৎসার জন্য গ্রহণ করিতেন।

আয়ুর্ব্বেদও ঠিক্ এই মতাবলম্বী ও এই ভাবে চিকিৎসা করেন। গ্রীক চিকিৎসা শাস্ত্রের তৃতীয় অবস্থায় সুবিখ্যাত হিপোক্রেটাসের অভ্যুদয় হয়। তিনি এ সময়ের গ্রীক্ চিকিৎসকগণের অগ্রণী ছিলেন। (the central figar of this stage). আধুনিক পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্র তাঁহাকে চিকিৎসার জন্মদাতা (Father of medicine) বলিয়া স্বীকার করেন। সুখের বিষয় পাশ্চাত্য শিক্ষিত চিকিৎসকগণ আমাদের চরক ও সুশ্রুতকে হিপোক্রেটিসের ন্যায় সর্ব্বোচ্চ আসন দিয়াছেন।

১। রোগোৎপত্তির কারণ—হিপোক্রেটাসের মতে রোগোৎপত্তির কারণ চারিটী "দোষ"—যাহাকে তিনি "ক্রেসিস্" (crasis) বলিয়াছেন এবং যাহাকে আরবগণ খিল্ট (khilt) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসকগণ "দোষ" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই "দোষ"গুলির বিবৃত অবস্থা হওয়া রোগের কারণ বলিয়া সর্ব্ব পুরাতন চিকিৎসা শাস্ত্রগুলি উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

এই দোষগুলি গ্রীক, রোমক ও আরব চিকিৎসকগণ চারিটী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যথা সোফ্‌রা (sofra—yellow bile) সউদা (souda—Black Bile) বল্‌গম্ (Balgam—phlym) খুন (Khun—Blered)। আয়ুর্ব্বেদ মতে দোষ তিনটী—"বায়ু পিত্ত কফ"।

২। দেহের "মূল" ধাতু—গ্রীক্, আরব ও হিন্দু চিকিৎসকগণ বলেন যে, কতকগুলি মূল ধাতুর (elements) সমষ্টিতে দেহোৎপন্ন হয়। হিপোক্রেটিসের মতে এই মূল ধাতু চারিটী—"ক্ষিত্যপ তেজো মরুৎ" হিন্দু চিকিৎসকগণের মতে এই মূল ধাতু পাঁচটী—"ক্ষিত্যপ তেজো মরুদ্ব্যোম্"

৩। শরীরের সুস্থতা ও অসুস্থতা—হিপোক্রেটিসের মতে চারিটী দোষের সমতা ও চতুর্ভূতের বিশেষ সংযোগে (proper combination) শরীর সুস্থ থাকে। হিন্দু মতও তাই। তিনটী "দোষের" সমতা ও পঞ্চভূতের বিশেষ সংযোগে শরীর সুস্থ থাকে। কিন্তু হিন্দু চিকিৎসকগণ পঞ্চভূতের বিশেষ সংযোগে যে সপ্ত ধাতুময় শরীর বর্ণন. করিয়াছেন, সেই সপ্ত ধাতু সাম্য অবস্থায় না থাকিলে শরীরের অসুস্থতা উৎপাদন করে। শরীরের অসুস্থতা সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণ বলেন যে, কতকগুলি রোগ দোষের বিকৃত অবস্থার

জন্য উৎপন্ন হয়, আবার কতকগুলি দোষ ও ধাতুর বিকৃত অবস্থার জন্য উৎপন্ন হয়।

৪। রোগের ফলাফল নিরূপণ —রোগীর সাধারণ অবস্থা জানিয়া রোগের ফলাফল নিরূপণ (Prognosis) সম্বন্ধে হিপক্রেটাস অদ্বিতীয় ছিলেন। "In prognosis the Hippocratic school have perhaps never been excelled"—Eucyclepardia Britannica.

এবিষয়ে আমাদের আয়ুর্ব্বেদ হিপক্রেটাস্ অপেক্ষা কোন অংশে কম নহে। চরকের সূত্রস্থানে সুখসাধ্য, কষ্টসাধ্য ও অসাধ্য রোগীর লক্ষণ যাহা বর্ণিত আছে এবং ইন্দ্রিয়স্থানে ইন্দ্রিয় সকলের পরীক্ষা সম্বন্ধে যাহা বর্ণিত আছে—তাহা হইতে রোগের ফলাফল সম্বন্ধে সম্যকভাবে নিরূপণ করা যায়।

৫। রোগের পরিচয় (Diagnosis)—এবিষয়ে হিপোক্রেটাসের জ্ঞান সামান্যই ছিল। এবিষয়ে আমাদের আয়ুর্ব্বেদ অদ্বিতীয় তাঁহারা হেতু, সামান্য ও বিশিষ্ট পূর্ব্বরূপ, রূপ, সংখ্যা, বিকল্প, প্রাধান্য বলাবল, কাল প্রভৃতি নির্ণয় করিয়া রোগের প্রকৃতির নিরূপণ করিতেন।

নাড়ী (Pulse) সম্বন্ধে হিপোক্রেটাস্ কিছুই জানিতেন না। এবিষয়ে পাশ্চাত্য গ্রীক ও রোমক চিকিৎসকগণের মধ্যে গ্যালেন (Galen) অদ্বিতীয় ছিলেন। আমাদের আয়ুর্ব্বেদে কনাদ কৃত নাড়ীবিজ্ঞান, গ্যালেনের নাড়ীবিজ্ঞান অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট।

প্রসাব (urine) হিপোক্রেটাসের এ্যাফরিয়ম্ (aphoriam) নামক পুস্তকে বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। আয়ুর্ব্বেদের প্রয়োগ-চিন্তামণি নামক গ্রন্থে আমরা এ সম্বন্ধে বিশেষরূপে অবগত হই।

প্রয়োগ-চিন্তামণি গ্রন্থে আমরা জিহ্বা পরীক্ষা, মূত্র পরীক্ষা, নাসা পরীক্ষা, নেত্র পরীক্ষা প্রভৃতির বিষয় বিশদভাবে বর্ণিত আছে দেখিতে পাই, ইহা হইতে আমরা আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রমতে রোগ নির্ণয় (diagnosis) করিয়া থাকি। হিপোক্রেটাসের রোগ নির্ণয় ও রোগের ফলাফল বিচার সম্বন্ধেও বিশেষ বর্ণনা আছে।

৬। চিকিৎসা (Treatment)—আয়ুর্ব্বেদের ন্যায় হিপোক্রেটাস ও ঔষধ অপেক্ষা পথ্যের বিশেষ উপকারিতা বলিয়া গিয়াছেন। "Great importance was given to diet medicines were regarded as secondary"—Eucyclopardia Britannica.

আয়ুর্ব্বেদ—এ বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল।

বিনাপি ভেষজৈর্ব্যাধি পথ্যাদেব নিবর্ত্ততে।
নতু পথ্য বিহীনস্য ভেষজানাং শতৈরপি॥

আধুনিক পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্রও ঐ মতের অনুমোদন করেন।

স্বাভাবিক ক্রিয়া দ্বারা শরীর ব্যাধি বিমুক্ত হয়—হিপোক্রেটাস বলিয়াছেন, রোগের কারণ দোষগুলি প্রথম অশুদ্ধ হইয়া রোগ উৎপন্ন করে; পরে সেগুলি স্বাভাবিক ক্রিয়া দ্বারা পরিপাক (digested) হইয়া দুরীভূত হয়। এই ভাবটী আমাদের আয়ুর্ব্বেদেও দেখিতে পাই। তরুণ জ্বরের সাম্যাবস্থায় লঙ্ঘনাদি ক্রিয়া দ্বারা রসের পরিপাক হইয়া নিরাম অবস্থায় পরিণত হয়। দুষিত রস শরীর হইতে দূরীভূত হওয়ার পর রোগী ব্যাধিমুক্ত হয়।

উপরিলিখিত বিষয়গুলি হইতে সম্যক অবগত হওয়া যায় যে, হিপোক্রেটাস্ লিখিত অনেকগুলি সত্যের সহিত আমাদের আয়ুর্ব্বেদের অনেক মিল আছে। এখন প্রশ্ন এই যে, হিপোক্রেটাস আয়ুর্ব্বেদকে এই সত্যগুলি দান করিয়াছেন বা আয়ুর্ব্বেদ হইতে হিপোক্রেটাস্ এই সত্যগুলি লইয়াছেন।

এসম্বন্ধে নিম্নে কতকগুলি মত দেওয়া গেল।

ডাক্তার পি, সি, রায় মহাশয় বলেন যে, হিপোক্রেটাস জন্মিবার পূর্ব্বেই হিন্দুরা "হিমারেল প্যাথলজির" উপর ভিত্তি করিয়া চিকিৎসা শাস্ত্রের উন্নতি বিধান করেন।

ডাক্তার এল্ডো, ক্যাষ্টাননি, বামার্গ সাহেবদের মতে হিপোক্রেটাস্ চিকিৎসা-সম্বন্ধে হিন্দু ও মিশর চিকিৎসা শাস্ত্র হইতে অনেক বিষয় গ্রহণ করেন "Hoppocratus owes his medical inspirations to Egyptian and Indian medicine.

ডাক্তার ইলিয়ট সাহেব বলেন যে, হিপোক্রেটাসের সময় অস্ত্র চিকিৎসায় দ্বারা অর্ব্বুদ কর্ত্তন করা সাধারণ অস্ত্রচিকিৎসাভূত ছিল না, যদিও হিন্দুশল্য-চিকিৎসকগণ বহুপূর্ব্ব হইতেই এই চিকিৎসাতে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন।

রোগোৎপত্তির কারণ সম্বন্ধে হিপোক্রেটাস "চারিটী দোষের" কথা ও হিন্দুগণ ৩টী দোষের কথা লিখিয়া গিয়াছেন। ইহা হইতে বোধ হয় হিপোক্রেটাস্ হিন্দু চিকিৎসা শাস্ত্র হইতে প্রথম তত্ত্ব অবগত হন। পরে নিজের বুদ্ধি অনুসারে আরও বিশদভাবে রোগোৎপত্তি বর্ণনা সম্বন্ধে চারিটী "দোষের" কথা বলিয়াছেন। যদিও হঠাৎ মনে হয়—হিপোক্রেটাসের ক্রেসিস্ (crasis) ও হিন্দুদের "দোষ" এক জিনিষ, অন্ততঃ আধুনিক পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ দুইটীকেই Homour বলিয়াছেন—তথাপি ক্রেসিস্ ও দোষের" মধ্যে অনেক প্রভেদ।

শ্রীআশুতোষ রায়, এল্ এম্ এস্।

শাক সম্বন্ধে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য মত।

শাক আমাদের দেশে বহুল পরিমাণে ব্যবহার হয় বটে, কিন্তু শাকের সুখ্যাতি আদৌ নাই। যাবতীয় খাদ্যের মধ্যে শাক নিকৃষ্ট বলিয়া গণ্য। কর্ম্ম-কর্ত্তা লোক-জন খাওয়াইয়া জোড় হাত করিয়া বলেন—গরীবের শাক অন্ন। নীতিশাস্ত্রকার বলেন,—স্বচ্ছন্দ বনজাত শাকান্ন আহারে যে উদর পূর্ণ হয় সে দগ্ধোদরের জন্য কে মহা পাপ করিবে? পুরাণে কথিত হইয়াছে যে, অঋণী এবং অপ্রবাসী হইয়া দিবসের তৃতীয় প্রহরে শাকান্ন আহার করাও সুখের। এইরূপ যেদিক দিয়াই দেখুন—শাক আমাদের দেশে জঘন্য খাদ্য বলিয়া পরিগণিত। গ্রাম্য কবির মুখ দিয়া শাকেরা স্বয়ং এ দুঃখ প্রকাশ করিয়াছে। সকল শাকের আত্ম কাহিনী আমার মনে নাই। একটু নমুনা দেখুন,—

সজ্‌নের শাক বলে আমি সকল শাকের হেলা।
আমায় মনে পড়্‌বে শুধু টানাটানির বেলা।

এদিকে ত শাকের এইরূপ নিন্দা, আয়ুর্ব্বেদও শাকের মাথায় একেবারে বজ্রাঘাত করিয়াছেন। আয়ুর্ব্বেদ বলেন :—

শাকেষু সর্ব্বেষু বসন্তি রোগাস্তে হেতবো
দেহ বিনাশনায়।
তস্মান্ বুধঃ শাক বিবর্জ্জনস্তু কুর্য্যাৎ তথাম্লেষু
এব দোষঃ।

অনুবাদ ;—সকল প্রকারে শাকেই রোগ সকল বাস করিয়া থাকে এবং সেই সকল রোগ দেহ নাশের হেতু স্বরূপ। এই জন্য বুদ্ধিমান ব্যক্তির শাকাহার পরিত্যাগ করা উচিত। অম্লেও এইরূপ দোষ আছে।

এদেশে শাকের এইরূপ অপমান, কিন্তু য়ুরোপে শাকের খুব আদর। য়ুরোপীয় চিকিৎসকগণ বলেন যে, নিত্য কিছু কিছু শাক-সবজী বিশেষতঃ সবুজ রঙ্গের শাক-সবজী খাওয়া উচিত। এদেশে শাকের এইরূপ অনাদর এবং য়ুরোপে শাকের আদরের কারণ কি ?

শাকের একটী গুণ এই যে, শাক আহার করিলে কোষ্ঠ শুদ্ধি হয়। "ঘৃতে বল বৃদ্ধি শাকে মল বৃদ্ধি" আমাদের দেশে প্রবাদ স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পাশ্চাত্য দেশে যথেষ্ট মাংসের প্রচলন আছে। মাংসাহারে স্বভাবতঃ কোষ্ঠবদ্ধতা জন্মে। শাক খাইলে মাংসের উক্ত দোষ নষ্ট হয় বলিয়া শাক মাংসাহারী দিগের পক্ষে আবশ্যক পদার্থ। আমাদের দেশে মাংসের ব্যবহার খুব কম এবং যেরূপ খাদ্য লোকে আহার করে, তাহাতে কোষ্ঠ বদ্ধতা হয় না। সুতরাং শাক এতদ্দেশীয় গণের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয় নহে।

কিন্তু শাক যতই নিন্দিত বা অপ্রয়োজনীয় হউক, আমরা নিত্য যথেষ্ট শাক আহার করিয়া থাকি এবং শাক নহিলে আমাদের চলেনা। ভোজের জন্য আজকাল লুচি-পোলাও ব্যবহৃত হইতেছে, কিন্তু পূর্ব্বে অন্নই ব্যবহৃত হইত এবং অন্নের সহিত প্রথমে পত্র-শাক হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্বপ্রকার শাকই নিমন্ত্রিতের রসনার তৃপ্তি সম্পাদন করিত। এখনও আমাদের দেশে চতুর্দ্দশীর চৌদ্দশাক বিশেষ আদরের সহিত গৃহস্থ মাত্রেই আহার করিয়া থাকে।

শাক বলিতে এখন আমরা কেবল পত্র-শাক এবং নাল শাকই বুঝিয়া থাকি, কিন্তু আয়ুর্ব্বেদে আমরা যেগুলিকে তরকারি বলি, সে সমস্তই শাক বলিয়া অভিহিত, পশ্চিমাঞ্চলেও তরকারী অর্থে শাক শব্দ হইয়া ব্যবহৃত থাকে।

শাক পাঁচ প্রকার। যথা পত্র-শাক, যেমন পালংশাক, নটে শাক, বেতো শাক প্রভৃতি, পুষ্প শাক, যেমন সজিনা ফুল, কুমড়া ফুল, সরিসার ফুল প্রভৃতি ; ফল-শাক, যেমন লাউ, কুমড়া, বেগুন প্রভৃতি, নালশাক, যেমন লাউডাঁটা, পুঁই ডাঁটা, কুমড়াডাঁটা, প্রভৃতি এবং কান্দ শাক, যেমন - ওল, গাজর, মাণকচু, মূলা প্রভৃতি। শাস্ত্রে এই পাঁচ প্রকার উত্তরোত্তর গুরু অর্থাৎ পত্রশাক হইতে পুষ্পশাক, পুষ্পশাক অপেক্ষা ফলশাক, ফলশাক হইতে নাল শাক এবং নাল শাক অপেক্ষা কন্দশাক গুরুপাক বলিয়া কথিত হইয়াছে। আয়ুর্ব্বেদে এই পাঁচ প্রকার শাক ব্যতীত সংস্বেদজ শাক বলিয়া আর এক প্রকার কথিত হইয়াছে এবং ইহা সর্ব্বাপেক্ষা গুরুপাক।

আয়ুর্ব্বেদে শাক মাত্রেই বিষ্টম্ভী অর্থাৎ পেট ভার করে, রুক্ষ, অতিশয় মল বর্দ্ধক এবং মল-মূত্র নিঃসরক বলিয়া কথিত হইয়াছে। পত্র-শাকের মধ্যে বেতো শাক এবং পল্‌তা নিন্দাবাদ হইতে অব্যাহতি পাইয়াছে। যাঁহারা অপকারিতার ভয়ে শাক ব্যবহার করিতে অনিচ্ছুক, তাঁহারা বেতোশাক এবং পল্‌তা যথেষ্ট আহার করিতে পারেন। পল্‌তা পিত্তনাশক, অগ্নিবর্দ্ধক, পাচক, এবং জ্বর, কাস, ও ক্রিমিনাশক; বেতোশাক ত্রিদোষ অর্থাৎ বায়ু, পিত্ত ও কফনাশক, অগ্নি বর্দ্ধক, পাচক, লঘুপাক এবং প্লীহা, রক্ত পিত্ত, অর্শ ও ক্রিমিনাশক।

লাউ কচিই খাওয়া ভাল, পাকা লাউ অপথ্য কিন্তু কুমড়া কচি অপকারী, পাকা কুমড়াই সুপথ্য। পাকা কুমড়া বস্তি শোধক বলিয়া যাহাদের প্রস্রাবের দোষ, পাথরী প্রভৃতি রোগ আছে তাহাদের পক্ষে উপকারী। পাকা কুমড়া ত্রিদোষ নাশক, লঘু, অগ্নিদীপক এবং উন্মাদ, মূর্চ্ছা প্রভৃতি মানসিক রোগে হিতকর। এখানে কুমড়া অর্থে দেশী বা চালকুমড়া। বিলাতী বা মিষ্ট কুমড়ার উল্লেখ আয়ুর্ব্বেদে নাই।

পটোল একটী উৎকৃষ্ট তরকারি। ইহা ত্রিদোষ নাশক, লঘু, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিজনক এবং জ্বর, কাস, শ্বাস, ও ক্রিমিনাশক। কচি বেগুন অগ্নিদীপক, লঘু এবং সুপথ্য। পাকা বেগুন পিত্ত বর্দ্ধক ও গুরু। বেগুন-পোড়া খুব লঘুপাক। হংস ডিম্বের ন্যায় যে এক প্রকার শাদা বেগুন আছে তাহা অর্শ রোগে বিশেষ হিতকর।

ওল - অর্শঃ রোগে বিশেষ হিতকর, কিন্তু দ্রদ্রু, কুষ্ঠ ও রক্তপিত্ত প্রভৃতি রোগে অহিতকর। ওল অগ্নিদীপক ও লঘু। কচি মূলাই সুপথ্য, বড় কাঁচা মূলা ত্রিদোষ বর্দ্ধক এবং গুরু। তবে সিদ্ধ করিয়া স্নেহ পদার্থ সহ সেবন করা যাইতে পারে। অন্য সমস্ত শাকই শুষ্ক হইলে অপকারী হয় কিন্তু শুষ্ক মূলা উপকারী।

উচ্ছে ও করলা—উচ্ছের সুপথ্য বলিয়া খ্যাতি আছে। উহারা পিত্তনাশক, বায়ুবর্দ্ধক নহে, লঘু, অগ্নিদীপক এবং জ্বর, কফ, পাণ্ডু রোগ ও ক্রিমি নাশক। ঝিঙ্গে পিত্ত নাশক কিন্তু কফ ও বায়ুবর্দ্ধক। চিচিঙ্গে (হোপা) পটোল হইতে কিঞ্চিৎ হীন গুণ এবং শোষ রোগীর পক্ষে বিশেষ হিতকর।

নানা প্রকার শাকের নানা প্রকার গুণ শাস্ত্রে লিখিত হইয়াছে। বাহুল্য ভয়ে সে সকলের উল্লেখ করা হইলনা। যে সকল শাক তিক্ত, সেগুলি প্রায়ই পিত্ত ও কফ নাশক। যে সকল শাক মধুর রস-বহুল—সেগুলি কফবর্দ্ধক এবং পিত্ত নাশক। তিক্ত ও কষায় রস বিশিষ্ট শাক সকল প্রায়ই বায়ুবর্দ্ধক।

কর্কশ, পুরাতন, পোকালাগা, শুষ্ক, অকালজাত অর্থাৎ যে সময়ে যে শাক সাধারণতঃ জন্মেনা—সেই সময়ে উৎপন্ন,—এরূপ শাক আহার করা উচিত নহে। শাক সিদ্ধ করিয়া এবং ঘৃত-তৈলাদি স্নেহ পদার্থ সংযুক্ত করিয়া আহার করা উচিত। কিন্তু কচি এবং যাহা সম্যক পুষ্ট হয় নাই—এরকম কন্দশাক ব্যবহার করা উচিত নহে।

এক্ষণে শাক সম্বন্ধে পাশ্চাত্য মত লিখিত হইতেছে। কন্দ-শাককে ইংরাজীতে

রুটস এবং টিউবরস (Roots and Tubers) এবং অন্যান্য শাককে গ্রীন ভেজিটেবলস, (Green vegetables) বলে।

কন্দশাক ব্যতীত অন্যান্য শাকে পুষ্টিকর পদার্থ খুব কম আছে এবং প্রায় শতকরা নব্বই ভাগ জল আছে। সিদ্ধ করিলে জলীয়াংশ আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। জল ব্যতীত অল্প কার্ব্বোহাইড্রেট, অত্যল্প প্রোটিড়, চিনি চর্ব্বি, এবং সেলুলোজ ও ধাতব লবণ থাকে।

এইখানে প্রোটিড় প্রভৃতির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া উচিত। কেননা সকল পাঠকের উহা জানা নাও থাকিতে পারে। পাশ্চাত্য মতে খাদ্যে পাঁচ প্রকার পদার্থ থাকে। যথা প্রোটিড়, কার্ব্বোহাড্রেট, চর্ব্বি, নানা প্রকার ধাতব লবণ এবং জল। মাংস, ডিম, ছানা প্রভৃতি প্রোটীড় বহুল খাদ্য এবং মনুষ্য শরীর প্রধানতঃ প্রোডিড় জাতীয় খাদ্য দ্বারা নির্ম্মিত। কার্ব্বোহাইড্রেট তিন প্রকার, যথা—শ্বেতসার (struch), চিনি এবং সোলুলোজ। চাউল প্রভৃতির অধিকাংশই শ্বেতসার, এবং শ্বেতসারই পরিপাক প্রাপ্ত চিনির আকারে উদ্ভিদ দেহে সঞ্চারিত হয়। আর যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষের মধ্যে শ্বেতসার থাকে, সেলুলোজ সেই গুলিকে আবৃত এবং পরস্পর সংযুক্ত করিয়া রাখে। কচি সেলুলোজ হজম হয়, কিন্তু পাকা সেলুলোজ কাষ্ঠবৎ কঠিন বলিয়া হজম হয় না। আর ধাতব লবণ নানা প্রকার। আমরা সাধারণতঃ যে লবণ আহারকরি—তাহাও এক প্রকার ধাতব লবণ। এই সকল দ্রব্য শরীরে ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য করিয়া থাকে।

শাকে যথেষ্ট পরিমাণে ধাতব লবণ—বিশেষতঃ পটাশ (Potash) ঘটিত লবণ আছে, সেইজন্য ইহা শরীরের পক্ষে বিশেষ হিতকর। শাকে প্রচুর সেলুলোজ থাকে বলিয়া উহার অল্প অংশই জীর্ণ হয়, অধিকাংশ মল রূপে নির্গত হইয়া যায়। কিন্তু যে অংশ জীর্ণ হয়না, তাহা অন্ত্রের কার্য্যকারী শক্তি বৃদ্ধি করিয়া থাকে। এইজন্য শাক খাইলে কোষ্ঠশুদ্ধি হয়।

যাঁহাদের পরিপাক শক্তি কম, তাঁহারা শাক সহজে জীর্ণ করিতে পারেনা। কাহারও কাহারও শাক খাইলে উদরে বায়ু সঞ্চয় হয়। শাক হজম হওয়া—নাহওয়া কিন্তু অনেকটা রন্ধনের উপর নির্ভর করে, সুসিদ্ধ হইলে শাক সহজে জীর্ণ হয়। পাকা শাকে সেলুলোজ অধিক থাকে এবং উহা কাষ্ঠবৎ কঠিন হইয়া পড়ে বলিয়া পাকা শাক হজম হয়না। শাক বাসি হইলে উহার স্বাদ নষ্ট হইয়া যায় এবং সহজে হজম হয় না। এই জন্য শাক টাট্‌কা খাওয়াই ভাল।

অন্যান্য শাক অপেক্ষা কন্দশাকের মধ্যে গোল আলুই শ্রেষ্ঠ এবং উহা সকল পরিবারেই নিত্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। *

গোল আলুতে শতকরা ৭১'৭৭ ভাগ

* গোল আলু পূর্ব্বে এসিয়া বা য়ুরোপে ছিলনা। আনীত হয়। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই ইহা সর্ব্ব গৃহস্থের চলেনা। সুতরাং আলুর আবিষ্কারে যে কিন্তু এই আলু আবিষ্কার করিয়া তজ্জন্য স্যার স্যার ওয়ালটার ব্যালে কর্ত্তৃক আমেরিকা হইতে দেশে যথেষ্ট প্রচলিত হইয়াছে। এখন আলু নহিলে যথেষ্ট উপকার হইয়াছে তাহা অস্বীকার করা যায়। ওয়ালটার ব্যালেকে অনেক নির্য্যাতন সহ্য করিতে

জল, ১'৭৯ ভাগ প্রোটিড, ০'১৬ ভাগ চর্ব্বি, ২০'৫৬ ভাগ কার্ব্বোহাইড্রেট্, ০'৭৫ ভাগ সেলুলোজ, এবং ০'৯৭ ভাগ লবণ আছে। প্রোটিড এবং চর্ব্বির ভাগ অত্যন্ত কম বলিয়া কেবল মাত্র আলু খাইলে মনুষ্যের দেহ রক্ষার উপায় হয় না। মৎস্য, মাংস, প্রভৃতি প্রোটিড বহুল খাদ্যের সহিত আলু আহার করিলে উহা উৎকৃষ্ট খাদ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। এদেশে চাউল যেমন প্রধান খাদ্য, আর্য্যাবর্ত্ত দেশে আলু সেইরূপ প্রধান খাদ্য। একজন পূর্ণবয়স্ক আইরিস প্রত্যহ ২।৩ সের আলু খাইয়া থাকে।

আলু সুসিদ্ধ হইলে বেশ সুস্বাদু এবং সহজ-পথ্য হইয়া থাকে। আলু সিদ্ধ করিয়া খাইতে হইলে খোসা শুদ্ধ সিদ্ধ করা উচিত। খোসা ছাড়াইয়া সিদ্ধ করিলে কতক লবণ বহির্গত হইয়া যায়, কিন্তু আমাদের দেশে ঝোল, দালনা, চড়চড়ি প্রভৃতির জল ফেলিয়া দেওয়া হয়না বলিয়া তরকারিতে আলুর খোসা ছাড়াইয়া দেওয়া ভাল।

যে আলু সিদ্ধ করিলে বেশ মাথা-মাথা বা বালি-বালি হয়, তাহাই উৎকৃষ্ট এবং সহজ পাচ্য। কিন্তু যদি আলু কঠিন থাকে, তাহা হইলে মাথা-মাথা হয় না এবং তাহা সহজে জীর্ণ হয় না। যাহাদের পরিপাক শক্তি দুর্ব্বল তাহাদের ঐরূপ আলু খাওয়া উচিত নহে।

গোল আলু ব্যতীত রাঙ্গা আলু, মৌ আলু, চুবড়ি আলু ও শাঁক আলু আমাদের দেশে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। রাঙা আলু ও মৌ আলু এক জাতীয় এবং কাঁচা বা রাঁধিয়া খাওয়া যায়। রাঙ্গা আলু ও মৌ আলুতে যথেষ্ট ষ্টার্চ্চ ও চিনি আছে এবং ইহা বেশ পুষ্টিকর। চুপ্‌ড়ি আলুতেও যথেষ্ট ষ্টার্চ্চ আছে। উহা সিদ্ধ করিলে গোল আলুর ন্যায় সুস্বাদু হয় এবং উহা প্রায় তদ্রূপ গুণযুক্ত। শাঁক আলু কাঁচা খাওয়া যায়। ইহাতে যথেষ্ট জলও যথেষ্টও চিনি আছে।

বিটের কন্দে প্রায় ৮৭ ভাগ জল, ৯ ভাগ কার্ব্বোহাইড্রেট, প্রধানতঃ চিনি ১½, প্রোটিড, এবং একভাগ লবণ আছে। বিট পাকা এবং কঠিন না হইলে সহজে হজম হয়। শালগম, গাজর, মানকচু প্রভৃতিতে যথেষ্ট ষ্টার্চ্চ আছে, কিন্তু অন্যান্য দ্রব্য খুব কম। ইহাদের উপাদানের অল্প-বিস্তর পার্থক্য থাকিলেও সাধারণতঃ ইহারা প্রায় এক প্রকার। কন্দে প্রোটিড ও চর্ব্বি কম বলিয়া মাংস, মৎস্য প্রভৃতি প্রোটিড ও চর্ব্বি বহুল খাদ্যের সহিত আহার করা উচিত।

পেঁয়াজ পুষ্টিকর কিন্তু গরম। পেঁয়াজে কিছু প্রোটেড এবং চিনি আছে। গন্ধক বহুল এক প্রকার তীক্ষ্ণ তৈল থাকায় পেঁয়াজে ঐরূপ গন্ধ অনুভূত হয়। কাঁচা পেঁয়াজ অপেক্ষা সিদ্ধ পেঁয়াজ লঘুপাক। রসুন—পেঁয়াজের ন্যায় গুণযুক্ত কিন্তু তীক্ষ্ণ।

কোঁড়ক বা ভুঁই কোঁড়ে যথেষ্ট প্রোটিড, কিছু চর্ব্বি ও চিনি এবং একপ্রকার অম্লরস আছে। কোঁড়ক যদি সহজে হজম হইত, তাহা হইলে উহা পুষ্টিকর খাদ্যের মধ্যে

হইয়াছিল। মানুষ এমনই অকৃতজ্ঞ। এক্ষণে যাঁহারা আলু ভক্ষণ করেন, তাঁহাদের স্যার ওয়ালটার র‍্যালেগের আত্মার সদ্গতির জন্য প্রার্থনা করা উচিত।

পরিগণিত হইতে পারিত। কিন্তু কোঁড়ক অত্যন্ত দুষ্পাচ্য এবং অনেকেরই উহা সহ্য হয়না। কোঁড়ককে ইংরাজিতে মশরুম (Mushroom) বলে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, মাংস খাইলে কোষ্ঠ বদ্ধতা জন্মে বলিয়া শাক খাওয়া আবশ্যক। তাহা ব্যতীত শাক না খাইয়া, কেবল মাংস খাইলে, স্কার্ভি রোগ হয় বলিয়াও য়ুরোপীয়-দিগের পক্ষে শাক খাওয়া উচিত। কিন্তু আমাদের দেশে শাকের এত অধিক ব্যবহার যে, শাক কমাইয়া দুগ্ধ, ডিম্ব, ঘৃত, মৎস্য প্রভৃতি বেশী খাওয়া উচিত। কিন্তু দেশের এমনই দুর্ভাগ্য, অন্য সুখাদ্য দূরে থাকুক—শাকও দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়িতেছে।

তবে দুষ্প্রাপ্য হইলেও অনেক সময় লোকে প্রচুর মূল্য দিয়া শাক ক্রয় করিয়া থাকে। সেই পয়সায় অন্য শ্রেষ্ঠ সুখাদ্য অনায়াসে খাওয়া যাইতে পারে। খাদ্য-হিসাবে শাকের উপযোগিতা যে অতি কম, তাহা পাঠকগণ এই প্রবন্ধ হইতে বুঝিতে পারিবেন।

মহিলাগণের চিকিৎসা শিক্ষা।

(৩)

(অজীর্ণ ও অগ্নিমান্দ্য)

আমি আজ কা'র মুখ দেখিয়া উঠিয়া-ছিলাম জানি না,—স্নান করিয়া আসিয়া পিসীমার জন্য পূজার যায়গা করিতে বসিয়াছি—এমন সময় আমার স্বামী আসিয়া ডাকিলেন—"পিসীমা।"

পিসীমা তখন বাড়ীতে ছিলেননা, স্নান করিতে গিয়াছিলেন। আমি তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া বলিলাম—"এত ভাবাইতে হয়? সাত আট দিন কোন খবরই নাই, আমরা ভাবনায় মরিয়া যাইতেছিলাম আর কি! যা' হো'ক এসেছ, বাঁচাইলে।"

স্বামী বলিলেন,—"রোজই আসিব-আসিব কথা হইতেছিল, সেইজন্য ৭৷৮ দিন খবর পাও নাই।"

আমি বলিলাম,—"তা' যা' হোক, এখন ঘরে চল, কাপড় চোপড় ছাড়, হাতে-মুখে জল দাও।"

স্বামী বলিলেন,—"পিসীমা কোথায়?"

আমি বলিলাম,—"তিনি এখনি আসিবেন, স্নান করিতে গিয়াছেন।"

স্বামী বলিলেন,—"আমি একটু পরে আসিয়া বসিতেছি, তোমাদের খবর দিতে আসিলাম। আমার সঙ্গে আমাদের খাজাঞ্চি বাবু ও তাঁহার স্ত্রী আসিয়াছেন, খাজাঞ্চি বাবুর স্ত্রীর বড় ব্যারাম, তাঁহারা নৌকাতেই আছেন। আমি একখানা গাড়ীর বন্দোবস্ত করিয়া তাঁহাদের লইয়া আসিতেছি। তাঁহারা আজ আমাদের বাড়ীতে থাকিবেন, তা'র পর কাল ক'লকাতায় যাইবেন। সেইখানে

ভাল ডাক্তারের দ্বারা খাজাঞ্জি বাবুর স্ত্রীর চিকিৎসা হইবে। আমিও বোধ হয় সঙ্গে যাইব।"

আমি বলিলাম—"তা' বেশ। তা'—তাঁ'রা কি জাতি? আমাদের রান্না খাইবেন তো'?

স্বামী বলিলেন,—"খাইবেন, তাঁ'রা আমাদেরই জাতি।" কথা শেষ করিয়া স্বামী চলিয়া গেলেন। আমি নির্নিমেষ-নেত্রে তাঁহাকে দেখিতে লাগিলাম।

অল্পক্ষণ পরে পিসীমা স্নান করিয়া আসিলেন। আমি বলিলাম—"পিসীমা, তাড়াতাড়ি পূজা সাঙ্গ করিয়া লও, আমাদের বাড়ীতে দুইজন কুটম্ব আসিতেছেন। শুধু তাই নয়, তোমাকে বোধ হয় আবার একটী রোগীরও চিকিৎসা করিতে হইবে।"

পিসীমা বলিলেন—"কি রকম?"

আমি সমস্ত কথা খুলিয়া বলিলাম।

পিসীমা পূজা করিতে গেলেন। আমি বাহিরের ঘরটা একটু ঝাঁট-ঝোট্ দিয়া পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়া আসিলাম। স্বামী, খাজাঞ্জি বাবু ও তাঁহার পত্নীও অল্প কাল পরে আসিয়া পঁহুছিলেন। আমাদের বাড়ীতে একটা যেন মহা সমারোহ পড়িয়া গেল।

খাজাঞ্জি বাবুর স্ত্রী একে অভ্যাগত হইয়া আসিয়াছেন, তাহার উপর রোগী,—আমি ও পিসীমা তাঁহার যত্ন বিশেষ করিয়াই করিতে লাগিলাম। তাঁহার সহিত আলাপ আপ্যায়নে আমরাও বড় সন্তুষ্ট হইতে লাগিলাম। অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁহার সহিত আমার যেন সখীত্ব জন্মিয়া গেল।

আহারাদির পর, বিশ্রামের পর—বৈকালে বেলা তাঁহার ধরণী-চুম্বিত-নিবিড়কৃষ্ণ অলকারাশি বন্ধন করিয়া দিতে দিতে বলিলাম, —"আপনারা কালই যাইবেন? আমার ইচ্ছা, এখানে দিন কয়েক কাটাইয়া যান, কিন্তু সে কথা শুনিবেন কি?"

খাজাঞ্জী বাবুর স্ত্রী বলিলেন,—"শুনিব না কেন? খুবই শুনিব। আপনাদের আদর-যত্ন দেখিয়া এস্থান ত্যাগ করিয়া যাইতে দুঃখ হয়, কিন্তু শুনিয়াছেন তো, আমি রোগে ভুগিতেছি, আর তাহারই জন্য তো কলিকাতা যাইতেছি, সুতরাং ইচ্ছা থাকিলেও তো থাকিবার যো নাই।"

আমি বলিলাম, "আর যদি আপনার রোগ সারাইবার উপায় এইখানেই করা হয়। তা' হ'লে তো থাকিতে রাজি আছেন?"

তিনি বলিলেন—"তা' হ'লে আর রাজি হইব না কেন? কিন্তু এত বড় শক্ত রোগ—এখানে কে সারাইবে? সেখানকার বড় বড় ডাক্তারেরা তো হারি মানিয়াছে। সেই জন্যই তো কল'কাতায় যাওয়া, নইলে আর ছুটী লইয়া—পয়সা খরচ করিয়া লইয়া যাইবেন কেন?"

আমি বলিলাম—"আপনি যদি নির্ভর ক'র্‌তে পারেন, তা' হ'লে বড় বড় ডাক্তারেরা যা' আরাম ক'র্‌তে পারেননি, তা' আমার পিসীমা-ডাক্তারে মন্ত্রের মত আরাম ক'রে দেবেন। পিসীমা আমার এমনতর অনেক রোগই আরাম ক'রেছেন। কিন্তু আপনি নির্ভর ক'র্‌তে পারবেন কি?"

খাজাঞ্জী বাবুর পত্নী বলিলেন,—'সন্তঃ, উপকার দেখতে পেলে নির্ভর ক'র্‌তে পা'রব না কেন; তা' যদি হয়, তা' হ'লে

তো আমাদের ক'লকাতা যাওয়ার জন্য অনেক টাকা খরচও বেঁচে যেতে পারে, আর উনিও দিন কতক আমাকে এখানেই রেখে চাকরি স্থানে গিয়ে আবার চাকরিতে লাগ্‌তে পারেন।"

আমি বলিলাম—"দেখুন, আপনারা যে নৌকায় আসিয়াছেন, তা' এখান থেকেই ছাড়িয়া দিন। আপনার স্বামীকে ব'লে এখানে এক সপ্তাহ থেকে যদি কোন ফল বুঝ্‌তে না পারেন, তা'র পর কল'কাতা যা'বেন। তখন এখান থেকেই নৌকা ক'রে গেলে চ'লবে, এখানেও তো নৌকা পাওয়া যায় না—এমন নয়।"

খাজাঞ্চী বাবুর পত্নী সে কথায় সম্মত হইলেন, তাঁহার স্বামীও এপ্রস্তাবে অসম্মত হইলেন না, পিসীমাও তাঁহার চিকিৎসার ভার গ্রহণ করিতে রাজি হইলেন।

পিসীমা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বয়সটা কত হইয়াছে?" খাজাঞ্চী বাবুর গৃহিণী বলিলেন,—"সতের বৎসর।"

পিসীমা শুধাইলেন—"ছেলে পিলে হয় নি?"

খা-স্ত্রী।—না।

পিসী। অসুখের অবস্থাটা সব খুলে বল দিকিনি।

খা-স্ত্রী। এক বছর থেকে এ রকমটা হ'য়েছে। রোগটা কবিরাজেরা ব'লেছিল—অজীর্ণ। নানা রকম ব্যবস্থাও করা হ'য়েছিল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'ল না।

পিসী। কি হয়?—যা' খাও—তা' জীর্ণ হয় না। দাস্ত কেমন হয়?

খা-স্ত্রী। রোগই তো ঐ। দাস্ত প্রায়ই ভাল হয় না, দশ পনের দিন পরে আবার বা একদিন খুব খানিক হড়্‌হড়্‌ ক'রে দশ পনের বার দাস্ত হ'য়ে প'ড়ল।

পিসী। অম্বল হয়? বুক জ্বলে কি?

খা-স্ত্রী। হাঁ। বিকেল বেলা রোজই বুক জ্বলে। সকাল বেলা পেটটা ফেঁপে থাকে। খেলেও হয়,—না খেলেও হয়—সর্ব্বদাই যেন পেটটা ভ'রে আছে বোধ হয়।

পিসী। তুমি পরিশ্রম কি রকম কর? রান্না-বান্না—সংসারের কাজ-কর্ম্ম কি নিজেই কর,—না সংসারের অন্য লোকজন আছে!

খা-স্ত্রী। কাজ-কর্ম্ম আমি বড় ক'র্‌তে পারি না,—রান্নাবান্না আমাকে ক'র্‌তেও হয় না—অন্য লোকজন বাড়ীতে নাই কিন্তু ঝি ঠাকুর চাকর—সবই আছে,—সেই জন্য আমাকে কাজ-কর্ম্ম বড় একটা ক'র্‌তে হয় না।

পিসী। ঐ তো হ'চ্ছে তোমার রোগের কারণ, ও সব যদি না থাক্‌তো, তা' হ'লে তোমার কোন রোগই হ'ত না। আমার চিকিৎসায় থা'ক্‌তে হ'লে তোমাকে খাট্‌তে হ'বে, চুপ ক'রে ব'সে থাক্‌লে চ'ল্‌বে না।

খা-স্ত্রী। তা' খাট্‌তে আমি রাজি আছি, কিন্তু খাট্‌বার শক্তি তো থাকা চাই,—কাজ কর্ম্ম ক'র্‌তে গেলে যে বড্ড কষ্ট বোধ হয়।

পিসীমা। অভ্যাস ওই রকম ক'রেছ—তাই কষ্ট হয়, আবার খাট্‌বার অভ্যাস ক'র্‌লে খাট্‌তে পা'র্‌বে।

খা-স্ত্রী। তা' ওষুধের ব্যবস্থাটা কি ক'র্‌বেন?

পিসী। ওষুধের ব্যবস্থা ব'লব বই কি! তা' ওষুধের ব্যবস্থা তো তোমায় শুধু ব'ল্‌লে হ'বেনা, আমার বউমায়েরই ওষুধের কথা

গুলি ভাল ক'রে শুন্‌তে হ'বে। বউমাই তো ব্যবস্থা শুনে ওষুধ তৈরি ক'রে দেবেন।

আমি বলিলাম—তুমি বল না পিসীমা, আমি তো সব শুন্‌ছি।

পিসীমা বলিলেন,—আমাদের বাগানের গাছের পাতি লেবুর গাছটার লেবুগুলো যে ফুরিয়ে গেল। কাল বাজার থেকে কতকগুলো পাতিলেবু আনা'তে হ'বে। আর খানিকটা বিট নুন আনা'তে হ'বে। কতকগুলো ডাবও চাই। সকাল-সন্ধ্যেয় দু'বার ক'রে দু'আনা ভ'র বিট নুনের গুঁড় মুখে ফেলে একটু জল খেতে হ'বে। সকালে ঐটে খাওয়ার এক ঘণ্টা পরে—বড় হ'লে আধখানা—আর ছোট হ'লে একটা পাতি লেবুর রস এক ছটাক জলে গুলে সেই জলটা চুমুক দিয়ে খেতে হ'বে। দু'পর বেলা ভাত খাওয়ার একঘণ্টা পরে আধ পোয়া টাট্‌কা ঘোল ঐ রকম দু আনা ভ'র বিট নুনের গুঁড় মিশিয়ে সেইটে খেয়ে ফেল্‌বে। বিকাল বেলা খানিকটা ডাবের জল— এ ছাড়া আমি আর কোন ওষুধের ব্যবস্থা ক'রব না,—এই আমার ওষুধ।

খা-স্ত্রী। সে কি!—এত বড় রোগ, এতেই সেরে যা'বে?

পিসী। এসব রোগ মা, ওষুধে সারে না, এ সব রোগ সারে নিয়মে। একটু বেছে-গুছে খাওয়া, পরিশ্রম করা—এই সবই হ'ল—এসব রোগের ওষুধ। লোকনাথ বদ্দি ব'লত—অজীর্ণ সারা'তে হ'লে পরিশ্রমের মত ওষুধ নেই, কোন ওষুধ না খেয়ে শুধু পরিশ্রম ক'র্‌লেও নাকি অজীর্ণ রোগ সেরে থাকে।

খা স্ত্রী। তা' আমি আপনার ব্যবস্থা‌‌‌‌‌‌—তেই দিন কতক খা'কব, কিন্তু শুধু এতে সা'র্‌বে কিনা তাই ভাবছি।

পিসী। ওই ভাবনাইতো হ'য়েছে রোগ না সারবার কারণ। মনটা যদি স্থির ক'র্‌তে পার এবং আমার কথাগুলি যদি সব পালন কর—তা' হ'লে তুমি যে এখান থেকেই সার্‌তে পা'রবে, তা' আমি খুব জোর ক'রে ব'ল্‌তে পারি। তবে আরও কতকগুলি নিয়ম পালন ক'র্‌তে হ'বে। দিনের বেলায় ঘুমাও কি?

খা-স্ত্রী। একটু ঘুমাই বই কি, খাওয়ার পর দু'তিন ঘণ্টা ঘুমান অভ্যাস আছে।

পিসী। তা'তে আর অজীর্ণ হ'বে না। লোকনাথ বদ্দি ব'লত—

দিবা নিদ্রা আয়ু হরে।
এ কাজ যেন কেউ না করে॥

লোকনাথ বদ্দি আরও ব'লত—যতগুলি কারণে অজীর্ণ রোগের উৎপত্তি হয়, তা'র মধ্যে দিনে ঘুমানো একটি প্রধান কারণ। দিনে ঘুমানো, রাত্রি জাগরণ, অধিক জলপান, অল্প খাওয়া, বেশী খাওয়া বা অসময়ে খাওয়া, মল মূত্রাদির বেগ ধারণ করা—এই সব কারণে অজীর্ণ রোগ উপস্থিত হয়। তা' এখনকার দিনে হেলায়-শ্রদ্ধায় এর অনেকগুলি কারণই অনেকে ক'রে থাকে। বাঙ্গালা দেশে অজীর্ণ রোগেও সেইজন্য লোকে বেশী ভোগে শুন্‌তে পাওয়া যায়।

আমি বলিলাম,—কি রকম নিয়মে থাকৃলে অজীর্ণ রোগ হয় না পিসীমা?

পিসীমা বলিলেন,—লোকনাথ বদ্দি অজীর্ণ রোগ জন্মাবার যে কারণগুলি ব'লত —ব'ললাম, সেগুলি না ক'র্‌লেই অজীর্ণ রোগ জন্মা'বার কোন ভয় থাকে না। সে-

কালে মেয়েমানুষদের রোগের কথা কে কবে আবার জান্‌তে পা'র্‌তো। সেকালের মেয়েমানুষেরা—যত বড় ঘরের মেয়েই হোন,—ছড়া-ঝাঁট দেওয়া, ঘর-দুয়ার পরিষ্কার করা রান্না-বান্না করা—এই সব নিয়েই থাকৃত। গৃহস্থ-সংসারের মেয়েরা সকাল বেলা এক পেট ক'রে পান্ত ভাত খেয়ে নিয়ে তা'রপর কাজ কর্ম্ম ক'রত। পরিশ্রমের গুণে সে পান্ত ভাত দণ্ড দু' তিনের মধ্যে কোথায় যে হজম হ'য়ে যে'ত তার ঠিক থা'কত না। শ্বশুর-শাশুড়ী, স্বামী-দেওর, ছেলে-মেয়ে সকলকে খাইয়ে বেলা আড়াই প'র—তিন প'রের সময় আবার তা'রা বেশ ক'রে আহার ক'রত। এখন সেরূপ কাউকে করাও দেখি ? অমনি বুক জ্ব'ল্‌বে—অমনি ঢেকুর উঠ্‌বে—অমনি অম্বল হ'বে। এখন পান্ত ভাতের স্থানে হ'য়েছে চা। পুরুষেরাও চা খান, দেখাদেখি মেয়েরাও তা' খেতে শিখেছেন। অনেকের আবার এক বেলা কি দুই বেলা খেয়েও তৃপ্তিলাভ হয় না, দিনের মধ্যে পাঁচ সাতবার এই চা'ই খাচ্ছেন। এত চা খেয়ে ক্ষিদে থা'কবে কোথেকে! অজীর্ণ হ'বেনা কেন ? এই রকম ক'রেই তো আমোদের দেশ নষ্ট হ'তে ব'সেছে।

আমি বলিলাম—পিসীমা, তুমি এত'ও জান!

পিসীমা বলিলেন,—না জান্‌লে আর তোমাকে মনের মত ক'র্‌তে পেরেছি। আমাদের পাড়ার সবাই পান্ত ভাত খাওয়া বন্ধ ক'রেছে, কিন্তু আমি তোমাকে সেই সাবেক চালে রেখেছি, সেইজন্যই ব'লতে নেই,—তোমার শরীরটে এত খাটুনিতেও এখনো ভেঙ্গে প'ড়েনি।

খাজাঞ্চি বাবুর স্ত্রী সকল শুনিয়া বলিলেন, "আমি আপনার উপদেশ শুনিয়া নিয়ম পালন কর্‌ব। আহারের ব্যবস্থাটা আমার কি হবে ?"

পিসী।—দু'বেলাই ভাত, মাছের ঝোল, পটল-বেগুন-ঝিঙ্গে-উচ্ছে-করলা-ডুমুর-মান কচু-ওল-পেঁপে—এই সমস্তর তরকারি। ডালের মধ্যে শুধু মুগের ডাল। জল খাবার জন্য কিছু খেতে দেবনা—খুব ভাল সন্দেশ হ'লে দু'একটা দিতে পারি, তা'ছাড়া মুড়ি-নারকেল—আদা-নুন। দিনের বেলা ঘুমা'তে পা'বে না, রাত্রিও জা'গতে পা'রে না। দিনের বেলা দুই প্রহরের মধ্যে এবং রাত্রিতে এক প্রহরের মধ্যে আহার ক'রতে হ'বে। আর সকাল থেকে আমার বউমার সঙ্গে সংসারের কাজ কর্ম্ম ক'র্‌তে হ'বে।

খাজাঞ্চি বাবুর স্ত্রী বলিলেন, "আমি আপনার উপদেশ বর্ণে বর্ণে পালন ক'রব।"

তাহার পর দিন হইতে তাঁহার চিকিৎসার সকল ব্যবস্থার ভার আমার উপর পড়িল। আমি পিসীমার ব্যবস্থানুসারে সকল বিষয়ের বন্দোবস্ত করিয়া দিলাম। ফলে এক সপ্তাহেই তিনি এরূপ উপকার বোধ করিলেন যে, তখন আর তাঁহার জন্য আমাকে আর বেশী ব্যস্ত হইতে হইল না, তিনি নিজেই নিজের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন।

এইরূপ ভাবে যখন একমাস কাটিয়া গেল—তখন আর তাঁহার রোগের চিহ্ন মাত্র থাকিল না। এই সময় তাঁহার স্বামী বাড়ী যাইবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। পিসীমার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করা হইল। পিসীমা অনুমতি প্রদান করিলেন, কিন্তু

বলিয়া দিলেন, —এইরূপ নিয়মে ৬ মাস থাকিতে হইবে।

সে আজ দশ বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। এই দশ বৎসরের মধ্যে তাঁহার পত্রে অবগত আছি—তাঁহার তিনটি পুত্র ও একটি কন্যা সন্তান হইয়াছে এবং অজীর্ণ কাহাকে বলে—একদিনও তাহা জানিতে পারেন নাই। আমি তাঁহা অপেক্ষা বয়সে একটু বড় বলিয়া তিনি আমাকে 'দিদি' সম্বোধন করিয়া পত্র লেখেন। শেষ চিঠি খানিতে লিখিয়াছেন,—"দিদি, আপনাদের কৃপায় আমিতো নির্ব্যাধি হইয়াছিই, তা'ছাড়া পিসীমার উপদেশে রাঁধুনি-বামুন ছাড়াইয়া দিয়া রান্না-বান্নার কাজ আমি সহস্তে করিয়া থাকি বলিয়া স্বামীর অর্থও অনেকটা বাঁচাইতে পারিতেছি। এখন বুঝিয়াছি, রাঁধুনি রাখা একটা অপব্যয় মাত্র এবং শুধু অপব্যয় নহে,—শরীর নষ্টেরও একটি কারণ। আমার মেয়েটির বয়স আট বৎসর, আমি এই বয়স হইতেই তাহাকে আমার কাজ কর্ম্মের-সাহায্যকারিণী করিয়া তুলিতেছি।"

আমি পিসীমাকে পত্রের কথা শুনাইলাম। তিনি আহ্লাদে আটখানা হইলেন।

ফলপ্রদ মুষ্টিযোগ।

—:•:—

পালি জ্বরে—

পালির দিন,—অধৌত মুখ রোগীকে ন্যাকড়ার পুঁটলী করিয়া আঃসেওড়ার পাতা শুঁকিতে দিবে। ইহা অব্যর্থ।

পালি দিনে—নিমুকার লতা—পুরুষ ডান হাতে, স্ত্রীলোক বাম হাতে বাঁধিবে, সে দিন আর জ্বর আসিবেনা।

ধবল কুষ্টে—

ওকড়ার ফল গোমূত্রে বাটিয়া প্রলেপ দিবে।

দদ্রু রোগে—

বড় এলাচের গুঁড়া—ঘোল সহ প্রলেপ দিবে।

মুখের ব্রণে—

(ক) নির্ব্বিষীর পাতা দুগ্ধে বাটিয়া প্রলেপ দিবে।

(খ) মহিষির গোবর নেকড়ায় বাঁধিয়া গরম করিয়া—ব্রণের উপর সেক দিবে।

(গ) পানবাইয়ের পাতা বাটিয়া প্রলেপ দিবে।

মসূরিকায়—

কণ্টকারীর শিকড়, গোল মরিচ সহ বাটিয়া খাইলে—বসন্তের আর ভয় থাকে না।

কাটা ঘায়ে—

(ক) আপাং গাছের শিকড় বাটিয়া প্রলেপ দিবে। (খ) গোরক্ষ চাকুলের পাতা দিয়া বাঁধিয়া রাখিবে। তৎক্ষণাৎ রক্ত বন্ধ হইবে, ব্যথা থাকিবেনা, ঘা' জুড়িয়া যাইবে। (গ) খয়েরের গুঁড়া ছড়াইয়া দিলে কাটা ঘা শুকায়। (ঘ)কেশুরের পাতার রস দিলে, ব্যথা থাকেনা, রক্ত বন্ধ হয়, ঘাও শীঘ্র শুকায়।

অজীর্ণে ব্যবস্থা।—

(১) দুই আউন্স বা একছটাক জলে একটি পাতি বা কাগজি লেবুর রস নিঙড়াইয়া মিশাইয়া লও। সেই রস মিশ্রিত জল প্রাতে ১ বার ও বৈকালে ১ বার পান কর, উপকার হইবে। (২) প্রাতঃকালে কিঞ্চিৎ গরম জল পান করিলে অজীর্ণ রোগে উপকার হইয়া থাকে। (৩) দিবসে আহারের পর টাট্‌কা ঘোল পান করিলে অজীর্ণ-রোগীর উপকার হইয়া থাকে।

শ্রীনন্দলাল বসু রায়।

সমালোচনা।

ধর্ম্মের তিনটি পথ।—ডাক্তার শ্রীমহেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য প্রণীত ও প্রকাশিত। মূল্য ৵৹ আনা। কর্ম্মমার্গ, জ্ঞানমার্গ ও ভক্তিমার্গ—এই ত্রিবিধ পথই যে ধর্ম্ম অর্জ্জনের উপায়—"গীতার" বিশ্লেষণ করিয়া এই গ্রন্থে তাহাই সহজ ভাবে বুঝান হইয়াছে। গ্রন্থারম্ভে জন্ম ও মৃত্যু কি?—এসকল কথাও বুঝাইবার জন্য গ্রন্থকার প্রয়াস করিয়াছেন। তাঁহার এ প্রয়াস সিদ্ধও হইয়াছে। গীতার বিশ্লেষণে গ্রন্থকারের গীতা আয়ত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। জীবে দয়া সর্ব্ব প্রধান ধর্ম্ম। জীবে দয়া করিতে হইলে জীবের সেবা করিতে হয়। সে সেবার পরম পুরুষেরই সেবা করা হয়। কর্ম্ম-মার্গ, জ্ঞান-মার্গ এবং ভক্তি-মার্গ—সকল মার্গেরই মুখ্য-পন্থা যদি এই "জীবে দয়া" বা "জীবে সেবা করা উচিত" ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে স্বতন্ত্র ভাবে আর কোন মার্গ অনুসরণেরই আবশ্যকতা হয় না। তখন ধর্ম্ম-মার্গ, জ্ঞানমার্গ এবং ভক্তিমার্গ—একই বলিয়া প্রতীতি হইবে। সহজ ভাবে, সরল করিয়া এই ক্ষুদ্র পুস্তকে অনেক ধর্ম্ম-কথাই বলা হইয়াছে। ধর্ম্ম-পিপাসুগণ এ গ্রন্থে ধর্ম্ম রহস্য জানিতে পারিবেন।

বিবিধ প্রসঙ্গ

সুচিকিৎসকের লোকান্তর।—পাশ্চাত্য-চিকিৎসকমণ্ডলীর অগ্রণী সার চার্লস পাড্রে লিউকিস লোকান্তরিত হইয়াছেন শুনিয়া আমরা যারপরনাই দুঃখিত হইয়াছি। ইনি পাশ্চাত্য-চিকিৎসা-বিদ্যায় সুপণ্ডিত হইয়া শুধুই যে পাশ্চাত্য চিকিৎসার পক্ষপাতী ছিলেন এমন নহে, আয়ুর্ব্বেদের সুগভীর রহস্যগুলি ইনি অবগত ছিলেন, এজন্য আয়ুর্ব্বেদীয়-চিকিৎসার যথেষ্ট সমাদর করিতেন। আমাদের অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে ইঁহার মুখে সর্ব্বদাই আশার কথা শুনা যাইত। মেসোপোটেমিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে হাসপাতাল, ঔষধপত্র, সেবা, চিকিৎসা প্রভৃতির সুব্যবস্থা করিবার জন্য ইনি ভারতের বৈদ্যক বিভাগের নায়কের আসন গ্রহণ করিয়া প্রশংসিত হইয়াছিলেন। ইঁহার বিয়োগে আমরা যথেষ্ট বেদনা অনুভব করিয়াছি।

—

ধন্বন্তরির পূজা।—কিছু দিন হইল মাদ্রাজের আয়ুর্ব্বেদ কলেজে 'ধন্বন্তরি'র পূজা হইয়া গিয়াছে। সহযোগী 'নায়ক' এই

উপলক্ষে বলিয়াছেন,—"আমাদের দেশে বৈদ্যমণ্ডলে মতান্তর ও মনান্তর ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইনা।" আমরা নিজেরা ইহার উপর আর অধিক কি বলিব? এই জন্যই তো আমাদের দেশে বৈদ্য-চিকিৎসার উন্নতি নাই।

কবিরাজের বিয়োগ।—গত ৩১শে অগ্রহায়ণ কবিরাজ প্রকৃতিপ্রসন্ন সেন হৃদ্‌রোগে পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে ইঁহার বয়ঃক্রম ৫২ বৎসর হইয়াছিল। হুগলি জেলার সোমড়া গ্রামে ইঁহার পৈত্রিক নিবাস। কলিকাতা সিমলা অঞ্চলে থাকিয়া ইনি চিকিৎসা-ব্যবসায় করিতেন। বেঙ্গল কেমিকেল ওয়ার্কসের ঔষধ প্রস্তুতের সহিত ইঁহার সম্বন্ধ ছিল। বিচক্ষণতা-গুণে ইনি এই সহরে একজন সুচিকিৎসক বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। ইঁহার বিয়োগে আমরা বিশেষ ব্যথা অনুভব করিতেছি। ভগবান ইঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রাণে শান্তিবারি প্রদান করুন।

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়।—সহযোগী "ধন্বন্তরি" সংবাদ দিতেছেন,—"ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত টাঙ্গাইল মহকুমার সদর ষ্টেসনে একটি অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।" সুখের কথা সন্দেহ নাই। আমরা অনেকবারই বলিয়াছি,—অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদের পূর্ণ সাধনা না করিলে লুপ্তপ্রায় আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার উন্নতির সম্ভাবনা নাই। সুতরাং মফঃস্বলেও এরূপ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠায় আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার শুভ চিহ্ন বলিতে হইবে।

আমাদের সম্বন্ধে 'ধন্বন্তরি'।—কিন্তু এই উপলক্ষে 'ধন্বন্তরি' আমাদের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের বেতন-নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে একটু কটাক্ষ করিয়াছেন। টাঙ্গাইলের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে বেতন-গ্রহণের ব্যবস্থা নাই, উপরন্তু আহার ও বাসস্থানও দেওয়া হয়, কিন্তু আমাদের বিদ্যালয়ে বেতন গ্রহণ করাও হয়—আহার—বাসস্থানও দিবার নিয়ম নাই—ইহাই তাঁহার বলিবার বিষয়। তিনি এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—আমাদের এ ব্যবস্থায় খরচটা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-ব্যয় অপেক্ষা কম পড়িবে না। ব্যয় সম্বন্ধে 'ধন্বন্তরি' যাহা বলিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ সত্য, কিন্তু এই বিদ্যালয় হইতে উত্তীর্ণ ছাত্রগণ বিশ্ববিদ্যালয়ের চরম উপাধি প্রাপ্ত ছাত্রগণ অপেক্ষা দেশের কাজেই হউক—আর আত্মোন্নতির পক্ষেই হউক—সকল বিষয়েই যে অধিক উৎকর্ষ লাভ করিবে, ইহা তো নিশ্চিত কথা। সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত এই বিদ্যালয়ের শিক্ষা-ব্যয় সমান হইলেও লাভ ভিন্ন তো ক্ষতির কারণ কিছুই দেখিনা। তাহার পর, টাঙ্গাইলে ছাত্রগণকে কোন ব্যয়ভারই বহন করিতে হয় না, আমাদের বিদ্যালয়ে করিতে হয়; আমাদের ব্যয়াধিক্যই তো ইহার কারণ। কলিকাতার মত সহরে এরূপ বিদ্যালয়ের পরিচালনায় আমাদিগকে যে কিরূপ ব্যয়ভার বহন করিতে হয়, তাহা কি আর বলিতে হইবে?

আয়ুর্ব্বেদ

মাসিকপত্র ও সমালোচক।

২য় বর্ষ। বঙ্গাব্দ ১৩২৪—মাঘ। ৫ম সংখ্যা।

কাজের কথা।

—:o:—

ধর্ম্ম ও স্বাস্থ্য।—ধর্ম্মের সহিত স্বাস্থ্যের যে অতি নিকট সম্বন্ধ—একথা লইয়া বাদানুবাদ করিবার কিছুই নাই। সদাচার-পালনে স্বাস্থ্যরক্ষা হইয়া থাকে, ইহা তো সর্ব্ববাদিসম্মত। পক্ষান্তরে সদাচার-পালনে মানসিক প্রফুল্লতা সাধিত হইয়া থাকে। সেই মানসিক প্রফুল্লতাই মানবের স্বাস্থ্যোন্নতির কারণ। সেকাল অপেক্ষা একালে স্কুল-কলেজে বিদ্যাশিক্ষার জন্য রাশি রাশি গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে হয়, কিন্তু সদাচার-পালন-শিক্ষা করিবার জন্য কোন গ্রন্থই নাই। ফলে দেশের ভবিষ্যৎ আশা-ভরসার স্থল যুবকগণ কর্ম্মময়-জীবনে প্রস্তুত হইবার জন্য যেরূপ চেষ্টা করিতেছেন, স্বাস্থ্য-সুখলাভের জন্য সেরূপ কর্ম্মঠ হইতে প্রয়াস পাইতেছেন না। বাঙ্গালাদেশ হইতে ব্রহ্মচর্য্য পালনে অভ্যস্ত হওয়ার বিধি এইরূপেই উঠিয়া গিয়াছে। ফলে অধুনা অনাচারের আবিলতায় বাঙ্গালী—সন্তানের দেহ যেরূপ কলুষ-পঙ্কিল হইয়া পড়িতেছে, বাঙ্গালী-বয়স্কের অকালে জরা ও মরণ উপস্থিত হওয়ার ইহাই কারণ।

* * *

অমৃতে অরুচি।—দুগ্ধের অপর নাম পয়ঃ। এই পয়ঃ অর্থে অমৃতও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শাস্ত্রকার দুগ্ধের গুণ ব্যাখ্যায় ইহাকে অনেকগুলি অভিধান প্রদানের ভিতর বলকর, মেধাজনক, আয়ুস্কর ও বয়ঃসংস্থাপক আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। সেকালে বাঙ্গালী এ সকল শাস্ত্রকথা মানিত, সেইজন্য আহারকালে পরম সুখে পয়ঃ বা দুগ্ধ পানও করিত। এখন সে দুগ্ধ-পানের স্পৃহা দেশ হইতে উঠিয়া গিয়াছে। দুগ্ধ, ঘৃত, ছানা, মাখন—এ সকল পুষ্টিকর আহারীয়ের স্থলে অধুনা চপ-কাটলেট-কোর্ম্মা-দোর্ম্মাই বাঙ্গালী যুবকের নিকট অধিক আদরণীয় হইয়া পড়িয়াছে। ফলে ব্রহ্মচর্য্য হারাইয়া, অনাচারে অভ্যস্ত হইয়া, বাঙ্গালী যুবক—একদিকে যেরূপ

বলক্ষয়ের কারণ করিয়া তুলিতেছে, আয়ুস্কর দ্রব্য সেবনের অভাবে সে ক্ষয় আর পূর্ণ হইতেছে না। অধুনা অনেকের মুখেই শুনা যায়—তাঁহার দাস্ত পরিষ্কার হয় না। ইহার জন্য তাঁহারা ঔষধ সেবনে প্রস্তুত, তথাপি দুগ্ধ—পয়ঃ বা অমৃতের আস্বাদন লইবেন না। ফলে এই অমৃতে অরুচি উপস্থিত হওয়াও বাঙ্গালী-যুবকের স্বাস্থ্যোন্নতির বিঘ্ন জন্মাইবার আর একটি কারণ।

* * *

শাক-সব্জির উপকারিতা।—সেকালে দেহের পুষ্টি বিধানের জন্য দুগ্ধ-ঘৃত-ছানা-মাখন—এ সকলের ব্যবস্থা যেরূপ দেশমধ্যে যথেষ্ট প্রচলিত ছিল, শাক-সব্জির উপকারিতাও দেশের লোকে সেইরূপ বিলক্ষণ উপলব্ধি করিত। এখন বাঙ্গালী-যুবকের রসনায় আর শাক-সব্জির আস্বাদ-গ্রহণ রুচেনা। কিন্তু যে সময়ে শুশুনি কলমে-হেলেঞ্চার আস্বাদনে বাঙ্গালী বীতশ্রদ্ধ হয় নাই, সে সময়ে এখনকার মত বাঙ্গালা দেশ অজীর্ণ-প্রবণ হইয়া পড়ে নাই। সে কালের দুগ্ধ-ঘৃতের মত বা এ কালের কোর্ম্মা-দোর্ম্মার মত শাক-সব্জির ভিতর সেরূপ প্রত্যক্ষভাবে পুষ্টিবর্দ্ধনের শক্তি থাকুক আর না থাকুক, পরোক্ষভাবে সেই সকল শক্তি উহাতেও নিহিত আছে, তাহা অস্বীকার করিবার যো নাই। বিশেষ-বিশেষ শাক-পাতারি সেবনে পাকস্থলীর ক্রিয়া সুপরিস্কৃত হইয়া থাকে। সেই পাকস্থালীর ক্রিয়া সুপরিস্কৃত হইলেই তো তাহা হইতে বল-সঞ্চয়ের উপায়-বিধান হইয়া থাকে। বাঙ্গালীর শ্যামাপূজার চতুর্দ্দশী তিথিতে এইজন্যই চৌদ্দশাক মিশাইয়া একত্র খাইবার ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ। শাক-পাতারি-সেবী বাঙ্গালী বিধবাদিগের স্বাস্থ্যোন্নতিও আমরা এ কথার পোষকতায় সাক্ষ্য প্রদান করিতে পারি। বায়ু শান্তির জন্য বৈদ্য প্রদত্ত ঔষধের অনুপানেও অনেক সময় যে শাক-পাতারির রসের আবশ্যক হয়,—ইহাও আমাদের কথার অন্যতর প্রমাণ। আমাদের দেশের লোকে এ সকল কথা চিন্তা করিবেন কি?

* * * *

শিক্ষায় ব্রহ্মচর্য্য।—আমাদের মনে হয়—ব্রহ্মচর্য্য পালনের উদ্দেশ্য বুঝাইবার জন্য শিক্ষা বিভাগ হইতে ঐ বিষয়ক একখানি পুস্তক পাঠ্য-তালিকাভুক্ত হওয়া কর্ত্তব্য। বাল্যজীবনই ব্রহ্মচর্য্য-পালনের প্রকৃষ্ট সময়। সে কালে গুরুগৃহে অধ্যয়ন-নিরত-বালকগুলীর ব্রহ্মচর্য্য-পালনের কথা আমরা অনেকবারই বলিয়াছি। এখন সে গুরুগৃহও নাই, সেরূপ শিষ্যেরও অভাব ঘটিয়াছে। দেশের দুর্গতি তো এইজন্যই। অল্পমতি বালকদিগকে কীট-দংশন হইতে রক্ষা করিবার জন্য দেশের কৃতিপুরুষগণ এ বিষয়ে চিন্তা করুন—ইহাই আমরা দেখিতে ইচ্ছা করি।

* * * *

আহারে আয়ুরক্ষা।—আয়ুরক্ষার জন্য উপযুক্ত আহারের নিতান্তই প্রয়োজন। আহারীয় সারাংশই রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জারূপে আমাদের যে আয়ুরক্ষার সহায়তা করিতেছে, একথা আমরা ইতঃপূর্ব্বে অনেক বার বলিয়াছি। ধর্ম্ম বল, অর্থ বল, কাম বল, মোক্ষ বল—আরোগ্যই যে সকল বিষয়ের মূল, তাহা তো শাস্ত্রকার

মাথার দিব্য দিয়া বলিয়া গিয়াছেন। সেই আরোগ্য লাভ করিলেই আয়ু রক্ষার উপায় করা হইবে। আরোগ্য লাভের জন্য যতগুলি নিয়মের প্রয়োজন, আহারের ভক্ষ্যাভক্ষ্যের বিচারকরণ তাহার অন্যতর। সেইজন্যই আমাদের পক্ষে শাস্ত্রবিধি-পালনের একান্ত প্রয়োজন। একালে—পাশ্চাত্য-বিজ্ঞানের যুগে যখন আমরা আহার-বিহার—সকল বিষয়েই স্ব স্ব মত-প্রচলনে নানারূপ আধি-ব্যাধির চির সহচর হইয়া পড়িতেছি, তখন সে সকল মত ছাড়িয়া দিয়া, ঋষি প্রদর্শিত পন্থা অনুসরণ করিলে হানি কি? শাস্ত্র শব্দের অর্থ শাসন-বাক্য। দেশ রক্ষার জন্যই তো সে শাসন-বাক্যের প্রয়োজন হইয়াছিল। সে বাক্যের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া যখন আমাদের স্বাস্থ্যোন্নতির অন্তরায়ই ঘটিতেছে, তখন আবার সেই শাস্ত্র বাক্য পালন করিবার প্রয়োজনীয়তা হয় নাই কি? এখনও যদি না হইয়া থাকে, তাহা হইলে আর কবে হইবে?

* * * * *

বাঙ্গালীর ব্যাধি।—আগেকার সহিত তুলনা কর, বাঙ্গালী আগে অধিক ব্যাধি প্রবণ ছিল, না এক্ষণে অধিক ব্যাধি সঙ্কুল হইয়াছে? জ্বর-জ্বালার নাম বাঙ্গালী আগে খুব কমই জানিত, অজীর্ণ-উদরাময়—এ সকলেও সেকালে বঙ্গবাসী বেশী ভুগিত—এরূপ কথা শুনা যায় নাই। এখন বাঙ্গালাদেশে জ্বর জ্বালাও যেরূপ, অজীর্ণ-উদরাময়ও তাহাপেক্ষা কম নহে। অগ্নিমান্দ্য তো স্ত্রী পুরুষ সকলেরই। ইহা ভিন্ন শত করা নিরানব্বই জন বাঙ্গালা দেশে ধাতু দৌর্ব্বল্যগ্রস্ত। শাস্ত্রবাক্য ভুলিয়া, অনাচার-স্রোতে গা ঢালিয়া দেওয়াই কি ইহার কারণ নহে! অভক্ষ্য-ভোজনে পাকস্থলীটির ক্রিয়া সুচারুরূপে হইতে না দেওয়া এবং শুক্রের পূর্ণ পরিণতি হইতে না হইতে অযথা এবং অস্বাভাবিক ভাবে উহা ব্যয় করাই এই সর্ব্বনাশকর ব্যাধি উপস্থিতির সর্ব্ব প্রধান কারণ। ব্রহ্মচর্য্য পালনের অভাবে দেশের যে ভীষণ সর্ব্বনাশ হইতেছে, একথা আমরা বরাবরই বলিয়া আসিতেছি। ব্রহ্মচর্য্য পালন বলিলে আহার-বিহার—সকল বিষয়েরই সংযম বুঝাইয়া থাকে। বাঙ্গালী যে পর্য্যন্ত সে সকল বিষয়ে সংযমী না হইবে, সে পর্য্যন্ত তাহার এই অধঃপতিত জীবন পরিবর্ত্তিত হইবার সম্ভাবনা নাই।

অপত্য-বিজ্ঞান।

—:•:—

(প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মত)

ইংরাজী শিক্ষিত মাত্রেই জানেন—১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে অসাধারণ প্রতিভাবান্ প্রাণিতত্ত্ববিদ্ ডার্ব্বিন্ সাহেবের "জাতি বৈচিত্র্যের উদ্ভব" নামক গ্রন্থখানি প্রকাশিত হওয়ার পর হইতেই প্রাণি-জগতের অনেক রহস্যই সাধারণের বোধগম্য হইয়া গিয়াছে।

ডার্ব্বিনের অমানুষিক প্রতিভাবলে আমরা জীবোৎপত্তির বহুতথ্যই জানিতে পারিয়াছি। আমরা জানিতে পারিয়াছি—একটী শুক্রাণু [Spermatozon] গর্ভকোষ নিঃসৃত পরিণতাবস্থ একটী ডিম্বাণু সহ সংযুক্ত হইলে সেই বিশেষ ডিম্বাণুটীর অভ্যন্তরীণ জীবন্ত পদার্থের [Porto Plasm] নিশ্চেষ্টতা ভঙ্গ হইয়া অপূর্ব্ব কার্য্যকারিতার বিকাশ ঘটিয়া থাকে। প্রাণির উৎপত্তি সেই কার্য্যকারিতার ভাবী ফল। আমরা আরও জানিতে পারিয়াছি—নিষেকিত ডিম্বাণু হইতেই মাতৃগর্ভে কখনও পুত্র, কখনও বা কন্যা জন্মগ্রহণ করে। এক্ষণে, জীব-বিজ্ঞানের সর্ব্বাপেক্ষা জটিল ব্যাপার—সন্তানোৎপত্তি রহস্য—আমাদের কাছে অনেকটা সরল ও সহজ হইয়া পড়িয়াছে।

কিন্তু ভ্রূণ পরিণতি লাভ করিয়া, কি কারণে যে স্ত্রী বা পুরুষের মূর্ত্তিতে প্রকাশ পায়, এ তথ্য এখনও আমাদের কাছে অস্পষ্ট। বিজ্ঞান ইহার মীমাংসা করিতে পারে না। কোন্ অনিবার্য্য নিয়মে—গর্ভস্থ ভ্রূণ পুত্রের আকার ধারণ করে, কেনই বা তাহা কন্যারূপেই বা ভূমিষ্ট হয়,—অমন যে 'জল জীয়ন্ত' য়ুরোপীয় বিজ্ঞান—তাহাতেও এ প্রশ্নের অসন্দিগ্ধ সদুত্তর অদ্যাবধি রচিত হয় নাই। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয়—য়ুরোপ সভ্য হইবার বহু শতাব্দি পূর্ব্বে—আর্য্যঋষি এই অপত্য তত্ত্বের অপূর্ব্ব রহস্য অনায়াসেই আবিষ্কার করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমি সেই অপত্যতত্ত্বেরই আলোচনা করিব।

কিন্তু প্রাচ্য-মত আলোচনা করিবার পূর্ব্বে—আমাকে পাশ্চাত্যমতের অনুসরণ করিতে হইবে। নতুবা আমার বক্তব্য সাধারণের কাছে পরিস্ফুট হইবে না। অতএব প্রথমেই দেখা যাউক, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ভ্রূণতত্ত্বের কিরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

বিজ্ঞান বলে—গর্ভবাসের প্রারম্ভ অবস্থায় ভ্রূণ কিছুকালের জন্য ক্লীব অবস্থায় থাকে—লিঙ্গ বিশেষের দিকে প্রবণতা দেখায় না। এই ক্লীব অবস্থা উচ্চ শ্রেণীর জীবের মধ্যে ক্ষণকালস্থায়ী, নিম্নশ্রেণীর মধ্যে অধিককাল স্থায়ী। স্তন্যপায়ী জীব ও পক্ষিদিগের ভ্রূণের প্রারম্ভাবস্থার অল্পকাল পরেই বলা যায়—উহা পুং বা স্ত্রী অঙ্গ সমন্বিত হইবে। কিন্তু অমেরুদণ্ডক জাতীয় অতি নিম্নশ্রেণীর জীব সম্বন্ধে এরূপ বলা একেবারেই অসম্ভব। ভেক জাতিই এই অমেরুদণ্ডক শ্রেণীর উদাহরণ। ভেকের অপেক্ষাকৃত বর্দ্ধিত ভ্রূণ দেখিয়াও উহা স্ত্রী কি পুরুষ হইবে, তাহা বলা যায় না।

ডিম্বাণু—শুক্রাণু সহযোগে নিষেকিত হইয়া নিশ্চেষ্টতা ভঙ্গ করিয়া ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। তাহার এই আদিম অবস্থা অল্পক্ষণ স্থায়ী। অতি সত্বরই ভ্রূণ উভ-লিঙ্গাবস্থ প্রাপ্ত হয়। পরে কোন একটী বিশেষ লিঙ্গ বিকাশ প্রবল হইয়া দাঁড়ায়। শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর মৌলিক উপাদান প্রায়ই এক প্রকার। প্রভেদের মধ্যে—ডিম্বাণু বৃহৎ, শুক্রাণু অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। ডিম্বাণু নিশ্চেষ্ট ও স্থির; শুক্রাণু-কার্য্যশীল ও চঞ্চল। এই উভয় অণুর সংমিলনেই—ভাবী জীবের সূচনা। এককোষী জীবের পরিবর্দ্ধন ব্যাপার পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, একটী ক্ষুদ্রতম জীবাণু নিজেই পরিবর্দ্ধিত

হইয়া দুইটী হইল। সেই দুইটী আবার পুর্ণায়তন প্রাপ্ত হইয়া চারিটীতে দাঁড়াইল। চারিটী পরিপুষ্ট হইয়া আটটীতে পরিণত হইল। এইরূপে বিভাজন দ্বারা তাহাদের বংশবৃদ্ধি হইতে লাগিল। কিন্তু এই একটী কোষ [Cell] দেখিতে দেখিতে দ্বিভাগে বিভক্ত হয় কেন? ইহার কারণ আর কিছুই নহে—কেবল দুইটী বিপরীতধর্ম্মী শক্তির ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া মাত্র। এই শক্তি দ্বয়ের মধ্যে একটী গঠন মূলক, অপরটী বিনাশ মূলক। ঐশ্বরিক লীলার আশ্চর্য্য মহিমায়—গঠন ও বিনাশের সম্পাতেই জীবন্ত পদার্থের উৎপত্তি। আপনি যত বড়ই পণ্ডিত হউন না, একথা অবিশ্বাস করিতে পারিবেন না। এই বিরাট বিশাল ব্রহ্মাণ্ডে এমনি দুইটী বিপরীত শক্তির ক্রিয়ার ফলে—প্রাথমিক নীহারিকার অবস্থা হইতে এই বিপুলায়তন বিস্ময়কর বিশ্বের উৎপত্তি হইয়াছে। এ সকল কথা বৈজ্ঞানিকের পরীক্ষিত সত্য কথা। অত্যুন্নত মানবজাতির পক্ষেও এই নিয়ম। স্ত্রী ও পুরুষের মিলনে শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর সংযোগে জীবের উৎপত্তি ঘটিয়া থাকে। পূর্ণায়তন প্রাপ্ত হইয়া লিঙ্গ উদ্ভাবন করে। এই লিঙ্গ ভেদের মূলে—জনক-জননীর স্বাস্থ্য ও শরীর গঠন; ডিম্বাণু ও শুক্রাণুর পুষ্টতা বা পরিপক্বতা—প্রভৃতি কারণ বর্ত্তমান। এই লিঙ্গভেদ বুঝাইবার জন্য য়ুরোপে বহু মতবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। সকল মত সবিস্তারে আলোচনা করিবার আবশ্যক নাই। আমি কেবল প্রধান মত গুলিরই উল্লেখ করিব।

১ম। দুই বিভিন্ন প্রকারের ডিম্বাণুবাদ।

এই মতবাদীরা—স্ত্রী ও পুং এই দুই প্রকারের ডিম্বাণু কল্পনা করেন। ইঁহারা বলেন,—স্ত্রী-ডিম্বাণু হইতে কন্যা এবং পুং-ডিম্বাণু হইতে পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। এ মতবাদটী অতি সহজ এবং সরল। কিন্তু তলাইয়া বুঝিতে গেলে—লিঙ্গ-বিকাশ-রহস্য কখনই এত সহজ হইতে পারে না। এই মতবাদীগণকে যদি প্রশ্ন করা যায়—স্ত্রী ও পুং প্রকৃতির স্বতন্ত্র ডিম্বাণু কিরূপে উৎপন্ন হয়? ইঁহারা সে প্রশ্নের যুক্তিপূর্ণ উত্তর দিতে পারেন না। বিশেষতঃ—বিজ্ঞান যখন বলিতেছে—জরায়ু-বাস কালে আবেষ্টন গত-কারণে অবস্থাধীন ভ্রূণ এক লিঙ্গের লক্ষণাক্রান্ত হইয়াও অপর লিঙ্গ উদ্ভাবন করিতে পারে, তখন আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি,—এ মত অযৌক্তিক। স্বতন্ত্র প্রকৃতির ডিম্বাণুর অস্তিত্ব—গভীর সন্দেহাকীর্ণ।

২য়। নিষেক-প্রণালী।

এই মতাবলম্বীগণ বলেন—নিষেকপ্রণালীর উপরই লিঙ্গ-পার্থক্য নির্ভর করে। অর্থাৎ ডিম্বাণু প্রবিষ্ট শুক্রাণুর সংখ্যার তারতম্য অনুসারেই ভ্রূণের লিঙ্গ ভেদ ঘটিয়া থাকে। অধিক সংখ্যক শুক্রাণু প্রবেশ করিলে পুত্র এবং অল্প সংখ্যক প্রবেশ করিলে কন্যা জন্ম গ্রহণ করে। বলা বাহুল্য এ মতটিও নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক। কেন না, ডিম্বাণুর প্রবেশ পথ এতদূর সূক্ষ্ম যে, অনুবীক্ষণের সাহায্য ভিন্ন তাহা দেখিতে পাওয়া অসম্ভব। অধিকন্তু একটীমাত্র শুক্রাণু প্রবেশ করিলেই সে পথ রুদ্ধ হইয়া যায়। যদি দৈবাৎ একাধিক শুক্রাণু—ডিম্বাণুর সহিত সম্মিলিত হয়, তাহা হইলে তাহা অস্বাভাবিক উৎপত্তিতে পরিণত হইয়া থাকে।

৩য়। নিষেক কাল।

এই মতের সিদ্ধান্ত—যদি একটী ডিম্বাণু ডিম্বকোষ হইতে নিঃসৃত হইয়াই শুক্রাণুর সহিত মিশ্রিত হয়, তবে তাহা পুরুষরূপে বিকশিত হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন, শুক্রাণু ও ডিম্বাণু নূতন হইলে স্ত্রী এবং প্রাচীন হইলে পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। এ মত উদ্ভিদ সম্বন্ধে খাটিতে পারে বটে, কিন্তু জীব সম্বন্ধে ইহা একেবারেই খাটেনা।

৪র্থ। জনক জননীর বয়স।

বিলাতের দুইজন বড় বৈজ্ঞানিক বহু দিন পরীক্ষা করিয়া এই তথ্যে উপনীত হইয়াছেন। তাঁহারা বলেন,—যদি পিতা—মাতার চেয়ে বয়সে বড় হয়, তাহা হইলে সে দম্পতির কেবল পুত্র সন্তানই জন্মিয়া থাকে। আবার মাতা—পিতার চেয়ে বয়সে বড় হইলে তাহাদের সন্ততির মধ্যে অধিকাংশই কন্যা হইয়া থাকে। উভয়ের বয়স সমান হইলে,—কখন বা পুত্র কখনও বা কন্যা জন্ম গ্রহণ করে। য়ুরোপের লোক এ মতের যথেষ্ট আদর করিয়া থাকেন। আমরা কিন্তু এমতের সারবত্তা স্বীকার করিতে অক্ষম। এ মতটী সত্য হইলে—ভারতবাসীর গৃহে আর কন্যা ভূমিষ্ট হইত না। ভারতবাসী—নিজের চেয়ে বয়ঃকনিষ্ঠা নারীকেই পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়া থাকে। এ সিদ্ধান্ত নির্ভুল হইলে এতদিন বাঙ্গালীর ঘরে আর মেয়ে জন্মগ্রহণ করিত না, গরীব-গৃহস্থকে কন্যাভার-কাতর হইতে হইত না, বর-পণের অত্যাচারে গৃহস্থকে সর্ব্বস্বান্ত ভিখারী সাজিতে হইত না;—বাঙ্গালী জাতি তাহা হইলে পুরুষ-প্রধান জাতিতে পরিণত হইত।

৫ম। শারীরিক বল।

স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে—যাহার দৈহিক বল অধিক, সন্তান তাহার অনুরূপ লিঙ্গ বিশিষ্ট হইয়া থাকে। অর্থাৎ স্বামী বলিষ্ঠ হইলে পুত্র এবং স্ত্রী বলিষ্ঠা হইলে কন্যা জন্ম গ্রহণ করে। এ মতটীও নিতান্ত অমূলক। আমরা অনেক সময় দেখিয়াছি, যক্ষ্মারোগ পীড়িতা মাতাই অধিক সংখ্যক কন্যা প্রসব করিয়া থাকে। আবার অতি ক্ষীণকায় পুরুষও—বহুসংখ্যক পুত্রের জন্মদাতা—ইহা বোধ হয় অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। অতএব এ মতটীও সমীচিন বলিয়া স্বীকার করা যায় না।

৬ষ্ঠ। মিলন স্পৃহা।

পুরুষের যদি স্ত্রীর সহিত মিলনে বেশী আগ্রহ থাকে, তবে পুত্রাধিক্য ঘটিবারই সম্ভাবনা। পক্ষান্তরে পুরুষের সহিত মিলনে স্ত্রীর যদি অধিক স্পৃহা হয়—তাহা হইলে কন্যার ভাগই বেশী হইয়া থাকে। এ মতও সত্য বলিয়া বিশ্বাস হয় না। কেন বিশ্বাস হয় না—সে কথা প্রাচ্য-মত আলোচনার সময় বুঝাইবার চেষ্টা করিব।

৭ম। স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠতা।

অতি প্রাচীনকাল হইতেই পণ্ডিতগণের বিশ্বাস—স্ত্রীজাতি হইতে পুরুষজাতিই শ্রেষ্ঠ। প্রাচীন দর্শনশাস্ত্রের মত—স্ত্রী জাতি অবিকাশিত পুরুষ বই আর কিছুই নহে। পুরুষের দেহের ও মনের যখন উচ্চ বিকাশ থাকে, অথচ মাতারও উৎপাদিকা শক্তির পূর্ণতা দেখিতে পাওয়া যায়—তখনই পুত্র-সন্তান জন্মগ্রহণ করে। মাতা যখন রুগ্না—অপূর্ণ-বিকাশ-সম্পন্না—তখন কন্যা সন্তানই জন্মিয়া থাকে।

কেন পুত্র বা কন্যা জন্মে, যে সম্বন্ধে পরীক্ষালব্ধ মতবাদ সংক্ষেপে উদ্ধৃত করিতেছি।

(ক) দৈহিক হিসাবে জননীর শরীর ও স্বাস্থ্যের প্রতিকূল অবস্থা, আহারের অপ্রাচুর্য্য, অপেক্ষাকৃত বায়ামতা—ইত্যাদি অবস্থায় পুত্র এবং ইহার বিপরীত অবস্থায় কন্যা হইয়া থাকে।

(খ) জনন উপাদান হিসাবে অপুষ্ট ডিম্বাণু অপেক্ষা পুষ্ট ডিম্বাণু স্ত্রীত্বে পরিণত হয়। নূতন, পূর্ণায়তন, সতেজ ডিম্বাণু হইতে কন্যার উৎপত্তি ঘটিয়া থাকে।

এই স্থানেই আমি পাশ্চাত্য-মত পরিত্যাগ করিয়া প্রাচ্যমতের অনুসরণ করিব।

প্রাচ্য-মতে—রজঃস্রাবের আরম্ভ দিবস হইতে ষোড়শ দিন পর্য্যন্ত—স্ত্রীজাতির গর্ভ গ্রহণ কাল। এই গর্ভগ্রহণ কালের মধ্যেও আবার ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়াণী, বৈশ্যাণী ও শূদ্রাণীর—বিশেষ নিয়ম ও বিচার দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সে সকল কথার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। অনুসন্ধিৎসু পাঠক, আয়ুর্ব্বেদ তন্ত্র ও স্মৃতি সংহিতা পড়িয়া দেখিবেন।

ঋষিগণ ঋতুমতী নারীকে অনেকগুলি নিয়মের অধীনে রাখিয়াছেন। সে নিয়মগুলি লঙ্ঘন করিলে অপত্য উৎপত্তির দোষ জন্মিয়া থাকে। যে নারী ঋষি রচিত নিয়মের শাসন মানিতে চাহে না, তাহার গর্ভস্থ ভ্রূণ বিকৃত দোষদুষ্ট হইয়া ভূমিষ্ট হয়। ভারতের ভ্রূণতত্ত্ব—বিরাট ও বিশাল, সংক্ষেপে তাহার আলোচনা অসম্ভব। আমি কেবল অতি সংক্ষেপে তাহার আভাস দিব।

তন্ত্র বলেন—জরায়ুর মুখে সমীরণা, চান্দ্রমসী ও গৌরী নামে তিনটী নাড়ী অবস্থিত, নিষেকিত শুক্রাণু যদি সমীরণার মুখে প্রবেশ করে, তাহা হইলে সন্তানোৎপত্তিই হয় না। 'চান্দ্রমসী'তে প্রবিষ্ট হইলে কন্যা এবং গৌরী-মুখে প্রবেশ করিলে পুত্র জন্মগ্রহণ করে।

ঋতুকালে—যুগ্মরাত্রে [৪র্থ ৬ষ্ঠ, ৮ম, ১০ম, ১২শ রাত্রিতে] পুরুষ ভার্য্যাতে উপগত হইলে পুত্র এবং অযুগ্ম রাত্রে [৫ম, ৭ম, ৯ম ১১শ, ১৩শ রাত্রে] উপগত হইলে কন্যা জন্ম গ্রহণ করে।

শুক্রের আধিক্যে পুত্র ও আর্ত্তবের আধিক্যে কন্যা জন্মিয়া থাকে। শুক্রশোণিত উভয় সমান হইলে নপুংসকের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

স্ত্রী পুরুষের মধ্যে যাহার সুরতস্পৃহা অধিক—সন্তান তাহার স্বরূপ হইয়াই জন্ম গ্রহণ করে।

গর্ভবস্থায় যে নারীর দক্ষিণ চক্ষু বৃহত্তর হয়, দক্ষিণ স্তনে অগ্রে দুগ্ধ জন্মে, দক্ষিণ উরু একটু স্থূলতর হয়, মুখ ও বর্ণের প্রসন্নতা দেখা যায়, তাহা হইলে সে নারীর গর্ভে পুত্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছে বুঝিতে হইবে। ইহার বিপরীত লক্ষণ দেখিলে,—কন্যা জন্মিবে বুঝিতে হইবে *

বারান্তরে আমি আয়ুর্ব্বেদের অপত্য তত্ত্বের আলোচনা করিব। আজ এই পর্য্যন্ত।

[ক্রমশঃ]

শ্রীসতীশ চন্দ্র রায়, এম্ এ।

* তন্ত্রে পুত্র ও কন্যা জন্মিবার এইরূপ অনেকগুলি কারণ দেখিতে পাওয়া যায়। বাহুল্য ভয়ে

আয়ুর্ব্বেদে বায়ু।

(তুলনা-মূলক আলোচনা)

(২)

পূর্ব্বে আমরা বায়ু এবং নার্ভের পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিয়াছি যে, ঋষিগণ বায়ুর কার্য্য বলিতে যাহা বুঝিতেন, পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ তাহাকেই নার্ভের ক্রিয়া বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এক্ষণে আমরা নার্ভের পীড়া এবং বাতব্যাধি সম্বন্ধীয় আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

অঙ্গ সঞ্চালন (motion) অনুভূতি (Sensation) পঞ্চেন্দ্রিয়ের কার্য্য (Functions of the special senses) মানসিক-বৃত্তি (Intellect) এবং হর্ষ বিষাদ ও রাগ-দ্বেষাদির (Emotions) অস্বাভাবিক বৃদ্ধি বা হ্রাসপ্রাপ্তি হইলে শরীরে যে বিকার উপস্থিত হয়, প্রতীচ্য-চিকিৎসাতন্ত্রাভিজ্ঞ পণ্ডিতগণ তাহাকে নার্ভের পীড়া বলিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে 'মোটরনার্ভ' সমূহ (যে সকল নার্ভ দ্বারা সর্ব্বায়বের মাংসপেশী ও যন্ত্রসমূহের আকুঞ্চন-প্রসারণ ক্রিয়া এবং অঙ্গচালনা সম্পাদিত হয়) বিকৃত হইলে গাত্রস্তম্ভ, অসমবায় কার্য্য (Incoordination) প্রভৃতি উপদ্রব এবং 'সেন্সরি' বা প্রেরণাপ্রদায়ক নার্ভসমূহ ব্যাধিগ্রস্ত হইলে গাত্রসুপ্তি (Anoathesia) স্পর্শদ্বেষ (Hypersesthesia) বেদনানুভূতি (Analgesia) এবং দ্রব্যসমূহের আকৃতি বিনিশ্চয়ে অক্ষমতা (Asterognosis) প্রভৃতি উপদ্রব লক্ষিত হয়।

কুপিত বায়ুর উপদ্রব বর্ণনায় চরক বলিয়াছেন—"

"সঙ্কোচঃপর্ব্বনাং স্তম্ভো ভঙ্গোহস্থাং পর্ব্বনামপি
রোমহর্ষঃপ্রলাপশ্চ পাণিপৃষ্ঠশিরোগ্রহঃ ॥
খাঞ্জপাঙ্গুল্যকুব্জত্বং শোষোহঙ্গানাম নিদ্রতা
গর্ভশুক্র রজোনাশঃ স্পন্দনং গাত্রসুপ্ততা ॥
শিরোনাসাক্ষিজত্রুনাং গ্রীবায়াশ্চাপি হুণ্ডনম্
ভেদস্তোদোহর্ত্তিরাক্ষেপো মুহুশ্চায়াস এব চ॥"

শাস্ত্রকারগণ নিম্নলিখিত কারণগুলি বাতব্যাধি-জনক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন—"

রুক্ষশীতাল্পলঘ্বন্ন-ব্যবায়াতিপ্রজাগরৈঃ।
বিষমাদুপচারাচ্চ দোষাসৃক্‌স্রবণাদপি ॥
লঙ্ঘনপ্লবনাত্যধ্ব-ব্যায়ামাদিবিচেষ্টিতৈঃ।
ধাতুনাং সংক্ষয়াচ্চিন্তা-শোকরোগাতি-
কর্ষণাৎ ॥
বেগসন্ধারণাদামাদভিঘাতাদভোজনাৎ।
মর্ম্মাবাধাদ্গজোষ্ট্রাশ্ব-শীঘ্রযানাপতংসনাৎ
দেহে স্রোতাংসি রিক্তানি পূরয়িত্বানিলোবলী
করোতি বিবিধান্ ব্যাধীন্ সর্ব্বাঙ্গৈকাঙ্গ-
সংশ্রয়ান্ ॥"

সে সকল উদ্ধৃত হইল না। কেবল আভাষ মাত্র দেখাইলাম। কেন না, তন্ত্রের যুক্তি বুঝিবার শক্তি বর্ত্তমান লেখকের নাই। অপত্য তত্ত্ব সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদের মন্তব্য সবিস্তারে আলোচিত হইবে। এই কর্ত্তাদায়ের বিড়ম্বনার দিনে সে সকল কথা সকলেরই জানা উচিত। —লেখক।

পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণও অতিশয় ক্লান্তি (Excessive Fatigue) অত্যধিকশ্রম (over exertion) আঘাত (Injury) হিম ও বর্ষা হইতে শরীরকে অরক্ষিত রাখা (Exposure to cold and wet) অতিব্যবায় (Sexual excesses) উচ্চ হইতে নিম্নে পতন (Falls) মূত্রবিবন্ধ (Retention of urine) রক্তস্রাব (Hœmorrhage) মানসিক অশান্তি (Mental distress) অতিরিক্ত মদ্যপান (Alcoholic indulgence) রাগ-দ্বেষ, হর্ষ-বিষাদ ও শোকভয় (Emotions) প্রভৃতির জন্য নার্ভের পীড়া উৎপন্ন হয় বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। কোন কোন রোগ হইতে বাতব্যাধি উৎপন্ন হইতে পারে এবং সকল রোগেই যে বায়ুর অল্পবিস্তর বিকার পরিলক্ষিত হয়, তাহা পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণও স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ নার্ভের পীড়ার যে সকল লক্ষণ ও উপদ্রব নির্দ্দেশ করিয়াছেন, আয়ুর্ব্বেদ-বিশারদ ঋষিগণ-নির্দ্ধারিত বাতব্যাধির হেতু ও উপদ্রবের সহিত তাহার বিশেষ কোন পার্থক্য নাই।

পূর্ব্বেও বলিয়াছি এবং এক্ষণেও পুনরুল্লেখ করিতেছি যে, সামান্য অসামঞ্জস্যে আলোচ্য বিষয়ের কিছু ক্ষতি-বৃদ্ধি হয় না। প্রতীচ্য-তন্ত্র এবং তদ্দেশীয় পণ্ডিতদিগের রোগ বিনিশ্চয় প্রণালীর সহিত অস্মদ্দেশীয় চিকিৎসা-বিধি ও ব্যাধিনিরূপণপদ্ধতি যে অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়া যাইবে, এরূপ আশা করা সঙ্গত নহে। দেখিতে হইবে,—ভারতীয় চিকিৎসকগণ কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত এমন কোন ব্যাধি মানবসমাজের অমঙ্গল সাধন করিতেছে কিনা,—পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ যাহার সন্ধান এখনও পান নাই—অথবা প্রতীচির পণ্ডিতগণ এমন কোন ব্যাধির অস্তিত্ব জ্ঞাত হইয়াছেন কি না—যাহা আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের অগোচর ছিল।

চরক বাতব্যাধির সংখ্যা অশীতিপ্রকার বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। একটিমাত্র প্রবন্ধে সকল প্রকার রোগের আলোচনা সম্ভবপর নহে। সুতরাং অপেক্ষাকৃত বলবান কয়েকটি রোগের আলোচনা করিয়া আমরা নার্ভের পীড়া ও বাতব্যাধি যে একই শ্রেণীর রোগ তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিব।

১। আক্ষেপক।—সুশ্রুতমতে শরীরের ধমনীসকল কুপিত বায়ু কর্ত্তৃক উত্তেজিত হইয়া মুহুর্মুহুঃ দেহকে আক্ষিপ্ত করে। এই আক্ষেপ-জনিত ব্যাধিই আক্ষেপক নামে অভিহিত হইয়াছে। আয়ুর্ব্বেদ বিশারদগণ প্রকরণভেদে আক্ষেপক ব্যাধিকে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন।

দণ্ডাপতানক ব্যাধিক্লিষ্ট রোগীর সর্ব্ব-শরীর দণ্ডের ন্যায় স্তব্ধ এবং তাহার এরূপ হনুগ্রহ উপস্থিত হয় যে, যে অতিকষ্টে অন্ন-সেবন করিতে পারে। আক্ষেপক রোগে শরীর ধনুর ন্যায় নমিত হইলে তাহাকে ধনুস্তম্ভ কহে। ধনুস্তম্ভ দ্বিবিধ—অন্তরায়াম ও বাহ্যায়াম। যে ধনুস্তম্ভে শরীর সম্মুখের দিকে নমিত হয়, তাহাকে অন্তরায়াম এবং যাহাতে শরীর পশ্চাৎদিকে নমিত হয়, তাহাকে বহিরায়াম বলে। চতুর্থ প্রকার আক্ষেপক অভিঘাতজ। বিজয়রক্ষিত অভিঘাতজ অর্থে 'দণ্ডাদ্যভিঘাতকুপিত বাতজং' বলিয়াছেন।

গঙ্গাধর দোষত্রয়ের প্রবলতা অনুসারে আক্ষেপকের শ্রেণী বিভাগ করিয়াছেন।

(গলাধরঘাহ কফপিত্তান্বিত ইত্যাদিনা নিমিত্তভেদেনাক্ষেপকাশ্চতুর্দ্ধা ইতি, তদ্‌যথা একঃ কফান্বিতেন বাতেন, দ্বিতীয়ঃ পিত্তান্বিতেন, তৃতীয়ঃ কেবলেন, চতুর্থোঽভিঘাতেনেতি—মধুকোষ।)

পাশ্চাত্যমতে 'মোটরনার্ভ' সমূহের বিকার বশতঃ বিরুদ্ধকার্য্যকরী মাংসপেশী সকলের অতিক্রত আকুঞ্চন-প্রসারণ ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। ইহারই ফলে অবয়ব সমূহ আক্ষিপ্ত ও বিক্ষিপ্ত হয়। মোটর নার্ভের বিকৃতি যে সর্ব্বদাই অঙ্গসমূহকে আক্ষিপ্ত করে; তাহা নহে। কখনো কখনো কম্পন (rigor) স্পন্দন (fremors) ও কেবলমাত্র আকুঞ্চন (Contraction) সম্পাদিত হয়।

প্রতীচ্য চিকিৎসকগণ-ব্যাখ্যাত 'এপিলেপ্‌সি', 'হিষ্টিরিয়া' ও 'টিটেনাস্' প্রভৃতি রোগের লক্ষণ ও উপদ্রবের সহিত আক্ষেপক ও তাহার প্রকরণ চতুষ্টয়ের সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হয়। সুতরাং আমরা উক্ত ব্যধিত্রয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

(ক) Epilepsy (এপিলেপ্‌সি)—নার্ভের বিকার বশতঃ সংজ্ঞালোপ হইয়া এই রোগ উৎপন্ন হয়। কখনো আক্ষেপ হয়, কখনো হয় না। যে শ্রেণীর Epilepsyতে সংজ্ঞা লোপ হয় কিন্তু আক্ষেপ হয় না—তাহাকে Patfifmal বলে এবং যাহাতে সংজ্ঞা লোপ ও আক্ষেপ উভয়ই পরিলক্ষিত হয়, তাহাকে Grandmal বলে।

অপরিমিত মদ্যপান, অত্যধিক ইন্দ্রিয় সেবা, হস্তমৈথুন (masturbation) ভয় শোক, চিন্তা, অভিঘাত (injuries) এবং ক্রিমির (presence of worms in tntestines) উপদ্রব বশতঃ Epilepsy উৎপন্ন হয়। পিতামাতা উন্মাদরোগগ্রস্ত অথবা অন্য কোন প্রকার নার্ভের পীড়া কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে সন্তানসন্ততিগণও Epilepsy কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইতে পারে।

Grandmal অর্থাৎ যে এপিলেপ্‌সিতে সংজ্ঞা লোপ ও আক্ষেপ উভয়ই পরিলক্ষিত হয়, তদ্বারা আক্রান্ত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে রোগীর সর্ব্বশরীর রিম্-রিম্ ঝিম্-ঝিম্ করে, সে কোন বিষয়ে মনসংযোগ করিতে পারে না—পারিপার্শ্বিক দৃশ্যাবলী এবং ঘটনাসমূহ তাহার নিকট স্বপ্নবৎ ও অস্পষ্ট বলিয়া মনে হয়। ব্যাধির আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে রোগী চীৎকার করিয়া উঠে এবং আত্মরক্ষার কিছুমাত্র চেষ্টা না করিয়া বাণবিদ্ধ হরিণের ন্যায় ভূমিতলে পতিত হয়। তাহার শরীরের মাংসপেশীসকল সঙ্কুচিত হইয়া মস্তক, গ্রীবা ও মেরুদণ্ড বক্রীভূত করে এবং বিষম্ হনুস্তম্ভ লক্ষিত হয়।

রোগের দ্বিতীয় স্তরে মাংসপেশী সকল থাকিয়া থাকিয়া সঙ্কুচিত হয়। প্রথমতঃ শরীর কম্পন এবং পরে আক্ষেপ আরম্ভ হয়। কখনো কখনো রোগীর মুখ দিয়া রক্তমিশ্রিত শ্লেষ্মা নির্গত হয়।

'পেটিমল্' শ্রেণীর 'এপিলেপ্‌সি'তে আক্ষেপ পরিদৃষ্ট হয় না। রোগী সহসা চেতনা হারাইয়া পড়িয়া যায়।

(খ) Hysteria (হিষ্টিরিয়া)—এই ব্যাধিও নার্ভের বিকারবশতঃ উৎপন্ন হয়। ইহার কারণ, লক্ষণ ও উপদ্রব অনেকটা 'এপিলেপসির'ই অনুরূপ। হিষ্টিরিয়া ও এপিলেপ্‌সিতে প্রভেদ এই যে, প্রথমোক্ত রোগে রোগীর বিশেষ কোন কার্য্য করিবার সঙ্কল্প পরিদৃষ্ট হয়, কিন্তু এপিলেপ্‌সিতে

সেরূপ কিছুই দেখা যায় না। হিষ্টিরিয়া আক্রান্ত লোককে তাহার অভিলষিত কার্য্যে বাধা দিলে, সে বল প্রকাশ করে। তাহার মুখের মাংসপেশী সমূহ সঙ্কুচিত হয় এবং মুখ দিয়া ফেন নির্গত হয়; কিন্তু 'এপিলেপ্সির' ন্যায় তাহা রক্তমিশ্রিত থাকে না। মুখমণ্ডল পাণ্ডু অথবা রক্তবর্ণ ধারণ করে। ওষ্ঠ নীলবর্ণে রঞ্জিত হয়—কিন্তু 'এপিলেপসির' ন্যায় মুখ পাংশুবর্ণ (cyanosis) ধারণ করে না। হিষ্টিরিয়ার আক্ষেপ বহুক্ষণস্থায়ী, এপিলেপসির আক্ষেপ স্বল্পস্থায়ী। হিষ্টিরিয়ায় ধনুস্তম্ভ পরিলক্ষিত হয়—এপিলেপসিতে তাহা হয় না; তবে হিষ্টিরিয়া লক্ষণাক্রান্ত এপিলেপ্সিতে (Hystars-epilepsy) ধনুস্তম্ভ হইয়া থাকে।

(গ) Tetanus (টিটেনাস)—শরীরের কোন স্থান ক্ষত হইলে সেইস্থানে 'ব্যাসিলাস্ টিটেনি' নামক এক প্রকার জীবাণু প্রবেশ করে এবং ক্রমে ঐ ক্ষতেই পুষ্ট হয়। এই জীবাণুকর্ত্তৃক যে বিষ উদ্গীরিত হয়, তাহাই 'নার্ভ' সমূহকে বিকৃত করে। এইজন্য পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ এই ব্যাধিকে Infections disease বা জীবাণু-দুষ্ট-ব্যাধি পর্য্যায়-ভুক্ত করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ইহাকেও নার্ভের পীড়া বলা যায়; কারণ অহিত আহার-বিহার যেমন নার্ভ সমূহকে বিকৃত করিয়া ব্যাধি উৎপাদন করে, তেমনই 'টিটে নাই' জীবাণু শরীরে বৃদ্ধি পাইয়া নার্ভসমূহকে বিকারগ্রস্ত করে। নার্ভের বিকার ব্যতীত আক্ষেপ প্রভৃতি হইতে পারে না।

হনুগ্রহ, ধনুস্তম্ভ ও আক্ষেপ—টিটেনাস্ রোগের প্রধান উপদ্রব। ধনুস্তম্ভ যে প্রকার-ভেদে বহিরায়াম ও অন্তরায়াম উভয়বিধ হইয়া থাকে, তাহা প্রতীচির চিকিৎসকগণও নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং অঙ্গসমূহ যে কঠিনতা প্রাপ্ত হয়—তাহারও উল্লেখ করিয়াছেন।

পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ বর্ণিত এই ত্রিবিধ ব্যাধির সহিত আক্ষেপ ও তাহার প্রকরণ চতুষ্টয় তুলনা করিয়া আমরা যাহা দেখিলাম নিম্নে তাহাই সংক্ষেপে সন্নিবেশ করিলাম:—

পাশ্চাত্য ব্যাধি	মত ব্যক্ত উপদ্রব	আয়ুর্ব্বেদোক্ত উপদ্রব	ব্যাধি
Grandmal বা আক্ষেপযুক্ত এপিলেপ্সি	মেরুদণ্ড ও গ্রীবা বক্রীভূত, আক্ষেপ, হনুগ্রহ, সংজ্ঞা লোপ ইত্যাদি	তদাক্ষিপত্যাশু মুহুর্মুহুর্দেহং মুহুশ্চরঃ	আক্ষেপক
Hyster-Epilepsy বা	হনুগ্রহ, দীর্ঘকালস্থায়ী আক্ষেপ, ধনুস্তম্ভ ইত্যাদি।		

পাশ্চাত্য ব্যাধি	মত ব্যক্ত উপদ্রব	আয়ুর্ব্বেদোক্ত উপদ্রব	ব্যাধি
হিষ্টিরিয়া লক্ষণাক্রান্ত এপিলেপসি			
Petitmal বা আক্ষেপ বিহীন এপিলেপ্‌সি	হনুগ্রহ, আড়ষ্ট দেহ, সংজ্ঞালোপ ইত্যাদি।	দণ্ডবৎ স্তব্ধগতি কৃচ্ছো দণ্ডাপতানকঃ। হনুগ্রহ স তেন স্যাৎ কৃচ্ছ্রাচর্ব্বণভাষণম্।	দণ্ডাপতনকাঃ
টিটেনাস্	হনুগ্রহ আক্ষেপ, ধনুস্তম্ভ—বহিরায়াম ও অন্তরায়াম ইত্যাদি	ধনুস্তুল্যঃ নমেদ যস্তু সঃ ধনুস্তম্ভ সংজ্ঞকঃ	ধনুস্তম্ভ।
		অভ্যন্তরং ধনুরিব যদা নমতিমানবম্ তদা-স্যাহভ্যন্তরায়ামঃ।	অন্তরায়াম
		বাহ্যায়ায়ু প্রতানস্থো বাহ্যায়ামং করোতি চ।	বহিরায়াম

২। পক্ষাঘাত—কুপিত বায়ু অধঃ ঊর্দ্ধ ও তির্য্যকগামিনী ধমনী সমূহকে এককালে বিকৃত করিলে যে ব্যাধির প্রকোপ হয়, সুশ্রুত তাহাকে পক্ষাঘাত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন :—

"অধোগমাঃ সতির্য্যগগা ধমনীরার্দ্ধদেহগাঃ।
যদা প্রকুপিতোহত্যর্থং মাতরিশ্বা প্রবর্ত্ততে॥
তদান্তরপক্ষস্য সন্ধিবন্ধান্ বিমোক্ষয়ন্।
হন্তি পক্ষং তমাহুর্হি পক্ষাঘাতং ভিষগ্বরাঃ॥

এই ব্যাধিতে শরীরের যে দিকের বায়ু প্রকুপিত হয়, তদ্বিপরীত দিক অকর্ম্মণ্য ও অসাড় হইয়া যায়। পক্ষাঘাত সম্বন্ধে চরকে উক্ত হইয়াছে—

"হত্বৈকং মারুতঃ পক্ষং দক্ষিণং বামমেব বা।
কুর্য্যাচ্চেষ্টানিবৃত্তিং হি রুজং বাকস্তম্ভমেব চ॥
গৃহীত্বা বা শরীরার্দ্ধং শিরাঃস্নায়ুং বিশোষ্য চ।
পাদং সঙ্কোচয়ত্যেকং হস্তং বা তোদশূলকৃৎ॥
একাঙ্গ রোগং তং বিদ্যাৎ সর্ব্বাঙ্গং সর্ব্বদেহজম্

সুতরাং একাঙ্গগতও হইতে পারে, আবার সর্ব্বাঙ্গগত অথবা অর্দ্ধশরীর গত হইতে পারে। অর্দ্ধশরীর গত পক্ষাঘাত সম্বন্ধে মধুকোষ টীকায় বিজয় রক্ষিত বলিয়াছেন—

অর্দ্ধমিতি অর্দ্ধমর্য্যাদয়া অর্দ্ধনারীশ্বর বৎ। পক্ষং বাহুকক্ষ পার্শ্বাদিভাগঃ ”

পাশ্চাত্যমতে কোন কোন নার্ভের বিকারবশতঃ উৎপন্ন ব্যাধিতে মাংসপেশী-সমূহ আড়ষ্ট হয়, অঙ্গসঞ্চালনের ক্ষমতা লুপ্ত হয় এবং স্পর্শজ্ঞান বিরহিত হয়। যে ব্যাধিতে এই সব উপদ্রব লক্ষিত হয়, তাহাকে তাঁহারা 'প্যারালিসিস্' আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। প্রতীচির চিকিৎসকগণও প্যারালিসিস্‌কে একাঙ্গগত, সর্ব্বাঙ্গগত এব অর্দ্ধশরীরগত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, যথা -'হেমিপ্লেজিয়া বা অর্দ্ধশরীর গত, 'প্যারাপ্লেজিয়া' বা সর্ব্ব-শরীরগত এবং 'মনোপ্লেজিয়া' বা একাঙ্গ গত প্যারালিসিস্। পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ গবেষণা দ্বারা তাহা নিরূপণ করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনায় প্রবৃত্ত না হইয়া আমরা প্যারালিসিসের বিশেষ গুণ বিশিষ্ট (Typieal) উদাহরণ-স্বরূপ একটি মাত্র ব্যাধির আলোচনা করিব।

পাশ্চাত্যমতে Facialnerve (যে নার্ভ-দ্বারা মুখের যাবতীয় কার্য্য সম্পাদিত হয়) বিকৃত হইলে মুখার্দ্ধের সকল প্রকার কর্ম্ম-শক্তি লুপ্ত হয়—ললাট-রেখা অদৃশ্য হয়—রোগীর চক্ষু স্তব্ধ ও আবিলভাব ধারণ করে—অক্ষিপল্লবদ্বয় নিমীলিত করা যায় না,—ওষ্ঠ বক্রীভূত হয় এবং বাক্‌সঙ্গ উপস্থিত হয়। নাসিকার মাংসপেশী সমূহ আড়ষ্ট হয় বলিয়া রোগী হাঁচিতে পারে না—তাহার জিহ্বা সমুৎক্ষিপ্ত হয় এবং কখনো কখনো তাহার শ্রবণশক্তিও লোপ পায়। প্রতীচ্য চিকিৎসকগণ এই ব্যাধিকে Paralysis of the Seventh Nerve অথবা 'বেল্‌স্‌প্যালসি' নামে অভিহিত করিয়াছেন।

আয়ুর্ব্বেদে অর্দ্দিত রোগের যে সকল লক্ষণ বিবৃত হইয়াছে তাহার সহিত প্রতীচির চিকিৎসকগণ বর্ণিত Bells Palsy র লক্ষণ ও উপদ্রবের সম্পূর্ণ ঐক্য পরিলক্ষিত হয়। অর্দ্দিত রোগ সম্বন্ধে চরকে উক্ত হইয়াছে—

"অতিবৃদ্ধঃ শরীরার্দ্ধমেকং বায়ুঃ প্রপদ্যতে।
যদা তদোপশোষ্যাসৃক বাহুং পাদঞ্চ জানু চ
তস্মিন সঙ্কোচয়ত্যর্দ্ধে মুখং জিহ্বং করোতি চ
বক্রীকরোতি নাসাভ্রূ ললাটাক্ষিহনূং তথা।
ততো বক্রং ব্রজত্যাস্যে ভোজনম্ বক্র-
নাসিকম্।
স্তব্ধং নেত্রং কথয়তঃ ক্ষবথুশ্চ নিগৃহ্যতে॥
দীনা জিহ্বা সমুৎক্ষিপ্তা কলা সজ্জতি
চাস্য বাক্
দন্তাশ্চলন্তি বধ্যেতে শ্রবণৌ ভিদ্যতে স্বরঃ॥
পাদহস্তাক্ষিজঙ্ঘোরুশঙ্খশ্রবণগণ্ডরুক্।
অর্দ্ধে তস্মিন মুখার্দ্ধে বা কেবলেস্যাৎ
তদর্দ্দিতম্॥

সুশ্রুতও অর্দ্দিত রোগের উল্লিখিত উপদ্রব সমূহ বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু চরকের সহিত এ বিষয়ে সুশ্রুতের মতভেদ লক্ষিত হয়। চরক অর্দ্দিত রোগ অর্দ্ধশরীর ব্যাপ্ত এবং উহাতে পাদহস্তাক্ষিজঙ্ঘোরু প্রদেশ পর্য্যন্ত প্রকুপিত হইতে পারে বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সুশ্রুতের মতে অর্দ্দিত রোগ কেবলমাত্র বক্ত্রাদ্ধ ও গ্রীবাদেশের পীড়া। মাধবকার সুশ্রুতের পোষকতা করিয়া তদীয় সংগ্রহে তাহাই উদ্ধৃত করিয়াছেন। যথা—

"উচ্চৈর্ব্যাহরতোঽত্যর্থং খাদতঃ কঠিনানি বা।
হসতো জৃম্ভতো বাপি-ভারাদ্বিষমশায়িনঃ॥
শিরোনাসৌষ্ঠচিবুক-ললাটেক্ষণসন্ধিগঃ।
অর্দ্দয়ত্যনিলো বক্ত্রমর্দ্দিতং জনয়ত্যতঃ॥

বক্রীভবতি বক্ত্রার্দ্ধং গ্রীবা চাপ্যপবর্ত্ততে।
শিরশ্চলতি বাকসঙ্গো নেত্রাদীনাঞ্চবৈকৃতম্॥
গ্রীবাচিবুকদন্তানাং তস্মিন পার্শ্বে চ বেদনা।
যস্যাগ্রজো রোমহর্ষো বেপুথর্নেত্রমাবিলম্।
বায়ুরূর্দ্ধং ত্বচি স্বাপস্তোদো মন্যাহনুগ্রহঃ।
তমর্দ্দিতমিতি প্রাহুর্ব্যাধিং ব্যাধিবিচক্ষণাঃ॥"

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, সুশ্রুত চরকোক্ত "অর্দ্ধে তস্মিন্ মুখার্দ্ধে বা কেবলং স্যাৎ-তদার্দ্দিতম্।" সংজ্ঞার পোষকতা করেন নহে। এই মতবৈষম্য সম্বন্ধে মধুকোষ টীকায় বিজয়রক্ষিত লিখিয়াছেন—তন্ত্রান্তরে তু মুখার্দ্ধবচ্ছরীরার্দ্ধব্যাপকোঽপ্যর্দ্দিত যদাহ দৃঢ়বলঃ "অর্দ্ধে তস্মিন মুখার্দ্ধে বা কেবলস্যাত্ত মর্দ্দিতং ইতি। নমু সম্বেবং তদা অর্দ্দিতাৎ অর্দ্ধাঙ্গবাতয়োঃ কো ভেদঃ? উচ্যতে, বেগিত্বেনার্দ্দিতে কদাচিদ্বেদনা ভবতি, অর্দ্ধাঙ্গবাতে তু সর্ব্বদৈবেতি ভেদঃ, অথবা যথোক্ত সর্ব্বলিঙ্গোঽর্দ্দিত-স্তদ্বিপরীতস্ত্বর্দ্ধাঙ্গবাত ইত্যাহুঃ।"

পাশ্চাত্য মতে এই ব্যাধি কেবল মাত্র মুখার্দ্ধেও হইতে পারে—আবার অর্দ্ধশরীর ব্যাপ্তও হইতে পারে। সুতরাং এক্ষেত্রেও দেখা যাইতেছে যে, প্রকৃত প্রস্তাবে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মতে কোন পার্থক্য লক্ষিত হইতেছে না।

৩। গৃধ্রসী।—পায়ের গোড়ালী এবং অঙ্গুলি সমূহকে আশ্রয় করিয়া যে সকল বস্তু আছে, তাহা বায়ু কর্ত্তৃক বিকৃত হইলে পদদ্বয়ের চালনা কষ্টকর হইয়া উঠে। সুশ্রুত এই ব্যাধিকে গৃধ্রসী আখ্যা প্রদান করিয়াছেন।

চরকের মতে গৃধ্রসী রোগে প্রথমতঃ নিতম্বদেশে শূল, তোদ, স্তম্ভ এবং মুহুর্মুহুঃ স্পন্দন অনুভূত হয়—ক্রমে উহা প্রসারিত হইয়া কটি পৃষ্ঠ, উরু, জানু, জঙ্ঘা এবং পদদ্বয় আক্রমণ করে।

"স্ফিক পূর্ব্বা কটিপৃষ্ঠোরু জানুজঙ্ঘাপদংক্রমাৎ
গৃধ্রসী স্তম্ভরুকতোদৈর্গৃহ্লাতি স্পন্দতে মুহুঃ॥

পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ sciatica নামক ব্যাধির উপদ্রব সম্বন্ধে বলেন যে, প্রথমে উরুর পশ্চাৎদেশে বেদনার অনুভূতি হয় এবং ক্রমে বেদনা তীক্ষ্ণ হইয়া সমগ্র পদদেশ ব্যাপিয়া যাতনার সৃষ্টি করে।

টেইলর এই ব্যাধিজাত বেদনাকে burring aud guawing (শূল ও তোদ) বলিয়া বিবৃত করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, এই ব্যাধির প্রকোপে কখনো কখনো মাংসপেশীর স্পন্দন পরিলক্ষিত হয়। কখনো কখনো এই শ্রেণীর বাতব্যাধি মেরুদণ্ডের অভ্যন্তরস্থ গর্ভকেন্দ্রকে পর্য্যন্ত বিকৃত করে।

৪। কলায়খঞ্জ।—পাশ্চাত্য-মতে নার্ভের পীড়াজনিত অব্যবস্থিত গতিকে (Inco ordination) লোকোমোটর এটাক্সী বলে। এই ব্যাধি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে রোগী অন্ধকারে শরীরের সাম্যাবস্থা সংরক্ষণ করিতে পারে না। চলিবার সময় তাহার দৃষ্টি নিম্নদিকে সংবদ্ধ থাকে—শরীর সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়ে এবং সে পদদ্বয় অপেক্ষাকৃত অধিক ব্যবধানে স্থাপন করে। পদ বিক্ষেপকালে তাহার শরীর কম্পিত হয় এবং পদানুরূপ স্থানে পদস্থাপন করিতে পারে না। চলিতে চলিতে সহসা গতি পরিবর্ত্তনের চেষ্টা করিলে সে ঘুরিয়া মাটীতে পড়িয়া যায়।

সুশ্রুত এইরূপ ব্যাধিকে কলায়খঞ্জ আখ্যা প্রদান করিয়াছেন।

"প্রক্রামন্ বেপতে যস্তু খঞ্জনিব চ গচ্ছতি।
কলায়খঞ্জং তং বিদ্যান্মুক্তসন্ধিপ্রবন্ধনম্॥
মধুকোষে বিজয় রক্ষিত বলিয়াছেন—
"প্রক্রামন্নিতি গমনমারভমাণো বেপতে। প্রশব্দোহয়ং আদিকর্ম্মণি। খঞ্জন্নিব গচ্ছতি বিকলয়ন্নিব গচ্ছতি, গমনারম্ভবেপনেন খঞ্জাদস্য ভেদঃ।"

আমরা বিভিন্ন প্রকারের এই চতুর্ব্বিধ বাতব্যাধির আলোচনা করিয়া দেখিতে পাইলাম যে, পাশ্চাত্য চিকিৎসা-তন্ত্রে বর্ণিত নার্ভের পীড়া এবং আয়ুর্ব্বেদোক্ত বাত ব্যাধি সমূহ বস্তুতঃ পক্ষে একই শ্রেণীর রোগ। বাহুল্য বিবেচনায় এবং পাঠকবর্গের বিরক্তি-ভাজন হইবার আশঙ্কায় অন্যান্য বাতব্যাধির আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম না। বাধিস্য কাকস্তম্ভ, খাঞ্জা দৃষ্টিনাশ, অববাহুক বিশাচী এবং মলমূত্রের বিবন্ধ প্রভৃতি যে নার্ভের বিকারবশতঃ হইয়া থাকে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

সার্দ্ধদ্বিসহস্রবর্ষপূর্ব্বে আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষগণ অপূর্ব্ব সাধনার বলে যে তথ্য সমূহের আবিষ্কার দ্বারা মানব সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন, শত শত শতাব্দীপরে প্রতীচির চিকিৎসকগণ আজ বিজ্ঞানের সাহায্যে তাহারই পুনঃ-প্রচারে ব্রতী হইয়াছেন। ইহা পাশ্চাত্য জাতি সমূহের জ্ঞানোন্নতির নিদর্শন হইতে পারে সত্য, কিন্তু ফলমূলসেবী ভারতীয় ঋষিগণ পূর্ব্বে যে জ্ঞান প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তদপেক্ষা অধিকতর উন্নত কিছুর সন্ধান না পাইলে কেমন করিয়া বলিব যে, পাশ্চাত্য-চিকিৎসা-তন্ত্র বিশ্বমানবের জ্ঞান বৃদ্ধি করিয়াছে।

এমন গভীর সাধনা, এত অর্থব্যয়, থিয়রী লইয়া এত বাদ প্রতিবাদ করিয়াও তাঁহারা বিশ্ববাসীকে নূতন কিছু শিখাইতে পারিয়াছেন, বলিয়া আমরা মনে করিতে পারি না।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, শস্ত্রো-প্রচার বিধি পাশ্চাত্য চিকিৎসা তন্ত্রের একটী অভিনব আশ্চর্য্য ব্যবস্থা। কিন্তু তাহাতেও নূতনত্ব কিছুই নাই।

ঋষিগণ বর্ণিত সেই (১) শিরাবাধন, (২) উদরপাটন, (৩) অন্ত্রচ্ছেদন, (৪) নাসাকর্ণোষ্ঠ বন্ধন, (৫) দোষোদকনিষ্কাশন, (৬) অশ্মরী আকর্ষণ, (৭) মূঢ়গর্ভ শল্যোদ্ধরণ প্রভৃতিই (১) Venesection, (২) Laparotomy, (৩) Operations on the Intestines, (৪) Plastic operations, (৫) Tapping, (৬) Lithotomy, (৭) Embriyotomy প্রভৃতি নূতন নামে, নবীন মূর্ত্তিতে আমাদিগকে বিস্মিত করিয়া তুলিয়াছে।

এ সবই সে পুরাতনের পুনরাবৃত্তি। *

শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত।

* পুরাতনের পুনরাবৃত্তি সন্দেহ নাই, কিন্তু ঋষি প্রচারিত সেই শল্য চিকিৎসা যে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক সমাজ হইতে একেবারে লুপ্ত হইয়াছে। পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ আমাদেরই পুরাতন জিনিসকে যে আমাদের সম্মুখে নূতন করিয়া ধরিতেছেন, তদ্দর্শনে আমরা বিস্মিত না হইলেও তাহা দেখিয়া আমাদের শিখিবার বিষয় যে যথেষ্ট রহিয়াছে। শুধু মুখে আমাদের অতীত গৌরবের স্মৃতি আনিয়া সুপ্ত থাকিলে চলিবে না, সেই সব লুপ্ত বিষয়ের পুনরুদ্ধারের প্রয়াসে জাগরিত হইতে হইবে। অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাও তো এইজন্যই করা হইয়াছে। আঃ সং।

আয়ুর্ব্বেদ-সমস্যা

(২)

এইবার আমরা ঔষধের মাত্রা লইয়া আলোচনা করিব। আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থাদিতে প্রায় সর্ব্বত্রই ঔষধের একটা মাত্রা নির্দ্ধারিত আছে; এই মাত্রার হিসাবে ঔষধাদি প্রস্তুত করাই যে আবিষ্কর্ত্তাদিগের অভিপ্রেত, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। মাত্রার পরিমাণ সর্ব্বত্রই নির্দ্দিষ্ট, উহা সের প্রতি বা তোলা প্রতি এত, এইরূপ হারাহারি হিসাব নহে। কিন্তু আমি অনুসন্ধানে জানিতে পারিয়াছি, এদেশে বহুদিন হইতে মাত্রা-ব্যতিক্রমের বিধান চলিয়া আসিতেছে, নির্দ্ধারিত তালিকার হারাহারি করিয়া কেহ বা কম, কেহ বা বেশী মাত্রায় ঔষধ প্রস্তুত করিয়া থাকেন। এরূপ মাত্রা-ব্যতিক্রমের ফল-বৈষম্য ঘটে কি না, তাহা বিশেষভাবে বিবেচ্য। পাকের ঔষধে মাত্রা-ব্যতিক্রমের সঙ্গে অগ্নিতাপের বিভিন্নতা অবশ্যম্ভাবী; দৃষ্টান্ত দ্বারা কথাটা বুঝাইয়া বলিতেছি; মনে করুন, মহামাষ তৈলের পূর্ণমাত্রার মাষকলাই ৪ সের, দশমূল ৬॥ সের, ছাগ-মাংস ৩০ পল, ৬০ সের জলে জ্বাল দিয়া ১৬ সের থাকিতে কাথ গ্রহণ করিতে হয়; এই কাথ যেরূপ হইবে, কেহ যদি অর্দ্ধমাত্রায় ঔষধ গ্রহণ করিয়া ৩০ সের জলে সিদ্ধ করতঃ ৮ সের কাথ গ্রহণ করেন, অথবা দ্বিগুণ মাত্রায় ১২৮ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ৩২ সের কাথ গ্রহণ করেন, তাহা হইলে সেই কাথ ঠিক তেমন হইবে কি না, কে বলিতে পারে? ঋষিকল্প আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণ বিজ্ঞানে অগাধ অধিকারের বলে যে মাত্রা নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন, নিশ্চয়ই তাহার একটা গভীর রহস্য আছে। আমি অনেক প্রবীণ চিকিৎসকের নিকট শুনিয়াছি, পূর্ণমাত্রার ব্যতিক্রম করিলে ঔষধ তেমন ফলপ্রদ হয় না। বস্তুতঃ এইরূপ মাত্রার কোন অর্থ না থাকিলে, বিভিন্ন ঔষধের বিভিন্ন মাত্রা (যেমন ত্রিশতী-প্রসারণী তৈল /৪ সের, কুব্জপ্রসারিণী ১৬ সের, অষ্টাদশশতিকপ্রসারণী ৬৪ সের) নির্ণয় করা হইয়াছে কেন? যাহা হউক ঔষধের মাত্রার সহিত ফলের কোন সম্বন্ধ আছে কি না, এ বিষয় ধীরভাবে বিবেচনা করিয়া চিকিৎসক মণ্ডলী যদি তাঁহাদিগের সিদ্ধান্ত সাধারণ্যে প্রচার করেন, তাহা হইলে দেশের বিশেষ কল্যাণ হইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস।

ঔষধের উপাদান-বৈষম্য—সামান্য অভিজ্ঞতার ফলেই এমন অনেক ঔষধের পরিচয় আমি পাইয়াছি, যে সকলের বিভিন্ন প্রকার উপাদানের তালিকা দেশে প্রচলিত আছে। একই ঔষধের ২।৩ রকম তালিকার কথা বোধ হয়, চিকিৎসক মণ্ডলীর অবিদিত নহে; আমি কোন কোন ঔষধের ৪৫ টী তালিকাও দেখিয়াছি। একই ঔষধ বিভিন্ন উপাদানে প্রস্তুত হইলে, উহার ফল কখনই একরূপ হইতে পারে না। এই উপাদান-বৈষম্য দর্শনেই আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধের আলোচনায় আমার মনোযোগ প্রথম আকৃষ্ট হইয়াছিল। একবার আমার কিছু

স্বর্ণসিন্দূর প্রস্তুত করাইবার প্রয়োজন হওয়াতে, কবিরাজদিগের নিকট উহার প্রস্তুতপ্রণালীর সন্ধান লইয়া আমি দুই রকম তালিকা প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। একজন কবিরাজ আমাকে যে তালিকা দিলেন, তাহাতে স্বর্ণ ১ তোলা, পারদ ৮ তোলা, এবং গন্ধক ১৬ তোলা ছিল; অপর এক জনের প্রদত্ত তালিকায় স্বর্ণের পরিমাণ ১ তোলা, পারদ ৮ তোলা এবং গন্ধক ৮ তোলা। এই পার্থক্য দেখিয়া আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থে স্বর্ণসিন্দূরের সন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হই; দেখিলাম, ভৈষজ্য রত্নাবলীতে স্বর্ণসিন্দূরের যে বচন আছে, তাহার সহিত উল্লিখিত তালিকাদ্বয়ের একটীরও মিল নাই। এখানেই আমার আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধাদি সম্বন্ধে আলোচনার সূত্রপাত হয়, এবং তৎফলে নানাপ্রকার সমস্যা আমার মনে জাগিয়া উঠে। তদবধি আমি আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধাদি প্রস্তুত করাইতে প্রবৃত্ত হইয়া এই সকল সমস্যা সমাধানের জন্য চেষ্টা করিতেছি, এবং যথাসাধ্য অনুসন্ধানের ফলেও সন্তুষ্ট হইতে পারি নাই। যাহা হউক, আমি অনুসন্ধানে এপর্য্যন্ত স্বর্ণসিন্দূরের নিম্নলিখিত দুইটী পৃথক বচন, এবং একটী বাঙ্গালা তালিকাপ্রাপ্ত হইয়াছি :—

১। "পলং রসেন্দ্রস্য চ গন্ধকস্যহেম্নোঽপি কর্ষংপরিগৃহ্য সম্যক।" অর্থাৎ—পারদ ৮ তোলা, গন্ধক ১ তোলা ও স্বর্ণ ২ তোলা।

২। রসগন্ধকয়োর্গ্রাহ্যং পলং হেম্নঃ কোলস্তথা। অর্থাৎ—পারদ ৮ তোলা, গন্ধক ৮ তোলা, স্বর্ণ ১ তোলা।

৩। পারদ ৪ তোলা, গন্ধক ৪ তোলা এবং স্বর্ণ ১ তোলা।

এই তিনটী তালিকার পার্থক্য পাঠক স্পষ্টই দেখিতেছেন। শেষোক্ত তালিকায় শার্ঙ্গধরের মান পরিভাষা অবলম্বনেই বোধ হয় এইরূপ পরিমাণ প্রদত্ত হইয়াছে। প্রথম ও দ্বিতীয় তালিকায় স্বর্ণের ভাগ যথাক্রমে ২ তোলা ও ১ তোলা। আমি অনুসন্ধানে জানিয়াছি, এদেশে এই দ্বিতীয় তালিকা অনুসারেই অধিকাংশ স্থলে স্বর্ণসিন্দূর প্রস্তুত করা হয়; কিন্তু বর্ত্তমান যুগের একজন প্রধান কবিরাজ আমাকে বলিয়াছেন,—স্বর্ণ ২ তোলা দ্বারা স্বর্ণসিন্দূর প্রস্তুত করিলে ফল অনেক অধিক হইয়া থাকে।

বসন্তকুসুমাকর একটী প্রধান ঔষধ। এ পর্য্যন্ত এই ঔষধের চারিটী তালিকা আমার দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। প্রত্যেক তালিকাতেই কিছু কিছু পার্থক্য বিদ্যমান আছে। রসেন্দ্রসারসংগ্রহের রসায়নাধিকারোক্ত এবং ভৈষজ্যরত্নাবলীর প্রমেহাধিকারোক্ত বসন্তকুসুমাকরের এক উপাদান হইলেও ভাবনাতে পার্থক্য আছে; যথা—রসেন্দ্রসারসংগ্রহে—"মালত্যাঃ কুসুমোদকৈঃ", ভৈষজ্যরত্নাবলীতে—"মালত্যাঃ কুসুমেন চ।" পরন্তু যোগরত্নাবলীর বচনে অনেক পার্থক্য পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। ভৈষজ্যরত্নাবলীর রসায়নাধিকারোক্ত বসন্তকুসুমাকরেও অনেক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

রসেন্দ্রসারসংগ্রহ এবং ভৈষজ্যরত্নাবলী ধৃত মন্মথাভ্ররসের বচনেও পার্থক্য দেখা যায়। প্রথম গ্রন্থে রস ও গন্ধকের মাত্রা ২ তোলা [রসগন্ধকয়োর্গ্রাহ্যং কর্ষমেকং এবং কর্পূর অর্দ্ধ তোলা (কর্পূরং শাণকং) কিন্তু দ্বিতীয় গ্রন্থের রস ও গন্ধকের মাত্রা

৮ তোলা (রসগন্ধকয়োর্গ্রাহ্যং পলমেকং) এবং কর্পূরের মাত্রা ১ তোলা (কর্পূরং তোলকং দদ্যাৎ)। বৃহৎ কস্তুরী ভৈরবেরও দুইটী তালিকা আমি দেখিয়াছি ; একটী ১৪ পদী এবং আর একটী ১৮ পদী।

বহু ঔষধেরই এইরূপ উপাদান-বৈষম্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। ঈদৃশ উপাদান-বৈষম্যে যে ফলবৈষম্য নিশ্চয়ই হয়, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। এখন এই সকল বিভিন্ন তালিকার মধ্যে কোন্ তালিকানুযায়ী ঔষধ অধিক ফলপ্রদ, দেশের লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসকগণ যদি ধীরভাবে তাহার আলোচনা করিয়া সুমীমাংসায় উপনীত হইতে পারেন তাহা হইলে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা-প্রণালীর একটী গুরুতর অভাব অপসারিত হইবে।

ঔষধপ্রস্তুত-প্রণালী—আয়ুর্ব্বেদীয় তৈল, ঘৃত, বটিকা প্রভৃতির প্রস্তুতপ্রণালীতেও আমি স্থানেস্থানে অনেক পার্থক্য প্রত্যক্ষ করিয়াছি; দৃষ্টান্তস্বরূপ তৈলপাকের প্রণালী এ স্থলে উল্লেখ করা যাইতে পারে। এ অঞ্চলের অনেক স্থানে মূর্চ্ছাপাকের পরই তৈলে কল্কদ্রব্যাদি প্রদত্ত হয়, এবং তৎপর ঐ কল্কদ্রব্যযুক্ত তৈলে ক্বাথ পাক করা হইয়া থাকে ; কিন্তু অনেক স্থানে আবার মূর্চ্ছা পাকের পরই তৈলের সহিত ক্বাথ পাক করিয়া, সেই তৈলে কল্কদ্রব্য প্রদানপূর্ব্বক জলসহ কল্ক-পাক করা হয়। ঐ উভয় প্রণালীতে পক্ব তৈল কখনই একরূপ ফল-প্রদ হইতে পারেনা। ঔষধপ্রস্তুত-প্রণালীতে যখন এইরূপ বহু পার্থক্য পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে, তখন চিকিৎসকগণ তৈল ঘৃত, বটিকা প্রভৃতি প্রস্তুতের একটা সাধারণ নিয়ম নির্দ্ধারণ করিয়া যদি সাধারণ্যে প্রচার করেন, তাহা হইলে আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধের রোগপ্রতিকার-ক্ষমতা নিশ্চয়ই বৃদ্ধি পাইতে পারে।

জারিত ধাতু—স্বর্ণ, লৌহ ও অভ্র এই তিনটি প্রধান ধাতুর জারণ ও মারণ সম্বন্ধে উপযুক্ত উপদেশ প্রচারিত হওয়া আবশ্যক ; এ কার্য্যে নানারূপ উপায় অবলম্বিত হইতে দেখা যায়। শাস্ত্রানুসারে লৌহ ও অভ্র অন্ততঃ শতপুটিত না হইলে ব্যবহারের যোগ্য হয় না ; কিন্তু অনেক চিকিৎসক আমার নিকট সরলভাবে স্বীকার করিয়াছেন, ভালরূপ ২০।২৫ টা পুট হইলেই লৌহ ও অভ্র ব্যবহারের যোগ্য হয়, আজকাল সাধারণতঃ যে সকল লৌহ ও অভ্র বিক্রয় হয় —তাহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া দেখিলে বড় বেশী 'পুটের' বলিয়া প্রতীয়মান হয় না। যাহা হউক এই লৌহ এবং অভ্রই যখন আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধের এক প্রধান উপাদান, তখন এ সকলের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। এ প্রসঙ্গে আর একটি কথা আমি চিকিৎসকদিগের নিকট নিবেদন করিব, আমি জনৈক প্রবীণ চিকিৎসকের নিকট শুনিয়াছি, হীরাকস হইতে ১০।১৫ পুটের নাকি অতি উৎকৃষ্ট লৌহ প্রস্তুত হইতে পারে, এবং তদ্দ্বারা প্রচলিত লৌহ অপেক্ষা নাকি অধিক ফল পাওয়া যায়। চিকিৎসকগণ ইহা একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। ঢাকার একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক আমাকে সম্প্রতি জানাইয়াছেন, পর্প টী এবং চতুর্ম্মুখ এই দুইটী ঔষধে তিনি জারিত স্বর্ণ অপেক্ষা কাঁচা সোনা মিশ্রিত কজ্জলী ব্যবহার করিয়া

অনেক অধিক ফল লাভ করিয়াছেন। বংশ-পরম্পরা ব্যবহার দ্বারা এইরূপ কাঁচা সোনার গুণ পরীক্ষিত হইয়াছে বলিয়া তিনি বলিলেন। আয়ুর্ব্বেদীয় উন্নতির নিমিত্ত চিকিৎসকদিগকে আমি ইহাও পরীক্ষা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

ঘৃত—আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ প্রস্তুতের জন্য নূতন কি পুরাতন ঘৃত ব্যবহার করা কর্ত্তব্য, সে সম্বন্ধে এক গুরুতর সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে। আজকাল দেখা যায়, অনেকেই নূতন ঘৃত ঔষধার্থ ব্যবহার করিয়া থাকেন। কিন্তু ঔষধপ্রস্তুত-প্রণালীতে শাস্ত্রকার স্পষ্টবাক্যে নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

দ্রব্যাণ্যভিনবান্যেব প্রশস্তানি ক্রিয়াবিধৌ।
ঋতে গুড় ঘৃত ক্ষৌদ্র ধান্য কৃষ্ণা বিড়ঙ্গতঃ॥

এরূপ সুস্পষ্ট নিষেধ বাক্য সত্ত্বে নূতন ঘৃত ব্যবহৃত হইতে পারে কিরূপে, তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন। চরক, হারীত, সুশ্রুত, বাগ্‌ভট চক্রপাণি প্রমুখ আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণ পুরাতন ঘৃতের অশেষ গুণ বর্ণন করিয়াছেন। এস্থলে আমি মহর্ষি হারীতের বচনটী মাত্র উদ্ধৃত করিতেছি :—

সর্পিঃ পুরাণং বিজ্ঞেয়ং দশবর্ষস্থিতং তু যৎ।
সর্পিঃ পুরাতনং শ্রেষ্ঠং ত্রিদোষতিমিরাপহম্॥
মূর্চ্ছা-কুষ্ঠ-বিষোন্মাদগ্রহাপস্মারনাশনম্।
দশ সম্বৎসরাদূর্দ্ধং আজামুক্তং রসায়নম্॥
শতবর্ষস্থিতং যত্ত কুম্ভসর্পিস্তদুচ্যতে।
রক্ষোঘ্নং কুম্ভসর্পিঃ স্যাৎ পরতস্তু মহাঘৃতম্॥
পেয়ং মহাঘৃতংভূতৈঃ সর্ব্বতোঽপি গুণাধিকম্।
যথা যথা জরাং যাতি গুণবৎ স্যাৎ তথা তথা।

এখানে দেখা যায়, দশ বৎসরের না হইলে ঘৃতকে পুরাতন বলা যায় না এবং দশ বৎসরের অধিক পুরাতন হইলেই ঘৃত রসায়ন গুণসম্পন্ন হইয়া থাকে। শত বৎসরের অধিক সময়ের পুরাতন ঘৃত সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গুণযুক্ত ; ফলতঃ ঘৃত যত অধিক পুরাতন হইবে, উহার উপকারিতাও তত অধিক বলিয়াই নির্ণীত হইয়াছে।" ভাব-প্রকাশের—

"বর্ষাদূর্দ্ধং ভবেদাজ্যং পুরাণং তৎ ত্রিদোষণুৎ"

এই বচনের দোহাই দিয়া এক বৎসরের অতিরিক্ত সময়ের ঘৃতকে পুরাতন বলা কেবল নিতান্ত অনুপায় স্থলেই চলিতে পারে, কারণ উহার পরই ভাবপ্রকাশ বলিতে-ছেন :—

"যথা যথাখিলং সর্পিঃ পুরাণমধিকং ভবেৎ।
তথা তথা গুণৈঃ স্বৈঃ স্বৈরধিকং তদুদাহৃতম।

সুতরাং বেশীদিনের পুরাতন ঘৃত ঔষধে ব্যবহার করা যে ভাবপ্রকাশেরও অভিপ্রেত তৎপক্ষে সংশয় নাই। এ অবস্থায় নূতন বা দশ বৎসরের কম সময়ের পুরাতন ঘৃত ঔষধার্থ ব্যবহার করা যাইতে পারে কি না, এবং ঐরূপ ব্যবহারে ঔষধের উপকারিতা হ্রাস পাইতেছে কি না, তাহা সকলে ধীরভাবে বিবেচনা করিয়া দেখেন,—ইহাই আমার প্রার্থনা।

মকরধ্বজ ও স্বর্ণসিন্দূর।—জানি না, কোন্ ঋষিবাক্যের অনুবলে এ দেশে কিয়ৎকাল যাবৎ মকরধ্বজ ও স্বর্ণ-সিন্দূর এক ও অভিন্ন পদার্থরূপে প্রচারিত হইতেছে। আজ কাল "মকরধ্বজ' (স্বর্ণ-সিন্দূর) এইরূপ এক অপূর্ব্ব আখ্যা দৃষ্টি গোচর হইয়া থাকে। আমি যতদূর জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে মকরধ্বজ ও স্বর্ণসিন্দূর দুইটী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পদার্থ বলিয়াই প্রতিপন্ন হইতেছে ; ইহাদের উপাদানের জিনিষ এক

হইলেও, ঐ সকল জিনিষের মাত্রা এবং উভয়ের প্রস্তুতপ্রণালীতে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। মকরধ্বজ প্রস্তুত করিতে হইলে—

স্বর্ণদলং পলমেকৈব রসেন্দ্রস্য পলাষ্টকম্।
রসমাৎ দ্বিগুণং গন্ধং তেনৈব কজ্জলীকৃতম্॥
কুমারিকা রসৈর্ভাব্যং কাচপাত্রে নিধাপয়েৎ
বালুকাযন্ত্রগং কৃত্বা ক্রমশ স্ত্রিদিনং পচেৎ॥

স্বর্ণ ৮ তোলা, পারদ ৬৪ তোলা এবং গন্ধক ১২৮ তোলা দ্বারা কজ্জলী করিয়া কুমারীরসে ৭টী ভাবনা প্রদানপূর্ব্বক বালুকা-যন্ত্রে তিন দিন পাক করিতে হয়। কিন্তু স্বর্ণসিন্দূরের জন্য—

পলং রসেন্দ্রস্য চ গন্ধকস্য হেম্নোঽপি কর্ষং পরিগৃহ্য সম্যক্।
বটপ্ররোহস্য রসেন যামং যামং বিমর্দ্দ্যাথ কুমারিকায়াঃ।
তৎ কাচ কুপ্যাং নিহিতং প্রযত্নাৎ পচেদ্বিধিজ্ঞঃ সিকতাখ্য যন্ত্রে।

৮ তোলা পারদ ও ৮ তোলা গন্ধক ২ তোলা স্বর্ণের সঙ্গে কজ্জলী করিয়া, বটাঙ্কুরের রস দ্বারা এক প্রহর এবং কুমারী-রস দ্বারা এক প্রহর মর্দ্দন পূর্ব্বক বালুকা-যন্ত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে যতক্ষণ আবশ্যক তত সময় পাক করিতে হইবে। সুতরাং এই উভয় পদার্থে পার্থক্য কত—তাহা বোধ হয় কাহাকেও বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। মকরধ্বজ আয়ুর্ব্বেদের শ্রেষ্ঠরত্ন; এই মহৌষধিই সর্ব্বরোগহর এবং জরা-মরণ-নাশন বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। কিন্তু বড় দুঃখের সহিত আমাকে বলিতে হইতেছে, এমন পরমকল্যাণকর পদার্থের প্রস্তুতপ্রণালী বোধ হয় এখন এ দেশের অতি অল্প লোকই অবগত আছেন। আমি অনেক চেষ্টা করিয়াও মকরধ্বজ প্রস্তুতে প্রকৃত পারদর্শী কোন মহাজনের সন্ধান এ পর্য্যন্ত করিয়া উঠিতে পারি নাই। কি উপায়ে যে তিন দিন জ্বাল দিয়া ঠিক অবিকৃত অবস্থায় ঔষধ রক্ষা করিতে পারা যায়, তাহা এখন অনেকেই অবগত নহেন।

"মকরধ্বজ (স্বর্ণসিন্দূর)" নামে এখন যে অপূর্ব্ব পদার্থ প্রচারিত হইতেছে, তৎসম্বন্ধে অনুসন্ধান লইয়া আমি জানিতে পারিয়াছি, ১ তোলা স্বর্ণ, ৮ তোলা পারদ এবং ১৬ তোলা গন্ধক দ্বারা কজ্জলী করিয়া কুমারীরসে মর্দ্দন পূর্ব্বক বালুকা যন্ত্রে ৮।১০ ঘণ্টা জাল দিয়া উহা প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, উপাদান ও জ্বালের অল্পতা নিবন্ধন ইহাকে শাস্ত্রানুসারে মকরধ্বজ তো বলা যায়-ই না, পরন্তু গন্ধকের আধিক্য ও স্বর্ণের অল্পতায় ইহা খাঁটি স্বর্ণসিন্দূর নামেও অভিহিত হইতে পারে না। এভাবে ঔষধ প্রস্তুত হইলে, তদ্দারা জরামরণ কেন, সামান্য ব্যাধির বিনাশ না হইলেও তাহাতে বিস্মিত হইবার কোনই কারণ নাই! যাহা হউক প্রকৃত মকরধ্বজ প্রস্তুত সম্বন্ধে যাঁহাদের যথার্থ অভিজ্ঞতা আছে, তাঁহারা যদি কৃপাপূর্ব্বক সকলকে বুঝাইয়া দেন যে, অগ্নিতাপের পরিমাণ কি ভাবে রক্ষা করিলে তিন দিনে পাক-কার্য্য সুসম্পন্ন হয়, এবং কিরূপ চিহ্ন দেখিয়া ঔষধ পাক শেষ হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে হইবে, তবেই একমাত্র এই পরমকল্যাণকর ঔষধ অচিরে বিলুপ্তি হইতে রক্ষিত হইতে পারে। দেশের ও আয়ুর্ব্বেদের যথার্থ কল্যাণসাধন করিতে হইলে, যাহাতে মকরধ্বজের প্রস্তুতপ্রণালী সকলের শিখিবার সুবিধা হয় তদ্রূপ ব্যবস্থা করিবার

জন্য দেশের ভিষকবর্গ বদ্ধপরিকর হইবেন, ইহাই আমি যুক্তকরে প্রার্থনা করিতেছি। যত্ন ও চেষ্টার ত্রুটিতে যদি এই অমূল্যরত্ন বিস্মৃতিসলিলে বিসর্জ্জিত হয়, তাহা হইলে তদপেক্ষা অধিকতর দুর্ভাগ্যের বিষয় এদেশবাসীর আর কিছুই হইতে পারে না। স্বর্ণসিন্দূর প্রস্তুতের "বিধিজ্ঞ" ব্যক্তি এদেশে অনেক আছেন, যথার্থ জিনিষ দ্বারা শাস্ত্রোক্ত প্রণালীতে উহা প্রস্তুত করিলে, নিশ্চয়ই অতি উত্তম ফললাভ হইবে। তবে, বরিশালের স্বর্ণসিন্দূর ব্যবসায়িগণের অতি সুলভ পদার্থের মায়ায় যাঁহারা মুগ্ধ হইতেছেন তাঁহারা কখনই সেই জিনিষ হইতে শাস্ত্রোক্ত স্বর্ণসিন্দূরের সুফল প্রত্যাশা করিতে পারেন না।

চ্যবনপ্রাশ।—অবশেষে আমি আয়ুর্ব্বেদের "পরম রসায়ন" চ্যবনপ্রাশ সম্বন্ধে দুই একটি কথা নিবেদন করিয়া এই প্রস্তাবের উপসংহার করিব। আপনারা সকলেই জানেন, এই মহৌষধের প্রভাবে অতিবৃদ্ধ ও বিগতেন্দ্রিয় চ্যবনমুনি পুনর্ব্বার নবযৌবন লাভ করিয়াছিলেন। এমন একটা প্রত্যক্ষ প্রমাণ অন্য কোন ঔষধের বর্ণনায় আছে বলিয়া আমি অবগত নহি। কিন্তু সেকালের চ্যবনমুনির ভাগ্যে যাহাই ঘটিয়া থাকুক, চ্যবনপ্রাশ একালের সুকুমার বালক ও যুবকদিগের স্বাস্থ্য ও সামর্থ্য রক্ষায়ও সমর্থ হইতেছে না, তাহা আমাদের নিয়তই প্রত্যক্ষীভূত হইতেছে! এরূপ ফলবিপর্য্যয়ের যে নিশ্চয়ই কোন গূঢ় কারণ আছে, তৎপক্ষে সন্দেহ করা যাইতে পারে না। কি সেই কারণ, এবং কিরূপেই বা তাহার প্রতিকার করা যাইতে পারে, আয়ুর্ব্বেদের সম্মান ও গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে, তদ্বিষয়ে চিকিৎসকদিগের দৃষ্টিপাত একান্ত আবশ্যক। আমি এ বিষয়ে আয়ুর্ব্বেদ-হিতৈষী ব্যক্তি মাত্রেরই বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি।

চ্যবনপ্রাশে ৫০০ শত আমলকী প্রদানের বিধান রহিয়াছে, অথচ অন্যান্য ঔষধ সমস্তই পল-মানে ব্যবস্থিত আছে। আজকাল দেশে যে সকল বিভিন্ন আকারের আমলকী দৃষ্টিগোচর হয়, তাহার সহিত নির্দ্দিষ্ট পলাদিমানের অন্যান্য ঔষধ সম্মিলিত হওয়াতে ফলবৈষম্য ঘটিবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে, কারণ ৫০০ শত বৃহদাকারের কাশীর আমলকী এ দেশের ৫০০ শত আমলকী অপেক্ষা পরিমাণে দ্বিগুণেরও অধিক হইবে। সুতরাং অন্যান্য ঔষধাদির সহিত সামঞ্জস্য দ্বারা সুফললাভের নিমিত্ত এই পাঁচশত আমলকীর একটা পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিয়া দেওয়া সঙ্গত কি না, চিকিৎসকগণ তাহা বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া দেখিবেন। ভৈষজ্যরত্নাবলীতে এই ৫০০ শত আমলকীর জন্য /৭৸/০ সাত সের তের ছটাক মাত্রা নির্দ্ধারিত হইয়াছে; ইহা কতদূর সমীচীন, তাহাও চিন্তনীয়।

তার পর, চ্যবনপ্রাশের জন্য গৃহীত আমলকী শুষ্ক কি অশুষ্ক হওয়া উচিত, তৎসম্বন্ধেও মতভেদ চলিতেছে। আজকাল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অশুষ্ক আমলকী দ্বারা চ্যবনপ্রাশ প্রস্তুত করা হয়। কিন্তু আমি কোন প্রবীণ চিকিৎসকের নিকট শুনিয়াছি, কাস অধিকারে শুষ্ক আমলকী দ্বারা প্রস্তুত চ্যবনপ্রাশই যে সমধিক ফলপ্রদ, তাহা তিনি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। আম-

লকীর আমরস কফরোগের পক্ষে হিতকর নহে, এ অবস্থায় অশুষ্ক আমলকী ব্যবহারের যৌক্তিকতা বিশেষভাবে বিবেচ্য। পরিভাষা-প্রকরণে শুষ্ক আমলকীই অধিকতর গুণ-সম্পন্ন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। যথা—

"দ্রাক্ষা-বিল্ম-শিবাদিনাং ফলং শুষ্কং
গুণাধিকম্।"

পরিভাষা প্রথমতঃ সাধারণভাবে শুষ্ক দ্রব্য গ্রহণের ব্যবস্থা করিয়া, পরে যখন বিশেষ-ভাবে শিবাদি (আমলকী, হরিতকী, বহেড়া) সম্বন্ধে সেই শুষ্কতার পুনরুক্তি করিয়াছেন, তখন নিশ্চয়ই ইহার গূঢ় অর্থ আছে। চরকোক্ত চ্যবনপ্রাশে আমলকী শুষ্ক কি অশুষ্ক হইবে, তৎসম্বন্ধে কোন কথাই নাই, কিন্তু হারীত সংহিতায় চ্যবনপ্রাশের বচনে দেখা যায়—

"ধাত্রীফলং পঞ্চশতং সুপক্ব রসসংযুতম্

আমার মনে হয়, হারীতের এই বচন হইতেই অশুষ্ক আমলকী গ্রহণের বিধান হইয়াছে। কিন্তু চরক ও হারীতোক্ত চ্যবন-প্রাশে অনেক পার্থক্য আছে। এখন সকলে চরকোক্ত চ্যবনপ্রাশই প্রস্তুত করিয়া থাকেন, সুতরাং চরকের বচনে হারীতের বিধান অনুসৃত হওয়া বোধ হয় সমীচীন নহে। হারীত চ্যবনপ্রাশের যে সকল উপাদান গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার সমবায়ে অশুষ্ক আমলকীরসের দোষ দূরীভূত হওয়া অসম্ভব নহে, আমি কিন্তু হারীতোক্ত "পিপ্পলীনাং সহস্রৈকং" কথা দ্বারা ইহাই বুঝিয়াছি। চরকের চ্যবনপ্রাশে মাত্র "পিপ্পল্য দ্বিপলং" ব্যবস্থিত আছে। এক সহস্র পিপুলের তেজে আমলকীর আমদোষ নষ্ট হওয়া অসম্ভব নহে। যাহা হউক, আজকাল চরকোক্ত যে চ্যবনপ্রাশ প্রস্তুত করা হয়, তাহাতে শুষ্ক কি অশুষ্ক আমলকী প্রদান করা কর্ত্তব্য, চিকিৎসকগণ যদি দয়া করিয়া তাহা নির্ণয় করিয়া দেন, তাহা হইলে দেশবাসীর প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবে।

শ্রীমুকুন্দবিহারী চক্রবর্ত্তী।

সভ্যতায় আয়ুক্ষয়।

জগতের যাবতীয় সভ্যজাতিদিগের ইতি-বৃত্ত আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানবের আয়ুর হ্রাস হইতেছে। এই কথায় অনেকেই আশ্চর্য্য হইতে পারেন। কেহ কেহ হয়ত বলিবেন, মানবের আয়ুঃ ক্রমশঃ হ্রাস হইতেছে বটে, কিন্তু সভ্যতা ইহার কারণ নহে। কিন্তু বর্ত্তমানকালে যে যে অরণ্যবাসী নগ্ন অসভ্য জাতি আছে, যাহারা সভ্যতার আলোক আদৌ প্রাপ্ত হয় নাই, তাহারা সভ্যজাতীয় মানবগণ অপেক্ষা সুস্থ, সবল ও দীর্ঘায়ু। কথাটী প্রথমতঃ আশ্চর্য্যজনক বলিয়া বোধ হয় বটে ; কেননা সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কত বিদ্যার আলোচনা, জ্ঞানের উৎকর্ষ, বিজ্ঞানের নব নব আবির্ভাব, কত নূতন বিষয়ের আবিষ্কার, শ্রম লাঘবের জন্য কত নূতন

নূতন কল-কারখানা, স্বাস্থ্যরক্ষার অভিনব উপায়াবলী, রোগ নিবারণের জন্য নূতন নূতন কত ঔষধাবলী, কত নূতন নূতন তত্ত্ব প্রভৃতির অভ্যুদয় হইতেছে, তাহার ফল কি মানবের আয়ুর্হ্রাস? বাস্তবিকই কথাটা প্রাণে লাগে, এত উন্নতির ফল কি না আয়ুহ্রাস!

কিন্তু একটু চিন্তা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, সভ্যতার অনুরোধে আমাদিগকে নানাবিধ অনৈসর্গিক ক্রিয়ার বশবর্ত্তী হইতে হয় এবং আহার, বিহার, পরিধেয়, বাসস্থান প্রভৃতি সম্বন্ধে সভ্যতা বজায় রাখিতে গিয়া অনেক অনৈসর্গিক উপায় অবলম্বন করিতে হয়। সুতরাং স্বাস্থ্য ও জীবনরক্ষায় প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যত্যয় ঘটে। আমরা অপ্রাকৃতিক উপায়ে শরীর রক্ষা করি। সভ্যতার অনুরোধে নানাবিধ পরিচ্ছদে আমাদের দেহ সর্ব্বাঙ্গ আবৃত রাখিতে হয়। ইহার ফল এই হয় যে, আমাদের ত্বকের তাপ-রক্ষিণী ও শৈত্যনিবারণী শক্তি হ্রাস হইয়া থাকে। পরিচ্ছদের ঔচিত্যানুচিত্যের জন্য শরীরে নানাপ্রকার রোগ উৎপন্ন হইতে পারে। শুধু তাহাই নহে, সভ্যতার অনুরোধে পরিচ্ছদ-পারিপাট্যে আমাদের অযথা অর্থব্যয় ত হইয়াই থাকে, তদ্ভিন্ন এই সভ্যতা বজায় রাখিতে গিয়া হয়ত পরিপোষণোপযোগী খাদ্যাদির অনটন হইয়া পড়ে, তজ্জন্য জীবনী-শক্তির হ্রাস হয়। পাঁচসিকা দেড়টাকা মূল্যের কম্বল দ্বারা যথেষ্ট শীত নিবারণ হইতে পারে, কিন্তু সভ্যতার খাতিরে অনেককে ৫০৲, ১০০৲, ২০০৲ টাকা বা তদধিক মূল্যের শাল ব্যবহার করিতে হয়। এই অযথা ব্যয় কাহারও কাহারও পক্ষে। অতি স্বচ্ছন্দভাবে হইয়া উঠে বটে, কিন্তু কাহারও কাহারও পক্ষে অতিশয় কষ্টকর হয়, এজন্য তাঁহাদিগকে অনুকরণের বশবর্ত্তী হইয়া ক্ষুন্নিবৃত্তির ব্যবস্থা পূর্ণভাবে না করিয়াও সভ্যতা বজায় রাখিতে হয়। কারণ কম্বল গায়ে দিয়া সমাজে মিশিলে লোকে নিন্দা করিবে, অনেকস্থলে ঘৃণার্হ হইতে হইবে। আবার এমনও দেখা যায়, অনেক সময় পরিচ্ছদের আবশ্যক নাই, গ্রীষ্মে প্রাণ ওষ্ঠাগত, শীতল বায়ুসেবন আবশ্যক, কিন্তু সেইরূপ সময়েও সর্ব্বশরীর আবৃত করিয়া স্বেদসিক্ত কলেবরে কর্ম্মস্থলে বা সমাজে বাহির হইতে হয়। তাহা না করিলে সভ্যতা বজায় থাকে না। শুধু ইহা নহে, অনেক সময় সভ্যতার খাতিরে মলমূত্র বায়ুনিঃসরণ প্রভৃতি প্রাকৃতিক ক্রিয়ারও রোধ করিতে হয়। এই সকল দ্বারা স্বাস্থ্য-হানি হয়, সুতরাং এ সকল জীবনের পক্ষে হানিকর।

আবার বিজ্ঞানের প্রভাবে নানাবিধ বিরামের দ্রব্য আবিষ্কৃত হওয়ায় কায়িক পরিশ্রমের লাঘব হইয়াছে। যে কায়িক শ্রম দেশের লোকের নিকট একসময়ে অপরিহার্য্য ছিল, তাহা এক্ষণে সখের বা বিরামের সামগ্রী হইয়াছে। যে দূরবর্ত্তী স্থানে পূর্ব্বে লোকে অনায়াসে হাঁটিয়া যাইতেন, এক্ষণে তাহার একচতুর্থাংশ দূরও লোকে ট্রামে না চড়িয়া যাইতে পারেন না। অনেক সময় হয়ত সময়ের লাঘবের জন্য ট্রামে চড়িতে হয় বটে, কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই আরামের জন্য ট্রামে চড়া হয়। আবার লজ্জার খাতিরে অনেক শ্রমজনক কর্ম্ম পরিচারক বা ভৃত্য দ্বারা করাইতে হয়। স্ত্রীলোকদের ভিতর

জল তোলা, বাটনাবাটা, কাপড়কাচা, গৃহ পরিষ্কার, রন্ধনাদি—যে সকল তাঁহাদিগের করণীয় বিষয় বলিয়া বিধিবদ্ধ ছিল, তাহাতে যে স্ত্রীজাতির মধ্যেও কায়িক শ্রমের ব্যবস্থা হইত, তাহাও এক্ষণে সমাজে ঘৃণার কার্য্য হইয়াছে। এমন কি—সন্তানপালনও এখনকার দিনে কোন কোন স্থলে লজ্জাস্কর বলিলে অত্যুক্তি হইবে না, এখন অনেকে পরিচারিকা দ্বারা উহা ও সম্পন্ন করাইয়া থাকেন!

এখন ভোজন সম্বন্ধেও এইরূপ ব্যবস্থা। রসনাতৃপ্তির জন্য আমরা আমাদের খাদ্য নানাবিধ সুগন্ধি ও উগ্র মশলাদি দ্বারা রন্ধন করি। ইহাতে খাদ্যগুলি খুব মুখ-রোচক হয় বটে, কিন্তু প্রায়ই গুরুপাক হয়। কেবল তাহা নহে, উগ্র মশলা থাকায় লালাগ্রন্থিস্থ স্নায়ুসমূহ উত্তেজিত হয়। সেই কারণে প্রচুর লালা নিঃসরণ ও ভোজনেচ্ছা অত্যন্ত প্রবল হয়, তজ্জন্য অতিভোজন হয় অর্থাৎ আমাদের শরীর রক্ষার জন্য যতটুকু আহার আবশ্যক, তাহা অপেক্ষা অধিক মাত্রায় আহার করা হয়। সুতরাং পরিপাক যন্ত্র সমূহের অতিরিক্ত শ্রম হয়, কাজেই সেগুলি শীঘ্র অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। সেইজন্য প্রায় অনেক লোকই অল্পবয়সে অজীর্ণপ্রবণ হইয়া স্বাস্থ্যভঙ্গ করিতেছেন দেখিতে পাওয়া যায়। আবার শস্যাদি অগ্নিতে পাক করায় উহার মধুরতা ও সারাংশ কিয়ৎপরিমাণে নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং আমরা যাহা আহার করি, উহাতে সারাংশ কম থাকায় খাদ্যের পরিমাণও অধিক হওয়া আবশ্যক হয়। এইজন্য বাধ্য হইয়া অনেক সময় অতি ভোজন করা আবশ্যক হইয়া পড়ে। কিন্তু অতি ভোজনে পরিপাক যন্ত্র যে দুর্ব্বল হইয়া থাকে, সে কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

বাসভবন সম্বন্ধেও ঠিক এইরূপ। সহরেরত কথাই নাই। জমীর দুর্ম্মূল্য বশতঃ অল্প পরিসর স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া বহুলোককে বাস করিতে হয়। সুতরাং কক্ষগুলিও যে অল্পায়তন হইবে তাহাতে আর কথা কি! তাহার উপর সেই সকল কক্ষও আবার নানাবিধ বিলাস সজ্জায় সজ্জিত, কাজেই বায়ু সমাগমের স্থান অতি সঙ্কীর্ণ। ঐ সকল ক্ষুদ্র সৌধাবলীর উচ্চতাও আবার অত্যন্ত অধিক, অনেকগুলি সৌধ চতুস্তল, পঞ্চতল, কতকগুলি ষড়তলও দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার প্রত্যেক তলে লোকের বাস। একতল অপেক্ষা অন্যান্যতলে চতুর্গুণ, পঞ্চগুণ বঃ ষড়গুণ করিয়া লোক বাস করিয়া থাকে, কিন্তু বায়ু চলাচলের পরিমাণ প্রথমতল অপেক্ষা অন্যান্য তলগুলিতে কিছু বিভিন্ন নাই। যাহা হউক উপরতলের লোকদিগের শ্বাসপ্রশ্বাস দ্বারা দূষিত বায়ুর গুরুত্ব আকাশ বায়ু অপেক্ষা অধিক হওয়ায় নিম্নে নামিয়া পড়ে, সুতরাং ইহাতে নিম্নতলবাসী লোক-দিগের স্বাস্থ্যহানি বিলক্ষণরূপে হইয়া থাকে। ইহা ত গেল কলিকাতার ন্যায় সহরের কথা। পল্লীগ্রামের জমীর প্রাচুর্য্য থাকিলেও এখন অনেকে সহরের অনুকরণে অল্পায়তনে হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করিতেছেন এবং অবশিষ্ট জমি ফেলিয়া রাখিতেছেন। তবে পল্লীগ্রামের গৃহ সমূহের পরিসর সহরের গৃহাবলীর পরিসর অপেক্ষা অধিক ও বাসযোগ্য। ইহা ভিন্ন অন্যান্য অনেক কারণেও পল্লী-গ্রামের এখন যে স্বাস্থ্যহানি ঘটিতেছে, তাহাও

সভ্যতার ফলে অর্থাৎ সহরের অনুকরণে— ইহা স্বীকার করিতে হইবে। যেমন এখনকার দিনে পল্লীগ্রামেও বাসগৃহের সংলগ্ন পায়খানার ব্যবস্থা হইয়াছে কিন্তু সহরের ন্যায় ড্রেণের বন্দোবস্ত নাই, কাজেই মেথর দ্বারা ময়লা পরিষ্কার করান হয় না। বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবেন যে, এ সমস্তই সভ্যতার পরিণাম। অধুনা রাজবর্ত্ম, রেলপথ প্রভৃতি উচ্চ করিয়া নির্ম্মাণ করিবার দরুণ জলনিকাশের পথরোধ না সঙ্কীর্ণ হওয়ায় আবাসভূমি সমূহের আদ্রতা বৃদ্ধি হইয়াছে এবং তাহারই ফলে ঐ সকল স্থান অস্বাস্থ্যকর হইয়া পড়িয়াছে, ইহারও মূলে সভ্যতা নিহিত।

এইরূপ আমাদের প্রত্যেক নিত্য ক্রিয়াবলী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের স্বাস্থ্যহানি ও আয়ুর্হ্রাস হইতেছে। বাইবেলে কথিত আছে "যে পরমেশ্বর সৃষ্টিকালে পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য, বৃক্ষ, লতা, পশু, পক্ষী প্রভৃতি সৃজন করিয়া অবশেষে একটী নর ও একটী নারী সৃষ্টি করিলেন। নরের নাম আদম ও নারীর নাম ইভ্। উক্ত নরনারীকে তিনি তাঁহার সৃষ্ট ইডেন্ নামক উদ্যানে বাস, যথেচ্ছ বিচরণ ও তাঁহার সৃষ্ট পদার্থ সমূহের যথেচ্ছ উপভোগের অধিকার দিলেন। কেবল জ্ঞান বৃক্ষ ও জীবনবৃক্ষ নামক দুইটী গাছের ফল খাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন। আদমের অনুপস্থিতিকালে ভুজঙ্গরূপধারী শয়তানের কুপরামর্শে ইভ্ ভগবন্নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খাইয়া পরিতৃপ্তি লাভ করিলেন। পরে আদম প্রত্যাবর্ত্তন করিলে স্ত্রীর অনুরোধে তিনিও সেই ফল খাইলেন। অন্তর্যামী ভগবান্ মানবের এই পাপের বিষয় অবগত হইয়া তাঁহাদের সম্মুখীন হইলেন। আদম ও ইভ পূর্ব্বে নগ্নাবস্থায় বিচরণ করিতেন কিন্তু আর সে অবস্থায় পরমেশ্বরের সম্মুখে বাহির হইতে পারিলেন না, কারণ জ্ঞানফল খাইয়া তাঁহারা জ্ঞানলাভ করিয়াছেন সুতরাং লতাপাতা দ্বারা কোনরূপে লজ্জা নিবারণ করিয়া তবে বাহির হইলেন এবং আপনাদের কৃত পাপের জন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইলেন। এই জ্ঞানলাভই সভ্যতার প্রথম সোপান। যদি বাইবেল কথিত আদম ও ইভ জ্ঞান ও জীবন বৃক্ষদ্বয়ের ফল না খাইতেন, তাহা হইলে মানব ভেদজ্ঞান রহিত হইয়া অমরত্ব লাভ করিতেন,—ইহা নিশ্চিত।

এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে জ্ঞানের উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে সভ্যতার বৃদ্ধি ও তদনুষাঙ্গিক আয়ুরও হ্রাস আমাদের যেন অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িয়াছে।

ডাঃ শ্রীকার্ত্তিক চন্দ্র দাস।

ব্রহ্মচর্য্য ও বিবাহ।

—-:•:—-

(পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর)

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম সম্বন্ধে শাস্ত্রে আরও বিবিধ উপদেশ আছে। বাহুল্য ভয়ে আমরা সে সমস্ত উদ্ধৃত করিলাম না। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের পর গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিতে হয়।

এই সময়ই দার পরিগ্রহের উপযুক্ত কাল শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে, ক্ষণমাত্রও অনাশ্রমী থাকিবে না। সুতরাং ব্রহ্মচার্য্যাশ্রম হইতে বহির্গত হইয়াই দার পরিগ্রহ করিবে। কেননা গৃহিণীই গৃহ পদ বাচ্য। গৃহিণী হীন গৃহকে গৃহ বলা যায় না।

বিবাহের উপযুক্ত বয়ঃক্রম সম্বন্ধে ভগবান মনু বলিয়াছেন ;—

ত্রিশ বৎসর বয়স্ক পুরুষ দ্বাদশবর্ষীয়া মনোরমা কন্যাকে এবং চতুর্ব্বিংশতি বর্ষ বয়স্ক পুরুষ অষ্টম বর্ষীয়া কন্যাকে বিবাহ করিবে। ইহা অপেক্ষা শীঘ্র করিলে ধর্ম্মহানি ঘটে।”.

ইহা দিগদর্শন মাত্র হইলেও এইরূপ বয়সেই বিবাহ করার নিয়ম পূর্ব্বে ছিল। কারণ গুরু গৃহে অধ্যয়ন শেষ করিতে প্রায় এইরূপ বয়স হইত। সুতরাং পূর্ব্বে পুরুষের বাল্য বিবাহ ছিল না।

কন্যার বিবাহও তখনকার দিনে অল্প বয়সেই হইত। কিন্তু বিবাহ হইলেই স্বামী স্ত্রীতে উপগত হইত না। কারণ শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে—ঋতু কালেই ভার্য্যাতে উপগত হইবে। স্ত্রীলোকের ঋতু সাধারণতঃ দ্বাদশ বৎসর বয়সেই এ দেশে হইয়া থাকে। সুতরাং দ্বাদশ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে স্ত্রীতে উপগত হইবার নিয়ম পূর্ব্বে ছিল না।

আবার বিবাহ ও গর্ভাধানের মধ্যে আর একটী কার্য্য ছিল দ্বিরাগমন অর্থাৎ বিবাহের পরে পিতৃগৃহ হইতে বধূকে ভর্তৃগৃহে পুনরাগমন! এখনও অনেক স্থলে বিবাহের পরে এক বৎসর কাল অতীত না হইলে কন্যাকে পিতৃগৃহে পাঠাইবার নিয়ম নাই। কিন্তু সেকালে যেরূপ স্বামী-স্ত্রীর মিলনের মধ্যে একটা সংযতভাবের ব্যবস্থা ছিল, তাহারই ফলে তিথি-নক্ষত্র বাছিয়া—পর্ব্ব দিন বাছিয়া স্ত্রী-পুরুষের মিলনের ব্যবস্থা হইত, এখন তাহা উঠিয়া গিয়াছে। যাহা হউক আমরা শাস্ত্রকারগণ পুত্রোৎপাদন সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহারই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। ধর্ম্মশাস্ত্রে কথিত হইয়াছে ;—

বিশুদ্ধ গর্ভাশয় এবং রজো সমন্বিতা ষোড়শ বর্ষ বয়স্কা স্ত্রীতে ত্রিংশ বৎসর বয়স্ক পুরুষ উপগত হইলে উত্তম পুত্র জন্মিয়া থাকে। ইহা অপেক্ষা ন্যূন বয়সের স্ত্রী পুরুষ সঙ্গত হইলে অধম পুত্র জন্মিয়া থাকে।

ষোড়শ বৎসর অপেক্ষা কম বয়সের স্ত্রীতে পঁচিশ বৎসর অপেক্ষা কম বয়সের পুরুষ গর্ভাধান করিলে সেই গর্ভ কুক্ষিতেই মরিয়া যায়। যদি জীবিত অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হয়, তাহা হইলেও অধিক কাল বাঁচে না, যদিই বা অধিক কাল বাঁচে, তাহা হইলে দুর্ব্বলেন্দ্রিয় হইয়া থাকে। এইজন্য অত্যন্ত বালিকাতে গর্ভাধান করিবে না।

পুরুষের বিংশতি বর্ষে গর্ভাধানের উল্লেখ দুই এক স্থলে থাকিলেও তাহা প্রামাণ্য নহে, কারণ পুরুষের বিংশ বৎসর বয়সে ব্রহ্মচার্য্যাশ্রম শেষ হয় না। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের পরে বিবাহ, পরে দ্বিরাগমন পরে গর্ভাধান, সুতরাং পঞ্চবিংশতিবর্ষ বয়সের পূর্ব্বে গর্ভাধানের প্রথা প্রাচীনকালে প্রচলিত ছিল না ইহা যুক্তি যুক্ত। মনু কথিত বিবাহের বয়স ধরিলেত কথাই নাই।

পূর্ব্বে স্ত্রীলোকের বিবাহ যে আট বৎসর বয়সে হইত, মনুর বচনেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। অষ্টম বৎসরে গৌরীদানের ফল হয় এবং একাদশ বৎসরের উর্দ্ধে রজস্বলা কন্যাদানে মহাপাপ হয়। কিন্তু ইহা কেবল বিবাহ সম্বন্ধে;—গর্ভাধান সম্বন্ধে স্বতন্ত্র কথা।

ধর্ম্মশাস্ত্রে এবং আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে ষোড়শ বৎসরের পূর্ব্বে স্ত্রীলোকের গর্ভাধান করা উচিত নহে বলা হইয়াছে। কিন্তু ধর্ম্মশাস্ত্রে ঋতুকালে সহবাস না করা পাপজনক বলিয়াও কথিত হইয়াছে। অথচ ঋতুকাল রমণীর দ্বাদশ বৎসর হইতেই আরম্ভ হয়। এই অসামঞ্জস্যের মীমাংসা কি?

প্রাচীন ভারতের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে ঋষি কন্যা এবং রাজকন্যাদিগের অধিক বয়সে বিবাহ হইত ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। অল্প বয়সে ঋষিকন্যাদিগের বিবাহের নিয়ম থাকিলে শকুন্তলা, দুষ্মন্তের হাতে না পড়িয়া কোন তপস্বীর হাতেই পড়িতেন শুক্রকন্যার প্রতি অত্যাচার করার ফলে রাজার রাজ্য দগ্ধ হইয়া খাণ্ডব বনে পরিণত হইত না। সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, দ্রৌপদী প্রভৃতি রাজকন্যার বিবাহ যৌবনকালেই হইয়াছিল। অতি প্রাচীনকালে বিক্রমাদিত্য যখন ভোজ রাজার দ্বিতীয়া কন্যাকে বিবাহ করেন, তখন তিনি যুবতী। শান্তনু যখন সত্যবতীকে বিবাহ করেন, তখন তিনি ছেলের মা। এত দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, প্রাচীন যুগে স্ত্রীলোকদিগের অধিক বয়সে বিবাহ যথেষ্ট প্রচলিত ছিল।

সাধারণের মধ্যে অষ্টম হইতে একাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত বিবাহের বয়স নির্দ্ধারিত থাকিলে, ষোড়শ বৎসরের পূর্ব্বে গর্ভাধান হইত বলিয়া মনে হয় না। কেননা তাহা হইলে ধর্ম্মশাস্ত্রে এবং আয়ুর্ব্বেদে ষোড়শ বৎসর অপেক্ষা কম বয়সে গর্ভাধান হইলে যে অপকৃষ্ট পুত্র হইবার কথা লিখিত হইয়াছে, তাহার সম্মান থাকে না। অপিচ সেই নিবৃত্তির দিনে উত্তম পুত্রলাভের প্রত্যাশায় দুই তিন বৎসর সংযত হইয়া থাকা, সেকালের লোকের পক্ষে কিছুমাত্র কষ্টকর ছিল না। সুতরাং গর্ভাধানের উপযুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত কন্যা পিতৃগৃহে থাকিত। এখনও বিবাহের পর এক বৎসর কন্যা না পাঠাইবার রীতি অনেক গৃহস্থের মধ্যে প্রচলিত আছে। সম্ভবতঃ ইহা গর্ভাধানকালের জন্য প্রতীক্ষা করার রূপান্তর মাত্র।

সেকালে কন্যা গর্ভাধানের পূর্ব্বে ভর্ত্তৃগৃহে আসিলেও পতির সহিত সাক্ষাৎ ঘটিত না।

বিবাহ করিবার পর বিদ্যাদিলাভার্থ ভর্ত্তা অন্যত্র গমন করিতেন এবং তাহারই জন্য যে বিবাহের পরেই গর্ভাধান হইত না শাস্ত্রে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। যথা:—

"বিদ্যার্থং প্রোষিতস্য ব্রাহ্মণস্য দ্বারা অপত্যোৎপাদনার্থ তদভিগমনে দ্বাদশবর্ষাণি

প্রতীক্ষোরস্তু গৌতমা" অর্থাৎ স্বামী বিদ্যা শিক্ষার জন্য অন্যত্র যাইলে স্ত্রী দ্বাদশ বর্ষ অপেক্ষা করিয়া অপত্যোৎপাদনার্থ তাহার নিকটে যাইবে। এরূপ ক্ষেত্রে কন্যার আট বৎসর বয়সে বিবাহ হইলে কুড়ি বৎসরের পরে এবং দ্বাদশ বৎসরে বিবাহ হইলে চব্বিশ বৎসরের পরে গর্ভাধান হইত।

সাত বা আট বৎসর হইতে একাদশ বৎসর পর্য্যন্ত বিবাহ কাল নির্দ্দিষ্ট হইলেও এবং রজঃস্বলা কন্যার বিবাহ না দেওয়া নরক গমনের কারণ বলিয়া কথিত হইলেও উপযুক্ত পাত্র না পাইলে রজঃস্বলা কন্যার বিবাহ দেওয়া সেকালে দোষাবহ ছিল না। মনু বলিয়াছেন,—

"কন্যা ঋতুমতী হইয়া আমরণ গৃহে থাকে, সেও ভাল তথাপি কোন গুণহীন পাত্রকে দান করিবে না।

এ সম্বন্ধে মনু আরও বলিয়াছেনঃ—

ঋতুমতী হইলেও কুমারী উপযুক্ত পাত্রের অভাবে তিনবৎসর কাল উপযুক্ত পাত্রের অনুসন্ধান করিবে এবং তিন বৎসর পরে উপযুক্ত পাত্র নির্ব্বাচন করিয়া লইবে। এরূপ ক্ষেত্রে দ্বাদশ বৎসরে রজঃ প্রবৃত্ত হইলেও গর্ভাধানের কাল ষোড়শ বর্ষ হইয়া পড়ে।

গুণবান পাত্র না পাওয়া যাইলে অধিক বয়সে বিবাহ দেওয়া সেকালে যে দোষাবহ ছিল না, হরধনুভঙ্গ, লক্ষ্যভেদ প্রভৃতি দ্বারা তাহা অবগত হওয়া যায়। যাহা হউক অনেক কারণে পূর্ব্বে অনেক কন্যার অধিক বয়সে বিবাহ হইত। অধুনা গুণবান পাত্রের যেরূপ অভাব, তাহাতে ধর্ম্মে আস্থাবান হিন্দু যদি গুণবান পাত্রের অনুসন্ধান করিবার জন্য বহু বিলম্ব করিয়া কন্যার বিবাহ দেন তাহা হইলে সেকালের দৃষ্টান্ত অনুসারে পাপভাগী হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। কারণ ইহা ঋষিবাক্য; যাঁহারা ঋতুর পূর্ব্বে কন্যাকে বিবাহ না দেওয়া পাপের কারণ বলিয়াছেন, ইহাও তাঁহাদেরই কথা।

দ্বাদশ বৎসর সাধারণতঃস্ত্রীলোকের রজঃ প্রবৃত্তির কাল বলিয়া নির্দ্ধারিত হইলেও এখনও দেখা যায় যে, ত্রয়োদশ, চতুর্দ্দশ, পঞ্চদশ বা ষোড়শ বৎসরেও স্ত্রীলোক ঋতুমতী হইয়া থাকে। প্রবৃত্তি মার্গানুযায়ী আধুনিক ভারতে কন্যাগণ যত শীঘ্র রজঃস্বলা হইয়া থাকে, নিবৃত্তি মার্গানুযায়ী প্রাচীন ভারতে বোধ হয় ইহা অপেক্ষা বিলম্বে রজঃস্বলা হইত। প্রবৃত্তিমূলক বিবিধ উত্তেজক খাদ্য, নাটক, নভেল পাঠ, থিয়েটার দেখা প্রভৃতি কারণে অল্প বয়সেই বালকবালিকাদিগের মনের উত্তেজনা ঘটে, ফলে জননেন্দ্রিয়েরও উত্তেজনা ঘটায় অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে এখনকার দিনে পুষ্প দর্শন হয়। পূর্ব্বে পুরুষদিগের মন এ বিষয়ে কতদূর নির্লিপ্ত থাকিত, তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। শিক্ষা-দীক্ষাপ্রভাবে প্রাচীনকালে নারীদিগেরও চিত্তের উত্তেজনা ঘটিত না বলিয়া পূর্ব্বে অপেক্ষাকৃত অধিক বয়সে রজঃপ্রবৃত্তি হইত। মহাভারতে লিখিত আছে :—

"ত্রিংশদ্বর্ষ ষোড়শবর্ষাং ভার্য্যাং বিন্দেত নগ্নিকাং।" অর্থাৎ ত্রিশ বৎসর বয়স্ক পুরুষ ষোড়শ বৎসর বয়স্কা নগ্নিকা (যাহার রজোদর্শন হয় নাই) কন্যা বিবাহ করিবে। ষোড়শ বর্ষ বয়স্কা নগ্নিকা কন্যার উল্লেখ

থাকায় পূর্ব্বে অপেক্ষাকৃত অধিক বয়সে রজঃ প্রবৃত্তি হইত বলিয়া প্রতীতি হয়। সহবাস সম্মতি, (consent act) আইন প্রচলিত করিবার সময় ভারত গবর্ণমেণ্ট ভারতের নানা প্রদেশস্থ বহু পণ্ডিত ব্যক্তিরমত গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহাতে বিবাহ এবং গর্ভাধানের বয়স লইয়া পণ্ডিতদিগের মধ্যে অনেক মতভেদ ঘটিয়াছিল। আমরা এ সম্বন্ধে বাহুল্য ভয়ে সে সকল বিষয়ের উল্লেখ না করিয়া কয়েকটী সারগর্ভ বক্তৃতার কিয়দংশ অনুবাদ করিয়া দিতেছি।

কলিকাতা মেডিকেল সোসাইটীতে ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলের ধাত্রীবিদ্যার শিক্ষিত ডাক্তার দয়াল চন্দ্র সোম মহাশয়ের অভিমত অনুযায়ী একটী প্রবন্ধ ডাক্তার বলাই চন্দ্র সোম কর্তৃক পঠিত হইয়াছিল। তাহাতে উল্লিখিত হইয়াছে যে, 'এগার হইতে তের বৎসর বয়স্কা একুশটী বালিকার প্রসব ব্যাপারে পাঁচটী স্বাভাবিক রূপে প্রসব করিয়াছিল, পাঁচটী অত্যন্ত কষ্ট পাইয়া প্রসব করিয়াছিল। পাঁচটীকে যন্ত্র দ্বারা প্রসব করাইতে হইয়াছিল এবং ছয়টী বালিকা মৃত সন্তান প্রসব করিয়াছিল। এই সকল বালিকা প্রসূতির অনেকেরই স্বাস্থ্য প্রথম প্রসবের পরে একরূপ ভালই ছিল, দুই জনের জ্বর হইয়াছিল এবং শরীর দীর্ঘকাল দুর্ব্বল ও রক্তহীন ছিল কিন্তু দ্বিতীয় এবং তৃতীয় প্রসবের পর অনেকেই বিবিধ কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে পাঁচজন দীর্ঘকাল জ্বর ও অতিসার রোগে ভুগিয়া মারাত্মক রক্তহীনতা রোগে মারা যায়, দুই জনের ক্ষয়রোগে মৃত্যু হয়।"

"যে সকল শিশু জীবিত অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল, তাহারা ক্ষুদ্রকায় বা অসম্যকপুষ্ট হয় নাই কিন্তু জন্মের পর তাহাদের বৃদ্ধি ভালরূপ হয় নাই। একটী শিশু ধনুষ্টঙ্কার রোগে এবং দুইটী এক প্রকার ক্ষয় রোগে জন্মের দুই মাসের মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, দুইটী শিশু জন্মের পাচ মাস পরে অতিসার রোগে এবং তিনটী দাঁত উঠিবার সময় জ্বর এবং আক্ষেপক রোগে মারা যায়। অবশিষ্ট সাতটী শিশু দুর্ব্বল ও হীনস্বাস্থ্য সম্পন্ন হইয়াছিল*।"

"বঙ্গদেশীয় পণ্ডিতগণ এ সম্বন্ধে শাস্ত্রার্থের যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশের পণ্ডিতগণ তাহা গ্রহণ করেন নাই এবং এ সম্বন্ধে যুক্তি ও আপ্তবাক্যের প্রাধান্য আইনের সমর্থকদিগের পক্ষেই দেখা যায়। যদি এরূপ নাই হইত এবং আমি যদি এক জন হিন্দু হইতাম তাহা হইলে পণ্ডিত শশধর তর্ক চূড়ামণি এবং তিলকের মতানুযায়ী ন্যায় পথ অবলম্বন করা অপেক্ষা অধ্যাপক ভাণ্ডারকর, জষ্টিস তেলাং এবং দেওয়ান বাহাদুর রঘুনাথ রাওয়ের মতানুযায়ী অন্যায় পথ অবলম্বন করাই আমি শ্রেয়োবোধ করিতাম। জয়পুরের মহারাজের বিবেচনায় গোঁড়া সম্প্রদায় যে আপ্ত পুরুষদিগের বাক্য

* পূর্ব্বে অল্প বয়স্কা বালিকার গর্ভাধানবস্থায় যে কুফল লিখিত সুশ্রুত মতে হইয়াছে, তাহার সহিত সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার ৺দয়াল চন্দ্র সোমের এই বিবরণ বর্ণে বর্ণে মিলিয়া গিয়াছে। ঋষি বাক্য যে কি অভ্রান্ত এবং সত্য ইহাতে তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। লেখক।

সাহায্যে আত্মপক্ষ সমর্থন করিতেছে. তাঁহারা যদি এ সময়ে জীবিত থাকিতেন, তাহা হইলে তাহারা স্বয়ং এ বিষয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করিতেন। মহারাজের এই মতের আমি সম্পূর্ণ সমর্থন করি।"

"কৃত্রিম উত্তেজনার দ্বারা এ দেশের স্ত্রী বালিকাদিগের পুষ্পদর্শন কাল যে অপেক্ষাকৃত শীঘ্র উপস্থিত হয় বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে। ময়মনসিংহের সিভিল সার্জ্জন মেজর জেনারেল ডাক্তার বসু ইণ্ডিয়ান মিরর নামক সংবাদ পত্রে যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে উল্লিখিত হইয়াছে যে,স্বাভাবিক ব্যাবিনা সাহায্যে পুষ্পদর্শন বঙ্গদেশে নিতান্ত দুর্লভ। অনারেবল স্যার এনগুস্কাবল এক দিকে অনেক পণ্ডিত শাস্ত্রকার এবং ভাষ্যকারদিগের মতানুসারে স্ত্রীলোকের বয়ঃপ্রাপ্তির প্রথম চিহ্ন (ঋতু) প্রকাশ পাইবার সময়কে গর্ভাধানের কাল বলিয়া নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। অপরদিকে অনেক কৃতবিদ্য ব্যক্তি যাঁহারা বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে বিদ্যালোচনা করিয়া থাকেন এবং আধুনিক ও প্রাচীন ইতিহাসের ঘটনার উপর নির্ভর করিয়া শাস্ত্রীয় সমস্যার সমাধান করেন, তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণের লিখিত পাঠ এবং সেই গুলির উদ্দেশ্য এই যে, ঋতুর প্রথম বিকাশেই গর্ভাধান যে কেবল অনাবশ্যক তাহা নহে. পরন্তু ধর্ম্মনিষ্ঠ এবং কর্ত্তব্য জ্ঞানসম্পন্ন স্বামীর পক্ষে যতদিন নিজের বয়স পঁচিশ বৎসর এবং স্ত্রীর বয়স ষোড়শ বৎসর পূর্ণ না হয়—ততদিন অপেক্ষা করা উচিত। ডেকান কলেজের অধ্যাপক ডাক্তার আর, জি, ভাণ্ডারকর, বঙ্গের সিভিল সার্ব্বিশ বিভাগের মিষ্টার আর, সি, দত্ত অনারেবল জষ্টিস কে, টি তেলাং এবং অন্যান্য জগৎ প্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ ব্যক্তিগতভাবে নিজের যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। বঙ্গের ছোট লাট কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া শিক্ষাবিভাগের ডাইরেক্টর জেনারেল সুপণ্ডিত স্যার এলফ্রেড ক্রফট কলিকাতার প্রধান পণ্ডিতদিগের সহিত পরামর্শ ও বাদানুবাদ করিয়া সেই একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। অনারেবল রাও বাহাদুর কৃষ্ণজী লক্ষ্মণ নলকার।"

"এই দেশের লোকের মধ্যে যে এইরূপ অস্বাভাবিক ইচ্ছার অস্তিত্ব দেখা যায়, তাহা সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা এবং ভারতের অধঃপতিত সময়ের হিন্দু ও মুসলমান কবিদিগের লিখিত কবিতাপাঠের ফল। ভারতের বিগত সময়ে যে অরাজকতা এবং শাসন বিভ্রাট ঘটিয়াছিল, যখন শাসন বিহীন ইন্দ্রিয় পরায়ণতা প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, সেই সময়ে এই সকল কবিতার সৃষ্টি হয়। এক হিন্দি ভাষাতেই অবৈধ প্রণয় সম্বন্ধে নায়ক ভেদ নামে প্রসিদ্ধ অন্যূন এক শত গ্রন্থ আছে এবং ঐ সকল গ্রন্থে অল্প বয়স্কা বালিকার সহিত সম্মিলন সম্বন্ধে ঘৃণিত বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। মনুষ্যত্বের গ্লানি জনক এই প্রথা যত শীঘ্র তিরোহিত হয় ততই দেশের মঙ্গল। অনারেবল রাজা অফ ভিঙ্কা।"

এই সম্বন্ধে সুপ্রসিদ্ধ এবং পদস্থ কয়েক জনের বক্তৃতা লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। এবং

তাহাতে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। কৌতূহলী পাঠক সহবাস সম্মতির বয়স সম্বন্ধে বক্তৃতা নামক পুস্তিকা পাঠে সমস্ত অবগত হইতে পারিবেন।

ব্রহ্মচর্য্য এবং বাল্য বিবাহ সম্বন্ধে শাস্ত্রের মত কি তাহা বলা হইয়াছে। এক্ষণে এই বর্ত্তমান বাঙ্গালীর শোচনীয় স্বাস্থ্যের উন্নতি সম্বন্ধে আমাদের কর্ত্তব্য কি তাহা আলোচনা করা যাইতেছে।

শাস্ত্রে ব্রাহ্মণের অষ্টম বর্ষ, ক্ষত্রিয়ের একাদশ বর্ষে, এবং বৈশ্যর দ্বাদশ বৎসর বয়সে উপনয়নের বিধি আছে*। উপনয়নের পর ছত্রিশ বৎসর, আঠার বৎসর, নয় বৎসর বা যত দিনে অধ্যয়ন শেষ না হয়—ততদিন ব্রহ্মাচর্য্যাশ্রম পালন করিবার উপদেশ আছে। সাধারণতঃ প্রায় চব্বিশ হইতে ত্রিশ বৎসরের মধ্যে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম শেষ হয় বলিয়া মনু ঐরূপ বয়সে বিবাহের উপদেশ দিয়া গিয়াছেন।

বর্ত্তমান সময়ে কোন ছাত্র ষোল বৎসরে মাতৃকুলেশন পাস করিয়া বি, এ, বা এম, এ পাশ দিলে তাহার বয়স ২০৷২২ বৎসর হয়। তাহার পর আইন, ডাক্তারী, ইঞ্জিনিয়ারী বা যাহা হউক পড়িতে ৪৷৫ বৎসর লাগে। সুতরাং শিক্ষা শেষ করিতে এখন ২৫৷২৬ বৎসর বয়স হইয়া পড়ে।

এখনও শিক্ষার বয়স সেই একই আছে, নাই কেবল ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম। স্বল্প সংখ্যক ছাত্রই এক্ষণে গুরু গৃহে থাকিয়া অধ্যয়ন করে। সকলের গুরুগৃহে অধ্যয়নের ব্যবস্থা একরূপ দেশ হইতে চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহা নাই থাকুক, তথাপি নিজের পুত্র কন্যার এবং দেশের হিতের জন্য যদি পাঠ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত বিবাহ না দেওয়া হয়, তাহা হইলেইত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। অথবা ঘটনা ক্রমে বিবাহ দিতে হইলেও অধ্যয়ন শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত কন্যাকে পিতৃ গৃহে রাখাই কর্ত্তব্য। এইরূপ নিয়ম করিলে গর্ভাধানের বয়স পুরুষের পঁচিশ এবং স্ত্রীর ষোল হইয়া পড়ে। যাঁহারা দেশের প্রকৃত হিতকামী তাঁহারা এ বিষয়ে এইরূপ সুপথ অবলম্বন করুন ইহাই আমাদিগের বক্তব্য।

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম যে পুর্ব্বে কিরূপ মঙ্গলজনক ছিল তাহা পুর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এখন দেশে ঠিক সেরূপ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের ব্যবস্থা না থাকিলেও ছাত্রগণ যদি অধ্যয়ন শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য পালন করেন, তাহা হইলে নিজের পুত্র-কন্যার এবং সমাজের শ্রেয়োলাভ হইবে।

ব্রহ্মচর্য্যভ্রষ্ট বাঙ্গালী জাতি অস্থি চর্ম্মসার বল-বীর্য্য-মেধাহীন কণ্ঠাগত-প্রাণ হইয়া পড়িয়াছে। দেশের ভবিষ্যৎ আশা ভরসারস্থল হে বঙ্গীয় ছাত্রবৃন্দ, এই মরণোন্মুখ বাঙ্গালী জাতিকে পুনঃ সঞ্জীবিত করিবার ভার তোমাদেরই উপর। যদি এই কঠিন কর্ত্তব্য পালন করিতে চাও—ছাত্র জীবনে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন কর। যদি বিদ্যাবুদ্ধি-যশঃ সম্মানের অধিকারী হইয়া সুখে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে চাও—ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন কর, যদি স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকে সুস্থ ও সুখী দেখিতে চাও—ছাত্র জীবনে ব্রহ্মচর্য্য পালন কর।

শ্রী—

* ব্রাহ্মণের পাঁচ হইতে ষোল বৎসর, ক্ষত্রিয়ের একাদশ হইতে বাইশ বৎসর, এবং বৈশ্যের দ্বাদশ হইতে চব্বিশ বৎসর উপনয়নের কাল—মনু।

বিসুচিকা ও কলেরা।

আয়ুর্ব্বেদোক্ত বিসূচিকা রোগ কলেরা কিনা এই বিষয় লইয়া বিভিন্ন চিকিৎসক সম্প্রদায়ের মধ্যে বহুদিন হইতে বাদানুবাদ চলিয়া আসিতেছে। কেহ কেহ বলেন, বিসূচিকাই কলেরা; আবার কেহ কেহ বলেন যে, কলেরা—বিসূচিকা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক ব্যাধি। অধিকাংশ এলোপ্যাথ এবং হোমিওপ্যাথ শেষোক্ত মতের পক্ষপাতী। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা এ সম্বন্ধে সত্যোদ্ঘাটন করিতে প্রয়াস পাইব।

যাঁহারা বিসূচিকাকে কলেরা বলিতে আপত্তি করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের প্রথম আপত্তি এই যে, বিসূচিকা—অজীর্ণ রোগ হইতে উৎপন্ন হয় এবং কলেরা জীবাণু বিশেষের সংক্রমণ বশতঃ উৎপন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু আমাদের মতে এই যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া বিসূচিকা—কলেরা হইতে পৃথক রোগ—একথা বলা চলে না। আমরা তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিব।

প্রথমতঃ দেখা উচিত যে, কলেরা জীবাণু হইতে উৎপন্ন হয় কিনা? এ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ বহু পরীক্ষা করিয়া উহা সত্য বলিয়াই প্রমাণিত করিয়াছেন। কিন্তু আবার ইহাও প্রমাণিত হইয়াছে যে, কেবল কলেরার জীবাণু উদরস্থ হইলেই কলেরা হয় না। অনেকে পরীক্ষার্থ কলেরার জীবাণু খাইয়া দেখিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের কলেরা হয় নাই। অনেক সুস্থ ব্যক্তির মলে কলেরার জীবাণু পাওয়া যায়। সুতরাং কেবল কলেরার জীবাণুকেই কলেরা রোগ উৎপন্ন হইবার কারণ বলা যায় না। কলেরা—জীবাণু ব্যতীত আরও কিছু চাই—যাহাতে রোগ উৎপন্ন হইতে পারে। ন্যায়শাস্ত্রে কারণ তিন প্রকার বলিয়া কথিত হইয়াছে। প্রথমতঃ সমবায়ি কারণ—যেমন সূত্র-বস্ত্রের সমবায়ি কারণ। দ্বিতীয়তঃ অসমবায়ি কারণ; যেমন সূত্র সমূহের একত্র যোজনে বস্ত্রের অসমবায়ি কারণ। তৃতীয়তঃ নিমিত্তকারণ; যেমন বায়দণ্ড (মাকু) বস্ত্রের নিমিত্ত কারণ। এখানে কলেরা জীবাণুকে যদি কলেরা রোগের সমবায়ি কারণ বলা যায়, তাহা হইলেও অন্য কারণের আবশ্যক। আর দুইটি কারণ কি? জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া জীবাণুর শরীরে প্রবেশ অসমবায়ি কারণ এবং অজীর্ণকে যদি নিমিত্তকারণ বলা যায়, তাহা হইলে কলেরা-জীবাণুও কলেরার কারণ এবং অজীর্ণও কলেরার কারণ বলা যাইতে পারে। সুতরাং প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয়বিধ শাস্ত্রের নির্দ্দেশই যথার্থ।

দ্বিতীয়তঃ—অধুনা যে সকল ব্যাধি জীবাণুজাত বলিয়া সিদ্ধান্ত হইয়াছে (যেমন যক্ষ্মা প্রভৃতি) আয়ুর্ব্বেদকারগণ সে সকল ব্যাধিকে জীবাণুজাত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন কিনা? ইহার উত্তরে বলিতে হইবে—করেন নাই। (ইহাতে কেহ যেন মনে না করেন যে জীবাণু তথ্যকে (Germ-Theory) আমরা সত্য বা মিথ্যা বলিয়া ধরিয়া লইতেছি। কেবল একমাত্র ক্রিমি-নিদানে বলা হইয়াছে যে, ছয় প্রকার ক্রিমি কুষ্ঠ রোগ

উৎপন্ন করে। এতদ্দারা বুঝা যায় যে, চক্ষুর অদৃশ্য রোগোৎপাদক জীবগুলি তাঁহাদের জ্ঞান দৃষ্টির সীমার বহির্ভূত ছিল না। তাহাই যদি হইল, তবে অন্যান্য জীবাণুজাত রোগের জীবাণুর বিষয় তাঁহারা উল্লেখ করেন নাই কেন? ইহার উত্তরে অবশ্যই বলিতে হইবে যে, জীবাণু-তথ্য মিথ্যা—পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ ভ্রমাত্মক পরীক্ষায় সম্পূর্ণ মিথ্যাকে সত্য বলিয়া মনে করিতেছেন, নচেৎ শাস্ত্রকারগণ অতীন্দ্রিয় জ্ঞান সম্পন্ন বলিয়া জীবাণু-তথ্য অবগত থাকিলেও সে সময়ে আমাদের দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সৃষ্টি না হওয়ায় উহা সাধারণের পক্ষে কোনরূপ কার্য্যকরী হইবে বলিয়া উল্লেখ করেন নাই।

কিন্তু এই পর্য্যন্ত বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে না। জীবাণুর উল্লেখ না থাকিলেও বহু রোগের সংক্রামকতার বিষয় শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে যথা—

প্রসঙ্গাৎ গাত্রসংস্পর্শাৎ নিঃশ্বাসাৎ সহ যোজনাৎ।
এক শয্যাসনাচ্চৈব বস্ত্র মাল্যানুলেপনাৎ॥
জ্বর কুষ্ঠশ্চ শোষশ্চ নেত্রাভিষ্যন্দ এবচ।
ঔপসর্গিক রোগাংশ্চ সংক্রামন্তি নরান্নরাং॥

অনুবাদ—একত্র অবস্থান, গাত্র সংস্পর্শ, নিঃশ্বাস, একত্র ভোজন, একশয্যা ও আসন ব্যবহার, একবস্ত্র, মাল্য ও অনুলেপন (চন্দনাদি গায়ে মাখিবার দ্রব্য) ব্যবহার বশতঃ জ্বর, কুষ্ঠ, যক্ষ্মা, নেত্রাভিষ্যন্দ (চোখ উঠা) এবং ঔপসর্গিক রোগ সকল একজনের শরীর হইতে অন্যের শরীরে সংক্রমণ করে। কতকগুলি রোগের নাম বলা হইয়াছে এবং এই সকল রোগ যে একের শরীর হইতে অন্যের শরীরে প্রবেশ করে তাহা বলা হইয়াছে। তা'রপর বলা হইয়াছে ঔপসর্গিক রোগ সকল। এক্ষণে দেখা যাউক, ঔপসর্গিক রোগ কাহাদের বলে। শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে—প্রথমে উৎপন্ন যে রোগ পশ্চাৎ কালজাত ব্যাধির সৃষ্টি করে তাহাকে ঔপসর্গিক রোগ বলে। আর সেই রোগ হেতুক পশ্চাৎ কালজাত ব্যাধিকে উপসর্গ বলে।

বিসূচিকা রোগে অতিসার, মূর্চ্ছা প্রভৃতি রোগ উপদ্রব রূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে। সুতরাং বিসূচিকা রোগও ঔপসর্গিক রোগের অন্তর্ভুক্ত, সুতরাং সংক্রামক।

এতদ্দারা প্রমাণিত হইতেছে যে, অধুনা পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্রের মতে যে সকল ব্যাধি জীবাণু কর্তৃক উৎপন্ন হয় বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে, আয়ুর্ব্বেদকারগণ তাহা অবগত থাকুন আর নাই থাকুন, রোগ প্রসঙ্গে সেরূপ কোন কথার উল্লেখ নাই, সুতরাং যক্ষ্মারোগের জীবাণুর উল্লেখ না থাকিলেও কোন সুধী ব্যক্তি যক্ষ্মারোগকে থাইসিস্ হইতে ভিন্ন রোগ নির্দ্দেশ করিবেন না, সেইরূপ বিসূচিকা রোগের জীবাণুর উল্লেখ নাই বলিয়াই উহাকে কলেরা হইতে পৃথক রোগ বলা চলে না।

দ্বিতীয় আপত্তি এই যে, বিসূচিকা কলেরার মত সদ্যোমারাত্মক নহে। কিন্তু এই আপত্তি নিতান্ত অযৌক্তিক। কারণ আয়ুর্ব্বেদে স্পষ্টতঃ এরূপ উল্লেখ না থাকিলেও বিসূচিকা যে আরও মারাত্মক তাহা বলা হইয়াছে। প্রমাণ দেখুন।

বিসূচিকা রোগের চিকিৎসার প্রারম্ভেই বলা হইয়াছে:—

"সাধ্যাসু পার্ষ্ণোর্দহনং প্রশস্তমগ্নি প্রতাপো বমনঞ্চ তীক্ষ্ণং।"

অর্থাৎ—সাধ্য রোগে পার্ষ্ণি (গোড়ালি) উত্তপ্ত লৌহ শলাকা দ্বারা পুড়াইয়া অগ্নিক্রিয়া (স্বেদ) এবং তীক্ষ্ণ বমন প্রয়োজ্য।

প্রথমে বলা হইল সাধ্য রোগের এইরূপ চিকিৎসা করিবে। এতদ্বারা এই রোগের বাহুল্যভাবে অসাধ্যত্ব নির্দ্দেশ করা হইল। তার পর রোগের চিকিৎসার প্রথমেই পার্ষ্ণি দাহের ব্যবস্থা। আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ মাত্রেই অবগত আছেন যে, রোগের মারাত্মক অবস্থায় এইরূপ দাহক্রিয়া প্রযুক্ত হইয়া থাকে। সাধারণ পাঠকবর্গের অবগতির জন্য আমরা দুইটী অনুরূপ প্রয়োগ দেখাইতেছি। সন্নিপাত জ্বরের চিকিৎসা প্রসঙ্গে কথিত হইয়াছে:—

"পাদয়োর্হস্তয়োর্মূলে কণ্ঠকূপ চ শঙ্খয়োঃ
স্বেদেষু চ কুলত্থানাং কণানং চূর্ণ ঘর্ষণম॥"

অর্থাৎ সন্নিপাত জ্বরে (রোগী অচৈতন্য হইলে) হস্ত ও পদদ্বয়ের কণ্ঠকূপে এবং উভয় শঙ্খদেশে উত্তপ্ত লৌহ শলাকা দ্বারা দগ্ধ করিবে। অত্যন্ত ঘর্ম্ম নির্গম হইতে থাকিলে কুলথি কলায় বা পিপুলের চূর্ণ শরীরে মর্দ্দন করিবে।

সংন্যাস রোগের চিকিৎসায় কথিত হইয়াছে:—

"সূচীভিস্তোদনং শস্তং দাহপীড়ানখান্তরে।
লুঞ্চনং কেশ রোমাঞ্চ দন্তৈর্দংশন মেবচ।
আত্মগুপ্তাবঘর্ষশ্চ হিতাস্তস্যাবরোধনে।"

অর্থাৎ সংন্যাস রোগে নখের অভ্যন্তরে সূচী বিদ্ধ করা, উত্তপ্ত লৌহ শলাকা দ্বারা দগ্ধ করা, কেশ রোমাদি আকর্ষণ করা, দন্ত দ্বারা দংশন করা এবং আলকুশী ফল গাত্রে ঘর্ষণ করা এই সকল ক্রিয়া দ্বারা রোগীর সংজ্ঞা লাভ হয়।

উপরোক্ত দাহ ক্রিয়া যে রোগের মারাত্মক অবস্থায় প্রযুক্ত হইয়া থাকে, তাহা বিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন। সুতরাং কলেরা যে প্রথম হইতে মারাত্মক আকার ধারণ করে এবং অসাধ্য স্থলে সদ্যোমারাত্মক হইয়া থাকে তাহা বুঝা যাইতেছে। আর একটী প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া বিষয়টী নিঃসংশয়রূপে প্রতিপন্ন করা যাইতেছে।

বিলম্বিকা—বিসূচিকা রোগের অবস্থা ভেদ মাত্র; সে কথা পরে বলিব। বিলম্বিকা রোগ সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে:—

দুষ্টন্তু ভুক্তং কফমারুতাভ্যাং প্রবর্ত্ততেনোর্দ্ধ-মধশ্চযস্ত।
বিলম্বিকাং তং ভৃশদুশ্চিকিৎস্যামাচক্ষতে শাস্ত্রবিদঃ পুরাণাঃ॥"

অর্থাৎ—যে রোগে বায়ু ও কফ কর্ত্তৃক দূষিত ভুক্ত দ্রব্য উর্দ্ধ বা অধোদিক দিয়া নির্গত হইতে পারে না, তাহাকে বিলম্বিকা রোগ বলে। পুরাতন শাস্ত্রবিদগণ বলেন এই রোগীকে পরিত্যাগ করা উচিত অর্থাৎ রোগীর চিকিৎসা করা উচিত নহে।

পরিত্যাগ করা উচিত কেন? রোগ ভাল হইবে না বলিয়া। যে রোগ প্রথম হইতেই অসাধ্য এবং বিসূচিকার ন্যায় দারুণ উপসর্গযুক্ত, সে রোগ যে আশু মারাত্মক হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি। তাই শাস্ত্রকার বলিয়াছেন যে এ রোগ নহে সাক্ষাৎ যম ইহার চিকিৎসা করায় ফল নেই।

ইহার ঠিক অনুরূপ কথা পাশ্চাত্য চিকিৎসাকোবিদ ডাক্তার অসলরের (osler) চিকিৎসা গ্রন্থে (Practice of Medicine) দেখিতে পাওয়া যায়।

এতদ্দ্বারা স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে যে, যাঁহারা বিসূচিকা কলেরার ন্যায় সদ্যো-মারাত্মক নয় বলিয়া উভয় রোগকে পৃথক বলিয়া নির্দ্দেশ করেন তাঁহাদের যুক্তি সমীচীন নহে। কেননা বিসূচিকা আশুমারাত্মক। এইস্থলে একটী অবান্তর কথা বলিতে বাধ্য হইতেছি, বিলম্বিকা রোগীকে পরিত্যাগ করার কথা বলা হইয়াছে বলিয়া যাঁহারা আয়ুর্ব্বেদ পাঠ করেন নাই, তাঁহারা শাস্ত্রকারদিগকে দোষ দিতে পারেন। যত কঠিন রোগই হউক রোগীর চিকিৎসা করিবে না এ কিরূপ উপদেশ? কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উক্ত বচনের উদ্দেশ্য রোগের অসাধ্যত্ব এবং আশু মারকত্ব নির্দ্দেশ করা, রোগীকে পরিত্যাগ করা নয়। কারণ শাস্ত্রকারেরাই উপদেশ দিয়াছেন :—

যাবৎ কণ্ঠগতাঃ প্রাণা যাবন্নাস্তি নিরিন্দ্রিয়ঃ।
তাবচ্চিকিৎসা কর্ত্তব্যা কালস্য কুটিলা গতিঃ।

অর্থাৎ—যতক্ষণ ইন্দ্রিয় শক্তি একেবারে লোপ না পায়, যতক্ষণ প্রাণ কণ্ঠাগত থাকে, ততক্ষণ চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। কারণ কালের গতি অতি কুটিল অর্থাৎ জানি কি যদি রোগী ভালই হয়! শুধু ইহাই পর্য্যাপ্ত নহে।

চরক সংহিতায় এই রোগ আশু-প্রাণনাশকারী বলিয়া পরম অসাধ্য বলা হইয়াছে।

বায়ু এবং জল দূষিত হইয়া এই রোগের সংক্রমণ ঘটে, একথা পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণও স্বীকার করিয়া থাকেন এবং সংক্রামক রোগের প্রাবল্য নিবারণের জন্য বায়ুশোধনের কারণ ধুনা প্রভৃতি পুড়াইতে ও জল শোধনের জন্য পটাসপারামেঙ্গন্যাট ব্যবহার করিতে পরামর্শ দেন। রোগ বীজ মিশ্রিত হইয়াই হউক বা অন্য যে কোন কারণেই হউক বায়ু ও জল দূষিত হইলে পীড়াদায়ক হইয়া থাকে।

আয়ুর্ব্বেদ বলেন,—কালের অযোগ, অতিযোগ এবং মিথ্যাযোগ বশতঃ ব্যাধির প্রাবল্য ঘটে। তদ্ব্যতীত কাল-বিশেষে সংক্রামক রোগ বিশেষেরও প্রাবল্য ঘটে। এখনকার দিনে শীতকালে প্লেগ, বসন্তকালে বসন্ত রোগ এবং বসন্ত বা গ্রীষ্মে বিসূচিকা বা কলেরা রোগের প্রাবল্যের উল্লেখ করিয়া আমরা একথা প্রমাণ করিতে পারি।

দেশ দূষিত হইলে সংক্রামক রোগের প্রাবল্য ঘটে। সংক্রামক রোগ হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য সেই দেশ পরিত্যাগ করিবার উপদেশ প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয় চিকিৎসা শাস্ত্রেই আছে। আয়ুর্ব্বেদে জনপদোদ্ধ্বংস কালে কর্ত্তব্য সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে :—

হিতং জনপদানাঞ্চ শিবানাং উপসেবনম্।

অর্থাৎ নির্দ্দোষ জনপদে বাস করা হিতকর ও পর্য্যাপ্ত যাহা লিখিত হইল—ইহাতে বুঝা যায় যে, বিসূচিকাদি সংক্রামক রোগ সময়ে প্রবল হইয়া বহু লোকের প্রাণসংহার করিয়া থাকে।

এই যে দেশ-কালাদির উপলক্ষে রোগের প্রাবল্য, ইহার সহিত অজীর্ণের সম্বন্ধে কি? এসব ক্ষেত্রেও কি অজীর্ণ বিসূচিকা রোগের কারণ স্বরূপ হইয়া থাকে।

অধিকাংশ রোগের সহিতই অজীর্ণের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে—"রোগাঃ সর্ব্বেঽপিমন্দেঽগ্নৌ" অর্থাৎ প্রায় সমস্ত রোগই অগ্নিমান্দ্য হইতে জন্মিয়া থাকে। সুতরাং

প্রধানতঃ পরিপাক বস্তু আশ্রয় করিয়া যে রোগ উৎপন্ন হয়, তাহা যে অজীর্ণমূলক, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে যে, কলেরা-জীবাণু উদরস্থ হইলেই রোগ উৎপন্ন হয় না, আরও বিস্তর সাহায্য আবশ্যক, সে জিনিসটী আর কিছুই নহে—অজীর্ণ। কলেরার সময় একস্থানের বহুলোক মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং বহুলোক বাঁচিয়া যায়। যাহাদের মৃত্যু হয়, তাহাদের অজীর্ণ ছিল এবং যাহারা বাঁচিয়া যায় তাহাদের অজীর্ণ ছিল না—এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নহে। কলেরার প্রাবল্যের সময় নিমন্ত্রণ খাওয়ার পর দিন কলেরা রোগে অনেক লোককে আক্রান্ত হইতে দেখা গিয়াছে; আর কলেরা হইলেও কলেরার পরে যে পরিপাক শক্তি কিরূপ ক্ষীণ হইয়া পড়ে, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

বিখ্যাত হোমিওপ্যাথ শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর কালী তাঁহার লিখিত "ওলাউঠা সংহিতা" নামক গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে কলেরার যে কয়টী প্রধান উপসর্গ যথা, প্রস্রাব বন্ধ হওয়া কোমা (coma—অজ্ঞান হওয়া) এবং চাউল ধোয়া জলের ন্যায় ভেদ হওয়া এ সকল বিষয়ের উল্লেখ যখন আয়ুর্ব্বেদে নাই, তখন বিসূচিকাকে কলেরা বলা যাইতে পারে না। দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, লেখক নিতান্ত ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। ভাব প্রকাশের যে বচনটী আছে তাহার অর্থ এইরূপ;—"নিদ্রানাশ, অস্থিরতা, কম্প, প্রস্রাব বন্ধ হওয়া এবং অজ্ঞান হওয়া এই পাঁচটী বিসূচিকা রোগের ঘোর উপদ্রব।" সুতরাং আয়ুর্ব্বেদের বিসূচিকা ও এখনকার কলেরা কেন এ রোগ হইবে না?

আয়ুর্ব্বেদকারগণ বিসূচিকার অসাধ্য লক্ষণে বলিয়াছেন—যঃ শ্যাবধ দন্তোষ্ঠ নখোহল্প সংজ্ঞো" অর্থাৎ রোগীর দন্ত ওষ্ঠ ও নখ শ্যামবর্ণ সংজ্ঞা অল্প প্রভৃতি উপসর্গ ঘটিলে রোগী বাঁচে না। পূর্ব্বে যে মূর্চ্ছার কথা বলা হইয়াছে তাহাকে কোমা (coma) বলিতে আপত্তি থাকিলেও এই অল্প সংজ্ঞ অর্থাৎ অল্প জ্ঞান থাকা যে কোমা আরম্ভ হওয়ায় পরিচায়ক তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তারপর শাস্ত্রে বলা হইয়াছে যে বিসূচিকা রোগে অতিসার হয়। বাতজ অতিসারের লক্ষণ এইরূপ:—

"অরুণং ফেনিলং রুক্ষমল্পমল্পং মুহুর্মুহু।
শকৃদামং সরুকশব্দং মারুতেনাতিসার্য্যতে।"

অর্থাৎ—বাতজ অতিসারে সফেন রুক্ষ ও অরুণবর্ণ মল বায়ুর সহিত অল্প অল্প করিয়া নির্গত হয়, শূলবৎ বেদনা হয় প্রস্রাব হয় না, পেট ডাকে, মলদ্বার নির্গত হইয়া পড়ে এবং কটি, উরু ও জঙ্ঘা অবসন্ন হয়।

সুতরাং এতদ্বারা বুঝা যায় বিসূচিকায় প্রস্রাব বন্ধ হইতে পারে। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, এখানে অন্যান্য অতিসারের লক্ষণ না ধরিয়া বাতজ অতিসারের লক্ষণ ধরা হইল কেন? কিন্তু বিসূচিকা রোগে বায়ুরই প্রাধান্য থাকে বলিয়া বাতজ অতিসারের লক্ষণ ধরা অসঙ্গত হয় নাই। বিসূচিকায় যে বায়ুরই প্রাধান্য থাকে, তাহা নিম্নলিখিত বিসূচিকার সাধারণ লক্ষণ দ্বারা জানা যায়।

সূচীভিরিব গাত্রাণি তুদন্ সন্তিষ্ঠতেহনিলঃ।
যস্যাজীর্ণেন সা বৈদ্যৈ বিসূচিতি নিগদ্যতে॥

অর্থাৎ—অজীর্ণ বশতঃ বায়ু অত্যন্ত কুপিত হইয়া শরীরে সূচিবেধবৎ যন্ত্রণা উৎপন্ন করে বলিয়া বৈদ্যগণ ইহাকে বিসূচিকা রোগ বলিয়া থাকেন।

তারপর বিসূচিকা রোগীর মলের কথা। বিসূচিকা রোগ প্রসঙ্গে মলের কথা কিছুই বলা হয় নাই, অতিসারের উপর বরাত দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং অতিসারের মলের উপর নির্ভর করিয়াই আমাদের বিসূচিকার মলের বিষয় স্থির করিতে হইবে।

কলেরায় শরীরের জলীয়াংশ নির্গত হইয়া যায়, আয়ুর্ব্বেদের অতিসারের শেষ পরিণাম বিসূচিকাতেও তাহাই হইয়া থাকে। প্রমাণ যথা:—

সংশম্যাপাং ধাতুরগ্নিং প্রবৃদ্ধঃ
শকৃন্মিশ্রোবায়ুনাধঃপ্রসৃষ্টঃ।
সরত্যতীবাতিসারং তমাহুর্ব্যাধিং ঘোরং ষড়্‌বিধং তং বদন্তি॥

অর্থাৎ—শরীরস্থ জলীয় ধাতু সমূহ অর্থাৎ কফ, পিত্ত, রস, রক্ত, জল, মূত্র, স্বেদ ও মেদ প্রভৃতি বর্দ্ধিত হইয়া কোষ্ঠাশ্রিত অগ্নিকে নির্ব্বাপিত করিয়া বায়ু কর্ত্তৃক অধোদেশে প্রেরিত হইয়া অতিরিক্ত পরিমাণে নিঃসৃত হইলে অতিসার রোগ জন্মিয়া থাকে। এই ঘোর ব্যাধি ছয় প্রকার।

এতদ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, এই রোগে অর্থাৎ বিসূচিকায় শরীরের জলীয় পদার্থই বহুলরূপে নির্গত হইয়া থাকে। সুতরাং রোগীর মল প্রথমে মল সংযুক্ত থাকিলেও শেষে যে জলবৎ হইবে সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি।

তারপর প্রতিপক্ষগণ চাল ধোয়া জলের ন্যায় মলভেদ হওয়ার উল্লেখ নাই, এইরূপ বলিয়াছেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে শরীরের জল নির্গত—জলের ন্যায় মল ভেদ হওয়া সহজে স্থির করা যাইতে পারে। কিন্তু উহা শারীরিক অন্যান্য পদার্থ সংযুক্ত থাকায় ঠিক জলের ন্যায় বর্ণযুক্ত হয় না—একটু আবিল হয়। অতিসারে যে বহুপ্রকার মলের বর্ণের কথা উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে আবিল কথাটীও আছে। ইহা জল বা দুগ্ধের ন্যায় ভেদ হয় বলিয়াও লিখিত হইয়াছে। সুতরাং বিসূচিকার চালধোয়া জলের ন্যায় ভেদ হয় এরূপ স্পষ্ট উল্লেখ না থাকিলেও বুদ্ধিমান চিকিৎসকের বুঝিবার পক্ষে কোন বাধা হয় না।

কেহ বলিতে পারেন যে, এইরূপ সমস্ত প্রয়োজনীয় বিষয় আয়ুর্ব্বেদে স্পষ্টরূপে বলা হয় নাই কেন; অবশ্য পাশ্চাত্য চিকিৎসকদিগের রোগ বর্ণনার প্রণালী দেখিয়াই লোকে এইরূপ প্রশ্ন করিয়া থাকে। পাশ্চাত্য চিকিৎসকদিগের রোগবর্ণন প্রণালী হইতে আয়ুর্ব্বেদকারগণের বর্ণনার চেষ্টা প্রণালী সম্পূর্ণ বিভিন্ন। যে বিষয়টা ভাল করিয়া বলা পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ বিশেষ আবশ্যক বলিয়া বিবেচনা করেন—এমন অনেক বিষয় আয়ুর্ব্বেদকারগণ সামান্যভাবে বলিয়াছেন। কোথাও চিকিৎসক অনায়াসে বুঝিয়া লইতে পারিবে বলিয়া আদৌ বলেন নাই। বাহুল্য ভয়ে আমরা এ সম্বন্ধে সে সকল কথার আলোচনা করিলাম না। অনুসন্ধিৎসু পাঠক একই রোগের বর্ণনা উভয় চিকিৎসা শাস্ত্র হইতে পাঠ করিলে ইহা অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন।

প্রতিপক্ষগণ যে সকল যুক্তি অবলম্বন করিয়া বিসূচিকা রোগকে কলেরা বলিতে

চাহেন না, আমরা তাহা দেখাইলাম এবং ঐ সকল যুক্তির বিরুদ্ধে আমাদের যাহা বক্তব্য তাহা বলিলাম। এক্ষণে কলেরা আর বিসূচিকা রোগ যে এক তাহা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিব।

আয়ুর্ব্বেদে প্রায় সকল রোগেরই পূর্ব্বরূপ অর্থাৎ কোন রোগ প্রকাশ পাইবার পূর্ব্বে যে সকল লক্ষণ প্রকাশ পায় স্পষ্ট বলিয়াছেন, পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্রেও তাহাই বলা হইয়াছে। কিন্তু বিসূচিকা বা কলেরার উভয় শাস্ত্রেই কোন পূর্ব্বরূপ নাই।

পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্র বলেন,—"কলেরার প্রথম অবস্থায় যে অতিসার হয় তাহাতে পূর্ব্বে কোন লক্ষণ প্রকাশ না পাইয়া সহসা প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে।"

পূর্ব্বে মূর্চ্ছা, অতিসার, বমি প্রভৃতি যে সকল উপসর্গের কথা লিখিত হইয়াছে, কলেরায় এ সকল লক্ষণ ঘটিয়া থাকে, নিম্নে তাহার প্রমাণ উদ্ধৃত করা যাইতেছে। তদ্ব্যতীত বিসূচিকার অসাধ্য লক্ষণে যে সকল উপসর্গের কথা লিখিত আছে, সেগুলি কলেরা রোগেও ঘটিয়া থাকে। লক্ষণগুলি এই :—

যঃ শ্যাবদন্তৌষ্ঠ নখোঽল্পসংজ্ঞো
বম্যার্দ্দিতোঽভ্যন্তর যাত নেত্রঃ।
ক্ষামস্বরঃ সর্ব্ব-বিমুক্ত সন্ধির্যায়ান্নরঃ সাঽ
পুনরগমায়।

অর্থাৎ :—বিসূচিকা রোগে যদি রোগীর দন্ত, ওষ্ঠ ও নখ শ্যাববর্ণ, সংজ্ঞা লুপ্ত প্রায়, অত্যন্ত বমি, নেত্রদ্বয় কোটরগত, স্বর অতিক্ষীণ এবং সন্ধি শিথিল হয়, তাহা হইলে রোগীর মৃত্যু হইয়া থাকে।

এক্ষণে কলেরার লক্ষণ দেখুন। পূর্ব্বে যে অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে, ডাক্তারি শাস্ত্রে তাহার পর যাহা লিখিত আছে :—তাহার অনুবাদ :—(ক) "অধিকাংশস্থলে দুই এক দিন উদরে শূলবদ্ বেদনা হইয়া থাকে, তরল মলভেদ হয়, বমি এবং তদানুসঙ্গিক মস্তকের যন্ত্রণা ও মানসিক অবসন্নতাও থাকিতে পারে। জ্বর নাও থাকিতে পারে।

(খ) প্রবল অবস্থায়—অতিসার বৃদ্ধি পাইতে থাকে। কখন বা প্রাথমিক অবস্থা প্রকাশ না পাইয়া প্রবল অতিসার হয় এবং শীঘ্র শীঘ্র প্রচুরতর মলভেদ হইতে থাকে। কোন কোন স্থলে শূলুনি এবং (প্রবাহিকা বা আমাশয়ের ন্যায়) কোঁথানি থাকে। অধিকাংশ স্থলে রোগী অবসন্ন ও নির্জীব হইয়া পড়ে। প্রবল পিপাসা হয়, জিহ্বা শ্বেতবর্ণ হয়, হাতে পায়ে অত্যন্ত খাল ধরে। কয়েক মিনিটের মধ্যে বমি আরম্ভ হয় এবং অবিরত হইতে থাকে। রোগী একেবারে নির্জীব হইয়া পড়ে, গাত্র-চর্ম্ম ছাইয়ের ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট হয়, চক্ষু দুইটী কোটরে ঢুকিয়া যায়, নাক সরু হইয়া যায়, গাল তুবড়িয়া যায়, স্বরভঙ্গ হয়, হাত পা ফ্যাকাশে হইয়া পড়ে, গাত্রচর্ম্ম শুষ্ক কুঞ্চিত এবং চটে চটে ও ঘামযুক্ত হয়।......ক্রমে রোগী অচৈতন্য হইতে থাকে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত প্রায়ই অল্প চৈতন্য থাকে।

পাঠক ইহা দ্বারা বুঝিতে পারিতেছেন যে, অতিসার, বমি, শূল পিপাসা, খালধরা, বিবর্ণতা মস্তকের যন্ত্রণা, মূর্চ্ছা বা সংজ্ঞার অল্পতা, চক্ষুকোটর প্রবিষ্ট হওয়া, স্বরভঙ্গ বা স্বরের ক্ষীণতা, ক্ষোমস্বর এবং হস্তপদাদি ফ্যাকাশে হওয়া শ্যাব দন্ত, ওষ্ঠ, নখ প্রভৃতি লক্ষণ কলেরা এবং বিসূচিকা উভয় রোগেই দেখা যায়।

পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্রে আর এক প্রকার কলেরা আছে, তাহাকে কলেরা-সিক্কা বলে। তাহার লক্ষণ এইরূপ :—

"এই রোগে রোগ প্রকাশ পাইবার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই অতিসার না হইয়াই রোগীর মৃত্যু হয়।"

পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্রের এই কলেরা-সিক্কা আয়ুর্ব্বেদোক্ত অলসক এবং বিলম্বিকা বা দণ্ডালসক রোগ। অলসক রোগের লক্ষণ যথা :—

কুক্ষিরানহ্যতেত্যর্থং প্রতম্যেৎ পরিকূজতি।
নিরুদ্ধো মারুতশ্চৈব কুক্ষাবুপরি ধাবতি ॥
বাতবর্চ্চো নিরোধশ্চ যস্যাতর্থং ভবেদপি।
তস্যালসকমাচষ্টে তৃষ্ণোদ্গারৌ চ যস্যতু ॥

অর্থাৎ পেট অত্যন্ত ফুলিয়া উঠে, রোগী অবসন্ন হইয়া সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়ে (The collapse.), যন্ত্রণায় অব্যক্ত শব্দ করে, রুদ্ধ বায়ু পেটের উপর দিকে উঠিতে থাকে, মল-মূত্র রোধ হয় এবং হিক্কা ও উদ্গার হইয়া থাকে। এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইলে তাহাকে অলসক রোগ বলা যায়। বিলম্বিকা বা দণ্ডালসক রোগ অলসক রোগের ভেদ মাত্র।

এইস্থানে পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্রের সহিত যে একটু মতদ্বৈধ আছে, তাহা দেখাইতেছি। পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ বলেন, যে কলেরা-সিক্কাতে ভেদ হইবার পূর্ব্বেই রোগীর মৃত্যু হয়। ইহাতে বুঝা যায়, রোগী আর কিছুক্ষণ জীবিত থাকিলে ভেদ হইত। কিন্তু আয়ুর্ব্বেদমতে দুষ্ট-ভুক্ত-দ্রব্য আমাশয়ে অলস হইয়া থাকে বলিয়াই ইহার নাম অলসক রোগ। সুতরাং এই রোগে রোগের ধর্ম্ম-বশতঃ ভেদ হয় না।

চরকে কথিত হইয়াছে :—আমদোষ বা অজীর্ণদোষ দুই প্রকার, বিসূচিকা ও অলসক। পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্রের মত ও এইরূপ।

তাঁহারা বলেন, অজীর্ণ রোগ দুই প্রকার এক প্রকার অজীর্ণ রোগে পরিপাক যন্ত্রের আক্ষেপ হয় এবং আর এক প্রকার অজীর্ণ রোগে পরিপাক যন্ত্র নিষ্ক্রিয় হইয়া থাকে।

বিসূচিকা বা কলেরায় প্রথমোক্ত এবং অলসক বা কলেরা-সিক্কায় দ্বিতীয়োক্ত অজীর্ণ দোষ ঘটে এই সকল প্রমাণ সত্ত্বেও যাঁহারা বিসূচিকাকে কলেরা হইতে পৃথক বলিয়া নির্দ্দেশ করেন তাহাদের মত ভ্রমাত্মক।

বিসূচিকা বা কলেরা চিকিৎসা সম্বন্ধেও প্রাচ্য ও প্রতীচ্য চিকিৎসা শাস্ত্রের মত প্রায় একরূপ। আমরা তাহার প্রমাণের অনুবাদ দিতেছি।

"মুখ দিয়া ঔষধ প্রয়োগ না করাই ভাল কারণ তাহাতে পাকস্থলীর আরও উত্তেজনা ঘটিয়া থাকে। আমাদের বাভটকার বলিয়াছেন :—

বিসূচিকা রোগে তীব্র বেদনা হইলেও শূলনাশক (শূলনাশক শব্দে বমন ও অতিসারাদিনাশক ঔষধ বলা হইল ইতি টীকাকার) ঔষধ সেবন করা উচিত নহে; কেননা দোষ কর্ত্তৃক অবসন্ন অগ্নি দোষ, ভুক্ত দ্রব্য এবং ঔষধ পরিপাক করিতে সমর্থ হয় না।

সাধ্য বিসূচিকা রোগে উত্তপ্ত লৌহ

শলাকা দ্বারা পায়ের গোড়ালি পুড়াইয়া দেওয়া অগ্নিতাপ, তীক্ষ্ণ বমন ও ভুক্ত দ্রব্য পক্কাভিমুখ হইলে লঙ্ঘন-স্বেদাদি দোষপাচক ক্রিয়া ও ফলবর্ত্তী দ্বারা বিরেচন হিতকর। এইরূপে বিশুদ্ধ দেহ ব্যক্তির মূর্চ্ছা অতিসার প্রভৃতি সদাই নিবৃত্তি পাইয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন যে আস্থাপন প্রয়োজন হিতকর।”

এতদ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, কলেরা বা বিসূচিকার প্রথমে মুখ দিয়া ঔষধ সেবন উভয়বিধ চিকিৎসা শাস্ত্রেরই অভিপ্রেত নহে।

এস্থলে পাঠকগণের বোধ-সৌকার্য্যার্থ বলিতে হইতেছে যে, বমন, ফলবর্ত্তি প্রভৃতি প্রয়োগের যে উপদেশ আছে, তাহা বিসূচিকা বা অলসক রোগভেদে বিবেচনা পূর্ব্বক প্রয়োগ করিতে হয়। যেমন ফলবর্ত্তি—অলসক রোগে প্রযোজ্য।

শাস্ত্রে বিসূচিকায় যেরূপ অগ্নিতাপ দিবার উপদেশ আছে, কলেরা রোগে পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্রেও সেইরূপ আছে। যথা :—

“উত্তাপের বাহ্য প্রয়োগ করা উচিত এবং উষ্ণ জল পান করাইয়া দেখা যাইতে পারে। উদরে তাপ প্রয়োগ বিশেষ উপকারী।

আয়ুর্ব্বেদে যে অগ্নি তাপ দিতে বলা হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বোদ্ধৃত বচনের অর্থ হইতেই জানা যায়। এ সম্বন্ধে আরও স্পষ্ট একটী বচনের অর্থ দেখুন ;—

“যবের চূর্ণ ও যবক্ষার (সোরার ন্যায় গুণবিশিষ্ট) ঘোলের সহিত বাটিয়া উষ্ণ করিয়া উদরে প্রলেপ দিলে বেদনা নষ্ট হয়। ইহা দ্বারা বহু উষ্ণ বাষ্পপূর্ণ ঘটে ; হাত গরম করিয়া বা অন্য প্রকারে উদরে স্বেদ দিবে।”

পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্রের মতে উষ্ণ জল দ্বারা আমাশয় ধৌত করিবার বিধি আছে।

আয়ুর্ব্বেদে আমাশয় ধৌত করার কথাটা উল্লিখিত না হইলেও নিম্নলিখিতরূপ বমন দ্বারা তাহা সাধিত হইয়া থাকে। যথা,—

“সাধ্য আমদোষে দুষ্ট অলসীভূত আমদোষ প্রথমে লবণমিশ্রিত উষ্ণ জল সেবন করাইয়া নির্গত করিয়া ফেলিবে।”

“আরও দেখুন,—করঞ্জ, ফল, নিমছাল, আপাংবীজ, গুলঞ্চ, বাবুইতুলসী এবং কুড়চি ছালের কাথ প্রস্তুত করিয়া তদ্বারা বমন করাইলে ঘোরতর বিসূচিকা রোগ প্রশমিত হয়।”

পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে যে, আয়ুর্ব্বেদে বিসূচিকা রোগে নিরূহ প্রয়োগের বিধি আছে। পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্রেও অন্ত্র ধৌত করিবার বিধি আছে।

“ঈষদুষ্ণ জল ও সাবান কিম্বা শতকরা দুইভাগ ট্যানিস এসিড দিয়া অন্ত্র ধৌত করিয়া ফেলা উচিত।”

বিসূচিকা রোগ ভাল হইবার মুখে পথ্য প্রয়োগ সম্বন্ধে যে বিশেষ সাবধানতা আবশ্যক—তাহা প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয় চিকিৎসা শাস্ত্রেই বলা হইয়াছে। সুশ্রুত বলিয়াছেন,—বিসূচিকা রোগে যথাযোগ্য বমন, বিরেচন ও লঙ্ঘনের পর ক্ষুধার্ত্ত রোগীকে পাচক ও অগ্নিদীপক ঔষধ-সংস্কৃত-পেয়াদি লঘুপাক পথ্য দিবে।

ডাক্তারি শাস্ত্র বলিয়াছেন,—“রোগ ভাল হইবার মুখে রোগীর আহার সম্বন্ধে বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য এবং প্রবল অতিসার

যাহাতে পুনরায় না হইতে পারে, সে সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক থাকা আবশ্যক।"

আমরা এ পর্য্যন্ত যে রোগের লক্ষণ, উপসর্গ, চিকিৎসা ও পথ্য সম্বন্ধে বলিলাম, তাহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, আয়ুর্ব্বেদোক্ত বিসূচিকা রোগই কলেরা। তবে কি জন্য যে কতকগুলি চিকিৎসক বিসূচিকাকে কলেরা নয় প্রতিপন্ন করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা বলা যায় না।

বিসূচিকা রোগ বহুকাল পূর্ব্ব হইতে ভারতবর্ষে বিদ্যমান আছে—ইহা পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণও স্বীকার করিয়া থাকেন। ডাক্তার অসলার প্রমুখ মনস্বিগণ বলেন,—"কলেরা প্রাচীন কাল হইতে দেশগত-ভাবে ভারতবর্ষে বিদ্যমান আছে। বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই যদি কলেরা রোগ ভারত-বর্ষে বিদ্যমান থাকে, তবে আয়ুর্ব্বেদে তাহার চিকিৎসাদি সম্বন্ধে কিছুই উল্লেখ থাকিবে না, ইহাও কি সম্ভব? যাহা হউক বিসূচিকা ও কলেরা যে একই রোগ—তাহাতে সন্দেহ নাই।

শ্রী—

মহিলাগণের চিকিৎসা-শিক্ষা।

(৪)

(রক্ত প্রদর)

আহারাদির পর পিসীমার পাকা চুল তুলিয়া দিতেছিলাম। তখন শীতকাল,—পিসীমা রোদে পিঠ দিয়া পা ছড়াইয়া বসিয়া আমাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছিলেন—"আমার মাথার যতগুলি চুল—বউমা, তোমার সেইরূপ পরমায়ু হোক"।—

আমি বলিলাম—সেকি—পিসীমা—তা' হ'লে তো আর মরাই হ'বেনা দেখ্‌ছি, তোমার মাথার চুল তো অগুণ্‌তি—তা' তোমার চুলের মত আমার অগুণতি পরমায়ু হ'বে নাকি? আমি তোমার ও রকম আশীর্ব্বাদ চাই না।"

পিসীমা বলিলেন—"কেন বউমা, বেশী পরমায়ু চাওনা কেন? বেশীদিন বাঁচা তো মা, পুণ্যের লক্ষণ। যা'রা পাপী—তা'রাই অল্পদিনে ম'রে যায়। তুমি মা তো আমার সে রকম কোন পাপ করনি যে তোমাকে অল্পায়ু হ'তে হ'বে। তুমি মা আমার সর্ব্ব-সুখী হও—তোমার পরমায়ু অক্ষয় হোক।"

আমি বলিলাম—"শুধু আমার পরমায়ু অক্ষয় হ'লেই বুঝি আমার সব হ'বে—তা'র চেয়ে আমাকে বেশী আশীর্ব্বাদ ক'রবার আর কিছুই নেই পিসীমা?"

পিসীমা আমার মনের কথা বুঝিলেন। বুঝিয়া একটু হাসিলেন। তা'রপর বলিলেন—"মা, সে আশীর্ব্বাদ আমি রোজই

ক'রে থাকি। তোমাকে শুনিয়ে কি সে আশীর্ব্বাদ ক'রব? সে আশীর্ব্বাদই তো মা তোমাকে সব আশীর্ব্বাদের মূল।"

আমিও পিসীমার কথা শুনিয়া একটু হাসিয়া ফেলিলাম। কিন্তু তখনি সে কথা চাপা দিয়া বলিলাম,—"আচ্ছা পিসীমা, তুমি যে আমাকে তোমার চিকিৎসা-শিক্ষার শিষ্যা ক'রবে ব'লেছিলে, তা' কই ক'রলে না? তা' যতদিন তুমি না আমাকে সে সব শে'খাচ্ছ—ততদিন কিন্তু আর আমি তোমার পাকা চুল তুলব না।"

পিসীমা আবার হাসিলেন। হাসিয়া আমার চিবুক ধরিয়া বলিলেন,—"পাগ্‌লি আর কি?—তা' শিষ্যা কি তোমায় ক'র্‌ছি না বউ মা! এই সুরমার ছেলের অসুখ হ'ল, খাজাঞ্চীবাবুর স্ত্রীর অসুখ হ'ল—সে সব যা' ক'রে সার্‌'ল—তা' তে কি তুমি কিছু শিখ্‌লে না? শুধু মুখে উপদেশ দিয়ে তোমায় শিষ্যা ক'রব কেন?—তোমায় তো হাতে-কলমে সকল ব্যবস্থা শিখিয়ে খুব ভাল শিষ্যা তৈরি ক'রছি। তবে তুমি আমার পাকা চুল তুল'বে না কেন?"

আমি বলিলাম—রোজ রোজ রোগী পাবে,—তবেতো তুমি আমার হাতে-কলমে শিষ্যা তৈরি কর্‌বে। রোগী না পেলে বুঝি মুখের কোন উপদেশ দিতে নেই?"

পিসীমা বলিলেন,—"তা' থা'ক্‌বেনা কেন?—তা' আছে। তবে রোগী পেলে যে শিক্ষা দেওয়া হয়—সে শিক্ষা অকাট্য হয়।"

আমাদের এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময় পশ্চাদ্দিক হইতে কে আসিয়া আমার চোখ টিপিয়া ধরিল। টেপনটা একটু জোরে হইয়াছিল, কাজেই আমার একটু লাগিয়াও ছিল। আমি বিরক্ত হইয়া বলিলাম—"কে—কে,—ছাড়িয়া দাও।"

যে চোখ টিপিয়াছিল, সে ছাড়িল না, খিল খিল করিয়া হাসিতে লাগিল।

আমি তাহার হাসি শুনিয়া আরও বিরক্ত হইলাম, তাহার হাতটা জোর পূর্ব্বক সরাইয়া দিলাম। তাহার পর ফিরিয়া যাহা দেখিলাম—তাহাতে রাগ হইল না, রাগের পরিবর্ত্তে আনন্দ হইল। সুরমা আমার চোখ টিপিয়াছিল, পিসীমা চুপ করিয়া রঙ্গ দেখিতেছিলেন। আমি একটু অপ্রতিভ হইলাম। বলিলাম—"সুরমা—তুমি! কখন্ এলে! বড় জোরে টিপিয়াছিলে, তাই একটু লাগিয়াছে।"

সুরমা আমার চোখের নিকট হাত লইয়া গিয়া, যে স্থানে টিপিয়া ধরিয়াছিল, সেই স্থানে একটু হাত বুলাইয়া দিল। তাহার পর বলিল,—"এই বুঝি তুমি আমায় ভাল-বাস! একটু টিপিয়া দিলে সহ্য কর্‌তে পারনা!"

আমি পুনরপি অপ্রতিভ হইয়া বলিলাম, "—না—না—তেমন লাগে নি, তা—তা—তুমি কখন এলে ভাই! অনেক দিন চিঠি-পত্তর লেখনি কেন? ছেলে-পিলে সব ভাল আছে তো?"

সুরমার পার্শ্বে আর একটি যুবতী দাঁড়া-ইয়াছিল, আমি বলিলাম,—"এটি কে ভাই! বেশ মেয়েটি তো!"

সুরমা বলিল—"অনেক কথা বললে যে! চিঠি-পত্তর তুমিও যে অনেক দিন আমাকে লেখনি—সে কথা তো ব'ল্‌লে না! বয়স হ'লে এই রকমই হয়!"

আমি বলিলাম—"ভাই, আমাকে সংসারের সবই একা দেখ্‌তে হয় সেটাতো জান, সুতরাং আমার সাত খুন মাপ। তা, যা হোক, এ মেয়েটী কে—পরিচয় দিলে না তো!

সুরমা বলিল—"আমার জা,—ছোট দেওয়ের স্ত্রী। রক্তভাঙ্গা রোগ হ'য়েছে, তাই পিসীমার নিকট নিয়ে এসেছি।"

পিসীমা বলিলেন,—"দেখ্‌লে বউমা, যে যা চায়—সে তাই পায়। তুমি চিকিৎসা শিখ্‌তে চাহিলে,—এই তো তোমার আর একটি রোগের চিকিৎসা শেখ্‌বার উপায় হ'ল।"

সুরমা ও তাহার জা এ কথার অর্থ বুঝিল না,—তাহারা আমাদের দিকে তাকাইল। পিসীমা কিন্তু অর্থ বুঝাইয়া দিলেন। সুরমা সে অর্থ শুনিয়া হাসিতে লাগিল।

তাহার পর পিসীমা রোগী লইয়া পড়িলেন। প্রথমেই তাঁহার বা চিকিৎসকদিগের স্বভাবসিদ্ধ অভ্যাস মত বয়সের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

সুরমা বলিল—"কুড়ি বৎসর।"

পিসী। ছেলে পিলে ক'টি?

সুরমা। দুটি।—একটি আমার ষোল বছরের সময় হয় আর একটি তা'র দু' বছর পরে হয়েছে।

পিসী। অসুখটা হ'য়েছে কদ্দিন?

সুর। প্রায় এক বছর।

পিসী। ঋতুটা কি ফি মাসে নিয়ম মত হয়?

সুর। না, কখন বা ঠিক সময়ে মাসে একবারই হয়, আবার কখন বা মাসে দু' বারও হয়। কিন্তু যখনই হোক—দশ বার দিন ক'রে রক্ত ভাঙ্গতে থাকে। ঋতুর সময় ছাড়া অন্য সময়ে বেদনার সহিত কখন কখন স্রাব হয় বুঝা যায়।

পিসী। অম্বল আছে? যা' খায়—হজম হয়!

সুর। না—অম্বল হয় না, তবে রাত্রিতে ক্ষিদেও বড় থাকে না—যেন খেলেও হয়, না খেলেও হয়।

পিসী। তা' হলেই তো যা' খায়—তা' ভাল জীর্ণ হয় না। জীর্ণ হ'লে আর ক্ষিদে হ'বে না কেন। দাস্ত কিরূপ হয়!

সুর। প্রায়ই ভাল হয় না!

পিসী। ছেলে কি এই দুটিই—না আর হইছিল!

সুর। না, আর হয় নি, তবে আর একবার গর্ভ হ'য়ে ছ' মাসের সময় নষ্ট হ'য়ে গি'ছল।

পিসী। সে কত দিনের কথা?

সুর। প্রায় দেড় বৎসর, তা'র কিছু দিন পর থেকেই এই অসুখটা হ'য়েছে।

পিসী। তবেই তো এ রোগ জন্মাবার একটা কারণ র'য়েছে বুঝ্‌তে পারা গেল। লোকনাথ বদ্দি বলত—এক সঙ্গে ক্ষীর-মাছ প্রভৃতি বিরুদ্ধ আহার ক'রলে, অপক্ক জিনিস আহার কর্‌লে, মদ্য পান ক'রলে, অত্যন্ত স্বামী সহবাস ক'র্‌লে, আর অকালে গর্ভ নষ্ট হ'লে এ রোগ জন্মে থাকে। শোক এবং বেশী উপবাস থেকেও এ রোগ জন্মে থাকে। দিনে ঘুমান, বেশী ভারি জিনিস ব'য়ে নিয়ে যাওয়াও এ রোগ জ'ন্মাবার একটা কারণ। তা' যে কারণেই হোক একটা কারণ গর্ভ নষ্ট—এটা বোঝা গেল।

পিসী। চেহারা কি এর চেয়ে বেশী ভাল ছিল? জল কি রকম খায়? কখন মূর্চ্ছা হয় কি!

সুর। চেহারা এর চেয়ে আগে ভাল ছিল,—এখন ফ্যাকাশে হ'য়ে গিয়েছে। জল বড্ড খায়—আমরা বারণ করি, বলি—অত জল খেওনা—বেশী জল খেলে জীর্ণের পক্ষে ব্যাঘাত হয়—কিন্তু সে কথা শোনে কে?

পিসী। গা-হাত-পা জ্বলে!

সুর। খুব। রোজই বলে—দিদি, গা-হাত-পা জ্বলার একটা উপায় করে দাও।

পিসী। ঘুম কেমন হয়?

সুর। ঘুমের পরিমাণটাও বেশী—তা' কি দিন, কি রাত। তবে ঘুমের পরিমাণ বেশী হ'লেও—ডাক্‌লেই ঘুম ভাঙ্গে, ঘুমটা যেন তন্দ্রার মত।

পিসী। যে স্রাবটা নির্গত হয়—সেটা কি মাংস ধোয়া জলের মত? পরিমাণে বেশী না কম? ফেনা ফেনা মনে হয় কি!

সুর। কখন কখন মাংস ধোয়া জলের মতই হয় বটে, আবার কখন কখন রাঙ্গা টকটকে দেখা যায়, কিন্তু বড় রুক্ষ। আর স্রাবের সময় বেদনা বড় বেশী।

পিসী। এটা হ'চ্ছে, বাতিক প্রদর—এ বায়ুজনিত প্রদর সার্‌বে। লোকনাথ বদ্দি বলিত—প্রদর রোগ চার প্রকার,—কফজ, পিত্তজ, বাতজ ও ত্রিদোষজ। ত্রিদোষজ মানে হ'চ্ছে—বায়ু, পিত্ত ও কফ—তিনটে মিশে যে রোগ জন্মায়—সেইটা ত্রিদোষজ। তা' এ ত্রিদোষজ কবিরাজদের সকল রোগেই আছে। যা'ক্—এ রোগ একটু যত্ন নিলেই সহজে সা'র্‌বে। কোন চিকিৎসা হইছিল কি?

সুর। ডাক্তারি ওষুধ অনেক খাওয়ান হ'য়েছে, কিন্তু কিছুই হয় নি।

পিসী।—ওই তো তোমাদের দোষ,—ডাক্তারি ছাড়া আর কিছু জা'ন্‌লে না। এদ্দিন যদি কোন কবিরাজকে দেখা'তে, তা'হ'লে সে টোট্‌কা-মুষ্টিযোগে এ রোগ সারিয়ে দিতে পা'রত।

সুর।—তা' যা' হ'য়েছে—তা' হ'য়েছে, এখন তো সারিয়ে দাও পিসীমা।

পিসী। স্বামীর কাছে কিন্তু এক বছর শু'তে পা'বে না, আগে এ কথায় রাজি হ'তে হ'বে।

সুরমা হাসিয়া ফেলিল। আমিও হাসি চাপিতে পারিলাম না। পিসীমা একটু রাগের ভরে বলিলেন,—"হাসছ কি—ওরই বেশী বাড়াবাড়ি ক'রেই তো রোগের উৎপত্তি. এখন কিছুদিনের জন্য ওটা বন্ধ না ক'র্‌লে চ'লবে না।"

সুরমা তাহার জায়ের দিকে চাহিয়া বলিল,—"শুন্‌ছ তো—একবছর একা শুয়ে থা'ক্‌তে হ'বে, পা'রবে তো!"

সুরমার জা লজ্জিতভাবে নতবদনা হইল। উত্তর দিল না।

সুরমা বলিল—"তা' হ'চ্ছেনা, আগে উত্তরটা দাও। সুরমার দেবরপত্নী ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল।

তাহার পর পিসীমা বলিলেন,—"প্রধান নিয়মের কথাটা তো হ'ল, তার'পর আরও কতকগুলি নিয়মের কথা বলি। এগুলিও পালন ক'র্‌তে হ'বে। শাক, অম্বল, কলাইয়ের দালটা মোটেই খেতে পা'বে না, লঙ্কার ঝাল, গুরুপাক এবং তীক্ষ্ণবীর্য্য দ্রব্য, দই, বড় মাছ, বেশী নুন, কুমড়া, বেশী দুধ

এ সব খাওয়াও বন্ধ ক'র্‌তে হ'বে। রোদে বেড়া'তে পা'বে না, ভারি জিনিস নিয়ে তুল্‌তে পা'বে না, সিঁড়ি বা বেশী উঁচু যায়গা থেকে বেশী ওঠা-নামা ক'র্‌তে পা'বে না, মল-মূত্রাদির বেগ মোটেই ধারণ ক'র্‌তে পা'বে না, হিম লাগান, রাতজাগা, রোজ স্নান করা, বেশী জোরে কথা কওয়া, আগুণ তাতে বেশীক্ষণ থাকা—এ সবও ক'রতে পাবে না, এই সব যদি ক'র্‌তে পার, তা'হ'লে আমি চিকিৎসার ভার নিতে পারি, নইলে চিকিৎসা করান মিছে মাত্র।

সুর। এ সব নিয়ম খুব পালন করা চ'ল্‌বে পিসীমা, এ সব তো খুব সহজ নিয়ম। যেটা সব চেয়ে শক্ত—সেইটা যদি পালন ক'র্‌তে পারে—তা' হ'লে এ সবের জন্যে কিছু আট্‌কাবে না।

পিসী। খাওয়ার কথাটা একটু বলি শোন। দিনের বেলা পুরাণ দাদ্‌খানি চালের ভাত, মুগ, ছোলার দাল, ডুমুর, পাকা কুমড়ো, মোচা, বেগুণ আলু, উচ্ছে কাচ-কলা—এই সবের তরকারি, মাছটা দিন কতক না খেলেই ভাল হয়, খেলে ছোটমাছ এবং পরিমাণে খুব অল্প। রাত্রিতে রুটী বা লুচি এবং দিনের মত তরকারি। তেলে পাক করা তরকারি না খেয়ে ঘিয়ের তরকারি খেলে বেশী উপকার হয়। জলখাবার—ময়দা, সুজি, ছোলার বেশম, ঘি এবং অল্প মিষ্টি দিয়ে যে সব জিনিস তৈয়ের হয়। ফলের মধ্যে খেজুর, দাড়িম, পানফল, কিস্‌মিস্, মিছরি, আক প্রভৃতি। স্নানটা যত কম হয়, তাও' যে দিন স্নান করা হ'বে—সে দিন ঠাণ্ডা জলে নয়, জল গরম ক'রে নিয়ে স্নান ক'র্‌তে হ'বে।

সুর। তা' এসব নিয়ম খুব পালন করা চ'ল্‌বে পিসীমা। এইবার তুমি ওষুধের কথা বল।

পিসী। হাঁা ব'ল্‌ছি। কাঁটান'টের গাছ চেন তো? সকালবেলা সেই কাঁটা ন'টের শিকড় এক সিকি ভ'র ওজনে নিয়ে আলোচাল ধোয়া জলের সঙ্গে বেটে তা'রপর আর একটু আলোচাল ধোয়া জল নিয়ে ঐটে পাতলা ক'রে তা'র সঙ্গে একটু মধু মিশিয়ে খেতে হ'বে। সন্ধ্যেবেলা কুশ'রমূল—কুশ চেনতো!—গঙ্গার ভাঙ্গনে ঘাসের মত যে গাছগুলো হয়—গঙ্গা নাইতে গিয়ে দেখেছ বোধ হয়—সেই কুশের মূল ঐ রকম সিকি ভ'র ওজনে নিয়ে ঐ রকম ক'রে আলোচা'ল ধোয়া জলে বেটে পাতলা ক'রে মধু মিশিয়ে খা'বে। আর বিকেল বেলা একবার ক'রে অশোকের ক্বাথ খেতে হ'বে। অশোক এ রোগের একটা মহা ওষুধ।

সুর। অশোকের ক্বাথ কি পিসীমা?

পিসী। অশোকের ফুল দেখেছ তো? অশোকষষ্ঠীতে অশোকের ফুল লাগে জান না?—সেই অশোকের ছাল ২ তোলা—২, তোলা মানে হ'চ্ছে দু টাকা ভ'র ওজনে নিয়ে একটু কুটে নিয়ে একছটাক দুধ আর সাতছটাক জল একটা মাটির হাঁড়িতে কাঠের জ্বালে সিদ্ধ ক'রে দুধটুকুমাত্র থাক্‌তে নামিয়ে ক'সটে ছেঁকে নিয়ে ঠাণ্ডা হ'লে তা'তে একটু চিনি মিশিয়ে সেইটে বিকাল বেলা তিনটা চা'রটা বেলার সময় খেতে দেবে। একে বলে—অশোক-ক্ষীর বা অশোক-দুগ্ধ। এটি সকল প্রকার প্রদর রোগেরই মহৌষধ। কবিরাজেরা এই

অশোক-ক্ষীর বা অশোক-দুধের বদলে তৈরি করা "অশোকঘি" দিয়ে থাকে, যদি কোন ভাল ক'বরেজের দ্বারা সেই অশোক-ঘি তৈরি ক'রে নিতে পার—তা' হ'লে এ না ক'রে তা' দিতেও পার। তবে জিনিসটা খাঁটি হওয়া চাই—সেই জন্যই তৈরি করিয়ে নিতে ব'লছি, বাজারে কবিরাজী ওষুধ বিক্রীর অনেক দোকানে তৈরি অশোকঘি পাওয়া যায় বটে, কিন্তু আজকাল অনেকেই ক'বরেজি ব্যবসা ক'রছে। তা'রা চিকিৎসার ধার ধারেনা—শুধু লাভের জন্য ওষুধ বিক্রীই তা'দের উদ্দেশ্য। এইসব গোলযোগের জন্য কোন ক'বরেজের দ্বারা তৈরি ক'রিয়ে নেওয়াই ভাল।

সুর। আর কোন ওষুধ খাওয়াতে হবেনা? শুধু এই ক'রলেই সেরে যাবে?

পিসী। এতেই সা'র্‌বে বোধ হয়। তবে আরও দু'একটা মুষ্টিযোগ ও পাচন বলছি, শুনে রাখ, যদি দরকার বোঝ, অর্থাৎ যদি এই সকল ব্যবস্থা দিন প'নের কি মাসখানেক ক'রেও না সারে, তা' হ'লে সেই সব ব্যবস্থা ক'রতে পার। কিন্তু কতকগুলো ওষুধ একসঙ্গে খাওয়াইওনা, কতকগুলো ওষুধ একসঙ্গে খাওয়ান ভাল নয়। এ ব্যবস্থায় যদি না সারে, তা' হ'লে কাঁটান'টে আর কুশের কথা যা' ব'লেছি—সেই দু'টি বদলে দিয়ে তা'রই যায়গায় আর দু'বার দু'-রকম ওষুধ দিতে পার। কিন্তু অশোক ছেড়না, অশোক এ রোগের পরম ওষুধ জেনে রেখ।

সুর। তাই ক'রব পিসীমা, এখন তুমি আরও গোটাকতক ওষুধ ব'লে দাও। লিখে রাখলেও অনেক কাজ হ'বে।

পিসী। কাকমাচীমূল কিম্বা কাপাসের মূল চা'ল ধোয়া জলের সঙ্গে খেলে প্রদর রোগে উপকার হয়। মধুর সহিত কাঠডুমুরের রস কিম্বা বেড়েলারমূল ছাগল-দুধে বেটে খেলে প্রদর রোগ ভাল হ'য়ে থাকে। কুশমূল ও বেড়েলামূল এক একটি সিকি ভ'র ওজনে নিয়ে চা'ল ধোয়া জলের সঙ্গে বেটে খেলেও প্রদর ভাল হয়। কাকমাচী কি কাপাসের মূল বা কাঠডুমুরের রসের কথা যা' ব'লেছি—ওদের পরিমাণও সিকি ভ'র জানবে। কুড়, শুকনা কুল আর শুকনা কাচাকলার গুঁড় এক একটি সিকি ভ'র ক'রে নিয়ে দুধ বা ঘিয়ের সঙ্গে মিশিয়ে খেলেও প্রদর রোগ সেরে থাকে। কুড় বেণের দোকানে কিন্‌তে পাওয়া যায়। বেশী রক্ত-স্রাব থামাবার জন্য শরপুঙ্খ বা বননীলের মূল একভরি নিয়ে চালধোয়া জলের সঙ্গে খেতে দিলে সদ্যঃ ফল হ'য়ে থাকে।

সুর। তা' তো বুঝলাম পিসীমা,—এখন কোন্ ব্যবস্থাটা ক'রব—ব'লে দাও।

পিসী। সে কথাতো ব'লে দিইছি, আগে যে রকম ব্যবস্থায় থাকতে ব'লেছি, তাই ক'র্‌বে, তা'তে না সারে, তবে এ সকল কথা। তবে আমার মনে হয়—যে তিনটি ওষুধের কথা আগে ব'লেছি তাই ক'রলেই সেরে যা'বে।

সুর। তাই বল পিসীমা—অল্পেই সেরে যাক্। বড্ড কষ্ট পাচ্ছে, দেখলে আমাদেরো কষ্ট হয়।

তাহার পর সুরমা আমার দিকে চাহিয়া বলিল,—আমি তো এসেই তোমাদের বাড়ী এইছি ভাই—তুমি কি আমাদের বাড়ী যা'বে না?

আমি বলিলাম—তুমি তো এসেছ নিজের গরজে। আমিও আমার গরজ প'ড়লে যা'ব, এখনও তো আমার কোন গরজ প'ড়েনি।

সুর। তবে তুমি থাক, আমি চ'ল্‌লাম। এই বলিয়া সুরমা চলিয়া গেল। সুরমা চলিয়া যাওয়ার পর আমি পিসীমাকে বলিলাম—"পিসীমা, সুরমা আসিয়া কেবল তো রোগেরই কথা কহিল। তাহার সহিত আমার কোন কথাই হইল না, একবার দেখা করিয়া আসিব?

পিসীমা বলিলেন,—"যাও।" আমি পিসীমার অনুমতি পাইয়া বাল্য সঙ্গিনীর সহিত মিলিত হইয়া পরমাহ্লাদে সুখ-দুঃখের কথা কহিতে লাগিলাম।

বিবিধপ্রসঙ্গ।

মানুষের বদলে কুমীর।—কলিকাতার রাস্তা গুলির গর্ত্তের ভিতর এখন ধাঙ্গর নামাইয়া নর্দ্দামা পরিষ্কার করান হয়। আমেরিকার ফ্লোরিডা নগরের নর্দ্দামা কুমীরের দ্বারা প'রষ্কার করানর ব্যবস্থা আছে। কলিকাতার মিউনিসিপ্যাল কর্ত্তারা এখানে সেই নিয়ম চালাইবার প্রস্তাব করিয়াছেন। মন্দ কি! ইহাতে ধাঙ্গরদিগের স্বাস্থ্য হানি ঘটিবে না। তাহারও তো মানুষ ভিন্ন আর কিছুই নহে।

আয়ুর্ব্বেদ সভার অভাব।—গত বড় দিনের সময় জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশন উপলক্ষে এবার কলিকাতায় নানারূপ সভারই আয়োজন হইয়াছিল। কিন্তু আয়ুর্ব্বেদ সভা বাদ পড়িয়াছে। কেহ কেহ বলিতেছেন,—ইতঃপূর্ব্বে আয়ুর্ব্বেদের উন্নতির জন্য কলিকাতা হইতে কয়েকজন খ্যাতনামা কবিরাজ দিল্লী পর্য্যন্ত ছুটিয়া গিয়াছিলেন, সে অবস্থায় কলিকাতায় এত জনসংঙ্ঘ উপলক্ষে তাঁহাদের চেষ্টা করিয়া একটা আয়ুর্ব্বেদ সভার আয়োজন করা উচিত ছিল।

পরিদর্শন।—কিছুদিন হইল কোচবিহারের মহামান্য ভূপ বাহাদুর অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়-পরিদর্শনে যথেষ্ট প্রীতি-প্রকাশ করিয়া এই বিদ্যালয়ের অনুষ্ঠাতৃ বর্গকে বিশেষ উৎসাহিত করিয়া গিয়াছেন। এজন্য উক্ত মহারাজা বাহাদুরের নিকট আমরা বিশেষ কৃতজ্ঞ।

বালকরক্ষার ব্যবস্থা।—বালক মহলে সিগারেটের অবাধ প্রচলনের ফলে তাহাদিগের যে স্বাস্থ্যোন্নতির বিঘ্ন জন্মাইতেছে এ কথা আমরা অনেকবার বলিয়াছি। সংপ্রতি শুনিয়া সুখী হইলাম, গবর্ণমেণ্ট আইনের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়া ইহা

রহিত করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। ২১ বৎসরের ন্যূন-বয়স্ক কোন বালককে কোন দোকানদার, সিগারেট, বিড়ি, সিগার বা নল বিক্রয় বা দান করিলে প্রথম অপরাধের জন্য অনধিক ১০৲ টাকা, দ্বিতীয় অপরাধের জন্য ২০৲ এবং তৎপরবর্ত্তী প্রত্যেক অপরাধের জন্য অনধিক ৫০৲ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবে—ইহাই পাণ্ডুলিপিতে লিখিত হইয়াছে। পুলিশ কর্ম্মচারী, শিক্ষাবিভাগের কর্ম্মচারী, প্রিভেণ্টিভ সার্ভিসের কর্ম্মচারী অথবা পশু ক্লেশ নিবারণী সভার কর্ম্মচারীরা ২১ বৎসরের ন্যূন বয়স্ক কোন বালককে ধূমপান করিতে দেখিলে তাহার নিকট হইতে উহা কাড়িয়া লইতে পারিবেন—ইহাও পাণ্ডুলিপিতে উল্লেখ করা হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট এ আইন বিধিবদ্ধ করিয়া ভাল কাজই করিতেছেন।

দীর্ঘ জীবন।—কলির পরমায়ু ১২০ বৎসর, কিন্তু এখন কোনরূপে ৫০ হইলেই যেন যথেষ্ট হইল। এ অবস্থায় কাহারও দীর্ঘ জীবনের কথা শুনিলে আনন্দিত হইতে হয়। রাণাঘাটের "বার্ত্তাবহ' সংবাদ দিতেছেন,—"রাণাঘাটের বিশ্বাস বংশের গোষ্ঠীপতি গোপালচন্দ্র বিশ্বাসের দেহান্তর হইয়াছে। মৃত্যুকালে ইঁহার বয়স ৮২ বৎসর পূর্ণ হইয়াছিল। জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তিনি সুস্থ সবল ও কর্ম্মক্ষম ছিলেন ও নিত্য নৈমিত্যিক, সান্ধ্যাহ্নিক সমাপন করিয়াছিলেন।" এই নিত্য নৈমিত্তিক সান্ধ্যাহ্নিক সম্পন্ন—তথা হিন্দুজনোচিত আচার ব্যবহার মানিয়া চলাই তাঁহার দীর্ঘজীবন লাভের কারণ বলিয়া আমরা মনে করি। আমরা যখন ইন্দোরে গিয়াছিলাম, তখন ইন্দোরের মহারাণীর পিতামহের মৃত্যু আমাদের সম্মুখেই হইয়াছিল। একশত বৎসরেরও অধিক বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন। তিনিও আমরণ স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ছিলেন। এখন লোকে স্বধর্ম্ম পালনও ভুলিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে অল্পায়ুও হইয়াছে।

চায়ের আমদানী।—"এডুকেশন গেজেট" সংবাদ দিতেছেন,"—১৯১৭—এপ্রিল হইতে অক্টোবর মধ্যে আসাম হইতে প্রায় ৮০ কোটী পাউণ্ড চা কলিকাতায় আসিয়াছিল; বাঙ্গালার বিভিন্ন জিলা হইতে ৬ কোটি ৬৮ লক্ষ, নিজাম রাজ্য হইতে ৩০ লক্ষ, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ হইতে ১৮০ লক্ষ এবং বিদেশ হইতে জাহাজে ১৯ লক্ষ পাউণ্ড চা আসিয়াছিল। বিদেশ হইতে আমদানির পরিমাণ ১৯১৬ অব্দের ঐ ছয় মাসে ৪ গুণ বাড়িয়াছে ঐ ১৯ লক্ষ পাউণ্ড বৈদেশিক আমদানীর ১৭ লক্ষ পাউণ্ড অক্টোবর মাসে।" এত চায়ের আমদানিতে কলিকাতার লোকে অত্যধিক চা খোর হইবে না কেন? কিন্তু ইহার ফল যে বিষময় হইতেছে—তাহা কি কেহ ভাবিয়া দেখিতেছেন?

মাসিকপত্র ও সমালোচক।

২য় বর্ষ। | বঙ্গাব্দ ১৩২৪—ফাল্গুন। | ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

কাজের কথা।

সিদ্ধিতে অসিদ্ধি।—আজকাল মদ-গাঁজা-গুলির চলনটা শিক্ষিত সমাজ হইতে একরূপ উঠিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু সিদ্ধির চলনটা যে খুবই বাড়িয়াছে, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ কলিকাতার আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়গুলির অত্যধিক মোদক বিক্রয়। সস্তার এই মোদক বিক্রয়ের ফলে অনেক বাঙ্গালীই সিদ্ধিখোর হইয়া পড়িতেছে। মোদক সেবনের প্রাথমিক উত্তেজনায় মানসিক প্রবৃত্তি চরিতার্থকরণের বেশ একটু তৃপ্তি অনুভব হয় বটে, কিন্তু ইহার অত্যধিক ব্যবহারে পরিণামে অবসাদ জন্মাইয়া ধাতু সকলের সাফল্য সাধন দূরে থাকুক, উহা হইতে দৌর্ব্বল্যই উপস্থিত হইয়া থাকে। সিদ্ধির গুণ-ব্যাখ্যায় আয়ুর্ব্বেদকারগণ ইহাকে উষ্ণ ও পিত্তকারক বলিয়াছেন। এ অবস্থায় ইহার অত্যধিক ব্যবহারে যকৃৎদুষ্ট-ব্যাধি জন্মিবার বিশেষ সম্ভাবনা। সিদ্ধিঘটিত মোদক সেবনে আপাতমধুরফলভোগী ব্যক্তি-দিগের এ সকল কথা ভাবিবার বিষয়।

* * *

মাদক সেবনের পরিণতি।—কোন মাদকেরই পরিণতি শুভজনক নহে। নীরোগ ব্যক্তির পক্ষে মাদক দ্রব্য ব্যবহারে সুস্থ শরীরকে ব্যস্ত করা ভিন্ন কিছুই ফললাভ হয় না। সে ব্যস্ততার ফলে শরীরে অন্যরূপ ব্যাধি উপস্থিত হইবারই বিশেষ সম্ভাবনা। সামান্য অসুখের চিকিৎসায় এইজন্যই বৃহৎ ঔষধ প্রয়োগের ব্যবস্থা করিতে আয়ুর্ব্বেদকার-গণ মাথার দিব্য দিয়া বারণ করিয়া গিয়াছেন। সামান্য সর্দ্দি-কাশিতে যক্ষ্মা বা ক্ষয়কাসের ঔষধ ব্যবহার করিলে তখনকার জন্য সর্দ্দি কাশি সারিয়া যায় বটে, কিন্তু পরিণামে যক্ষ্মা বা ক্ষয় কাসের সৃষ্টিই হইয়া থাকে। সিদ্ধি ঘটিত মোদক সেবনে ব্যাধির অবস্থা ভেদে উপকার হইলেও সকল অবস্থায় উহার ফল শুভ জনক হয় না। এইজন্যই বিজ্ঞাপন দেখিয়া নিজে নিজে মোদক সেবনের ব্যবস্থা না করিয়া সুচিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ পূর্ব্বক যদি উহা ব্যবহার করা যায়, তাহা হইলে উপকার হইতে পারে, নতুবা নিজে নিজে ব্যবস্থা করিয়া উহা

ব্যবহার করিলে অনেক সময় অনিষ্টেরই সম্ভাবনা।

* * *

বিজ্ঞাপনের ঔষধ।—তা' ছাড়া বিজ্ঞাপনের চটক দেখিয়া যা' তা' ঔষধ ব্যবহার করা তো কোনক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। বিজ্ঞাপনের অনেক ঔষধে অনেক সময় 'গরু হারাইলে গরু পাওয়া যায়'—এমন সকল কথাও বাহির হইয়া থাকে। কিন্তু সত্য সত্য তাহা যদি হইত, তাহা হইলে আয়ুর্ব্বেদের রোগ-চিকিৎসার এক এক অধিকারে রাশি রাশি ঔষধের ব্যবস্থা কখনই সন্নিবেশিত হইত না। শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন প্রকৃত চিকিৎসকের পক্ষেও রোগনির্ণয় করিয়া ঔষধ-নির্ব্বাচনের সময় বিশেষ চিন্তা করিবার প্রয়োজন হইয়া থাকে। যে ঔষধের গুণ জানা নাই, সে ঔষধ ব্যবহার করিতে আয়ুর্ব্বেদবেত্তাগণ এইজন্যই নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। আয়ুর্ব্বেদ এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

"যথাবিষং যথাশস্ত্রং যথাগ্নিরশনির্যথা।
তথৌষধম বিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতমমৃতং যথা॥"

অর্থাৎ—যে ঔষধের গুণ অজ্ঞাত থাকে, সেই ঔষধ শস্ত্র, অগ্নি ও বজ্র সদৃশ অনিষ্টকারী, কিন্তু যে ঔষধের গুণ জ্ঞাত থাকে, তাহা অমৃতের ন্যায় উপকারী। এ সকল কথা এখনকার দিনে কেহ চিন্তা করেন না—ইহাই দুঃখের বিষয়।

* * *

বঙ্গে শিশু-মৃত্যু।—বাঙ্গালা দেশে শিশু মৃত্যুর সংখ্যা দিন দিনই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। সরকারি হিসাবে প্রকাশ—গত ১৯১১ খৃঃ অব্দে সমগ্র বাঙ্গালা দেশে যত শিশু জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল, তাহাদের প্রত্যেক পাঁচ জনের মধ্যে একজন করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। আমরা নিম্নে কয়েক বৎসরের জন্ম ও মৃত্যুর তালিকা প্রদান করিতেছি,—

খৃঃ অব্দ	জন্ম	মৃত্যু
	(হাজার করা)	
১৯১২	৩৫·৩০	২৯·৭৭
১৯১৩	৩৩·৭৮	২৯·৯
১৯১৪	৩৩·৮৬	৩৪·৫
১৯১৫	৩১·৮০	৩২·৮৩

সুতরাং দেখা যাইতেছে, জন্ম ও মৃত্যুর তুলনায় বাঙ্গালা দেশে মৃত্যুর হার ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতেছে।

* * *

শিশুমৃত্যুর কারণ।—এই শিশু-মৃত্যুর কারণ নির্দ্দেশ করিতে হইলে মৃত শিশুদিগের পিতা মাতাকে সর্ব্ব প্রধান দোষী করিতে হয়। ব্রহ্মচর্য্যভ্রষ্ট অস্বাস্থ্যকর পিতা-মাতার শুক্র শোণিত মিলনের ফলে যে সকল শিশু জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে, ভূমিষ্ট হওয়ার অল্পকাল পরে তাহারাই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে। সুতরাং বাঙ্গালীর ব্রহ্মচর্য্যের অভাবই সাধারণতঃ বাঙ্গালা দেশে শিশু-মৃত্যু বৃদ্ধির সর্ব্ব প্রধান কারণ। তা' ছাড়া বিশুদ্ধ গব্য দুগ্ধের অভাবে শিশু-শরীরে যে যকৃত রোগের আক্রমণ হইয়া থাকে, তাহাও শিশু মৃত্যুর আর একটি কারণ। ইহা ভিন্ন সামান্য 'বালসা' হইবামাত্র বড় বড় ঔষধ প্রয়োগে যে তাহা আরোগ্য করিবার চেষ্টা করা হয়, তাহার ফলেও তাহাদিগকে অকাল-মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত করা হয়। বাঙ্গালী যখন ব্রহ্মচর্য্য হারায় নাই, সভ্যতার চাকচিক্যে বঙ্গজননী যখন সৌন্দর্য্যশালিনী হন নাই, হলুদ-

তেল মাখাইয়া, রোদে রাখিয়া প্রকৃতির সহজ-জাত স্বভাবের উপর নির্ভর করিয়া যখন শিশু রক্ষার ব্যবস্থা করা হইত, তখন কিন্তু বাঙ্গালী শিশুর অকাল মৃত্যুর কথা বড় শুনা যাইত না। সামান্য সামান্য অসুখে আলুইয়ের বটি, মধু আদার রস সেবনে তাহারা নিরাময় তো হইতই এবং তাহারই ফলে দীর্ঘজীবনও লাভ করিত। বর্ত্তমান সময়ে শিশুমৃত্যুর হার দেখিয়া সে সকল অতীত কাহিনী চিন্তা করিবার সময় আসে নাই কি ?

পরিবর্ত্তিত প্রণালীতে আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ প্রস্তুত উচিত কিনা ?

আমাদের দেশে দুইশ্রেণীর কবিরাজ দেখিতে পাওয়া যায়। ১ম। রক্ষণশীল, ২য়। পরিবর্ত্তনশীল। যাঁহারা রক্ষণশীল—তাঁহাদের বিশ্বাস—আয়ুর্ব্বেদ অপৌরুষেয়, ব্রহ্মাদি দেবগণ ইহার প্রবর্ত্তক। সুতরাং আয়ুর্ব্বেদের কোন পরিবর্ত্তন—একেবারেই অনুচিত। অন্ততঃ আমাদের মত মানুষ আয়ুর্ব্বেদের উপর কলম চালাইতে পারিবেনা।

পক্ষান্তরে - যাঁহারা পরিবর্ত্তনশীল, তাঁহারা আয়ুর্ব্বেদকে ভাঙ্গিয়া গড়িতে চাহেন, আয়ুর্ব্বেদকে অন্য জাতির বিজ্ঞানের সাহায্যে বিশ্লেষণ করিতে চাহেন, আয়ুর্ব্বেদকে সম্পূর্ণাবয়বে দেখিতে ইচ্ছা করেন। বলা বাহুল্য—আমি এই দ্বিতীয় শ্রেণীর কবিরাজদেরই পক্ষপাতী। শুধু আমি কেন. যিনি আয়ুর্ব্বেদের উন্নতি দেখিতে চাহেন, তিনি কখনই রক্ষণশীলের অনুদারতা ও সঙ্কীর্ণতার পোষকতা করিবেন না।

আমরা সকলেই প্রতি নিয়ত প্রত্যক্ষ করিতেছি - অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা দিন দিন প্রসার লাভ করিতেছে। ইহার একমাত্র কারণ—অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা সাম্প্রদায়িক নহে। হিন্দুর বিজ্ঞানে, মুসলমানের বিজ্ঞানে —যাহা কিছু সার ও সত্য দেখিতে পাওয়া যায়, অ্যালোপ্যাথেরা তাহা অকুণ্ঠিত চিত্তে গ্রহণ করেন। কোন নূতন ঔষধের সন্ধান পাইলে, তাহা পরীক্ষা করিয়া সাদরে লইয়া থাকেন। এটী আমার—সুতরাং উৎকৃষ্ট. ওটী পরের অতএব নিকৃষ্ট,—ডাক্তারী মতে এরূপ সঙ্কীর্ণতা স্থান পায় না। এই উদারতার জন্যই ডাক্তারি চিকিৎসার এতদূর প্রবল প্রভাব। দুঃখের বিষয় কবিরাজ মহাশয়দের মধ্যে অনেকেই এরূপ উদারতা দেখাইতে পারেন নাই। তাই আয়ুর্ব্বেদের এতদূর অধঃপতন হইয়াছে। খ্রীষ্টিয় ষোড়শ শতাব্দিতেও যে আয়ুর্ব্বেদ—অপরের কাছে অপরাজেয় ছিল, সনাতন, জ্ঞানময়, আদি বিজ্ঞান আয়ুর্ব্বেদ আজ ডাক্তারী চিকিৎসার নিকটে হীনপ্রভ হইয়া পড়িয়াছে। অথচ অনেকেরই মুখে শুনিতে পাই, আজকাল দেশের লোকের মতি ফিরিয়াছে, আয়ুর্ব্বেদের আদর বড়িয়াছে, উন্নতি হইয়াছে। এই উন্নতির পরিমাপ কতটুকু ? দুই চারিজন শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত কবিরাজ—

কলিকাতায় বসিয়া সিভিল সার্জ্জনের ফিঃ আদায় করিতেছেন, মোটর চড়িতেছেন—ইহাতেই কি বুঝিব, আয়ুর্ব্বেদের উন্নতি হইয়াছে? কোন চিকিৎসায় যে রোগী আরাম হয় নাই, সে রোগী যে আয়ুর্ব্বেদের অমৃত সেচনে পুনর্জ্জীবিত হইতেছে এরূপ ঘটনা আমরা শত শত প্রত্যক্ষ করিতেছি—বল দেখি সে আয়ুর্ব্বেদের কি ইহাই উন্নতির লক্ষণ? তিন টাকা সেরের চ্যবণপ্রাশ"—৪৲ টাকা তোলার "স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজ" ৬৲ টাকা সেরের—"মহারাজ প্রসারিণী তৈল—পথে পথে, গলিতে গলিতে, মোড়ে মোড়ে—নানা বর্ণ রঞ্জিত সাইন বোর্ড দোদুল্যমান—দেয়ালে-প্রাচীরে-খবরেরকাগজে-পাজিতে স্বয়ম্ভূ কবিরাজ মহাশয়দের—নবাবিষ্কৃত ঔষধাবলীর বিরাট বিজ্ঞাপন, ইহাই কি আয়ুর্ব্বেদের উন্নতির পরিচায়ক? তোমরা একবার ভাবিয়া দেখ দেখি এগুলি আয়ুর্ব্বেদের অবনতির চিহ্ন কিনা? যে উদারতার গুণে ডাক্তারী চিকিৎসা জীবন্ত বিজ্ঞানে পরিণত হইয়াছে, সেই উদারতার অভাবেই আয়ুর্ব্বেদ হতশ্রী হইয়া পড়িয়াছে। নহিলে, যাহার পিতৃপিতামহ আয়ুর্ব্বেদের কল্যাণে সুদীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া সংসারে সুখী হইয়া গিয়াছেন, সে আজ আয়ুর্ব্বেদের মহিমা ভুলিবে কেন? আর আয়ুর্ব্বেদ যে দেশের কল্প-পাদপ, সেই দেশের ভ্রান্ত নরনারীরে আয়ুর্ব্বেদের গৌরব আজ নূতন করিয়া বুঝাইতে হইবে কেন?

যখন দেখিব এ দেশে আবার নাগার্জ্জুন-ভাব মিশ্রের মত সাহসী চিকিৎসক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, যখন দেখিব কবিরাজ মহাশয়েরা যাহা নিজে জানিয়াছেন,—তাহা অপরকে জানাইতেছেন, যখন দেখিব বৈদ্যগণ বৈদ্যক গ্রন্থে স্ব স্ব পরীক্ষালব্ধ ফল লিপিবদ্ধ করিতেছেন,—তখনই বুঝিব আয়ুর্ব্বেদের পুনরুন্নতি হইয়াছে।

এটা উন্নতির যুগ। আমাদের সৌভাগ্য—সকল জাতির মধ্যেই একটা সজীবতা দেখা দিয়াছে। জাতীয় উন্নতির প্রতি সকলেরই দৃষ্টি পতিত হইয়াছে। তবে আয়ুর্ব্বেদেরই বা উন্নতি হইবে না কেন? কবিরাজ মহাশয়েরা এ কথাটা একটু ভাবিয়া দেখিবেন কি?

আয়ুর্ব্বেদের উন্নতি করিতে হইলে, কি কি করিতে হইবে, আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণ আমার চেয়ে তাহা ভাল বুঝিবেন। আমি সে সকল কথা বলিতে চাহিনা। আমি কেবল বলিতে চাই—যাঁহারা আয়ুর্ব্বেদ পরিবর্ত্তনের বিরোধী আয়ুর্ব্বেদ দেবরচিত শাস্ত্র—অতএব নূতন কিছু করা চলিবে না—যাঁহাদের এইরূপ ধারণা, তাঁহারা যত বড় পণ্ডিতই হউন—তাঁহাদের হস্তে আয়ুর্ব্বেদের উন্নতি হইবে না,—অনুসন্ধিৎসুর সাহস ভিন্ন আয়ুর্ব্বেদের গৌরব রক্ষা অসম্ভব। যাঁহারা আয়ুর্ব্বেদকে বাঁচাইতে চাহেন, তাঁহাদিগকে দুইটি কাজ করিতে হইবে;—১ম। পুরাতনকে অন্বেষণ, ২য়। নূতনকে সমাদর। আয়ুর্ব্বেদকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিতে হইলে ডাক্তারী বিজ্ঞানের সাহায্য গ্রহণ—নিন্দা বা অগৌরবের কথা নহে। যিনি এ কথায় সম্মত হইবেন না, তাঁহাকে একটা দৃষ্টান্ত দিয়াই বুঝাইতেছি। ধরুন—মৃগনাভি ও এরণ্ড তৈল, এ দুইটা উৎকৃষ্ট ঔষধ। আয়ুর্ব্বেদে যখন এই মৃগনাভি ও এরণ্ড তৈলের গুণ লিখিত হইয়াছিল—তখন হয়ত ডাক্তারী বিজ্ঞান অতি শিশু। কিন্তু পরে,—বড় বড় ডাক্তারেরা বারংবার পরীক্ষা করিয়া মৃগনাভি ও এরণ্ড তৈলের এত গুণ আবিষ্কার করিয়া

ফেলিয়াছেন যাহাতে বিস্ময়ে অবাক হইতে হয়। আমাদের দেশীয় অনেকগুলি গাছ-গাছড়ার আময়িক প্রয়োগ ডাক্তারেরা এরূপ বিশদ ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন যে, সে সকল দ্রব্যের ব্যবহার শিখিতে হইলে আমাদিগকে আবার ডাক্তারদেরই শিষ্যত্ব স্বীকার করিতে হয়। "কালমেঘ" এ দেশের একটী স্বচ্ছন্দ বনজাত উদ্ভিদ। এ দেশের প্রাচীনাগণ শিশু-যকৃতের উপর "কালমেঘের" কার্য্যকারিতাশক্তি সর্ব্ব প্রথমেই লক্ষ্য করিয়াছিলেন। এখন ডাক্তারী গ্রন্থে -"কালমেঘের" যেরূপ অদ্ভুত বিশ্লেষণ দেখিতে পাই, তাহাতে মনে হয় - ডাক্তারেরাই বুঝি এ উদ্ভিদের আবিষ্কার কর্ত্তা। ডাক্তারী পুস্তকে আমরা "কালমেঘ" সম্বন্ধে বহু রহস্য জানিতে পারি। এক্ষণে পাঠকগণ ভাবিয়া দেখুন - এইরূপ স্থলে —আয়ুর্ব্বেদকে পরিস্ফুট করিবার জন্য—ডাক্তারী বিজ্ঞানের সাহায্য লওয়া উচিত কি না? হইতে পারে—ইহা লজ্জার কথা, কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত আমাদের মধ্যে স্বাধীনভাবে গবেষণা করিবার প্রবৃত্তি না দেখা দিবে, ততদিন আমরা স্বালম্বনের শ্লাঘা কেমন করিয়া করিব? সুতরাং ডাক্তারী ভৈষজ্য বিদ্যার সাহায্যে আমরা যদি আয়ুর্ব্বেদের ভেষজতত্ত্ব পরীক্ষা করিয়া লই—তাহা বোধ হয় নিতান্ত দোষের বিষয় হইবে না। কেননা ইহাতে লাভ ভিন্ন ক্ষতি নাই। আলোচনা বাহুল্যে, বিজ্ঞতাই বাড়িতে থাকে।

আজ কাল কেহ কেহ মেডিক্যাল কলেজে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কবিরাজী চিকিৎসা আরম্ভ করিয়াছেন। ইঁহাদের চেষ্টায় কার্য্যতঃ ডাক্তারী চিকিৎসার উৎকৃষ্ট ও গ্রহণীয় অংশ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসায় প্রবর্ত্তিত হইতেছে। ইহাতে আয়ুর্ব্বেদের কতদূর উন্নতি হইতেছে, তাহা বিশেষজ্ঞরাই বলিতে পারিবেন। আমি কিন্তু সকলকেই আয়ুর্ব্বেদের বিশেষত্ব ও স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিতে অনুরোধ করি।

আয়ুর্ব্বেদের শারীরবিজ্ঞান ও ডাক্তারী মতের শারীর বিজ্ঞান—এক নহে। আয়ুর্ব্বেদে বায়ু পিত্ত-কফের যে অসীম প্রভাব উল্লিখিত হইয়াছে, - ডাক্তারেরা তাহা স্বীকার করেন না। আবার ডাক্তারী মতকে অনেক স্থলে আয়ুর্ব্বেদ মতের বিরোধী বলিয়া মনে হয়। এরূপ স্থলে —উভয় বিজ্ঞানের সামঞ্জস্য রাখা অসম্ভব। তবে যেখানে - উভয়ের একই উদ্দেশ্য—রোগ চিকিৎসা, সেখানে ডাক্তারী ভৈষজ্য তত্ত্বের সাহায্যে আয়ুর্ব্বেদের ভেষজ কল্পনা—অবশ্যই তুলনা করিয়া পরীক্ষা করা চলে। সেরূপ পরীক্ষা করাও উচিত।

যাঁহারা ডাক্তারী মতের গোঁড়া—তাঁহারা ডাক্তারী চিকিৎসা গ্রন্থকে ভ্রমপ্রমাদশূন্য বলেন। কিন্তু, ডাক্তারী চিকিৎসা-বিধিও যে Empirical—তাহা অস্বীকার করা চলেনা। শরীরের উপর কোন ঔষধ কি প্রকারে কায করে, ডাক্তারী গ্রন্থে অনেক স্থলেই তাহা নিরূপিত হয় নাই। ফিনোলপ্থেলিন, বিরেচক, কিন্তু উক্ত পদার্থ শারীরিক যন্ত্রে কি কার্য্য করিয়া যে বিরেচন করিয়া থাকে, ডাক্তারী বিজ্ঞান তাহার সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারে না। কিন্তু আয়ুর্ব্বেদ যেস্থানে বলিতেছেন—"বিরেচনীয় বর্গের মধ্যে এরণ্ড তৈল প্রধান"—সে স্থলে বিশুদ্ধ এরণ্ড তৈল প্রাপ্তির জন্য ডাক্তারী ভৈষজ্যতত্ত্বের উপদেশ লইলে বোধ হয় কাজটী খুব ভালই হয়। আমি এই একটী মাত্র দৃষ্টান্ত দিলাম। আমার বক্তব্য—যদি আয়ুর্ব্বেদোক্ত উপায় অপেক্ষা, দ্রব্যের বিশুদ্ধিতা রক্ষার কোনও সরল উপায় ডাক্তারী বিজ্ঞানে দেখিতে পাওয়া যায়, সে

উপায়টীকে আয়ুর্ব্বেদের অঙ্গীভূত করিয়া লইলে মন্দ হয় না। যেমন আয়ুর্ব্বেদে—"গুলঞ্চ" বাতরক্তের একটী মহৌষধ—সুতরাং কবিরাজ মহাশয়েরা গুলঞ্চ প্রয়োগেই বাত রক্তের চিকিৎসা করুন; কিন্তু কিরূপ নিয়মে প্রস্তুত হইলে—গুলঞ্চ অধিক ফলপ্রদ ও বীর্য্য বান হইয়া থাকে, কি করিলে গুলঞ্চের ক্বাথ বা স্বরস দীর্ঘকাল অবিকৃতভাবে রাখিতে পারা যায়; সে সম্বন্ধে ডাক্তারী বিজ্ঞানের পরামর্শ লইলে ক্ষতি কি? যাঁহারা এ কথা শুনিতে প্রস্তুত নহেন, তাঁহারা স্বয়ং পরীক্ষা করিয়া দ্রব্যের বীর্য্যাধিক্যের বিচার করুন। প্রত্যেক দেশেই চিকিৎসা বিজ্ঞানের 'ফার্ম্মাকোপিয়া' দেখিতে পাওয়া যায়, জ্ঞানোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে—ঐ সকল ফার্ম্মাকোপিয়া মধ্যে মধ্যে সংশোধিত ও পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। তবে কবিরাজ মহাশয়েরাই বা কেন আয়ুর্ব্বেদের "ফার্ম্মা কোপিয়ায়' সংস্কার করিবেন না? আয়ুর্ব্বেদ যে স্মরণাতীতকালে সংকলিত হইয়াছিল। তারপর কত যুগযুগান্তর চলিয়া গিয়াছে। মধ্যে মধ্যে দুই চারি জন মনস্বী চিকিৎসকও আবির্ভূত হইয়া আয়ুর্ব্বেদের রত্নভাণ্ডারে—নিজ নিজ জ্ঞান লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এখনকার বৈদ্যগণের ভিতর সেরূপ সংস্কার ও বর্দ্ধনের প্রয়াস—কেন আমরা দেখিতে পাইব না?

আমি কিরূপ পরিবর্ত্তনের অভিলাষী বর্ত্তমান প্রবন্ধে ধারাবাহিক নিয়মে তাহা লিপিবদ্ধ করিব। প্রথমে "অরিষ্ট বিধি"ই আলোচনা করা যাউক।

অরিষ্ট।—চরক-সুশ্রুতাদি প্রাচীনতম গ্রন্থেও আমরা আসব অরিষ্টের প্রয়োগ দেখিতে পাই। ঋষিগণ দ্রবাবস্থায় ঔষধ রক্ষার প্রয়োজনীয়তা বহুকাল পূর্ব্বেই অবগত হইয়া ছিলেন। তাঁহারাই ভেষজ পদার্থকে গুড়, চিনী বা মধু সংযোগে সন্ধিত করিবার প্রথা চিকিৎসা-জগতে প্রথম আবিষ্কার করিয়া ছিলেন। অম্ল, খর্জ্জুররস প্রভৃতি হইতে উৎপন্ন সুরার—কার্য্য ও গুণাবলী সম্বন্ধে তাঁহাদের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা দেখিতে পাওয়া যায়। সন্ধিত দ্রব্যের ভিন্ন ভিন্ন অংশের ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা দিয়া—তাঁহারা রসায়ন জ্ঞানের যথেষ্ট পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। "বিনষ্টঃ সন্ধিতো যস্তু তচ্ছুক্রম্ অভিধীয়তে।" এই শ্লোকার্দ্ধ পাঠ কালেই আমরা বুঝিতে পারি—Alcoholic fermentation হইলে যে—Acetic fermentation আরম্ভ হয়, আমাদের ঋষিদের কাছে এ রহস্য অপরিজ্ঞাত ছিল না। কিন্তু সুরা পরিশ্রুত না হইলে যে তাহার রক্ষণ ক্ষমতা জন্মিতে পারে না,—এ টুকু বোধ হয় ঋষিরা তত ভাবিয়া দেখেন নাই। য়ুরোপীয় বিজ্ঞানের উপদেশ—কোনও জিনিষকে সুরা সংযোগে পচন হইতে রক্ষা করিতে হইলে—কম পক্ষে তাহাতে শতকরা ১২॥০ ভাগ সুরাসার থাকা চাই। আয়ুর্ব্বেদ মতে আসব, অরিষ্ট প্রস্তুত করিতে হইলে,—জলে গুড়, মউল ফুল, মিশাইতে হয়,—তাহার সঙ্গে ক্বাথ বা কুট্টিত ঔষধ মিশ্রিত করিলে, তাহা পচিতে আরম্ভ হয়। শেষে এই দ্রব দ্রব্যে—নানাবিধ অনাবশ্যক ও হানিকর পরিবর্ত্তন চলিতে থাকে। কাজেই প্রাচীন মতের অরিষ্ট, আসবে আমরা ভেষজ পদার্থের পূর্ণ গুণ দেখিতে পাই না। শুধু পাই—কতকগুলি অহিতকর জিনিষ মাত্র। ঋষি বলিয়াছেন—"যদপক্কৌষধাম্বুভ্যাং সিদ্ধং মদ্যং স আসবঃ" অর্থাৎ অপক্ক ঔষধ ও জলদ্বারা যে মদ্য প্রস্তুত হয় তাহার নাম—

আসব। কিন্তু এইভাবে প্রস্তুত আসব আমরা উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি—তাহাতে মদ্যের ভাগ অতি অল্পই থাকে বোধ হয় শতকরা পাঁচ ভাগও হইবে না। আবার শাস্ত্রমতে—কোনও আসব একমাস, কোনও আসব বা ১৫ দিন কাল পর্য্যন্ত মুখবন্ধ অবস্থায় রাখিয়া দিবার আদেশ দেখিতে পাওয়া যায়। একমাস পরে যে আসব ভাণ্ড হইতে উদ্ধৃত হয়,—তাহাতে সুরাসার আরও অল্প থাকে। সুতরাং দ্রব্যের সহিত ভেষজ একত্র করিয়া রাখিলে, সে দ্রব্যে ভেষজ-গুণের যৎসামান্যই অস্তিত্ব থাকে। অতএব আয়ুর্ব্বেদের আসব, অরিষ্ট-কল্পনার কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন বড়ই আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। আমার মনে হয়, আর্য্য ঋষিগণ যে যুগে ঔষধ রূপে আসবাদির কল্পনা করিয়াছিলেন, সে সময় তাঁহারা কেবল সন্ধান প্রক্রিয়া (fermentation) পর্য্যন্তই—যথেষ্ট মনে করিয়াছিলেন। সন্ধিত দ্রব্যকে চোয়াইয়া 'সুরাসার' করিলে তাহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারে—তাঁহারা এ টুকু ভাবিয়া দেখেন নাই। কেন না আয়ুর্ব্বেদের শেষ স্বাধীন সংগ্রহ "ভাব প্রকাশেও" তরল পদার্থ চোঁয়াইবার প্রণালী দেখিতে পাই না।

তবে আধুনিক কবিরাজ মহাশয়দের দ্বারা প্রকাশিত "ভৈষজ্য রত্নাবলী" গ্রন্থে—"মৃত সঞ্জীবনা সুরা" প্রস্তুতের যে প্রণালী দেখিতে পাওয়া যায়—তাহার উপরে ততটা আস্থা স্থাপন করা চলে না। 'মৃত সঞ্জীবনী' সুরা 'ময়ুরাখ্য যন্ত্রে' পাতন করিয়া লইতে হয়—কেবল ভৈষজ্য রত্নাবলীতেই আমরা ইহা দেখিতে পাই। হস্ত লিখিত গোবিন্দ দাসের ভৈষজ্য রত্নাবলীতে এই মৃত সঞ্জীবনীর নাম গন্ধও নাই। শার্ঙ্গধর, চক্রদত্ত, বৃন্দ, বঙ্গসেন, এমন কি ভাবপ্রকাশ গ্রন্থেও—এই মৃত সঞ্জীবনী সুরার উল্লেখ দেখা যায় না। কাজেই বলিতে হয় "মৃত সঞ্জীবনী" নিতান্তই আধুনিক। অতএব আমার বিশ্বাস—আসব অরিষ্ট প্রস্তুত করিতে হইলে, তাহা দীর্ঘকাল স্থায়ী করিবার জন্য—তাহার সহিত পরিশ্রুত সুরা যোগ করা কর্ত্তব্য। কুট্টিত ঔষধ—দ্রব মধ্যে নিমজ্জিত করিয়া, তাহাতে গুড়াদি প্রক্ষেপ দিয়া সন্ধিত না করিয়া, ঔষধ দ্রবগুলি সুরা মিশ্রিত জলে ভিজাইয়া রাখিলে আসব বা অরিষ্টের উল্লেখ সিদ্ধি হইতে পারে। এই সুরা মিশ্রিত জলে ঔষধ দ্রব্যের সা... উত্তমরূপে মিশিয়া যায়। ইহাতে আর পক্ষ কাল বা একমাস পর্য্যন্ত আসবের জন্য অপেক্ষা করিতে হয় না। ঔষধ দ্রব্য কুট্টিত করিয়া সুরা মিশ্রিত সলিলে ভিজাইয়া ৪।৫ দিন মুখ বন্ধ করিয়া রাখিতে হইবে। পরে বেশ করিয়া নিঙ্গড়াইয়া ছাঁকিয়া লইলেই আসব প্রস্তুত হইল। এই প্রক্রিয়ায় ইংরাজী নাম—Maceration.

ডাক্তারী মতে টিংচার প্রস্তুত প্রক্রিয়ার অনুরূপেও অতি সহজে উৎকৃষ্ট আসব প্রস্তুত হইতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ "কনকাসব" নামক প্রসিদ্ধ আসবের প্রস্তুত-বিধি নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

"কনকাসব" শ্বাস রোগের একটী মহৌষধ। আমার এক আত্মীয়ার জন্য—কাঁচরাপাড়ার দুর্গাগতি কবিরাজ এই কনকাসব ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ইহার উপাদান—

সংক্ষুণ্ণ কনকং শাখা মূল পত্র ফলৈঃ সহ।
ততশ্চতুঃপলং গ্রাহ্যং বৃষ মূলত্বচস্তথা॥
মধুকং মাগধী ব্যাঘ্রী কেশরং বিশ্বভেষজং।
ভার্গী তালীশপত্রঞ্চ সংচূর্ণৈষং পলদ্বয়ং।

সংগৃহ্য ধাতকী প্রস্থং দ্রাক্ষায়াঃ পল বিংশতিং।
জল দ্রোণদ্বয়ং দত্বা শর্করায়াস্তুলাং তথা।
ক্ষৌদ্র স্যার্দ্ধ তুলাঞ্চাপি সর্ব্বং সংমিশ্য যত্নত।
ভাণ্ডে নিক্ষিপ্ত যাবৃত্য নিরধান্মাস মাত্রকং।
(বিনোদলাল সেনের ভৈঃ রত্না।)

অর্থাৎ ধুতুরা [শাখা, মূল, পত্র ও ফল সহিত—কুট্টিত] ৪ পল, বাসক মূলের ছাল ৪ পল, যষ্টিমধু, পিপুল, কন্টিকারী, নাগেশ্বর, শুঁঠ, বামনহাটী ও তালীশ পত্র প্রত্যেকের চূর্ণ ২ পল, ধাতকীপুষ্প ১৬ পল, দ্রাক্ষা ২০ পল, জল ১২৮ সের, চিনী ১২॥০ সের মধু ৬।০ সের। এই সমুদয় দ্রব্য উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া, আবৃত পাত্রে ১ মাস রাখিয়া, পরে দ্রবাংশ ছাঁকিয়া লইবে।

এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া আমার পিসীমা কিছুদিন হাঁপানীর হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু অনুমান—৩ বৎসর পরে তাঁহার আবার হাঁপানী হয়। কাজেই তিনি 'কনকাসব' সেবনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। দুঃখের বিষয়—দুর্গাগতি গুপ্ত অতি অল্প বয়সেই ইহলোক হইতে অপসারিত হ'ন। পিসীমার দ্বিতীয় বার অসুখের সময় দুর্গাগতি জীবিত ছিলেন না। কি করি! সে সময় এত কবিরাজী ঔষধালয় ছিল না যে কনকাসব ক্রয় করিয়া লইব। আমি তখন ইউনিভার্সিটীর উপাসক—কালেজের ছাত্র। অন্ন চিন্তার নিরুত্থন হইয়া পড়ি নাই। উপেন্দ্র বরাট তখন কাঁচরাপাড়ার কবিরাজ। আমি তাঁহার কাছেই কনকাসবের প্রার্থী হইলাম। তিনি বলিলেন—"কনকাসব প্রস্তুত নাই। প্রস্তুত করিয়া দিতে পারি, কিন্তু একমাস সময় লাগিবে। রোগিণী রোগের যন্ত্রণায় অধীরা-- এ অবস্থায় ১ মাস ঔষধের প্রতিক্ষা করা চলে না। আমি উপেন বাবুর নিকট হইতে "কনকাসবের" ফর্দ্দ লিখিয়া লইলাম। মস্‌লা যোগাড় করিয়া তাঁহাকে দেখাইলাম। শেষে, স্বয়ং উহা য়ুরোপীয় বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে দুই দিনের মধ্যেই প্রস্তুত করিলাম। আমার নিজ কৃত 'কনকাসব'—অত্যন্ত ফলপ্রদ হইয়াছিল। দেশে কাহারও কাসি বা হাঁপানী হইলে,— আমার কাছে ছুটিয়া আসিত। দেখিতাম— সকলেরই বিশেষ উপকার হইয়াছে। বন্ধুবর —রাধা জীবন—আমার ঔষধ বিতরণ দেখিয়া শ্লোক আওড়াইতেন—

ব্রাহ্মণং ভিষজং দৃষ্টা স চেল জলমাচরেৎ

আমি যে উপায়ে অল্প সময়ের মধ্যে সমধিক বীর্য্যবান কনকাসব প্রস্তুত করিয়াছিলাম, তাহাও লিখিতেছি।

ধুস্তুরাদি সমস্ত দ্রব্য উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া লইয়া, সুরা মিশ্রিত জলে (শতকরা ৪৫ ভাগ সুরা) চূর্ণগুলি ভিজাইতে হয়। পরে "পার কোলেটার" যন্ত্রে ঐ আর্দ্র দ্রব্য পূর্ণ করিয়া 'পার কোলেশন' বিধি অনুসারে আসব প্রস্তুত করিতে হয়। এইরূপে প্রস্তুত আসবের পূর্ণ মাত্রা ১ ড্রাম। ইহাতে ১ মাত্রা আসবে ৫ রতি পরিমাণে চূর্ণ ঔষধ থাকে। কনকাসবে যে যে ঔষধ দ্রব্য ব্যবহৃত হয়,—সে গুলির মধ্যে প্রায় সকলেরই সার ভাগ জলে দ্রবণীয়। সুতরাং এই ধুস্তুরাদি পদার্থকে প্রাচীন আসব প্রক্রিয়া মতে প্রস্তুত না করিয়া বক্ষ্যমান মতে অরিষ্ট করা উচিত। যথা—ধুস্তুরাদি দ্রব্য ৩৮ পল, দ্বিগুণ জলে সিদ্ধ করিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। আবার ঐ ভেষজ দ্রব্য গুলিকে দ্বিগুণ জলে সিদ্ধ করিয়া লইয়া, উভয় ক্বাথ একত্র মিশ্রিত কর। এই ক্বাথ বাষ্প উত্তাপে ঘনীভূত করিতে হইবে--ঘনীভূত ক্বাথের

পরিমাণ হইবে—২৮॥০ পল। ইহার সহিত ৯॥০ পল সুরাসার মিশাইয়া ৩৮ পল অরিষ্ট করিতে হইবে। এই কনকাসব ৫ গুণ অধিক বীর্য্যবান হইবে। ইহার ২১ ফোঁটা খাইলেই উপকার হয়, শ্বাসের টান কমে। (ক্রমশঃ)।

শ্রীসতীশচন্দ্র রায় এম্ এ।

বাল্য বিবাহের বৈজ্ঞানিক যুক্তি।

:০:

[বিষ কন্যা]

দ্বিতীয়-প্রস্তাব।

যাঁহারা "মুদ্রা রাক্ষস" পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে "বিষ-কন্যার" কথা বোধ হয় আর বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। বাস্তবিক "বিষ-কন্যার" মারণী-শক্তি অতি ভয়ানক ছিল। আমার বিশ্বাস—এই জন্যই সেকালে পুত্র-কন্যার বিবাহে পাত্র ও পাত্রী উত্তমরূপে পরীক্ষা করা হইত।

সে পরীক্ষা কিরূপ? নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল।

প্রথমে বর-পরীক্ষার একটু আভাষ দিতেছি। স্মার্ত্ত রঘুনন্দন তাঁহার উদ্বাহ-তত্ত্বে লিখিয়াছেন—

ন মূত্রং ফেনিলং যস্য বিষ্ঠাচাপ্সু নিমজ্জতি।
মেঢ্রশ্চোন্মাদ শুক্রাভ্যাং হীনঃ ক্লীবঃ স উচ্যতে।

"যাহার প্রস্রাবে ফেনা জন্মে না, এবং যাহার বিষ্ঠা জলে ডুবিয়া যায় * * * * সেই ব্যক্তি ক্লীব; তাহাকে কখনও কন্যাদান করিবে না।" বর-পরীক্ষার এইরূপ অনেক লক্ষণই উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু সে সকল কথা অদ্যকার প্রবন্ধের আলোচ্য নহে। অতএব এইস্থানেই আমি সে প্রসঙ্গ পরিত্যাগ করিতেছি।

এইবার কন্যা-পরীক্ষার কথা বলিয়া যাই।

ত্রাণি যস্যাঃ প্রলম্বানি ললাট মুদরং ভগং।
ক্রমেণ ভক্ষয়েন্নারী শ্বশুরং দেবরং পতিং॥

যে কন্যার ললাট, উদর ও জননেন্দ্রিয় লম্বমান দীর্ঘাকার হয়, সে কন্যা যথাক্রমে শ্বশুর, দেবর ও পতিকে ভক্ষণ করিয়া থাকে। কন্যা পরীক্ষারও এইরূপ অনেকগুলি লক্ষণ শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। বাহুল্য ভয়ে আমি কেবল তাহার একদেশ মাত্র দেখাইতেছি। এখন সমাজে—এইরূপ কন্যা-পরীক্ষার প্রথা উঠিয়া গিয়াছে। যে অবধি পণ-প্রথা সমাজে প্রবেশ করিয়াছে—সেই অবধিই কন্যা-পরীক্ষা উঠিয়া গিয়াছে। বরের বাপ টাকা পাইলেই তুষ্ট,—তাহার উপর পুত্রবধূর রংটা যদি একটু ফর্‌সা হয়, তাহা হইলে ত কথাই নাই। সে কন্যা বিষকন্যা কিনা? সে কন্যা পতিঘাতিনী হইবে কিনা?—ধনলুব্ধ-বরকর্ত্তা—একবারও তাহা ভাবিবার অবকাশ পান না!

আমি ব্রাহ্মণ। সমাজে একটা কোন ব্যবস্থা চালাইবার অবশ্যই আমার ক্ষমতা আছে। আমি প্রত্যেক হিন্দুকে, আমার প্রত্যেক দেশবাসীকে অনুরোধ করিতেছি—

তাঁহারা পুত্র-কন্যার বিবাহে—এইরূপ পরীক্ষা আরম্ভ করুন, দীন-নির্য্যাতন-বর-পণ উঠাইয়া দিন, দেখিবেন – তাঁহাদের পুত্র-কন্যাদের মধ্যে —অকাল মৃত্যু তিরোহিত হইবে। হৃত-স্বাস্থ্য ফিরিয়া আসিবে। তাঁহাদের সন্তান-সন্ততি যাহা ভূমিষ্ঠ হইবে, সেগুলি বলবান্ ও দীর্ঘজীবী হইবে। দম্পতির মনের মিল হইবে। সংসারে মঙ্গল ও শান্তি যুগপৎ বিরাজ করিবে।

অবশ্য পুরাকালের মত কন্যা-পরীক্ষা একালে হয় ত চলিবে না। কেন না দৈহিক লক্ষণ দেখিয়া কন্যা নির্ব্বাচন করিতে হইলে—ভূয়োদর্শিতা ও সূক্ষ্মদৃষ্টির প্রয়োজন। কিন্তু জ্যোতিষ মতে কন্যা ও পাত্র পরীক্ষা করা, গণ-রাশি-যোটক প্রভৃতির বিচার করা – নিতান্ত কঠিন ব্যাপার নহে। দম্পতীর মনো-মালিন্য, কামোন্মত্ত হইয়া ব্যভিচার প্রবৃত্তি, ক্ষীণাঙ্গ অল্পায়ু সন্তান প্রসব—এই যে আধি বিড়ম্বনায় হিন্দুর ঋষি-রচিত সংসার দিন দিন ধ্বংস হইতে বসিয়াছে—ইহার মুখ্য কারণ - বিবাহের পূর্ব্বে পাত্র ও পাত্রীকে পরীক্ষা না করা। কন্যাদায়ের জ্বালায় অনেক গৃহস্থেরই সে স্বাধীনতা নাই। অনেক গৃহস্থই পাত্র নির্ব্বাচনের সাহস করেন না, - যেমন তেমন একটার হাতে মেয়েটাকে তুলিয়া দিতে পারিলেই নিশ্চিন্ত হন। কিন্তু বরের বাপের ত সে অসুবিধা নাই। তিনিত অনায়াসেই কন্যাকে পরীক্ষা করিয়া গৃহে আনিতে পারেন; —তিনি কেন তাহা করেন না? ইহার কারণ —তাঁহারও সে সাহস নাই। তিনি অর্থ লোভী, রূপ-পিপাসু,—তিনি তো সংসারের শান্তি চাহেন না; তিনি চাহেন—কন্যাকর্ত্তার রত্ন মঞ্জুষা। তিনি চাহেন – পুত্রবধূর অনিন্দ্য সুন্দর রূপ। সেই রূপবতী কন্যা হয় ত বিষ কন্যা —সে স্বামী গৃহে আসিয়া স্বামীকে ধীরে ধীরে বিষ জর্জ্জর করিয়া অকালে মৃত্যুপথে অগ্রসর করিয়া দিল; বরের বাপ তাহা বুঝিলেন না। নহিলে তাঁহারই বাটীর পার্শ্বে এক গরীব গৃহস্থের একটী শ্যামাঙ্গী কন্যা ছিল - সে কন্যার সহিত তাঁহার পুত্রের কোষ্ঠীর উত্তমরূপ মিলনও হইয়াছিল, তথাপি সে কন্যাকে পুত্রবধূ করিতে তাঁহার অসম্মতি হইবে কেন? অর্থের লোভে, রূপের লোভে—এইরূপে দেশের সর্ব্বনাশ হইতেছে! কত মণিভূষিতা ভুজঙ্গিনী সৌন্দর্য্যের আবরণে আত্মগোপন করিয়া রত্নের ঝাঁপি কক্ষে লইয়া শ্বশুর-গৃহে প্রবেশ করিতেছে! কর্ত্তাদের সে দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই!

এই বিষ কন্যার বিষ সহ্য করাইবার জন্যই প্রাচীন আর্য্যগণ সমাজে বাল্য বিবাহের প্রচলন করিয়াছিলেন। এ সকল কথা আমি পূর্ব্ব প্রবন্ধে সবিস্তারে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। এক্ষণে "বিষ কন্যা" সম্বন্ধে আরও দুই চারিটী কথা লিখিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিব।

অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন,—একটা কিম্বদন্তী আছে যে, যে সকল ক্ষিপ্ত কুকুর বা শৃগাল অথবা বিষধর সর্প—বারম্বার অপর প্রাণীকে দংশন করিতে থাকে, তাহাদের বিষ-বেগ ক্রমশঃ মন্দীভূত হইয়া কমিয়া যায়। তখন তাহারা আর কাহাকেও দংশন করিলে, দংশিত ব্যক্তি আর মরে না। এই নিয়মটী বিষকন্যা সম্বন্ধেও খাটে। "জ্যোতিঃসারার্ণব" গ্রন্থে ইহার অনেক প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা;—

লম্বোদরী স্থূল জঙ্ঘা স্থূল নাসা চ যা ভবেৎ।
পতয়োষ্টৌ ম্রিয়েরন্ সা নবমে তু প্রসীদতি॥

- যে কন্যার উদর লম্বা জঙ্ঘা ও নাসিকা স্থূল,—তাহার আটটী পতি মরিবে, নবম পতিতে সে নারী প্রসন্না থাকিবে।

এই শ্লোকটী পড়িয়া স্পষ্টই বুঝা যায়—যখন একে একে আটটী পতি বিষ কন্যার বিষ-সংসর্গে মরিয়া গিয়াছে, তখন তাহার বিষের আর কোন জোর নাই, কাজেই সে কন্যা নবম পতিকে লইয়া সুখে ঘরকন্না করিবে।

ভূমির্নস্পৃশ্যতে যস্যা অঙ্গুল্যা চ কনিষ্ঠয়া।
ভর্ত্তারং প্রথমং হন্যাৎ দ্বিতীয়ঞ্চাভি নন্দতি॥

যে কন্যার চরণের বৃদ্ধাঙ্গুলী ও কনিষ্ঠাঙ্গুলী—চলিবার সময় ভূমি স্পর্শ করে না, সে কন্যার প্রথম স্বামী মরিয়া যাইবে। দ্বিতীয় স্বামী লইয়া সে সুখিনী হইবে।

যস্যা মধ্যং ভবেদ্দীর্ঘং সা স্ত্রী পুরুষ ঘাতিনী।
ভূমির্নস্পৃশ্যতেঽঙ্গুল্যা সা নিহন্যাৎ পতিত্রয়ং॥

যে কন্যার মধ্যদেশ দীর্ঘ, সে পুরুষ ঘাতিনী, যাহার মধ্যাঙ্গুলী মৃত্তিকা স্পর্শ করে না, সেই কন্যা তিনটী পতির প্রাণ বিনাশ করিয়া থাকে।

প্রদেশিনী ভবেদ্দীর্ঘা সা স্যাৎ সৌভাগ্যশালিনী
উর্দ্ধা যস্যা ভবেদ্দীর্ঘা পতিং হন্তি চতুষ্টয়ং॥

যে কন্যার চরণের প্রদেশিনী অঙ্গুলী বৃদ্ধাঙ্গুলীর চেয়ে দীর্ঘ হয় সে কন্যা সৌভাগ্যশালিনী হইয়া থাকে। কিন্তু সেই প্রদেশিনী দীর্ঘ হইয়া যদি উপরে উঠিয়া থাকে, তবে সে একে একে চারিটী স্বামীকে বিনষ্ট করিবে।

বিরলা দশনা যস্যাঃ কৃষ্ণাক্ষী কৃষ্ণ জিহ্বিকা।
ভর্ত্তারং প্রথমং হন্তি দ্বিতীয়মপি বিন্দতি॥

যে কন্যার দন্ত বিরল, নেত্রদ্বয় ও জিহ্বা কৃষ্ণবর্ণ তাহার প্রথম স্বামী মরিবে এবং সে দ্বিতীয় পতি লাভ করিবে।

যস্যা অত্যুৎকটৌ পাদৌ বিস্তৃতঞ্চ মুখং ভবেৎ।
উত্তরোষ্ঠে চ রোমানি সা শীঘ্রং ভক্ষয়েৎ পতিং॥

যে কন্যার পদদ্বয় উৎকট (সম্পূর্ণরূপে ভূতল স্পর্শ করে না) আস্য কুহর অতি বিস্তৃত ঠোঁটের উপর লোম রেখা দৃষ্ট হয়, সে শীঘ্রই স্বামীকে ভক্ষণ করে।

জ্যোতিষ শাস্ত্রে বিষ কন্যার আরও প্রমাণ পাওয়া যায়—

রিপুক্ষেত্র গতৌ তৌতু লগ্নে যদি শুভ গ্রহৌ।
ক্রূরস্তত্র গতোপ্যেকো ভবেৎ স্ত্রী বিষ কন্যকা॥

যে কন্যার জন্ম লগ্নে দুইটী শুভগ্রহ থাকে, এবং ঐ শুভগ্রহদ্বয়ের যদি সেই লগ্নস্থান অরি স্থান হয়, এবং একটী ক্রূর গ্রহ সেখানে বিদ্যমান থাকে, তবে সে কন্যা বিষকন্যা নামে অভিহিতা হইবে।

ভদ্রা তিথি র্যদাশ্লেষা শতভিষাচ কৃত্তিকা।
আঙ্গার রবিবারেষু ভবেৎ স্ত্রী বিষ কন্যকা॥

মঙ্গলবারে বা রবিবারে, দ্বিতীয়া সপ্তমী অথবা দ্বাদশী তিথিতে, অশ্লেষা শতভিষা কিম্বা কৃত্তিকা নক্ষত্রের যোগে যে কন্যা জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে, তাহাকে বিষ কন্যা বলা যায়।

বিষ কন্যার সংসর্গে স্বামীর মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। বিষকন্যা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী হইলেও তাহাকে পরিত্যাগ করা উচিত। এইরূপ বিষকন্যার সংক্রামক বিষদোষ হইতে—পুরুষদিগকে রক্ষা করিবার জন্যই ত্রিকালদর্শী ঋষিগণ বাল্য বিবাহের ব্যবস্থা প্রচলিত করিয়াছিলেন। আমরা নির্ব্বোধ—ঋষি-বাক্যের গূঢ় রহস্য না বুঝিয়া বাল্য-বিবাহের দোষ কীর্ত্তন করি।

এক্ষণে আমরা পণের লোভে, রূপের মোহে, কন্যার লক্ষণালক্ষণ দেখিবার অবকাশ পাই না। রাশি নক্ষত্র-গণ-যোটকের মহদুদ্দেশ্য বুঝিতে পারি না। ফলে, আমাদের সংসারে বধূরূপে কত বিষকন্যাই স্থান লাভ করিতেছে, তাহাদের দৈহিক বিষের প্রভাবে—আমাদের আশার অবলম্বন বংশধরগণ—দিন দিন দুরা-

রোগা রোগে আক্রান্ত হইতেছে, যৌবনে উদ্যম-উৎসাহ হারাইতেছে, অকালে বলিপলিত জরাগ্রস্ত হইয়া মানসিক কষ্টে কালযাপন করিতেছে! তাহাদের চক্ষুজ্যোতিঃ ভ্রষ্ট—তাই অকালে চস্‌মা পরিতে হইতেছে! মস্তিষ্ক মেধাধৃতি হীন, শরীর কান্তি ভ্রষ্ট,—যুবাদের দুর্দ্দশা চরমে উঠিয়াছে। তবুও বরপণ আদায় করিতে হইবে, রূপসী বধূ গৃহে আনিতে হইবে, —এতদপেক্ষা মানুষের আর কি অধঃপতন হইতে পারে? *

শ্রীরামসহায় কাব্যতীর্থ—
বেদান্ত শাস্ত্রী।

বঙ্গে অজীর্ণ রোগের এত প্রাদুর্ভাব কেন?

আজকাল বঙ্গদেশে অজীর্ণ রোগের বিষম প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। শতকরা নব্বই জন বা ততোধিক ব্যক্তি অজীর্ণ রোগে ভুগিয়া থাকে। বর্ত্তমান প্রসঙ্গে আমরা এই দেশ ব্যাপী অজীর্ণ রোগের কারণ নির্দ্দেশ করিতে প্রয়াস পাইব। কিন্তু তৎপূর্ব্বে অজীর্ণ রোগ সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক।

শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে যে, জীবন বলের উপর নির্ভর করে এবং বল অগ্নির উপর নির্ভর করে। বাঙ্গালী জাতির অগ্নিবল কমিবার সঙ্গে সঙ্গে জীবনও কমিতেছে। শতবর্ষ জীবী লোক বাল্যকালেও আমরা অনেক দেখিয়াছি, কিন্তু এখন তাহাদের সংখ্যা বিরল হইয়াছে। এখন বাঙ্গালী গড়ে পঞ্চাশ বৎসর বাচে কি না সন্দেহ। পূর্ব্বে লোকে যেরূপ আহার করিতে পারিত, এখন আর সেরূপ আহার করিতে পারে না। একটা সহজ দৃষ্টান্ত দিই। পৌষপার্ব্বন এক সময়ে বঙ্গের একটী মহৎ ব্যাপার ছিল। বর্ষার মেঘমুক্ত শরতের সুনীল আকাশ যখন চন্দ্র কিরণে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠে, নিদাঘতাপতপ্ত পৃথিবী বর্ষার জলে স্নান করিয়া তৃপ্ত হইবার পর শরতে যখন আদ্র দেহ শুষ্ক করিয়া কাশপুষ্পময় বসন পরিধান করে, যখন আশু ধান্য ভাণ্ডারজাত হয় এবং হৈমন্তিক ধান্য ক্ষেত্রের পর ক্ষেত্র শ্যামল বর্ণে আচ্ছাদিত করিয়া বায়ুভরে দুলিতে থাকে, তখন যেমন বঙ্গ শারদীয় মহাপূজার মহানন্দে মাতিয়া উঠিত, তেমনি যখন স্বর্ণ বর্ণ হৈমন্তিক ধান্য ভাণ্ডার জাত হইত, মসুর-কলায়-তিল, অতসী, যব, গোধূম প্রভৃতি শস্যক্ষেত্রের

---

* এখনকার দিনে বিবকন্যা নিরূপণ করিতে হইলে জ্যোতিষ ও সামুদ্রিক শাস্ত্রে জ্ঞান থাকা চাই। আমাদের মধ্যে অনেকেরই তাহা নাই। সুতরাং এ অবস্থায় বাল্য বিবাহ প্রথাই নিরাপদ। কিন্তু যাঁহারা "ভদ্র" আখ্যাধারী, তাঁহারা যেরূপ শোষণ বৃত্তি অবলম্বন করিতেছেন, তাহাতে দরিদ্র কন্যা-কর্ত্তাকে বাধ্য হইয়াই অধিক বয়স পর্য্যন্ত কন্যাকে অনূঢ়া রাখিতে হইতেছে, অতএব সমাজ হিতৈষী মাত্রেরই বরপণ উঠাইবার চেষ্টা উচিত।

—লেখক।

শোভা সম্পাদন করিত, কৃষক সারা বৎসর পরিশ্রমের পরে যখন দুই দিন বিশ্রামের অবসর পাইত, বৃত্তিভোগী রজক, ক্ষৌরকার হইতে ব্রাহ্মণগণের ভাণ্ডার পর্য্যন্ত ক্ষেত্রজাত শস্যে পূর্ণ হইত, বর্ষার ক্ষীণ অগ্নিবল হেমন্তে যখন প্রবল হইয়া উঠিত, তখন বঙ্গ পৌষপার্ব্বণের মহানন্দে বেশ মাতিয়া উঠিত। বঙ্গে এমন গৃহ ছিল না, যে গৃহে বিবিধ পিষ্টকের আবির্ভাব না হইত। ধনীর গৃহে ব্যয়সাধ্য খাদ্যাদির আয়োজন হইত, দরিদ্র চালের গুঁড়া, ময়দা, মুগের দাল, নারিকেল, গুড় প্রভৃতি সংযোগে নানাপ্রকার পিষ্টক প্রস্তুত করিত। আমরা বাল কালে এই মহাপার্ব্বণ দেখিয়াছি, আর দেখিয়াছি লোকে বহু পরিমাণে পিষ্টক আহার করিতে পারিত।

সে পৌষপার্ব্বণ এখন আর নাই বা নাম মাত্র আছে। কেন এমন হইল? ইহার কারণ দুইটী, পিষ্টক বিলাসিতা। লোকে গৃহ প্রস্তুত পবিত্র পিষ্টক অপেক্ষা বাজারের জঘন্য কৃত্রিম দ্রব্যে প্রস্তুত দুই পয়সার কচুরী কিনিয়া খাওয়া শ্রেয়ঃ বোধ করে। দ্বিতীয় কারণ— লোকের অগ্নিবল কমিয়া গিয়াছে, পিষ্টক জীর্ণ করিবার শক্তি এক্ষণে অনেকেরই নাই। আয়ুর্ব্বেদে পিষ্টক অন্ন অপেক্ষা আট গুণ পুষ্টিকর বলিয়া কথিত হইয়াছে। বাঙ্গালী জাতি এক্ষণে এই পুষ্টিকর খাদ্যে বঞ্চিত হইয়াছে। কবি প্রবাসিনী কন্যার হইয়া যাহা বলিয়াছেন, আমাদের বঙ্গ জননীর নিকট সেই কথা বলিতে ইচ্ছা হয়;—

আসিলে পৌষমাস বদনে মৃদুহাস
আর কি পিঠে পুলি ভাজিবি না গো।

কেবল পৌষপার্ব্বণ বলিয়া নহে, ৪০।৫০ বৎসর পূর্ব্বের কথা যাঁহাদের স্মরণ আছে, তাঁহারা জানেন যে এই ৫০ বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালী জাতির আহার কত কমিয়া গিয়াছে। আহারই জীবন, সুতরাং আহারের সহিত জীবনও যে কমিবে তাহাতে আর বিচিত্র কি।

আয়ুর্ব্বেদ বলেন যে, অগ্নিমান্দ্য হইতেই সমস্ত রোগ জন্মিয়া থাকে। সুতরাং মন্দাগ্নির ফলে বাঙ্গালী জাতি যে বিবিধ রোগ পীড়িত হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? প্রকৃত সুস্থ দেহ ব্যক্তি বাঙ্গালী জাতির মধ্যে নিতান্ত বিরল, আবাল বৃদ্ধ বনিতার কোন না কোন পীড়া আছেই। প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা কর, কাহারও একটা দিন বিনা উপসর্গে কাটে না। কেহ বলিবে—একটা অম্বল ঢেকুর উঠিয়াছিল, কেহ বলিবে ভাল ক্ষুধা হয় নাই, কাহারও পেট ভার, কাহারও মাথা টিপ-টিপ, কাহারও শরীরটা কেমন ম্যাজ ম্যাজে, কাহারও ভাল দাস্ত হয় নাই ইত্যাদি একটা না একটা উপসর্গ আছেই আছে। রাজপথে দাঁড়াইয়া একবার পথবাহী জনস্রোতের দিকে লক্ষ্য করিতে থাক, দেখিবে মানুষের মত মানুষ কোথায়? হৃষ্ট পুষ্ট বলিষ্ট তেজোব্যঞ্জক মূর্ত্তি নিতান্ত বিরল। প্রায় অধিকাংশ ব্যক্তিরই জ শীর্ণ, ম্লানমুখ, চক্ষু কোটর গত, তেজের লেশমাত্র নাই, কোনও রূপে দেহভার বহন করিয়া চলিয়াছে। এক কথায় বাঙ্গালী জাতির জীবন রোগে জর্জ্জরিত হইয়া পড়িয়াছে।

অজীর্ণ রোগ হইতে কোন্ কোন্ রোগ জন্মিতে পারে তাহার দিগদর্শন স্বরূপ শাস্ত্রকার বলিয়াছেন:—অগ্নির দৌর্ব্বল্য হেতু অন্নজীর্ণ না হইলে অমলত্ব প্রাপ্ত হইয়া বিষবৎ অনিষ্ট করিয়া থাকে। উহা পিত্তের সহিত সংসৃষ্ট হইয়া দাহ তৃষ্ণা, মুখরোগ, অম্লপিত্ত এবং পিত্ত জনিত অন্যান্য রোগ উৎপন্ন করে। কফের সহিত

সংসৃষ্ট হইয়া যক্ষ্মা, পীনস, মেহ এবং অন্যান্য কফ জনিত রোগ উৎপন্ন করে। বায়ুর সহিত মিলিত হইলে বায়ুজনিত রোগ সমূহের সৃষ্টি করে। মূত্রের সহিত মিলিত বিবিধ মূত্র রোগের সৃষ্টি করে। মলের সহিত মিলিত হইয়া বিবিধ কুক্ষিগত রোগ উৎপন্ন করে এবং রস রক্তাদি ধাতুর সহিত মিলিত হইয়া রসরক্তাদি গত বিবিধ রোগ উৎপন্ন করে।

শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে যে, অগ্নি নষ্ট হইলে মৃত্যু হয়, আর অগ্নি উপযুক্তভাবে থাকিলে নীরোগ শরীরে দীর্ঘকাল জীবিত থাকা যায়। শুধু ইহাই নয়, স্বাস্থ্য, উৎসাহ, উপচয় (পুষ্টি) প্রভা, বল, আয়ু, সমস্তই অগ্নিবলের উপর নির্ভর করে। বাঙ্গালীর সেই অগ্নিবল ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে, তাই বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য উৎসাহ উপচয়, প্রভা, বল ও আয়ু ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে। দেশের যেরূপ অবস্থা তাহাতে বাঙ্গালীর অগ্নি বল পুনরায় প্রবল হইয়া তাহাদিগকে স্বাস্থ্য, বল, আয়ু প্রভৃতির অধিকারী করিবে, কি নির্ব্বাপিত হইয়া বাঙ্গালী জাতির অস্তিত্বের বিলোপ সাধন করিবে, তাহা বিধাতাই জানেন। অনেকের ধারণা আছে যে, তরল দাস্ত হইলেই অজীর্ণ বলা যায়। কিন্তু তাহা যথার্থ নহে, কোষ্ঠকাঠিন বা কোষ্ঠ বদ্ধতা ও অজীর্ণ জন্য জন্মিতে পারে। শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে যে, আম দোষ (অজীর্ণ) দুইপ্রকার, যথা বিসূচিকা ও অলসক। তন্মধ্যে বিসূচিকা (Spasmodic dyspepsia) রোগে অন্ত্রের ক্রিয়া শীঘ্র শীঘ্র হয়। ভুক্ত দ্রব্য যাহা জীর্ণ হইবার তাহা শীঘ্র হয় এবং অজীর্ণ অংশ বমি বা মলরূপে শীঘ্র শীঘ্র নির্গত হইয়া যায় আর অলসক রোগে (Paralytic dyspepsia) ভুক্ত দ্রব্য অত্যন্ত বিলম্বে জীর্ণ হয় এবং মলও বিলম্বে নির্গত হইয়া থাকে। সুতরাং কোষ্ঠবদ্ধতাও অজীর্ণ রোগের পরিচায়ক।

শাস্ত্রে অগ্নি চতুর্ব্বিধ বলিয়া কথিত হইয়াছে যথা সমাগ্নি, বিষমাগ্নি তীক্ষ্ণাগ্নি ও মন্দাগ্নি। এতন্মধ্যে দোষশূন্য বা অবিকৃত অগ্নিকে সমাগ্নি বলা যায়। সমাগ্নি উপযুক্ত অন্নকে যথাকালে সম্যক পরিপাক করে। অপর তিনটী অগ্নি দূষিত বা বিকৃত। বায়ু কর্তৃক দূষিত অগ্নিকে বিষমাগ্নি বলা যায়। এই অগ্নি কখন ভুক্তদ্রব্য পরিপাক করে, এবং কখন কখন পেটফাঁপা, শূলবৎ বেদনা, উদাবর্ত্ত (ভুক্তদ্রব্য উপর দিকে ঠেলিয়া উঠা,) অতিসার, পেটভার, পেটে গুড় গুড় শব্দ এবং প্রবাহন (মলত্যাগ কালে কুন্থন) উৎপাদন করে। পিত্ত দূষিত অগ্নিকে তীক্ষ্ণাগ্নি বলে। তীক্ষ্ণাগ্নি প্রচুর অন্নকে শীঘ্র পরিপাক করে এবং পরিপাকের পরে গলদেশ তালু ও ওষ্ঠের শুষ্কতা ও দাহ উৎপাদন করে। তীক্ষ্ণাগ্নি অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইলে অত্যগ্নি বা ভস্মকাগ্নি বলা যায়। কফদূষিত অগ্নিকে মন্দাগ্নি বলে। এই অগ্নি অল্প পরিমিত অন্ন-কেও যথাকালে পরিপাক করিতে না পারিয়া দীর্ঘকালে পরিপাক করে এবং পেট ও মাথা ভার, কাশ, শ্বাস, থুথু উঠা, বমি ও শরীরের গ্লানি উৎপাদন করে।

এই তিন প্রকার অগ্নিই অনিষ্টকর। তন্মধ্যে তীক্ষ্ণাগ্নি কদাচিৎ দেখা যায়। বিষ-মাগ্নি বা মন্দাগ্নি রোগেই অধিকাংশ বাঙ্গালী ভুগিয়া থাকে। সংগ্রহকারগণের গ্রন্থে অম্লপিত্ত স্বতন্ত্র রোগ,—ইহা স্বতন্ত্র ভাবে লিখিত হইলেও প্রাচীন সংহিতায় উহা অজীর্ণেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। পিত্তজনিত যে বিদগ্ধাজীর্ণ হয় তাহাই অম্লপিত্ত। বিদগ্ধাজীর্ণে ভুক্তদ্রব্য দূষিত পিত্ত কর্তৃক বিদগ্ধ হইয়া অম্লত্ব প্রাপ্ত হয়। এই

জাতীয় অম্লপিত্ত রোগ আজকাল বাঙ্গালা দেশে নিতান্ত প্রবল। সহজে বোধ হয় শতকরা ৭৫ জন এই রোগে পীড়িত।

পূর্ব্বে পিত্ত জনিত তীক্ষ্ণাগ্নির কথা বলা হইয়াছে, উপরে বিদগ্ধাজীর্ণের কথা বলা হইল। সংপ্রাপ্তি ভেদে পিত্ত হইতে এই দুই প্রকার রোগ উৎপন্ন হয়। পিত্তের জলীয়াংশ বৃদ্ধি প্রাপ্ত না হইয়া যদি কেবল তেজাংশ বৰ্দ্ধিত হয়, তাহা হইলে তীক্ষ্ণাগ্নি রোগ জন্মিয়া থাকে। আর যদি পিত্তের জলীয়াংশ বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে উত্তপ্ত জল যেমন অগ্নিকে নির্ব্বাপিত করে, বৰ্দ্ধিত পিত্তও সেইরূপ জঠরাগ্নিকে দুর্ব্বল করিয়া তোলে। ইহাতেই বিদগ্ধাজীর্ণ বা অম্লপিত্ত রোগ জন্মিয়া থাকে।

অজীর্ণ রোগ যে কেবল শরীরকে কালান্তরে (দীর্ঘকালে) প্রাণনাশ করিয়া থাকে তাহা নহে, সময়ে সময়ে সদ্যোমারাত্মকও হইয়া থাকে। কফ জনিত আমাজীর্ণ, বায়ু জনিত বিষ্টব্ধাজীর্ণ এবং পিত্তজনিত বিদগ্ধাজীর্ণ হইতে বিসূচিকা, অলসক এবং বিলম্বিকা রোগ জন্মিয়া থাকে।

এই বিসূচিকা রোগে কুপিত বায়ু শরীরে সূচীবিদ্ধ হওয়ার ন্যায় যন্ত্রণা উপস্থিত করে বলিয়া, ইহা বিসূচিকা নামে খ্যাত। এই রোগে মূর্চ্ছা (সংজ্ঞাহীনতা coma), অতিসার, বমি, পিপাসা, শূলবেধবৎ বেদনা, ভ্রম, উদ্বেষ্টন (খাল ধরা), হাই উঠা, দাহ, দেহের বিবর্ণতা, কম্প, হৃদয়ে বেদনা ও মস্তকে বিদীর্ণ হওয়ার ন্যায় পীড়া হয়। গ্রন্থান্তরে লিখিত হইয়াছে যে, এই রোগে নিদ্রানাশ, অস্থিরতা (Restless), কম্প, মূত্রাঘাত (প্রস্রাব বন্ধ হওয়া) ও সংজ্ঞাহীনতা এই পাঁচটী ভীষণ উপদ্রব ঘটিয়া থাকে। অধুনা এই রোগ কলেরা নামে সুপরিচিত।

অলসক রোগে পেট অত্যন্ত ফুলিয়া উঠে, রোগী যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া কূজন করে (গোঁঙ্গায়), মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে, রুদ্ধ বায়ু হৃদয় কণ্ঠাদি দেশে প্রধাবিত হয়, বায়ু ও মল রুদ্ধ হয় এবং হিক্কা ও উদ্গার হইয়া থাকে। ইহার ডাক্তারী নাম কলেরা-সিক্কা (cholera sicca)। এই রোগে ভেদ-বমি হয় না।

বিলম্বিকা অলসক রোগের প্রকার ভেদ মাত্র। এই রোগে বায়ু ও কফ কর্ত্তৃক দূষিত ভুক্ত দ্রব্য ঊর্দ্ধ বা অধোদিক দিয়া নির্গত হইতে পারে না। শরীর দণ্ডবৎ হইয়া যায় বলিয়া গ্রন্থান্তরে এই রোগকে দণ্ডালসক বলা হইয়াছে।

পূর্ব্বে দুই প্রকার আমদোষের প্রসঙ্গে যে বিসূচিকা ও অলসকের কথা বলা হইয়াছিল তাহা সাধারণ সংজ্ঞা, যেমন অগ্নি। আর এক্ষণে যে বিসূচিকা ও অলসক রোগের বিষয় লিখিত হইল—তাহা বিশেষ সংজ্ঞা, যেমন দাবানল। পাঠকের সন্দেহ নিরাকরণ জন্য ইহা লিখিত হইল। শাস্ত্রে লিখিত হইয়াছে যে অজীর্ণ রোগে বমি, থুথু উঠা, শরীরের অবসন্নতা, ভ্রম, মূর্চ্ছা, প্রলাপ এবং মরণ পর্য্যন্ত ঘটিয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত বিসূচিকা ও অলসক রোগের আরম্ভ বমি প্রভৃতি উপসর্গ যুক্ত; আর শেষোক্ত বিসূচিকা ও অলসক রোগের শেষ —মরণে পর্য্যবসিত।

এতদ্বারা বুঝা যাইতেছে যে. অজীর্ণ বিবিধ রোগের কারণ; অজীর্ণ স্বল্পজীবী হইবার কারণ; অজীর্ণ—সময়ে সদ্যোমরণের কারণ। ইহা ব্যতীত অজীর্ণের আরও একটী বিষময় ফল আছে; সেটী বংশানুক্রমিক অপকর্ষ (Hereditary degeneration)। বিষয়টী স্পষ্ট করিয়া বলা যাইতেছে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, ৫০ বৎসর পূর্ব্বেও

লোকে বহু ভোজন করিতে পারিত এবং অজীর্ণ রোগের এত প্রাদুর্ভাব ছিল না। সে সময়ে শিশুদিগের যকৃৎ সংক্রান্ত পীড়া এত প্রবল ছিল না। এত প্রবল ছিল না বলিলেও ঠিক বলা হইল না—নিতান্ত কম ছিল। অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে শিশুর যকৃৎ রোগ এত প্রবল হইল কেন? দুগ্ধপোষ্য শিশু দোকানের খাবার কিনিয়া খায় না যে, দোকানের খাবারের উপরে এই দোষ আরোপ করা যাইবে। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, বাজারের দুগ্ধই দোষী। কিন্তু গৃহ পালিতা গাভীর দুগ্ধ পান করিয়াও যখন শত শত শিশু যকৃৎ-রোগে আক্রান্ত হইতেছে দেখিতেছি, তখন সে কথা কি করিয়া বলিব? আমাদের বিশ্বাস,—পিতামাতার অজীর্ণ রোগ থাকাই ইহার কারণ। অম্লপিত্ত রোগে পিত্ত দূষিত হইয়া থাকে। পিত্তের সহিত যকৃতের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। আয়ুর্ব্বেদে যকৃৎ বিকৃতিকেই প্রকারান্তরে পিত্ত বিকৃতি বলা হইয়াছে। সুতরাং পিত্ত বিকৃতিবশতঃ যকৃতের বিকৃতি ঘটে। পিতা বা মাতার অথবা পিতামাতা উভয়ের এইরূপ যকৃৎ বিকৃতি ঘটিলে তাহাদের সন্তান যে যকৃৎ রোগগ্রস্ত হইবে তাহাতে আর বিচিত্র কি?

আমরা দিগ্‌দর্শন মাত্র কেবল যকৃৎ রোগের কথা বলিলাম। অজীর্ণ রোগগ্রস্ত পিতামাতার সন্তান কখনই সুস্থ-সবল হইতে পারে না। তাহাদের পরিপাক শক্তি দুর্ব্বল হয় এবং আহারাদি সম্বন্ধে একটু অনিয়ম হইলেই সহজে রোগাক্রান্ত হইয়া পড়ে। বঙ্গদেশের শিশুদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে ইহার সারবত্তা হৃদয়ঙ্গম করা যায়। সুস্থ, সবল, পুষ্টদেহ শিশু কম, অধিকাংশ শিশুই শীর্ণ ও রুগ্ন। এই সকল শিশুর আবার যখন পুত্র-কন্যা হইবে তখন তাহারা আরও দুর্ব্বল, শীর্ণ ও রুগ্ন হইয়া পড়িবে। এইরূপ ক্রমাপকর্ষ ঘটিলে বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যের বর্ত্তমান অবস্থার ভবিষ্যতে যে কি ভীষণ হইবে, তাহা চিন্তা করিতেও অন্তরাত্মা শিহরিয়া উঠে।

পার্ব্বত্য অজগর যেমন আক্রান্ত পশুকে সম্যক বেষ্টন করিয়া ধীরে ধীরে গ্রাস করে, এই ভীষণ অজীর্ণ রোগও সেইরূপ সমগ্র বাঙ্গালী জাতিকে আক্রমণ করিয়া ধীরে ধীরে গ্রাস করিতেছে। বাঙ্গালী এখনও সাবধান হও। এখনও চেষ্টা করিলে এই ভীষণ অজগরের কবল হইতে পরিত্রাণ পাইতে পার, এখনও তোমার ক্ষীণ শরীর পুষ্ট করিবার,—স্বল্প আয়ু দীর্ঘ করিবার, অসুস্থ দেহ সুস্থ করিবার সময় আছে। কিন্তু আর কিছুদিন অবহেলা করিলে আর তোমাদের পরিত্রাণের উপায় থাকিবে না। অজীর্ণ রোগের পরিণাম যে কি ভয়ঙ্কর এবং উহা যে কিরূপে বাঙ্গালী জাতির অস্তিত্ব বিলোপ করিতে উদ্যত হইয়াছে, তাহা আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি। এক্ষণে এই দেশব্যাপী অজীর্ণ রোগ কি কারণে দেশে এত প্রবল হইয়াছে সে সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, ৫০ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালী জাতি প্রচুর আহার করিতে পারিত এবং বাঙ্গালা দেশে এমন অজীর্ণ রোগের প্রাদুর্ভাব ছিল না। এই ৩০ বৎসরের মধ্যে এমন কি পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে যাহাতে অজীর্ণ রোগ এরূপ বিষম প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছে। ইহার কারণ অনেক, সংক্ষেপতঃ:—১। পরিশ্রম হীনতা ও বিলাসিতা। ২। তামাক, সিগারেট ও চায়ের প্রচলন। ৩। কয়লার জ্বালের প্রচলন। ৪। দোকানের খাবারের

প্রচলন। ৫। খাদ্যাভাব। ৬। ভেজাল খাদ্যের প্রচলন। ৭। জীবনসংগ্রামে ও জীবিকা উপার্জ্জনে পশ্চাৎপদতা। ৮। সংযমাভাব। ৯। বিবিধ ব্যাধির প্রাদুর্ভাব ১০। মানসিক বিকৃতি। ১১। ধর্ম্ম হীনতা।

অন্যান্য বিবিধ কারণ পৃথক না লিখিয়া উহাদের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। প্রত্যেকের বিষয় পৃথকভাবে আলোচনা করা যাইতেছে ১। পরিশ্রম হীনতা ও বিলাসিতা। পূর্ব্বে বাঙ্গালীর আচার ব্যবহার যেরূপ ছিল এক্ষণে তাহার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। বাঙ্গালী-জাতি পূর্ব্বাপেক্ষা এখন বিলাসী হইয়া পড়িয়াছে। পূর্ব্বে যে বাঙ্গালী অনায়াসে দুই চারি ক্রোশ পথ চলিত, সেই বাঙ্গালী এখন একক্রোশ বা দুই ক্রোশ পথ চলিতে হইলে রেল, ট্রাম বা সেয়ারের গাড়ীর আশ্রয় গ্রহণ করে। পূর্ব্বে আধমন ত্রিশসের একটা মোট লোকে অকুণ্ঠিত চিত্তে বহিয়া লইয়া যাইত, কিন্তু এখন একটা পাঁচ সের জিনিষ বহিয়া লইয়া যাওয়াও আমরা অপমান বোধ করি। পূর্ব্বে গৃহস্থ মাত্রেরই গৃহ সংলগ্ন একটু ফুলের বাগান বা তরকারীর ক্ষেত ছিল, এবং সেই বাগান বা ক্ষেতের সমস্ত কার্য্য যেমন বেড়া বাঁধা, জমী কোপান, বীজ বা গাছ রোপণ করা, গাছে জল দেওয়া প্রভৃতি সমস্তই গৃহস্থ মাত্রেই নিজে নিজে সম্পন্ন করিত। কিন্তু এখন চাক্‌রীজীবী-বাঙ্গালী তাহাতে অপমান বোধ করে। অথচ সময়ে পয়সা জোটে না যে, মজুর খাটাইয়া বাগানের কার্য্য করান হইবে। কাজেই এখন গৃহস্থের গৃহ সংলগ্ন জমীতে ফুলের বাগান বা তরকারীর ক্ষেত দেখা যায় না। সেগুলি জঙ্গলে পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে।

জগতের অনান্য সভ্য জাতির মধ্যে ব্যায়াম করিবার একটা ধরা বাঁধা প্রথা আছে। কিন্তু বাঙ্গালী জাতির মধ্যে তাহা নাই। যদি কেহ সে নিয়ম পালন করেন, তাহা দুই চারি মাসের জন্য মাত্র।

এদিকে ব্যায়াম করা হয় না, অপর দিকে শ্রমজনক গৃহকার্য্য অপমান জনক বলিয়া পরিত্যাগ করা হইয়াছে ;—তাহার উপর রেল, ট্রাম, গাড়ী প্রভৃতির বাহুল্যবশতঃ হাঁটিতেও বড় হয় না। এরূপ ক্ষেত্রে শ্রমহীনতা বশতঃ অজীর্ণ রোগ যে প্রশ্রয় পাইবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি।

কেবল পুরুষ বলিয়া নহে—মহিলাদিগের মধ্যেও এই দোষ ঘটিতেছে। আজ কাল অবস্থা একটু স্বচ্ছল হইলেই ঝি চাকর বামুন রাখা একটা রোগের মধ্যে দাঁড়াইয়াছে। পূর্ব্বে বিশেষ বড়লোক না হইলে ঝি-চাকর কেহ রাখিত না, বামুন তো (পাচক) বড় লোকেও রাখিত না। যাহাদের চাষ আবাদ ছিল তাহারা কৃষক নিযুক্ত করিত বটে, কিন্তু তাহাতে গৃহলক্ষী দিগের কাজ বাড়িত ভিন্ন কমিত না। কেননা, কৃষক কৃষি কাজ ব্যতীত আর কিছু করিত না। অধিকন্তু তাহাকে আহার, জলখাবার পুর-মহিলাগণকেই দিতে হইত। কিন্তু এখন সে প্রথা উঠিয়া গিয়াছে, কাজেই মহিলাদিগকে পরিশ্রম খুব কমই করিতে হয়। এ অবস্থায় তাহারা যে অজীর্ণ, অম্লপিত্ত এবং তদানুসঙ্গিক বিবিধ রোগে ভুগিবেন, তাহাতে আর কথা কি!

ফল কথা বলিতে গেলে আমরা বাবু হইয়া পড়িয়াছি এবং মহিলাদিগকেও সম্ভবমত বাবু করিয়া তুলিতেছি। বঙ্গদেশে অজীর্ণ রোগের প্রাদুর্ভাবের ইহা একটী প্রধান কারণ।

কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, কৃষক সম্প্রদায়কে তো যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে হয়,—তবে তাহাদের মধ্যে এই রোগ প্রবেশ করিতেছে কেন? কিন্তু আমরা অজীর্ণ রোগের একটি মাত্র কারণ নির্দ্দেশ করি নাই। স্বাস্থ্যের চিরশত্রু বিলাসিতা ধীরে ধীরে সমাজে প্রবেশ করিতেছে একথা বলিয়াছি। শ্রমজীবীলোকেও আজ কাল অনেক স্থলে পরিশ্রম করিতে অনিচ্ছুক; তাহাদিগের অজীর্ণ তাহারই ফল সম্ভূত। বহুদিনের একটি ঘটনা প্রমাণ স্বরূপ উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

কোন সময়ে পূর্ব্ববঙ্গ রেলপথের আড়ংঘাটা ষ্টেশনে এই প্রবন্ধের লেখককে গাড়ীর জন্য অপেক্ষা করিতে হয়। একটী বৃদ্ধ ভদ্রলোক এবং তিন জন মুসলমান শ্রমজীবীও সেই সময় গাড়ীর জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। ভদ্রলোকটী তাহাদের সহিত কথা কহিয়া অবগত হইলেন যে, তাহারা দৈনিক পাঁচ আনা পারিশ্রমিক পায়, সংপ্রতি রাণাঘাট যাইবে। রাণাঘাট, আড়ংঘাটা হইতে ২৷৷০ ক্রোশ দূরবর্ত্তী এবং তখনও গাড়ী আসিবার দুই ঘণ্টা বিলম্ব আছে। বৃদ্ধ ভদ্রলোকটী তাহাদের বলিলেন, বাপু তোমরা তো অনায়াসে হাঁটিয়া যাইতে পার। তবে কেন অকারণ ছয় পয়সা করিয়া ভাড়া দিবে? ঐ পয়সা পেটে খাইলে উপকার হইবে। আমিও বৃদ্ধের উপদেশের সমর্থন করিলাম। শ্রমজীবী কয়জন চলিয়া গেল। কিন্তু তাহারা অন্তরালে ছিল মাত্র; গাড়ী আসিলে গাড়ীতে উঠিল। ধন্য রেলট্রাম; তোমাদের 'মোহিনী শক্তি'। আমরা পেটে না খাইয়া তোমাদের বক্ষে আরোহণের সুখ অনুভব করি।

২। তামাক, সিগারেট ও চায়ের প্রচলন।—তামাক বঙ্গদেশে বহুপূর্ব্বে প্রচলিত ছিল না। সম্রাট আকবরের সময় হইতে আমাদের দেশে উহার প্রচলন হয়। ক্রমে তামাক সেবনের কদভ্যাস পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ন্যায় ভারতেও অতি শীঘ্র প্রচলিত হইয়া পড়ে। তামাক যে অজীর্ণ রোগ জন্মাইয়া থাকে, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ তাহা বহু পরীক্ষার দ্বারা স্থির করিয়াছেন। আমরা যে সময়ের সহিত বর্ত্তমান সময়ের তুলনা করিতেছি, সে সময়েও তামাকের প্রচলন ছিল বটে কিন্তু এত অধিক—বিশেষতঃ সিগারেট-বিড়ি প্রভৃতি আকারে প্রচলিত ছিল না। বিশেষতঃ তখন বহু অনুকূল কারণের সহিত সংগ্রাম করিয়া তামাক একাকী কিছুই করিয়া উঠিতে পারে নাই। এক্ষণে বহু প্রতিকূল কারণের সহিত মিলিয়া তামাক অজীর্ণরোগের প্রাবল্য বৃদ্ধি করিয়া তুলিতেছে।

আমরা অনেক তামাক, চুরুট ও দোক্তাসেবী অজীর্ণ রোগী ও রোগিণীর তামাক-চুরুট-দোক্তা বন্ধ করিয়া রোগ প্রশমিত হইতে দেখিয়াছি। তামাক—নস্য, দোক্তা, গুড়ুক বা চুরুট যে আকারেই ব্যবহৃত হউক—সমান অপকারী। তবে হুঁকায় খাইলে তামাকের ধূম জলের ভিতর দিয়া যায় বলিয়া অনেকটা বিষ জলে মিশিয়া থাকে এবং সেই জন্য কম অপকারী হইয়া থাকে।

চায়ের প্রচলন পূর্ব্বে এ দেশে ছিল না, অল্প দিন হইল চলিতেছে। এই অনাবশ্যক ও অহিতকর পদার্থের প্রচলন যে দেশের মঙ্গলজনক নহে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। উষ্ণ প্রধান দেশে চা পান করিলে অজীর্ণরোগ জন্মিয়া থাকে। শীত প্রধান দেশেও চা অহিতকর বলিয়া বহু পাশ্চাত্য মনস্বী মত

প্রকাশ করিয়াছেন। বঙ্গে চায়ের বহুল প্রচলন অজীর্ণ রোগের অন্যতম কারণ। চা-পায়ী অজীর্ণরোগী চা পান ত্যাগ করিয়া অজীর্ণ রোগ হইতে মুক্ত হইয়াছে—এরূপ প্রমাণ আমরা যথেষ্ট পাইয়াছি।

৩। কয়লার জাল।—সহরে এবং আজ কাল অনেক পল্লিগ্রামে কয়লার প্রচলন হইয়াছে। পূর্ব্বে মাটীর হাড়িতে কাঠের জ্বালে অন্নাদি রন্ধন করা হইত। এক্ষণে ধাতু পাত্রে কয়লায় জ্বালে রন্ধন করা হয়। মৃদু জ্বালে রন্ধন করিলে তাহা যেমন সুসিদ্ধ ও ও সুপাচ্য হয়, প্রখর জ্বালে সেরূপ হয় না। তাহার উপর ধাতু পাত্রের ব্যবহার বশতঃ তাপ অধিক হয় এবং ধাতুর সংসর্গে খাদ্য অল্প বিস্তর দূষিত হইয়া থাকে। বঙ্গে ইহাও অজীর্ণ রোগের প্রাদুর্ভাবের অন্যতম কারণ। যে অজীর্ণ ও অম্লপিত্ত রোগী কয়লার জ্বালে এবং ধাতু পাত্রে সিদ্ধ করা অন্ন ব্যঞ্জন আহার করিয়া থাকেন, তিনি মাটীর হাড়ীতে এবং কাঠের জ্বালে প্রস্তুত অন্ন ব্যঞ্জন আহার করিলে উভয়ের পার্থক্য বুঝিতে পারিবেন।

৪। দোকানের খাবার।—সহরে এবং পল্লিগ্রামে এক্ষণে অসংখ্য খাবারের দোকান হইয়াছে। সহরে মাংসের হোটেলের সংখ্যাও কম নহে। ঐ সকল দোকানের এবং হোটেলের প্রস্তুত খাদ্য দেশে অজীর্ণ রোগের প্রাবল্যের আর একটী কারণ। অনেক অম্লপিত্ত রোগীর মুখে শুনা যায় যে, দোকানের খাবার খাইলেই তাঁহাদের অম্বল হয়, কিন্তু ঘরে প্রস্তুত খাবার খাইলে অসুখ হয় না। দোকানের প্রস্তুত খাদ্য সুলভ মূল্যের নিকৃষ্ট উপকরণে প্রস্তুত হয় এবং প্রস্তুতের সময়ে ও পরে রাস্তার ধুলা ও অন্যান্য পদার্থ মিশ্রিত হওয়ায় সহজেই অপকারী হইয়া পড়ে। এ সম্বন্ধে ইতঃপূর্ব্বে যথেষ্ট আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং এই প্রবন্ধে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

৫। খাদ্যাভাব।—খাদ্যাভাব অজীর্ণরোগের আর একটী প্রধান কারণ। দুগ্ধ, ঘৃত এবং মৎস্য—এই তিনটী দ্রব্যই বাঙ্গালীর প্রধান খাদ্য ছিল। কিন্তু এক্ষণে দুগ্ধাদি নিতান্ত দুর্ম্মূল্য হইয়া উঠিয়াছে। ধনবান ভিন্ন ঐ সকল দ্রব্য আহার করা অন্য কাহারও ভাগ্যে বড় একটা ঘটিয়া উঠে না। যে গৃহস্থ পরিবারে ১০।১২টী লোক আছে—তাহাদের বাড়ীতে জোর ২।৩ পয়সার ঘৃত তরকারীতে দেওয়া হইয়া থাকে। তাহাতে বোধ হয় প্রত্যেকের এক বেলায় এক ফোঁটা করিয়া ঘৃত উদরস্থ হয়। মৎস্য সম্বন্ধেও প্রায় সেইরূপ। এইরূপ অবস্থাহীন একটি পরিবারের মধ্যে প্রত্যহ এক পোয়ার অধিক মৎস্য ক্রয় করা হয় না। কাজেই ঐ এক পোয়া মৎস্য মেছুনীর বাটখারা, আঁইস এবং কাঁটা মুক্ত হইয়া আধ পোয়ার অধিক দাঁড়ায় না। আধপোয়া বা দশ তোলা মৎস্য দশ জনে দুই বেলা খাইলে এক বেলায় এক জনের আধ তোলা মৎস্য উদরস্থ হয়। তা'রপর দুগ্ধ,—শিশুদিগকে উদর পূর্ণ করিয়া দুগ্ধ দিতে এক্ষণে অনেক গৃহস্থেরই শক্তি নাই। তার উপর বৃদ্ধ বৃদ্ধা থাকিলে তাহাদের একটু দেওয়া আবশ্যক। সুতরাং বয়স্কদিগের ভাগ্যে দুগ্ধ বড় একটা জুটিয়া উঠে না।

কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, অতিরিক্ত আহার বশতঃই অজীর্ণ হয়, আহার অল্প হইলে অজীর্ণ হইবে কেন? কিন্তু অগ্নি উপযুক্ত ইন্ধন না হইলে যেমন প্রজ্জলিত থাকিতে পারেনা, সেইরূপ জঠরাগ্নি উপযুক্ত খাদ্য না পাইলে প্রবল থাকিতে পারে না।

দুর্ভিক্ষের সময় ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। দুর্ভিক্ষ পীড়িত নর-নারী কয়েক দিন অনশন অথবা যৎসামান্য আহার করিয়া জীবন রক্ষা করিবার পর যদি সহসা অতিরিক্ত আহার করে, তাহা হইলে অসুস্থ হইয়া মৃত্যু মুখে পতিত হয়। ইহার কারণ এই যে, অল্পাহারে বা অনাহারে থাকিয়া তাহাদের জঠরাগ্নি নির্ব্বাপিত প্রায় হইয়া গিয়াছিল। এরূপ অবস্থায় সহসা প্রচুর আহার সেই নির্ব্বাপিত প্রায় অগ্নি পরিপাক করিতে অসমর্থ হইয়া থাকে। শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে যে, হীন মাত্রায় আহার করিলে তাহা বল ও পুষ্টির হানি করে এবং নানা প্রকার বায়ু রোগ উৎপন্ন করে। কাজেই হীন মাত্রায় আহারের ফলে বল ও পুষ্টিহানি ঘটার পর অতিমাত্রায় আহার জন্য যে অসুস্থ হইতে হইবে, তাহাতে আর কথা কি?

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, উপযুক্ত ইন্ধন না পাইলে যেমন অগ্নি প্রজ্বলিত থাকিতে পারেনা, সেইরূপ উপযুক্ত ইন্ধন না পাইলে জঠরাগ্নি প্রবল থাকিতে পারে না এস্থলে উপযুক্ত শব্দের অর্থ কি? অগ্নিতে শুষ্ক কাষ্ঠ, ঘৃত প্রভৃতি দিলে উহা জ্বলিতে থাকে, কিন্তু আর্দ্র কাষ্ঠ, ধূলা, বালি দিলে জ্বলে না, নিবিয়া যায়,—সুতরাং ঘৃত ও শুষ্ক কাষ্ঠাদিই অগ্নির উপযুক্ত ইন্ধন। জঠরাগ্নির ইন্ধনও সেইরূপ উপযুক্ত হওয়া আবশ্যক। শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে যে, হিতকর অন্নপান রূপ সমিধের দ্বারা নিত্য সমাহিত চিত্তে মাত্রা ও কাল বিচার করিয়া অন্তরাগ্নিতে হোম করিবে। হায়! সমিধ ও হবির অভাবে আমাদের হোমাগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়াছে। অন্তরাগ্নিও কি সেইরূপ সমিধ ও হবির অভাবে নির্ব্বাপিত হইবে?

খাদ্যের অভাব ঘটায় উপযুক্ত খাদ্য এক্ষণে বাঙ্গালী জাতির উদরস্থ হয় না। চাউল বাঙ্গালীর প্রধান খাদ্য। উহা ঘৃত, মৎস্য, মাংস ও দুগ্ধের সহিত সংযুক্ত হইলে উপযুক্ত খাদ্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে, কিন্তু কেবল চাউল উপযুক্ত খাদ্য নহে। পাশ্চাত্য দেশীয় মনস্বিগণও ইহা স্বীকার করিয়া থাকেন। ঘৃত ও মৎসাদির অভাবে বাঙ্গালী জাতি এক্ষণে শাক ও অন্ন আহার করিয়া থাকে। এইরূপ অনুপযুক্ত আহার জঠরাগ্নির উপযুক্ত ইন্ধন নহে। সুতরাং বাঙ্গালীর জঠরাগ্নি প্রজ্জ্বলিত থাকিবে কিরূপে। দুঃখের বিষয় এই যে, এক্ষণে শুধু শাকও অনেকের জুটেনা। তরি-তরকারী যেরূপ দুর্ম্মূল্য, তাহাতে অল্প লোকেই যথেষ্ট তরি তরকারী কিনিয়া খাইতে পারে। অপরং বা কিং ভবিষ্যতি।

বাঙ্গালী জাতির আর দুই প্রকার খাদ্যের উল্লেখ করা কর্ত্তব্য। দাল এবং ফল। দাল বেশ পুষ্টিকর, প্রায় মাংসের সমতুল্য। অধিকাংশ দরিদ্র পশ্চিম দেশবাসীর চানা ও রহরকি দাল প্রিয় এবং প্রবল খাদ্য। কিন্তু পশ্চিম দেশের ন্যায় বঙ্গদেশে দালের প্রচলন নাই এবং উহাদিগের ন্যায় দাল হজম করিতে বাঙ্গালী অক্ষম। বাঙ্গালায় দালের ব্যবহারও অল্প এবং যেরূপ ভাবে রাঁধিয়া আহার করা হয়, তাহাতে যৎসামান্য দালই উদরস্থ হইয়া থাকে। সুতরাং দালের দ্বারা বাঙ্গালীর খাদ্যাভাবের প্রয়োজনীয়তা পূর্ণ করা হয় না।

ফল বাঙ্গালায় প্রচুর জন্মিত এবং এখনও অনেক জন্মে। ফল সুখাদ্য হইলেও উহার সকল গুলিতে পুষ্টিকর পদার্থ বিশেষ কিছু নাই। বাদাম, পেস্তা প্রভৃতি ফল যথেষ্ট পুষ্টিকর বটে; কিন্তু উহা এদেশে জন্মেনা

এবং যেরূপ মূল্যে এদেশে বিক্রীত হয়, তাহাতে ধনবান্ ব্যতীত অপরের ক্রয় করিয়া আহার করা ও সম্ভব নহে। সুতরাং ফলের দ্বারা বাঙ্গালীর আহারাভাবের কিছু প্রতিকার হয় না। তবে মন্দের ভাল যে, এই দুর্ভিক্ষ পীড়িত দেশে আমের সময় রসালের আস্বাদনে অনেক দরিদ্রের জঠর জ্বালার অনেকটা নিবৃত্তি ঘটে।

বর্ত্তমানে কিরূপ শোচনায় খাদ্যাভাব ঘটিয়াছে, তাহা দেখান হইল। এই খাদ্যাভাবই দেশব্যাপী অজীর্ণ রোগের একটী কারণ। যাহা হউক এক্ষণে দেখা যাউক পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে দেশের অবস্থা কিরূপ ছিল ? কারণ সে সময়ে দেশে অজীর্ণ রোগের প্রাদুর্ভাব ছিল না।

পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে এমন গৃহস্থ কম ছিল, যাহাদের দুই তিনটী বা তদধিক গাভী ছিলনা। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা প্রয়োজন মত দুগ্ধ খাইতে পাইত। গৃহিণীরা দুগ্ধ হইতে মাখন, ঘৃত এবং বিবিধ সুখাদ্য প্রস্তুত করিতেন। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে কাহাকেও ঘৃতহীন ভোজন করিতে হইত না। গব্য ঘৃত বঙ্গের সর্ব্বত্রই পাওয়া যাইত এবং মূল্যও সুলভ ছিল। এই সময়ে টাকায় দেড় সের হইতে দুই সের ঘৃত বাজারে বিক্রীত হইত। এখন পল্লিগ্রামেও সহজে ঘৃত পাওয়া যায় না এবং মূল্য ও ৫ গুণ অধিক দাঁড়াইয়াছে। কার্য্যোপলক্ষে আমি বর্দ্ধমান, হুগলী, নদীয়া, যশোহর এবং ২৪ পরগণা জেলার বহু পল্লিগ্রামে ভ্রমণ করিয়াছি। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে যেখানে নিমন্ত্রিত বা অতিথি হইতাম, সেখানে গৃহস্থ নিজগৃহ হইতেই প্রচুর দুগ্ধ-ঘৃত দিতে পারিত। এখন সেই সকল পল্লিগ্রামে গৃহস্থ নিজ গৃহ হইতে দুগ্ধ-ঘৃত দিতে তো পারেই না, অধিকন্ত পাড়ায় ঘুরিয়া হয়ত সামান্য মাত্র সংগ্রহ করিতে পারে; কখন বা তাহাও পারে না।

মৎস্যও পূর্ব্বে দেশে বেশ সুলভ ছিল। বঙ্গদেশে খানা, ডোবা, খাল, বিল ও নদী প্রচুর। পূর্ব্বে ঐ গুলিতে জল থাকিত এবং জলে প্রচুর মৎস্য থাকিত। ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল পর্য্যন্ত সকলের ঘরে জাল ছিল। স্নান করিতে যাইবার সময় প্রায় প্রত্যেক গৃহস্থেরই কোন না কোন ব্যক্তি জাল, খালুই (মাছ রাখিবার পাত্র) লইয়া বাহির হইত এবং খাল-বিল বা পুষ্করিণীতে জাল ফেলিয়া খালুইটী পূর্ণ করিত। পরে স্নান করিয়া ফিরিয়া আসিত। সর্ব্বত্রই যে এইরূপ উপায়ে মৎস্য সংগৃহীত হইত তাহা নহে, কিন্তু আমি অনেক স্থলে এইরূপ দেখিয়াছি। মৎস্য তখন এত প্রচুর জন্মিত যে, ভদ্রঘরের বালিকা, যুবতী এবং প্রৌঢ়া স্ত্রীলোকগণের অনেকেও স্নান করিতে গিয়া মৎস্য দেখিয়া ধরিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিত না,—কাপড় ছাঁকা দিয়া প্রচুর মৎস্য ধরিয়া আনিত। এখন খাল, বিল, ডোবায় আর জল থাকে না, জলে আর তত মাছ থাকে না, গৃহস্থের ঘরে আর জাল থাকে না।

মৎস্য পূর্ব্বে এত প্রচুর ও সুলভ ছিল যে, যাহাদের ধরিয়া লইবার সুবিধা ঘটিত না, তাহারা স্বল্প মূল্যে অনায়াসেই উহা ক্রয় করিতে পারিত। এখন এত দুষ্প্রাপ্য এবং দুর্ম্মূল্য হইয়াছে যে, উপযুক্ত পরিমাণ মৎস্য ক্রয় করিবার সাধ্য অধিকাংশ গৃহস্থেরই নাই।

দিগদর্শন স্বরূপ আমরা কয়েকটী খাদ্যের বিষয় আলোচনা করিলাম। তাহা ব্যতীত অন্যান্য সর্ব্ব প্রকার খাদ্যই এখন দুষ্প্রাপ্য এবং দুর্ম্মূল্য হইয়া পড়িয়াছে। ফলে বাঙ্গালী জাতি আর উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্য সংগ্রহ করিতে পারে

না। বাঙ্গালী এখন পেট ভরিয়া খাইতে পায় না। অপকৃষ্ট খাদ্য হীন মাত্রায় খাইয়া জঠর জ্বালা নিবৃত্তি করে মাত্র। এই সকলই বঙ্গে অজীর্ণ রোগের প্রাদুর্ভাবের প্রধান কারণ। আগামীবারে এ সম্বন্ধে আমরা আরও বিস্তৃত আলোচনা করিব।

শ্রী—

স্বাস্থ্যরক্ষায় ভোজন বিধি।

সুস্থ, সবল ও নিরোগী হইয়া দীর্ঘায়ু লাভ করিতে হইলে আমাদিগের নিত্য আহার্য্য বস্তু গুলির গুণ, মাত্রা, সংযোগ, বিরুদ্ধ ক্রিয়া, ভোজনের কালাকাল, গুরু-লঘুপাক প্রভৃতির বিষয় বিশেষরূপে জ্ঞাত থাকা আবশ্যক। নিত্য আহার্য্য দ্রব্যের সহিত শরীরের অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ। আমরা অনভিজ্ঞতা বশতঃ কত প্রকার অহিত জনক, অপকৃষ্ট, সংযোগ বিরুদ্ধ পান-ভোজন দ্বারা স্বাস্থ্য হারাইয়া চিররুগ্ন হইতেছি, তাহার ইয়ত্তা নাই। সেইজন্য বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা নিত্য আহার্য্য দ্রব্যগুলির গুণাগুণ, সংযোগ, বিরুদ্ধ ক্রিয়া, দ্রব্যের গুরু-লঘুপাক, মাত্রা, কালাকাল, কোন্ ঋতুতে কোন্ দ্রব্য হিত-জনক ইত্যাদি আবশ্যকীয় বিষয় গুলির আলোচনা করিব।

আহার্য্য দ্রব্য ছয় প্রকার—চূষ্য, পেয়, লেহ্য, ভোজ্য, ভক্ষ্য ও চর্ব্ব্য। ইহাদিগের মধ্যে চূষ্য হইতে পেয়, পেয় হইতে লেহ্য, লেহ্য হইতে ভোজ্য, ভোজ্য হইতে ভক্ষ্য, ভক্ষ্য হইতে চর্ব্ব্য দ্রব্য গুরু পাক।

চূষ্য—ইক্ষু, দাড়িম প্রভৃতি। পেয়—চিনি মিশ্রির সরবত প্রভৃতি। লেহ্য—রসালা অর্থাৎ কাঠাল প্রভৃতির রসাস্বাদন। ভোজ্য—অন্ন-ব্যঞ্জনাদি, ভক্ষ্য—লাড়ু, মোয়া প্রভৃতি। চর্ব্ব—চিপিটক (চিড়া) প্রভৃতি।

ভোজনের পূর্ব্বে হস্ত-মুখ-পদদ্বয় উত্তমরূপে ধৌত এবং দন্ত ও জিহ্বা পরিষ্কৃত করিবে। উপবেশনের জন্য কাষ্ঠ আসন (পীড়া) অপেক্ষা কম্বল ও গালিচার আসন প্রশস্ত ও সুখজনক। সুখজনক আসনে অঙ্গাদি বিকৃত ভাবাপন্ন না করিয়া সরলভাবে উপবেশন পূর্ব্বক ভোজ্য দ্রব্যাদি পরীক্ষা করিয়া ভোজনে প্রবৃত্ত হইবে। ভোজন সময়ে শ্রুতিমধুর সুখজনক গল্প শ্রবণ করিতে করিতে ভোজন করা উচিত।

প্রত্যহ ভোজনের প্রাক্কালে সামান্য কয়েক টুকরা আদা সৈন্ধবলবণ সহযোগে সেবন করিবে। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে এ সম্বন্ধে উক্ত আছে—

"ভোজনাগ্রে সদাপথ্যং লবণাদ্রক ভক্ষণম্।
অগ্নি সন্দীপনং রুচ্যং জিহ্বা কণ্ঠ বিশোধনম্॥"

ভোজনের পূর্ব্বে লবণ (সৈন্ধবলবণ) সংযুক্ত আদ্রক ভক্ষণ হিতজনক, অগ্নির উদ্দীপক, রুচি জনক, জিহ্বা ও কণ্ঠের শোধক।

আদ্রকের সহিত লবণ খাওয়ার যে উল্লেখ আছে, তাহা সৈন্ধব লবণ বুঝিতে হইবে। কড়কচ এবং বিলাতি লবণ নহে। আয়ুর্ব্বেদের

পারিভাষিক শব্দানুসারে লবণ স্থানে সৈন্ধব লবণ প্রযুক্ত। এই প্রকার আরও বহু শব্দ আছে যেমন, গুড় বলিতে ইক্ষু গুড়, চন্দন বলিতে রক্তচন্দন ইত্যাদি। সৈন্ধব লবণ ত্রিদোষঘ্ন, ঈষৎ মধুর, অগ্নিদীপক, পাচক, লঘু, স্নিগ্ধ রুচিজনক, শীতবীর্য্য শুক্রজনক, চক্ষুর হিতকারক। এজন্য ভোজনে সৈন্ধব লবণই প্রশস্ত। পঞ্চ লবণের মধ্যে সৈন্ধব লবণ সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

আদ্রকের গুণ—মলভেদক, গুরু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক, কটু রস (ঝাল) মধুর, সূক্ষ্মস্রোতানুগামী, বায়ু ও কফনাশক। আদ্রক ও সৈন্ধব—এই দুইটী দ্রব্যের সংযোগে পিত্তের প্রকোপ হয় না, ও ক্ষুধা বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

গুরু দ্রব্য।—গুরু দ্রব্য তিন প্রকার,—

মাত্রা গুরু—(অতিরিক্ত মাত্রায় সেবন)

স্বভাব গুরু (দ্রব্যের স্বাভাবিক গুরুত্ব গুণযুক্ত—যাহা বিলম্বে পরিপাক হয়) পলান্ন, পেঁয়াজ, মাংস ইত্যাদি।

সংস্কার গুরু—নানাবিধ দ্রব্য ও গরম মসল্লাদি সংযোগে প্রস্তুত। এই ত্রিবিধ গুরুদ্রব্যই মন্দাগ্নি ব্যক্তি কখনই সেবন করিবে না ফল-মূলাদি আহার করিতে হইলে অন্ন আহারের অন্ততঃ এক ঘণ্টা পূর্ব্বে করিবে। অনেকের অভ্যাস আছে, ভাতের পাতে লুচি, রুটি ভোজন করিয়া থাকেন, কিন্তু আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে ইহা নিষিদ্ধ।

"গুরু পিষ্টময়ং দ্রব্যং তণ্ডুলান্ পৃথকানপি।
ন জাতু ভুক্তবান্ খাদেন্মাত্রাং খাদে দ্বুভুক্ষিতঃ॥

গুরু দ্রব্য, পিষ্টময় দ্রব্য (লুচি প্রভৃতি) তণ্ডুল ও চিপিটক (চিড়া) এই সকল দ্রব্য ভুক্ত ব্যক্তি কখনই ভোজন করিবেনা। ভুক্ত ব্যক্তি অর্থে এ স্থলে ভোজন শেষে অথবা ভোজনের অব্যবহিত পরে বুঝাইবে। তবে আবশ্যক হইলে ঐ সকল দ্রব্য অতি অল্প মাত্রায় ভক্ষণ করিতে পারা যায়।

ভোজনের সময়—ভোজনের উপযুক্ত সময় অতীত করিয়া ভোজন করিলে বায়ু কর্তৃক জঠরাগ্নি উপহত হইয়া ভুক্ত দ্রব্য অতিকষ্টে পরিপাক করে এবং পুনর্ব্বার ভোজনে অভিলাষ থাকে না। এজন্য ভোজনের নির্দ্দিষ্ট সময় অতীত করিয়া ভোজন করিবে না। এস্থলে বলা আবশ্যক, যাহার চির অভ্যাস বশতঃ যে সময় ভোজন কাল নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহার পক্ষে সেই সময়ই উপযুক্ত কাল জানিবেন।

পাকস্থলীর চারি অংশের দুই অংশ ভোজ্য দ্রব্যের দ্বারা পূর্ণ করিবে, এক অংশ পাণীয় দ্বারা পূর্ণ করিবে, অবশিষ্ট এক অংশ বায়ু সঞ্চালনের নিমিত্ত শূন্য রাখিবে, আকণ্ঠ পুরিয়া কখনও ভোজন করিবে না। এস্থলে আমাদিগের দেশ-প্রথানুসারে বহুস্থানে দেখিতে পাওয়া যায়,—নিমন্ত্রণের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ কর্ত্তার আগ্রহাতিশয্যে ভোজন কর্ত্তার মাত্রাতিরিক্ত ভোজন করিতে হয়। ইহাতে দুইটি বিষয়ে বিশেষ ক্ষতি হইয়া থাকে, কর্ত্তার দ্রব্যের অপচয় এবং ভোক্তার স্বাস্থ্য হানি; এমন কি, ইহাতে কোন কোন স্থলে ভোক্তার বিসূচিকা, উদরাময়, উদরাধ্মান পর্য্যন্ত জন্মিয়া মৃত্যুও হইতে পারে। এমত স্থলে নিমন্ত্রিত কর্ত্তা ও ভোক্তা—উভয়েরই বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন কর্ত্তব্য। একটী প্রবাদ বাক্য আছে "আপ রুচি খানা পর্ রুচি পর্‌না",—সকলেরই স্মরণ রাখা উচিত, এক কথাটির মূল্য আছে।

ভোজনের সময় জল পান— অধিক জলপান করিলে ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক হয় না, এবং একবারে জলপান না করিলেও পরিপাক হয় না. এস্থলে আয়ুর্ব্বেদে উক্ত আছে "অত্যম্বু পানান্ন বিপচ্যতেঽন্ন মনম্বু পানাচ্চ স এব দোষঃ।
তস্মান্নরো বহ্নি বিবর্দ্ধনায় মুহুর্মুহুর্বারি পিবেদ ভুরি॥ (ভাব প্রকাশ)।

অতএব একেবারে জলপান না করা এবং অতি জলপান করা—কোনটাই সঙ্গত নহে।

বিষমাশন।—ভোজনের সময় অধিক মাত্রায় আহার কিম্বা অসময়ে অধিক বা অল্প আহার করিলে তাহাকে বিষমাশন বলে। ইহা স্বাস্থ্যের পক্ষে অতিশয় অহিতকর। আবার ক্ষুধার উপযুক্তরূপ অন্ন ভোজন না করিলে শরীর কৃশ ও দুর্ব্বল হইয়া থাকে।

অকাল ভোজন—ক্ষুধা উপস্থিত না হইতে আহার করিলে, বলহানি, শিরোরোগ, বিসূচিকা, অলসক ও বিলম্বিকা রোগ জন্মে। ঐ সকল রোগ কালে বর্দ্ধিত হইয়া মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটাইতে পারে।

কিরূপ অন্ন ভোজন করা উচিত?—যে অন্ন মনের প্রফুল্লতাজনক, বল ও পুষ্টি-কারক, ও পরমায়ুবর্দ্ধক—এরূপ অন্ন ভোজনের উপযুক্ত। অতিশয় উষ্ণ অন্ন বলনাশক, অতি শীতল ও শুষ্ক অন্ন দুষ্পাচ্য, অতিশয় ক্লিন্ন অন্ন (নরম ভাত) বিস্বাদকর। নাতি উষ্ণ, নাতি শীতল, নাতি কঠিন, নাতি দ্রব অন্ন ভোজনই প্রশস্ত। অন্নের মাড় পরিত্যাগ না করিয়া যে অন্ন—মাড়ের সহিত মিশ্রিত থাকিয়া প্রস্তুত হয়—তাহা অত্যন্ত বলকারী। সিদ্ধ চাউলের অন্ন অপেক্ষা আতপান্ন বলকারী।

আহারের নিয়ম— অতিশয় দ্রুত আহার করিবে না, ভক্ষ্য বস্তু উত্তমরূপে চর্ব্বণ করিয়া উদরস্থ করিবে।

ভক্ষ্য বস্তু উত্তমরূপে চর্ব্বণ না করিয়া ভোজন করিলে অজীর্ণ ও অম্ল-পিত্ত রোগাক্রান্ত হইতে হয়। অতি বিলম্বেও আহার করিবে না, তাহাতে প্রস্তুতিকৃত আহার্য্য সামগ্রী অতিশয় শীতল হইয়া পরিপাক শক্তির হ্রাস হয়।

ঋতু অনুযায়ী আহার—শীত কালে, ও হেমন্ত-শিশির ঋতুতে এবং বর্ষাকালে—অম্ল, মধুর ও লবণ রসযুক্ত, বসন্ত কালে—কটু, (ঝাল) তিক্ত, এবং কষায় রসযুক্ত, গ্রীষ্ম কালে মধুর রসযুক্ত শরৎ কালে—মধুর, তিক্ত এবং কষায় রস সংযুক্ত অন্ন-পানীয় সেবন করিবে।

শরৎ ও বসন্ত কালে রুক্ষ্ম দ্রব্য এবং হেমন্ত, শিশির, গ্রীষ্ম ও বর্ষা কালে স্নিগ্ধ দ্রব্য সেবন করিবে।

গ্রীষ্ম ও শরৎ কালে শীতল দ্রব্য, তদ্ভিন্ন অন্যান্য ঋতুতে (হেমন্ত শিশির, বসন্ত ও বর্ষা) উষ্ণ গুণ যুক্ত দ্রব্য সেবন বিধি। মধুরাদি করিয়া ছয়টী রস—(মধুর, অম্ল, কটু, তিক্ত, কষায়, লবণ) সকল ঋতুতেই সেবন করিবে, তন্মধ্যে যে সকল ঋতুতে যে যে রসের সেবন বিশেষ করিয়া বলা হইল—সেই সেই রস অধিক মাত্রায় সেবন করা কর্ত্তব্য।

ঋতু ভেদে সেবন বিধি—বর্ষাকালে বায়ু কুপিত হয়, এজন্য বর্ষাকালে বায়ু প্রশমিত পান, আহার করিবে। মধুর, অম্ল ও লবণ রস বায়ু প্রশমক।—শরীর গ্লানি যুক্ত হয় বলিয়া এই ঋতুতে কটু (ঝাল) তিক্ত ও কষায় রস যুক্ত দ্রব্য বিশেষ রূপে সেবন করিতে হয়।

স্বেদকর দ্রব্য সেবন—যে বস্তু ভোজনে ও যেরূপ ব্যায়ামে ঘর্ম্ম নির্গত হয়,

সেই সকল দ্রব্যও দধি, উষ্ণ দ্রব্য, জাঙ্গল মাংস, গোধূম, তণ্ডুলের অন্ন, মাষ কলায়ের যূষ, কূপ জল—প্রভৃতি সেবন বিধি।

বর্ষাকালে বর্জ্জনীয় বিধি।—পূর্ব্বদিক হইতে প্রবাহিত বায়ু, বৃষ্টি- রৌদ্র, হিম, অতি পরিশ্রম, নদীতীরে ভ্রমণ, দিবানিদ্রা, রুক্ষদ্রব্য সেবন; নিত্য মৈথুন স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য এইগুলি বর্ষাকালে বর্জ্জনীয়।

বর্ষার অবসানে হিতজনক বিধি।—ঘৃত, মধুর দ্রব্য, কষায় ও তিক্ত রস সংযুক্ত দ্রব্য, লঘু দ্রব্য, দুগ্ধ, ইক্ষু-বিকার (ইক্ষু চিনি গুড়) লবণ, অল্প পরিমাণে জাঙ্গল মাংস, গোধূম, যব, মুগ, শালিতণ্ডুল, কর্পূর, চন্দন, রাত্রির প্রথম ভাগের চন্দ্র কিরণ, মাল্য ধারণ, অল্প ব্যায়াম, সরোবরে জল ক্রীড়া, এবং পিত্তাধিক্য ব্যক্তির বিরেচন—বর্ষা অন্তে প্রশস্ত ব্যবস্থা।

বর্ষার অবসানে বর্জ্জনীয় বিষয়।—দধি, অতিরিক্ত ব্যায়াম, অম্ল দ্রব্য, কটু দ্রব্য (ঝাল) উষ্ণ দ্রব্য, তাক্ষ দ্রব্য, দিবা নিদ্রা, হিম, রৌদ্র সেবন—এ গুলি বর্ষা ঋতুর অবসানে আদৌ কর্ত্তব্য নহে।

শরৎ কালে সেবন বিধি।—ইক্ষু বিকার (গুড় চিনি) শালিতণ্ডুল, মুগ, সরোবরের জল, দুগ্ধ, সন্ধ্যাকালের চন্দ্র কিরণ হিতজনক।

শিশির কালে (শীত কালে) হেমন্ত কাল অপেক্ষা অধিক শীত হয়, এজন্য আদান কালের স্বভাব জনিত শরীর বিশেষ রক্ষ হয়, অতএব এইকালে হেমন্ত কালের নিয়ম সকল পালন করাই প্রশস্ত ব্যবস্থা।

হেমন্ত কালের বিধি।—প্রাতে বেলা এক প্রহরের মধ্যে ভোজন, অম্ল দ্রব্য, মধুর দ্রব্য, লবণ রস সংযুক্ত দ্রব্য, তৈল মর্দ্দন রৌদ্র সেবন, ব্যায়াম, গোধূম, ইক্ষুবিকার, শালিতণ্ডুল, মাষকলাই, মাংস, পিষ্টান্ন, নূতন তণ্ডুলের অন্ন, তিল, মৃগনাভি (কস্তুরী) কুঙ্কুম, অগুরু, শৌচাদি কার্য্যে গরম জল ব্যবহার, স্নিগ্ধ দ্রব্য, স্ত্রী সংসর্গ, মোটা এবং গরম পশমাদি নির্ম্মিত বস্ত্র ইত্যাদি ব্যবহার করিবে।

বসন্তে ব্যবস্থা।—বমন, নস্যগ্রহণ, মধুর সহিত হরীতকী সেবন, ব্যায়াম, উদ্বর্ত্তন, জাঙ্গল মাংস, গোধূম প্রভৃতি কফ নাশক দ্রব্য ব্যবহার, শালি তণ্ডুলের অন্ন, মুগ, যব, চন্দন, কুঙ্কুম, অগুরু প্রভৃতি গাত্রে অনুলেপন, রুক্ষ, কটু, উষ্ণ এবং লঘু দ্রব্য ভোজন এই ঋতুতে হিতজনক।

বসন্ত কালে বর্জ্জন বিধি।—অম্ল দ্রব্য, দধি, স্নিগ্ধদ্রব্য (যাহাতে কফ বৃদ্ধি হয়) দুষ্পাচ্য দ্রব্য ভোজন, দিবানিদ্রা, হিম সেবন বসন্তকালে সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়।

গ্রীষ্ম ঋতুর বিধি—মধুর দ্রব্য, স্নিগ্ধদ্রব্য, শীতল ও লঘু দ্রব্য, রসালা (কাঁঠাল) চিনি, শক্তু (ছাতু) দুগ্ধ, চিনির সহিত খরমুজা, শালি তণ্ডুল, মাংস রস প্রভৃতি আহার, কর্পূর ও চন্দনাদির অনুলেপন, শীতল জল পান, এই ঋতুতে হিতকর। কটু দ্রব্য (ঝাল) ক্ষার দ্রব্য, অম্লদ্রব্য, রৌদ্র ও অতিরিক্ত পরিশ্রম এই সময়ে একেবারেই বর্জ্জন করিবে।

এই প্রসঙ্গে আমরা ভোজনান্তর ক্রিয়াগুলির কথা বলিয়া অদ্যকার বক্তব্য শেষ করিব। ভোজন অন্তে উত্তমরূপে আচমন করিতে হয়—ইহাই শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থা কিন্তু আজকাল অনেকে তুলিয়া দিয়াছেন। আচমনের ফলে জিহ্বা ও দন্তমূল পরিষ্কৃত হয়, এই জন্যই আচমনের ব্যবস্থা। শুধু তাহাই নহে, খড়িকা

দ্বারা দন্তমূল পরিষ্কৃত করাও আবশ্যক, নতুবা দন্ত সংযোগ স্থলে আহার্য্য দ্রব্যের কণিকা থাকায় উহা পচিয়া মুখে দুর্গন্ধ হয় এবং ক্রমশঃ দন্ত বেষ্টিত মাংস শিথিল হইয়া—দন্তমূল ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, এখনকার দিনে অনেকেরই অতি শীঘ্র যে দন্তরোগ জন্মিয়া থাকে এবং উহার পরিণামে দন্তোৎপাটন পূর্ব্বক কৃত্রিম দন্ত ব্যবহারের প্রয়োজন হয়—আচমনের অভাবই তাহার কারণ। আচমনের শেষে জল সিক্ত হস্ত দ্বারা ৩।৪ বার চক্ষু মার্জ্জনা করিবে, ইহাতে চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি সতেজ থাকে, এবং তিমির রোগ নষ্ট হয়। আয়ুর্ব্বেদে উক্ত আছে—

আচম্য জলবুক্তাভ্যাং পাণিভ্যাং চক্ষুষী স্পৃষেৎ।
ভুক্ত্বাপাণি তল ঘৃষ্ট্বা চক্ষুষো যদি দীয়তে।
অচিরেনৈবতদ্বারি তিমিরাণি ব্যপোহতি॥

(ভাব প্রকাশঃ)

তাম্বূল (পান) সেবন বা (মুখশুদ্ধি) আচমনের পর কর্ত্তব্য। কটু, তিক্ত, কষায়-বিশেষ ফল, হরীতকী, গুপারি, লবঙ্গ, জাতিফল প্রভৃতি দ্বারা, অথবা কর্পূর, কস্তুরী সুগন্ধি দ্রব্য মিশ্রিত তাম্বূলের দ্বারা মুখশুদ্ধি করিবে। কিন্তু অতিরিক্ত তাম্বূল সেবন অতিশয় অবৈধ, ইহার ফলে অকালে দন্ত সকল তো নষ্ট হইয়া থাকেই, অজীর্ণ রোগও ইহার ফলে জন্মিয়া থাকে। তাহার পর, আমরা যে তাম্বূল সেবন করি, তাহাও বিবেচনা পূর্ব্বক ব্যবহার কর্ত্তব্য। শাস্ত্রকার তাম্বূলের গুণ ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন,—তাম্বূল তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, রুচিকারক, মলসারক, ক্ষার সংযুক্ত তিক্ত ও কটু রস বিশিষ্ট, কামোদ্দীপক, রক্তপিত্তজনক, লঘু, বশ্যতাজনক, কফঘ্ন, মুখের দুর্গন্ধ ও মলনাশক, বাতঘ্ন, শ্রমপনোদক, মুখের বিশুদ্ধকারক, কান্তিজনক, হনু (চোয়াল) ও দন্তগত মল নাশক, রসনেন্দ্রিয় শোধক, মুখস্রাব ও গল রোগনাশক। কিন্তু নূতন তাম্বূল—ঈষৎ কষায় সংযুক্ত, মধুর রস, গুরু, কফকারক। বঙ্গদেশজাত তাম্বূল অত্যন্ত কটুরস (ঝাল) যুক্ত সারক, পাচক, পিত্ত বর্দ্ধক, উষ্ণবার্য্য, কফ নাশক ও পুরাতন তাম্বূল—কটুরসবিহীন, লঘু, কোমলতর, পাণ্ডুরবর্ণ—সেইজন্য ইহাই তাম্বূলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। গুপারি সম্বন্ধেও এইরূপ বিবেচনা করিয়া ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। আয়ুর্ব্বেদ গুপারির গুণ-ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন,—গুপারি গুরু, শীত-বীর্য্য রুক্ষ, কষায় রস যুক্ত, কফঘ্ন, পিত্তনাশক, মত্ততাজনক, অগ্নিপ্রদীপক, রুচিকারক, মুখের দুর্গন্ধনাশক। কিন্তু পক্ক গুপারি ও সিদ্ধ করা গুপারি ত্রিদোষ (বায়ু পিত্ত, কফ) নাশক, অপক্ক গুপারি ব্যবহার করা প্রশস্ত নহে।

খদির বা খয়ের সম্বন্ধেও বিচার আবশ্যক। খদির এক প্রকার বৃক্ষের নির্য্যাস। বিশুদ্ধ খয়ের প্রায়ই দুষ্প্রাপ্য। খদির বৃক্ষের নির্য্যাস গ্রহণ করিয়া ব্যবসায়ীগণ নানাবিধ দ্রব্য সংযোগে কৃত্রিম খয়ের প্রস্তুত করিয়া থাকে। এজন্য পানের সহিত আমরা যে সকল খয়ের ব্যবহার করি, তাহা বিশুদ্ধ নহে বলিয়া অপকারীই হইয়া থাকে। নতুবা বিশুদ্ধ খয়ের কফঘ্ন এবং পিত্তনাশক, সেইজন্য ইহা ব্যবহারে উপকারই হইবার কথা।

চূর্ণ বা চুণ—সম্বন্ধেও বিবেচনা করিবার বিষয় আছে। চুণ দ্বিবিধ,—পাথর হইতে জাত—(যাহা কলিকাতা অঞ্চলে ব্যবহৃত হইয়া থাকে) ও শম্বুক হইতে জাত। ইহার মধ্যে শম্বুক জাত চুণ অম্লনাশক, কফ ও বাতনাশক। কিন্তু এ চুণ আমরা ব্যবহার করি না বলিয়া তাম্বূল সেবনে আমাদের অনিষ্ট হইয়া থাকে। পান, গুপারি, খয়ের, চুণ—এই কয়েকটী দ্রব্যের

যোগে এবং সুগন্ধি মসল্লা দ্বারা যে পান প্রস্তুত হয়, তাহা সেবনে কফ, পিত্ত ও বায়ু জন্য দোষ নষ্ট করে। প্রাতঃ কালে পান সেবন করিতে হইলে, গুপারি, মধ্যাহ্নে খদির, এবং রাত্রিতে চূণের ভাগ কিছু অধিক দিবে।

তাম্বূলের শীস্ ও বোঁটা,—অজীর্ণ কারক, বুদ্ধি ভ্রংশজনক—স্মৃতি শক্তিনাশক। তাম্বূল চর্ব্বণ করিয়া প্রথম অংশ (পিক্) ফেলিয়া দিবে, উহা বিষাক্ত। ২য় বার চর্ব্বণে যে রস উৎপন্ন হয়—তাহা ভেদক ও দুষ্পাচ্য। তৃতীয় বার চর্ব্বণে যে রস প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাই গুণ দায়ক।

ভোজনের পর আচমন—আচমনের পর মুখশুদ্ধি, তা'রপর বিশ্রাম, এ সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণ যে ব্যবস্থা দিয়াছেন,—তাহা আমরা বলিলাম।

ইহার পর উপবেশন, শয়ন—অথবা দ্রুত গমন নিষিদ্ধ। ভোজনান্তে ধীর পদে একশত পদ হাটিবে, তাহাতে আলস্যাদির শিথিলতা দূর হয়। ভোজনের পরক্ষণেই উপবেশন করিলে ভুঁড়ি বৃদ্ধি হয় (পেট মোটা হয়)। শয়ন করিলে দেহ পুষ্টি ও দ্রুত গমন করিলে মৃত্যু তাহার পশ্চাদানুসরণ করে, অর্থাৎ উৎকট ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া মৃত্যু পর্য্যন্ত হইতে পারে। ভোজনের পর ধীরে ধীরে একশত পদ ভ্রমণ করিলে পরমায়ু বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

ভ্রমণের পর অষ্টশ্বাস পরিমিত কাল (আট-বার শ্বাস প্রশ্বাস বহনে যে সময় ক্ষেপ হয়) তৎকাল পর্য্যন্ত উত্তানভাবে সুখে শয়ন করিবে, তৎপর ষোলবার ঐ প্রকার শ্বাস বহনের সময় পর্য্যন্ত দক্ষিণ পার্শ্বে (ডাইন কাতে) শয়ন করিবে, অতঃপর তাহার দ্বিগুণ অর্থাৎ বত্রিশ বার পর্য্যন্ত শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণের সময় অতিক্রম করিয়া ইচ্ছামত ভাবে শয়ন করিবে।

নাভির উর্দ্ধদেশে বাম পার্শ্বে পক্কাশয় (অগ্নির স্থান)। এজন্য ভুক্ত বস্তু জীর্ণ হইবার জন্য বাম পার্শ্বে শয়ন করা কর্ত্তব্য।

আগেকার লোকে এ সকল বিধি মানিতেন, তাহার ফলে তাঁহারা নীরোগ দেহে দীর্ঘজীবন লাভ করিতেন। এখন আমরা তাহা মানি না বলিয়াই আমরা যে স্বাস্থ্য-সুখ হারাইয়া অল্পায়ু হইয়া পড়িয়াছি—তাহা ধ্রুব—সত্য কথা।

শ্রীহরিপ্রসন্ন রায় কবিরত্ন।

বায়ু সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ।

পাঠক, প্রবন্ধের নাম দেখিয়া মনে করিবেন না যে, সেই পুরাতন কথার পুনরাবৃত্তি হইতেছে। বায়ু আমরা শ্বাস লই; বায়ু আমাদের প্রাণ, বায়ু বৃক্ষলতাদির প্রাণ ইত্যাদি, কিন্তু বর্ত্তমান প্রবন্ধে এই সকল বিষয় আমাদের আলোচ্য নহে।

ভিন্ন ভিন্ন শিরাবাহী বায়ু জীব শরীরের উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করে—তাহাই আমাদের আলোচ্য বিষয়। প্রসঙ্গ ক্রমে আয়ুর্ব্বেদের বায়ু সম্বন্ধেও কিছু কিছু আলোচনা করা যাইবে।

কিরূপ বায়ু দূষিত—তাহা বলিবার উপলক্ষে

আয়ুর্ব্বেদে অনার্ত্তব বায়ুর উল্লেখ আছে দেখিয়া আসিতেছি। কিন্তু টীকা-টিপ্পনীতে তাহার বিশেষ ব্যাখ্যা কিছুই পাই নাই। সম্প্রতি ঘটনাক্রমে উক্ত কথাটীর একটী সুন্দর ব্যাখ্যা পাইয়াছি। পাঠকদিগকে আজ তাহা উপহার দিব।

ব্যাখ্যা কোথায় পাইয়াছি জানিবেন?—কৃষকদিগের নিকট। মিটিয়রোলজিষ্ট—যাহারা আবহাওয়ার বিষয় জানে তাহাদিগের নিকট হইতে। কবে মনস্যুন (Monsoon (ইহা এক প্রকার বায়ু—যাহাতে জল বর্ষণ করায়) আরম্ভ হইবে—বায়ুর হিউমিডিটি (Humidity—আদ্রতা) এবং ভেলোসিটী (Velocity—বেগ) কত—প্রভৃতি বিষয় জানিতে আমরা ব্যস্ত হই, কিন্তু এই নিরক্ষর কৃষকদিগের নিকট বায়ু সম্বন্ধে যে সকল বিস্ময়কর জ্ঞাতব্য বিষয় আছে—তাহা জানিবার চেষ্টা করিনা। বলিতে পারিনা—হয়ত পূর্ব্বে এ বিষয়ে কেহ লিখিয়া থাকিবেন, হয়ত অনন্ত শাস্ত্রের মধ্যে কোথাও এ সম্বন্ধে আলোচিত হইয়া থাকিবে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত উহা আমাদের এবং সম্ভবতঃ অনেকের দৃষ্টিগোচর হয় নাই।

বিষয়টী যেরূপে যে স্থানে আমার শ্রুতি-গোচর হইয়াছিল, তাহা পাঠকদিগকে সবিস্তার নিবেদন করিতেছি। কেননা, ইহার সহিত আমাদের আহারীয় দ্রব্যের উৎপাদক কৃষক কুলের সুখ-দুখঃ উন্নতি-অবনতির বিশেষ সম্বন্ধ আছে। সুতরাং তাহা সাধারণের অপ্রীতিকর হইবে না।

গঙ্গাতীরে বালির চড়া। পূর্ব্বে এই সকল স্থান দিয়া গঙ্গা প্রবাহিত হইত। গঙ্গা ক্রমে সরিয়া সরিয়া গিয়া এখন চড়া পড়িয়াছে। মৃত্তিকা বালুকাময়। দিবসে খুব গরম, রাত্রে ঠাণ্ডা। চড়া বলিয়া অনেক পরিসর স্থান মনে করিবেন না। দৈর্ঘে ৫।৬ ক্রোশ, বিস্তারে কোথাও এক, কোথাও দেড়, কোথাও বা দুই ক্রোশ। মধ্যে মধ্যে গ্রাম,—অধিবাসিগণ সকলেই কৃষিজীবী। পূর্ব্বে এই সকল জমিতে বিবিধ শস্য প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইতে দেখিয়াছি। এক্ষণে বহুকাল শস্যোৎপাদন করা অথচ সার না দেওয়ার ফলে জমীগুলি অনুর্ব্বর হইয়া পড়িয়াছে। পূর্ব্বে অধিবাসিগণ নীরোগ, বলিষ্ঠ এবং স্বচ্ছল অবস্থা সম্পন্ন ছিল ও প্রচুর দুগ্ধ ঘৃত খাইতে পাইত। এক্ষণে তাহাদিগের মধ্যে বিবিধ রোগের প্রাবল্য। তাহাদের শরীর দুর্ব্বল, অবস্থা শোচনীয়,—এবং দুগ্ধ ঘৃত একেবারেই আহার করিতে পায় না।

এইরূপ গঙ্গার চড়ায় একটী গ্রামের প্রান্তে বসিয়া রোগী দেখিতেছিলাম। সম্মুখে মাঠের পর মাঠ, তাহার উপর জ্যোৎস্না পড়িয়াছে। কিন্তু বিশ বৎসর পূর্ব্বে জোৎস্নাপ্লাবিত মাঠের যে সৌন্দর্য্য দেখিয়াছি, এখন সেরূপ দেখিলাম না। সৌন্দর্য্যের ভিতর কি যেন একটা আতঙ্ক, একটা বিভীষিকার মূর্ত্তি পরিস্ফুট থাকিয়া সৌন্দর্য্যকে মলিন এবং অপ্রিয়দর্শন করিয়া তুলিয়াছে। রোগী দেখিবার সময় নিম্নলিখিত রূপ কথোপকথন চলিতে লাগিল।

আমি—প্রশ্ন। তোমাদের এখানে আগে তো ম্যালেরিয়া ছিল না, তবে ম্যালেরিয়া কিসে হ'ল বাপু?

উ। আজ্ঞে বোধ হয় পাট থেকেই ম্যালেরিয়া হ'য়েছে।

প্র। কেন পাটের চাষ ত আগেও ছিল?

উ। ছিল বটে, কিন্তু সে না থাকাই। ঘর বা বেড়া বাধবার মত অল্প অল্প পাটের চাষ লোকে করত। এখন পাটের দরও খুব,

তাহার ফলে নগত টাকাটা হাতে পাওয়া ও যায়, সেই জন্যে লোকে পাটের চাষ খুব করে। ওই যে গ্রামের নীচে সব খাত্ দেখচেন্ ওই থেকে মাটী তুলে আমরা ঘরের পোতা (মেঝে) উচু করি। ওই সব খাতে পাট পচাইতে দেওয়া হয়। সে সময়ে দুর্গন্ধে গ্রামে টেকা যায় না, আর মশার তো অবধিই নাই। তারপর সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত জলে দাঁড়িয়ে পাট কাচ্‌তে হয়। কাজেই আশ্বিন মাস থেকে ভয়ানক ম্যালেরিয়া আরম্ভ হয়।

আমি। তা' বাপু তোমরা এমনি ক'রে টাকার লোভে প্রাণে মারা যাচ্ছ। আর সে টাকাওতো চিকিৎসায় খরচ হয়ে যায়। এক কাজ ক'র্‌তে পার না, অনেক গ্রামের লোক মিলে কিছু দূরে একটা খাল, বিল জমা নিয়ে সেই খালে পাট পচাতে পার না?

উঃ। তেমন উপযুক্ত লোক এ তল্লাটে কেউ নেই। তা'রপর আজকাল কেউ কারো কথা শোনেনা।

এই নিরীহ অসহায় ধ্বংসাভিমুখী কৃষক দিগের অবস্থা দেখিয়া মনে বড় কষ্ট অনুভব করিলাম। ইহাদিগের পরিত্রাণের কি কোন উপায় নাই? দেশের হিতসাধনের জন্য কংগ্রেস প্রতিষ্টিত হইয়াছে শুনিয়াছি। যদি কংগ্রেস এই সকল কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন, তাহা হইলে সার্ব্বজনীন সুখ্যাতিলাভ করিতে পারেন।

কিছুক্ষণ নিস্তব্ধভাবে এই বিষয় চিন্তা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, তা' কেবলতো ম্যালেরিয়া নয়, অন্য অনেক রোগও হচ্ছে দেখছি?

উঃ। তা' হ'বে না মশায়, পরিশ্রম করতে হয়, অথচ লোকে খেতে পায় না। আগে দুধ ঘি, মাছ খুব ছিল, আমরা প্রচুর খেতে পেয়েছি. তাই এ বুড়ো বয়সে যা' খাট্‌তে পারি, আজ কাল জোয়ান ছেলেরা তা খাট্‌তে পারে না। সেইজন্য টপ টপ ক'রে মরেই যাচ্ছে সব।

আমি। তাইত দুধ-ঘি এ অঞ্চলে আগে খুব ছিল, এখন নেই বল্লেই চলে।

উঃ। আর গরুই সব গেল মশায়।

আমি। হাঁ, যাও আছে তা, মানুষের চেহারাও যেমন, গরুর চেহারাও তেমনি। শুধু তাই নয়, পূর্ব্বে যে সব জমিতে সোণা ফ'লত—এখন সে সব জমীতে কিছুই ফলে না। চৈত্র মাসের শেষে এ অঞ্চলে কত পটোল হত, কিন্তু এবারতো কিছু হয় নাই।

উঃ। হ'বে কি মশায়, চোত মাস শেষ হতে চললো, আজও দখিণে বাতাস নেই, দখিণে ভিন্ন তো পটোল হয় না।

এইবার বাদল প্রসঙ্গে ফসলের উপর বিভিন্ন দিগদিগন্ত বায়ুর প্রভাবের বিষয় আসিয়া পড়িল। আমি আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিয়া লিখিয়া লইতে লাগিলাম।

আমি। বল কি দখিণে বাতাস ভিন্ন পটোল হয় না?

উঃ। আজ্ঞে না—দখিণে বাতাস নইলে লতা বাড়ে না, কাজেই পটোল হয় না। ফুল বা ফল ধরলে চুঁয়াইয়া যায়। আমরা দেখেছি—দখিণে বাতাসে ডগা এক দিনে ৪।৫ আঙ্গুল বড় হয়, কিন্তু অন্য বাতাসে প্রায়ই বাড়ে না, ডগা কুক্‌ড়ে থাকে, হয়ত একটু আধটু বাড়ে।

আমি। আচ্ছা এবারতো বলছ—দখিণে বাতাস হয় নি, তবুও দু চারটা পটোল হচ্ছে।

উঃ। আজ্ঞে তা হবে না কেন? গাছ যখন হয়েছে—তখন ফল হবে বৈকি। তবে দশটা জালি নষ্ট হয়ে একটা হয়—তাও বড় হয়

না। কিন্তু দখিণে পেলে সব জালিতেই পটোল হয়, আর বেশ পুষ্ট হয়।

প্রঃ। আচ্ছা দখিণে বাতাসে এমন হয় কেন বল দেখি?

উঃ। দখিণে বাতাসে মাটী রসে, আর শিশির পড়ে, সঙ্গে সঙ্গে লতা লতিয়ে যায়। এই দেখুন—আশ্বিন-কার্ত্তিক মাসে আমরা পটোলের গেঁড়ো (মূল) পুঁতি, আর মাঘ মাস পর্য্যন্ত এই ৪।৫ মাসে লতা ৫।৬ আঙ্গুলের বেশী বড় হয় না, কিন্তু দখিণে পেলে একমাসেই ৪।৫ হাত বাড়ে, শীতের মধ্যে দখিণে পেলেও বাড়ে।

প্রঃ। আচ্ছা দখিণে বাতাস কোন সময়ে হয়?

উঃ। এই ধরুন—ফাল্গুন থেকে বৈশাখ মাস পর্য্যন্তই বেশী হয়।

আমি। দিন রাত সমান থাকে?

উঃ। না দিনে পশ্চিমে-বাতাস হয়। তা'রপর সন্ধ্যার সময় একটু আগুনের হলকার হাওয়া উঠে, সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণে-বাতাস হইতে আরম্ভ করে।

আমি। দখিণে-বাতাসে আর কি হয়?

উঃ। আজ্ঞে পটোল, উচ্ছে, তরমুজ, ভুঁয়েশশা, মেঠো কুমড়ো—এ সবই দখিণে পেলে ভাল হয়। দখিণে ভিন্ন এ সকল ভাল হয় না।

আমি। আচ্ছা জলের সঙ্গে কি এ সকলের সম্বন্ধ নেই?

উঃ। একটু আধটু থাকতে পারে কিন্তু বেশী নয়. দখিণের সঙ্গেই এর সম্বন্ধ। এই দেখুন—গত বৎসরে এ সময়ে জল হয় নি, কিন্তু দখিণে হাওয়া ছিল, পটোল ও খুব হইয়াছিল। এবৎসর জল হয়েছে, কিন্তু দখিণে না হওয়ায় পটোল হচ্ছে না।

আমি। আচ্ছা ফাল্গুন থেকে বৈশাখ মাস পর্য্যন্তই কি কেবল দখিণে-বাতাস বয়?

উঃ। বেশীর ভাগ তাই, তবে আষাঢ়-শ্রাবণ মাসেও মধ্যে মধ্যে দখিণে হয়। আর একদিন দখিণে পেলেই খুব পটোল ধরে সে সব পটোলের মার নেই।

আমি। আচ্ছা পূবে বাতাস কবে হয়?

উঃ। আষাঢ়, শ্রাবণ আর ভাদ্র মাসে পূবে বাতাস হয়, মাঝে মাঝে দখিণে কি পশ্চিমে বাতাস হয়. উত্তুরে বাতাস প্রায় হয় না।

আমি। পূবে বাতাসের সঙ্গে ফসলের কি কোন সম্বন্ধ নাই?

উঃ। আজ্ঞে আছে বৈকি। পূবে বাতাসে পাটে পোকা হয়।

আমি। আচ্ছা পূবে বাতাসে যদি পাটে পোকা হয় তা' হলে পোকায় পাট নষ্ট হবারই কথা। কেননা বর্ষায় পূবে বাতাসই বয়।

উঃ। হাঁ—পাটে পোকা হয় বৈকি। কিন্তু একদিন পশ্চিমে জল আর বাতাস পেলেই সব পোকা ম'রে যায়।

আমি। পশ্চিমে জল কি রকম?

উঃ। এই পশ্চিম দিক থেকে মেঘ এসে যে জল হয়, তা'কে পশ্চিমে-জল বলে। আশ ধান ফোলার মুখে ২।১ দিন পশ্চিমে জল-বাতাস পেলে ধানের খুব যুত হয়।

আমি। আচ্ছা পূবে ছাড়া অন্য বাতাসে পোকা হয় না?

উঃ। হাঁ, দখিণে বাতাসেও হয়।

আমি। আচ্ছা পূবে-বাতাসে কোন্ জিনিষের ভাল হয় না?

উঃ। শাক আলু ভাল হয়। পূবে বাতাস না পেলে শাক আলুর গাছ বেরোয়না। শাক আলু আষাঢ় মাসে পোতে আর অঘ্রাণ মাসে তোলে।

আমি। আচ্ছা, আশ্বিন মাস থেকে কি রকম বাতাস হয়?

উঃ। আশ্বিন মাসে পূবে-পশ্চিমে আর দখিণে—এই তিন রকম বাতাসই দেখা যায়। কার্ত্তিকের প্রথমেই আমন ধান ফোলে। সেই সময় পশ্চিমে জল পেলে খুব ভাল হয়। পূবে-বাতাসে আমন ধানের অনিষ্ট হয়। ফোলার মুখে বাতাস হ'লেই ধানে আগড়া (শস্যহীন ধান্য) বেশী হয়।

আমি। আচ্ছা উত্তুরে-বাতাশে কোন্ ফসল ভাল হয়?

উঃ। যব, গম, ছোলা, মটর, মস্থরী—হরিৎ খন্দই উত্তুরে বাতাসে ভাল হয়। দখিণে বাতাস পেলে চুঁইয়ে যায়, দানা ভাল হয় না।

কৃষকদিগের নিকট যাহা অবগত হইয়াছি, তাহা লিখিত হইল। এক্ষণে শাস্ত্রে এ সম্বন্ধে কি আছে—তাহা সংক্ষেপে বলা যাইতেছে। সুশ্রুতে বিভিন্ন দিগাগত বায়ুর গুণ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত হইয়াছে,—"পূর্ব্ব বায়ুর গুণ—মধুর, স্নিগ্ধ, লবণ রসাত্মক গুরু, বিদাহ-জনক, রক্তপিত্তবর্দ্ধক, এবং ক্ষতরোগী এবং শ্লেষ্ম রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের রোগ বৃদ্ধি করে, বিশেষতঃ ব্রণে ক্লেদ বৃদ্ধি করে। ইহা বাত প্রকৃতি, শ্রান্ত ও কফক্ষীণ ব্যক্তিদিগেরও পক্ষে হিতকর। দক্ষিণ বায়ুর গুণ—মধুর, অবিদাহী, কষায় রসাত্মক, লঘু, চক্ষুর হিতকর বলবর্দ্ধক, রক্তপিত্তনাশক, এবং বায়ু প্রকোপক নহে।"

"পশ্চিম বায়ুর গুণ—বিশদ (পিচ্ছিলের বিপরীত) রুক্ষ, পরুষ (খরখরে) খর (প্রচণ্ড বেগ বিশিষ্ট), স্নেহ ও বলনাশক, তীক্ষ্ণ, কফ ও মেদ শোধক, সদ্যঃ প্রাণক্ষয়কারক এবং শরীর শোষক।"

"উত্তর বায়ুর গুণ—স্নিগ্ধ, মৃদু, মধুর, কষায়-রসযুক্ত। শীতল, সুস্থ ব্যক্তিগণের ক্লেদ ও বল বর্দ্ধক, ক্ষীণ, ক্ষয় ও বিষ পীড়িত ব্যক্তিগণের পক্ষে বিশেষ হিতকর এবং দোষ প্রকোপক নহে।"

আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে হেমন্ত ও শীতকালে উত্তর বায়ু, বসন্তকালে দক্ষিণ বায়ু, গ্রীষ্মে নৈঋত বায়ু. প্রাবৃটকালে পশ্চিম বায়ু, প্রবাহিত হয় বলিয়া লিখিত আছে, তাহার অন্যথা ঘটিলে তাহাকে অনাবর্ত্ত বায়ু বলে। শাস্ত্রে অনার্ত্তব বায়ু অহিতকর বলিয়া কথিত হইয়াছে।

অনাবর্ত্ত বায়ু উদ্ভিদ জগতের পক্ষে যে অহিতকর, তাহা পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে। যেমন উত্তরে বায়ুর সময় দক্ষিণে বায়ু প্রবাহিত হইলে যব, গম, ছোলা প্রভৃতি ভাল জন্মে না। সুতরাং অনাবর্ত্ত বায়ু মনুষ্য শরীরেও যে অনিষ্ট উৎপাদন করিবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি।

বসন্তে দক্ষিণ বায়ুর স্পর্শে শরীর তৃপ্ত হয়, শারীরিক ও মানসিক একটা স্ফূর্ত্তির উদ্রেক হয়, যৌবনোচিত ভাব প্রবলতর হয়। ইহা আমরা সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়াছি। শীত পীড়িত তরুলতাগুলিও বসন্ত বায়ুর স্পর্শে পুষ্প-পল্লবে সজ্জিত হইয়া যেন নব যৌবন প্রাপ্ত হয়। শীতকালে প্রবল উত্তরে বায়ুর স্পর্শ সুখকর না হইলেও আমাদের শরীরকে সবল এবং অগ্নিকে উদ্দীপিত করিয়া তুলে। ইহার অন্যথা ঘটিলে বিবিধ রোগ উৎপন্ন হয়।

অনাবর্ত্ত বায়ু ব্যতীত দিবা সংযোগে যে বায়ু হিতকর বা অহিতকর হইয়া থাকে, তাহা সুশ্রুতের বচন দ্বারা অবগত হওয়া যায়। সুশ্রুতের টীকাকার ডল্লনাচার্য্য বলেন যে. পূর্ব্ব ও পশ্চিম বায়ু অহিতকর এবং দক্ষিণ ও উত্তর বায়ু হিতকর।

সুশ্রুতে কথিত হইয়াছে যে, উষ্ণ বায়ু বা আতপ কর্ত্তৃক দগ্ধ হইলে শীত ক্রিয়া করিবে। উষ্ণ বায়ু বা আতপ দগ্ধের অর্থ টীকাকার "আতপে দগ্ধবৎ" বলিয়াছেন। পশ্চিম দেশে "লু" নামক যে বায়ু প্রবাহিত হয়, তাহাতে "বৎ"এর ব্যবহার চলে না, দগ্ধই হইয়া যায়।

বর্ষার অহিতকর জল সংযুক্ত পূর্ব্ব বায়ু দ্বারা পীড়িত হইলে কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সুশ্রুত বলিয়াছেন ;—

"শীত বর্ষানিলৈর্ষ্টতে উষ্ণং স্নিগ্ধঞ্চ শস্যতে ॥"

"শীত (হিম, তুষার) বা বর্ষার সজল বায়ু দ্বারা অভিভূত হইলে উষ্ণ এবং স্নিগ্ধ ক্রিয়া করিবে।"

অনাবর্ত্ত এবং বিভিন্ন দিগাগত বায়ুর বিষয় কথিত হইল। আয়ুর্ব্বেদে ও বিবিধ শাস্ত্রে বায়ু সম্বন্ধে যে সকল তথ্য নিহিত আছে, পরে সে সম্বন্ধে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে এক্ষণে যেমন সময়ে বৃষ্টি হয় না. বায়ুও সেইরূপ ঋতু অনুযায়ী প্রবাহিত হয় না। কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি এই বিকৃতির কারণ নির্ণয়ের চেষ্টা করিবেন কি ?

শ্রী—

শিশু জীবন।

'শরীমাদ্যং খলু ধর্ম্ম সাধনম্।" ইহ জগতে ধর্ম্মার্থ অর্জ্জনের একমাত্র উপায় সুস্থ শরীর ও মন। এই শরীর ও মন সুস্থ রাখিতে আমাদের যে কত পরিশ্রম করিতে হয়—কত অর্থরাশি অকাতরে ব্যয় করিতে হয়, তাহার ইয়ত্তা কোথায় ?—কিন্তু একবার অসুস্থ হইলে তা'রপর তা'র প্রতিবিধান, দেহ রোগের আকর হইলে তা'রপর তা'র নিরাকরণ অপেক্ষা স্বাস্থ্য ও সময় থাকিতে থাকিতে উপায় করাই ভাল, সুযুক্তি। Prevention is better than cure. অনেক সময়ই দেখিতে পাই—চিকিৎসকের বিনা প্রয়োজনে—চতুর গৃহস্থ বা শিক্ষিত পিতামাতা—বা সুযোগ্য গৃহিণী তাঁহাদের সুশিক্ষা ও সুবন্দোবস্তের গুণে সহজেই রোগের হাত এড়াইয়া যান। এজন্য হয়ত অনেকখানি ধৈর্য্যের আবশ্যক, অনেকটা স্বার্থত্যাগের দরকার, অনেক সংযমের প্রয়োজন। অবশ্য হিন্দুর দেশে গৃহস্থের লক্ষ্মীর সংসারে, দেবতা-ব্রাহ্মণের মিলনমন্দিরে দৈনিক জীবনে আচার-বিচার-সংযম-নিষ্ঠার পরিচয়ই অধিক ছিল—তা'র ব্যবস্থাই তিন ভাগ ; তা'রই উপর হিন্দুর বিশাল ধর্ম্মের অতুল্য ভিত্তি—আর তা'র ফল ইহলোকে অক্ষুণ্ণ স্বাস্থ্য, অনন্ত শান্তি—পরলোকে—অক্ষয় স্বর্গ।

আজ অজ্ঞান-তমসায় দেশ ভরিয়াছে, হিন্দু জ্ঞান কর্ম্ম ভুলিয়াছে—তা'র শিক্ষা, দীক্ষা সে বিপুল আদর্শ আজ অতল তলে,—তাই দেশে রোগ শোক, অশান্তি ও দারিদ্র্য জীবন, যেন একটী মহাবিড়ম্বনা মাত্র। এইরূপ দায়িত্ব বিহীন জীবন বহন করিয়া মানুষ নিজের স্বাস্থ্য সম্বন্ধেই এত উদাসীন যে, অপরের—এমন কি নিজ শিশু সন্তানদের সম্বন্ধেও ঠিক লক্ষ্য রাখিতে পারে না বা রাখিতে চাহে না।

সামান্য একটী বীজ বপন সময় হইতে—চারা গজায় ও পরে তাহার কত তত্ত্বাবধান করিলে তবে সময়ে বর্দ্ধিত সে বৃক্ষের ফলভোগের অধিকারী আমরা হই।—তুলনায় মানুষের জন্য —তাহা হইলে আমাদের কত অধিক যত্ন ও পরিশ্রম আবশ্যক। "আত্মাবৈজায়তে পুত্র"—এ হেন আদরের পুত্র—স্নেহের পুতলী—নয়নানন্দ —প্রাণারামকে যথাযথভাবে গড়িয়া তুলিতে পিতামাতার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি—সযত্ন আবশ্যক। শিশু জীবন সুনিয়ন্ত্রিত করিতে হইলে পিতা মাতাকে পুত্র জননের পূর্ব্ব হইতেই বেশ সাবধান—বেশ প্রস্তুত থাকিতে হইবে—পিতার শুক্র যাহাতে শিশুর বল ও মাতার শোণিত যাহাতে তাহার পুষ্টি—অবিকৃত ও বিশুদ্ধ থাকা নিতান্তই আবশ্যক। তা'রপর শিশু ভূমিষ্ট হইবার পূর্ব্বে ও গর্ভধারণ কালেও শিশুর জননীর কত দায়িত্ব তাহা আধুনিক শিশু-জননীরা একেবারেই ভুলিয়াছেন। গর্ভস্থ শিশু ঠিক এক খানি ক্যামরা—প্লেটের ন্যায় চতুর্দ্দিকের ঘটনাবলীর একটা ছাপ লইবার জন্য যেন প্রস্তুত ও উন্মুখ, এ অবস্থায় জননীর চিত্ত প্রফুল্ল ও সংযত রাখার জন্য—ভাল ভাল পুস্তক পাঠ সুন্দর সুন্দর মনোহারী চিত্রাদি দর্শন—সুশ্রাব্য সঙ্গীতাদি শ্রবণ অতিশয় হিতকর। শারীরিক গুরুতর পরিশ্রম, রাত্রি জাগরণ ইত্যাদি একেবারে নিষিদ্ধ, আচার্য্য মনু—গর্ভিণীর উপবাসাদি নিষেধ করিয়াছেন।—তাহাতে মাতৃ শোণিত পুষ্ট—শিশুর স্বাস্থ্যের বিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা।—শিশু জননের অতিরিক্ত কষ্ট সহ্য করিবার নিমিত্ত সভ্য দেশীয়া অনেকানেক শিক্ষিতা মহিলা Alcohol (সুরা) সেবন অভ্যাস করিয়া থাকেন,—এটী শিশুর স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের একটী প্রধান কারণ ও ভবিষ্যতে তাহার মাদক প্রিয়তার একটী পূর্ব্ব পত্তন। দয়াময় ভগবান যাহার জন্য গর্ভ ধারণ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাকে তদুপযুক্ত ধারণ ক্ষমতাশক্তিও দিয়াছেন, কার্য্যেই "খোদার উপর খোদকারী" ঠিক নহে। তবে রোগী বা দুর্ব্বলের কথা স্বতন্ত্র, গর্ভিণীর পক্ষে বিশ্রাম—শারীরিক ও মানসিক —সর্ব্ববিধ নিশ্চিন্ততাই বলাধানের একমাত্র সুযোগ—একমাত্র সুপথ্য।

—ক্রমশঃ

শ্রীঅমরনাথ চট্টোপাধ্যায় এম্ বি।

ব্রণলেপ বিধি।

প্রথম শোধন, দুই শোণিত-মোক্ষণ,
তৃতীয়েতে উপনাহ, চতুর্থ পাটন,
পঞ্চম শোধন আর ষষ্ঠেতে রোপন,
সপ্তমে বর্ণকরণ ব্রণের ক্ষেপণ॥
রক্ত-আগন্তুজ শোথে হরিদ্রা উত্তম.
হরীতকী, পুনর্নবা, দূর্ব্বা গন্ধদ্রব্য,
বেণামূল, পদ্মকাষ্ঠ, লোধ, গেরীমাটী.
রসাঞ্জন, লেপ দিবে মিলায়ে একটী।
সর্ষপ ও স্বর্ণমূলা. সজিনার বীজ,
তিল, যবাদির ছাতু, তিসি, সুরা বীজ,

এদের প্রলেপ হয় ব্রণের পাচক
ব্রণ পাকাইতে ইহা প্রয়োগে ভিষক ॥
দন্তীমূল, চিতা ছাল, মনসার আটা,
গুড়, ভেলা, হীরাকস, সৈন্ধব—এ ক'টা,
আকন্দের আটা সহ প্রলেপ প্রদানে।
ব্রণ বিদীরণ হয় জানিবা সন্ধানে ॥
দন্তী-চিতা-করবীর মূল আর ভেলা,
করঞ্জ; পায়রা. চীল-গৃধ্র-বিষ্ঠাগুলা;
সর্জ্জি-যবক্ষার আদি ক্ষার বিলেপনে।
শীঘ্র ব্রণ ফাটি যায় এ ক'টি লেপনে ॥
যষ্টিমধু, নিমপাতা, হরিদ্রা যুগল,
তেউড়ী, সৈন্ধব, তিল,—দন্তী এ সকল,
পেষণ করিয়া লেপ করিলে প্রদান।
বিশুদ্ধ হইবে ব্রণ করিবে সন্ধান।
নিমপাতা, ঘৃত, মধু. যষ্টিমধু, তিলে,
দারুহরিদ্রার সহ পেষি' লেপ দিলে—
ব্রণের শোধন আর রোপণ হইবে।
(বিশুদ্ধ হইয়া ব্রণ পূরিয়া উঠিবে)।
করঞ্জ; নিসিন্দা, নিমপত্র-লেপ দিলে
কিম্বা হিঙ্—রশুনের প্রলেপ দানিলে,
নিমের প্রলেপে ক্ষত ক্রিমি নাশ হয়,
শার্ঙ্গধরে সংগৃহীত এই সমুদয় ॥
নিমপাতা, তিল, দন্তী, তেউড়ী, সৈন্ধব,
মধু সহ প্রলেপনে নিলে এই সব।
দুষ্ট ব্রণ প্রশমিত, বিশোধিত হয়।
বিশেষ পূরিয়া উঠে ইহাতে নিশ্চয় ॥
কটূকী, মদন ফল—কাঁজীতে বাটিয়া।
উষ্ণ লেপে নাভিশূল যাইবে সারিয়া।
সজিনা, এরণ্ড; মুগ, শেফালিকা, যব,
গোধূম, সহিত বাটি উষ্ণ করি সব;
বাত বিদ্রধিতে তাহা গাঢ় লেপ দিবে,
ইহাতে সুফল লাভ অবশ্য হইবে ॥
পৈত্তিক বিদ্রধিতে খৈ, যষ্টিমধু ঘৃত,
চিনি কিম্বা দুগ্ধ দ্বারা করিয়া পেষিত—
বেণা, ক্ষীরককোলীর মূল ও চন্দন।
প্রলেপ দানিলে উহা হয় প্রশমন ॥
ইষ্টক, বালুকা আর মণ্ডুর, গোময়,
গোমূত্রে পেষিয়া যদি অগ্নি তপ্ত হয়,
সুখোষ্ণাবস্থায় তা'র প্রলেপ দানিবে
কফ বিদ্রধি তা'তে বিনাশ পাইবে।
মঞ্জিষ্ঠা, হরিদ্রা আর লোহিত চন্দন,
যষ্টিমধু, গেরীমাটী, দুগ্ধেতে পেষণ
করিয়া প্রলেপ তার অবশ্যই দিবে।
রক্তজ ও আগন্তুজ বিদ্রধি জানিবে।
চিজল, সজিনা বীজ, দশমূল কিম্বা
জলে পেষি অগ্ন্যুত্তাপে উষ্ণ করি' নিবা।
অপর রাখালশসা, দেবদারু ল'য়ে
উষ্ণ করি লও তাহা শিলাতে পিষিয়ে,
বাত-কফ গলগণ্ড বুঝিবে যখন.
উপশম এ প্রলেপে হইবে তখন।
সর্ষপ ও নিমপত্র, ভেলা পোড়াইয়া
ছাগমূত্রে লেপে যায় অপচা সারিয়া।
সর্ষপ, মসিনা, যব মূলা-শন বীজ,
অম্লতক্রে পেষি সহ সজিনার বীজ।
প্রলেপ প্রদানে এর প্রশমন হয়.
গণ্ডমালা, গলগণ্ড, অর্ব্বুদ নিচয়।
শুধু বাত প্রপীড়িত অঙ্গ ক্ষুরে চিরি,
কুঁচের প্রলেপ তপ্ত রাখিবেক পুরি;
বিশ্বচী, অববাহুক গৃধ্রসী অপর
অন্য বাতব্যাধি শান্তি লভিবে সত্বর।
ধুতুরা, এরণ্ড আর নিসিন্দার পাতা,
সর্ষপ, সজিনা-ছাল, পুনর্নবা তথা।
ইহাদের প্রলেপেতে দীর্ঘকাল জাত।
দারুণ শ্লীপদ রোগ হইবে সুসংযত।
কৃষ্ণজীরা, কুড়, কুল, হবুষ, এরণ্ড,
কাঁজিতে পেষিয়া লেপে নাশিবে কুরণ্ড।

করবীর মূল জলে করিয়া পেষণ।
প্রলেপে লিঙ্গ সম্ভূত পীড়া প্রশমন
ত্রিফলা—লৌহ কটাহে অগ্নি দগ্ধ করি,
সেই ভস্ম মধুসহ লইবেক মারি' ;
উপদংশ ক্ষতে তাহা করিলে লেপন,
রোপিত হইয়া হবে সদ্যঃ প্রশমন ॥
রসাঞ্জন, হরীতকী—শিরীষ বাটীয়া,
প্রলেপনে উপদংশ যাইবে সারিয়া।
পাকুড়, বংশলোচন, গেরিমাটী আর
গুলঞ্চ, রক্তচন্দন, কল্ক করি তা'র ;
ঘৃত বিমিশ্রিত করি করিলে লেপন।
অগ্নিদগ্ধ স্থানে তাহা হয় প্রশমন।
কাথ করি কাঁটানটে, গাব ছাল নিয়ে
অগ্নি দগ্ধ ভাল হয় ঘৃত লেপ দিয়ে।
যব ভস্ম করি তাতে তৈল মিশাইয়া,
লেপে অগ্নিদগ্ধ ক্ষত উঠিবে পূরিয়া।
বাটীয়া পলাশ আর উড়ুম্বর ফল,
তৈল মধুযুক্ত লেপে যোনি দৃঢ়বল।
কার্পাস মূলের কাথে নিত্য ধৌত হলে।
যোনির দৃঢ়ত্ব হয় সেইরূপ বলে ॥
আম্র-মূল, ফল কিম্বা করিয়া পেষণ।
মধু ও কর্পূর যোগে করিলে লেপন—
যোনিতে, গত যৌবনা নারীর নিশ্চয়
যোনি দৃঢ় হয় তাতে নাহিক সংশয়।
মরিচ, তগর পাদুকা, পিপুল, সৈন্ধব,
আপাঙ, বৃহতীফল, তিল, কুড়, যব,
সর্ষপ, মাষকলাই, অশ্বগন্ধা আদি
চূর্ণ করি, মধু দ্বারা বিমর্দ্দিয়া যদি,
লেপন মর্দ্দন করে তা দ্বারা সতত,
তাতে লিঙ্গ বৃদ্ধি হয়, স্তন উপগত।
বাহু ও কর্ণের তাতে পরিপুষ্টি হয়,
লিঙ্গ বৃদ্ধি তরে অন্য ব্যবহৃত হয়।
চিনি, অশ্বগন্ধা আর সৈন্ধব লবণ,
ছাগ দুগ্ধে পক্ব ঘৃত করিবে লেপন।
সঘন রাখালশসা পাতার স্বরসে
লাল করবীর দণ্ডে বিমর্দ্দিয়া রসে,
তাহা দ্বারা হয় যদি লিঙ্গ বিলেপিত।
তার যোগে শুষ্ক যোনি হয় স্রাবান্বিত।
জলে পেষি পান, কুড়, হরীতকী চুর,
প্রলেপে গাত্র দৌর্গন্ধ হয়ে যায় দূর।
কুলত্থ কলায় আর ছোলা, ছাতু, কুড়,
জটামাংসী, দারুচিনি, চন্দনের চুর,
—এসব একত্র করি করিলে লেপন।
স্বেদ ও গাত্র দৌর্গন্ধ্য হয় নিবারণ।
সচললবণ, কুড়, হরিদ্রা উভয়,
বচ ও মরিচ লেপে সর্ব্বেবঙ্গ হয়।

শ্রীরাসবিহারী রায় কবিকঙ্কণ।

মুষ্টিযোগ ও টোট্‌কা।

অগ্নিমান্দ্যে যোগ—

(১) প্রত্যহ প্রাতঃকালে অম্ল লবণের সহিত আদার কুচি সেবন করিলে অগ্নি বৃদ্ধি হইয়া থাকে। (২) গব্য ঘৃতের সহিত শুঁঠ চূর্ণ মিশাইয়া সেবন করিলে অগ্নির দীপ্তি হইয়া থাকে। (৩) হরীতকী ও শুঁঠের গুঁড়া প্রত্যেক দ্রব্য চারি আনা মাত্রায় অম্ল ইক্ষু গুড় ও সৈন্ধবের সহিত সেবন করিলে অগ্নি বর্দ্ধিত হয়।

ক্রিমি নিবারণের উপায়—

(১) কাঁচা সুপারি বাটিয়া লেবুর রসের সহিত সেবন করিলে ক্রিমি বিনষ্ট হয়। (২) খেজুর পাতার রস ও লেবুর রস একত্র সেবন করিলে ক্রিমি বিনষ্ট হয়। (৩) নারিকেলের জল মধুর সহিত সেবন করিলে ক্রিমি বিনষ্ট হয়। (৪) সুপারিগাছের শিকড়ের রস ইক্ষুচিনি মিশাইয়া পান করিলে ক্রিমি নষ্ট হয়।

উকুন নিবারণের যোগ।—

ধুতুরা পাতার রস কিম্বা পানের রস খানিকটা কর্পূরের সহিত মিশাইয়া মাথায় প্রলেপ দিলে উকুন মরিয়া যায়।

উৎকাসি নিবারণের ব্যবস্থা—

(১) দুই তোলা মিছরি—নেকড়ায় পুঁটলি করিয়া খানিকটা জলে টাটকা ভিজাইয়া সরবৎ প্রস্তুত কর। তাহার পর সেই সরবৎ অগ্নিসন্তাপে চড়াইয়া মধুর মত ঘন করিয়া লও। তাহার পর সেইটি সমস্ত দিনে অল্প অল্প অবলেহ কর। সঞ্চিত কফ উঠিয়া যাইবে। (২) দুইতোলা বাসক-পাতার রস গরম করিয়া মধু মিশাইয়া সেবন কর, উপকার হইবে। (৩) ময়ূরপুচ্ছ ভস্ম অর্দ্ধ আনা, পিপুলের গুঁড়া অর্দ্ধআনা, ৫।৬ ফোঁটা মধু একত্র মিশাইয়া উভয় বেলা কর, উপকার হইবে।

আধকপালে নিবারণের ব্যবস্থা—

(১) অতি প্রত্যুষে ডুব দিয়া স্নান করিলে আধকপালে রোগে উপকার হইয়া থাকে। (২) খানিকটা ঠাণ্ডা জল নাক দিয়া পান করিতে পারিলে সদ্যঃ আধকপালে রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে। (৩) চারিআনা কুঙ্কম ও চারি আনা চিনি একত্র মিশাইয়া চারিতোলা ঘৃতে ভাজিয়া নস্য গ্রহণ করিলে অর্দ্ধ শিরঃশূল বা সূর্য্যাবর্ত্ত নিবারিত হয়।

শয্যা মূত্র নিবারণের ব্যবস্থা—

তেপাকুচা মূলের রস সিকি ভ'র ওজনে লইয়া দিন কয়েক প্রত্যহ বালককে খাওয়াইয়া দিলে শয্যামূত্র নিবারিত হয়।

পাথরি রোগে যোগ—

(১) গুড় ও কাঁজি ১ তোলা হিসাবে লইয়া তাহার সহিত কাঁচা হরিদ্রা চূর্ণ অর্দ্ধ তোলা মিশাইয়া ১ সপ্তাহ সেবন করিলে অশ্মরী বা পাথরি রোগের শর্করা নষ্ট হয়। (২) শসার বীজ বা নারিকেলের ফুলের চূর্ণ সিকি ভ'র ওজনে লইয়া দুগ্ধ সহ মিশাইয়া ১ সপ্তাহ সেবন করিলে শর্করা নষ্ট হয়। (৩) পাষাণভেদী, শুঁঠ ও গোক্ষুর প্রত্যেক দ্রব্য ॥৵০ হিসাবে লইয়া আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া যে কাথ প্রস্তুত হইবে, সেই কাথ সিকি ভ'র যবক্ষার ও সিকি ভ'র চিনি মিশাইয়া দিন কয়েক সেবন করিলে শর্করা নষ্ট হয়।

শ্রীঅতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
কবিভূষণ।

সরস্বতী স্তোত্র।

—— :০: ——

অমলধবলপদ্মন্যস্তপাদাব্জযুগ্মা
জিতশশধরকান্তিঃ কম্রক্লপচ্ছটাভিঃ।
বশগহৃদয়বাসা জ্ঞানদা সেবকানাং
জয়তু জয়তু দেবী ভারতী বিশ্ববন্দ্যা॥ ১॥

কুকৃতিচয়তমোভিঃ সন্ততৈর্ব্বোধনেত্রম্
পরিবৃতমিতিমাতঃ কিঞ্চিদিষ্টং ন বীক্ষে।
তদপৃথগতদাসং বোধদীপং প্রকাশ্য
স্বসহজকরুণাভি র্দর্শ্যতাং কৃত্যমার্গঃ॥ ২॥

ক বত কলুষকর্ম্মা মাদৃশো হীনবুদ্ধিঃ
ক চ শুভমতিবন্দ্যা ত্বং বুধস্বান্তকান্তা।
তদপিযদহমজ্ঞো লব্ধকামঃ কৃপাস্তে
নখলু স মম দোষঃ কো ন ভদ্রে প্রয়াসী॥ ৩॥

অথ ন মম দুরাশা সাহসং বেত্তি বাণি!
প্রমতিকৃতিবুধাপ্যাং ত্বাং যদস্ম্যাপ্তুকামঃ।
ত্বমসি নিখিললোকে দেবি! তুল্য-প্রসাদা
ত্যজতি কিমু বিমূঢ়ং পুত্রমজ্ঞং প্রসূঃ স্বম্॥ ৪॥

কুমতিকলুষজালৈরপ্রকাশান্তরাত্মা
কথমিহ মহিমানং বাণি বুধ্যে ভবত্যাঃ।
প্রকৃতিরনুগবৃন্দাজ্ঞত্বহন্ত্রী তবাস্তি
ধ্রুবমিতিমিতিহীনং সাহসং মেঽপ্যবুদ্ধেঃ॥ ৫॥

ভজনকুসুমমাল্যৈ র্জ্ঞানসূত্রৈ র্নিবদ্ধৈঃ
সুবচনরচনাভিঃ প্রার্চ্চতি ত্বাং সুবিজ্ঞঃ।
ইতি কিমকৃতবুদ্ধিঃ স্যান্নিরস্তত্বদর্চ্চা
সুকৃতিত ইহ কশ্চিৎ ত্বং সমা মাতৃরূপা॥ ৬॥

ন সুমতিরতিহীনস্যাস্তি মে নৈব বিদ্যা
নচ ভজনজপুণ্যং যেন তোষোভবত্যাঃ।
তদপি তব মহিম্না ত্বৎপ্রসাদং হি লপ্স্যে
জগতি ন খলু নশ্যেৎ কাপি বস্তুস্বভাবঃ॥ ৭॥

চিদমৃতময়বোধং দেহি দুর্ধীতমো মে—
পসরতু হরিদশ্বে ধান্তবৎ প্রোস্থতীহ।
অহমপি চিরকাম্যং প্রাপ্যতেঽঙ্ঘ্রিপ্রসাদং
জগতি তব লভেয়ং সেবকত্বং যথার্থম্॥ ৮॥

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের
ছাত্রবৃন্দ।

সমালোচনা।

আয়ুর্ব্বেদ বিষয়ক প্রস্তাব।— কবিরাজ শ্রীহরিমোহন দাশ গুপ্ত কবিরত্ন লিখিত। জেলা ঢাকা, পোঃ আঃ বেজগাঁও— এই ঠিকানায় গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্তব্য। এ পুস্তকের মূল্য নাই। দেশে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার প্রচলনাধিক্যের জন্য এ পুস্তকখানি লিখিত। আয়ুর্ব্বেদ প্রণেতা ঋষিগণের কাল নিরূপণ করিয়া আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থগুলির উৎপত্তির বিবরণ এবং ঐ সকল গ্রন্থ লিখিত বিষয়গুলির বক্তব্য এ পুস্তকে বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। লুপ্তপ্রায় আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার পুনরুন্নতির জন্য গ্রন্থকার যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহার সকল গুলিই গ্রহণযোগ্য। তবে শুধু সংস্কৃত ভাষায় নহে, বাঙ্গালা এবং ইংরাজী ভাষাতেও

আয়ুর্ব্বেদীয় শাস্ত্রগুলির অনুবাদ প্রকাশ করিয়া সেই সকল ভাষাতেও ভারতীয় সকল প্রদেশের ছাত্রবৃন্দকে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। এ সকল কথা আমরা অনেকবার বলিয়াছি। আমাদের ধাতুতে আমাদের দেশীয় ঔষধই যে সমধিক উপকারী—সে বিষয়ে আর কথা কি! বর্ত্তমান সময়ে যে সকল কারণে আমরা স্বাস্থ্যহীন ও অল্পায়ু হইতেছি,—আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা পরিত্যাগও যে তাহার একটী কারণ, তাহাতো নিশ্চয় কথা। দেশের লোকে এসকল কথা বুঝেন না—ইহাই তো দুঃখ! পল্লীস্থ প্রধান প্রধান জমীদার ও ধনীদিগের বাটীতে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করা সম্বন্ধে গ্রন্থকার যাহা বলিয়াছেন,—আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক সমাজ হইতে তাহার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। দেশের জমীদার এবং ধনী সম্প্রদায়ের সেকালের মত এদিকে দৃষ্টি পুনঃ পতিত হইলে আয়ুর্ব্বেদের পুনরুন্নতি হইতে কতক্ষণ লাগে? এরূপ গ্রন্থের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

—:০:—

ম্যালেরিয়া দমন।—ম্যালেরিয়ায় বাঙ্গালা দেশের যে ভীষণ সর্ব্বনাশ সাধিত হইতেছে, আমাদের মহামান্য গবর্ণর লর্ড রোণাল্ডশে বাহাদুর তাহা সম্যকরূপে উপলব্ধি করিয়া উহা দমন করিবার জন্য চেষ্টাশীল হইয়াছেন। ফলে গত ২৯শে জানুয়ারি প্রাতঃকালে কলিকাতা লাট প্রাসাদে ২৪ পরগণা, নদীয়া ও যশোহর জেলা বোর্ডের সদস্যগণ—নদীয়ার মহারাজ প্রমুখ কয়েকজন জমীদার ও সেনেটারি বোর্ডের সভ্যগণকে লইয়া এক অধিবেশন হইয়াছিল। বঙ্গেশ্বর ম্যালেরিয়ায় বঙ্গবাসীর যে সকল ক্ষতি হইতেছে তাহার সমস্ত অবস্থা বুঝাইয়া উহা নিবারণের জন্য বলিয়াছেন, "এনাফেলিস্ মশকের দংশনেই যখন ম্যালেরিয়ার উৎপত্তি হইয়া থাকে পরীক্ষা দ্বারা এক বাক্যে স্বিরিকৃত হইয়াছে, তখন উহাদিগকে ধ্বংস করিবার ব্যবস্থা করা অপেক্ষা বাঙ্গালা দেশে যাহাতে উহাদিগের জন্মিবার কারণই না হইতে পারে, ম্যালেরিয়া দমনের জন্য তাহারই উপায় বিধান করিতে হইবে। এরূপ ব্যবস্থা করিতে হইলে—হয় বাঙ্গালাকে জলশূন্য করিতে হইবে, নয় ক্ষুদ্রক্ষুদ্র স্বল্প জলাশয়গুলির পরিবর্ত্তন করিয়া বৃহৎ জলাশয়ের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। বর্ষাকালে নদীর উচ্ছ্বসিত জল আটক করিয়া রাখিয়া আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা যাইতে পারে।" এই কল্পনা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য তিনি সমবেত সদস্যগণকে এই কার্য্যের সাহায্যকারী হইবার জন্য অনুরোধ করেন। স্বয়ং লাট বাহাদুর যখন উদ্যোগী হইয়াছেন, তখন আমাদের মনে হয়—এইবার বোধ হয় সত্য সত্যই দেশ হইতে ম্যালেরিয়া দমনের একটা উপায় হইবে। ম্যালেরিয়ায় তো বাঙ্গালার কম সর্ব্বনাশ হইতেছে না! বঙ্গেশ্বরের বক্তৃতাতেই প্রকাশ,—বাঙ্গালায় প্রতি বৎসর কেবল ম্যালেরিয়া রোগে সাড়ে তিন হইতে চারি লক্ষ লোক প্রাণত্যাগ করে! লর্ড রোণাল্ডশের চেষ্টায় বাঙ্গালা দেশ ম্যালেরিয়া

শূন্য হইলে তাঁহার যশোগীতি প্রতিদিন বাঙ্গালা পল্লীপ্রান্তরে বিঘোষিত হইয়া তাঁহাকে চির স্মরণীয় করিয়া রাখিবে।

দান।—আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম,—সুদূর হৃষিকেশের প্রখ্যাত নামা বাবা রামনাথ কালী কমলীওয়ালা আয়ুর্ব্বেদের উন্নতি ও প্রসার কল্পে নগদ ৫২ হাজার টাকা মূল্যের ভূ-সম্পত্তি দান করিয়াছেন। এ টাকায় তত্রত্য আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের পরিচালন কার্য্য চলিবে।

আয়ুর্ব্বেদিক প্রাকটিসনার্স বিল।—অনারেবল কুমার শ্রীযুক্ত অরুণ চন্দ্র সিংহ বাহাদুর আয়ুর্ব্বেদিক প্রাকটিসনার্স বিল নামক একখানি আইনের পাণ্ডুলিপি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় উত্থাপন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। ডাক্তারির মত কবিরাজীতেও হাতুরে কবিরাজ যাহাতে দেশে স্থান পাইতে না পারে—ইহাই সে বিলের উদ্দেশ্য ছিল। গত ১৩ই মাঘ কলুটোলায় শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের বাড়ীতে ইহার প্রতিবাদের জন্য এক প্রকাণ্ড সভা হয়। কলিকাতা এবং মফস্বলের অনেক আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকই সে সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। এরূপ বিল পাশ হওয়া কোন ক্রমেই কর্ত্তব্য নহে—সভায় ইহাই স্থির করা হয়। কুমার বাহাদুর ইহার প্রত্যাহার না করিলে সভায় কার্য্যবিবরণী মাননীয় গবর্ণমেণ্ট বাহাদুরে নিকট জ্ঞাপন করা হইবে—ইহাও সভার স্থিরিকৃত হয়। ফলে কুমার বাহাদুর বিলের প্রত্যাহারই করিয়াছেন। এই উপলক্ষে যে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণের সম্মিলন ঘটিল—ইহাই লাভের কথা।

আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা। আগে দেশের রাজন্যবর্গ এবং জমীদার সম্প্রদায় মাসিক বেতন দিয়া অনেক আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসককে পারিবারিক চিকিৎসক নিযুক্ত করিতেন। ফলে উদর চিন্তার উপায় থাকায় সেই সকল চিকিৎসক আয়ুর্ব্বেদের উন্নতি কল্পে মনোযোগ প্রদান করিতেও সক্ষম হইতেন। সেই রাজন্যবৃন্দ এবং জমীদার বর্গের জন্য তাঁহাদিগেরই ব্যয়ে আয়ুর্ব্বেদীয় অনেক মূল্যবান্ ঔষধও সেকালে প্রস্তুত হইত। যাঁহারা প্রস্তুত করাইতেন, তাঁহাদিগের রোগ সারাইতে উহার অল্পই ব্যয় হইত, অবশিষ্ট দরিদ্র জন সাধারণের মধ্যে বিনামূল্যে বা স্বল্পমূল্যে প্রদান করার ব্যবস্থা হইত। এখন সে প্রথা দেশ হইতে একরূপ উঠিয়া গিয়াছে। এখন দেশের নরপতিগণের অনেকে রাজ্যমধ্যে দাতব্য অ্যালোপ্যাথিক ঔষধালয়ের প্রতিষ্ঠায় যেরূপ মনোযোগী, বেতন দিয়া আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক নিযুক্ত করিতে সেরূপ ইচ্ছুক নহেন। যতগুলি কারণে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার অবনতি ঘটিয়াছে, ইহার প্রতি দেশের ধনকুবের দিগের ঔদাসিন্য তাহার অন্যতর কারণ।

আয়ুর্ব্বেদের সমাদর।—দেশের এ হেন দুর্দ্দিনে কোন দেশীয় নরপতি কোন আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসককে পারিবারিক চিকিৎসক নিযুক্ত করিয়াছেন শুনিলে আনন্দিত হইতে হয়। সংপ্রতি-মালদহ—চাঁচোলের মহামান্য রাজা শ্রীল শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র রায় চৌধুরী বাহাদুর "আয়ুর্ব্বেদ" পত্রের সহঃ সম্পাদক কবিরাজ শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেন গুপ্ত কবিরঞ্জনকে তাঁহার কাশীপুর-প্রাসাদের পারিবারিক চিকিৎসক নিযুক্ত করিয়া আয়ুর্ব্বেদের সমাদর প্রদর্শন করিয়াছেন। মালদহ-চাঁচোলেও এই রাজা বাহাদুরের অনেকগুলি দাতব্য-ডাক্তারি ঔষধালয় আছে, কিন্তু আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক নিযুক্ত করিয়াও ইনি চিরদিন আয়ুর্ব্বেদের

প্রতি সমাদর দেখাইয়া আসিতেছেন। দেশের সমস্ত নরপতি এবং জমীদার যদি এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেন, তাহা হইলে লুপ্তপ্রায় আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার পুনরুন্নতি হইতে কয় দিন লাগে!

স্বাস্থ্য বিভাগের কর্ম্মচারীদের কর্ত্তব্য পালন। সঞ্জীবনীতে প্রকাশ—"সংপ্রতি কলিকাতার জগন্নাথঘাটের নিকটবর্ত্তী এক গুদামে স্বাস্থ্যবিভাগের এক কর্ম্মচারী ব্যবহারের অনুপযোগী ২ মণি ৭৮টা বস্তা ময়দা পাইয়াছেন। উহা মানুষের ব্যবহারের পক্ষে একান্ত অনুপযুক্ত ও অস্বাস্থ্যকর বলিয়া স্বাস্থ্যবিভাগীয় কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে পোড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে।" ভেজাল খাদ্যের প্রতীকার করিতে হইলে এইরূপ ব্যবস্থাই করিতে হইবে।

চিকণচালে দেশের অবস্থা।—রাণাঘাটের "বার্ত্তাবহ" গত ২৭ শে মাঘের সংখ্যায় "মোটা ভাত, মোটা কাপড়" শীর্ষক প্রবন্ধের একস্থলে বলিয়াছেন,—"হাটে যাও, বাটে যাও, সহরে যাও নগরে যাও,—যেখানেই যাও, দেখিবে সর্ব্বত্রই এক "চিকণ চাল" সমভাবে বর্ত্তমান! কৃষক সন্তান দেখ,—চিকণ জুতা, চিকণ ধুতী, চিকণ পীরাণ, চিকণ ওড়নী, চিকণ চুল, চিকণ টেড়ী, চিকণ ছড়ী, চিকণ ঘড়ী, চিকণ চুরুট, (সিগারেট!) চিকণ হাসি, (চিকণ কাশী ও বা!) চিকণ আহার, চিকণ বিলাস! ঐ মুটে মজুর দেখ, মোট ফেলিয়া চিকণ চা'য়ের পিয়ালায় চুমুক দিতেছে, চিকণ চুরুটে চিত্ত মস্‌গুল করিতেছে! চিকণ চা'লে ঘরে যাঁহার মোটা ভাত নাই, পরিবারবর্গের পরিধানে মোটা কাপড়ও বুঝি যোটে নাই, তাঁহার চিকণ চা'ল দেখিলে কি মনে হয় বল দেখি!" এই চিকণ চালেই তো বাঙ্গালার সর্ব্বনাশ হইতেছে। শুধু অর্থ কৃচ্ছ্রতায় পুষ্টিকর আহারের অভাবে নহে, চিকণ চালে স্বাস্থ্যহানি করিয়া আমরা যে অল্পায়ু হইয়া পড়িতেছি, তাহা অবিসংবাদিত।

বৃদ্ধ বৈদ্যের বিয়োগ।—আমরা নিতান্ত দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি, গত ১লা ফাল্গুন কলিকাতার বৃদ্ধ বৈদ্য কালিদাস বিদ্যাভূষণ ৬২ বৎসর বয়সে নিউমোনিয়া রোগে দেহত্যাগ করিয়াছেন। চিকিৎসা ব্যবসায়ে ইনি যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট হইতে ইনি "বৈদ্যরত্ন" উপাধি প্রাপ্ত হন। নদীয়া জেলার হরিপুর গ্রামে ইঁহার নিবাস, ইহা ভিন্ন কলিকাতা—রায় বাগানেও ইঁহার একখানি খরিদ করা বাড়ী আছে। শেষ জীবনে সেই বাড়ীতেই অবস্থিতি পূর্ব্বক ইনি ব্যবসায় পরিচালন করিতেন। আমরা ইঁহার বিয়োগে যথেষ্ট ব্যথা অনুভব করিয়াছি ভগবান ইঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রাণে শান্তিবারি প্রদান করুন।

আয়ুর্ব্বেদ

মাসিকপত্র ও সমালোচক।

২য় বর্ষ। | বঙ্গাব্দ ১৩২৪—চৈত্র। | ৭ম সংখ্যা।

আর্য্যঋষি জীবাণুতত্ত্ব জানিতেন কি না?

সংক্রামক রোগপ্র-সঙ্গে সে দিন এক বড় ডাক্তারের সঙ্গে কথা হইতেছিল; ডাক্তার-বাবু বলিতেছিলেন—"জীবাণুর রোগ-জননশক্তি আবিষ্কার—য়ুরোপীয় বিজ্ঞানেরই নিজস্ব। হিন্দু ঋষিরা জীবাণু তত্ত্ব বুঝিতেন না। তাঁহারা কেবল আহার-বিহারের অনিয়মকেই সকল রোগের কারণ বলিয়া স্থির করিয়া গিয়াছেন।"

হিন্দু হইয়া আমি কিন্তু এ কথায় সায় দিতে পারিলাম না। ঋষিরা জীবাণুতত্ত্বের যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছিলেন। আমরা ঋষি রচিত সংহিতা কয়খানিই বা পড়িয়াছি? ঋষিরা যে জীবাণুরহস্য য়ুরোপীয় বিজ্ঞানের ভূমিষ্ঠির বহুকালে পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছিলেন, বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমি তাহার আভাষ দিব।

জীবাণুজাত রোগ মাত্রেই সংক্রামক। সেই সংক্রামক রোগ দুই প্রকার। ১ম। বাহ্য প্রকৃতি প্রকোপজ। ২য়। অন্তঃ প্রকৃতি প্রকোপজ। সাধারণতঃ বিজ্ঞান সংক্রামক রোগকে এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে। সংক্রামক রোগের এ প্রকৃতি আর্য্য-ঋষির অগোচর ছিল না। আধুনিক বিজ্ঞান মতে যে সকল সংক্রামক রোগ বাহ্য প্রকৃতি প্রকোপজ, ঋষিদের মতে—তাহার নাম জনপদধ্বংসী মহামারী। ঋতু বিপর্য্যয়ের জন্য —দেশ-কাল-জল ও বায়ু প্রভৃতি বিকৃত হইলে, সংক্রামক রোগ জনপদ সমূহ ধ্বংস করিয়া থাকে। মানুষের দেহ, প্রকৃতি, আহার. বল, বয়ঃক্রম, সাত্ম্য. সত্ত্বাদি ভিন্ন প্রকারের হইলেও, একই জনপদে বাস করার জন্য জল বায়ু-কাল প্রভৃতির তুল্যতা থাকে। কাজেই সাধারণ ভোগ্য জল-বায়ু প্রভৃতি বিকার প্রাপ্ত হইলে, এক প্রকার রোগ সংক্রমিত হইয়া মহামারী রূপে আবির্ভূত হয়। ডাক্তারেরা যাহাকে "ম্যালেরিয়া" বলেন. তাহা বাহ্য প্রকৃতি প্রকোপজ সংক্রামক ব্যাধি, তাই ম্যালেরিয়ার প্রতিকার করিতে গেলে, হয় জল-বায়ুর বিশুদ্ধতা সম্পাদন, অথবা সেস্থান পরিত্যাগ—এই দুইটীর একটী করিতেই হইবে।

অন্তঃপ্রকৃতি প্রকোপজ সংক্রামক রোগ অনেকগুলি আছে। আর্য্যঋষি বলেন—

জ্বরঃকুষ্ঠঞ্চ শোষশ্চ নেত্রাভিষ্যন্দ এব চ।
উৎসর্গিক রোগাশ্চ সংক্রামিন্ত নরান্নরং।

অর্থাৎ জর, কুষ্ঠ, যক্ষ্মা, নেত্রাভিষ্যন্দ প্রভৃতি উপসর্গিক রোগ (বসন্ত, বিসূচিকা, হাম, বিষ, মেহ, উপদংশাদি)—ইহারা পাপজ—এক দেহ হইতে অন্যদেহে সংক্রামিত হইয়া থাকে। কিরূপে ইহার সংক্রমণ ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়? ঋষি কহিয়াছেন—

প্রসঙ্গাৎ গাত্র-সংস্পর্শান্নিঃশ্বাসাৎ সহ ভোজনাৎ
একশয্যাশাসনাচ্চৈব গন্ধ মাল্যানুলেপনাৎ॥

মৈথুন, গাত্র-সংস্পর্শ, নিঃশ্বাস, একত্রভোজন, একশয্যায় শয়ন, রোগীর ব্যবহৃত গন্ধ মাল্য, অনুলেপন (বস্ত্রাদিও বটে) ব্যবহার—ইত্যাদি কারণে সংক্রানক রোগের সংক্রমণ হইয়া থাকে।

সংক্রমণের উপায়গুলি পর্য্যালোচনা করিলে বুঝা যায়—যে সকল ব্যাধি সংক্রামক, তাহাদের মধ্যে এমন একটা শক্তি বা পদার্থ আছে, যাহা নিঃশ্বাস প্রভৃতির দ্বারা শরীর মধ্যে প্রবেশ করে। অতএব ঐ সকল ব্যাধির প্রত্যক্ষদৃশ্য কোন মূর্ত্তি না থাকিলেও উহাদের এমন একটা অদৃশ্য ও অমূর্ত্ত মূর্ত্তি আছে—যাহা রোগির নিঃশ্বাসাদির সহিত যাতায়াত করিতে পারে। তাই দার্শনিক ঋষি বলিয়াছেন—"সৌক্ষ্মাৎ কেচিদ্দর্শনাঃ" অর্থাৎ ঐ সকল রোগ-বীজ সৌক্ষ্ম হেতু সাধারণ লোকলোচনে দেখা যায় না। তপঃপ্রভাবে ঋষিদের যে দিব্যদৃষ্টি লাভ হইত, সে দৃষ্টি অতি শক্তিশালী—সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণকারী—অনুবীক্ষণকেও পরাজিত করিত। তাঁহারা রোগের অমূর্ত্ত বীজ—দিব্যদৃষ্টির সাহায্যে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন।

রোগের বীজ—জীবন্ত ও অণুপরিমিত, তাই তাহারা "জীবাণু" নামে অভিহিত। কিন্তু ঋষিরা এই রোগ-বীজাণুকে 'কৃমি' বলিতেন। কৃমি বলিলে—আমরা এখন বিষ্ঠাজাত এক প্রকার দৃশ্য কীট বুঝিয়া থাকি। ঋষিরা কৃমির এরূপ অর্থ বুঝেন নাই। তাঁহাদের মতে জীবশরীর সম্ভূত যাবতীয় রোগ-বীজাণুই 'কৃমি' নামে অভিহিত। ঐ সকল কৃমি—মল অর্থাৎ পুরীষ, মূত্র, শ্লেষ্মা প্রভৃতি শারীরিক ক্লেদ হইতে উৎপন্ন। এইজন্য আমাদের বিশ্বাস—মহর্ষি সুশ্রুত যে সংক্রামক রোগের পর্য্যায়ে জ্বরেরও নাম করিয়াছেন, সে জ্বর সাধারণ শ্রেণীর জ্বর নহে। সে জ্বর—এমন জ্বর—যাহার কৃমি-জনকতা আছে। সে জ্বর—'ম্যালেরিয়া' 'ব্লাক্ ফিবার' ও 'টাইফয়েড' শ্রেণীর বিষম জ্বর।

শরীরে যে সকল রোগ জন্মে, তাহাদের নিদান বা কারণ শরীরেরই অধর্ম্ম। যে সকল নিয়মে শরীর সুস্থ থাকে, তাহার অন্যথাচরণই শরীরের অধর্ম্ম। সংক্রামক রোগ সম্বন্ধেও ঋষিরা ঐ কথা বলিয়াছেন। য়ুরোপের বিজ্ঞান যেমন—'জীবাণু'কেই সংক্রামক রোগের কারণ বলে; ঋষিদের মতে 'বীজাণু' সেরূপ মুখ্য কারণ নহে, গৌণ কারণ মাত্র। কেননা আমরা বেশ বুঝিতে পারি—শুধু সংক্রমণের দ্বারাই রোগের উৎপত্তি হয় না, যদি সেরূপ সম্ভাবনা থাকিত, তাহা হইলে সংক্রামক রোগীর কাছে—তাহার আত্মীয় স্বজন, দাসী, পরিচারক, চিকিৎসক, যিনিই থাকিতেন, তাঁহারই রোগ জন্মিত। আমি স্বয়ং দেখিয়াছি—একজন বসন্ত রোগীর সুশ্রুষা-কারিণীর বসন্ত হইল না, অথচ অন্যত্র আর এক পল্লীতে বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।

এই জন্যই ঋষিগণ সংক্রামক রোগের উৎপত্তির কারণকে শরীরের অধর্ম্ম বলিয়াছেন। তাঁহাদের মতে অহিত ও অমিত পাপ-জনক পান-ভোজন দ্বারা সংক্রামক রোগ আপনা হইতেই জীবদেহে উদ্ভূত হইয়া থাকে। এবং ক্রমে সে রোগ নিঃশ্বাসাদির দ্বারা এক দেহ হইতে অন্যদেহে সংক্রমিত হইয়া থাকে। যদি কেবল জীবাণু হইতেই রোগের উৎপত্তির সম্ভাবনা থাকিত, তাহা হইলে এক-সঙ্গে সকলেরই রোগ জন্মিত। অতএব শারীরিক অধর্ম্মই রোগ-জননের মুখ্য নিদান। নিঃশ্বাসাদির দ্বারা সমাগত জীবাণু হইতে যে রোগোৎপত্তি—তাহা রোগের গৌণ নিদান। য়ুরোপের বিজ্ঞান সংক্রামক রোগ-প্রসঙ্গে এক 'জীবাণুর' দোহাই দিয়াই নিশ্চিন্ত। ঋষি-গণ—সংক্রামক রোগগুলির পৃথক্ পৃথক নিদান নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। সে নিদান জীবাণু হইতে পৃথক্। ঋষি বলেন—যদি দেহে তাদৃশ নিদান সমূহ নিষেবিত হয়, তবে বিনা সংক্রমণেও রোগের উৎপত্তি ঘটিতে পারে। এ কথা পাকা দার্শনিকের কথা।

আপনারা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন—"সংক্রামক রোগের যখন জীবাণু আছে এবং ঐ জীবাণু হইতে অপর জীবাণুর উৎপত্তিও ঘটিয়া থাকে—ইহা বৈজ্ঞানিক সত্য; তখন জীবাণু ব্যতিরেকে কেমন করিয়া সর্ব্বপ্রথম মানব-শরীরে সংক্রামক রোগ জন্মিতে পারে? একথা কেমন করিয়াই বা বিশ্বাস করিব? যদি অচেতন পদার্থ হইতে চেতন পদার্থের সৃষ্টি সম্ভব হইত, তাহা হইলে না হয় ঋষিদের "নিদানের" রোগজনন শক্তির কথা স্বীকার করিয়া লইতাম।" এ প্রশ্নের উত্তরে—আমরা বলিতে পারি—অচেতন হইতে চেতনের উৎপত্তি জগতে অসম্ভব বা বিরল নহে। হিন্দুর বিশ্বাস—শ্রীভগবানের উক্তি—"ময়া ততমিদং বিশ্বং জগদব্যক্ত মূর্ত্তিনা।" জগতের প্রতি অণু-পরমাণুতেই ভগবানের সত্ত্বা বিরাজিত। কি চেতন কি অচেতন, কি স্থূল, কি সূক্ষ্ম. কি দৃষ্ট কি অদৃষ্ট—সর্ব্বত্রই এক চৈতন্যময় পদার্থ অব্যক্ত ভাবে বিরাজ করিতেছে। সাংখ্য মতে তাহার নামই পুরুষ। সেই অব্যক্ত, অমূর্ত্ত, নিষ্ক্রিয়, চৈতন্যময় পুরুষ যখনই প্রকৃতির সহিত মিলিত হইতেছেন, তখনই তিনি ব্যক্ত, মূর্ত্ত পরিস্ফুট, সক্রিয় ও কর্ত্তা বলিয়া প্রতীত হইতেছেন। অতএব মানুষ যখন অহিত, অমিত অমেধ্য পাপজনক আহার-বিহারে আত্ম-নিয়োগ করিতেছে, তখন তাহার শরীরে ভুক্ত পদার্থের মধ্যস্থিত অব্যক্ত চৈতন্য বিকৃত বাত-পিত্ত-কফ-ময়ী প্রকৃতির সহিত সম্মিলিত হইয়া রোগের জীবাণুরূপে পরিস্ফুট হইতেছে। অপর কোনও জীবাণুর সাহায্যের অপেক্ষা করিতেছেনা। দর্শন শাস্ত্রের মতে—নির্বীজ সৃষ্টি বিরল নহে। উদ্ভিজ্জ সৃষ্টি সম্বন্ধে—রাঘব ভট্ট বলিয়াছেন—

"তত্র সিক্তা জলৈর্ভূমিরন্ত রুষ্ম বিপাচিতা।
বায়ুনাব্যুহ মানাত্তু বীজত্বং প্রতি পদ্যতে

জল সিক্ত ভূমি স্বীয় অভ্যন্তরস্থ উষ্মার দ্বারা বিপাচিত এবং বায়ু কর্ত্তৃক সঙ্ঘাত ভাব প্রাপ্ত হইলে বীজরূপে পরিণত হইয়া থাকে। অচেতন হইতে সচেতনের উৎপত্তি—আরও দুইখানি গ্রন্থেও স্বীকৃত হইয়াছে। যথা,—

"স্বেদজঃ স্বিদ্যমানেভ্যো ভূবহ্নিকম্ভ্যঃ প্রজায়তে।
যূক মৎকুন কীটাদ্যা যে চান্যে ক্ষণ ভঙ্গুরাঃ।"

—বিশ্বসার।

সিদ্যমান (অন্তরুষ্মা কর্ত্তৃক পচ্যমান) মৃত্তিকা, অগ্নি ও জল হইতে যুক মৎকুন প্রভৃতি

নানাবিধ ক্ষণভঙ্গুর কীট জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে।

মহর্ষি অগ্নিবেশও বলিয়াছেন—

"ত্বঙ্‌-মাংস-শোণিত-লসিকা কোথ ক্লেদ
সংস্বেদজাঃ ক্রিমায়াহভি মূর্চ্ছন্তি।"

বৈদ্যরাজ সুশ্রুতও বলিয়াছেন—

"কৃমি কীট পিপীলিকা প্রভৃতয়ঃ স্বেদজা"

ঋষিদের এই সকল উক্তি ভাবিয়া দেখিলে আমরা বেশ বুঝিতে পারি—ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্রই চৈতন্যময় পদার্থ নিয়ত অনভিব্যক্ত অবস্থাতে বর্ত্তমান রহিয়াছে, কালক্রমে তাহা অভিব্যক্ত হইতেছে। ঐ অভিব্যক্তির নাম সৃষ্টি। যেমন একই মাটী, ঘটাদি আকারে গঠিত হইয়া নানাবিধ সংজ্ঞালাভ করিয়া নানাকার্য্যে নিয়োজিত হইয়া থাকে, তেমনি একই অনভিব্যক্ত চৈতন্য পঞ্চভূতে মিশিয়া নানাবিধ দোষ-গুণের অধিকার লাভ করে। এই জন্যই কুষ্ঠ রোগের বীজাণু, যক্ষ্মা জনক অনুচিত আহার বিহারে জাত ক্ষয় বীজাণু হইতে স্বতন্ত্র। শাস্ত্রকার বলিয়াছেন—"স্বকর্ম্ম ফলভূক পুমান্"—মানুষের সুখ-দুঃখ তাহার কর্ম্মফল হইতে উৎপন্ন। যে ব্যক্তি অনাচারী অভক্ষ্যভোজী, অসংযমী, ও অধর্ম্মাচারী—তাহার শরীরে—সর্ব্বনিয়ন্তা স্রষ্টা পাপরোগ—জীবাণুরূপে প্রকাশিত হইয়া তাহাকে সংহার করিয়া থাকেন। পক্ষান্তরে যিনি সদাচারী—ধার্ম্মিক, হইয়া পবিত্রভাবে জীবন যাপন করেন, ভগবান তাহার শরীরে সঞ্জীবনী মহাশক্তিরূপে বিরাজমাণ থাকিয়া সেই ব্যক্তিকে রোগ হইতে রক্ষা করিয়া থাকেন। প্রহ্লাদ যাঁহাকে জীবন-দাতা রূপে প্রাপ্ত হইয়াছিল, হিরণ্যকশিপু তাঁহাকেই সংহারকর্ত্তারূপে লাভ করিয়াছিল। পুরাণের এ উপাখ্যান নিরর্থক নহে।

আমরা হিন্দু—অদৃষ্টবাদী—দার্শনিক জাতি। আমরা নির্বীজ-সৃষ্টি বিশ্বাস করি, আবার বীজ-সৃষ্টিও স্বীকার করি। বীজ হইতে বৃক্ষ জন্মিতেছে—ইহাকে আমরা স্থূল সৃষ্টি বলি। আর অমূর্ত্ত [অব্যক্ত ভাব] হইতে যে জীবের সৃষ্টি হইতেছে—তাহাকে সূক্ষ্মসৃষ্টি নামে অভিহিত করি। আর্য্য বিজ্ঞানের মতে—মানুষ সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই তাহার সংহারক জীবাণু জন্মগ্রহণ করে নাই। মানব সৃষ্টির যুগ-যুগান্তর পরে—দেশে অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হইলে তবে পাপরোগ জীবাণুর সৃষ্টি হইয়াছে। কিছুকাল পরে মানব যদি আরও উৎকট পাপানুষ্ঠান করে, তাহা হইলে ভবিষ্যতে আরও অসংখ্য নূতন নূতন পাপরোগের জীবাণু জন্মগ্রহণ করিতে পারে। শাস্ত্রের উপর শ্রদ্ধা রাখিয়া আমরা এইরূপ ভবিষ্যৎ বাণী করিতে পারি।

আর্য্য-বিজ্ঞান আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র আলোচনা করিয়া আমরা এইটুকু বুঝিতে পারিয়াছি—সংক্রামক রোগ কেবলমাত্র জীবাণু হইতেই উৎপন্ন হয় না, উহাদের মুখ্য নিদান আহার-বিহার আচরণ; গৌণ নিদান জীবাণু। আমরা দেখিয়াছি-শরীরে জীবাণু আশ্রয় গ্রহণ করিলেই—রোগ জন্মে না। বীজ হইতে গাছের উৎপত্তি সত্য, কিন্তু উষর ভূমিতে বা পাষাণ স্তূপে বীজ পতিত হইলে সে বীজ কখনই অঙ্কুরিত হয় না। সৃষ্টি-সাধিকা-কারণ-সমষ্টির ভিতরে একটুও বৈলক্ষণ্য থাকিলে, বীজ হইতে অঙ্কুর বাহির হইতে পারে না। এ রহস্য মহর্ষি চরক গর্ভাবক্রান্তি নামক অমূল্য অধ্যায়ে বিশেষরূপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বীজ হইতে অঙ্কুরোদ্গমের জন্য কর্ষিত, সারযুক্ত, উর্ব্বর ভূমি আবশ্যক। তদ্রূপ

জীবাণু হইতে রোগোৎপত্তি হইবার পূর্ব্বে জীবাণুর বিকাশ উপযোগী অহিত আহার অনুষ্ঠানাদি সেবিত, পাপময় শরীর চাই। এ কথা অস্বীকার করা চলে না।

শৈশবে বিষ্ণুশর্ম্মার গ্রন্থে পড়িয়াছিলাম—
শঙ্কাভিঃ সর্ব্বমাক্রান্তং মন্নপানঞ্চ ভূতলে।
প্রবৃত্তিঃ কুৎ কর্ত্তব্যা জীবিতব্যং কথং নু বা॥

আমরা প্রত্যহ যে সকল জিনিষ পানভোজন করিতেছি, অনবরত যে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করিতেছি,—কে বলিতে পারে, তাহাতে আমাদের শরীরে জীবাণু প্রবেশ করিতেছে কি না?—তথাপি আমরা সকল সময়েই তো রোগাক্রান্ত হই না। এই জন্যই—যাহার ঐকান্তিকতা নাই, আয়ুর্ব্বেদ তাহাকে নিদানের অন্তর্ভুক্ত করেন নাই। নতুবা জীবাণুতত্ত্ব ঋষিরা ভাল রকমই জানিতেন।

আয়ুর্ব্বেদে চিকিৎসার মূল মন্ত্র -
"সংক্ষেপতঃ ক্রিয়াযোগোনিদান পরিবর্জ্জনম্॥"
ইহার অর্থ—রোগ হইতে মুক্তিলাভ করিতে হইলে, নিদান-পরিবর্জ্জন—সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। বাস্তবিক, যে সকল কারণে রোগোৎপত্তি হইয়া থাকে, সেই সকল কারণ ত্যাগ করিতে না পারিলে, রোগ কখনই সারে না। সংক্রামক রোগীর সাহচর্য্য হইতে দূরে থাকিলে সংক্রামক রোগ জন্মিবার ভয় নাই। কিন্তু যদি তাদৃশ রোগোৎপাদক অনুচিত আহার—বিহারাদি প্রতিনিয়তই আচরিত হয়,তাহা হইলে সংক্রামক রোগির নিকট হইতে লক্ষ যোজন দূরে থাকিলেও আপনা হইতে শরীরে সংক্রামক রোগ উৎপন্ন হইবে—ইহাই ঋষিদের উপদেশ—ইহাই আর্য্য বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত।

অতএব যদি সংক্রামক রোগ হইতে রক্ষা পাইতে চাও, তাহা হইলে শুধু সংক্রামক রোগীর সামীপ্য ছাড়িলেই চলিবে না। তোমাকে শারীরিক ও মানসিক—উভয় অধর্ম্মই পরিত্যাগ করিতে হইবে। ঋষিদের উপদেশ পালন করিলে, তুমি নিশ্চয়ই স্বাস্থ্য ও দীর্ঘ জীবন পুরস্কার পাইবে। আর যদি তুমি সদাচারী না হও, নিয়ত অহিত-অমিত-অপবিত্র-পান-ভোজন পরিত্যাগ না কর, শাস্ত্র বাক্য না মান, পূজ্য ব্যক্তির অবমাননা কর, উপভোগকেই জীবনের সর্ব্বস্ব ভাব, লোভ-মোহে মত্ত হও—তাহা হইলে নিশ্চয় জানিও—তোমার আচরিত পাপ কর্ম্ম—তোমাকে ঈশ্বরের অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত করিবে,—তোমার কৃত পাপই একদা রোগ-জীবাণুরূপে তোমার দেহে জন্ম গ্রহণ করিয়া তোমাকে ধ্বংস মুখে প্রেরণ করিবে। তখন বায়ু পরিবর্ত্তন, ঔষধ সেবন, আহার্য্য দ্রব্য হইতে মক্ষিকা তাড়ানোর ব্যবস্থা,—যাহাই কিছু কর না কেন, কিছুতেই তোমার রক্ষা নাই। পৃথিবীতে দীর্ঘজীবী হইতে হইলে—অটুট স্বাস্থ্য ভোগ করিতে হইলে—আবার তোমাকে ঋষি-মতেরই উপাসনা করিতে হইবে।

শ্রীরামসহায় কাব্যতীর্থ
বেদান্ত শাস্ত্রী।

পরিবর্ত্তিত প্রণালীতে আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ প্রস্তুত করা উচিত কিনা ?

(২)

"কনকাসবের" কথায় আরও একটা বিষয় মনে পড়িতেছে। গ্রন্থকর্ত্তার উপদেশ—ধুস্তুরের শাখাপত্র ও ফল—সমস্তই গ্রহণ করিতে হইবে। ধুতুরা বৃক্ষে সকল সময় সমান ফল থাকে না। আবার কোনও গাছে বা অধিক ফল, কোনও গাছে বা কম ফল দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন ঋতুতে গাছে মোটেই ফল ফল ধরে না। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় স্থিরীকৃত হইয়াছে—ধুতুরা বৃক্ষের মূল ও শাখার চেয়ে ফল ও পত্র—তেজস্কর। প্রাচীন মতে তৈয়ারী "কনকাসবে" ধুতুরার বীর্য্য কতটা থাকিল, তাহা বুঝিবার উপায় নাই। এদিকে ঋতুভেদেও বৃক্ষের তেজ বা বার্য্যের হ্রাস হইয়া থাকে। গ্রীষ্মকালের শীর্ণ বৃক্ষ হইতে প্রস্তুত আসব যে মাত্রায় রোগীকে দেওয়া যায়, শীতকালের পুষ্ট বৃক্ষজাত আসব—সে মাত্রায় ব্যবহার করা চলে না। বিশেষতঃ ধুতুরা যখন—উপবিষ, উহার মাত্রাতিশয় জীবনকে বিপন্ন করিতে পারে, তখন ধুতুরা হইতে জাত ঔষধে একটুও অনিশ্চিত থাকা উচিত নহে। কেবল মাত্র—ধুতুরার পাতা ব্যবহার করিলে, আর কোন গোলযোগ থাকে না। ধুতুরার পত্র—শাখা ও মূলের চেয়ে বীর্য্যবান।

কনকাসবের আর একটী উপাদান—বাসক মূলের ছাল। আয়ুর্ব্বেদে যে যে ঔষধে বাসকের প্রয়োগ আছে, সেই সেই ঔষধে বৈদ্যগণ বাসকের মূল ব্যবহার করেন। তাঁহাদের বিশ্বাস—মূলের বীর্য্যই বেশী। কিন্তু রাসায়ণিক পরীক্ষায় সম্প্রতি জানা গিয়াছে—বাসকের বীর্য্যাংশ মূলের চেয়ে পাতাতেই বেশী থাকে। এরূপ অবস্থায় কষ্টলব্ধ মূল পরিত্যাগ করিয়া, বাসকের পাতাকেই ঔষধের উপাদান স্বরূপ গ্রহণ করা উচিত।

পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থকারগণ বরং আসব অরিষ্ট প্রয়োগ করিতেন। কিন্তু বৌদ্ধযুগের পর—ভিষক সমাজে আসব অরিষ্টের আর আদর ছিল না। বৌদ্ধযুগের "অর্ক প্রকাশ" ও "আসব বিধান" নামক দুইখানি ক্ষুদ্র পুস্তকে আসব ও অরিষ্ট প্রয়োগের প্রাচুর্য্য পরিলক্ষিত হয়। বৌদ্ধ শ্রমণগণ ধর্ম্ম প্রচারকের ব্রত গ্রহণ করিয়া দেশে দেশে ভ্রমণ করিতেন—তাঁহাদের সঙ্গে জীবের যন্ত্রণা নিবারণের জন্য নানাবিধ ঔষধ থাকিত। পান্থের পক্ষে স্বরস বা টাটকা ঔষধ সংগ্রহ করা সম্ভব হইত না। কাজেই শ্রমণগণ—আসব প্রস্তুত করিয়া লইতেন। দুই একখানি তন্ত্রেও আসব অরিষ্টের প্রসঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়। শার্ঙ্গধর ও চক্রদত্ত কতকগুলি আসব অরিষ্টের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ইহাদের পরবর্ত্তী কোন গ্রন্থকারই আসব অরিষ্টের তেমন উল্লেখ করেন নাই। অত বড় সংগ্রহ গ্রন্থ "ভাব প্রকাশ"—যাহাতে নষ্ট প্রায় শল্যতন্ত্রও স্থান পাইয়াছে—সে ভাবপ্রকাশেও কেবল মাত্র "লৌহারিষ্ট" ছাড়া অন্য অরিষ্টের ব্যবহার দেখিতে পাই না। ইহাতেই অনুমান হইতেছে—প্রস্তুতের দোষে

সেকালে অরিষ্টের ব্যবহার পরিত্যাগ করিতে অনেকেই বাধ্য হইয়াছিলেন। এক্ষণে নূতন করিয়া, আসব অরিষ্টের প্রচলন আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। পরিবর্ত্তিত প্রণালী মতে শাস্ত্রোক্ত আসব অরিষ্ট ছাড়া—অনেকগুলি ঔষধের জার হইতেই নূতন আসব অরিষ্ট প্রস্তুত হইতে পারে। অধিকন্তু—বটিকা, চূর্ণ প্রভৃতির চেয়ে, রোগির দেহে আসব অরিষ্ট যে শীঘ্রই প্রভাব বিস্তার করিতে পারে—ডাক্তারী মতের টীংচার গুলিই তাহার একমাত্র প্রমাণ।

পরিবর্ত্তিত প্রণালীতে প্রস্তুত আসব, অরিষ্ট ব্যবহার করিতে—কবিরাজ মহাশয়েরা আপত্তি করিতে পারেন। কিন্তু প্রকারান্তরে অনেক কবিরাজ মহাশয়ই তো পরিবর্ত্তিত প্রণালী অবলম্বন করিতেছেন। কবিরাজী ক্যাটালগে যে "কর্পূরাসব" নামক আসবের বিজ্ঞাপন দেখিতে পাই, উহা যে শাস্ত্রীয় প্রণালীতে প্রস্তুত আসব—একথা কেহই বোধ হয় সাহস করিয়া বলিতে পারিবেন না। ডাক্তারেরা যে "টিঞ্চার ক্যাম্ফার" বা "স্পিরাট ক্যাম্ফার" ব্যবহার করেন, "কর্পূরাসব" তাহাই। কেবল জমকালো নাম লইয়া "কর্পূরাসব" ও মৃগমদাসব" শাস্ত্রের দোহাই দিতেছে মাত্র। যে সকল আসব বা অরিষ্ট পেটেণ্ট ঔষধের মত বিক্রয় হয়, সেগুলির কেহই প্রায় শাস্ত্রীয় আসব নহে। যে জিনিস শাস্ত্রীয় খোলস পরিয়া সমাজে বাহির হইয়াছে, তাহা প্রকাশ্যে কেন গৃহীত হইবে না?

পরিবর্ত্তিত প্রণালীতে আসব অরিষ্ট প্রস্তুত করিলে, আর একটী মহদুপকার হইবে। অনেক ঝঞ্ঝাট বলিয়া আজকাল পাচনের ব্যবহার উঠিয়াই গিয়াছে। কবিরাজ মহাশয়গণ যদি পাচনের ক্বাথ-সংরক্ষণ নিয়মে রক্ষা করিয়া রোগীকে প্রদান করিতে পারেন, রোগী তাহা আনন্দের সহিত ব্যবহার করিবে, যেখানে কাঁচা স্বরস আবশ্যক, সেখানে এইরূপ ক্বাথ অনায়াসেই ব্যবহার চলিবে। প্রয়োজনানুযায়ী—চরক-চক্রদত্তোক্ত অনেক পাচনও আসব, অরিষ্টের আকারে রক্ষা পাইবে। আমি যতদূর জানি, পাচন ও অনুপানের ভয়ে—অনেকেই কবিরাজী ঔষধ সহসা ব্যবহার করিতে স্বীকৃত হন না। পাচনের ক্বাথকে আসবে পরিণত করিতে পারিলে—রোগী ও চিকিৎসক—উভয়ের পক্ষেই সুবিধা হয়।

যাঁহারা রক্ষণশীল—তাঁহারা বোধ হয় আমার প্রস্তাবে সম্মত হইবেন না। সুরাসারের সাহায্যে—আসব-অরিষ্ট সংরক্ষণ—তাঁহারা অনুমোদন করিবেন না। তাঁহাদের প্রতি এ অধমের নিবেদন—সুরাসারের পরিবর্ত্তে তাঁহারা গ্লিসারিন ব্যবহার করিতে পারেন। গ্লিসারিং, মধুর সুযোগ্য প্রতিনিধি, অতএব কবিরাজ মহাশয়েরা যেখানে মধু ব্যবহার করিতে পারেন, সেখানে অনায়াসেই গ্লিসারিন প্রয়োগ করা চলে। যে ভেষজ দ্রব্যের স্বরস খুব উপকারী —অথচ সর্ব্বদা স্বরস প্রাপ্তির সুবিধা নাই, সে স্থলে ক্বাথের মত স্বরসকেও রক্ষা করা উচিত। ইহা একেবারেই কঠিন নহে। কাঁচা দ্রব্যের নিষ্পীড়িত স্বরসে কিয়ৎ পরিমাণে গ্লিসারিং মিশাইলেই স্বরস রক্ষিত হয়। এইরূপ সংরক্ষিত স্বরস ঠিক Succusএর মতই হইবে। তবে এইরূপ সংরক্ষিত স্বরস, দীর্ঘকাল ফেলিয়া রাখা অনুচিত। তাহাতে স্বরস থিতাইয়া যাইবে, ফলে স্বরস কিছু পরিমাণে হীনবীর্য্যও হইবে।

অবলেহ্য বা লেহ।—অবলেহ এক রকম ঘন সার। ভেষজ দ্রব্যের ক্বাথকে

চিনী বা গুড় সংযোগে ঘন করিলে লেহ প্রস্তুত হয়। সুতরাং লেহ এক প্রকার কাথ সংরক্ষণেরই নামান্তর। কিন্তু লেহ প্রক্রিয়ার প্রধান দোষ—ইহাতে কাথকে যেরূপ ঘন করিতে হয়, তাহাতে কাথ পুড়িয়া যাইতে পারে। বাষ্প-তাপে কাথকে ঘন করিয়া লইলে—সে ভয় থাকে না। আমি "কুটজাবলেহ" নামক প্রসিদ্ধ ঔষধটীকে জলে ফেলিয়া দেখিয়াছি—তাহার কতক অংশ জলে অদ্রবনীয় ভাবে রহিয়া গিয়াছে বাষ্পতাপে লেহ পাক করিলে, লেহের কোনও অংশই জলে অদ্রবনীয় থাকিবে না।

চূর্ণ, বটিকাদি।—ইহাদের সম্বন্ধে বিশেষ কোনও পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন নাই। কেবল উপাদানগুলি, টাটকা এবং চূর্ণগুলি যতদূর সম্ভব সূক্ষ্মভাবে প্রস্তুত করা চাই।

ঘৃত ও তৈল।—"ঘৃত" ও "তৈল"—কবিরাজী চিকিৎসার একটী প্রধান উপকরণ। আমি নিজে দেখিয়াছি—এক ভদ্রলোক প্রায় ৩ বৎসর কাল ঘুষঘুষে জ্বরে ভুগিয়াছিলেন। প্রত্যহ একই সময়ে তাঁহার জ্বর আসিত। ডাক্তার দেখাইতে তিনি ক্রুটী করেন নাই। শেষে ডাক্তারেরা জবাব দিলে, তিনি বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য দেশে দেশে ভ্রমণ করেন। তাহাতেও কোন ফল হইল না, ভদ্রলোক দেশে ফিরিয়া আসিলেন। প্রতিজ্ঞা করিলেন—তিনি মরিবার জন্যই প্রস্তুত, ঔষধ আর খাইবেন না। এইবার কবিরাজী চিকিৎসার পালা। কবিরাজ বড় সঙ্কটে পড়িলেন, রোগী পাচন-বটীকা-চূর্ণ-বটক—কিছুই খাইতে সম্মত নহে। কবিরাজ মহাশয় তখন—রোগীকে কিরাতাদি তৈল ব্যবস্থা করিলেন। এই তৈল ১৫।১৬ দিন ব্যবহার করিতেই রোগীর জ্বর ত্যাগ হইল, টেম্পারেচার সবনর্ম্যাল হইল, তিনি অনেকটা স্বস্তিবোধ করিতে লাগিলেন। ক্ষুধা বাড়িল। গায়ের জ্বালা কমিল। প্রায় দুই মাসে তাঁহার শরীরে পূর্ব্বস্বাস্থ্য অনেকটা ফিরিয়া আসিল। এ ঘটনা—আমার শোণা কথা নহে, প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট ব্যাপার। আমি নিজে ১২ মাস গুড়ুচ্যাদি তৈল ব্যবহার করি—আমার বয়স ৫৮।৫৯, কিন্তু আমাকে দেখিলে ৩০।৩৫ বোধ হয়। আমি কবিরাজী তৈলের অনন্য শরণ ভক্ত।

এই জন্যই তৈল পাক সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে কল্ক, কাথ, এবং দ্রব পদার্থ (দুগ্ধ, দধির মাত, শতাবরী প্রভৃতির রস, কাঞ্জিকাদি) এইগুলি তৈল ও ঘৃত পাকের অঙ্গ। ঘৃত ও তৈল পাকের নাম "স্নেহ-পাক"। স্নেহপাকের সাধারণ নিয়ম —স্নেহের চতুর্থাংশ কল্ক, চতুর্গুণ দ্রব দিয়া স্নেহ পাক করিতে হয়। স্নেহে কাথ দিতে হইলে, কাথ্য দ্রব্য ৪ গুণ, ৮ গুণ, অথবা ১৬ গুণ জল দিয়া সিদ্ধ করিতে হয়।

কাঁচরাপাড়ার কবিরাজদের মত—স্নেহের সহিত দধি, দুগ্ধ, তক্র, কাঞ্জিক, মাংসের কাথ প্রভৃতি দিতে হইলে,—এই দ্রব পদার্থের সংখ্যা যদি পাঁচ বা ততোধিক হয়, তবে প্রত্যেকটী স্নেহের সম পরিমাণে দিতে হয়। আর যদি দ্রবের সংখ্যা একটী, ২টী, ৩টী বা ৪টী হয়—তাহা হইলে প্রত্যেকটী স্নেহের চতুর্গুণ দিতে হইবে। কাঁচরাপাড়ায় ৺ উপেন্দ্র বরাট, দুর্গানন্দ, প্রভৃতি বৈদ্যগণ এই নিয়মে ঘৃত বা তৈল পাক করিতেন।

যদি স্নেহ পাকে কেবল কল্কের উল্লেখ থাকে, অথচ কোন দ্রবের উল্লেখ না থাকে তবে কল্ক দ্রব্যগুলি জলে পেষণ করিয়া

তাহার সহিত স্নেহের ৪ গুণ জল মিশাইয়া পাক করিতে হয়। আবার যেখানে কেবল মাত্র ক্বাথ দিয়া স্নেহ পাকের ব্যবস্থা আছে, সেখানে ক্বাথ্য দ্রব্য গুলিকে কল্ক স্বরূপেও দ্বিতীয় বার গ্রহণ করিতে হয়। মোটামুটী নিয়ম—কল্কের সহিত স্নেহ পাক কিম্বা ক্বাথের সহিত স্নেহ পাক। কিন্তু ক্বাথের সহিত পাচিত, উৎপন্ন স্নেহে আমরা পাই—অর্দ্ধ দগ্ধ ঘনীভূত ক্বাথ ও স্নেহ পদার্থ। ইহা ছাড়া আর নূতন কিছু পাই না। ক্বাথ প্রস্তুত করিবার সময়—ক্বাথ্য দ্রব্যের জলে দ্রবনীয় অংশ ক্বাথে মিশিয়া যায়। এই ক্বাথকে ঘৃত বা তৈলের সহিত দ্বিতীয়বার পাক করিলে—ক্বাথ্য দ্রব্যের যে অংশ জলে অবিকৃত ভাবে নিষ্কাশিত হইয়াছিল, ফুটন্ত ঘৃতের উত্তাপে তাহার কিয়দংশ অঙ্গারে পরিণত হইয়া যায়। সুতরাং ক্বাথকে ঘৃত বা তৈলের সহিত পাক করায় ক্বাথের অনেকটাই নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু শিলা পিষ্ট কল্ক দ্রব্য যদি স্নেহের সহিত পাক করা যায়, তাহা হইলে, কল্কের দ্রবনীয় সকল অংশই স্নেহে মিশ্রিত হয়। ইহাতে আর এক লাভ—জল যাহা গ্রহণ করিতে পারে নাই, ভেষজ দ্রব্যের সে অংশও স্নেহ আকর্ষণ করিয়া লইতে পারে। যেমন ভল্লাতক; ভেলাকে জলে সিদ্ধ করিলে, ভেলার অনেক অংশ বা বীর্য্য—জল গ্রহণ করিতে পারে না, ঐ অগ্রাহ্য অংশ তৈলের মত জলে না মিশিয়া, উপরে বিন্দুর মত ভাসিতে থাকে। কিন্তু ঘৃত বা তৈলের সহিত সজল ভেলা সিদ্ধ করিলে, ভেলার সমস্ত বীর্য্য ঘৃতে বা তৈলে উত্তমরূপে মিশ্রিত হয়। হয়। মোট কথা—যে ভেষজ দ্রব্যে তৈলের অস্তিত্ব আছে, সে তৈলাংশ, জল গ্রহণ করিতে পারে না অথবা সামান্য পরিমাণে পারে। ঘৃত বা তৈল দ্রব্যের সমস্ত বীর্য্যই গ্রহণ করিতে সক্ষম। আমার বিশ্বাস—যদি বিজ্ঞানকে সম্মান করিতে হয়, তবে—কল্কের সহিত স্নেহ পাকের সার্থকতা আছে। ক্বাথের সহিত স্নেহ পাক—না করাই ভাল। আমি কবিরাজ মহাশয়দিগকে এই কথা বলিতে চাহি—তাঁহারা ক্বাথের সহিত স্নেহ পাক না করিয়া কল্কের সহিত স্নেহ পাক করুন। ইহাতে পাক করা ঘৃত-তৈল যথেষ্ট বীর্য্যবান্ ও ফলপ্রদ হইবে। স্নেহের সহিত দধি-দুগ্ধাদির পাকে—আমার কোনও অভিজ্ঞতা নাই, এ কার্য্য শাস্ত্রকারদের উপদেশ মত করাই উত্তম।

এ সম্বন্ধে আমি দুই একজন পাক বিদ্ কবিরাজের সঙ্গে পরামর্শ করিয়াছিলাম। তাঁহারা আমাকে বলিয়াছিলেন—পাকের দ্বারা ঘৃত বা তৈল অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়। যে রোগী কাঁচা ঘৃত বা তৈল সহ্য করিতে পারে না. ভেষজপক্ক ঘৃত-তৈল সে অনায়াসেই সহ্য করিতে পারে। কথাটা অসঙ্গত নহে। কিন্তু আমার বক্তব্য—ঘৃত বা তৈল পাকে, উহারা উদ্দেশ্য নহে, নিমিত্ত মাত্র। কেবল ঘৃত বা তৈল সহ্য করাইবার জন্য কবিরাজেরা উহাদের ব্যবস্থা করেন না। যদি ঘৃতের সহিত ভেষজ দ্রব্যের পূর্ণ গুণের সত্বার আবশ্যক থাকে, তবে আধুনিক বিজ্ঞানের মতে—কেবল কল্কের দ্বারাই স্নেহ পাক করিতে হইবে। আমার এই কথাটী কবিরাজ মহাশয়েরা কি ভাবে গ্রহণ করেন, আশা করি এই "আয়ুর্ব্বেদ" পত্রেই আমি তাহা জানিতে পারিব। *

শ্রীসতীশচন্দ্র রায় এম এ,

* এই প্রবন্ধের রচনাকালে রাসায়নিক পরীক্ষক শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র দাস গুপ্ত মহাশয়ের নিকট হইতে

"অপত্য তত্ত্বের" উপসংহার

—:০:—

প্রবন্ধের প্রথমেই একখানি পত্র অবিকল উদ্ধৃত করিলাম ;—

"ভাই !

"অপত্যতত্ত্ব" শীর্ষক আমার একটী প্রবন্ধ সম্প্রতি 'আয়ুর্ব্বেদ' পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। তুমি তাহা অবশ্যই পাঠ করিয়াছ। প্রবন্ধটী সম্পূর্ণ করিবার জন্য, পাঠক মহল হইতে ৪।৫ খানি তাগিদ-পত্র পাইয়াছি। কিন্তু অপত্যতত্ত্ব সম্বন্ধে য়ুরোপীয় বিজ্ঞানের মত আমি আলোচনা করিয়াছি, ঋষিদের সিদ্ধান্তও যথাসাধ্য লিপিবদ্ধ করিয়াছি, সাধারণের কাছে তথাপি প্রবন্ধটী অসম্পূর্ণই রহিয়া গিয়াছে। আয়ুর্ব্বেদ ও তন্ত্র রহস্য আমি বড় বেশী বুঝিনা, সুতরাং অপত্যতত্ত্বের উপসংহার ভাগ তোমাকেই লিখিতে হইবে। ইতি।

শুভাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীসতীশ চন্দ্র রায়।"

প্রসিদ্ধ সাহিত্যক, আমার অগ্রজ স্থানীয় সতীশ বাবু যখন আমাকে এতটা দিগ্‌গজ ঠাওরাইয়াছেন, তখন ত আর চুপ করিয়া থাকা চলেনা! পতঙ্গের উপর মাতঙ্গের ভার আজ আমার মত মহা মুর্খকেও যে অস্বাভাবিক আত্মাভিমানে স্ফীত করিয়া তুলিয়াছে—বর্ত্তমান প্রবন্ধে পাঠকগণ কেবল সেই টুকুই বুঝিতে পারিবেন। সতীশ বাবুর আদেশেই আজি আমি আমার জীবনব্যাপী মনীষাদৈন্যকে লোক চক্ষুর সম্মুখে সপ্রমাণ করিতে অগ্রসর হইতেছি। পাঠকগণ আমাকে ক্ষমা করিবেন।

সন্তানোৎপাদনের জন্য স্ত্রী ও পুরুষের সম্মিলন চাই। কেননা, পুরুষ অনুপ্রাণয়িতা, স্ত্রী তাহার বশবর্ত্তিনী শক্তি। বেদে—পুরুষ হোতা, স্ত্রী ঋত্বিক ; বৌদ্ধে—স্বামী প্রবুদ্ধাচার্য্য, স্ত্রী—অনুবর্ত্তিনী শিক্ষা। তন্ত্রে—স্বামী চিদাধার, স্ত্রী বিশ্ব প্রকৃতি। পুরুষ—সন্ন্যাস, স্ত্রী সংসার। ঈশ্বরের অপ্রতিহত বিধান বলে—স্ত্রী-পুরুষের ভেদ আমরা অতি সহজেই বুঝিতে পারি। কিন্তু কেন যে পুত্র জন্মায়, কেন বা কন্যা জন্মায়, ইহার মিমাংসা করা বড়ই কঠিন ব্যাপার। রমানাথ বাবু পুরুষ, তাঁহার পুত্র আছে, কন্যাও আছে, অতএব ভিতরকার রমানাথ—কতকটা পুরুষ, কতকটা স্ত্রী, নতুবা রমানাথ হইতে পুত্র-কন্যার উৎপত্তি হইতেই পারেনা, অথবা রমানাথ এমন একটী পদার্থ, যাহার কোন লিঙ্গ নাই, যাহা স্ত্রী ও নহে, পুরুষ ও নহে, অথচ তাহার পুত্র-কন্যা উৎপাদনের শক্তি বর্ত্তমান। সন্তানের লিঙ্গভেদ-ক্রিয়া তাহার বশবর্ত্তী; যদিও রক্ত মাংসের বা স্থূল রমানাথের নিজের ইচ্ছায় সে ক্রিয়া সম্পন্ন হইতে পারে না। আবার ইহাও মনে হইতে পারে, গর্ভযোগ সময়ে এমন একটা কিছু ঘটিয়াছিল, এমন কোনও পদার্থের

যথেষ্ট পরিমাণে সাহায্য পাইয়াছি। আমার অনুজোপম, বঙ্গ সাহিত্যে প্রথিত যশা লেখক শ্রীযুক্ত ব্রজ বল্লভ রায়, কতকগুলি গ্রন্থ যোগাড় করিয়া দিয়া আমাকে উপকৃত করিয়াছেন। —লেখক।

হ্রাস বা আধিক্য হইয়াছিল, যে জন্য রমানাথের পুত্র বা কন্যা জন্মিয়াছে। ঋষিদের মধ্যে কেহ কেহ বলেন,—ইহজন্মে পুত্র বা কন্যা রূপে ভূমিষ্ঠ হওয়া—শিশুর অদৃষ্ট-ফল মাত্র। পূর্ব্ব জন্মের কামনা পূর্ণ করিবার জন্য জীবাত্মা প্রয়োজন মত পুরুষ বা স্ত্রীর আকারে প্রকাশিত হইয়া থাকেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ—তাঁহাদের জড়াত্মিক বিজ্ঞানে জীবের জন্মান্তর পরিগ্রহ মানিতে চাহেন না। আমরা কিন্তু জন্মান্তরের কথা মর্ম্মে মর্ম্মে বিশ্বাস করি।

আমাদের শাস্ত্রে যম ও নিয়ম এক। আমার-সাহিত্য গুরু, আচার্য্য অক্ষয় চন্দ্র "পূর্ণিমা" পত্রিকায় এ সম্বন্ধে একটি যুক্তিপূর্ণ সন্দর্ভ লিখিয়া ছিলেন। অনুসন্ধিৎসু পাঠক ১৩১৬ সালের পূর্ণিমা পড়িলে তাহার রসাস্বাদন করিতে পারিবেন। আমরা চিত্রে দেখি—হরের কোলে গৌরী বিরাজিতা, ইহার অর্থ মৃত্যুর কোলে জীবন, বিশ্লেষের বুকে সংশ্লেষ, অচেতনের মধ্যেই চেতনের লীলা। জীবনের উন্মেষ—কর্ম্মক্ষেত্রে যবনিকা উথান মাত্র। জীবন হইতে মরণ, মরণ হইতে জীবন, ইহা দার্শনিক সত্য। হরগৌরী মূর্ত্তি—তাই চতুস্পাদ বৃষের উপর অধিষ্ঠিত। এই বৃষ—ধর্ম্মরূপী—মহাসত্য। ইহা তন্ত্রের রূপক।

সাংখ্যকার জড়পরমাণুর (পঞ্চতন্মাত্র) ন্যায় জীবনের পরমাণু নামক একটী স্বতন্ত্র পদার্থের উল্লেখ করিয়াছেন। এই জীবনের পরমাণুই পুরুষ। ইহার জন্য উদ্ভিদ, মানুষ প্রভৃতি বিভিন্ন জৈবিক পদার্থে একই রূপ জীবন উৎপন্ন হইয়া থাকে। এ সকল কথার বিস্তৃত ব্যাখ্যা আপাততঃ নিস্প্রয়োজন। আবশ্যক হইলে, শারীরবিদ্যা-অধ্যায়ে ইহার আলোচনা করিব।

'অপত্য তত্ত্ব' আলোচনা করিবার সময় আমাদেব মনে স্বতঃই তিনটী প্রশ্ন উদিত হইয়া থাকে।

(১) স্ত্রী-পুরুষ ভেদ কত দিনের?

(২) সৃষ্টির প্রথম হইতেই কি এইরূপ লিঙ্গভেদ আছে?

(৩) তাহা না হইলে, ইহা কবে বা কেমন করিয়া হইল?

তন্ত্রই এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন। মানুষের কেন পুত্র বা কন্যা জন্মায়? এই পুত্র বা কন্যা উৎপাদন তাহার নিজের ইচ্ছামত হয় কিনা? তন্ত্র ভিন্ন তাহার উত্তর আর কোথাও মিলিবে না। সুতরাং প্রথমেই আমি তন্ত্রের যুক্তি অনুসন্ধান করিব। আমাদের তন্ত্রের আগা গোড়াই রূপকে পরিপূর্ণ। তন্ত্রের রূপক—আর্য্য-সিদ্ধান্তের অস্থি মাংসময় প্রতিমূর্ত্তি। দার্শনিক সত্য সকলে ধারণা করিতে পারে না, তান্ত্রিক তাই সেই সত্যকে রক্ত মাংসের সংযোগে স্থূল দেহাবয়ব প্রদান করিয়াছেন। পুরাণের দেবতাগণ—তন্ত্রের রূপক। পাঠকগণ তন্ত্রে অর্দ্ধ নারীশ্বর নামক রূপকটীর কথা অবশ্যই অবগত আছেন। আমি এই অর্দ্ধ নারীশ্বরের কথায় ঋষি-মতের লিঙ্গভেদ বুঝিবার চেষ্টা করিব।

মনুসংহিতার জগতোৎপত্তি অধ্যায়ে মনু বলিয়াছেন—

"অর্দ্ধেন নারীং * * বিরাজ মসৃজৎ প্রভুঃ"

ইহার অর্থ—সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর অনন্ত বিরাজ মূর্ত্তিকে দুই অংশে বিভক্ত করিলেন। তাহারই একাংশ স্ত্রী এবং অপরাংশ পুরুষ হইল। মনুসংহিতার এই মহাসত্যকে তন্ত্র সাধারণ বোধ্য করিবার জন্য স্থূলরূপে অর্দ্ধ নারীশ্বর মূর্ত্তিতে গঠন করিলেন। অর্দ্ধ নারীশ্বর মূর্ত্তির

অর্থ—জীব-জগৎ উৎপত্তি কালে স্ত্রী-পুরুষ তত্ত্ব বিশিষ্ট ভাবে পৃথক হয় নাই। অর্থাৎ বর্ত্তমান জগতে যে সকল পুরুষ বা স্ত্রী-জীব দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের আদি পুরুষের (কারণের) লিঙ্গ ভেদ ছিল না। সে আদি কারণ—স্ত্রীও বটে পুরুষও বটে। সেই মৌলিক উভয় লিঙ্গত্ব হইতে স্ত্রী-পুরুষ ভেদের উৎপত্তি।

সুশ্রুতসংহিতা পাঠ করিলে আমরা জানিতে পারি—আর্য্য ঋষিগণ পুং-বীর্য্যের মত স্ত্রী-বীর্য্যেরও অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন। তাঁহারা আর্ত্তব ও স্ত্রী বীর্য্য একার্থে প্রয়োগ করিয়াছেন। আর্ত্তবের অর্থ—ঋতু-ভব শোণিত হইলেও, সে রক্তে স্ত্রী-বীর্য্য (ovum) ভাসিয়া আসে। অতএব শুক্রার্ত্তবের সম্মিলনে গর্ভোৎপত্তি হইয়া থাকে। এস্থলে আর্ত্তব অর্থে স্ত্রী শুক্র বা 'ওভম্' বুঝিতে হইবে।

চরক বলেন—"গতে পুরাণে রজসি নরে চাবস্থিতে পুনঃ শুদ্ধ স্নাতাং স্ত্রিয়্ মব্যাপন্ন-যোনি শোণিত গর্ভাশয়া মৃতুমতাং আচক্ষহে।" পূর্ব্ব মাসের পুরাতন রজঃ ঋতু শোণিতে নিঃসৃত হইয়া নূতন রজঃ প্রস্তুত হইলে সেই শুদ্ধ স্নাতা, অদুষ্ট যোনি-শোণিত-গর্ভাশয় বিশিষ্টা স্ত্রীকে "ঋতুমতী" বলা যায়। এইরূপ ঋতুমতী স্ত্রীতে অদুষ্ট বীর্য্য পুরুষ উপগত হইলে, রজঃ শুক্রের সংযোগে গর্ভ উৎপন্ন হইয়া থাকে। সুশ্রুতের মতে—"শুক্র বাহুল্যাৎ পুমান আর্ত্তব বাহুল্যাৎ স্ত্রী সাম্যাদুভায়ার্নপুংসকমিতি। [শারীর স্থান, ৩য় অধ্যায়]—অর্থাৎ শুক্র বাহুল্যে পুত্র, আর্ত্তব বাহুল্যে কন্যা এবং শুক্রার্ত্তব তুল্য হইলে সন্তান নপুংসক হইয়া থাকে। ঋতুর দ্বাদশ দিবস পর্য্যন্ত গর্ভকাল। ঋষিদের মতে—নূতন রজঃ বা স্ত্রী বীর্য্য না হইলে গর্ভোৎপত্তি ঘটে না। সুতরাং ঋতুর দ্বাদশ দিন পর্য্যন্ত গর্ভ গ্রহণের প্রশস্ত কাল। একথা আজ কাল পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও স্বীকার করিতেছেন।

এক্ষণে দেখা যাউক—"শুক্র বাহুল্য" ও "আর্ত্তব বাহুল্য"—ইহাদের অর্থ কি? বাহুল্য শব্দের অর্থ প্রাবল্য. সুতরাং শুক্র বাহুল্যের সাধারণ অর্থ পিতৃ অংশের প্রাবল্য, আর আর্ত্তব বাহুল্যের অর্থ মাতৃ অংশের (রজঃ) প্রাবল্য। যেখানে পিতৃশক্তি—মাতৃশক্তি (রজঃ) হইতে প্রবলা, সেখানে পুত্র হইবার সম্ভাবনা।

এইবার দর্শনের কথা একটু ভাবিতে হইবে। দর্শন শাস্ত্রের মতে—প্রথমে ইন্দ্রিয় তত্ত্বের উৎপত্তি। সেই ইন্দ্রিয়তত্ত্ব হইতে স্থূল ইন্দ্রিয় (ঐন্দ্রিয়িক অবয়ব) উৎপন্ন হইয়া থাকে। সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় তত্ত্ব অহঙ্কারের প্রসব। সুতরাং এস্থলে বোধ হয় সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন, ইন্দ্রিয় তত্ত্ব পুরুষ বা পুরুষের ইচ্ছা শক্তির বশবর্ত্তী। বাগভট বলেন—"কারণানু বিধায়িত্বাৎ কার্য্যানাং তত্ত্ব ভাবতা।" অর্থাৎ কার্য্য ও কারণ একই পদার্থ। এ উক্তির যাথার্থ্য স্বীকার করিলে বলিতে হয়—সন্তানোৎপাদিকা ইচ্ছা ও তাহার স্থূল ফল শুক্র বা রেতঃ করণ একই ধর্ম্মযুক্ত। পিতার কাম ভাব বা সন্তানোৎপাদন ইচ্ছা বলবতী হইলে পিতৃ শুক্রে পিতৃ অংশ অত্যন্ত বলবান হইয়া থাকে। আবার মাতার সন্তানোৎপাদিকা শক্তি বলবতী হইলে, মাতৃবীর্য্যে (ovum) যে মাতৃ অংশ প্রবল হইবে, ইহা সহজেই অনুমেয়। গর্ভোৎপাদনকালে যাহার ইচ্ছা যত বলবতী, সেই পরিমাণে তাহার বীর্য্য শীঘ্রই স্খলিত হইবে। তন্ত্রমতে—পিতৃ অংশ উদাসীন, বৈশ্লেষিক, জীবের উন্মেষক মাত্র। মাতৃ অংশ—সংগঠক,

সঞ্চয়ক, স্থিতিকারী। এস্থলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, যে অংশ যত বলবান, গর্ভাধান-কালে সে অংশ তত শীঘ্রই ক্ষরিত হয় এবং ভ্রূণের লিঙ্গত্ব নিরূপণ করিয়া দেয়। মাতৃ ইচ্ছা প্রবল হইলে, মাতৃবীর্য্য অগ্রে ক্ষরিত হইয়া সে গর্ভে কন্যা জন্মগ্রহণ করে। সেই রূপ পিতৃ ইচ্ছা প্রবল হইলে, সে গর্ভে পুত্রই জন্মগ্রহণ করে।

এস্থলে—ঋষি মতের "শুক্র বাহুল্য" বা "আর্ত্তব বাহুল্যের" অর্থ বহু পরিমাণে শুক্র বা আর্ত্তবের প্রাচুর্য্য হইতে পারে না। কেন না, তাহা হইলে, বহু অপত্যের সম্ভাবনা হইতে পারে। তবে 'বাহুল্য' শব্দের অর্থ কি? সেই কথাই বলিতেছি। "বাহুল্য" শব্দের অর্থ—মাতৃ বা পিতৃ ইচ্ছার প্রাবল্য জন্য স্ব স্ব বীর্য্যে স্ব স্ব অংশের সংশ্লেষিকা (সংগঠনী—সংযোগিনী) বা বিশ্লেষিকা (বিয়োগিনী—বিক্ষেপিকা) শক্তির প্রাবল্য বুঝিতে হইবে। এই 'বাহুল্যের' অর্থ বুঝাইতে গিয়া আচার্য্য দারুবাহি অনেক কথাই বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—সহবাস কালে পিতৃবীজ যদি মাতৃবীর্য্যের পূর্ব্বে ক্ষরিত হয়, তবে সে গর্ভে পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করে। অনুরূপ কারণে মাতৃবীজ অগ্রে ক্ষরিত হইলে, কন্যাই হইয়া থাকে। যথা,—

স্ত্রী পুংসয়ো সুসংযোগে যত্মাদৌ বিসৃজেৎপুমান্
শুক্রং ততঃ পুমান্ বীরো জায়তে বলবান্ দৃঢ়ঃ।
অথ চেৎ বনিতা পূর্ব্বং বিসৃজেদ্রক্ত সংযুতং।
ততো রূপান্বিতা কন্যা জায়তে দৃঢ় সংহিতা।

অরুণদত্তোদ্ধৃত শ্লোকঃ।

এইবার আপনারা বিশ্বোৎপত্তির সহিত জীবোৎপত্তি—মিলাইয়া লউন। প্রকৃতি সত্ত্ব রজ-তমোময়ী। ঐষিকত্ব, কৌশিকত্ব, বিশ্লেষত্ব প্রভৃতি গুণের প্রসুপ্ত অবস্থায় অ-কার্য্যকরী) পুরুষ তাহাতে অধিষ্ঠিত হইলে, তবেই জগতের বিকাশ। মাতৃ রজঃ প্রসুপ্ত শক্তি বুকে লইয়া পিতৃ বীজকে ধরিল, অমনি তাহার অন্তর্নিহিত শক্তির নিদ্রাভঙ্গ হইল; সে অবস্থায়—যে শক্তি, যে ইচ্ছা, বা যে অংশ তাহার নিদ্রা ভাঙ্গাইয়া তাহাকে অকার্য্য হইতে কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিবে,—তাহার লিঙ্গত্বে, তাহার বিশিষ্ট বর্ণে, তাহার—বিশিষ্ট ধর্ম্ম বা বিশিষ্ট লিঙ্গত্ব হইবে। অতএব মাতৃ ইচ্ছা বা তাহার স্থূল অভিব্যক্তি স্বরূপ মাতৃ অংশ (সংগঠিকা) যদি প্রবল হয়, তাহা হইলে সে গর্ভে কন্যাই হইবে—ইহার বিপরীত হইলে পুত্রই জন্মিবে।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের নূতন আবিষ্কার "অগনা বলিজিম্"- ও "ক্যাটা বলিজিম"—কত যুগ যুগান্তর পূর্ব্বে "সংগঠিকা" ও "বিক্ষেপিকার" রূপকে সজ্জিত হইয়া অর্দ্ধ নারীশ্বর মূর্ত্তিতে আমাদের পূর্ব্বপুরুষের মহিমাকীর্ত্তন করিতেছে! আমরা মূর্খ—সে তত্ত্ব বুঝিবার চেষ্টা করি না! বল দেখি ভাই! কিমাশ্চর্য্য মতঃ পরং? পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ভূমিষ্ঠ হইবার বহুকাল পূর্ব্বেই আর্য্য ঋষি বলিয়াছিলেন—পিতৃ অংশে বিক্ষেপিকা শক্তির আধিক্য. মাতৃ অংশ চিরদিনই সংগঠিকা। এই যে স্ত্রী পুরুষ লিঙ্গভেদ, ইহার আদিকারণ—"অর্দ্ধ নারীশ্বর" অর্থাৎ উভয় লিঙ্গাত্মক। আর্য্য ঋষি জানিতেন, —প্রাণী বিকাশের এমন কোন অবস্থা বা যুগ ছিল—যখন স্ত্রী প্রাণী বা পুরুষ প্রাণী ছিল না, সকল প্রাণীই অর্দ্ধ নারীশ্বর হর-গৌরী অর্থাৎ উভয় লিঙ্গাত্মক ছিল।

ইচ্ছা সত্বেও—এই অকিঞ্চিৎকর প্রবন্ধটাকে সহজবোধ্য ভাষায় লিখিতে পারিলাম না। ইহাতে মাদৃশ ক্ষুদ্রজনের অক্ষমতাই সূচিত হইতেছে। কিন্তু কি করিব? দার্শনিক ও

বৈজ্ঞানিক শব্দের পরিভাষা এখনও বঙ্গভাষায় রচিত হয় নাই। এ পরিভাষা রচনা করিতে পারেন—বঙ্গের উজ্জ্বল রত্ন ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র. —পণ্ডিত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

আর দুই একটী কথা বলিয়াই এ প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

আয়ুর্ব্বেদে পড়িয়াছি—বৈদ্য ইচ্ছা করিলে মানুষের পুত্র বা কন্যা উৎপাদন করাইয়া দিতে পারেন। কিন্তু সাধারণে এ কথার তাৎপর্য্য বুঝিতে অক্ষম। পিতৃশক্তি ও মাতৃশক্তি—দুইটী বিভিন্ন শক্তি, ইহাদের ভিতর পরস্পর বিনিময় সংসাধিত হইতে পারে কিনা? মাতৃ অংশ বা সংগঠিকা শক্তিকে কোনওরূপে বিশ্লেষিকা শক্তি বা তাহার স্থূল অভিব্যক্তিরূপ পিতৃ অংশে পরিণত করা যায় কিনা? এই রহস্যটুকু বুঝিতে পারিলেই আমাদের সকল সন্দেহ মিটিয়া যায়। ঋষি বলিয়াছেন—জৈবী শক্তির কেন্দ্র ভিন্ন তার দুইটী বিভাগ থাকিলেও পুরুষ অর্থাৎ দেহবদ্ধ চৈতন্যই তাহার আধার। যাহার ধর্ম্ম আছে, সেই মানুষ। ধর্ম্ম লইয়াই না পশুত্বে নরত্বে প্রভেদ? কণাদের মতে—"যতোভ্যুদয় নিঃশ্রেয়স সিদ্ধিঃ স ধর্ম্মঃ।" যাহা হইতে অভ্যুদয় ও কল্যাণ সাধিত হয় তাহার নামই ধর্ম্ম। আবার সাংখ্যের মতে—"অথ ত্রিবিধ দুঃখস্যাত্যন্ত নিবৃত্তি বত্যন্ত পুরুষার্থ"—আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক, আধিভৌতিক [মানসিক, শারীরিক, প্রাকৃতিক] এই তিন প্রকার দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি করিবার জন্যই মনুষ্যের দেহ ধারণ। চরকও বলিয়াছেন—মানুষ প্রাণরক্ষার জন্য, ধন উপার্জ্জনের জন্য এবং পারলৌকিক উন্নতির জন্য চেষ্টা করিবে। অতএব দেখা যাইতেছে—মানুষের মানসিক, শারীরিক ও প্রাকৃতিক ভেদে তিন প্রকার ধর্ম্ম আছে। জৈবী শক্তির সংগঠিকা বা বিশ্লেষিকা ভেদে যে দুইটী বিভিন্ন কেন্দ্র আছে—প্রাকৃতিক বা যৌথবিক ক্ষেত্রে যাহা প্রবর্ত্তক বা নিবর্ত্তক—তাহা এই ক্ষেত্রেই কার্য্যকরী। আমরা যে পঞ্জিকায় বিভিন্ন রাশিযুক্ত লোকের আয়-ব্যয়ের কথা শুনিয়া থাকি, তাহা এই বিশ্লেষিক (নিবর্ত্তক) বা সংশ্লেষিক প্রবর্ত্তক) অর্থাৎ দেহস্থ পিতৃ বা মাতৃ শক্তির আধ্যাত্মিকভেদে ত্রিবিধ কোষ আয়-ব্যয় অর্থাৎ কোন রাশিতে মানুষের আত্মিক, শারীরিক বা প্রাকৃতিক বিশ্লেষিকা-শক্তি বৃদ্ধি পায়, কোন রাশি বা কোন নক্ষত্রে তাহার সংশ্লেষিকার (মাতৃকা শক্তি) শক্তি বর্দ্ধিত হয়। ধর্ম্ম লইয়াই যখন মানুষের মনুষ্যত্ব, তখন মানুষের সকল কার্য্যেই ধর্ম্মের অনুষ্ঠান দেখিবেন না কেন? তোমরাই বা পঞ্জিকার কথা অবিশ্বাস করিবে কেন? ঋষি বলিয়াছেন—তিথি অনুসারে, নক্ষত্রানুসারে, পক্ষানুসারে, দিবা ও রাত্রিভেদে—পিতৃ ও মাতৃ শক্তির আয় ব্যয়ের ভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। তুমি যত বড় নাস্তিকই হওনা কেন, অমাবস্যা-পূর্ণিমায় শরীরে যে রস সঞ্চার হইয়া থাকে, শরৎকালে যে পিত্ত প্রকুপিত হয়, বাল্যে ও প্রভাতে যে শ্লেষ্মা বর্দ্ধিত হয়, সান্নিপাতিক বিকারে—৭ম, ৯ম, ১১শ, ১৪শ দিবসে যে দৈহিক শক্তি অত্যন্ত হ্রাস হইয়া যায়—একথা তুমি অস্বীকার করিতে পারিবে না। দৈহিক হ্রাস-বৃদ্ধি প্রত্যহ সমান ভাবে হয় না। দিবা-রাত্রির মধ্যে—জীবের জন্ম মৃত্যুর কালও বিশেষরূপে নির্দ্দিষ্ট আছে। পঞ্জিকার কথা হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না। তিথি বিশেষে, নক্ষত্র বিশেষে, দিন বিশেষে, পিতৃ মাতৃ যুগ্ম শক্তিরও হ্রাস-বৃদ্ধি হইয়া থাকে। একটী শক্তির হ্রাস হইলে

অপরটী বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। যাহার যাহা সহজ ধর্ম্ম, তাহাকে কৃত্রিম উপায়ে সেই ধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিতে পারা যায়। ঋষিগণ দ্রব্যের সাহায্যে, উপায়ের সাহায্যে জৈবী শক্তির আয়-ব্যয়ের কেন্দ্র আয়ত্ত করিতে পারিতেন, সুতরাং পিতৃকা ও মাতৃকা শক্তির উপর তাঁহাদের যথেষ্ট প্রভুত্ব ছিল। মানব বিজ্ঞান স্বকল্পিত উপায়ে মাতৃ-দেহের সংশ্লেষিকা বা বিশ্লেষিকা, প্রবর্ত্তক বানিবর্ত্তক, আয় বা ব্যয়, অ্যানাবনিজিম বা ক্যাটা বনিজিম প্রভৃতির হ্রাস-বৃদ্ধি করিয়া মানুষের পুত্র বা কন্যা উৎপাদনের সাহায্য করিতে পারে। ঋষিরা ইহা জানিতেন। তাই তাঁহারা এরূপ ঔষধের কল্পনা করিয়া গিয়াছেন, যে ঔষধ খাইলে—কন্যা প্রসবিনী-রমণী পুত্রেরও জননী হইতে পারে। আয়ুর্ব্বেদে এমন ঔষধ আছে—যাহা সেবনে বন্ধ্যানারী গর্ভিণী হইতে পারে, পুরুষ ইচ্ছামত পুত্র বা কন্যা উৎপাদন করিতে পারে। বহু প্রসবিনী নারীর গর্ভগ্রহণের শক্তি হ্রাস হইয়া যাইতে পারে। আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ মাত্রেই আমার এ কথার সত্যতা বুঝিতে পারিবেন।

তান্ত্রিক ঋষি বলিয়াছেন—জৈবী-শক্তির দুইটী বিভিন্ন কেন্দ্র মানুষের শরীরের বাম ও দক্ষিণ ভাগে অবস্থিত। পিতৃকা কেন্দ্র (Katabolism) শরীরের দক্ষিণার্দ্ধে এবং মাতৃকা কেন্দ্র বামার্দ্ধে প্রবাহিত হইয়া থাকে। নিখিল শক্তি-কেন্দ্রের ন্যায়, জৈবীশক্তির ও প্রবর্ত্তক বা পিতৃকা কেন্দ্র, নিবর্ত্তক বা মাতৃকা কেন্দ্রকে আকর্ষণ করে। এক জাতীয় দুইটী কেন্দ্র পাশাপাশি থাকিলে বিক্ষেপণ বিশ্লেষণও চলিতে থাকে। অর্দ্ধ নারীশ্বর মূর্ত্তির বামভাগে গৌরী দক্ষিণ ভাগে—শিব। স্ত্রী তাই স্বামীর বামার্দ্ধ ভাগিনী। মহর্ষি সুশ্রুতের উপদেশে —"সহদেবানা মন্যতমং ক্ষীরে নাভি যুক্ত্যং ত্রীংশ্চতুরু বা বিন্দুন দদ্যা দ্দাক্ষিণে নাসা পুটে পুত্র কামায়ৈ। নতান নিঠিচেৎ।" আমার পুত্র হউক মনে এইরূপ ইচ্ছা হইলে গৃহীতগর্ভা স্ত্রীর দক্ষিণ নাসাপুটে [পিতৃকা কেন্দ্র] দুগ্ধ যুক্ত, লক্ষণা বিশ্ব বা সহদেবাদির যে কোনও একটীর মূলের ৩।৪ বিন্দু রস টানিয়া লইতে বলিবে। সে রস যেন সে আর থুতুর সহিত ফেলিয়া না দেয়। আচার্য্য বাগভটও বলিয়াছেন—

ক্ষারেণ শ্বেত বৃহতী মূলং নাসা পুটে স্বয়ং।
পুত্রার্থং দক্ষিণে সিচেদ্বামে দুহিতৃ বাঞ্ছয়া।

শ্বেত বৃহতা মূলের রস দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া পুত্রার্থিনী নারী দক্ষিণ নাসাপুটে এবং কন্যার্থিনী গর্ভিণী বাম নাসাপুটে টানিয়া লইবে।

চরক স্পষ্টই বলিয়াছেন—

"সব্যাঙ্গ গর্ভা * * সব্য প্রদুগ্ধে স্ত্রিয়ন্ত্বেন স্তুতে"

যে নারীর গর্ভ বাম ভাগে অবস্থিত, বামস্তনে যাহার প্রথম দুগ্ধ সঞ্চারিত হয়, সে নারী নিশ্চয়ই কন্যা প্রসব করিবে।

আয়ুর্ব্বেদে, তন্ত্রে, জ্যোতিষশাস্ত্রে—অপত্য তত্ত্বের বহু রহস্যই জানিতে পারা যায়। ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সে সকল তত্ত্বের আলোচনা অসম্ভব। আমি কেবল এই টুকু বলিতে চাই—যে রহস্যের মীমাংসার জন্য য়ুরোপের বড় বড় বৈজ্ঞানিক মাথা ঘামাইয়াছেন,—পরন্তু স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই; ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণ বহুযুগ পূর্ব্বে—যুক্তিপূর্ণ গবেষণার সাহায্যে—সে সকল রহস্যের মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন। এক অর্দ্ধ নারীশ্বর মূর্ত্তির কল্পনা দেখিয়াই—আমরা বুঝিতে পারি—স্ত্রী বা পুং তত্ত্বের প্রাকৃভাব উভয় লিঙ্গাত্মক। এই

উভয় লিঙ্গাত্মক আদি কারণ হইতেই স্ত্রী ও পুরুষের উৎপত্তি। পিতৃকেন্দ্রের ক্রিয়াতিশয্যে পুরুষ বা পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। পক্ষান্তরে মাতৃকা কেন্দ্র যখন কার্য্যকরী,—তখনই কন্যার উৎপত্তি। মানব দেহের বাম ও দক্ষিণার্দ্ধে —এই দুই শক্তিকেন্দ্র, এই দুই আয়-ব্যয়ের হিসাব অবস্থিত। নবাবিষ্কৃত ইলেক্ট্রোহোমিও প্যাথি বা তাড়িতবিজ্ঞান পাশ্চাত্য জগতে এই তত্ত্বই প্রতিপন্ন করিতেছে। আর্য্য ঋষি কিন্তু অনেক আগেই—এই উভয় শক্তির কেন্দ্রের উপর পাকা বৈজ্ঞানিকের প্রভুত্ব করিয়া গিয়াছেন। আমাদের দুঃখ—তোমরা তাহা দেখিয়াও দেখিলেনা। একটু সন্ধানও লইলে না। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান—জড়শক্তির প্রবর্ত্তক (Positive) কেন্দ্রের দুই একটী কথা আজ ১৯০০ বৎসরের অক্লান্ত চেষ্টায় জানিতে পারিয়াছে। জৈবী শক্তির নিবর্ত্তক বা মাতৃকা (Negative) কেন্দ্রের রহস্য—তান্ত্রিকের নেত্রে সৃষ্টির প্রথম বিস্ফুরণেই ধরা পড়িয়াছিল। প্রাকৃতিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক—সকল ক্ষেত্রেই তান্ত্রিক এই মাতৃকাশক্তির ইন্দ্রজাল ভেদ করিয়াছিলেন। মাতৃকা শক্তির জীবনীয় প্রবাহ তান্ত্রিকের হৃদপিণ্ডের ভিতর প্রাণ স্পন্দনে নাচিয়া উঠিয়াছিল। তাই তন্ত্রের মর্ম্ম বেদিকায় নারী—লিখনের অধিনায়িকা। ভ্রূণতত্ত্বের নিগূঢ় রহস্য জানিতে পারিয়াই তান্ত্রিক নারীকে মা বলিয়া পূজা করিয়াছিলেন, জগদ্ধাত্রী জগদম্বা ভাবিয়া নারীর চরণে প্রণত হইয়াছিলেন। স্ত্রী যে স্বামীকে স্বর্গরাজ্যের শেষ সোপানে তুলিয়া দিয়াছিল,—তন্ত্র ও আয়ুর্ব্বেদ এ উপন্যাস জলন্ত অক্ষরে লিখিয়া রাখিয়াছে। মাতৃ রহস্য ভেদ করিয়া আর্য্য ঋষি বিশ্বমাতাকে জীবনের আরাধ্যা বলিয়া বন্দনা করিয়াছিলেন। গর্ভাধান ব্যাপার অদ্ভুত রহস্য জালে জড়িত, আর্য্য ঋষি তাহা তন্ন তন্ন করিয়া দেখিবার অবকাশ পাইয়াছিলেন। ৫০ বৎসর পূর্ব্বে—পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের এ তত্ত্ব বুঝিবার শক্তিও ছিল না। প্রবীণ তান্ত্রিকের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া আজ আমরা সর্ব্বসমক্ষে প্রচার করিতেছি—'মাতৃত্বের মৃত্যু নাই। মাতৃগর্ভে জন্ম পরিস্ফুট হয়। মাতৃস্তন্যে শিশু যুবা হয়। যুবতীর হাসিতে সন্ন্যাসী ও সংসারী—জীবনের পূর্ণ অর্থ খুঁজিয়া পায়।" মাতৃত্ব ও নারীত্ব বুঝিতে হইলে মহাদেব হইতে হইবে। তন্ত্র ও আয়ুর্ব্বেদ—পূর্ণ নারীতত্ত্বের অক্ষুন্ন সংহিতা। যখন অপত্যতত্ত্ব বুঝিবার আবশ্যক হইবে, তখন সকল দম্ভ, পরিহার করিয়া তন্ত্র ও আয়ুর্ব্বেদের শরণ লইও,—তোমার জম্বুদ্বীপে জন্মগ্রহণ সার্থক হইবে।*

কবিরাজ শ্রীব্রজবল্লভ রায় কাব্যতীর্থ।

* গর্ভস্থ ভ্রূণ যে প্রথমাবস্থায় উভয় লিঙ্গে থাকে, স্মৃতি শাস্ত্রের পুংসবন প্রক্রিয়াই তাহার আর একটী জলন্ত প্রমাণ। পুংসবন বিধির আলোচনা করিলে, আমরা অপত্যতত্ত্বের বহু রহস্য বুঝিতে পারি। আর এক সময়ে তাহার চেষ্টা করিব। —লেখক।

দীর্ঘজীবন লাভের উপায়।

—:০:—

আমাদের গুরুজনের প্রধান আশীর্ব্বাদ—"দীর্ঘজীবী হও"। কেননা মানুষ ধনী হউক, দরিদ্র হউক, সে বেশীদিন বাঁচিতেই ভালবাসে।

"কথামালার" বৃদ্ধ যখন শ্রান্ত দেহে, শুষ্ক কণ্ঠে, কাতর ভাবে যমকে ডাকিয়াছিল, তখন সে ভাবে নাই—তাহার আহ্বানে সত্য সত্যই যমরাজ স-শরীরে হাজির হইবেন। কিন্তু যম আসিয়া যখন সেই বৃদ্ধ কাঠুরিয়াকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আমাকে ডাকিতে ছিলে কেন?" বৃদ্ধ অমনি উত্তর দিল—"এই কাঠের বোঝাটী আমার মাথায় তুলিয়া দিতে ডাকিয়াছিলাম।" দীন-দরিদ্র-অসহায়-জরাজীর্ণ-বৃদ্ধ মরিবার সুযোগ পাইয়াও সে মরিতে চাহিল না। জগতে কেহই মরিতে চাহেনা, সকলেই চায় বাঁচিয়া থাকিতে। দীর্ঘজীবন সকলেরই কামনার ধন। সাংসারিক আধিব্যাধির তাড়নায় অস্থির হইয়া অনেকেই বলে "মরণ হইলে বাঁচি", এটা কিন্তু প্রাণের কথা নহে। বেঁচে থাকাই মানুষের চরম লক্ষ্য। দীর্ঘজীবী হইবার জন্য মানুষ অনেক দিন হইতেই চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। ভারতের মুনি-ঋষিরা দীর্ঘ জীবন লাভের জন্য যোগাভ্যাস করিতেন, ভারতের আয়ুর্ব্বেদে—দীর্ঘজীবন লাভের অনেক মহৌষধ আবিষ্কৃত হইয়াছে। যাঁহারা আয়ুর্ব্বেদ পাঠ করিয়াছেন,—তাঁহারা ইহা অবশ্যই জানেন।

দীর্ঘজীবন লাভের জন্য য়ুরোপের মনীষিগণ যে কিরূপ চেষ্টা করিয়া থাকেন, আজ আমি তাহারই একটু পরিচয় দিব। আজ কাল আমাদের দেশে দীর্ঘজীবী লোক বড় একটা দেখা যায় না। অতএব যাহাতে পরমায়ু বৃদ্ধি পায়, এমন কথা সকলেরই শুনা উচিত। আমার যাহা বলিবার, বলিয়া যাই,—ঋষিরা দীর্ঘজীবন লাভের যে সকল উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—কোনও সুবিজ্ঞ আয়ুর্ব্বেদবেত্তা তাহা সাধারণের গোচরীভূত করিবেন।

"সঞ্জীবনী সুধা" পান করিলে, মৃত্যুকে জয় করা যায়। এই জন্যই সুধাভাণ্ড লইয়া দেবাসুরে বহুকাল ধরিয়া যুদ্ধ চলিয়াছিল,—আর্য্যজাতির ইহাই কল্পনা। এ কল্পনায়, আর্য্যজাতির মধ্যে দীর্ঘজীবন লাভের যে কত দূর আগ্রহ ছিল, তাহা বুঝিতে পারা যায়। ৩য় খৃষ্টাব্দে—চীন-রাজ চীহংটী 'সুখদ্বীপের' সন্ধানে সমুদ্র যাত্রা করিয়াছিলেন। সম্রাট এক বাজীকরের মুখে সংবাদ পাইয়াছিলেন—সুখদ্বীপের অধিবাসীরা এক প্রকার সরবৎ প্রস্তুত করিয়া থাকে, সে সরবৎ পান করিলে আর মৃত্যুর ভয় থাকে না। বলা বাহুল্য এ পানীয়—সুধারই প্রকার ভেদ।

এ কলুষময়ী কলিযুগে কাহারও ভাগ্যে সুধা প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। তবে কি কলির মানব দীর্ঘজীবন লাভ করিতে পারিবে না? অধ্যাপক মেচিনি কফ—মর্ত্ত্যে বসিয়াই এক স্বর্গীয় সুধার আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। সে সুধা দুর্ল্লভ নহে, মূল্যবানও নহে, অথচ তাহাতে মানুষ দীর্ঘজীবী হইতে পারে। সেই সুধার ইতিহাসই আজ আমি পাঠকগণের কাছে কীর্ত্তন করিব।

অধ্যাপক মেচিনী কফ—১৮৪৫ খৃঃ অব্দে রুষ রাজ্যের চার্কোতো প্রদেশে ভূমিষ্ঠ

হইয়াছিলেন। সামান্য কৃষক কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও ভাগ্য-দেবতার অনুগ্রহে—তিনি ওডেসার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকের পদে বরিত হইয়াছিলেন। ইহা ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের কথা। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে—বিসূচিকা রোগ রুষসাম্রাজ্যের মহামারীর আকারে প্রকাশ পাইয়াছিল। সেই সময়, রুষ গবর্ণমেণ্টের অনুরোধে মহাত্মা মেচিনিকফ্ জীবাণুতত্ত্বের পরীক্ষায় আত্ম নিয়োগ করেন। সেই অবধি জীবাণুতত্ত্ববাদে তাঁহার অসাধারণ অভিজ্ঞতা পাশ্চাত্য জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। তিনি অনেক রোগেরই যে ফ্যাগোসাইট্ (Phagocyte) নামক জীবাণুর আবিষ্কার করিয়াছেন, ইহাতেই তিনি বৈজ্ঞানিক জগতে অমর হইয়া থাকিবেন।

মানবদেহ বহুবিধ জীবাণুর দ্বারা পূর্ণ, ফ্যাগোসাইট্ তাহাদেরই অন্যতম। ইহারা রক্তের সহিত মিশিয়া সর্ব্ব শরীরে বিচরণ করে। ইহাদের কার্য্য—শান্তিরক্ষক পুলিশের কার্য্য। অর্থাৎ পুলিশ যেমন রাষ্ট্রের শান্তি রক্ষা করিয়া থাকে, সমাজের অহিতকারী ব্যক্তিগণের অপরাধের শাস্তি-বিধান করিয়া থাকে, অন্যায় কার্য্যের প্রতিবিধান করিয়া দেশ রক্ষা করিয়া থাকে, ফ্যাগোসাইট্ শরীরের মধ্যে ঠিক এইরূপ কার্য্যেই দীক্ষিত। যদি কোন রোগ-বীজাণু শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া শরীরকে ধ্বংস করিতে অগ্রসর হয়, ফ্যাগোসাইট্ তাহাতে বাধা দেয়। ফ্যাগোসাইট্—বিদ্যুতের মত দ্রুতগামী, ইহাদের ঘ্রাণশক্তিও বড় তীক্ষ্ণ; কোন রোগ-বীজাণু শরীরে আশ্রয় গ্রহণ করিবা মাত্র—ফ্যাগোসাইট্ তাহাদের আক্রমণ করে। সে আক্রমণে রোগ-জীবাণু প্রায়ই ধ্বংস হইয়া যায়। ইহারা যখন আক্রমণ করে, দল বদ্ধ হইয়াই করে। সুতরাং ইহাদের হস্ত হইতে রোগবীজাণুর পরিত্রাণের আশাই নাই। শরীর সুস্থ থাকিলে, এই ফ্যাগোসাইট্ অতি সহজেই রোগ-বীজাণুকে নিঃশেষ করিতে পারে। কিন্তু মানুষের দেহ যদি স্বাভাবিক অবস্থায় না থাকে, তাহা হইলে ফ্যাগোসাইট্ বা বীজাণু ধ্বংসের জন্য গুরুতর পরিশ্রম করিতে হয়। ইহাতে তাহারা দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, তখন রোগ-বীজাণুগুলির সহিত মহা যুদ্ধে ফ্যাগোসাইট্ পরাস্ত হইয়া পড়ে। সেই অবস্থায় রোগ-বীজাণু—মানব-দেহে প্রবেশ লাভ করিয়া, দেহকে রোগপ্রবণ করিয়া তুলে। মেচিনিকফ্ সাহেব—২৫ বৎসর ধরিয়া পরিশ্রম করিয়া এই ফ্যাগোসাইট্ জীবাণুর কার্য্য-কারিতা শক্তির আবিষ্কার করিয়াছেন।

সম্প্রতি তিনি পরীক্ষা করিয়াছেন, মানব—দেহে এই ফ্যাগোসাইটের সংখ্যা বাড়াইতে পারিলে, দেহে আর রোগ-বীজাণু প্রবিষ্ট হইতে পারেনা। আবার দেহ রোগাক্রান্ত না হইলে সে দেহে জরা বা বার্দ্ধক্য দেখা দেয় না। অধ্যাপক মেচিনিকফের বিশ্বাস—মানব-দেহে যে জরা বা বার্দ্ধক্য দেখা দেয় এবং শরীরে বিকলতা বা জড়তা আসিয়া উপস্থিত হয়,—তাহা জীবাণুরই কার্য্য। অনেক জীবাণু আছে, যাহারা পেশী ও স্নায়ুর ক্ষয় সাধন করিয়া থাকে, তাহারই ফলে মানুষ জরাগ্রস্ত হইয়া পড়ে, তাহার জীবনী-শক্তিও হ্রাস প্রাপ্ত হয়।

এই জরা সংঘটনকারী জীবাণুর দল মানব দেহের উদরের ভিতর বৃহৎ নালীর মধ্যে বাস করিয়া থাকে। অনেক রকম পরীক্ষার পর মেচিনিকফ এই বার্দ্ধক্য, জননশীল জীবাণুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিঃসংশয় হইয়াছেন। এই

সকল ক্ষয়কারী জীবাণুর হস্ত হইতে মানুষ কিসে মুক্তি লাভ করিতে পারে, মেচিনিকফ তাহারও উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। সে উপায় আর কিছুই নয়, দুগ্ধ বা দুগ্ধজাত পদার্থ ভক্ষণ করা। কথাটা আরও একটু বিস্তৃত ভাবে বলিতেছি।

প্রথমতঃ দুগ্ধ হইতে মাখন তুলিয়া লইতে হয়। তৎপরে, সেই দুগ্ধ জাল দিয়া হঠাৎ ঠাণ্ডা করিতে হয়। এইরূপ দুগ্ধে অল্প পরিমাণে দম্বল দিয়া দধি পাতিতে হইবে। এই দধি আহার করিলে, জরা সংঘটনকারী জীবাণুর পতন-শক্তি নষ্ট হইয়া যায়। অধিকন্তু, এই দধির অম্লরসে—শরীর রক্ষক ফ্যাগোসাইট্ গুলিরও পুষ্টিসাধিত হইয়া থাকে।

দধি প্রস্তুত করা কঠিন কার্য্য নহে। কিন্তু ইহার একটু বিশেষত্বও আছে। দধি পাতিবার দুগ্ধটী যেন বিশুদ্ধ হয়। আর দম্বলটী যেন বুলগেরিয়া প্রদেশ হইতে সংগৃহীত হয়। মেচিনী-কফ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, বুলগেরিয়া প্রদেশের দুগ্ধজাত দধিতেই—সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী বীজাণু জন্মিয়া থাকে।

আমাদের দেশে—মুনি ঋষিগণ—ফল-মূল ভক্ষণ ও দুগ্ধ পান করিয়া দীর্ঘ কাল জীবিত থাকিতেন। এদেশে দধি ও তক্রের যথেষ্ট প্রচলন ছিল। আয়ুর্ব্বেদে দধি ও তক্রের নানা গুণ বর্ণিত হইয়াছে। আমরা দধি ভক্ষণ করি বটে, কিন্তু তাহা "চিনী পাতা।" এরূপ দধি শরীরের কোনও উপকারে আসে না। অম্লদধির উপকারিতা আমরা ভুলিতে বসিয়াছি! তাই জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়—সৌখীন বাঙ্গালি! তুমি "চিনি পাতার" মায়া কাটাইতে পারিবে কি? অম্লদধি ভক্ষণ করিয়া, মেচিনিকফের কথার সত্যতা পরীক্ষা করিবে কি?

ডাক্তার শ্রীনগেন্দ্রনাথ দে।
(ক্যাম্বেল হস্‌পিট্যালের ভূতপূর্ব্ব হাউস সার্জ্জন)

বঙ্গে অজীর্ণ রোগের এত প্রাচুর্ভাব কেন?

(২)

বাঙ্গালী জাতির বিলাসিতাও বহুকারণে পরোক্ষভাবে অজীর্ণ রোগের হেতভূত হইয়াছে। পূর্ব্বে আমরা বিলাসিতার জন্য পরিশ্রম-হীনতার উল্লেখ করিয়াছি। পূর্ব্বে পরিচ্ছদের জন্য এক জন বাঙ্গালীর যাহা ব্যয় হইত, এখন তাহার অনেক অধিক ব্যয় হইয়া থাকে। পূর্ব্বে এক জোড়া চটী জুতা, একখানা ধুতি ও চাদর হইলেই চলিত। প্রাতঃস্মরণীয় ৺বিদ্যাসাগর মহাশয় চটীজুতা এবং মোটা চাদর ব্যবহার করিয়াই দেশীয়-বিদেশীয়গণের নিকট মহা সম্মানিত হইয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু এখন আর সার্ট, কোট, মোজা, বহুমূল্য জুতা, কাপড়, রেশমী চাদর নহিলে সম্মান থাকে না। কাজেই খোরাকীর পয়সা হইতে যতদূর পারি,

পয়সা কাটিয়া লইয়া আমরা পরিচ্ছদ ক্রয় করি। সোজা কথায় আমরা পেটে না খাইয়া বাবুয়ানা করি।

পরিচ্ছদ সম্বন্ধে বিলাসিতা পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে অধিকতর প্রবল। "তরল আলতা" হইতে আরম্ভ করিয়া বহুমূল্য নেকলেশ পর্য্যন্ত ইহার ক্ষেত্র। রমণীদিগের এই বিলাসিতা অনেক শিশুপুত্রকে উপযুক্ত পরিমাণ দুগ্ধ হইতে এবং অনেক স্বামীকে উপযুক্ত পরিমাণ সুখাদ্য হইতে বঞ্চিত করিয়া থাকে।

অনাবশ্যক বিলাসিতাকে আমরা এত বাড়াইয়া তুলিয়াছি যে, তাহা হিসাব করিয়া দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। দুই একটী উদাহরণ দেওয়া যা'ক।

পথে যাইতেছি, দেখিলাম—এক জন ফেরীওয়ালা চিড়িয়া বাঁশী বিক্রয় করিতেছে। ৩।৪ পয়সা দিয়া একটী বাঁশী কিনিয়া আনিলাম এবং পুত্রের হাতে দিলাম। পুত্র আনন্দে বাঁশী বাজাইয়া নাচিতে লাগিল। পিতা মাতার কি আনন্দ? কিন্তু বাঙ্গালী-পিতা-মাতা, তোমাদের বুদ্ধি যদি বিলাসিতায় বিকৃত না হইত, তাহা হইলে তোমরা ইহাতে আনন্দিত না হইয়া দুঃখিত হইতে। পুত্রদিগকে বাঁশী বাজাইতে না দিয়া, সে পয়সা যদি তাহাদের পেটে খাওয়াইতে, তাহা হইলে কি শুভ ফলই না হইত!

বিলাসিতার আর একটী দ্রব্যের বিষয় উল্লেখ করিব,—সেটী কাঁচের চুড়ি। পূর্ব্বে স্ত্রীলোকেরা শাঁখা ব্যবহার করিত। একবার দুই গাছি শাঁখা কিনিলে বহুকাল চলিত। যাহাদের শাঁখা জুটিত না, তাহারা দুই গাছি কড়্ হাতে দিয়াই সন্তুষ্ট থাকিত। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত রমানাথের স্ত্রী রাঙা সুতা হাতে বাঁধিয়াই কত সন্তুষ্ট ছিলেন। কিন্তু এখন নিত্য নূতন চুড়ি উঠিতেছে, আর বাঙ্গালীর মেয়েরা নিত্য তাহা ক্রয় করিতেছে। নূতন এক রকম উঠিলে পুরাতন আর কেহ পরে না। বাঙ্গালী জাতির এমনই করিয়াই না ক্রমশঃ অধঃপতন ঘটিতেছে। এই অধঃপতনই বাঙ্গালীর খাদ্যাভাবের কারণ এবং তাহারই ফলে অজীর্ণ রোগের বাহুল্য ঘটিতেছে।

ভেজাল খাদ্যের প্রচলনও বঙ্গে অজীর্ণ রোগের একটি প্রধান কারণ। একে ত বাঙ্গালী খাইতে পায় না, তাহার উপর কষ্ট সৃষ্টে যদি কোন রকম করিয়া একটু তৈল, ঘৃত, ময়দা, চিনি সংগ্রহ করিতে পারে, তাহাও ভেজাল। সর্ষপ তৈলে শেরগোজা প্রভৃতির তৈল, ঘৃতে বাদাম তৈল, ময়দায় শাদা পাথর চূর্ণ প্রভৃতি কত রকম ভেজাল যে চলিতেছে, তাহার সংখ্যা নাই। এই সকল ভেজাল খাদ্য খাইলে যে অজীর্ণ হইবে তাহাতে আর বিচিত্র কি! খাদ্য নির্ব্বাচন প্রসঙ্গে আমরা ইতঃপূর্ব্বে যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছি। সুতরাং পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক।

জীবন সংগ্রাম ও জীবিকা।—এই বিষম প্রতিযোগিতার দিনে জীবিকার্জ্জনের জন্য যে সকল সদ্‌গুণ অন্যান্য জাতির মধ্যে আছে, বাঙ্গালীর তাহা নাই। একজন হিন্দুস্থানী লোটা-কম্বল হাতে করিয়া বাঙ্গালায় আসে। কিছুদিন ভিক্ষা করিয়া অথবা অন্য কোন উপায়ে কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া কাপড়, ঘৃত বা পাপর মাথায় করিয়া বিক্রয় করে। কিছুদিন পরে একখানি ছোট দোকান করিয়া বসে। শেষে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিয়া ধনী হইয়া পড়ে। প্রথম অবস্থায় সে ২।৪ পয়সার চানা বা ছাতু খাইয়া জীবন ধারণ করিত, শেষে বিবিধ বহুমূল্য সুখাদ্য দ্বারা রসনা

ও দেহের তৃপ্তি ও পুষ্টি সাধন করে। এরূপ সহিষ্ণুতা ও অধ্যবসায় বাঙ্গালীর নাই।

একজন কাবুলী কিছু হিং ও সালম মিছরি প্রভৃতি লইয়া বাঙ্গালায় আসে। প্রথমে ঐ সকল দ্রব্য ফেরি করিয়া বেচিয়া কিছু অর্থ সংগ্রহ করে। তা'র পর দুই আনা সুদে টাকা ধার দিতে আরম্ভ করে, সঙ্গে সঙ্গে গরম কাপড়ের ব্যবসায়ও (?) চলিতে থাকে। বাঙ্গালায় দরিদ্র কৃষক, কুলি, মজুর, এমন কি, অনেক দরিদ্র ভদ্রলোক তাহাদের নিকট টাকা ধার লয়, কাপড় খরিদ করে। ফলে তাহারা কৃষক-কুলি-মজুরদিগের অর্থ শোষণ করিয়া ক্রমশঃ অর্থবান হইয়া পড়ে, আর কৃষক প্রভৃতি ক্রমশঃই দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইতে থাকে। একজন কাবুলীর যেরূপ সহিষ্ণুতা, অধ্যবসায়, স্বজাতি প্রীতি ও পরাক্রম আছে, বাঙ্গালীর তাহা নাই।

সর্ব্বত্র একজনের এমন যথেষ্ট অর্থ থাকে না, যদ্দারা সে একাকী একটী ব্যবসায় চালাইতে পারে। সেইজন্য পাশ্চাত্য দেশে কয়েক জন লোকে মিলিয়া একটী কোম্পানী গঠিত করে এবং বহুলোকে সেই কোম্পানীর অংশ ক্রয় করে। ইহার ফলে একটী প্রকাণ্ড কারখানা বা ব্যবসায় স্থাপিত হয়। দেশের বহুলোক সেই কারখানায় প্রতিপালিত হয়, অনেকে অর্থবান হইয়া পড়ে, অংশ ক্রয়-কারীরাও যথেষ্ট লাভ পায়। এরূপ কোন কারখানা বা ব্যবসায় চালাইবার ক্ষমতা বাঙ্গালীর নাই। বাঙ্গালা দেশে যে কয়েকটী ব্যবসায়ের কারখানা এইরূপে করা হইয়াছিল, সে গুলির শোচনীয় পরিণাম—বাঙ্গালীর এ বিষয়ে অক্ষমতার জ্বলন্ত নিদর্শন। যদি এই রূপ করিয়া দুই একটী কোনমতে টিকিয়া থাকে, তাহা ধর্ত্তব্য নহে। কেননা বড় ধরণের সবগুলি কারখানারই অধঃপতন ঘটিয়াছে।

জীবন-সংগ্রামে এইরূপে পশ্চাৎপদ হওয়ায় বাঙ্গালী জাতি অন্যান্য জাতির সহিত প্রতি-যোগীতায় যথেষ্ট উপার্জ্জন করিতে পারে না। উপার্জ্জন যখন যথেষ্ট হয় না, তখন যথেষ্ট আহার জুটিবে কোথা হইতে ? সুতরাং উপযুক্ত খাদ্যের অভাবে বাঙ্গালী জাতির অগ্নি-বল যে ক্ষীণ হইয়া পড়িবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি ?

ফলে কৃষি এবং চাকরিই এক্ষণে বাঙ্গালীর জীবিকার্জ্জনের প্রধান উপায়। তদ্ব্যতীত ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায়াদিতেও অনেক লোকে জীবিকার সংস্থান করে। কিন্তু এই সকল লোকেও জীবিকা অর্জ্জনের নিমিত্ত এরূপ অনিয়ম করিতে বাধ্য হয় যে, তাহারই ফলে অজীর্ণ রোগ জন্মিয়া থাকে। বাহুল্য ভয়ে আমরা সে বিষয় বাদ দিয়া কেবল চাকরিজীবী দিগেরই কথা বলিব।

আমাদের দেশে পূর্ব্বে লোকে সকালে-বিকালে কাজ করিত, মধ্যাহ্নে আহার করিয়া বিশ্রাম করিত। এখনও কৃষিজীবী এবং অনেক শ্রমজীবী তাহাই করিয়া থাকে। গ্রীষ্ম প্রধান দেশে এই প্রথা স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ অনুকূল। কেননা দ্বিপ্রহরে অগ্নিবল প্রবলতর হয় এবং আহারের পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিলে ভুক্ত দ্রব্য সুজীর্ণ হয়। কিন্তু এখন চাকরির জন্য সকলকেই ৮।৯টা বা দশটার মধ্যেই আহার করিতে হয়, আর আহার করিয়াই কার্য্যক্ষেত্রে ছুটিতে হয়। শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে যে, আহারের পর বসিয়া থাকিলে ভুঁড়ি হয়, শুইয়া থাকিলে শরীর পুষ্ট হয়, ধীরে ধীরে পাদচারণা করিলে পরমায়ু বর্দ্ধিত হয়, আর ছুটিলে মৃত্যু পিছু পিছু

ছুটিতে থাকে অর্থাৎ ভুক্ত দ্রব্য জীর্ণ হয় না বলিয়া সে ব্যক্তি শীঘ্রই কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যু মুখে পতিত হয়। এক্ষণে চাকুরী-জীবী বাঙ্গালীর পশ্চাতে অজীর্ণরূপী মৃত্যু নিয়ত ছুটিতেছে।

শাস্ত্রে আরও কথিত হইয়াছে যে, আহার করিয়া ধীরে ধীরে একশত পদ চলিয়া বাম পার্শ্বে শয়ন করিবে এবং মনের প্রিয় রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ উপভোগ করিবে। এরূপ করিলে ভুক্তদ্রব্য অদূষিত থাকে। দুঃখের বিষয় শাস্ত্রের এই হিতকর বাক্য পালন করা চাকরিজীবী বাঙ্গালীর অসাধ্য। আহারের পরে বিশ্রাম না করিয়াই কেহ পদব্রজে, কেহ ট্রামে, কেহ রেলে—কার্য্যস্থলের উদ্দেশে গমন করেন, কার্য্যস্থলে গিয়া বিলম্বে আগমন জনিত ক্রুদ্ধ মণিবের রূপ-শব্দাদি অবশ্যই মনের প্রিয় হয় না। সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রে যে অজীর্ণ রোগ জন্মিবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি!

শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে যে, আহারের পর দুই দণ্ড কাল শরীর ও মনের আয়াসজনক কোন কার্য্য করিবে না। পাশ্চাত্য দেশের চিকিৎসকগণও এই মতের পোষকতা করিয়া থাকেন। আহারের পর ভুক্ত দ্রব্য পরিপাকের জন্ত পাকস্থালীর কার্য্য আরম্ভ হয়। শরীরের যে অঙ্গ যখন কোন কার্য্য করে, তখন সেই অঙ্গে অধিকতর রক্ত সঞ্চালনের আবশ্যকতা ঘটিয়া থাকে। হস্ত দ্বারা কোন কার্য্য করিলে সঙ্গে সঙ্গে হস্তে অধিকতর রক্ত সঞ্চালিত হয়—ইহা সহজেই প্রত্যক্ষ করা যাইতে পারে। আহারের পর হস্ত-পদাদির অতিরিক্ত চালনা করিলে সেই সেই স্থানে অধিকতর রক্ত সঞ্চালিত হয় বলিয়া পাকস্থালীতে যথেষ্ট রক্ত যাইতে পারে না এবং সেই জন্য অজীর্ণ রোগ জন্মিয়া থাকে। অধিকাংশ চাকরিজীবী বাঙ্গালীই এই জন্য অজীর্ণ রোগে ভুগিয়া থাকে।

সংযমাভাব।—সংযমের অভাবও অজীর্ণ রোগের অন্যতম কারণ। অতিরিক্ত স্ত্রী-সহবাস বশতঃ অজীর্ণ রোগ জন্মে, অতিরিক্ত স্ত্রী সহবাসে শরীর দুর্ব্বল ও ক্ষীণ হইয়া পড়ে এবং পরমায়ু হ্রাস পায়। পূর্ব্বে লোকে ধর্ম্মপালন করিত বলিয়া এ সম্বন্ধে তিথি—নক্ষত্র বিচার করিত। তাহাতে অনেকটা সংযম আসিয়া পড়িত। কিন্তু এক্ষণে লোকে ধর্ম্মে আস্থা শূন্য, বিধি-নিষেধ মানেনা এবং পালন করে না। ফলে সংযম একেবারেই দেশ হইতে লোপ পাইয়াছে। আর সংযমের অভাবে লোকে হীনবীর্য্য, দুর্ব্বল দেহ ও দুর্ব্বলাগ্নি হইয়া পড়িতেছে।

বিবিধ ব্যাধির প্রাদুর্ভাব।—অজীর্ণ যেমন বহু রোগের কারণ; প্রায় সমস্ত রোগই সেইরূপ অজীর্ণের কারণ। শাস্ত্রে অজীর্ণরোগের যে সমস্ত কারণ লিখিত হইয়াছে, তন্মধ্যে ব্যাধি দ্বারা শরীর কৃশ হওয়া একটী। বঙ্গে আজকাল বিবিধ রোগের বিষম প্রাদুর্ভাব এবং সেই সকল রোগে ভুগিয়া বাঙ্গালী জাতি দিন দিন কৃশ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে। কৃশ ও দুর্ব্বল শরীরে অগ্নিবল কখনই প্রবল থাকিতে পারে না। সুতরাং বঙ্গে বিবিধ ব্যাধির প্রাদুর্ভাবও অজীর্ণ রোগের প্রাবল্যের অন্যতর কারণ।

মানসিক বিকৃতি।—মনের সহিত শরীরের নিকট সম্বন্ধ। মন অসুস্থ হইলে শরীর এবং শরীর অসুস্থ হইলে মন অসুস্থ হইয়া থাকে। বর্ত্তমানে বাঙ্গালীজাতির মনের যেরূপ অশান্তি ঘটিয়াছে, তাহাতে তাহার শরীর যে স্বভাবতঃই

অসুস্থ হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি। শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে যে, ঈর্ষ্যা, ভয়, ক্রোধ, রোগ, দৈন্য প্রভৃতি দ্বারা পীড়িত হইলে অন্ন সম্যক পরিপাক প্রাপ্ত হয় না। বর্ত্তমানকালে বাঙ্গালীজাতির মন ঐ গুলির অন্ততঃ দুই তিনটী বিষয়ে পীড়িত। দৈন্যের ত কথাই নাই। দেশের প'নর আনা তিন পাই লোক দারিদ্র্যপীড়িত। বাঙ্গালী জাতির গৃহ ভগ্ন, শয্যা ছিন্নভিন্ন—মলিন, খাদ্যের পরিমাণ স্বল্প এবং জঘন্য, দেহ শীর্ণ ও দুর্ব্বল, কান্তি ম্লান, মুখ বিষণ্ণ। এই আমজ্জা পরিব্যাপ্ত দৈন্যকে পরিচ্ছদের আবরণে বৃথা ঢাকিয়া বাঙ্গালী জীবন যাপন করিতেছে। বৃথা বলিলাম—কেন না, বাঙ্গালীর আকৃতিতে, ভঙ্গীতে, গমনে, উপবেশনে দৈন্য স্বতঃই প্রকাশিত হইয়া পড়িতেছে। সুদূর পল্লী-গ্রামের অবস্থা দেখিলে বুক ফাটিয়া যায়। দরিদ্র পল্লীবাসীর চালে খড়, ঘরে অন্ন নাই; পরিধানে ছিন্ন-মলিন বসন, মুখ বিষাদমাখা, শরীর জীর্ণশীর্ণ। এই বিষম দৈন্যদশায় পতিত-বাঙ্গালী যৎসামান্য শাক-অন্ন যাহা আহার করিতে পায়—তাহাও জীর্ণ করিতে পারে না। সুতরাং জাতীয় দৈন্যও অজীর্ণ-রোগের প্রাদুর্ভাবের একটী প্রধান কারণ।

দৈন্য কেবল বাঙ্গালীর আহার এবং বাস-স্থানেই সীমাবদ্ধ নহে। এই দৈন্য অবস্থার উপর বাঙ্গালী বিবাহ করে তাহার ফলে পুত্র-কন্যা হয়। পুত্রকন্যা জন্মিবামাত্র তাহাদের আহারের জন্য দুগ্ধ এবং গাত্রাবরণের জন্য বস্ত্রের চিন্তা করিতে হয়। তা'র পর পুত্র-কন্যা বড় হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের শিক্ষার ব্যয় এবং ভরণ-পোষণের ব্যয় ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে। হয়ত ইতিমধ্যে আবার দুই একটী নূতন শিশু আসিয়া পিতামাতার আনন্দ এবং দুশ্চিন্তা যুগপৎ বর্দ্ধিত করিয়া তুলে। তা'র পর কন্যার বিবাহের দায়। অধঃপতিত বঙ্গদেশের অধঃপতিত সমাজে কন্যার পিতাকে পাত্র ক্রয় করিতে হয়! ইহার উপর পিতৃদায়, মাতৃ-দায়, পুত্রের শিক্ষার ব্যয়, লৌকিকতা প্রভৃতি নানা উপসর্গ আছে। এই শত অভাব—অনটনের মধ্যে পড়িয়া বাঙ্গালীর জঠরাগ্নি ক্রমশঃ মাথায় উঠিয়া পড়িতেছে। সুতরাং অন্ন জীর্ণ হইবে কিরূপে? দেশে একটা প্রবাদ আছে "ভাবনায় পেটের ভাত চা'ল হ'য়ে যাচ্ছে" বা "ভাবনায় পেটের ভাত হজম হয় না?" ইহা অতি সত্য কথা-দেশব্যাপী। দৈন্য যে দেশব্যাপী অজীর্ণ রোগের একটী প্রধান কারণ, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

পূর্ব্বে বাঙ্গালীর যে মানসিক বল ছিল, তাহা বাঙ্গালী হারাইয়াছে, দুর্ব্বল চিত্ত সহজেই ক্রোধে-ঈর্ষ্যায়-ভয়ে বা শোকে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িতেছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, যে মন—ক্রোধাদি দ্বারা অভিভূত হইলে অন্ন সহজে জীর্ণ হয় না। সুতরাং মানসিক দুর্ব্বলতাও অজীর্ণের একটী কারণ। বাঙ্গালী জাতি মানসিক বল হারাইল কিরূপে? সে সম্বন্ধে আরও একটু আলোচনা করা যাউক।

ধর্ম্মহীনতার ফলে—আমরা মানসিক বল হারাইয়াছি। কেবল মানসিক বল নহে, বল ভিন্ন আরও অনেক জিনিষ হারাইয়াছি। শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে যে, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যেরূপ আচরণ করে, ইতর ব্যক্তিগণ তাহার অনুকরণ করিয়া থাকে। হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠ। এই সমাজের শ্রেষ্ঠ—ব্রাহ্মণ-জাতির ধর্ম্মহীনতার পরিচয় পাইলেই অন্যান্য

জাতিরও ধর্ম্মহীনতার পরিচয় পাওয়া যাইবে।

পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বেও বাঙ্গালীর ধর্ম্মে আস্থা ছিল। তখন প্রায় প্রত্যেক ব্রাহ্মণের গৃহে শালগ্রাম শিলা গৃহ-দেবতা রূপে বিদ্যমান থাকিতেন। ঠাকুর পূজার জন্য বাড়ীর সংলগ্ন একটু ফুলের বাগান করা হইত, ফুলের বাগান রক্ষার জন্য ব্যায়াম করা হইত, ফুলের সৌরভে মন প্রফুল্লিত হইত। গৃহস্থ যে কোন দ্রব্য গৃহ দেবতাকে নিবেদন না করিয়া আহার করিত না। ইহার ফলে সমস্ত খাদ্যাদি পবিত্র-ভাবে রক্ষিত হইত,—কোনরূপ মলিনতা বা অশুচি খাদ্যাদি সংস্পর্শ হইত না। সুখে গৃহস্থ গৃহ দেবতাকে অগ্রণী করিয়া উৎসব করিত। দুঃখে গৃহস্থ গৃহ দেবতাকে অবলম্বন করিয়া শান্তিলাভ করিত। সুখদুঃখ গৃহ দেবতার ভিতর দিয়া গৃহস্থকে স্পর্শ করিত, তাই তাহাদের তীক্ষ্ণতা অনুভূত হইত না। পুত্র যেন পিতার অধীনে থাকিয়া, প্রজা যেন রাজার অধীনে থাকিয়া দিন যাপন করিত। এখনও যেন মধ্যাহ্ন সূর্য্যকর প্রতি-ভাসিত ঘণ্টারব মুখরিত পল্লী-ভবনের "সহস্রশীর্ষ পুরুষ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাদ"—এই মহামন্ত্র আমার কর্ণবিবরে ধ্বনিত হইয়া শরীর পুলক কণ্টকিত করিতেছে।

আত্মপরতা চিত্তকে সঙ্কীর্ণ ও দুর্ব্বল করিয়া তুলে আর পরার্থপরতা চিত্তকে উদার ও সবল করিয়া তুলে। আমরা এত স্বার্থপর হইয়া পড়িয়াছি যে, এখনকার দিনে অতিথি আমাদের নিকট এক মুষ্ট অন্ন পায় না। কিন্তু ৬০ বৎসর পূর্ব্বে মধ্যাহ্নে সমাগত অতিথিকে নিজের আহারীয় দ্রব্য দিয়া যৎ-সামান্য কিছু আহার করিয়া গৃহস্থ আহ্লাদিত হইয়াছে দেখিয়াছি। এইরূপ দেব-সেবা এবং অতিথি-সেবা করিয়া তখনকার দিনে গৃহস্থের যে একটা আত্মপ্রসাদ জন্মিত, সে আত্মপ্রসাদ শরীরকে ও মনকে সবল করিত।

অনেকে জানেন যে, সাহেবেরা ছুটির দিনে মধ্যে মধ্যে ভ্রমণ করিতে যাইয়া থাকেন। ইহাতে শরীর ও মন প্রফুল্ল হয়, অগ্নি বর্দ্ধিত হয় এবং শরীর সুস্থ থাকে। পূর্ব্বে ধর্ম্মাচরণের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মধ্যেও এইরূপ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা ছিল। একটা উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। গ্রামের অনতি-দূরে একটী বৃহৎ অশ্বত্থ বৃক্ষ পঞ্চানন ঠাকুর নামে খ্যাত ও পূজিত হইত। চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী বহু গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা—সকলে মিলিয়া সেই পঞ্চানন তলায় মধ্যে মধ্যে রাঁধিয়া খাইত। তাহাতে যে কি আনন্দ—কি স্ফূর্ত্তি—তাহা যিনি না দেখিয়াছেন, তিনি বুঝিতে পারিবেন না। আরবদেশে একটী প্রবাদ আছে যে, যে দিন শিকার করিয়া বেড়ান হয়, সে দিন জীবনের দিনের মধ্যে গণনা করা হয় না। আমরাও বলি,—সেকালে যে দিন পঞ্চানন তলায় রাঁধিয়া খাওয়া হইত, সে দিন জীবনের দিনের মধ্যে গণনা করা হইত না। অপিচ এইরূপ দিনে যে কি ক্ষুধা হইত, তাহা অনুভব করিবার সৌভাগ্য লেখকের বাল্য-কালেই ঘটিয়াছিল।

একাদশী, অমাবস্যা এবং ভিন্ন ভিন্ন পর্ব্ব দিনে উপবাস করা আমাদের ধর্ম্মাচরণের মধ্যে পরিগণিত। মধ্যে মধ্যে এইরূপ উপবাস করিলে যদি কিছু অজীর্ণ হইয়া থাকে, তাহা নষ্ট হইয়া যায় এবং অগ্নি বলবান হইয়া থাকে। ধর্ম্মের অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে এই হিতকর প্রথাও দেশ হইতে লোপ পাইতে বসিয়াছে।

ধর্ম্মহীনতার সঙ্গে সঙ্গে আমরা অনেক হিতকর অনুষ্ঠান হইতে বঞ্চিত হইয়াছি। বাহুল্য ভয়ে আমরা সে সকল বিষয়ের আর আলোচনা করিলাম না। অজীর্ণ রোগ যে কিরূপ পরিণাম-ভয়াবহ এবং কিরূপে বিবিধ কারণের সমবায়ে অজীর্ণ রোগের এত প্রাদুর্ভাব ঘটিয়াছে—সেই বিষয়ই বলা হইল। এক্ষণে স্থূলতঃ অজীর্ণ রোগ কি কি কারণে জন্মিয়া থাকে তাহার আলোচনা করিব।

শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে যে, অতিরিক্ত জল পান, বিষমাশন (অর্থাৎ কোন দিন অল্প, কোন দিন অধিক, কোন দিন ১০ টায়, কোন দিন ৩টায়—এইরূপ অনিয়মে ভোজন), মল-মূত্রাদির বেগ ধারণ করা, নিদ্রা-বিপর্য্যয় (দিবসে নিদ্রা যাওয়া বা রাত্রি জাগরণকরা) প্রভৃতি কারণে কালে লঘু এবং সাত্ম্য দ্রব্য ভোজন করিলেও তাহা জীর্ণ হয় না। অপিচ, অভোজন, অতি-ভোজন, অসাত্ম্য দ্রব্য (যাহা শরীরের পক্ষে হিতকর নহে) ভোজন, গুরু-শীতল ও অতি রুক্ষ দ্রব্য ভোজন, সংদুষ্ট দ্রব্য (পচা, বাসি, কৃত্রিম প্রভৃতি) ভোজন, দেশ কাল ও ঋতুর বৈষম্য (স্বাভাবিক অবস্থার বিকৃতি) প্রভৃতি কারণে অগ্নি দূষিত হয় এবং সেই দূষিত অগ্নি লঘুপাক অন্নও জীর্ণ করিতে পারে না।

পরিপাক যন্ত্রের কোন অংশের বিকৃতি ঘটিলেও অজীর্ণ রোগ জন্মিয়া থাকে। দন্ত খাদ্যদ্রব্য পেষণ করিয়া পরিপাক কার্য্যের সহায়তা করে বলিয়া দন্তগুলিও পরিপাক যন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত। উত্তমরূপে চর্ব্বণ করিয়া আহার না করিলে ভুক্তদ্রব্য ভালরূপ জীর্ণ হয় না। দন্ত রোগ বশতঃ দন্ত—বিকৃত, শিথিল বা দুর্ব্বল হইলে খাদ্যদ্রব্য উত্তমরূপে চর্ব্বিত হয় না, কাজেই ভুক্ত দ্রব্য ভালরূপ জীর্ণ হয় না বলিয়া দন্তের অসুস্থতা বশতঃ অনেকের অজীর্ণ, উদরাময়, আমদোষ প্রভৃতি জন্মিয়া থাকে। এরূপ অবস্থায় অসুস্থ দন্তগুলি ফেলিয়া, কৃত্রিম দন্ত বাঁধাইয়া লওয়া উচিত। এইরূপ করিলে অজীর্ণাদি রোগ উৎপন্ন হইতে পারে না।

লালা গ্রন্থি (Salivary gland), আমাশয় (Stomack), এবং অন্ত্রের বিকৃতি ঘটিলেও অজীর্ণ-রোগ উৎপন্ন হয়। পূর্ব্বে যে অভোজন, অতিভোজন প্রভৃতি অজীর্ণের কারণ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, সেই সকল কারণেই উহাদের বিকৃতি ঘটিয়া থাকে।

শরীরের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গই পরস্পর সম্বন্ধ বিশিষ্ট, এক অঙ্গ অসুস্থ হইলে, অন্য অঙ্গও অল্প-বিস্তর অসুস্থ হইয়া পড়ে। আমাশয়ে কোন গোলযোগ ঘটিলে মাথা ধরে, আবার প্রবল মাথাধরা হইলে ক্ষুধা বা আহারে ইচ্ছা হয় না। বৃক্ষের একটী শাখা ধরিয়া আকর্ষণ করিলে অন্যান্য শাখাও যেরূপ আন্দোলিত হয়, ইহাও প্রায় তদ্রূপ। সুতরাং শরীরের যে কোনস্থান পীড়িত হইলেই অল্পাধিক পরিমাণে অজীর্ণ ও অগ্নিমান্দ্য হইয়া থাকে। এরূপ স্থলে সেই পীড়িত অঙ্গেরপীড়ার উপশম হইলেই অজীর্ণ ও অগ্নিমান্দ্য প্রসারিত হইয়া যায়। এক্ষণে অজীর্ণ রোগে পথ্যাপথ্য এবং অজীর্ণ রোগে যে সকল নিয়ম পালন কর্ত্তব্য, সে সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

অজীর্ণ রোগে পথ্য।—পুরাতন মিহি চাউলের অন্ন, ক্ষুদ্র মৎস্য, শাঞ্চে শাক, বেতো শাক, কচি মূলা, বেতের ডগা, সজিনার ডাঁটা, পাকা দেশী কুমড়া, কচি কাঁচকলা, গুগুনি শাক, গাঁদাল, পটোল, বেগুন, নিমপাতা, উচ্ছে, কাকরোল প্রভৃতির তরকারী। দালের

মধ্যে মুগের দাউলের যুষ মাত্র, দাল নহে। সর্ষপ তৈল, হিং, লবণ; আদা, যোয়ান, মরিচ, মেথী, ধনে, জীরা প্রভৃতি মসলার সংযোগে তরকারী রন্ধন করা যাইতে পারে। যেমন সহ্য হয়—অল্প অল্প মাখন বা ঘৃত সেবন করা কর্ত্তব্য। কেন না—ঘৃত দ্বারা অগ্নি বৃদ্ধি হইয়া থাকে। প্রথমে খুব অল্প মাত্রায় আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ মাত্রা বাড়াইতে হয়।

দুগ্ধ অজীর্ণ রোগে সুপথ্য নহে। কারণ দুগ্ধ খাইলে জীর্ণ হয় না এবং উদরে বায়ু জন্মায়। কিন্তু দুগ্ধ পান অভ্যাস থাকিলে অপেক্ষাকৃত অল্প মাত্রায় দুগ্ধের সমান পরিমাণ জল-বার্লি মিশ্রিত করিয়া খাওয়া যাইতে পারে। কোষ্ঠবদ্ধতা যুক্ত অজীর্ণ রোগে কখন কখন ইষদুষ্ণ দুগ্ধ পান করিলে বেশ উপকার হয়। অজীর্ণ রোগে তরল দাস্ত হইতে থাকিলে তক্র বিশেষ উপকারী। দধির সিকি পরিমাণ জলের সহিত মিলাইয়া মন্থন করিয়া মাখন উদ্ধৃত করিয়া লইলে তাহাকে তক্র বলা যায়। এইরূপ অবস্থায় ছানার জলও সুপথ্য। সর্দ্দি-কাস প্রভৃতি উপসর্গ না থাকিলে অজীর্ণ রোগে দধি সুপথ্য।

সর্ব্ব প্রকার লেবু, দাড়িম, আঙ্গুর, পানি-ফল, ও মিছরি অজীর্ণ রোগে হিতকর। গরম জল এবং কটু ও তিক্ত দ্রব্য এই রোগে সুপথ্য।

সহ্য হইলে দুই বেলা অন্নাহার করা যাইতে পারে। সহ্য না হইলে একবেলা অন্ন, আর একবেলা খৈয়ের মণ্ড, যবের রুটী বা জলবার্লি সেবন করা কর্ত্তব্য। প্রবল অজীর্ণ রোগে আবশ্যক হইলে দুইবেলা অন্নাহার বন্ধ করিয়া অন্ন মণ্ড; খৈয়ের মণ্ড প্রভৃতি খাওয়া যাইতে পারে। এই রোগে তরকারী ব্যবহার যত কম হয়—ততই ভাল। তরকারী চুষিয়া ছিবড়া ফেলিয়া দেওয়া উচিত। খাদ্য সংস্কার প্রসঙ্গের উপদেশ অনুসারে হিং, আদা, মরিচ প্রভৃতি পাচক দ্রব্য সংযোগে তরকারী প্রস্তুত করিলে সহজে জীর্ণ হয়।

অপথ্য—জোলাপ লওয়া, মল মুত্রের বেগ ধারণ, রাত্রি জাগরণ, পূর্ব্বাহার জীর্ণ না হইতে ভোজন, দাল, মৎস্য, মাংস, পুঁইশাক, পিষ্টক, গুড়, তালশাঁস, তালের ফোঁপল, দুগ্ধ, ছানা, ক্ষীর, সরবৎ, অধিক জলপান এবং সর্ব্ব প্রকার গুরুপাক দ্রব্য অজীর্ণ রোগে অহিত-করি।

এক্ষণে অজীর্ণ রোগে বিশেষ হিতকর কতকগুলি নিয়মের উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি। ঔষধ সেবন অপেক্ষা এই সকল নিয়ম পালনে অধিক উপকার হওয়া সম্ভব।

১। ব্যায়াম।—রীতিমত দুই বেলা ব্যায়াম করা কর্ত্তব্য। অন্য ব্যায়ামের অভাবে সামর্থ্য অনুসারে প্রত্যহ দুই এক ক্রোশ করিয়া দুই বেলাই ভ্রমণ করা কর্ত্তব্য।

২। আহার। (ক) উত্তমরূপে চর্ব্বন করিয়া আহার করিবে। (খ) আহারের পূর্ব্বে এবং পরে কিছুক্ষণ (প্রায় একঘণ্টা) পরিশ্রম করিবে না। (গ) আহারের অব্যবহিত পূর্ব্বে বা পরে জলপান করিবে না, এক ঘণ্টা পরে জল পান করিবে। (ঘ) মনে ক্রোধাদির উদ্রেক হইলে সে সময়ে আহার না করিয়া মন প্রশান্ত হইলে আহার করিবে। (ঙ) আহারের সময় এবং পরে কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত মন যাহাতে প্রফুল্ল থাকে তাহা করা কর্ত্তব্য। (চ) উষ্ণ খাদ্য আহার করিবে। (ছ) অত্যন্ত দ্রুত বা অত্যন্ত বিলম্ব করিয়া আহার করিবে না। (জ) তন্মনা হইয়া

আহার করিবে। (ঝ) নিত্য এক সময়ে আহার করিবে।

৩। জলপান।—অজীর্ণ রোগে অল্প জল পান করা উচিত। বাতশ্লেষ্ম প্রধান অজীর্ণ রোগে দিন তিন চারিবার তিন ছটাক বা এক পোয়া করিয়া গরম জল খাইলে বিশেষ উপকার হয়। পিত্ত ও বাতপিত্ত প্রধান অজীর্ণ রোগে উষা পান অর্থাৎ সূর্য্য উদয়ের পূর্ব্বে শীতল জল আধ সের তিন পোয়া পান করিলে সুফল পাওয়া যায়।

৪। নিদ্রা।—দিবা নিদ্রা এবং রাত্রি জাগরণ উভয়ই অজীর্ণ রোগের কারণ, সুতরাং দিবানিদ্রা এবং রাত্রিজাগরণ বর্জ্জনীয়। রাত্রি ৯৷১০ টার সময় নিদ্রিত হইয়া প্রত্যূষে শয্যা-ত্যাগ করিবে।

৫।—নিত্য কিছুক্ষণ মন যাহাতে প্রফুল্ল থাকে এরূপ নির্দ্দোষ ক্রীড়া বা আমোদ আহ্লাদ করিবে।

৬।—সংযম অভ্যাস করিবে।

দিনচর্য্যা।

যেরূপ নিয়মে নিত্য আহার-বিহারাদি করিলে শরীর সুস্থ থাকে এবং দীর্ঘজীবন লাভ করা যায়, আয়ুর্ব্বেদে সেই সকল নিয়ম দিন-চর্য্যা ও সদাচারের অন্তর্ভুক্ত। ডাক্তারীতে যাহাকে হাই-জিন (Hygiene) বলে, শাস্ত্রোক্ত দিনচর্য্যা ও সদাচার বলিতে তাহাই বুঝায়। তবে স্বাস্থ্যনীতির (Hygiene) কয়েকটী প্রধান অঙ্গ ধর্ম্ম-শাস্ত্রের অনুশাসন বিধির অন্তর্ভুক্ত আছে। অপিচ, ঋতুচর্য্যাকেও ইহার মধ্যে গণনা করা উচিত।

শাস্ত্র বলিয়া গিয়াছেন,—

আহার, নিদ্রা ও ব্রহ্মচর্য্য—এই তিনটি শরীর ধারণের তিনটী স্তম্ভ স্বরূপ। এই তিনটী, যথাযথরূপে সেবিত হইলে—বল, বর্ণ, পুষ্টি এবং দীর্ঘ পরমায়ু লাভ করা যায়।

ইতঃপূর্ব্বে ব্রহ্মচর্য্য প্রবন্ধে, ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ বাহুল্য মাত্র। তবে এখানে ব্রহ্মচর্য্য অর্থে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম নহে, ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমোচিত সংযম অবলম্বন বুঝাইতেছে। আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে শরীর রক্ষার অপর দুইটী প্রধান উপায়;—আহার ও নিদ্রার বিষয় আলোচনা করিব।

প্রথমতঃ শয্যাত্যাগ হইতে আলোচনা করা যাউক। ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে (অর্থাৎ রাত্রি দুই দণ্ড বা ৪৮ মিনিট থাকিতে) শয্যাত্যাগ করিবে।

প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করা স্বাস্থ্য রক্ষা ও দীর্ঘায়ু লাভের প্রশস্ত উপায়। শাস্ত্রে প্রাণনাশক যে ছয়টী বিষয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে, * তন্মধ্যে প্রভাত কালে নিদ্রা সেবন একটী। প্রকৃতির অনুবর্ত্তনকারী রোগহীন পশু পক্ষীদিগের প্রতিও দৃষ্টিপাত করিলে, তাহারাও অতি প্রত্যূষে জাগরিত হইয়া থাকে দেখিতে পাই। যাহা হউক স্বাস্থ্যকামী ব্যক্তি মাত্রেরই প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করা উচিত। শয্যাত্যাগ করিবার পরেই ভগবানের নাম স্মরণ করা কর্ত্তব্য। ইহাতে মনের দৃঢ়তা সম্পাদিত হয়, মন প্রশান্ত হয়, এবং অল্প কারণে বিচলিত হয় না। এইজন্য আর্য্য ঋষিগণ প্রাতে গাত্রোত্থান করিয়া মহাবাক্য সকল অন্তরের সহিত আবৃত্তি করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

অনন্তর শরীরের বিষয় চিন্তা করিয়া শৌচ-কার্য্য সমাধা করিবে। শরীরের বিষয় চিন্তা অর্থে শরীর কেমন আছে, পূর্ব্বাহার জীর্ণ হইয়াছে কিনা ইত্যাদি। এই প্রাতঃকালের শরীর চিন্তার উপরেই সমস্ত দিনের কর্ত্তব্যের অবধারণ নির্ভর করিতেছে। অবশ্য সুস্থ দেহে সুস্থ ব্যক্তির ন্যায়ই দিনচর্য্যা করিতে হয়। কিন্তু অজীর্ণাদি ঘটিলে তাহাতে বিবেচনা পূর্ব্বক স্নান, আহার, পরিশ্রম প্রভৃতি দৈহিক ব্যাপার নিয়মিত করিতে হয়। এক কথায় প্রকারান্তরে—এই স্থলে বলা হইল যে, শরীরের সামান্য কিছু ভাবান্তর ঘটিলেই সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রতিকারে মনোযোগী হইবে।

ইহার পর, শৌচ-কার্য্য সমাধা করিবে। প্রত্যহ প্রাতে যথোচিত মলোৎসর্গ হওয়া সুস্থের লক্ষণ এবং স্বাস্থ্যরক্ষার অনুকূল, তাহার পর, দন্ত ধাবন ও জিহ্বা নির্লেখন করিতে হয়। কষায়, মধুর, তিক্ত বা কটু রসাত্মক দন্ত কাষ্ঠ (দাঁতন) প্রশস্ত। নিম, খদির, মৌল, করঞ্জ, কবরী, আকন্দ, অর্জ্জুন প্রভৃতি বৃক্ষের দন্তকাষ্ঠ ব্যবহার্য্য। শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী ও বহেড়ার চূর্ণ, মধু, তৈল ও লবণ সহ মিশ্রিত করিয়া দন্ত কাষ্ঠের অগ্রভাগ চিবাইয়া কুঁচির ন্যায় করিয়া উক্ত পদার্থ মাখাইয়া এক একটী দন্ত ঘর্ষণ করিবে। কিন্তু যেন দন্তমাংস আহত না হয়। এইরূপে দন্তধাবন করিলে জিহ্বা, দন্ত ও মুখের মল বহির্গত হইয়া যায়, মুখের দুর্গন্ধ ও বিরসতা নষ্ট হয়, দন্ত সকল পরিষ্কৃত হয় এবং আহারে রুচি জন্মে।

গলরোগ, তালুরোগ, ওষ্ঠরোগ, জিহ্বা-রোগ, মুখ ক্ষত, শ্বাস, কাস, হিক্কা, বমি, মূর্চ্ছা, মদাত্যয় (Alchoholism), অর্দ্দিত ; (Facial paralysis), কর্ণশূল, দন্তরোগ ও হৃদ্রোগ থাকিলে দন্তকাষ্ঠ ব্যবহার করা উচিত নহে। কেবল পূর্ব্বোক্ত চূর্ণ দ্বারা দন্ত মার্জ্জনা করা কর্ত্তব্য।

দন্তধাবনের পর স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, সীসক, টিন বা লৌহ নির্ম্মিত জিহ্বানির্লেখন (জিব-ছোলা) দ্বারা জিহ্বা পরিষ্কার রাখা উচিত। ইহাতে জিহ্বার মল দূরীভূত হয় এবং মুখ-

* স্ত্রিয়ো বৃদ্ধা পূতি মাংসং বালার্কস্তরুণং দধিঃ।
প্রভাতে মৈথুনং নিদ্রা সদ্য প্রাণ হরাণি ষট ॥

অর্থাৎ বৃদ্ধা স্ত্রী গমন, পচা মাংস আহার, শরৎকালের রৌদ্র সেবন, অসম্যক জাত দধি সেবন এবং প্রভাতে মৈথুন ও নিদ্রা সেবন এই ছয়টী সদ্যো প্রাণনাশক। প্রাণ-অর্থে এখানে জীবনী শক্তি (vitality).

বিবরে সৌগন্ধ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহার পর গণ্ডূষধারণ করিবার জন্য শাস্ত্রকারগণ বলিয়া গিয়াছেন। প্রত্যহ প্রাতঃকালে তৈলের গণ্ডূষ ধারণ করিলে হনুতে (চোয়ালে) বলজন্মে, স্বর বর্দ্ধিত হয়, অন্নে রুচি জন্মে, কণ্ঠশোষ ও মুখশোষ হয় না, ঠোঁটফাটার আদৌ ভয় থাকে না, দন্ত সকল ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না এবং দৃঢ় মূল হইয়া থাকে। ইহার দ্বারা দন্তশূলও নিবারিত হয়। এরূপ করিলে অম্লদ্রব্য ভক্ষণ করিলেও দন্তহর্ষ (দাঁত শির শির করা) হয় না এবং কঠিন দ্রব্য চর্ব্বণ করিয়া খাইতে পারা যায়। তৈলের গণ্ডূষ-ধারণ এরূপ উপকারী, কিন্তু দুঃখের বিষয়, যে, এদেশে একেবারে ইহা চলিত নাই। যাহা হউক প্রত্যহ এক গণ্ডূষ তৈল খরচ করিয়া দেশের সকল ব্যক্তিই এই হিতকর নিয়মটী পালন করিলে বিশেষ উপকার পাইবেন। তৈল-গণ্ডূষ ১৫ মিনিট মুখে ধারণ করিলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়া থাকে।

অনন্তর তৈল মর্দ্দন করিয়া স্নান করিবে। কুম্ভকে পুনঃ পুনঃ তৈলাক্ত করিলে, চর্ম্মে বারবার তৈল মাখাইলে—গাড়ীর ধুরায় তৈল দিলে—উহারা যেমন ভারসহ হইয়া থাকে, সেইরূপ তৈলাভ্যঙ্গ দ্বারা শরীর দৃঢ় ও উত্তম ত্বক্ বিশিষ্ট হয়, বায়ুরোগ জন্মিতে পারেনা।

মস্তক তৈল দ্বারা আর্দ্র রাখিলে শিরঃশূল হয় না, খালিত্য (টাক) ও পালিত্য (চুল-পাকা) জন্মে না, কেশ সকল পতিত হয় না, কেশ সকল দীর্ঘ, কৃষ্ণবর্ণ ও দৃঢ় হয়, মস্তকের অস্থি সমূহের বল বর্দ্ধিত হয়, ইন্দ্রিয় সকল প্রসন্ন হয়, ত্বক সুন্দর ও নির্ম্মল হয়, এবং সহজে নিদ্রা হয়।

নিত্য কর্ণকুহরে তৈল প্রদান করিলে বায়ুজনিত কর্ণরোগ হয় না, মন্যাস্তম্ভ (ঘাড়ের শির টানিয়া ধরা) কিম্বা হনুগ্রহ (চোয়াল নাড়িতে না পারা), উচ্চৈঃ শ্রুতি (চেঁচাইয়া বলিলে শুনিতে পাওয়া) কিম্বা বধিরতা রোগ জন্মে না।

বায়ু দ্বারা স্পর্শশক্তি জন্মে এবং ত্বক্ই স্পর্শ জ্ঞানের আশ্রয় স্বরূপ। অথচ তৈল ত্বকের পরম হিতসাধক। এইজন্য নিত্য তৈলাভ্যঙ্গ করিবে। নিত্য তৈলাভ্যঙ্গ সেবীর গাত্রে আঘাত লাগিলে অভিঘাতজনিত পীড়া প্রবল হইতে পারে না, বল প্রয়োগ কার্য্য করিলেও সহসা শরীর পীড়িত হয় না। অভ্যঙ্গ বশতঃ জরা সহজে আক্রমণ করিতে পারে না।

পাদদেশে নিত্য তৈল মর্দ্দন করিলে পদের ক্ষয়ত্ব শুষ্কতা, রুক্ষতা, অবসন্নতা এবং গ্লানি সদ্যঃই নষ্ট হয়, পদদ্বয় সুকুমার, সবল ও দৃঢ় হয়, দৃষ্টিশক্তি বর্দ্ধিত হয়, বায়ু প্রশমিত হয়, গৃধ্রসী রোগ (Sciatica) হয় না, পা ফাটিয়া যায় না। এবং পাদের শিরা বা স্নায়ুর সঙ্কোচ হয় না।

শরীরে আমদোষ থাকিলে, অজীর্ণরোগে এবং বমন-বিরেচনের পর তৈলাভ্যঙ্গ নিষিদ্ধ। কারণ ইহাতে অগ্নিমান্দ্যাদি বিবিধ রোগ উৎপন্ন হইতে পারে।

স্নান—পবিত্রতাজনক, শুক্রবর্দ্ধক, আয়ু-বর্দ্ধক। শ্রম স্বেদ ও মলনাশক, বলকারক এবং অত্যন্ত ওজোবর্দ্ধক, অপিচ স্নান করিলে দাহ ও পিপাসা দূর হয়, সমস্ত ইন্দ্রিয় বিশোধিত হয়, মনের প্রীতি হয়, রক্ত পরিষ্কৃত হয় এবং অগ্নি উদ্দীপিত হয়।

শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে যে, উষ্ণ জল দ্বারা অধঃকায় (মস্তক ব্যতীত সমস্ত শরীর) ধৌত করা সুখজনক। কিন্তু মস্তকে উষ্ণ জল দিলে কেশ ও চক্ষুর বলহানি হইয়া থাকে। সেইজন্য উষ্ণ জল দ্বারা অধঃশরীর ধৌত করিয়া মস্তকে শীতল জল বা উষ্ণজল শীতল করিয়া তদ্দ্বারা ধৌত করা উচিত। কিন্তু বাত-শ্লেষ্মপ্রকোপজনিত রোগে অবস্থা বিবেচনায় উষ্ণ জলদ্বারা মস্তক ধৌত করা ও যাইতে পারে।

শীতকালে অত্যন্ত শীতল জলে স্নান করিলে বায়ু ও শ্লেষ্মা প্রকুপিত হয়। আবার উষ্ণকালে অত্যন্ত উষ্ণ জলে স্নান করিলে রক্ত ও পিত্ত কুপিত হইয়া থাকে। সুতরাং এতদুভয়ই বর্জ্জনীয়।

যাহাদের শরীর সুস্থ,—তাহাদিগের পক্ষে স্রোত-জলে স্নান করাই প্রশস্ত। কলের জল বহুক্ষণ মৃত্তিকার নিম্নে রুদ্ধ থাকে বলিয়া রৌদ্র ও বায়ুর সংস্পর্শবশতঃ কিঞ্চিৎ দূষিত হইয়া পড়ে। যাহারা নিত্য গঙ্গাস্নানে অভ্যস্ত, কলের জলে স্নান করিলে তাহাদের সর্দ্দি হয় দেখিয়াছি। কলের জলে স্নান করিতে হইলে জল ধরিয়া প্রথমে কিছুক্ষণ রৌদ্রে রাখা উচিত।

যাঁহাদের শরীরে বায়ু বা শ্লেষ্মা অথবা বাতশ্লেষ্মার প্রকোপ আছে, তাহাদের পক্ষে অধঃশরীর উষ্ণজলে ধৌত করিয়া মস্তকে উষ্ণ-জল শীতল করিয়া তদ্দ্বারা ধৌত করা কর্ত্তব্য। পিত্তপ্রধান ব্যক্তির পক্ষে শীতল জলে স্নান করাই হিতকর।

উষ্ণ জলে স্নান করিতে হইলে কিরূপ উষ্ণ জলে স্নান করা উচিত? এক কথায় ইহার উত্তর—সুখোষ্ণ জলে অর্থাৎ জলের যে পরিমাণ উত্তাপ থাকিলে তাহা শরীরের সুখকর হইয়া থাকে—তাহাতেই স্নান করা উচিত। উষ্ণজলই হউক, শীতল জলই হউক—যাহা শরীরের সুখকর হয়, সেইরূপ জলে স্নান করা উচিত।

অতিসার, জ্বর, কর্ণশূল, বিবিধ বায়ুরোগ, আধ্মান (পেটফোলা) রোগ, অরুচি এবং অজীর্ণ রোগে স্নান করা নিষিদ্ধ। আহার করিয়া, পরিশ্রম করিয়া, রৌদ্র সেবন ও ভয় পাইবার পর কিম্বা শরীর ও মন সুস্থ না হইলে কদাচ স্নান করিবে না।

প্রসঙ্গ ক্রমে শাস্ত্রোক্ত কতকগুলি নিত্য ব্যবহার্য্য বিষয়ের গুণ লিখিত হইতেছে।

বস্ত্র ধারণ—নির্ম্মল বস্ত্রধারণ আয়ুঃপ্রদ ও অলক্ষ্মী নাশক।

গন্ধমাল্য সেবন—পুংস্ত বর্দ্ধক, সুগন্ধজনক, আয়ুঃপ্রদ, পুষ্টি ও বলপ্রদ। ইহা মনের তৃপ্তি-জনক।

রত্নালঙ্কার ধারণ—শ্রেষ্ঠতাব্যঞ্জক, মঙ্গল-কর, আয়ুঃপ্রদ, শ্রীজনক, মনের হর্ষজনক, এবং ওজোবর্দ্ধক।

পাদুকা ধারণ—চক্ষুঃ ও স্পর্শেন্দ্রিয়ের হিতকর, পদদ্বয়ের বিপদ নিবারক, বলকর, গমনে সুখকর এবং পুংস্তবর্দ্ধক।

শরীরের কেশাদিকর্ত্তন—কেশ, নখ, শ্মশ্রু কর্ত্তন—দেহের হর্ষও লঘুতা সম্পাদক, সৌভাগ্যজনক, উৎসাহ বর্দ্ধক, পবিত্রতা সম্পাদক এবং রূপ ব্যঞ্জক।

কেশ প্রসাধন—কেশ প্রসাধন (চুল আচড়ান) দ্বারা মস্তকের ধূলি, উকুন ও মল দূর হয়, কেশের উৎকর্ষ ঘটে এবং শ্রী সম্পাদিত হয়।

অনুলেপন (গাত্রে চন্দনাদি সুগন্ধি দ্রব্য লেপন)—ইহা সৌভাগ্যপ্রদ, বর্ণ-প্রীতি-

ওজঃ ও বলবর্দ্ধক এবং স্বেদ দুর্গন্ধ, বিবর্ণতা ও শ্রমনাশক। যাহাদিগের পক্ষে স্নান নিষিদ্ধ বলা হইয়াছে, তাহাদিগের পক্ষে অনুলেপনও নিষিদ্ধ।

ছত্র ধারণ—ছত্র ধারণ দ্বারা বৃষ্টি, বায়ু, ধূলি, রৌদ্র ও হিম নিবারিত হয়। শরীরের বর্ণ ভাল থাকে, চক্ষুদ্বয়ের হিত হয়, ওজঃ বর্দ্ধিত হয়।

দণ্ড ধারণ—দণ্ড (লাঠি) ব্যবহার করিলে কুক্কুর, সর্প প্রভৃতির ভয় নিবারিত হয়, পদ স্খলন হয় না, শ্রমের লাঘব হয় এবং উৎসাহ, বল, স্থৈর্য্য ও ধৈর্য্য বর্দ্ধিত হয়।

উষ্ণীষ ধারণ—মস্তকে উষ্ণীষ ধারণ করিলে কেশ পবিত্র থাকে এবং বায়ু, আতপ ও ধুলা লাগিতে পারে না।

শৌচ—পাদদ্বয় এবং মল মার্গ সকল ধৌত করিয়া শুচি রাখিলে আয়ু ও মেধা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, শরীর পবিত্র থাকে।

শরীর পরিমার্জ্জন—নিত্য গাত্র মার্জ্জনা করিলে শরীরের দুর্গন্ধ ও গুরুতা নষ্ট হয়, তন্দ্রা, কণ্ডু ও মল দূর হয়, শরীরের কদর্য্য ভাব নষ্ট হয় এবং আহারে রুচি জন্মে।

উদ্বর্ত্তন—অঙ্গে কুঙ্কুম-হরিদ্রাদি মর্দ্দনকে উদ্বর্ত্তন বলে। ইহা দ্বারা মেদ, কফ ও বায়ু নষ্ট হয়, অঙ্গ সকল দৃঢ় হয় এবং চর্ম্ম নির্ম্মল হইয়া থাকে।

সংবাহন (গা টেপান)—সংবাহন নিদ্রা ও প্রীতিজনক। পুংস্ত বর্দ্ধক, কফ, বায়ু ও শ্রম নাশক, মাংস, রক্ত ও চর্ম্মের প্রসন্নতা কারক এবং সুখজনক।

পাদ প্রক্ষালন—পদ প্রক্ষালন করিলে পদের মল দূর হয়, পদে রোগ হয় না শ্রম দূর হয়, চক্ষু ভাল থাকে, পুংস্ত বর্দ্ধিত হয় এবং প্রীতি জন্মে।

উপবেশন—বসিয়া থাকিলে স্থৌল্য, সৌকুমার্য্য ও সুখ বর্দ্ধিত হয়।

পথ পর্য্যটন—পথ পর্য্যটন করিলে স্থৌল্য ও সৌকুমার্য্য নষ্ট হয়। অতিরিক্ত পথ পর্য্যটন করাও দৌর্ব্বল্য জনক।

সংক্রমণ (পাইচারী করা)—পাইচারি করিলে দেহের কষ্ট হয় না, আয়ু, বল, মেধা ও অগ্নি বর্দ্ধিত হয় এবং ইন্দ্রিয় সকল শক্তি শালী হইয়া থাকে।

শয্যাশন—উৎকৃষ্ট অর্থাৎ কোমল বিস্তীর্ণ এবং যথেষ্ট উপাধানাদিযুক্ত শয্যায় শয়ন করিলে সুখে নিদ্রা হয়, শ্রম ও বায়ু নষ্ট হয় এবং বীর্য্যের পুষ্টিলাভ হয়। দুঃখজনক শয্যায় শয়ন করিলে ইহার বিপরীত ফল হইয়া থাকে।

ব্যজন (পাখার বাতাস)—ব্যজন দ্বারা মুখাদির শুষ্কতা, দাহ, ব্রণ, মূর্চ্ছা ও ঘর্ম্ম নিবারিত হয়।

বায়ু সেবন—নির্ম্মল বায়ু সেবন করিলে আয়ু ও আরোগ্য লাভ হয়।

আতপ ও ছায়া—রৌদ্র সেবন করিলে তৃষ্ণা, পিত্ত, শরীরের উত্তাপ, স্বেদ, মূর্চ্ছা, ভ্রম ও রক্তদোষ জন্মে এবং ছায়া সেবন দ্বারা ঐ সকল নষ্ট হয়।

ব্যায়াম—শরীরের আয়াস অর্থাৎ পরিশ্রম জনক কার্য্যমাত্রকেই ব্যায়াম বলা যায়। নিয়মিতরূপে ব্যায়াম করিলে অতিরিক্ত জনিত কোন রোগই আক্রমণ করিতে পারে না। ব্যায়ামের পর সর্ব্ব শরীর উত্তমরূপে এবং সুখজনক ভাবে মর্দ্দন করান উচিত।

ব্যায়াম দ্বারা শরীরের পুষ্টি হয়, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল সুবিভক্ত হয়, কান্তি বর্দ্ধিত হয়, অগ্নির দীপ্তি হয়, আলস্য থাকে না, শরীর বিশুদ্ধ, লঘু ও দৃঢ় হয়, শ্রম, ক্লান্তি, পিপাসা, শীত,

ও গ্রীষ্ম সহ্য করিতে পারা যায় এবং পরম আরোগ্য লাভ হইয়া থাকে। ব্যায়ামের ন্যায় শরীরের স্থৌল্যনাশক আর কিছুই নাই। ব্যায়ামশীল ব্যক্তিকে সহজে জরা আক্রমণ করিতে পারে না। ব্যায়ামশীল ব্যক্তির শরীরের মাংস দৃঢ় হয়। ক্ষুদ্র মৃগ সকল যেমন সিংহকে আক্রমণ করিতে পারে না, সেইরূপ ব্যায়াম ও উদ্বর্ত্তনকারী ব্যক্তিকে রোগ সকল আক্রমণ করিতে পারে না, ব্যায়ামকারী ব্যক্তির তরুণ বয়স না থাকিলেও তাহাকে দেখিলে সুন্দর বোধ হয়। নিত্য ব্যায়াম করিলে বিরুদ্ধ (দুগ্ধ মৎস্য একত্র ভোজন)—যে কোন প্রকার গুরু খাদ্য আহার করা যাউক না কেন, তাহা নির্দ্দোষরূপে পরিপাক প্রাপ্ত হয়।

বলবান এবং স্নিগ্ধ ভোজনকারী ব্যক্তির পক্ষে ব্যায়াম বিশেষ হিতকর। শীতকালে এবং বসন্ত কালে ব্যায়াম বিশেষরূপে হিতকর।

বলের অর্দ্ধেক পরিমাণ ব্যায়াম করিবে। ইহার অধিক করিলে মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। হৃদয়াস্থিত বায়ু যখন মুখে উপস্থিত হয় অর্থাৎ যখন হাঁপাইতে হয় বা হাঁ করিয়া শ্বাস টানিতে হয়, তখন অর্দ্ধেক বল পরিমাণ ব্যায়াম করা হইয়াছে বুঝিতে হইবে। শাস্ত্রান্তরে কথিত হইয়াছে যে, যখন বগল, কপাল, নাসিকা, এবং হস্ত পদাদিতে ঘর্ম্ম সঞ্চার হইবে এবং মুখ শুষ্ক হইবে তখন বলের অর্দ্ধেক পরিমাণ ব্যায়াম করা হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

বয়স, বল, দেহ, দেশ, কাল, ও খাদ্য সম্বন্ধে লক্ষ্য রাখিয়া ব্যায়াম করিতে হয়। ইহার অন্যথা করিলে রোগ জন্মিয়া থাকে।

অতিরিক্ত ব্যায়ামবশতঃ ক্ষয়, তৃষ্ণা, অরুচি, বমি, রক্তপিত্ত, ভ্রম, ক্লান্তি, কাস, শোষ, জ্বর ও শ্বাস প্রভৃতি রোগ জন্মিয়া থাকে।

রক্তপিত্ত, শোষ, শ্বাস, কাস, ভ্রম ও ক্ষত রোগগ্রস্ত ব্যক্তির এবং স্ত্রীসহবাসবশতঃ ক্ষীণ ব্যক্তির পক্ষে ব্যায়াম নিষিদ্ধ। আহারের পর ব্যায়াম করা কর্ত্তব্য নহে।

শাস্ত্রে ব্যায়াম সম্বন্ধে যথেষ্ট লিখিত হইয়াছে। শাস্ত্রোক্তি নিম্নে পরিস্ফুট করা যাইতেছে।

ব্যায়ামের উপকারিতা—ব্যায়ামের উপকারিতা সম্বন্ধে যাহা শাস্ত্রে লিখিত হইয়াছে, তাহার উপর কিছু বলা ধৃষ্টতা মাত্র। কিন্তু ব্যায়াম ব্যতীত শরীর যে সুস্থ থাকিতে পারে না সে সম্বন্ধে একটী সুন্দর গল্প আছে। নিম্নে তাহা লিখিত হইল।

কোন সময়ে এক ঋষি—মানব কিসে নীরোগ হয়—এই বিষয় বৃক্ষতলে বসিয়া চিন্তা করিতেছিলেন। এমন সময় একটী পক্ষী যদৃচ্ছা ক্রমে উড়িয়া আসিয়া সেই বৃক্ষের শাখায় উপবিষ্ট হইল। পক্ষীমাত্রেই মধ্যে মধ্যে ডাকিয়া থাকে, এই পক্ষীটীও বৃক্ষ শাখায় বসিয়া ডাকিল। কিন্তু পাখীর ডাকে একটু বিশেষত্ব ছিল। পাখী ডাকিল, "কোহরুক্।" পক্ষী আপনার অত্যন্ত শব্দই করিয়াছিল, কিন্তু তরুতলস্থ ঋষি সেই ডাক শুনিয়া মনে করিলেন, যে আমি যাহা ভাবিতে ছিলাম,—পাখী সেই বিষয়েই প্রশ্ন করিয়াছে "কোহরুক" অর্থাৎ নীরোগ কে? কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া ঋষি উত্তর করিলেন, "হিতভুক" অর্থাৎ যে ব্যক্তি হিতকর দ্রব্য ভোজন করে সেই নীরোগ। কিন্তু ইহাতে পাখীর ডাক থামিল না। পাখী আবার ডাকিতে লাগিল "কোহরুক?" ঋষি ভাবিলেন যে,—উত্তর সম্যক হয় নাই। তিনি

চিন্তা করিয়া দেখিলেন যে, কেবল হিতকর দ্রব্য খাইলেই নীরোগ হওয়া যায় না, সমান পরিমাণে আহার করা আবশ্যক। কারণ হিতকর দ্রব্যও অল্প বা অধিক পরিমাণে আহার করিলে রোগ হইয়া থাকে। সুতরাং তিনি উত্তর করিলেন,'—হিতভুক্ মিতভুক্' অর্থাৎ হিতকর দ্রব্য পরিমিত মাত্রায় যে আহার করে সেই নীরোগ। কিন্তু অদ্যাপি পাখীর ডাক থামিল না। পাখী আবার ডাকিতে লাগিল 'কোঽরুক্ ?' ঋষি ভাবিলেন, এবারেও উত্তর সম্যক হয় নাই। তিনি চিন্তা করিয়া দেখিলেন যে, কেবল হিতকর দ্রব্য পরিমিত ভাবে আহার করিলেই শরীর সুস্থ থাকেনা, পরিমিত আহার ব্যতীত ভুক্তদ্রব্য জীর্ণ হইবে কিরূপে ? এবার তিনি উত্তর করিলেন, 'হিতভুক্ মিতভুক্ শ্রমোপভুকয়শ্চ,' অর্থাৎ যে ব্যক্তি হিতকর দ্রব্য পরিমিত ভাবে আহার করে এবং পরিশ্রম করিয়া আহার করে, সেই নীরোগ। পাখীটী যেন উত্তরে সন্তুষ্ট হইয়াই অন্যত্র চলিয়া গেল।

ব্যায়াম কাহাকে বলে—পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে! শরীরের আয়াস বা শ্রমজনক কার্য্যের নাম ব্যায়াম। অন্যত্র কথিত হইয়াছে যে, শরীরের যে চেষ্টা দ্বারা দেহ দৃঢ় ও সবল হয় তাহাকে ব্যায়াম বলে। ফলতঃ যাহাতে শরীরের যাবতীয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দৃঢ় হয়, তাহাকেই সম্পূর্ণ ব্যায়াম বলা যায়। পথ পর্য্যটন দ্বারাও আয়াস হয় বটে কিন্তু পদদ্বয় যেরূপ সঞ্চালিত হয়, অন্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সেরূপ সঞ্চালিত হয় না। কুস্তি, ডন করা প্রভৃতিও ব্যায়াম পদ বাচ্য। অধুনা স্যাণ্ডো সাহেবের আবিষ্কৃত নানা প্রকার উত্তম ব্যায়ামের প্রচলন হইয়াছে।

কুলি-মজুর প্রভৃতি ইতর শ্রেণীর লোক যথেষ্ট পরিশ্রম করে বলিয়া তাহাদের আর স্বতন্ত্র ব্যায়াম করিবার আবশ্যক হয় না। যে সকল দরিদ্র স্ত্রীলোক সংসারের যাবতীয় কার্য্য করিয়া থাকেন, তাঁহাদেরও যথেষ্ট শ্রম হয় বলিয়া স্বতন্ত্র ব্যায়াম অনাবশ্যক। এতদ্ভিন্ন অন্য সকলেরই নিত্য নিয়মিত ভাবে ব্যায়াম করা কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ আজকাল গাড়ী-ঘোড়া—যান বাহনের প্রাচুর্য্যের দিনে লোকে বেশী হাঁটিয়া চলে না, পূর্ব্বে ভদ্রলোকে কোন দ্রব্যাদি বহিয়া লইয়া যাইতে সঙ্কুচিত হইতনা। কিন্তু এখন লোকে শ্রমসাধ্য কোন কার্য্য স্বহস্তে করা অপমানজনক বোধ করে। সেইজন্য সকলের পক্ষেই নিত্য কিছুক্ষণ ব্যায়াম করা অত্যন্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। এই ব্যায়াম হীনতা দেশে অজীর্ণাদি বিবিধ রোগের প্রাবল্যের মূল।

শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে যে, বলবান এবং স্নিগ্ধ ভোজনকারীদিগের পক্ষে ব্যায়ামে অভ্যস্ত হওয়া হিতকর। ইহাতে বিপর্য্যয় বাক্যের বৈপরীত্য দ্বারা বুঝা যায় যে, দুর্ব্বল এবং রুক্ষভোজীদিগের পক্ষে ব্যায়াম হিতকর নহে। বাঙ্গালী জাতি এক্ষণে দুর্ব্বল এবং রুক্ষভোজী। সুতরাং এখনকার বাঙ্গালীর ব্যায়াম করিতে হইলে অল্প মাত্রায় ব্যায়াম করা উচিত। অল্প ব্যায়াম দ্বারা ক্রমশঃ শরীরের বল বর্দ্ধিত হইলে পরে সম্যক্ ব্যায়াম করা যাইতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে কিঞ্চিৎ স্নিগ্ধ (ঘৃত মাখন প্রভৃতি) ভোজনও আবশ্যক।

বয়স, বল, শরীর, দেশ, কাল ও খাদ্য সম্বন্ধে বিচার করিয়া ব্যায়াম করা উচিত। বয়স অর্থে বাল্য ও বৃদ্ধ অবস্থায় ব্যায়াম করা উচিত নহে। বালকেরা যে ছুটাছুটি করিয়া

খেলা করে, তাহাতেই তাহাদের যথেষ্ট ব্যায়াম হয়। বৃদ্ধ বয়সে ব্যায়াম করিবার সামর্থ্য থাকে না এবং এই বয়সে সংক্রমণ (পাইচারি করা) হিতকর। যৌবনে সম্যক্ এবং প্রৌঢ় বয়সে সহ্য মত ব্যায়াম করা উচিত। বলবানের পক্ষে সম্যক্ ব্যায়াম করা কর্ত্তব্য। দুর্ব্বলের পক্ষে অল্প ব্যায়াম বা সংক্রমণ হিতকর। কৃশ শরীরে অল্প ব্যায়াম করা বা সংক্রমণ করা উচিত। মধ্য-শরীরীর সম্যক ব্যায়াম করা উচিত। স্থূল শরীরে সহ্যমত ব্যায়াম করা উচিত। অবশ্য ব্যায়াম স্থৌল্য নাশক বলিয়া স্থূল শরীরীর যথেষ্ট ব্যায়াম হিতকর। কিন্তু সহ্য না হইলে অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে।

শীতপ্রধান দেশে অধিক এবং গ্রীষ্মপ্রধান দেশে অল্প ব্যায়াম সহ্য হয়। শীত ও বসন্তকালে অধিক এবং অন্যান্য ঋতুতে অল্প ব্যায়াম করা উচিত। স্নিগ্ধ ও বহুভোজীদিগের পক্ষে অধিক এবং রুক্ষ ও অল্প ভোজীদিগের পক্ষে অল্প ব্যায়াম করা উচিত।

অতিরিক্ত ব্যায়ামের দোষ পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। গ্রন্থান্তরে লিখিত আছে যে, বুদ্ধিমান ব্যক্তি ব্যায়াম, হাস্য, ভাষ্য (কথা বলা), পথ-পর্য্যটন মৈথুন ও রাত্রিজাগরণ—কর্ত্তব্য হইলে অতিরিক্ত মাত্রায় সেবন করিবে না। কারণ এই সমস্ত এবং এইরূপ অন্যান্য বিষয় যে ব্যক্তি অতিরিক্ত মাত্রায় সেবন করে,—গজ যেমন সিংহকে আকর্ষণ করিলে বিনষ্ট হয়—সেইরূপ সে ব্যক্তিও সহসা বিনষ্ট হইয়া থাকে।

আমাদের দেশে আজকাল অনেক দুর্ব্বল বালকদিগকে অতিরিক্ত ব্যায়াম করিতে দেখা যায়। শাকান্নাহারী দুর্ব্বল বাঙ্গালী যুবক জলে ভিজিয়া বা রৌদ্রে পুড়িয়া একঘণ্টা বা ততোধিক কাল ফুটবল খেলিলে অতিরিক্ত ব্যায়াম করা হয় বলিয়াই আমাদের মনে হয়। এইরূপ অতিরিক্ত ব্যায়াম সর্ব্বথা পরিত্যজ্য। অতিরিক্ত নিদ্রা সেবনও অহিতকর। এ সম্বন্ধে শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে ;—

"সুখ, দুঃখ, পুষ্টি, কৃশতা, বল, অবল, সমস্তই নিদ্রার আয়ত্ত। অকালে নিদ্রা সেবন করিলে বা একেবারে নিদ্রা সেবন না করিলেও পরমায়ু ক্ষয় করিয়া থাকে।

সত্য ও সিদ্ধিপ্রদ বুদ্ধি যেমন যোগিগণকে ভজনা করে, সেইরূপ যুক্তিযুক্তভাবে নিদ্রা সেবন করিলে সুখ ও দীর্ঘ আয়ুঃ মনুষ্যকে আশ্রয় করে।

এক্ষণে দেখা যাউক—যুক্তিযুক্ত রূপে নিদ্রা সেবন কাহাকে বলে? প্রথম রাত্রিতে শয়ন করিয়া শেষরাত্রে গাত্রোত্থান করিলেই যুক্তিযুক্ত রূপে নিদ্রা সেবন করা হয়। দিবসে নিদ্রা যাওয়া এবং রাত্রিজাগরণ—উভয়ই অহিতকর। অত্যধিক দিবানিদ্রা সেবন করিলে পাণ্ডুরোগ, শিরঃশূল, শরীর আর্দ্রবস্ত্রাবৃতবৎ বোধ, শরীরের গুরুতা, অঙ্গ মর্দ্দ (গা আড়ামোড়া করা,) অগ্নিমান্দ্য, হৃদয়ের কফপিত্ততা, শোথ, অরুচি, গা বমি বমি করা, নাকমুখ দিয়া জল পড়া, আধ্‌কপালে, গাত্রে চাকা চাকা দাগ হওয়া, পিড়কা, কণ্ডু, তন্দ্রা, গলরোগ, স্মৃতি ও বুদ্ধির নাশ, স্রোতঃ সমূহের রোধ, জ্বর, ইন্দ্রিয় সমূহের দুর্ব্বলতা প্রভৃতি রোগ উৎপন্ন হয়। অপিচ, দিবানিদ্রা শরীরের স্নিগ্ধতা কারক এবং রাত্রি জাগরণ রুক্ষতা জনক। কিন্তু বসিয়া বসিয়া ঘুমান বা তন্দ্রা—রুক্ষও নহে এবং অভিষ্যন্দীও নহে।

দিবানিদ্রা এইরূপ অহিতকর হইলেও গ্রীষ্ম-

কালে শরীর অত্যন্ত রুক্ষ হয়, বায়ু বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং রাত্রি অত্যন্ত ছোট বলিয়া এই সময়ে দিবানিদ্রা হিতকর। অপিচ যে সকল ব্যক্তি গীত, অধ্যয়ন, মদ্য, মৈথুন শ্রমজনক কর্ম্ম, ভারবহন ও পথ পর্য্যটন বশতঃ কৃশ হইয়াছে, অজীর্ণরোগ গ্রস্ত, ক্ষত রোগ গ্রস্ত, ক্ষীণ, বৃদ্ধ, বালক, ও দুর্ব্বল ব্যক্তি, তৃষ্ণা, অতিসার, শূল, শ্বাস ও হিক্কা রোগগ্রস্ত ব্যক্তি, কৃশ উচ্চস্থান হইতে পতিত ও আঘাত প্রাপ্ত ব্যক্তি, উন্মাদ-রোগী, যানারোহণ ও রাত্রি জাগরণ বশতঃ ক্লান্ত ব্যক্তি, ক্রোধ, শোক ও ভয়পীড়িত ব্যক্তি এবং দিবানিদ্রায় অভ্যস্ত ব্যক্তির পক্ষে দিবানিদ্রা হিতকর।

যাহাদের শরীর মেদো বহুল, যাহারা নিত্য স্নেহ পান করে, যাহাদের শরীরে শ্লেষ্মা অধিক, যাহারা শ্লেষ্মা জনিত রোগগ্রস্ত এবং যাহারা বিষপীড়িত—তাহাদিগের পক্ষে দিবা নিদ্রা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

যে সকল ব্যক্তির নিদ্রা হয় না, তাহাদের পক্ষে তৈলাভ্যঙ্গ, গাত্রে হরিদ্রাদি মর্দ্দন, স্নান, জলচর জন্তুর মাংসরস, শালি তণ্ডুল, দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মদ্য, মনের সুখ, মনের প্রিয় গন্ধ ও শব্দ, গা টেপান, চক্ষুর তর্পণ, মস্তকে ও মুখে সুগন্ধি দ্রব্য লেপন, প্রশস্ত শয্যায় শয়ন, সুখময় গৃহে বাস প্রভৃতি হিতকর। এই সকল দ্রব্য নষ্ট-নিদ্র ব্যক্তির নিদ্রা পুনরানয়ন করে।

দেহ সম্বন্ধে আহার যেরূপ আবশ্যক, নিদ্রাও সেইরূপ আবশ্যক। আহার ও নিদ্রা হইতে শরীরের কৃশতা বা স্থূলতা সম্পাদিত হয়।

নিদ্রা নানা প্রকার, যথা, তমোগুণ বশতঃ উৎপন্ন, শ্লেষ্মাধিক্য হইতে উৎপন্ন, মন ও শরীরের শ্রম হইতে উৎপন্ন, আগন্তুক হেতু হইতে উৎপন্ন, রোগ ধর্ম্মে উৎপন্ন এবং রাত্রির স্বভাব হইতে উৎপন্ন। তন্মধ্যে রাত্রির স্বভাব হইতে যে নিদ্রা উৎপন্ন, সেই নিদ্রাকেই যথার্থ ভূতধাত্রী (জীবের প্রতিপালন কারিণী) বলা যায়। যে নিদ্রা তমোগুণ হইতে উৎপন্ন, তাহা পাপের মূল এবং অন্যান্য নিদ্রা রোগের কারণ বলিয়া কথিত হইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

চরকোক্ত পঞ্চকর্ম্ম সাধন।

[বমন ও বিরেচনের ক্রিয়া]।

বমনেতে উর্দ্ধদিকে দোষ হৃত হয়।
বিরেচনে অধোদিকে হরে তা' নিশ্চয়॥
অথবা শরীর মলদ্বারে নিঃসরণ।
উভয়ের সংজ্ঞা তাই হয় বিরেচন॥
বিরেচন দ্রব্য সব করিলে সেবন।
স্ববীর্য্য প্রভাবে করে হৃদয়ে গমন॥
ধমনী সংযোগে স্থূল সূক্ষ্ম স্রোতঃ হতে।
শুধু দোষ দ্রব করে আগ্নেয় হেতুতে॥
স্ব স্ব স্থান হইতে উহা তীক্ষ্ণতা কারণ।
বিচ্ছিন্ন হইয়া পরে হয় নিঃসরণ॥
বিচ্ছিন্ন ও দ্রবীভূত হইবার আগে।
শরীরেতে যেই জন স্নেহাদি প্রয়োগে॥
তাহাতে সংলগ্ন তাহা না থাকে কখন।
স্নেহাভ্যক্ত পাত্রে মধু না লাগে যেমন॥
প্রবলত্ব হেতু তাহা আমাশয়ে যায়।
অগ্নি, বায়ু গুণে উহা উর্দ্ধদিকে ধায়॥

ক্ষিতি—জলাত্মক হেতু অধোগামী হ'বে।
উভয় সংযোগে উহা দু'দিকে বহিবে॥

তীক্ষ্ণ মধ্য ও মৃদু বিরেচনের লক্ষণ।

তীক্ষ্ণ, মধ্য মৃদুভেদে বমি-বিরেচন।
বিশেষ লক্ষণ তার করহ শ্রবণ॥
বিনা বেগে দ্রব মল মহা বেগে বয়।
পায়ুতে অত্যল্প ক্লেশ অশূল হৃদয়॥
আমাশয় ক্ষীণ করি কৃৎস্ন দোষ সরে।
সে নিরূহ বিরেচনে তীক্ষ্ণ বলি ধরে॥
ঔষধ জলাগ্নি কিম্বা কীটে দুষ্ট নহে।
দেশ কাল গুণ যুক্ত তুল্য বীর্য্য রহে॥
প্রয়োগ হইলে কিছু অধিক মাত্রায়।
স্নেহ স্বেদ পরে যুক্ত তীক্ষ্ণ হয় তায়॥
পূর্ব্বোক্ত মাত্রা ও গুণে কিছু হীন হ'লে।
স্নেহ স্বেদ যোগে যুক্ত মধ্য বীর্য্য বলে॥
রুক্ষ জনে মন্দ বীর্য্য, হীন মাত্রা আর।
বিরুদ্ধ দ্রব্য সংযোগে মৃদু সংজ্ঞা তার॥
ইহাতে সম্যক দোষ না করে হরণ।
শুদ্ধ নাহি হয় তাতে বলবানগণ॥
এ ঔষধে সিদ্ধি লাভে ইচ্ছা করে যেই।
মধ্যম ও দুর্ব্বল জনে প্রয়োগিবে সেই॥
সমস্ত মধ্যম, অল্প ব্যাধির লক্ষণ।
তীক্ষ্ণ মধ্য, মৃদু তারে কহে সুধিগণ॥
রোগী ও রোগের বল অপেক্ষা করিয়া।
তীক্ষ্ণাদি ঔষধ বৈদ্য দেখে প্রয়োগিয়া॥

ঔষধ প্রয়োগের নিয়ম।

বমন-ঔষধ পান করিবার পরে।
দোষ না সারিলে তাহা পুনঃ পান করে।
পিত্ত দরশন নাহি হয় যতক্ষণ।
পুনঃ পুনঃ বমি তারে করাবে তখন॥
ত্রিবিধ রোগ ও রোগী বল অপেক্ষিয়া।
প্রয়োগ বা সর্ব্বত্যাগে কালাদি বুঝিয়া॥
ঔষধ নির্গত কিম্বা জীর্ণ যদি হয়।
অথবা দোষ নির্গত যদি তাতে নয়॥
তবে পুনর্ব্বার সিদ্ধি লিপ্সু চিকিৎসক।
প্রয়োগ করিবে তাকে দোষ নিঃসারক॥
পরিপাক পূর্ব্বে দোষ করে নিঃসরণ।
বমন ঔষধে, তথা দিলে বিরচন॥
পচ্যমান কালে দোষ নিঃসরণ করে।
পাকের অপেক্ষা তেঁই বমনে না ধরে॥
দোষ নিঃসারণ বিনা জীর্ণ বা বমিত।
হ'লে বিরেচনৌষধ পুন তাতে হিত।
দীপ্তাগ্নি ও বহুদোষ, স্নিগ্ধ অতিশয়।
তাহাদের কষ্টে হয় শোধন নিশ্চয়॥
শোধনের দিন তার ক্রিয়া না হইলে।
ভুক্তান্তে পাইবে ক্রিয়া পরে দিন দিলে॥
বহু দোষ দুর্ব্বলের সহজে না সরে।
দোষ পরিপাক পরে মলাদি নিঃসরে॥
বিরেচন দিয়া তারে না দিবে রেচন।
সারক আহারে হবে মল নিঃসরণ॥
বমি বিরেচনে যদি বিশুদ্ধ না হয়।
পানাহার অবান্তরে শেষ দোষ ক্ষয়॥

শ্রীরাসবিহারী রায় কবিকঙ্কণ।

টোট্‌কা ও মুষ্টিযোগ।

—:০:—

শরীরের দুর্গন্ধ—

(১) কদমের পাতা, লোধ ও অর্জ্জুন পুষ্প এই তিন দ্রব্য সমানভাগে জলদ্বারা উত্তম রূপে বাটিয়া গাত্রে লেপন করিলে শরীরের দুর্গন্ধ

নষ্ট হয়। (২) রক্তচন্দন বেণারমূল, বালা, তেজপত্র, কুলের আটীর শাঁস, অগুরু ও নাগকেশর এই সকল দ্রব্য সমান ভাগে লইয়া, জল দ্বারা উত্তমরূপে বাটিয়া গাত্রে মাখিলে শরীরের চিরকালের দুর্গন্ধ নষ্ট হইয়া থাকে। (৩) হরিতকী, লোধ, নিমপাতা, ছাতিম ছাল ও দাড়িমের খোসা এই সকল দ্রব্য সমান ভাগে লইয়া একত্রে পেষণ করিয়া শরীরে লেপন করিলে শরীরের দুর্গন্ধ নষ্ট হইয়া থাকে (৪) হরিতকী, মুথা, রক্তচন্দন, নাগকেশর বেণার মূল, লোধ, কুড় ও হরিদ্রা এই সকল দ্রব্য সমান ভাগে লইয়া বাটিয়া একত্রে গাত্রে লেপন করিলে ঘর্ম্মজনিত দুর্গন্ধ নিবারণ হয়। (৫) মোটা এলাচ, শঠী, তেজপত্র, রক্তচন্দন, হরীতকী, সজিনাছাল, মুথা, কুড় এই সকল দ্রব্য সমান ভাগে লইয়া বাটিয়া গাত্রে লেপন করিলে শরীরের দুর্গন্ধ নষ্ট হয়। (৬) কাঁচা হরিদ্রা উত্তমরূপে পেষণ করিয়া গাত্রে মাখিলে শরীরের দুর্গন্ধ নষ্ট হইয়া থাকে।

মুখের দুর্গন্ধ—

(১) আমের আটির শাঁস, জামের আটির শাঁস ও পদ্মের মূল উত্তমরূপে পেষণ করিয়া রাত্রে মুখে ধারণ করিলে মুখে দুর্গন্ধ নষ্ট হইয়া সুগন্ধ উৎপন্ন হয়। (২) পিপ্পলী চুর্ণ, ঘৃত ও মধু একত্রে মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে মুখের দুর্গন্ধ নষ্ট হইয়া সুগন্ধ বাহির হয়। (৩) মুরামাংসী, নাগকেশর ও কুড় এই সকল দ্রব্য সমান [illegible] চুর্ণ করিয়া প্রাতে ও সন্ধ্যা-কালে লেহন করিলে সকল প্রকার দুর্গন্ধ নষ্ট হইয়া থাকে।

ব্রণ ও মেচেতা—

(১) মসুর, কলাই ও কর্পূর সমান ভাগে লইয়া জলে উত্তমরূপে চন্দনের মত বাটিয়া বহুবার প্রলেপ দিলে মুখের দুর্গন্ধ নষ্ট হয়। (২) শিমুল বৃক্ষের কাঁটা, কাঁচা দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে গণ্ডস্থলজাত ব্রণ আরোগ্য হইয়া থাকে। (৩) ধনে, বচ, শৈলজ ও লোধ এই চারি বস্তু সমান রূপে লইয়া জলে পেষণ করতঃ মুখে লেপন করিলে মুখ জাত ব্রণ আরোগ্য হয়। (৪) শ্বেত সর্ষপ ও তিল তৈল সমান ভাগে দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া লেপন করিলে মুখের লাবণ্য বৃদ্ধি হয়। (৫) মনছাল, লোধ, দারু হরিদ্রা, হরিদ্রা ও সর্ষপ সম ভাগে জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া পেষণ করিয়া মুখে প্রলেপ দিলে মুখের ব্রণ ও কৃষ্ণবর্ণ দাগ নষ্ট হইয়া সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হয়।

কেশের সৌন্দর্য্য সাধন—

(১) পুরাতন লোহার ঝামা, জবাপুষ্প ও আমলকী সমান ভাগে জলে বাটিয়া মস্তকে লেপন করিলে অতি অল্পকাল মধ্যে অকাল পক্ক শুক্লবর্ণ কেশ কৃষ্ণবর্ণ হয়। (২) হরিতকী বহেড়া, ইক্ষুরস, ভৃঙ্গরাজের রস এবং কৃষ্ণবর্ণ মৃত্তিকা সম ভাগে লইয়া মস্তকে প্রলেপ দিলে শীঘ্র শুক্লবর্ণ কেশ কৃষ্ণবর্ণ হয়। (৩) গুঞ্জা ফল, মধুর সহিত পেষণ করিয়া মস্তকের যে স্থানে চুল উঠিয়া যায়, সেইস্থানে লেপন করিলে কৃষ্ণবর্ণ অতি সুশ্রী চুল উৎপন্ন হয়। (৪) যষ্টিমধু, নীলসুন্দী পুষ্প, সূচমুখীর মূল তিল, গব্যঘৃত, ছাগ দুগ্ধ ও ভৃঙ্গরাজ পত্র সম ভাগে জলে বাটিয়া কেশহীন স্থানে প্রলেপ দিলে কৃষ্ণবর্ণ ঘন কেশ উৎপন্ন হয়। (৫) তিল বৃক্ষের মূল, গাভী দুগ্ধ ও লোধ ছাল সম ভাগে জলে পেষণ করিয়া গব্য ঘৃতের সহিত মিশাইয়া লেপন করিলে সত্বর ঘন কৃষ্ণবর্ণ কেশ উৎপন্ন হয়। (৬) হাতীর দাঁত পোড়াইয়া কালি

করিয়া তাহার সহিত সম ভাগে রসাঞ্জন মিশ্রিত করিয়া কেশহীন স্থানে লাগাইলে শীঘ্র কৃষ্ণবর্ণ কেশ উৎপন্ন হইয়া হইয়া থাকে।

খুসকি, মরামাস ও উকুন—

(১) বেলের মূলের ছাল, গোমূত্রের সহিত বাটিয়া মস্তকে লেপন করিলে সমস্ত উকুন মরিয়া যায়। (২) তিল তৈল, বিড়ঙ্গ ও গো মূত্র প্রক্ষেপ দিয়া জ্বাল দিয়া নামাইয়া লইবে। উহা মস্তকে মর্দ্দন করিলে চুলের উকুন, খুসকি ও মরামাস নষ্ট হইয়া থাকে।

দক্র রোগের ব্যবস্থা—

(১) দক্র স্থান ভাল করিয়া চুলকাইয়া সোঁদালপাতার রস মর্দ্দন করিলে শীঘ্র প্রশমিত হয়। (২) শোধিত গন্ধক ওজন করিয়া সমভাগে চিনির সহিত লইয়া সরিষার তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে দক্র নষ্ট হইয়া থাকে। (৩) দক্রস্থান ভাল করিয়া চুলকাইয়া রসুনের রস মর্দ্দন করিলে সকল প্রকার দক্রই শীঘ্র আরোগ্য হইয়া থাকে।

ছুলির ঔষধ—

(১) পাতিলেবু, বচ ও সোহাগার খই একত্রে মিশাইয়া ছুলির উপর মর্দ্দন করিলে ছুলি শীঘ্র আরোগ্য হয়। গেঁড়োলেবুর রস মর্দ্দন করিলেও ছুলি আরোগ্য হয়।

পদ্ম কাঁটা—

মুখে সাদা সাদা চক্রের ন্যায় দক্রর মত একরূপ চর্ম্মরোগ উৎপন্ন হয়, উহাকে সাধারণ লোকে পদ্মকাঁটা বলে।

পদ্মের পাতা ও ডাঁটা অগ্নিতে ভস্ম করিয়া লইয়া সর্ষপ তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে পদ্মকাঁটা শীঘ্র আরোগ্য হইয়া থাকে।

পাঁকুই বা হাজা—

(১) পাঁকুই বা হাজা অতি জঘন্য রোগ। উহা প্রায় স্ত্রীলোক দিগের হাতে ও পায়ে দেখিতে পাওয়া যায়। অতিরিক্ত জলে থাকিলে ঐ রোগ উৎপন্ন হয়। (২) বাবলা পাতার ক্বাথ, অশ্বত্থের আঠা ও খদির সম ভাগে মিশ্রিত করিয়া অগ্নিতে জ্বাল দিয়া উহা একটু নরম অবস্থায় নামাইবে। ঐ ক্বাথ লাগাইলে অচিরে পাঁকুই বা হাজা বিদূরিত হয়। (৬) ভাল আল্‌তা জলে গুলিয়া গরম করিয়া লাগাইলে পাঁকুই নষ্ট হইয়া থাকে।

শ্রীসুধাংশু ভূষণ সেন গুপ্ত।

সমালোচনা

আয়ুর্ব্বেদীয় ধাত্রী বিদ্যা সংগ্রহ ১ম খণ্ড। কবিরাজ শ্রীহরিমোহন দাশগুপ্ত কবিরত্ন প্রণীত। প্রকাশক—কবিরাজ শ্রীনিখিল রঞ্জন সেন গুপ্ত, কবিভূষণ, বহরমপুর, ধন্বন্তরি ঔষধালয়। মূল্য ১৲ টাকা। সাধারণ লোকের বিশ্বাস, কেবল জীর্ণ-জটিল রোগেই আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা চলিতে পারে, আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক শস্ত্র প্রয়োগ-বিধিতে অভ্যস্ত নহেন, ধাত্রী বিদ্যার শিক্ষাও তাঁহাদের নাই। এ ধারণা যে অমূলক, তাহাই সপ্রমাণ করিবার জন্য গ্রন্থকার এই পুস্তকখানি লিখিয়াছেন। ধাত্রীবিদ্যা সম্বন্ধে, আয়ুর্ব্বেদের নানা গ্রন্থের

নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত ভাবে যে সকল বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, শৃঙ্খলার সহিত শ্রেণীবদ্ধ করিয়া তাহাই এ পুস্তকে লিখিত। প্রত্যেক শ্লোকের সরল বাঙ্গালা অর্থ লিখিয়া তন্নিম্নে প্রমাণকরণ উদ্দেশে মূল শ্লোক গুলিও দেওয়া হইয়াছে। গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য অতি মহৎ। ধাত্রীবিদ্যার সকল গূঢ় রহস্যই তিনি এ পুস্তকে সুকৌশলে গ্রথিত করিয়াছেন। ঋতুকাল হইতে সন্তান পালন পর্য্যন্ত কিরূপ নিয়মে স্ত্রীজাতির কালক্ষেপ করা কর্ত্তব্য, তাহার কোন কথাই গ্রন্থকার বাদ দেন নাই। রমণিগণ এ গ্রন্থ পড়িয়া অনেক কথা শিখিতে পারিবেন। তবে পুস্তক খানির মূল্য আর একটু কম করিলে ভাল হইত। ৮০ পৃষ্ঠার পুস্তকের মূল্য ১৲ টাকা হওয়া উচিত নহে, প্রতি ফর্ম্মা ১০ হিঃ ||৵০ এবং বাঁধানর জন্য আরও ৵০—মোট ৮০ করিলেই বেশ হইত। যাহা হউক আমরা এ পুস্তক পড়িয়া সুখী হইয়াছি।

বিবিধ প্রসঙ্গ

:o:

মাদক দ্রব্য।—সুরা, সিদ্ধি, গাঁজা, অহিফেন, চরস এবং কোকেন প্রভৃতি মাদক দ্রব্য ব্যবহারে ভারতবাসীর যে ভয়ঙ্কর অনিষ্ট হইতেছে, ইহা উপলব্ধি করিয়া, সংপ্রতি ইংলণ্ড, আফ্রিকা এবং ভারতবর্ষের অনেক গুলি প্রথিত নামা চিকিৎসকের স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞাপন পুস্তিকা প্রচারিত হইয়াছে। উহাতে এইরূপ লিখিত আছে,—"বৈজ্ঞানিক উপায়ে পরীক্ষা দ্বারা ও ভূয়োদর্শনের ফলে জানিতে পারা গিয়াছে,—(ক) সুরা, কোকেন, অহিফেন, সিদ্ধি, গাঁজা ও চরস বিষ। (খ) ভারতবর্ষের ন্যায় উষ্ণ প্রধান দেশে ঐ সকল বিষ অত্যল্প মাত্রায় ব্যবহার করিলেও স্বাস্থ্যের অপচয় ঘটিয়া থাকে। ঐ সকল মাদক দ্রব্য কোনরূপ শারীরিক বা মানসিক কষ্ট দীর্ঘকালের জন্য দূর করিতে পারে না। (গ) যাঁহারা সুরাপান বা অন্য কোন মাদক দ্রব্য ব্যবহার করেন না, তাঁহারা মাদকসেবীদিগের অপেক্ষা অধিক কষ্ট সহ্য করিতে সক্ষম এবং সকল প্রকার সংক্রামক পীড়ার হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম হন। (ঘ) সুরাপানের কুফল এক পুরুষ পরেও প্রকাশ পাইয়া থাকে। (ঙ) দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে সুরাপায়ী ব্যক্তিগণ অতি শীঘ্রই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। (চ) সুরাপানের ফলে প্লেগ নিবারণ করিতে পারা যায় না। (ছ) ম্যালেরিয়া এবং যক্ষ্মারোগের বীজাণু শরীরে প্রবেশ করিলে সুরাপায়িগণ অতি শীঘ্র ঐ রোগে আক্রান্ত হয়। যাঁহারা সুরাপায়ী নহেন, ঐ সকল বীজাণু তাঁহাদিগকে সহজে ক্লিষ্ট করিতে পারে না। (জ) সুরা সম্বন্ধে যে সকল কথা বলা হইল, সিদ্ধি, গাঁজা, চরস, অহিফেন সম্বন্ধেও সেই কথা বলা যাইতে পারে। (ঝ) এইজন্য আমরা ভারতবাসীদিগকে অনুরোধ করিতেছি যে, তাঁহারা সকল প্রকার মাদক দ্রব্যের হস্ত হইতে দূরে থাকিয়া তাঁহাদের সনাতন শাস্ত্রাদেশ ও সামাজিক প্রথানুসারে পানাহারের ব্যবস্থা করুন।" সনাতন শাস্ত্রাদেশ এবং সামাজিক প্রথা ভুলিয়াই তো আমাদের সর্ব্বনাশ হইয়াছে!

বিদ্বৎ সভা।—নিখিল বঙ্গের বৈদ্য-

জাতির সম্মিলনে কলিকাতায় যে "বিদ্বৎ সভার" প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, তাহার উদ্দেশ্যাবলীর ৬ষ্ঠ উদ্দেশ্য—"আয়ুর্ব্বেদের উন্নতি ও সুশিক্ষার ব্যবস্থা।" কিন্তু এ পর্য্যন্ত এ সম্বন্ধে তাহার কিরূপ বন্দোবস্ত হইয়াছে, তাহা আমরা জানিতে পারি নাই। ঐ সভার মুখপত্র—'ধন্বন্তরিতে'ও চিকিৎসা বিষয়ক কোন প্রবন্ধ বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। আমাদের মনে হয়,—সভা এখনো এ বিষয়ের সুবন্দোবস্ত করিতে সক্ষম হন নাই। কিন্তু বৈদ্যজাতির অবস্থা দিন দিন যেরূপ চাকরিতগত প্রাণে শোচনীয় হইতেছে, তাহাতে বরপণ নিবারণের মত আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার জন্যও এই সভার কর্ত্তৃপক্ষগণের উঠিয়া-পড়িয়া লাগার দরকার হইয়াছে। আমরা আশা করি, সভার কর্ত্তৃপক্ষগণ আমাদের এই যুক্তিপূর্ণ কথা-গ্রহণে কালবিলম্ব করিবেন না।

আয়ুর্ব্বেদ সম্মেলন।—শ্রীযুক্ত রাজা নরেন্দ্রনাথ নিখিল ভারতবর্ষীয় আয়ুর্ব্বেদ সম্মেলনের নবম বার্ষিক অধিবেশনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি, শ্রীযুক্ত লালা সৈন্ধদাস আয়ুর্ব্বেদ প্রদর্শনী সমিতির সভাপতি এবং কবিরাজ শ্রীযুক্ত কাশীরাম প্রদর্শনীর তত্ত্বাবধায়ক মনোনীত হইয়াছেন।

দান।—মালদহ-চাঁচোলের বদান্যবর রাজা শ্রীল শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র রায় চৌধুরী বাহাদুর সংপ্রতি কলিকাতা-অনাথ আশ্রমে পাঁচ হাজার, বোবা ও কালাদিগের স্কুলে দুই হাজার এবং বৈদ্যনাথ কুষ্ঠাশ্রমে দুই হাজার টাকা দান করিয়াছেন। আগামী ৮ই চৈত্র তাঁহার পুত্রের উপনয়ন, সেই উপলক্ষে নৃত্য গীতাদিতে অর্থের অপব্যয় না করিয়া এই দানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। দেশের ধনকুবেরদিগের তো এইরূপ মতি গতি হওয়াই কর্ত্তব্য।

পরলোক।—কলিকাতার অতিবৃদ্ধ কবিরাজ কুমারটুলির দুর্গাপ্রসন্ন সেন মহাশয় গত ১ চৈত্র পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়ঃক্রম ৯০ বৎসর হইয়াছিল। ইনি একজন সুপণ্ডিত ও সুচিকিৎসক ছিলেন। ইদানিন্তনকালে ইঁহার মত বৃদ্ধ বৈদ্য কলিকাতায় আর কেহ ছিলেন না। আমরা ইঁহার বিয়োগে যথেষ্ট ব্যথা অনুভব করিয়াছি। ভগবান ইঁহার শোক সন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রাণে শান্তি প্রদান করুন।

অকাল মৃত্যু।—আমরা আর একটি উদীয়মান যুবক কবিরাজের অকাল মৃত্যুতে বিশেষ ব্যথিত হইয়াছি। ইঁহার নাম কবিরাজ রাখালচন্দ্র সেন, এল-এম-এস। গত ১লা চৈত্র ইনি আত্মীয় স্বজনকে কাঁদাইয়া, বন্ধু-বান্ধব দিগকে শোক সাগরে নিমজ্জিত-করিয়া, চির দিনের জন্য অনন্ত ধামে গমন করিয়াছেন। মেডিকেল কলেজের চরম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, ইনি সনাতন আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা বৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক যথেষ্ট উন্নতি করিতেছিলেন। ইনি যুবা মাত্র—ইঁহার বিয়োগে ইঁহার পরিবার বর্গের বিলক্ষণ ক্ষতি হইল।

বৈদ্য বান্ধব সমিতি।—গত ৩রা চৈত্র ৩১-৩৫, শিবনারায়ণ দাসের লেনে বৈদ্য বান্ধব সমিতির তৃতীয় বার্ষিক সম্মিলন হইয়া গিয়াছে। অনেক গুলি বৈদ্য সন্তান এই সম্মিলনে যোগদান করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র নাথ সেন সভাপতি হইয়াছিলেন। সময়োপযোগী দুই খানি সঙ্গীত গীত হইয়াছিল। কয়েকজন বক্তা বক্তৃতাও করিয়াছিলেন। এরূপ জাতীয় সম্মিলনের ফল যে শুভজনক, সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই।

মাসিকপত্র ও সমালোচক

২য় বর্ষ। | বঙ্গাব্দ ১৩২৫—বৈশাখ। | ৮ম সংখ্যা

নব বর্ষে প্রার্থনা।

—০*০—

এস নূতন বর্ষ—হর্ষ-ভরেতে স্পর্শ করহ ধরা,
তাহে হউক মত্ত চিত্ত তাহারি ক্ষিপ্ত আকুল করা।
তব হাস্য জড়িত আস্যখানি
অঙ্গ মাঝারে রঙ্গে ছানি'—
ওগো। হউক মগ্ন ভগ্ন-হৃদয়—ঘুচুক রুগ্ন-জরা।

এস নূতন বর্ষ হর্ষ-ভরেতে স্পর্শ করহ ধরা,
এস শান্ত করিতে স্তব্ধ-হিয়াটি—রুদ্ধ যাতনা ভরা।
কণ্ঠে তোলহ রাগিণী-দীপ্ত,
অমিয়-বর্ষণে করহ সিক্ত,—
ওই সুধার বর্ষণে স্নাত-তনুটি রহুক তোমাতে গড়া।

এস নূতন বর্ষ হর্ষ-ভরেতে স্পর্শ করহ ধরা,
তব মঙ্গল-গীতি বহুক বঙ্গে তাপ-দহন-হরা।
ক্ষুব্ধ স্মৃতিটি করহ লুপ্ত,
লুব্ধ আশাটি রাখহ গুপ্ত,
ওগো স্নিগ্ধ করহ দগ্ধ-হৃদয়—তপ্ত বালুকা-চড়া।

এস নূতন বর্ষ হর্ষ-ভরেতে স্পর্শ করহ ধরা,
ওগো অতীত কাহিনী লুপ্ত করিয়া লইয়া নূতন ছড়া।
মর্ম্ম মাঝারে ধর্ম্ম রাশি
গর্ব্ব-বাতাসে বহুক আসি'—
তাহে পুণ্য-হাসিটি উঠুক ফুটিয়া—শুভ্র-বসন পরা।
এস নূতন বর্ষ হর্ষ-ভরেতে স্পর্শ করহ ধরা,
তাহে হউক মত্ত চিত্ত তাহারি ক্ষিপ্ত আকুল করা।

শ্রীসত্যচরণ সেন গুপ্ত কবিরঞ্জন।

SURGEON সুশ্রুত।

—:o:—

[প্রথম অধ্যায়]

সে এক উন্মাদনাময় সাহসের কথা। এখনও সে ঘটনা, নীলাকাশে নক্ষত্র-ধবল-ছায়াপথের মত, প্রাচীনের স্মৃতি-পথে সমুজ্জ্বল! দেশের তখন বড় দুর্দ্দিন। সমাজে দুইটী দলে রীতিমত সমর ঘোষণা আরম্ভ হইয়াছে। এক-দল অতীতের অনুরাগী হইয়া "রক্ষণ শীলতার" পরিচয় দিতেছেন। অপর দল "সংস্কারের ধূয়া ধরিয়া প্রাচীন প্রথা পদদলিত করিতেছেন! একে অন্যের ছলান্বেষণ করিয়া, হাসি-কান্নার ইন্দ্রধনু গড়িতেছেন! বাঙ্গালার তখন এইরূপ বিভীষিকাময়ী অবস্থা। সর্ব্বত্রই ভাঙা-গড়ার বিপুল আয়োজন, উত্থান-পতনের অপূর্ব্ব দ্বন্দ্ব!

এই উদয়াস্তের সন্ধিস্থলে—নবযুগের অভ্যুদয়ের সূচনায় বাঙ্গালার সকল কেন্দ্রেই এক একজন মহাপুরুষ "অবতারের" মত অবতরণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সকলের কথা আজ আমাদের আলোচ্য নহে। আমরা কেবল মধুসূদন গুপ্তের কীর্ত্তি-কাহিনী ইঙ্গিতে উল্লেখ করিব।

যে সময়ের কথা বলিতেছি—সে সময় বাঙ্গালার বিজ্ঞান-জগতও বিশৃঙ্খল। যদিও বৌদ্ধযুগে ভারতের শল্যতন্ত্র নাম-শেষে পরিণত হইয়াছিল, তথাপি সেই ধ্বংসাবশেষ হইতে ইষ্টক-প্রস্তরাদি আহরণ করিয়া অনেকেই শিল্প-সুষমাময়-সৌধ-হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করিতে ইতস্ততঃ করেন নাই। ভারতেরই কেবল এ চেষ্টা ছিল না। ভারতের দেখাদেখি—বাঙ্গালারও অধঃপতন ঘটিয়াছিল। বাঙ্গালী অতীতের শ্লাঘাময়ী স্মৃতি ভুলিতে আরম্ভ করিয়াছিল। স্বাধীন চিন্তাকে অভিনন্দন করিবার প্রবৃত্তিই বাঙ্গালীর ছিল না। শাস্ত্রের শাসন- নীতির অনুজ্ঞা, বাঙ্গালীর মেধা-মনীষার বিকাশ-পথ বিঘ্ন-বাধায় নিবিড় করিয়া তুলিয়াছিল।

"আয়ুর্ব্বেদ" যাহাদের জাতীয় জীবনে সারাদপিসার স্বর্গীয় বিভূতি, তাহাদেরই অধস্তন পুরুষ—ঘৃণা-কুটিল-নেত্রে আয়ুর্ব্বেদের উপর উপেক্ষার অপাঙ্গ নিক্ষেপ করিয়াছিল। যাঁহারা

বর্ণের গুরু—তাঁহারাই প্রথমে প্রত্যক্ষের অমর্য্যাদায় আত্মনিয়োগ করিয়া, আপ্তবাক্যের উপর নির্ভরশীল হইয়াছিলেন। যে শরীর—"শারীর বিজ্ঞানের" সর্ব্বস্ব, বাঙ্গালার বৈদ্য সে শরীরের গঠন-কৌশল বুঝিতে চাহিতেন না তাঁহারা শিখিয়াছিলেন—মৃত শরীর স্পর্শে অশুচি হইতে হয়। সমাজে তখন শব-ব্যবচ্ছেদ মহা পাপের কার্য্য। তপোবনের পাষাণ বেদিকায় বসিয়া ঋষি যে' দিন—"কুশলেনাতি পন্নং তদ্ বহুধাভি প্ররোহতি" বলিয়া রক্ষামন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছিলেন, সেদিন সেই জীবন্মুক্ত বৈজ্ঞানিক ত্রিকালজ্ঞ হইয়াও বুঝিতে পারেন নাই—তদীয় আবির্ভাবকালের সার্দ্ধ দ্বিসহস্র বর্ষ পরে তাঁহারই বংশধরগণ—তাঁহার আশা আকাঙ্ক্ষাকে এইরূপে অন্তর্জলি করিবে।

অন্যূন আড়াই হাজার বৎসর পরে—অপ-ধর্ম্মের মালিন্য ও অজ্ঞানতার গাঢ় অন্ধকারের মাঝে, বঙ্গের দুঃখ-শোকদীর্ণ-জরা-মরণ-জীর্ণ নরলোকে, বিপদ ভঞ্জন মধুসূদনের আবির্ভাব। ঋষি-যুগের শল্যতন্ত্র তখন নরসুন্দরের নিজস্ব সম্পত্তি। সমাজ শাসন শিথিল করিয়া, কেহই তখন শবদেহ স্পর্শ করিতে সাহস করে নাই। অথচ তখন সারাবঙ্গে একটা অভূতপূর্ব্ব "ওলট-পালট চলিতেছিল। হিন্দুর গোঁড়ামী —শিক্ষিত সমাজে ধিক্কৃত হইতেছিল। হিন্দু সন্তান মরীচিকার পশ্চাতে ছুটিয়া, পাদ্রির বক্তৃতা শুনিয়া অনায়াসেই ধর্ম্ম পরিবর্ত্তন করিতেছিল। কুসংস্কারের মূলে কুঠারাঘাত করিয়া—সৌম্যমূর্ত্তি ইংরাজ—বাঙ্গালীর শিক্ষা-ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বিজ্ঞানে, প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সাম্প্রদায়িক প্রভেদ নাই। বিশ্বের বিজ্ঞানে বিশ্ববাসী মাত্রেরই সমান অধিকার। বিজ্ঞান—সাধারণ তন্ত্র সম্ভূত সামগ্রী;—সুতরাং সার্ব্বভৌমিক ও সার্ব্বজনিক। তাহা একের বলিয়া, অন্যের হেয় বা অন্যকে অদেয় হইতে পারে না। বিজ্ঞান ঐশ্বরিক আশীর্ব্বাদ, প্রকৃতির প্রধান প্রসাদ, বিজ্ঞানের মুক্ত প্রাঙ্গণ—পৃথিবীর জগন্নাথ ক্ষেত্র। সেখানে যবন নাই, ব্রাহ্মণ নাই,—জাতিভেদ সেখানে প্রবেশ করিতে পারে না। যুগাবতার শ্রীকৃষ্ণের মত, ইংরাজ যখন সাম্য-নাদের ফুৎকার দিয়া, বিজ্ঞানের 'পাঞ্চজন্য' বাজাইতেছিলেন, হিন্দু-সমাজ তখন শুদ্ধিতত্ত্বের উদ্ভট শ্লোক আওড়াইয়া, বাস্তবকে কল্পনার মাধুরী মাখাইতেছিল। দেশের এই স্মৃতি-সর্ব্বস্ব যুগে, শুভ-মুহূর্ত্তে—বিজ্ঞানের উদার আহ্বান, একমাত্র মধুসূদনেরই কর্ণবিবরে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল। সে দিন বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর বড় শুভদিন। চতুর্দ্দিকের বিঘ্ন-বহুল বাধা, দুই পায়ে ঠেলিয়া, মহা মনস্বী-মধুসূদন মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদের জন্য সব্যসাচীর মত নিপুণ হস্তে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন। সে'দিন উৎসবময়ী কলিকাতা অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিয়াছিল। বিরাট বিশ্বমণ্ডলে—এই মহানন্দের মহা কাহিনী ঘোষণা করিবার জন্য —ইংরাজের বিজয়-দুর্গ হইতেও মুহুর্মুহুঃ তোপধ্বনি হইয়াছিল। যে দেশে শবদেহ স্পর্শ করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, সমাজে পতিত হইতে হয়, সেই দেশে এক তরুণ সুন্দর যুবা—স্বয়ংসিদ্ধ সঙ্কীর্ণচেতাদের বিরাগ-বিদ্রূপ নীরবে সহিয়া, অবজ্ঞা ও উপেক্ষার মাঝে বীরের মত দাঁড়াইয়া, বিশ্ব-মানবের কল্যাণ-সাধনে আত্মজীবন উৎসর্গ করিয়া, বিজ্ঞান-রাজ্যের সার্ব্বজাতিক ভূমি মেডিকেল কলেজে প্রবেশ করিয়াছে—একথা যে শুনিয়া-ছিল, সেই বিস্মিত হইয়াছিল। দেব-মূর্ত্তি—

মধুসূদনকে দেখিবার জন্য—রাজপথের মহতী জনতা বাত্যা-তাড়িত-সমুদ্রের মত বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। মধুসূদনকে সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য—সেদিন নগরবাসীগণ নগর-সজ্জার ত্রুটী করে নাই। হিন্দুর চিন্তাশক্তির অধোগতির এই জ্বলন্ত উদাহরণ প্রত্যক্ষ করিয়া, সুর-লোকের সারস্বত-মন্দিরে কেবল একজনের চক্ষু অশ্রুবাষ্পে ভরিয়া উঠিয়াছিল। তিনি মহর্ষি সুশ্রুত। তাঁহারই স্মৃতি-চর্চ্চার জন্য—এই অকিঞ্চিৎকর প্রবন্ধের অবতারণা।

"সার্জ্জন সুশ্রুত" নামে প্রবন্ধের নামকরণ হইয়াছে। বাস্তবিক 'সুশ্রুতে'র মত পাকা সার্জ্জন বোধ হয় পৃথিবীতে অল্পই আবির্ভূত হইয়াছেন। আমাদের নরজন্ম লাভ করিবার এই প্রধান সফলতা যে, আমরা সেই মহাত্মার দেশেই জন্মগ্রহণ করিয়াছি। তাঁহারই মাতৃ-ভূমির জল-বায়ু ও সূর্য্যালোক, আমাদের শরীরে প্রাণস্পন্দন আনিয়া দিয়াছে। কিন্তু আমরা ত সে অপূর্ব্ব মহত্বের সমাদর করিতে শিখি নাই। তাই ভারতের অস্ত্র-চিকিৎসা ভারত-বাসীর অবহেলায় নির্ব্বাসিত-অপরাধীর মত, বিস্মৃতির ক্রোড়ে নীরবে নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছে। আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ যে অস্ত্র চিকিৎসায়—সকল দেশের শিক্ষাগুরু ছিলেন, আজ আমরা তাহা বিশ্বাস করি না। আজ আমরা য়ুরোপের শল্যতন্ত্র দেখিয়া তাহার নৈপুণ্যের প্রশংসা করি,—কিন্তু সে নৈপুণ্য যে ঋষিযুগের সাধনার একটু ক্ষীণ আভাষ মাত্র—আমরা তাহা ভুলিয়া গিয়াছি। ইতিহাস আমাদের সে ভুল ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। এখন আমরা অনেকেই জানিতে পারিয়াছি—পৃথিবীর শল্যতন্ত্র ভারতের অপরাঙ্মুখ অনুসন্ধানের কাছেই ঋণী। অঙ্গ বিনিশ্চয় বিদ্যায় 'সুশ্রুত' যাহা বলিয়া গিয়াছেন, —পাশ্চাত্য-বিজ্ঞান তাহার অতিরিক্ত বড় কিছু বলিতে পারেন নাই।

সুশ্রুত প্রণীত গ্রন্থের নাম "সুশ্রুত সংহিতা"। বর্ত্তমান যুগে "সুশ্রুত সংহিতা" আয়ুর্ব্বেদের অন্যতম প্রতিনিধি। সুশ্রুত চরকের অপেক্ষাও প্রাচীন হইতে পারেন, কেন না, চরকসংহিতায় সুশ্রুতের ইঙ্গিতোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সুশ্রুত একজন আদর্শ অস্ত্র-চিকিৎসক, কাশীরাজ 'ধন্বন্তরি' তাঁহার উপদেষ্টা; সুশ্রুতের পিতার নাম "বিশ্বামিত্র।" সুশ্রুতের ব্যক্তিগত জীবনের কথা, ইহার চেয়ে বেশী জানা যায় না।

শারীর বিদ্যা, শারীর তত্ত্ব, নিদান, শল্য-তন্ত্র (Surgical Treatment), ধাত্রীবিদ্যা, স্ত্রীরোগ, অস্ত্রবিধি, অগদ [Antedotes to Poisons], কৌমার ভৃত্য [The treatment of Infants and of the Puerpen at state), শস্ত্রসাধ্য-চিকিৎসা, ইন্দ্রিয়-বিজ্ঞান, গর্ভ ব্যাক্রান্তি, ভৈষজ্যবিধান, ভূতবিদ্যা [ইহার মধ্যে জীবাণু তত্ত্বেরও আভাষ পাওয়া যায়], রসায়ন,—চিকিৎসা বিজ্ঞানের সকল বিভাগেই সুশ্রুতের অসাধারণ পারদর্শিতা ছিল। ব্রাহ্মণের সূক্ষ্ম হেতুবাদ, উপনিষদের তত্ত্বস্পর্শী গভীরতা, বিজ্ঞানের বাস্তব রহস্য,—সুশ্রুত রচিত সংহিতার প্রত্যেক অধ্যায়ে সত্যের নিশ্বাসে জাগ্রত! সে জন্ম-মৃত্যুর-আক্ষেপ-বিক্ষেপ, সে অকপট-অধ্যবসায়, সে উদার অগ্রগামিত্ব,—বুঝি আর কোথাও এমন যুগপৎ সম্মিলিত হয় নাই! মানুষকে ঈশ্বর বলিলে যদি দেবতার অবমাননা না হয়, আমরা 'সুশ্রুতকে'ই ঈশ্বর বলিতে পারি। সুশ্রুতের মত বৈজ্ঞানিক, সুশ্রুতের মত দার্শনিক,—প্রকৃতির বুকে আর বুঝি দ্বিতীয় কেহ জন্মে

নাই। তত্ত্বদর্শীর নিপুণ দৃষ্টি লইয়া, একবার যদি তোমরা সুশ্রুতসংহিতার হিরণ্ময় অধ্যায় পড়িতে পার, আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি—তোমাদের নব্যতা-সুলভ-জ্ঞানের অহঙ্কার চির-দিনের মত চূর্ণ হইয়া যাইবে। সে স্বভাব-বিপুলা-প্রতিভার চরণে—তোমাদের সভ্যতাভি-মানী-উচ্চশির আপনা আপনি নত হইয়া পড়িবে। তোমরা যতই আত্মবিস্মৃত হইয়া থাক না কেন, ইংরাজী শিক্ষার গৌরব-গর্ব্বে তোমাদের স্নায়ু মণ্ডলের যতই উত্তেজনা থাকুক না কেন, "সুশ্রুত" পড়িলে তোমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবে—মৃত্যু-মলিন-মর্ত্ত্যের মাটিতে সে যে জ্ঞান-গবেষণার অনন্ত ভাণ্ডার! সুশ্রুতের ভিতর যে সকল তত্ত্ব নিহিত, অদ্যাপি তাহা অনেক জাতির জ্ঞান-গোচরও হয় নাই। সুশ্রুতের পদতলে বসিয়া পৃথিবীর বিজ্ঞান এখনও অনেক বিষয় শিখিতে পারে। য়ুরোপের অমন জীবন্ত বিজ্ঞানও—এমন কোন নূতন কথা বলিতে পারে নাই,—যাহার 'স্বপ্ন-ছায়া' সুশ্রুতে দেখিতে পাওয়া যায় না।

সার্জ্জন সুশ্রুতের সর্ব্ব প্রধান বিশেষণ—"পুরুষ ছেত্ত্বা"। এই 'পুরুষছেত্ত্বা' শব্দের অপভ্রংশেই প্রাচীন মিশরের 'পয়স ছিসত্তাস' (ডিসেক্টার.) শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। যিনি শবচ্ছেদ করেন—তাঁহারই গরীয়ান্ অভিধান-'পুরুষ ছেত্ত্বা'। সুশ্রুত শবচ্ছেদ করিতেন। ভগ্নাস্থির সন্ধান, প্রনষ্ট শল্যের উদ্ধার, ব্রণের শোধন, রোপন উৎসাদন, অবসাদন প্রভৃতি কার্য্যে তাঁহার মত কৃতিত্ব কোন চিকিৎসকই দেখাইতে পারিবেননা। সুশ্রুতের সময় "এক্সরে" ছিল না, কিন্তু তিনি এমন প্রলেপ জানিতেন—যাহার সাহায্যে শল্যের অবস্থান-স্থান সহজেই নিরূপিত হইত।

যকৃত বা প্লীহায় ফোঁড়া হইলে সুশ্রুত তাহা শস্ত্র প্রয়োগে ভেদ করিতে পারিতেন। তিনি মূত্রাশয়ের অশ্মরী (পাথুরী) কাটিয়া বাহির করিতেন। যন্ত্রের সাহায্যে মূঢ়গর্ভ আহরণ করিতেন। উদরে আঘাত লাগিয়া ছিন্ন অন্ত্র বাহির হইয়া পড়িলে, তিনি তাহা যথাস্থানে পুনঃ স্থাপিত করিয়া সেলাই করিয়া দিতেন। জলোদরের জলস্রাব করাইতেন। চক্ষুরোগে তাঁহার মত লঘু হস্তে অস্ত্র প্রয়োগ করিতে কয়জন চিকিৎসক পারেন? বিবর্ত্তন (flexion) আবর্ত্তন ক্রমে তিনি যে গর্ভিণীর সুখ-প্রসবের বিধি-ব্যবস্থার উল্লেখ করিয়াছেন, ধাত্রী-পরীক্ষা, সন্তান পরীক্ষা অধ্যায়ে তিনি যে সকল যুক্তিপূর্ণ উপদেশ দিয়াছেন, একবার তোমরা তাহা প্লেফেয়ারের 'মিড্‌ওয়াইফারির' সঙ্গে মিলাইয়া দেখিও—মনে হইবে উহা বুঝি সুশ্রুতেরই ইংরাজী অনুবাদ। আজকাল তোমরা যে 'ব্যাসিলি থিওরীর' গুমর করিয়া থাক, তাহাও সুশ্রুতের অজ্ঞাত ছিলনা। সুশ্রুত মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছেন—রাজযক্ষ্মা,—কতকগুলি জ্বর, কতকগুলি পাপজ ব্যাধি,—ইহারা সংক্রামক। কুষ্ঠের কৃমি আছে। গর্ভাবস্থায়, পাণ্ডুরোগে রক্তের লাল কণিকা কমিয়া যায়। রক্তাতিসার ও ক্ষয়রোগ জনিত উরঃক্ষতে আভ্যন্তরিক ক্ষতের চিকিৎসা করিতে হয়। বিসর্প রোগের (ইরিসিপ্ল্যাস্) পরিণামে সর্ব্ব শরীরস্থ রক্ত বিষাক্ত হইয়া উঠে। রক্তার্ব্বুদ থাকিলে রোগী কিছুতেই বাচেনা। সর্প দংশন করিলে হৃদয়ে রক্তশল্য জন্মায়, সেই জন্য শ্বাস কৃচ্ছ্রতায় দংশিত ব্যক্তির মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। সন্নিপাত ও বিসূচিকা রোগে, হৃদয়ে রক্তের চাপ বাঁধিতে থাকে—তাই সদৃশ চিকিৎসা তত্ত্ব মতে—উক্ত রোগে সর্পবিষ মহৌষধি।

ক্ষয়রোগে হৃদপিণ্ডে কোটর উৎপন্ন হয়। কি অমানুষিক দক্ষতার সহিত—সুশ্রুত যে এ সকল তত্ত্ব বুঝাইয়া দিয়াছেন, তাহা দেখিলে বিস্ময়ে অবাক হইতে হয়!

এক্ষণে অনেকের বিশ্বাস—১৬২৮ খৃষ্টাব্দে উইলিয়ম হার্ভি নামক এক সাহেব, শরীরে রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়ার (circulation of the blood প্রথম আবিস্কার করেন। কিন্তু য়ুরোপের বৈজ্ঞানিকগণ শুনিয়া বিস্মিত হইবেন—হার্ভির জন্মগ্রহণের বহু শতাব্দি পূর্ব্বে, ভারতেরই এক ফল-মূলাশী বৃক্ষতলবাসী ঋষি, এই রক্তের গতি আবিস্কার করিয়া ছিলেন। তাঁহার নাম সুশ্রুত। 'সুশ্রুত' কৃত সংহিতায় লিখিত হইয়াছে—" * * * তস্য চ হৃদয়, স্থানং। স হৃদয়াচ্চতুর্বিংশতীং ধমনী রনুপ্রবিশ্য * * কৃৎস্নং শরীর মহরহস্তর্পয়তি, বর্দ্ধয়তি ধারয়তি যাপয়তি জীবয়তি যাদৃষ্ট হেতুকেন কর্ম্মণা।" আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে—মহর্ষি সুশ্রুত শোণিত-সঞ্চালন-ক্রিয়ার বৈজ্ঞানিক-মীমাংসা করিতে গিয়া বলিয়াছেন,—রক্ত বাহিনী-শিরামণ্ডলীর দ্বারা, রক্ত সমস্ত দেহে চলাচল করিয়া থাকে। এই সকল শিরা যকৃৎ ও প্লীহা হইতে উদ্গত হইয়া সমগ্র শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া আছে। প্রকৃতিস্থ অবস্থায় রক্ত যতক্ষণ স্বীয় শিরায় বিচরণ করে, ততক্ষণ ধাতুর পূরণ, বর্ণের ঔজ্জ্বল্য সাধন স্পর্শ জ্ঞানের তীক্ষ্ণতা—প্রভৃতি বর্ত্তমান থাকে। সেই রক্ত দূষিত হইলে শরীরে রক্ত জন্য নানাবিধ ব্যাধির আবির্ভাব হইতে দেখা যায়। হার্ভি সাহেব রক্তের গতির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—কিন্তু এ তত্ত্ব যে সর্ব্ব প্রথম ভারতেই আবিষ্কৃত হইয়াছিল,—একথা আর অস্বীকার করা চলে না।

'পুরুষ ছেত্তা' সুশ্রুত—শিরা, ধমনী, স্নায়ু, প্রভৃতির প্রসার সংস্থিতি, রসাদি ধাতুর পরস্পর পরিণতি,—বাতবাহী শিরামণ্ডলীর কার্য্য প্রভৃতি, যেরূপ নিপুণভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা পড়িলে মনে হয়,—মহর্ষির মত চিন্তাশক্তি প্রতিভা ও গবেষণা—অদ্যাপি বিজ্ঞান-জগতে দুর্ল্লভ। কেবলমাত্র সুশ্রুত পড়িলেই তোমরা বুঝিতে পারিবে—আয়ুর্ব্বেদের মত সম্পূর্ণ চিকিৎসা—পৃথীবীর আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না।

য়ুরোপের জীবন্ত-বিজ্ঞান বলিতেছে,—সেল্ প্রটোপ্লাসমের বিপাকই জীবন। কিন্তু ইহাতেও গুরুতর সংশয় বিদ্যমান। সেলের জীবন আছে, জীবন তাহাতে উৎপন্ন হয় না। তবে জীবনীশক্তি কি? সে শক্তি তোমার সেলপ্রটোপ্লাসমের চেয়েও সূক্ষ্ম—তাহার নাম "ওজঃ বিন্দু"। তাই সুশ্রুত আত্মজ্ঞ জীবনীশক্তিকে পুরুষ নামে অভিহিত করিয়াছেন। তোমাদের নিদান বা আময়িক শারীর (Morbid Anatomy) ব্যাধির স্বরূপ বলিতে পারে না, তাহার বাসস্থানের নির্দ্দেশ করিয়া দিতে পারে। আমাদের সুশ্রুত বলেন—"তদ্দুঃখ সংযোগাশ্চ-ব্যবধ্যায়ঃ। স এব অনুষ্ঠানম্।" ইহা—পাকা দার্শনিকের কথা, ত্রিকালজ্ঞ মহাপুরুষের কথা, সর্ব্বজ্ঞ ভগবানের কথা। জগতে সকল শক্তির ন্যায় জীবনী শক্তিরও বিকাশ—ব্যোমিক বিস্ফুরণের ভিতর দিয়া। "প্রণব" এই বিস্ফুরণেরই সঙ্কেত মাত্র। তুমি, আমি, জগৎ—ওঙ্কার বা আদিম বিস্ফুরণের প্রসব, তাই আমাদের শারীরিক পরমাণু নিয়তই বিস্ফুরণশীল॥ ইহাকেই কি তোমরা "অ্যামিবিক মুভমেণ্ট" বল না? যাহাতে এই আনবিক স্ফুরণের সাম্যাবস্থা নষ্ট হয়, তাহার নাম

বিকার। সুশ্রুতের এই বার্ত্তিক, হারীত সংহিতায় বিশদরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছিল। সে সত্য বহুযুগ পরে মহাত্মা হ্যানিম্যানের কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল। সত্য চিরদিন এক। বিজ্ঞান-জগতে—সুশ্রুত, হারীত ও হ্যানিমানে কোন প্রভেদ থাকিতেই পারে না।

সুশ্রুত যেখানে ঔষধের কথা বলিতেছেন, সেখানে তিনি একজন পাকা রসায়নবিদ্। আয়ুর্ব্বেদ বলেন—"দ্রব্যের বীর্য্যে ব্যাধি নষ্ট হয়।" সুশ্রুত বলেন—গুণের গুণ থাকিতে পারে না, কেন না গুণ—নির্গুণ, "নির্গুণাশ্চ গুণা স্মৃতাঃ।" অতএব ঔষধি তত্ত্বে সুশ্রুতের স্থির সিদ্ধান্ত, দ্রব্যের পরিণতি অপরিণতি ভেদে বৈষম্য থাকিতে পারে, রসের পরিবর্ত্তন হইতে পারে, বিপাক ও সকল ক্ষেত্রে একরূপ হইতে পারে না। সুতরাং আরোগ্য-কল্পে—দ্রব্যের বীর্য্যই প্রধান। কিন্তু রস গুণ, বীর্য্য—দ্রব্য ব্যতিরেকে থাকিতে পারে না, অতএব দ্রব্য লইয়াই অনুসন্ধান আরম্ভ করিতে হইবে। বীর্য্য যদি অচিন্তনীয় ও অবিনশ্বর হয়, তবে দ্রব্যের বিশুদ্ধ বীর্য্যই সেবন করা উচিত। তাহার সঙ্গে কতকগুলা জড় আবর্জ্জনা মিশাইবার আবশ্যকতা নাই। এই জন্যই মর্দ্দন, সন্তাপ, পীড়ন প্রভৃতির সাহায্যে—সুশ্রুত দ্রব্যের জড়ধর্ম্ম নষ্ট করিবার উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। সুশ্রুতের অনুজ্ঞা—তৈল বা ঘৃত শতবার ধৌত করিও, সহস্রবার পাক করিও, লক্ষবার মর্দ্দন করিও। তাহাতে দ্রব্যের বীর্য্য বিশুদ্ধ হইবে, তাহার জড়াত্মিকা ধর্ম্ম নষ্ট হইবে। জীবনও শক্তি, বীর্য্যও শক্তি, শক্তি না হইলে শক্তিকে আহত করিতে পারে না। সূক্ষ্ম না হইলে সূক্ষ্মে আঘাত করা অসম্ভব।

সুশ্রুত যেখানে রোগ তত্ত্বের ব্যাখ্যা করিতেছেন, সেখানেও তিনি অন্যের কাছে অপরাজেয়—আদর্শ বৈজ্ঞানিক। আনবিক বিস্ফুরণের সাম্যাবস্থা নষ্ট হইলে, পরমাণু পুঞ্জের তাপের তারতম্য হয়। শারীর ক্ষেত্রে এরূপ তাপ বৃদ্ধি হইলে পিত্ত বৃদ্ধি হয়, বায়ু অর্থাৎ দৈহিক তাড়িৎ শক্তি বিপর্য্যস্ত হয়, শৈত্য বা শ্লেষ্মা কমিয়া যায়। এই সকল কথা ভাল করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিও, সেলপ্রটো প্ল্যাসম্ তত্ত্বকে অনেক স্থূল বলিয়াই মনে হইবে।

সুশ্রুত ছিলেন "বৈজ্ঞানিক" ও "দার্শনিক"—অতি সংক্ষেপে আমি তাহার পরিচয় দিলাম। সুশ্রুত-প্রণীত-সংহিতার সমালোচনা করিতে পারি, সে শক্তি আমার নাই। সুশ্রুতের আমলে এ দেশের অস্ত্র চিকিৎসা কত উন্নত ছিল, এইবার তাহাই দেখাইবার চেষ্টা করিব। ইহাতে আর কিছু উপকার না হউক—ভারতের অতীত গৌরবের একটী জ্যোতির্ম্ময় অধ্যায় এই আত্মবিস্মৃত জাতির নয়ন-সমক্ষে নিশ্চয়ই উদঘাটিত হইবে। নব্য যুবকগণেরও সুশ্রুত পাঠে অনুরাগ জন্মিবে।

অস্ত্র চিকিৎসার উৎপত্তি।—প্রাচ্য-পাশ্চাত্য—উভয় দেশেরই পণ্ডিত মণ্ডলী—"অথর্ব্ব বেদকে" চিকিৎসা বিজ্ঞানের আদি গ্রন্থ বলিয়া থাকেন। আমার গুরু স্থানীয় অসাধারণ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় ১৩১২ সালে একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। উক্ত প্রবন্ধে তিনি প্রমাণ করিয়াছিলেন—সাম বেদেই শারীর বিদ্যা ও শল্য বিদ্যার প্রথম পরিচয় পাওয়া যায়। ত্রিবেদী মহাশয়ের মত মৌলিক গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ—বাঙ্গালা ভাষায় বড় বেশী দেখিয়াছি

বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার বিশ্বাস—বৈদিক যজ্ঞে নিহত পশুর ছেদিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নাম হইতে আয়ুর্ব্বেদীয় শারীরবিদ্যার উৎপত্তি। বাস্তবিক সামবেদ আলোচনা করিয়া লেখকের মনেও এ ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে। রামেন্দ্র বাবু লিখিয়াছেন – 'নিহত পশুর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শাম নামক ছুরিকা দ্বারা কাটিয়া পৃথক করা হইত। যে ব্যক্তি এই কর্ম্ম করিত, তাহার নাম শমিতা। যজ্ঞ ভূমির সংলগ্ন যে স্থানে এই কর্ম্ম নিষ্পাদিত হইত, সেই স্থানের নাম শামিত্র দেশ। সেই খানেই অগ্নি জ্বালিয়া পশুর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পাক করা হইত। যে অগ্নিতে পাক হইত, তাহার নাম শামিত্র অগ্নি।"

এইরূপে পশুর বিবিধ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের জ্ঞান হইতে বৈদিক-যুগের পরবর্ত্তী কালে, শারীরবিদ্যার অঙ্গবিনিশ্চয় ব্যাপার ক্রমশঃ বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। আয়ুর্ব্বেদে আমরা অনেক গুলি বৈদিক পরিভাষার সংগ্রহ দেখিতে পাই। বাহুল্য ভয়ে তাহাদের আর উল্লেখ করিলাম না।

সুশ্রুতের সময়ে আয়ুর্ব্বেদীয় অস্ত্র চিকিৎসার প্রভূত উন্নতি হইয়াছিল। এখন পাশ্চাত্য-জগৎ যেমন তাহার "শল্য বিদ্যা" লইয়া সর্ব্ব সমক্ষে সগৌরবে দণ্ডায়মান, সুশ্রুতের যুগে ভারতবাসীও সেইরূপ শল্যতন্ত্রের গর্ব্ব প্রকাশ করিতে পারিত। কিন্তু সুশ্রুতের অত্যুন্নত শল্যতন্ত্র একেবারেই—অতটা বিপুল বিস্তার লাভ করে নাই। সুশ্রুতের পূর্ব্ব হইতেই তাহার ক্রম-বিকাশের সম্ভাবনা। তবে বৈদিক-যুগের পর হইতে সুশ্রুতাবির্ভাবের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত —এই সুদীর্ঘকালের কোন ইতিহাসই আমরা পাই নাই। বেদের গল্প-গাথায়, পুরাণের মনোজ্ঞ উপন্যাসে, কেবল এই মাত্র জানা যায়, —দেবাসুরের যুদ্ধের সময় জগতে প্রথম শল্য বিদ্যার উৎপত্তি। সেকালে অশ্বিনী-কুমারদ্বয় —নামজাদা অস্ত্র চিকিৎসক। তাঁহারা সৃষ্টি-কর্ত্তা ব্রহ্মারও ছিন্নশির সংযোজন করিয়াছিলেন। ইহার পরই স্বর্গবৈদ্য 'ধন্বন্তরি' কাশীরাজ 'দিবোদাস' নামে—অস্ত্র-চিকিৎসার প্রবর্ত্তক।

সুশ্রুতের আবির্ভাব কাল।—

ধন্বন্তরির দ্বাদশ শিষ্যের মধ্যে সুশ্রুত সর্ব্ব প্রধান। সুশ্রুত স্বকৃত সংহিতায় নিজের মত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এবং স্থানে স্থানে সতীর্থ ঔপধেনব, ঔরভ্র, পৌষ্কলাবত—এই তিনজনেরও মত সংকলন করিয়াছেন। সুশ্রুত-সহাধ্যায়ীগণের শল্যতন্ত্র অধুনা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং, শল্যতন্ত্রে তাঁহাদের অভিজ্ঞতার ফল কিছুই জানিবার উপায় নাই। তবে বৈদিক যুগের পর, সুশ্রুতের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যে সময়—তাহার মধ্যেও ভারতে বহু শল্যতন্ত্র রচিত হইয়াছিল। এখন সুশ্রুতই আমাদের অস্ত্র চিকিৎসার আদি ও প্রধান গ্রন্থ। 'বাগভট' সুশ্রুতের বহু পরবর্ত্তী, অস্ত্র চিকিৎসার উপদেষ্টা হইয়া 'বাগভট' কেবল সুশ্রুত হইতেই সার সঙ্কলন করিয়া নিরস্ত হইয়াছেন। কিন্তু 'বাগভটে'র গ্রন্থে সুশ্রুতোক্ত ব্যতীত কতকগুলি নূতন অস্ত্রেরও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

হর্ণেল সাহেব সুশ্রুতকে বৈদিক-যুগের লোক বলিয়াছেন। আমরা কিন্তু সুশ্রুতকে অথর্ব্ব বেদের পরবর্ত্তী বলিয়াই বিশ্বাস করি। হইতে পারে এ ধারণা ভ্রান্ত। অথর্ব্ব বেদের "আয়ুষ্যানি" ও "ভৈষজ্যানি" মন্ত্র গুলি পাঠ করিলে, সে সময়ের চিকিৎসা-প্রণালী যে মন্ত্র-তন্ত্র-প্রধান ছিল—ইহাতে আর কোন

সন্দেহই থাকে না। কিন্তু চরকও সুশ্রুতের চিকিৎসার মত যেরূপ সুসংবদ্ধ, যুক্তিপুর্ণ, ও গবেষণাময়, তাহাতে চরক-সুশ্রুতকে অথর্ব্ব বেদের পরবর্ত্তী বলিয়াই মনে হয়। এই উভয় গ্রন্থের ভাষাও—শেষ ব্রাহ্মণের ভাষা।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি—সুশ্রুতের প্রকৃত কাল-নির্ণয়, কখনই সম্ভবপর নহে। সুশ্রুত সম্বন্ধে কেবল এইটুকু বলিতে পারা যায় যে, ডম্বনা-চার্য্য বলিয়াছেন—নাগার্জ্জুন সুশ্রুতের প্রতি-সংস্কার কর্ত্তা। তিনি নাকি উত্তর তন্ত্রেরও রচয়িতা। ইহা যদি বিশ্বস্ত প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে বলিতে হয়,—সুশ্রুত হয় ত খৃষ্ট পূর্ব্ব তৃতীয়-চতুর্থ শতাব্দিতে বর্ত্তমান ছিলেন। কেননা নাগার্জ্জুনের জন্মকাল—খৃষ্টীয় প্রথম বা দ্বিতীয় শতাব্দি বলিয়া, কেহ কেহ প্রমাণ উপস্থাপিত করিয়াছেন। নাগার্জ্জুন সুশ্রুতের নিশ্চয়ই পরবর্ত্তী। আবার সুশ্রুত যে প্রাচান গ্রন্থ, পঞ্চম-শতাব্দির সংকলিত—Bower Manuscript পাঠে আমরা ইহা জানিতে পারি। বার্ত্তিক সূত্রে লিখিত হইয়াছে—"সুশ্রুতেন প্রোক্তং সৌশ্রুতং।" ইহার দ্বারাও সপ্রমাণ হইতে পারে—সুশ্রুত খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দিরও পুর্ব্বে ভারতভূমিতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।

অঙ্গ বিনিশ্চয় বিদ্যা।—সুশ্রুত কর্ত্তৃক উপদিষ্ট "অঙ্গ বিনিশ্চয় বিদ্যা", যুরোপের শারীর তত্ব অপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূন নহে। শারীরতত্ত্বে সুশ্রুত যাহা লিখিয়াছেন—তাহা তাঁহার 'শোনা কথা" নহে,—"প্রত্যক্ষ দর্শনে"র অভিজ্ঞতা।

মানব দেহে সুশ্রুত—ত্বক ৭টী,

কলা	৭টী
আশয়	৭টী
দ্বার	৯টী
কন্ডরা	১৬টী
জাল	১২টী
কূর্চ্চ	৬টী,
রজ্জু	৪টী,
সেবনী	৭টী,
অস্থি	৩০০ খানি
অস্থিসন্ধি	২১০টী
স্নায়ু	৯০০
পেশী	৫০০
শিরা	৭০০
মর্ম্ম	
অঙ্গ	১০৭

বিশ্লেষণ করিয়া দেখিয়াছিলেন। ইহাদের বিস্তৃত বিবরণ, স্বরূপ, অবস্থান, কার্য্য, শক্তি, সন্ধান—সুশ্রুত বেশ নিপুণতার সহিত বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার সমস্ত কথা উদ্ধৃত করিতে পারি, আমাদের সে শক্তি ও সময় নাই। আমরা কেবল উদাহরণ স্বরূপ যৎ-কিঞ্চিৎ বিবরণ প্রদান করিতেছি। যিনি বিশেষ বিবরণ জানিতে চাহেন, তিনি সুশ্রুত-সংহিতা পাঠ করিবেন।

অস্ত্র-চিকিৎসা।

এইবার সুশ্রুতোক্ত অস্ত্র চিকিৎসার সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিব।

অস্ত্র-চিকিৎসা-বিজ্ঞানে ভারত যে পৃথিবীর সকল দেশেরই শিক্ষাগুরু—অনেক উদার হৃদয় মহাপ্রাণ যুরোপীয় বৈজ্ঞানিক একথা মুক্তকণ্ঠে অকুণ্ঠিত চিত্তে স্বীকার করিয়াছেন। শরীরের একস্থান হইতে চর্ম্ম কাটিয়া লইয়া যে অন্য স্থানে তাহা লাগানো যাইতে পারে,—যুরোপ এ

রহস্য সুশ্রুতের নিকটই অবগত হইয়াছিল। ওয়েবার সাহেব স্বয়ং ইহা স্বীকার করিয়াছেন। চক্ষুরোগে অস্ত্রপ্রয়োগ—ইহাও ইউরোপ ভারতীয় শল্য বৈদ্যের নিকট শিক্ষা করিয়াছে। ডাক্তার হির্সবার্গ ইহা স্বীকার করিয়াছেন। এ বিদ্যা—প্রাচীন গ্রীক, মিসর বা অন্যজাতি, পূর্ব্বে জানিত না।

এখন যে যে স্থলে বা যে যে রোগে—ডাক্তারগণ অস্ত্র প্রয়োগ করিয়া থাকেন, সুশ্রুত তাহা সমস্তই জানিতেন। সুশ্রুতোক্ত অস্ত্র চিকিৎসা আট ভাগে বিভক্ত। যথা—

১। ছেদ্য। (ছেদন করা)

২। ভেদ্য। (ভেদ করা)

৩। লেখ্য। (চর্ম্ম চাঁচিয়া তোলা)

৪। বেধ্য। (শিরা বিদ্ধকরণ)

৫। এষ্য। (নাড়ীব্রণাদির সীমা সন্ধান)

৬। আহার্য্য। (অশ্মরী মূঢ়গর্ভ প্রভৃতি আহরণ বা বাহির করা)

৭। বিস্রাব্য। (স্রাব করণ)

৮। সীবন। (সেলাই করা)

ইহা ভিন্ন—বন্ধন ক্রিয়া, বস্তিকার্য্য (ডুস্, পিচকারী প্রয়োগ) ক্ষার ও অগ্নিকার্য্যে—সুশ্রুতের অমানুষিক দক্ষতা ছিল। অস্ত্র প্রয়োগ করিবার পূর্ব্বে তৎ-কর্ম্মোপযোগী যন্ত্র অস্ত্র, বস্ত্রখণ্ড, তুলা, সূত্র, পাখা, উষ্ণজল, হিম-জল, প্রভৃতি—বলবান্ পরিচারকগণ সংগ্রহ করিয়া রাখিত। অর্শ, অশ্মরী, উদর, মূঢ়গর্ভ ভগন্দর, ও মুখরোগাদিতে অস্ত্র প্রয়োগ করিতে হইলে,—রোগীর আহারের পূর্ব্বেই তাহা সম্পন্ন হইত। পাছে কোন সূক্ষ্মশিরা বা স্নায়ু কাটিয়া গিয়া রোগীর কোনও অত্যাহিত ঘটে,—সে বিষয়ে সুশ্রুতের বড় তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল।

অস্ত্রোপচারের শেষে—

অস্ত্রোপচারের শেষে—ক্ষতস্থানের রক্তপূয় নিষ্কাষিত করিয়া কষায় জলে, ক্ষতস্থান ধৌত করিয়া, তিল, মধু প্রভৃতি পচন নিবারক ভেষজ বস্ত্রখণ্ডে মাখাইয়া তাহার দ্বারা ক্ষত আবৃত করা হইত। ইহার পর স্নিগ্ধ, স্বেদ ও বন্ধন। বন্ধন প্রত্যহই খোলা হইত এবং ক্ষতস্থান প্রত্যহ কষায় জলে প্রক্ষালিত হইত। ডাক্তারেরা যেমন ড্রেস্ করিয়া থাকেন, সুশ্রুত ঠিক্ তেমনি করিতেন। অস্ত্র ক্রিয়ায় তাঁহার উপদেশ গুলি, কি ডাক্তার, কি কবিরাজ—সকলেরই পাঠ করা উচিত। সুশ্রুতের ব্রণ চিকিৎসা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর।

সার্জ্জন সুশ্রুত ১২৫ প্রকার অস্ত্র ব্যবহার করিতেন। ঐ সকল অস্ত্রের দুইটী শ্রেণী ছিল। এক শ্রেণীর নাম যন্ত্র, অপর শ্রেণীর নাম শস্ত্র। যন্ত্রের সংখ্যা ১০১ প্রকার, শস্ত্র ২৪টী। ঐ সকল যন্ত্র ও শস্ত্রের আকার, তাহাদের প্রস্তুত প্রণালী, উপাদানসমূহ, সুশ্রুত তন্ন তন্ন করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন। চিত্রের অভাবে আমরা পাঠকগণকে বুঝাইতে পারিলাম না। আমরা কেবল যথাসম্ভব সংক্ষেপে—তাহার পরিচয় দিতেছি।

সুশ্রুতের মতে—চিকিৎসকের হস্তই সর্ব্ব প্রধান যন্ত্র। কেননা সকল যন্ত্রই হস্তের সাহায্যে প্রয়োগ করিতে হয়। সুশ্রুত 'যন্ত্রের ভিতর নিম্নলিখিত যন্ত্রগুলিকে স্থান দিয়াছেন—

স্বস্তিক যন্ত্র। ইহা চতুর্বিংশতি প্রকার। ১৮ অঙ্গুলী দীর্ঘ, দুই খণ্ড লৌহ, একটী কীলক দ্বারা আবদ্ধ। এই যন্ত্রের মুখ—সিংহ-ব্যাঘ্র, মৃগ প্রভৃতি দশবিধ পশুর এবং কাক, চিল,

শকুনি প্রভৃতি চতুর্দ্দশ প্রকার পক্ষীর মুখের আকারে নির্ম্মিত হইত।

সন্দংশ যন্ত্র। ইহা সাঁড়াশী ও সন্নার আকারে, প্রয়োজনের অনুরূপ নির্ম্মিত হইত।

তাল যন্ত্র। দৈর্ঘ্যে দ্বাদশাঙ্গুলী। কর্ণ-নাসিকাদির অভ্যন্তরে প্রয়োগ হইত।

নাড়ীযন্ত্র। নানা আকারে নির্ম্মিত এবং নানাকার্য্যে ব্যবহৃত হইত। অঙ্গুলিগ্রহণ প্রভৃতি এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

শলাকা যন্ত্র। ২৮ প্রকার। ইহাদের আকার নানারকম, নানাকার্য্যে ব্যবহৃত হইত।

শস্ত্রাবলী।

সুশ্রুতোক্ত শস্ত্রাবলীর নাম; যথা—১। মণ্ডলাগ্র। ২ করপত্র। ৩ বৃদ্ধি। ৪ নখ-শস্ত্র। ৫। মুদ্রিকা। ৬। উৎপল পত্র। ৭। অর্দ্ধধার। ৮। সূচী। ৯। কুশ পত্র। ১০। শারীর মুখ। ১১। আটী মুখ। ১২। অন্তর্মুখ। ১৩। ত্রিকুট্টক। ১৪। কুঠারিকা। ১৫। ব্রীহিমুখ। ১৬। আরা। ১৭। বেতস পত্রক। ১৮। বড়িশা। ১৯। দন্তশঙ্কু। ২০। এষণী।

বারান্তরে এই সকল শস্ত্রের ব্যবহার-প্রণালী বুঝাইবার চেষ্টা করিব।

শ্রীব্রজবল্লভ রায় কাব্যতীর্থ।

বৈদিক বৃক্ষাবলী।

—:o:—

বেদে অনেকগুলি ঔষধের গাছের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। পরবর্ত্তী চিকিৎসা গ্রন্থে ঐ সকল নামের বহু পরিবর্ত্তন দেখিতে পাই। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমি বৈদিক-সাহিত্য হইতে কতকগুলি ভেষজ-বৃক্ষের নামের তালিকা প্রকাশ করিতেছি। আশা করি কবিরাজ মহাশয়েরা, তাহাদের স্বরূপ নির্ণয় করিয়া দিবেন।

উদ্ভিদ্ জাতি বৈদিক যুগে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। ১ম। বনস্পতি। ২য়। বীরুধ্। বৃক্ষ বলিলে বীরুধ, বনস্পতি—দুইই বুঝাইত। ইংরাজী ভাষায় যাহার নাম Tree, বেদে তাহাই বনস্পতি, যাহাকে ইংরাজী ভাষায় plant বলে—তাহার বৈদিক নাম "বীরুধ"। এই বীরুধবর্গের মধ্যে যেগুলি ঔষধের উপাদান রূপে ব্যবহৃত হইত, ঋষিগণ তাহাদিগকে "ওষধি" নামেও অভিহিত করিতেন। বৃক্ষের যে অঙ্গকে আমরা পল্লব বলি, বৈদিক-সাহিত্যে তাহার নাম ছিল—"বল্শ"। বট, অশ্বত্থ প্রভৃতি বৃক্ষের বায়বীয় মূলকে বৈদিক-সাহিত্যে "বয়া" নাম দেওয়া হইয়াছিল। বয়াকে "ঝুরি" বলে, কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় "বয়া" বা তাহার কোনও প্রতিশব্দ দেখিতে পাওয়া যায় না। নিম্নে বর্ণমালার অকারাদি ক্রমে বৈদিক-সাহিত্যে উল্লিখিত ভেষজবৃক্ষের নামের তালিকা সংগৃহীত হইল।

অ—

অজশৃঙ্গী। ইহার অর্থ বাবলাগাছ। ইহার অপর একটী নাম "বল্ক"। পরবর্ত্তী সংস্কৃত গ্রন্থে "বল্ক" শব্দ পাওয়া যায় না, "বল্কল" শব্দ পাওয়া যায়। তাহার অর্থ বৃক্ষের ত্বক।

অপামার্গ। বাংলা নাম—আপাং।

অমলা। আমলকী।

অমূলা। ইহা বৃক্ষের উপর ঝুলিত, মৃত্তিকায় ইহার মূল থাকিত না। ইহার রসে শরের মুখ বিষাক্ত করা হইত। অথর্ব্ব বেদে এই পরিচয় জানা যায়।

অরটু। ইহা যে কোন্ বৃক্ষ, যায় না। ইহার কাষ্ঠে গাড়ীর চাকার "ধুরো" নির্ম্মিত হইত।

অরাটকী। ইহাকেও চিনিতে পারা যায় না।

অরুন্ধতী। ইহা লতা বিশেষ; হিরণ্যবর্ণ, ইহার নাড়িকা বা ডাঁটায় হুল থাকিত; দেখিলে 'লোমশ' মনে হইত। ইহার একটী বিশেষণ "লোমশবক্ষণা"। অথর্ব্ববেদে উল্লিখিত হইয়াছে—ঋষিগণ এই গাছ হইতে লাক্ষা সংগ্রহ করিতেন এবং ইহার রস খাইলে গো-জাতি প্রচুর দুগ্ধবতী হইত।

অর্ক। আকন্দ।

অলাপু। লাউ।

অবকা। ইহার আর একটী নাম শীপাল। গন্ধর্ব্বগণ, কণ্ঠস্বর প্রসাধনের জন্য ইহার পত্র ভক্ষণ করিতেন।

অশ্বগন্ধা। প্রস্তর গন্ধি বলিয়া বৈদিক যুগে এই ঔষধের—"অশ্ম" এইরূপ বানান ছিল। পরবর্ত্তী যুগে ইহার নাম হইয়াছে "অশ্বগন্ধা"। 'ম'য়ের স্থানে "ব" বসিয়াছে।

অশ্বত্থ।

অশ্ববার। নল জাতীয় তৃণ বিশেষ।

আ—

আদার। সংস্কৃত নাম আদ্রক। আদা।

আবয়ু। সর্ষপ।

আণ্ডীক। পদ্ম।

আল। শস্যক্ষেত্রে জন্মিত, কোন্ জাতীয় গাছ এখনও বুঝিবার উপায় নাই।

আহা। দুর্ব্বা বিশেষ।

উ

উশনা। শত পথ ব্রাহ্মণে লেখা আছে, সোমলতা না পাইলে, ঋষিরা এই গাছের রস বাহির করিয়া সোমের কাজ সারিতেন।

উদুম্বর। ডুমুর, যজ্ঞডুমুর।

উশীর। তৃণ বিশেষ, বেণা। অনুলেপনে রমণীরা ব্যবহার করিতেন। পরবর্ত্তী যুগে—বহুরোগে ইহার আভ্যন্তরিক প্রয়োগ দেখিতে পাই।

ঊ

ঊষা। জ্যোতির্ম্ময়ী লতা বিশেষ।

এ

এরণ্ড। বেদে ইহার উল্লেখ নাই, কিন্তু ব্রাহ্মণে আছে।

ঐ

ঐক্ষগন্ধি। সুগন্ধি ওষধি বিশেষ। ইহার অর্থ—ষাঁড়ের গাত্রের গন্ধবিশিষ্ট দ্রব্য। কিন্তু জিনিষটা যে কি?—ঠিক্ জানা যায় না।

ক

কিয়াম্বু। শব-দাহস্থানের নিকটস্থ জলাশয়ে এই গাছ লাগাইতে হইত। মৃতদেহের সৎ-

কারার্থে ইহার প্রয়োজনীয়তা ছিল। ইহা শাক বিশেষ।

কুমুদ।

কুষ্ঠ। সকল রোগেই ব্যবহৃত হইত। তাই ইহার আর একটী নাম "বিশ্বভেষজ"। আয়ুর্ব্বেদে কিন্তু বিশ্বভেষজ অর্থে শুণ্ঠী বুঝায়। কুষ্ঠ হিমালয় জাত, সুগন্ধি ওষধি।

জ

জঙ্গিড়। বুঝিতে পারা যায় না। কেহ কেহ ইহাকে Terminuatia Arjuneya বলিয়া অভিহিত করেন।

কর্কন্ধু। কুষ্মাণ্ড জাতীয়। বোধ হয়—লাল কুমড়া (বিলাতী কুমড়া) হইতে পারে। উড়িয্যা দেশে বিলাতী কুমড়ার নাম "বাঘারু"। দেশ-বিশেষে সাদা কুমড়াকেও কর্কন্ধু বলে. ইহারই অপভ্রংশ কধু বা কদু।

কাকম্বীর। কি বৃক্ষ, জানা যায় না।

কুশ।

কাশ।

কুশর। তৃণ জাতীয়, আকার বৃহৎ। ইক্ষু হইতে পারে। সংস্কৃতে "কুশর" নাম ব্যবহার হয় না। যশোহরে, উত্তর বঙ্গে কুশারি ও কুশর শব্দে ইক্ষু বুঝায়।

কিংশুক।

খ

খদির।

খর্জ্জুর। বৈদিক যুগে দীর্ঘ উকার বানান ছিল।

ত

তিল।

তিল্বক। কোন্ জিনিষ জানা যায় না।

ত্রায়মাণা। কেহ বলেন, বলাডুমুর, কেহ বলেন—নয়।

ন্যগ্রোধ। বট।

নারাচী। বিষাক্ত গাছ। শরে ইহার রস মাখানো হইত।

প

প্লক্ষ। পাকুড়।

পাটা। শৈবাল। বাংলায় গুড় পরিষ্কারের জন্য যে পাটাশেহালা ব্যবহার হয়, তাই কি?

পিপ্পল। অশ্বত্থ।

পূতদ্রু। পূতদারু। হিমালয় জাত সরল বৃক্ষ।

পলাশ।

পূতিক। পূতীক। পুঁই।

প্রস্থ। চেনা যায় না।

ব

বদর। কুল।

বিল্ব।

বজ। বচ হইবে কি?

বিম্ব। তিক্তলকুচ।

বিষাঙ্কা। বিষাক্ত বৃক্ষ।

ভ

ভঙ্গ। অথর্ব্ব বেদোক্ত মাদকদ্রব্য। "ভাং" কি?

ম

মঞ্জিষ্ঠা।

মদুঘ। মদ্য উৎপাদক বৃক্ষ বিশেষ।

শ

শণ। ইংরাজী নাম hemp.

শফক। চেনা যায় না।

শালুক। জলজ পুষ্প।

শমী। Mimosa Suma। অথর্ব্ববেদে

উক্ত হইয়াছে, ইহার পত্র-রসে নেশা হয়। কেশবহুল স্থানে লাগাইলে চুল উঠিয়া যায়।

শম্মলী। শিমুল। পরবর্ত্তীযুগে আকার বসিয়া শাল্মলী হইয়াছে।

স

সোমলতা। এখন ব্যবহার নাই, চেনাও যায় না।

শ্রীরামসহায় কাব্যতীর্থ বেদান্তশাস্ত্রী।

আয়ুর্ব্বেদে ভারত বাণিজ্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

পূর্ব্বে চীণ, উত্তরে তুরস্ক, দক্ষিণে সমুদ্র এবং পশ্চিমে ইজিপ্ট, আরব ও য়ুরোপ—এই সকল দেশের সহিত যে ভারতের বাণিজ্য সম্বন্ধ—বহুযুগ পূর্ব্বেই স্থাপিত হইয়াছিল, আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে ভেষজ দ্রব্যের নাম-রহস্যের আলোচনা করিলেই আমরা তাহা বুঝিতে পারি। ভারতের অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্য—ভারতকে একদা লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে পরিণত করিয়াছিল এবং সেই সিদ্ধমন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করিয়া, ভারত পৃথিবীর গুরুপদে অভিষিক্ত হইয়াছিল।

পিঁপুল।—আয়ুর্ব্বেদে পিঁপুলের অনেকগুলি নাম। তাহার মধ্যে "উপকুল্যা" "বৈদেহী" এবং "মাগধী" এই তিনটী প্রধান। আমার মনে হয়, এই তিনটী নামের সার্থকতা বোধ হয়—পূর্ব্বে বিদেহ বা মগধ দেশ হইতে এদেশে প্রথম আমদানি হইয়াছিল। পুরাতত্ত্ব বিষয়ক পুস্তক পাঠে আমরা বুঝিতে পারি—বিদেহ এবং মগধ দেশের লোকেই ভারতে প্রথম বাণিজ্যের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। কোষকার অমর সিংহ বণিক্ পর্য্যায়ের প্রথমেই "বৈদেহকঃ" শব্দ বসাইয়াছেন। এই বিদেহ দেশ মগধেরই অন্তর্গত। য়ুরোপীয় বণিক্‌গণের কাছে ভারতীয় পিপ্পলীই প্রথম পরিচিত হইয়াছিল। ইংরাজীতে পিপ্পলীর নাম—pepper, ইহা পিপ্পলীরই অপভ্রংশ। বণিকগণ মলবার উপকূল হইতেই পিঁপুল, গোল মরিচ প্রভৃতি মস্‌লা সংগ্রহ করিতেন। এই উপকূলের সহিত সম্বন্ধ থাকার জন্যই বোধ হয় পিঁপুল ও মরিচের নাম "উপকূল্যা" হইয়াছে।

এলা।—এলা বা এলাইচ আয়ুর্ব্বেদোক্ত বহু ঔষধেরই উপাদান। আয়ুর্ব্বেদে—"যক্ষ কর্দ্দম" নামে একটী প্রলেপ দেখিতে পাওয়া যায়। এলাচ, কর্পূর, কস্তুরী, অগুরু—এই গন্ধ চতুষ্টয়ের সংমিশ্রণের নামই—"যক্ষ কর্দ্দম।" অমর কোষেও "যক্ষ কর্দ্দম" প্রলেপের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যক্ষ কর্দ্দমের প্রধান ও প্রথম উপাদানের নাম "এলা"। এই "যক্ষ কর্দ্দমের" কর্দ্দম হইতেই বোধ হয় এলাচের ইংরাজী নাম cardamom হইয়াছে। পূর্ব্বে এদেশ হইতে ভারতীয় বণিকগণ—এলাচ রপ্তানী করিতেন। রাজনির্ঘণ্টে এলাচের নাম "দ্রাবিড়ী" ও "সাগর গামিনী"; ইহাতে বেশ বুঝা যায়, এলাচ দ্রাবিড় দেশে উৎপন্ন হইত এবং তথাকার অনার্য্যগণ এলাচকে সাগর পথে য়ুরোপে চালান দিতেন।

লবঙ্গ।—লবঙ্গের একটী সংস্কৃত নাম—"বারি সম্ভব"। ইহা সমুদ্র মধ্যস্থিত দ্বীপে উৎপন্ন হইত, তথা হইতে ভারতে আসিত এবং বিদেশে প্রেরিত হইত।

কুষ্ঠ।—"কুষ্ঠ"—একটী গন্ধ দ্রব্য। অনেক রোগে, ঔষধার্থে ইহার প্রয়োগ দেখিতে পাই। ডাক্তার অপার্ট বলেন,—ভারতীয় বণিকগণ অতি উচ্চমূল্যে ইহা রোমান্‌দের নিকট বিক্রয় করিতেন। কুষ্ঠের ইংরাজী নামও—costus.

নলদ।—"নলদ"—সুগন্ধী দ্রব্য। কবিরাজেরা তৈল পাকের সময় ইহার ব্যবহার করেন। ভারতীয় বণিক্‌গণ—ইহাও য়ুরোপে উচ্চ মূল্যে বিক্রয় করিতেন। ইহার য়ুরোপীয় নাম Nard.

বোল (Myrrh)—"বোল" একটী প্রাচীন গন্ধ দ্রব্য। ঔষধার্থে এদেশে ইহার বহুল প্রচলন ছিল। ইজিপ্টে ইহার নাম—"বল"। "বোল" ভারত হইতে ইজিপ্টে যাইত। পরে ইজিপ্ট হইতেই ইহা য়ুরোপে চালান হইয়াছিল।

কস্তুরী।—"কস্তুরী" ভারতের একটী মূল্যবান্ গন্ধ দ্রব্য। সান্নিপাতিক রোগে, কফ রোগে, স্নায়ুদৌর্ব্বল্যে,—নাড়ীর ক্ষীণতায়, দৈহিক তাপের অভাবে, ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়। সাধারণের বিশ্বাস—"কস্তুরী" মৃগ নামক পশুর নাভিদেশে জন্মে। এই জন্য ইহার নাম "মৃগনাভি"। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইহা হরিণের নাভি ও অণ্ডকোষের মধ্যবর্ত্তী কোষ বিশেষ। অণ্ডকোষের সংস্কৃত নাম—"মুষ্ক"। এই "মুষ্ক" শব্দ হইতেই মৃগনাভির আরবী নাম হইয়াছে—"মেস্ক"। "মেস্ক" হইতে ইহার ইংরাজী নাম—Musk। ইহার দ্বারা বেশ বুঝা যাইতেছে—"কস্তুরী" ভারত হইতে প্রথমে আরব দেশে গিয়াছিল, পরে আরবীয়গণের নিকট হইতে—ইহা য়ুরোপের মেটিরিয়া মেডিকাতে স্থান পাইয়াছিল।

শর্করা।—"শর্করা"—ইক্ষুজাত বিকার। ইহা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় পদার্থ। বৈদিক যুগ হইতে যজ্ঞ কার্য্যে এবং ঔষধার্থে ইহার যথেষ্ট ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতবাসীর নিকট হইতেই য়ুরোপ শর্করার প্রস্তুত-প্রণালী এবং গুণাবলী শিক্ষা করে। তাই চিনীর ইংরাজী নাম Sugar। য়ুরোপের মহিয়সী মহিলা, মিসেস্ মেনিং—শর্করাকে ভারতজাত পদার্থ বলিয়াই স্পষ্টভাবে স্বীকার করিয়াছেন। শর্করা হইতে প্রাচীন ভারতবাসীরা মিছরী প্রস্তুত করিতেন। মিছরীর সংস্কৃত নাম—"শর্করা খণ্ড"। ইহার ইংরাজী নাম Sugar candy। এমন নামগত সামঞ্জস্য সত্বেও কেহ কেহ বলিয়াছেন—ভারতবাসীরা শর্করার ব্যবহার শিখিয়াছে—চীনদেশবাসীর কাছে,—তাই শর্করার নাম "চিনী"—আর মিছরী আসিয়াছিল—মিসর দেশ হইতে, তাই—তাহার অপভ্রংশে মিস্‌রী বা মিছরী নামের উৎপত্তি। তাঁহাদের ধারণা যে ভ্রান্ত, এ কথা সাহস করিয়া বলা যায়।

বাণিজ্যের রীতি—আদান ও প্রদান। ভারত যেমন বহু জিনিষ বিদেশে প্রদান করিয়াছে, তেমনি বিদেশ হইতে কিছু কিছু আদান বা গ্রহণও করিয়াছে।

যোয়ান।—যোয়ানের সংস্কৃত নাম—"যবানিকা"। তাই মনে হয়, হয়ত ইহা যবন দেশ হইতে ভারতে আসিয়াছে। তবে ইহা আমার অনুমান মাত্র—নিশ্চয় কিনা বলিতে পারি না।

সিহল।—"সিহল"—গন্ধদ্রব্য বিশেষ। অমরকোষে ইহার উল্লেখ আছে; "তুরুষ্কঃ পিণ্ডকঃ সিহেলা যবনোঽপি"। আবার বিশ্ব মেদিনীকারও লিখিয়াছেন—তুরুষ্কঃ সিহলকে ম্লেচ্ছ জাতৌ দেশান্তরেঽপিচ।" ইতিহাস পাঠে জানা যায়—আওনিয়ান গ্রীকগণকেই হিন্দুরা যবনাখ্যা দিয়াছিলেন। এই জন্যই মনে হয়—তুরুষ্ক ও গ্রীকগণ ভারতে "সিহল" নামক দ্রব্য লইয়া আসিয়াছিলেন।

রৌমক লবণ।—প্রাচীন হিন্দুগণ "রৌমক" নামক লবণ ব্যবহার করিতেন। অমর কোষেও "রৌমক" নাম লবণ বিশেষের পর্য্যায়ভুক্ত হইয়াছে। প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণিক ভানুজী দীক্ষিত বলেন—"রুমায়াং ভবং"। অতএব রৌমক লবণ যে রুমা বা রোম দেশ হইতে ভারতে আসিয়াছে, ইহা আমরা অনু-মান করিতে পারি।

হিঙ্গু ও কুঙ্কুম।—"হিঙ্গু" ও "কুঙ্কুম" এই উভয় দ্রব্যের নামের পর্য্যায়ে "বাহ্লিক" শব্দটী স্থান পাইয়াছে। সুতরাং মনে হয়—এই দুই জিনিষ বাহ্লিক দেশ হইতে এদেশে আসিয়াছে।

রসোন।—"রসোন"—ইহার সংস্কৃত নাম —ম্লেচ্ছকন্দ। আয়ুর্ব্বেদে ইহার আর একটী নাম "যবনেষ্ট"। হয়ত ইহা বহুযুগ পূর্ব্বে ম্লেচ্ছ দেশ হইতে এদেশে আসিয়াছিল।

তাম্র।—তাম্রের একটী নাম—"ম্লেচ্ছ" মুখ"। ভানুজী দীক্ষিত বলেন ম্লেচ্ছদেশে মুখমুৎপত্তি যস্য। আবার তাম্রের আর একটী বিশেষণ—"নৈপালী"। ম্লেচ্ছ দেশ ও নেপাল হইতে এদেশে তাম্রের আমদানী হইয়াছিল।

কর্পূর, লৌহ ও সীসা।—কর্পূরের নাম "চীণজ"। লৌহেরও একটী নাম চীণজ। সীসকের নাম "চীণবঙ্গ"—এই তিন দ্রব্য যে চীণদেশ জাত, ইহাই তাহার প্রমাণ।

হিঙ্গুল।—হিঙ্গুলের নাম দরদ। বোধ হয়—হিঙ্গুল দরদ অর্থাৎ দর্দ্দিস্থান হইতে এ দেশে আমদানী হইয়াছিল।

লঙ্কা।—লঙ্কা। লঙ্কাদ্বীপ হইতে এ দেশে আসিয়াছিল।

এই কয়টীমাত্র দ্রব্যের নাম-রহস্য হইতে আমরা বুঝিতে পারি ভারত বিদেশ হইতে যাহা আমদানি করিয়াছিল, তাহার শতগুণ দ্রব্য রপ্তানি করিয়াছিল।

ডাক্তার শ্রীঅমরনাথ চট্টোপাধ্যায়
এম্ বি।

চিকিৎসকের দুঃখ।

——০:০——

স্কুলমাষ্টার, কেরাণী প্রভৃতির দুঃখের কথা অনেকেই শুনিয়াছেন। তাহারা প্রায়ই দরিদ্র। বাস্তব-জগতে দরিদ্রের জীবন দুঃখপূর্ণ। যতকাল সমাজবন্ধন থাকিবে, ততকাল ধনী-দরিদ্রের ভেদ থাকিবে এবং দারিদ্র্যদুঃখ অনিবার্য্য বোধ হইবে। কিন্তু দারিদ্র্য ব্যতীতও

দুঃখের অনেক কারণ থাকিতে পারে, তবে সেগুলি প্রায়ই শ্রুতিগোচর হয় না। এই নিরন্ন-বহুলসমাজে দারিদ্র্যের আর্ত্তনাদ-কল্লোলে তাহা ডুবিয়া যায়। আমি আজ সেই কথা বলিব।

অনেকে ভাবিতে পারেন,—চিকিৎসকের আবার দুঃখ কি? অবশ্য অর্থসম্পৎশূন্য-প্রতিপত্তিহীন-চিকিৎসকের দুঃখ থাকিতে পারে, তাহা ত দারিদ্র্যদুঃখ ব্যতীত আর কিছুই নয়। আমি সে কথা বলিতেছিনা। আমি যে দুঃখের কথা বলিতেছি, ছোট হউক, বড় হউক—চিকিৎসক-জীবনের তাহা নিত্য সহচর।

এই বিরাট বিশ্বমণ্ডলের মত ক্ষুদ্র মনুষ্য-সমাজমণ্ডলের ভিত্তিও কর্ম্মভেদের উপর প্রতিষ্ঠিত। বিশ্বদেহে যেমন ক্রিয়াভেদে ভূতসমষ্টির বিকাশ, সমাজদেহেও সেইরূপ কর্ম্মবৈচিত্র্য ব্যষ্টির প্রতিষ্ঠা এবং যেমন বিশ্ব-ক্ষেত্রে, সেইরূপ সমাজক্ষেত্রে কর্ম্মানুসারেই ভূত-বিশেষের উৎকর্ষ অপকর্ষ কল্পনা। অবশ্য সূক্ষ্মদৃষ্টিতে কেহই ক্ষুদ্র বা নিকৃষ্ট নহে, কিন্তু স্থূল-জগতে সে সূক্ষ্মের সম্পর্ক অতি বিরল—অন্ততঃ সাক্ষাৎসম্বন্ধে নহে। স্থূলের সহিতই তাহার আদান-প্রদান ও সম্বন্ধ।

চিকিৎসা অতি মহৎ ও পুণ্যকর্ম্ম,—ইহা অনেকেরই বিশ্বাস। অন্ততঃ চিকিৎসকগণকে সমাজ এই চাটুবাক্যেই অভিনন্দিত করে। কিন্তু চিকিৎসা ব্যবসায় কি সত্যই মহৎ? মানুষ—রোগযন্ত্রণায় অস্থির হইয়া,প্রাণের মমতায় দুঃখনিবৃত্তির আশায় চিকিৎসকের নিকট ছুটিয়া আসে, চিকিৎসক অর্থের বিনিময়ে তাহার চিকিৎসা করেন, কেননা, অর্থ গ্রহণ না করিলে চিকিৎসকের জীবিকা নির্ব্বাহ হয় না। অবশ্য অনেক মহানুভব আছেন—যাঁহারা বিনামূল্যে দীনদরিদ্রের চিকিৎসা করেন, তাঁহাদের সংখ্যা অতিঅল্প। আবার ধনবানের গৃহে আহূত হইলে প্রভূত অর্থপ্রাপ্তি-সম্ভাবনা ত্যাগ করিয়া, সমকালীন নিঃস্বদরিদ্রের আহ্বান যাঁহারা বরণ করিয়া লইতে পারেন, তাদৃশ চিকিৎসক একান্তই দুর্ল্লভ। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বে রাজ্যৈশ্বর্য্যপরাঙ্মুখ আকুমার ব্রহ্মচারী ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন

অর্থস্য পুরুষো দাসোহর্থোদাসোনকস্যচিৎ
ইতি সত্যং মহারাজ বদ্ধোঽস্ম্যর্থেন কৌরবৈঃ।

অর্থাৎ—মহারাজ, পুরুষই অর্থের দাস, অর্থ কাহারও দাস নহে, একথা সত্য (তাহার উদাহরণ) কৌরবেরা আমাকে অর্থ দ্বারা বন্দী করিয়াছে।

চিকিৎসকগণও রোগীদিগকে ঠিক এই কথাই বলিতে পারেন। বরং ভীষ্মের পক্ষে অনুকূল একটা কথা বলা যাইতে পারে, উভয় পক্ষই রাজ্যলাভের জন্য জ্ঞাতিবিরোধে প্রবৃত্ত। চিকিৎসকের পক্ষে সে কথাও বলা চলে না। ধনী-দরিদ্র—উভয়েই প্রাণের মমতায় তাঁহার দ্বারস্থ হয়। চিকিৎসক অর্থের মানদণ্ডেই উভয়ের প্রাণের তুলনা করিতে বাধ্য হন।

অবশ্য পৃথিবীতে প্রায় সমস্ত জিনিষেরই মূল্য লওয়ার রীতি আছে। যে খাদ্য সামগ্রী ব্যতীত কেহ জীবন ধারণ করিতে পারে না, তাহা মূল্য দিয়া কিনিতে হয়। যে জল জগতের জীবন, তাহাও স্থান-বিশেষে ও সময় অনুসারে ক্রয় করিতে হয়। কিন্তু সে সকল ক্ষেত্রে লোকে তাহাদের কষ্টোপার্জ্জিত অর্থের বিনি-ময়ে একটা দ্রব্য পাইয়া থাকে, কিন্তু প্রভূত অর্থ-বিনিময়েও মানুষ চিকিৎসকের নিকট কি পাইয়া থাকে? জীবন কি চিকিৎসকের আয়ত্ত? চিকিৎসা-বিদ্যা অদ্যাপি অসম্পূর্ণ এবং

অনিশ্চিত। নিত্য নব বিজ্ঞানালোকে উদ্ভাবিত পাশ্চাত্য ভূখণ্ডেও অদ্যাপি চিকিৎসাবিদ্যা বিজ্ঞান পদবী লাভের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। আধুনিক চিকিৎসা বিদ্যা বিশারদ-গণও স্বীকার করিতেছেন—মানুষের প্রকৃতিই তাহার রোগ প্রতিষেধক। চিকিৎসক সেই প্রকৃতির সহায়তা করিতে পারেন মাত্র। সেই প্রকৃতির সম্পূর্ণ স্বরূপ কোন চিকিৎসক জানিতে পারিয়াছেন? এ সম্বন্ধে একটি সুন্দর রূপক * আছে। গভীর অন্ধকারাচ্ছন্ন গৃহে রোগীর জীবন এবং রোগের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ বাধিয়া গিয়াছে। রোগীর আত্মীয়-স্বজনগণ রোগীর সাহায্যার্থ চিকিৎসককে আহ্বান করিলেন। চিকিৎসক বৃহৎ লগুড় স্কন্ধে রোগীর কক্ষে আবির্ভূত হইলেন। গভীর অন্ধকারে কিছুই লক্ষ্য হয় না, চিকিৎসক অনু-মানের উপর নির্ভর করিয়া লগুড় প্রহার আরম্ভ করিলেন। যদি চিকিৎসক এবং রোগী উভয়ের ভাগ্যবশে রোগের উপর লগুড় নিক্ষিপ্ত হইতে থাকে, তবে রোগ সে যাত্রা পলায়ন করে, আর যদি রোগ ছাড়িয়া জীবনের উপর লাঠি পড়ে, তবে রোগীর জীবলীলা সাঙ্গ হইয়া যায়।

তাই দেখা যায়—লোকে চিকিৎসার জন্য যে অর্থব্যয় করিতে বাধ্য হয় তাহা প্রায়ই অপব্যয় মনে করিয়া থাকে। একটা উদ্ভট শ্লোক আছে

রোগকালে পিতা বৈদ্যঃ রোগ শেষে সহোদরঃ
রোগমুক্তৌ মাতুলস্তু, দানকালে চ শ্যালকঃ। †

প্রাচীন হিন্দুধর্ম্ম শাস্ত্রে দেখ, † চিকিৎসক অপাঙ্‌ক্তেয় বলিয়া নিন্দিত, তাহার অন্ন অভক্ষ্য বলিয়া কথিত। সুদূর অতীতের কথা ছাড়িয়া দেই, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বর্ত্তমান যুগে যুগাবতার বলিয়া অনেকের নিকট পূজিত। তিনি যে একজন জীবন্মুক্ত মহা-পুরুষ ছিলেন, সে সম্বন্ধে কাহারও মতভেদ নাই। তিনি চিকিৎসকের অন্ন গ্রহণ করিতে পারিতেন না বলিতেন, ‡ উহাদের অর্থ লোকের দুঃখকষ্টের উপর উপার্জ্জিত। এই তত্ত্ব পরম দূরদর্শী আর্য্য ঋষিগণ বুঝিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের সর্ব্বতত্ত্বভেদিনী প্রতিভার আলোকে ইহার যথাসম্ভব এবং কথঞ্চিৎ প্রতিকারের উপায় ও উদ্ভাবিত হইয়াছিল। মর্ত্যভূমিতে হিমগিরির পাদমূলে সম্মিলিত ঋষিসঙ্ঘ কর্ত্তৃক সর্ব্ব প্রথম আয়ুর্ব্বেদের অবতারণা হইয়াছিল, তাহার পর কিছুদিন পর্য্যন্ত আয়ুর্ব্বেদের ভার তাঁহাদেরই হস্তে ছিল। কিয়ৎকাল পরে তাঁহারা বুঝিতে পারেন,—আয়ুর্ব্বেদ চর্চ্চার ফল আধ্যাত্মিক অবনতি। পরমার্থ ভগবচ্চিন্তা ত্যাগ করিয়া কেবল লোকের রোগের —পাপের চিন্তা করা তপস্যার প্রতিকূল। তখন তাঁহারা স্থির করেন, সত্ত্বগুণ প্রধান ব্রাহ্মণের পক্ষে এ বিদ্যা ত্যাগ করাই কর্ত্তব্য কিন্তু কাহার হস্তে আয়ুর্ব্বেদের ভার ন্যস্ত করেন? কেননা এ শাস্ত্র সমাজের পক্ষে কথঞ্চিৎ হিতকর এবং প্রয়োজনীয় সন্দেহ নাই, অতএব লুপ্ত হওয়া প্রার্থনীয় নহে। ক্ষত্রিয়ের হস্তে দেশরক্ষার ভার। সে কার্য্য মহত্তর

* স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু কথিত।

† এই অভ্যাসটী কেবল মানুষের নহে। স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র স্বর্গবৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে দেবগণের সহিত তুল্যাংশে অধিকারী হইলেও যজ্ঞীয় সোমভাগ গ্রহণে বহুকাল বঞ্চিত রাখিয়াছিলেন এবং এইজন্যই অবশেষে মহর্ষি চ্যবনের সহিত তাঁহার বিষম বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল। মহাভারত ও দেবীভাগবত।

‡ মনু, বিষ্ণু ও যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা। শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত।

এবং পবিত্রতর। অতএব ক্ষত্রিয়ের পক্ষেও এ বিদ্যা উপযোগিনী নহে। বৈশ্য—বাণিজ্য-জীবী। সে—ব্যবসায়ের হিসাবে এ বিদ্যা গ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু তাহা হইলে লোকের উপকার অপেক্ষা পীড়নের মাত্রাই বাড়িবে। অথচ ব্যবসায়ের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত না করিলে—কেবল সখের হিসাবে এ কার্য্য স্থায়ী হইবে না। এই সমস্ত আলোচনা করিয়াই মহর্ষিগণ ব্রাহ্মণ-পিতা এবং বৈশ্য-মাতার সহযোগে অম্বষ্ঠজাতির সৃষ্টি করিয়া তাহাদের হস্তে আয়ুর্ব্বেদ অর্পণ করিলেন। পিতৃবীজের প্রাধান্য হেতু ব্রাহ্মণ সুলভ জীবদুঃখকারতা এবং ধর্ম্মভাবের আধিক্য এবং মাতৃবীজ জনিত বণিগ্-বৃত্তির গৌণভাব লইয়া যে জাতির উদ্ভব,—তাহার দ্বারা লোক পীড়ন অধিক হইবে না—অথচ এ বিদ্যাও বিস্তৃত এবং প্রচলিত থাকিবে—এই উদ্দেশ্যেই তাঁহারা বিধান করিয়াছিলেন,—'অম্বষ্ঠানাং চিকিৎসিতম্'।

ইহকাল ও পরকালের উপর মানুষের আশা ও স্থিতি। ইহকালের হিসাবে চিকিৎসকের কোন-সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ঘটিয়া থাকে? অন্যান্য ব্যবসায় যেরূপ অর্থকর, তাহার তুলনায় চিকিৎসা-ব্যবসায় অনেক হীন। জগতে ঐশ্বর্য্য-বান্‌দের গণনা-মুখেই হউক আর অবসানেই হউক—কোন চিকিৎসকের নাম কীর্ত্তিত কি হয়?

তাহার পর যশঃ। আমাদের দেশেই বল, আর পাশ্চাত্য দেশেই বল,—কোন দেশের ইতিহাসেই চিকিৎসকের নাম উল্লিখিত হয় নাই। কোন সার্থকজন্মা কবির লেখনীমুখে চিকিৎসকের কীর্ত্তি-সঙ্গীত হইয়াছে? এই বর্ত্তমান অর্দ্ধ মহাদেশব্যাপী ভীষণ লোকক্ষয়কর যুদ্ধে উভয় পক্ষীয় বীরেন্দ্রগণ পরস্পরকে সংহার করিতে প্রবৃত্ত। আর চিকিৎসকগণ শত্রুমিত্র নির্ব্বিশেষে সকলেরই প্রাণ রক্ষায় যত্ন করিতেছেন, কিন্তু যখন কোলাহল নিস্তব্ধ হইবে, ধরিত্রী আবার শান্তি-শীতলা হইবেন, তখন ইতিহাসে—কবিমুখে—জনকণ্ঠে দিগ্বিজয়ী বলিয়াই হউন, আর দেশরক্ষাকারী বলিয়াই হউন—শত্রুজয়ী বীরেন্দ্রগণেরই যশঃ ধ্বনিত হইবে—কৃতজ্ঞতা মুগ্ধ সমগ্র দেশের সম্মান-ঐশ্বর্য্য তাঁহাদের চরণেই অঞ্জলিরূপে প্রদত্ত হইবে। রাজনীতিক বল, ব্যবসায়ীবল ধনী ভূস্বামীগণই বল,—অল্প বিস্তর সকলেই যে মহোৎসবে সমাদৃত হইবেন, কেবল চিকিৎসকগণের ভাগ্যে হয়ত ক্ষীণকণ্ঠের মৃদু ধন্যবাদ মাত্র—আর না বলাই ভাল।

কেবল চিকিৎসকগণের নিকট চিকিৎসা গ্রন্থে চিকিৎসকের নাম বিখ্যাত এবং প্রশংসিত। যাহার কথা অন্যে বলে না—তাহার কথা নিজেকেই বলিতে হয়।

যশের কথা যখন উঠিল, তখন অযশের কথাও বলিতে হয়। চিকিৎসক জন সাধারণের রোগাকাঙ্ক্ষী,—সমাজের ইহাই বিশ্বাস। কেননা লোকের রোগ না হইলে চিকিৎসকের ব্যবসায় চলে না। তাই কি দূরদর্শী গভর্ণমেণ্ট স্বাস্থ্য বিভাগে নিযুক্ত চিকিৎসকগণের চিকিৎসাবৃত্তি নিষিদ্ধ করিয়াছেন? চিকিৎসা-ব্যবসায়িগণ দেশের স্বাস্থ্যবৃদ্ধির পরিপন্থী,—এই ধারণার ফলেই কি এই ব্যবস্থা?

পুরাণকার ঋষি এই তত্ত্ব বুঝিয়াছিলেন কিনা জানিনা কিন্তু যিনি আদি চিকিৎসক স্বর্গবৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে সূর্য্যপুত্র অর্থাৎ শনির (গ্রহ) বৈমাত্র এবং যমের সহোদর ভ্রাতা * বলিয়াছিলেন—তাঁহার সূক্ষ্মদৃষ্টি অন্ততঃ বর্ত্তমান যুগের হিসাবে প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই।

* মার্কণ্ডেয় পুরাণ এবং হরিবংশ।

ইহা যদি বিশুদ্ধ রসিকতা হয়, তবে তাহা তীব্র এবং চিকিৎসক-মর্ম্মভেদিনী বটে।

সংসার মরুক্ষেত্রে বন্ধুলাভ বড় শান্তিপ্রদ, কিন্তু চিকিৎসকের ভাগ্যে তাহা দুর্ঘট। আমি প্রকৃত বন্ধুত্বের কথা বলিতেছি না, ঘনিষ্ঠতা-সৌহৃদ্যের কথাই বলিতেছি। ব্যবসায়ের অনুরোধে তাহা রক্ষা করা চিকিৎসকের পক্ষে অতি দুরূহ। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, অন্যান্য ব্যবসায়ে বন্ধু বান্ধবের নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ দোষাবহ বিবেচিত হয় না, বরং তাহারাই যথা-সাধ্য পৃষ্ঠপোষণ এবং সহায়তা করিয়া থাকে, কিন্তু চিকিৎসকের পক্ষে তাহা করা আর বন্ধু বিচ্ছেদ হওয়া একই কথা। বন্ধু বান্ধবগণের এমন কি—দূর আত্মীয়গণের রোগ হইলে অন্য সকলেই যাইয়া সংবাদ লইয়া থাকে, সমবেদনা-সৎপরামর্শ জ্ঞাপন করিতে পারে, কেবল চিকিৎসকের পক্ষে তাহা সকল সময় সম্ভব হয় না। যে ক্ষেত্রে রোগী—চিকিৎসক-বন্ধু বা আত্মীয়কে আহ্বান করে নাই, সে ক্ষেত্রে অনাহূত এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া যাইতে চিকিৎসক সঙ্কোচ এবং আত্মমর্য্যাদা-লাঘবকর বিবেচনা করেন। রোগীও কুণ্ঠিত হয়, অনেকে পছন্দও করেন না। চিকিৎসক উপস্থিত হইলেও অকপট ভাবে নিজের মতামত প্রকাশ করিতে পারেন না।

চিকিৎসককে কদাচিত দীর্ঘজীবন লাভ করিতে দেখা যায়, বিষাক্ত, দূষিত, সংক্রামক মারাত্মক নানারূপ রোগ লইয়া তাঁহাকে সর্ব্বদা নাড়াচাড়া করিতে হয়, শীঘ্রই হউক আর বিলম্বেই হউক—চিকিৎসককে তাহার ফলভোগ করিতে হয়। একটা প্রবাদ আছে, ভূতের ওঝার মৃত্যু ভূতের হাতে আর, সাপের ওঝার মৃত্যু সর্পাঘাতে হইয়া থাকে। চিকিৎসকের ভাগ্যে এই প্রবাদের সম্পূর্ণ সার্থকতা দেখা যায়।

ভোগ-সুখ চিকিৎসকের ভাগ্যে দুর্লভ! তাঁহাদের নিকট "ভোগে রোগভয়ম্" বলিয়া ইচ্ছামত আহার বিহার বিভীষিকা-সঙ্কুল হইয়া উঠে। কর্ম্মক্লান্ত জীবনে বিশ্রাম গ্রহণ বা অবকাশ লাভ সকলের ভাগ্যেই সুলভ, কেবল চিকিৎসকের অদৃষ্টে অবকাশের অবকাশ ঘটিয়াছে।

ইহকালে চিকিৎসকের সুখ ও সুবিধা ত এই। পরকালের পথও তাঁহার ভাগ্যে কণ্টকাকীর্ণ। চিকিৎসককে সর্ব্বদা যেরূপ প্রলোভনের মধ্যে থাকিতে হয়, সর্ব্বদা যেরূপ কুচিন্তা ও জঘন্য বিষয়ের আলোচনা করিতে হয়, তাহার ফলে "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী" বিধি অনুসারে চিকিৎসকের ভাবনানু-যায়ীই জীবন যে গঠিত হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় নাই। পাঁচজন কঠিন রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে নিরাময় করিলে চিকিৎসক যে আত্ম-প্রসাদ বা পুণ্য সঞ্চয় করেন, বুদ্ধি বা চিকিৎসার দোষে একজনের ভবলীলা অবসান করাইলেই তাহা নিঃশেষ হইয়া যায়। অথচ চিকিৎসাক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির অর্থ তাহাই। এই প্রাচীন শ্লোকার্দ্ধেও এই কথাই সমর্থিত হইয়াছে—

"শতমারী ভবেদ্বৈদ্যঃ সহস্রমারী চিকিৎসকঃ।"

গড়ে কি এই এই দুই ফলের কাটাকাটি হয়? যদি তাহা না হয়, তবে চিকিৎসক কি জন্য এই ভীষণ দায়িত্ব-মহান্ প্রত্যবায় স্বীকার করেন? বিলাতী আইনের একটা মূলসূত্র এই—বরং দশজন দুষ্ট নিষ্কৃতি লাভ করুক, কিন্তু একজন নিরপরাধও যেন দণ্ডিত না হয়। চিকিৎসার মূলসূত্র কি তাহার বিপরীত? অথচ তাহা না

হইলে হাসপাতালে পরীক্ষা-পর্য্যবেক্ষণ প্রভৃতি উঠাইয়া দিতে হয় এবং চিকিৎসা বিদ্যার উন্নতি বা অভিজ্ঞতা লাভ অসম্ভব। পরীক্ষাযূপে কত মানবের জীবন উৎসর্গীকৃত হইয়াছে—বর্ত্তমান চিকিৎসা বিদ্যার ভিত্তিমূল কত প্রাণীর রুধির-প্লুত—তাহা সৃষ্টিকর্ত্তাই একমাত্র অবগত আছেন।

ধর্ম্ম জগতেও কোন চিকিৎসকের জীবন আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভে ধন্য এবং প্রসিদ্ধ হইয়াছে? প্রাচীন পুরাণ—মহাভারত-রামায়ণাদির ব্রাহ্মণ, মহর্ষি, ব্রহ্মর্ষিগণের কথা ছাড়িয়া দিই, জনক তুল্য রাজর্ষি, ভীষ্ম-অর্জ্জুনাদি তুল্য ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ ক্ষত্রিয়গণের কথাও ধরিব না, কিন্তু গুহক চণ্ডাল বণিক তুলাধার ও সমাধি, ব্যাধ দাসী পুত্রাদিও ধর্ম্মরাজ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত বলিয়াই পুরাণকার ঋষিমুখে অভিনন্দিত হইয়াছেন। প্রাচীন এবং মধ্যযুগের সাহিত্যেও কবিগণ যাঁহাদিগের উদ্দেশ্যে পুষ্পাঞ্জলি দান করিয়াছেন, যাঁহাদের ভগবদ্‌ভক্তি ও পরমার্থ লাভ স্মরণ করিয়া অদ্যাপি কোটী ভক্ত হৃদয় বিগলিত, জ্ঞানী চিত্ত আদ্র এবং সংসার তাপ দগ্ধের হৃদয় আশা এবং সান্ত্বনায় উচ্ছ্বসিত হইতেছে—তাহাদের মধ্যে ত কোন চিকিৎসকের নাম দেখি না! কোন কাহিনী—কোনউপাখ্যান—কোন সঙ্গীতে চিকিৎসকের পুণ্যস্মৃতি সঞ্জীবিত করিয়া রাখে নাই। যুগে যুগে লোকপাবন অবতার ও লোকোত্তর মহাপুরুষগণ অবতীর্ণ হইয়া পদরেণু স্পর্শে কত কামকাঞ্চনাসক্ত পাপিষ্ঠের উদ্ধার করিয়াছেন, হীন অস্পৃশ্য জাতি সর্ব্বজন ঘৃণ্য পতিতা গণিকাও তাঁহাদের কৃপালাভে বঞ্চিত হয় নাই, কেবল চিকিৎসকই সে অক্ষয় করুণা লাভে অধিকারী হয় নাই। পূর্ব্ব এবং পশ্চিম উভয় মহাদেশেরই ধর্ম্মের এবং সাধনার ইতিহাসে নৃপতি, মন্ত্রী, যোদ্ধা, পণ্ডিত, বণিক, দাস, ধীবর, রজক, মালাকার, চর্ম্মকার, ব্যাধ সকল শ্রেণীর লোকই স্থান পাইয়াছে,—পায় নাই কেবল চিকিৎসক।* জগতে এমন হতভাগ্য বুঝি আর নাই।

কিত ধাতু হইতে চিকিৎসক শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। কিত ধাতুর দুই অর্থ। সংশয় এবং রোগ প্রতীকার। চিকিৎসা-ব্যবসায়ীর ইহ-পরকাল গভীর সংশয়াচ্ছন্ন, এই মনে করিয়াই কি শব্দশাস্ত্রকার চিকিৎসক শব্দের ওরূপ ব্যুৎপত্তি করিয়াছিলেন?

শুনিতে পাই, লোকে অসহ্য যন্ত্রণার হাত এড়াইবার জন্য সুরা পান করে। পূর্ব্বেও বহু চিকিৎসক সুরাসক্ত ছিলেন, এক্ষণেও সে দৃষ্টান্তের অভাব নাই। তাঁহারা কি এই দুঃখ নিবারণের জন্যই সেই সন্তাপহারিণীর আশ্রয় লইয়াছেন?

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাস গুপ্ত কাব্যতীর্থ।

---

* কেবল মাত্র মুরারি গুপ্ত প্রভৃতি ২।১ জন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের করুণালাভের অধিকারী হইয়াছিলেন।

দিন চর্য্যা

(পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর)

এইবার আহারের কথা বলিব। আহার সম্বন্ধে শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে,—"বল, আরোগ্য, আয়ু এবং প্রাণ অগ্নিতে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, সেই অগ্নি অন্ন-পানারূপ ইন্ধন পাইলে প্রজ্জ্বলিত থাকে, অন্যথা নির্ব্বাপিত হইয়া যায় অন্নই প্রাণীদিগের প্রাণ স্বরূপ, লোকে অন্নেরই আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে। বর্ণের উৎকর্ষ, সুস্থিরতা, জীবন, প্রতিভা, সুখ, তুষ্টি, পুষ্টি, বশ ও মেধা সমস্তই অন্নে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।"

এই যে প্রাণ স্বরূপ অন্ন—ইহা আহার করা বিশেষ বিবেচনা সাপেক্ষ্য। কেননা, অন্ন প্রাণীদিগের প্রাণস্বরূপ বটে, কিন্তু অযুক্তিযুক্ত ভাবে সেবন করিলে প্রাণ নাশক হইয়া থাকে, অতএব আহার সম্বন্ধে যুক্তি কি—এই প্রসঙ্গে তাহা আলোচনা করা যাইতেছে।

চরক সংহিতায় কথিত হইয়াছে যে, আহার বিধি আটটী বিষয়ের উপর নির্ভর করে। যথা, প্রকৃতি, করণ, সংযোগ, রাশি, দেশ, কাল, উপযোগ, সংস্থান ও উপযোক্তা। প্রত্যেকের বিষয় পৃথকভাবে আলোচনা করা যাইতেছে।

প্রকৃতি—আহার দ্রব্যের যে স্বাভাবিক গুণ তাহার নাম প্রকৃতি। যেমন মাষকলায় স্বভাবতঃ গুরু এবং এবং মুগ স্বভাবতঃ লঘু, শূকর মাংস স্বভাবতঃ গুরু এবং হরিণ মাংস স্বভাবতঃ লঘু। এইরূপ অম্লদ্রব্য শ্লেষ্মা ও পিত্ত বর্দ্ধক, কষায় ও তিক্ত দ্রব্য বায়ু বর্দ্ধক। দাল উদরে বায়ু সঞ্চয়কারক, তিক্ত দ্রব্য পিত্ত নাশক, কটু দ্রব্য কফ নাশক, মাংস পুষ্টিজনক শাক মলবর্দ্ধক প্রভৃতি বুঝিতে হইবে। দ্রব্যের প্রকৃতি বুঝিয়া ক্ষীণাগ্নি ব্যক্তি মাষকলায় পরিত্যাগ এবং মুগ আহার করিবে না। শ্লেষ্মা বা পিত্ত প্রধান ব্যক্তি অম্ল দ্রব্য আহার করিবে না। বায়ু প্রকৃতি ব্যক্তি তিক্ত ও কষায় দ্রব্য আহার করিবে না। যাহাদের উদরে বায়ু সঞ্চয় হয়, তাহারা দাল আহার করিবে না। পিত্ত প্রধান ব্যক্তি তিক্ত দ্রব্য এবং কফ প্রধান ব্যক্তি কটু দ্রব্য আহার করিবে। শীর্ণ ব্যক্তি পুষ্টির জন্য মাংস আহার করিবে এবং অল্প মল ব্যক্তি মল বৃদ্ধির জন্য শাক আহার করিবে —ইত্যাদি।

করণ—স্বাভাবিক পদার্থের সংস্কারকে করণ বলে। সংস্কার দ্বারা দ্রব্যের গুণান্তর হয়। জল ও অগ্নির সংযোগ, শোধন, মন্থন, দেশ-কাল ভাবনাদি, কাল-প্রকর্ষ এবং পাত্রাদি দ্বারা দ্রব্যের সংস্কার হইয়া থাকে। জল দ্বারা সংস্কার—যেমন চিড়া ভিজাইয়া খাইলে অপেক্ষাকৃত লঘু পাক হয়। অগ্নিদ্বারা সংস্কার—যেমন ধান্য হইতে চাল হয়, বেগুণ পোড়াইয়া খাইলে লঘুপাক হয়। জল ও অগ্নির দ্বারা সংস্কার—যেমন বিবিধ খাদ্য সিদ্ধ করিয়া খাইলে লঘু পাক হয়। শোধন—যেমন ফলাদির বীজ ও ত্বক ফেলিয়া দিয়া খাইলে লঘুপাক হয়। মন্থন—যেমন মথিত দধি ঘোল রূপে পরিণত হয় এবং মাখম উৎপন্ন হয়। দেশ—আনুপ দেশের জল অভিষ্যন্দী, এবং জাঙ্গল দেশজাত জল ও প্রাণীর মাংস অভিষ্যন্দী

নহে। কাল—যেমন উত্তরায়ণ কালে কটু তিক্ত ও কষায় রসের বৃদ্ধি হয় এবং দক্ষিণায়ণে অম্ল লবণ ও মধুর রস বর্দ্ধিত হয়, শরৎকালে জল নির্ম্মল হয়। ভাবনা—যেমন চড়াই পক্ষীর ডিম্বের অভ্যন্তরস্থ পদার্থ দ্বারা চাউল ভাবনা দিলে তাহা অত্যন্ত শুক্রবর্দ্ধক হয়। কাল-প্রকর্ষ—যেমন কুষ্মাণ্ড পক্ক হইলে সুপথ্য হয়। অত্যন্ত অল্প বয়স্ক পশুর মাংস অপথ্য ও মাংস কাল-প্রকর্ষবশতঃ সুপথ্য হইয়া থাকে। পাত্রভেদে—যেমন ধাতুপাত্রে অম্লরস এবং কাংসাদি নির্ম্মিত পাত্রে ঘৃতাদি বিকৃত হয়। যেমন ঘৃত লৌহময় পাত্রে, পেয়া রৌপ্যময় পাত্রে, ফল ও তক্ষ্য (লাড়ু প্রভৃতি) কদলী পত্রে, পরিশুষ্ক ও প্রদিগ্ধ মাংস সুবর্ণ পাত্রে, মণ্ডাদি ও মাংস, যূষ রৌপ্য ময় পাত্রে, সিদ্ধ শীতল দুগ্ধ তাম্রময় পাত্রে* জল সরবৎ প্রভৃতি মৃন্ময় পাত্রে রাজ যাড়ব (সরবৎ বিশেষ) কাচ বা স্ফটিক নির্ম্মিত পাত্রে দিলে গুণশালী হয়।‡

সংযোগ—দুই বা বহুদ্রব্যের একত্র মিলনকে সংযোগ বলে।* একটী দ্রব্যের যেরূপ গুণ থাকে, ভিন্ন দ্রব্যের সহিত সংযুক্ত হইলে তাহার পার্থক্য ঘটে, ঘৃত ও মধু স্বতন্ত্রভাবে সেবন করিলে অনিষ্ট হয় না, কিন্তু একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে বিষবৎ অনিষ্ট করে! আবার সংযোগ দ্বারা দ্রব্য লঘুপাক বা গুরুপাক হইয়া থাকে। হিং, লবণ, মরিচ প্রভৃতি পাচক দ্রব্যের সংযোগে খাদ্য লঘুপাক হয়। ঘৃত, পেস্তা, ছোলা, বড়ি প্রভৃতির সংযোগে খাদ্য গুরুপাক হয়। লঘুপাক অন্ন মাংস-ঘৃতাদি সহ মিশ্রিত করিয়া পোলাও প্রস্তুত করিলে গুরুপাক হয়। রাশি—রাশি দুই প্রকার, যথা—সর্ব্বগ্রহ রাশি ও পরিগ্রহ রাশি। মোটের উপর সমস্ত দ্রব্য যাহা আহার করা হইল, তাহাকে সর্ব্ব গ্রহ রাশি, আর পৃথক দ্রব্যের পরিমাণকে পরিগ্রহ রাশি বলে, যেমন তিন পোয়া দুগ্ধ, এক পোয়া চাল, আধ পোয়া দাল, তিনছটাক মাংস ইত্যাদি। এই রাশি জ্ঞান না থাকায় একবার একটী ভদ্র মহিলা বিষম অপ্রস্তুত হইয়াছিলেন। গল্পটি অপ্রাসঙ্গিক হইবে না, পরন্তু উপদেশ জনক হইবে বলিয়া নিম্নে লিখিতেছি।

কোন সময়ে এক ধনবান গৃহস্থের বাড়ীতে একজন সন্ন্যাসী অতিথি হইয়াছিলেন। অতিথি-বৎসলা গৃহিণী স্বয়ং অতিথির সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এবং আহারাদির বন্দোবস্তের ভার গ্রহণ করেন। বেলা তৃতীয় প্রহরের সময় অতিথি স্বয়ং

* আয়ুর্ব্বেদে তাম্রময় পাত্রে দুগ্ধ দিবার নিয়ম আছে, কিন্তু স্মৃতি শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে "তাম্র পাত্রে পানং সদ্যো গোমাংস ভোজনম্" অর্থাৎ তাম্রপাত্রে দুগ্ধ পান করিলে সদ্যো গোমাংস ভোজন করা হয়। এই বিরুদ্ধ মতবাদের মীমাংসা এই, তাম্র পাত্রে দেবাদির, উদ্দেশে দুগ্ধ আহরণ করা প্রচলিত আছে। এ স্থলে দুগ্ধ অর্থে উদ্ধৃত সার (মাখম তোলা) দুগ্ধ। সসার দুগ্ধ তাম্রময় পাত্রে দেওয়া যাইতে পারে।

‡ সুশ্রুত সূত্রস্থান, ৪৯ অধ্যায়, ৮৯ সংখ্যক শ্লোক।

* করণের কাল, ভাবনা, পাত্রভেদ সম্বন্ধে সুশ্রুতের টীকাকারের যে মত আমি তাহার অনুসরণ করি নাই। সুশ্রুতের টীকাকারের মত গতবর্ষের মাঘ মাসের আয়ুর্ব্বেদে ২১৩।১৪ পৃষ্ঠায় আয়ুর্ব্বেদ কি Emplrical নামক প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য। আহার সম্বন্ধে আটটী বিষয়ের কথা যখন বলা হইয়াছে, তখন আহারের দেশ সম্বন্ধে ঔষধ বিশেষকে ধান্য রাশির মধ্যে রাখিলে গুণান্তর সংযোগ হয়, তিলকে ফুলের সহিত অধিবাসিত করিয়া পীড়ন করিলে ফুলেল তেল হয়।

পাক করিয়া আহার করেন। এক সের চাউলের অন্ন দুইটী কাচকলা ভাতে, কিঞ্চিৎ দুগ্ধ ও ঘৃত লইয়া অতিথি আহারে প্রবৃত্ত হইলেন। গৃহিণী যখন দেখিলেন যে, অতিথি সমগ্র অন্ন উদরস্থ করিলেন, তখন নিজের পুত্র তিন ছটাক চাউলের অন্ন মাত্র আহার করে মনে করিয়া তাঁহার চিত্ত কিঞ্চিৎ ক্ষুব্ধ হইল তিনি অতিথিকে বলিলেন, সন্ন্যাসীঠাকুর-আপনি বেশ আহার করিতে পারেন। আমার ছেলেটী কিছুই খেতে পারে না। সন্ন্যাসী তদুত্তরে কিছু বলিলেননা। কিন্তু ক্ষুব্ধা গৃহিণী কথাটা একবার বলিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই, দুই তিনবার বলিয়াছিলেন। তিন বার বলিবার পর অতিথি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন আরে বেটী, আমি বেশী খাই না তোর ছেলে বেশী খায়! চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আমি একবার মাত্র আহার করি, আর তোর ছেলে দশবার আহার করে। দশবারে তোর ছেলে যা খায়— সব্ একত্র কর্ দেখি—আমার আহারের চেয়ে বেশী হয় কিনা! গৃহিণীর মুখে আর কথা নাই। তিনি সন্ন্যাসীর সর্ব্ব গ্রহ রাশি এবং নিজের পুত্রের পক্ষে পরিগ্রহ রাশি লইয়া বিচার করিয়াছিলেন বলিয়া এইরূপ ঘটিয়াছিল। আশা করি আয়ুর্ব্বেদের পাঠিকা কোন গৃহিণী এইরূপ ভ্রমে পতিতা হইবেন না এবং আয়ুর্ব্বেদের পাঠকগণ সর্ব্বগ্রহরাশি এবং পরিগ্রহ রাশি বিচার করিয়া আহার করিবেন।

দেশ—দ্রব্যের উৎপত্তি ও প্রচার এবং যে দেশে যাহা সাত্ম্য—দেশ সম্বন্ধে তাহাই বিচার্য্য। উৎপত্তি—যে দেশে যে সকল দ্রব্য উৎপন্ন হয়, সেই দেশের লোকের পক্ষে তাহাই সুপথ্য। প্রচার—বঙ্গে মাংস ও মৎস্যের প্রচলন আছে, পশ্চিমাঞ্চলে অনেক স্থানে নাই, ইংরাজ পনির আহারে অভ্যস্ত, ভারতবর্ষের উহার প্রচার নাই, দেশসাত্ম্য—মধ্যদেশবাসীর পক্ষে শীতল ও স্নিগ্ধ দ্রব্য এবং আনূপ দেশবাসীর পক্ষে উষ্ণ ও রুক্ষ দ্রব্য হিতকর। শীতপ্রধান দেশবাসীর পক্ষে উষ্ণ বীর্য্য ও উত্তেজক খাদ্য এবং গ্রীষ্ম প্রধান দেশবাসীর শীতল ও অনুত্তেজক খাদ্য হিতকর।

কাল—ঋতু সাত্ম্য ভেদে কালের বিচার করিতে হয়। কাল রোগকে অপেক্ষা করে। এই ব্যক্তির অগ্নিমান্দ্য আছে, অতএব ইহাকে লঘুপাক আহার দাও, এই ব্যক্তির শরীরে পিত্ত প্রকোপ আছে, অতএব ইহাকে পিত্তনাশক আহার দাও ইত্যাদি বিষয় কাল লইয়া বিচার্য্য। আর শীতকালে অগ্নি প্রবল হয় বলিয়া অধিক আহার হিতকর, গ্রীষ্মকালে অগ্নি দুর্ব্বল হয় বলিয়া অল্প আহার হিতকর—ইত্যাদি বিষয় ঋতু সাত্ম্য লইয়া বিচার করিতে হয়।

উপযোগ সংস্থা—অর্থাৎ খাদ্যাদি প্রয়োগের নিয়ম, ইহা জীর্ণ লক্ষণকে অপেক্ষা করে। এই ব্যক্তির ভুক্ত অন্ন জীর্ণ হইয়াছে—অতএব ইহাকে পুনরায় আহার দাও, এই ব্যক্তির ভুক্ত অন্ন জীর্ণ হয় নাই—সুতরাং ইহাকে পুনরায় আহার দেওয়া যাইতে পারে না—ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করিয়া খাদ্য উপযোগ করিতে হয়।

উপযোক্তা—যে ব্যক্তি আহার করে তাহাকে উপযোক্তা বলে। যেরূপ আহার দ্বারা যে ব্যক্তি সর্ব্ব ঋতুতেই ভাল থাকে—তাহাকে সেইরূপ আহারই সকল সময়ে দিতে হয়।

এই সমস্ত আহার-বিধির বিশেষ ভাব অনুসারে শুভ বা অশুভ ফল ঘটিয়া থাকে। এই সকল বিষয় বুঝিয়া হিতকর উপায় অবলম্বন করিবে। মোহ বা প্রমাদবশতঃ কখনও

আপাত প্রিয় কিন্তু পরিণামে অহিতকর ও অসুখ জনক আহার করিবে না।

নিম্নলিখিত আহার-বিধি সুস্থ ব্যক্তির পক্ষে এবং কোন কোন আতুরের পক্ষে হিতকর। যথা, উষ্ণ, স্নিগ্ধ, মাত্রাবৎ, পূর্ব্বাহার জীর্ণ হইলে, বীর্য্য বিরুদ্ধ নহে এমন দ্রব্য, ইষ্টদেশে ইষ্ট উপকরণ যুক্ত, নাতি দ্রুত, নাতি বিলম্বিত-ভাবে, না কথা কহিতে, না হাসিতে হাসিতে তন্মনা হইয়া এবং আপনার অবস্থা বিবেচনা করিয়া ভোজন করিবে।

উষ্ণ খাদ্য আহার করিবে। উষ্ণদ্রব্য আহার করিতে ভাল লাগে, ইহা জঠরাগ্নি উদ্দীপিত করে, শীঘ্র পরিপাক পায়, শ্লেষ্মাকে শুষ্ক করে। এই জন্য উষ্ণ খাদ্য আহার করা উচিত। কিন্তু এস্থলে উষ্ণ বলিতে অত্যুষ্ণ নহে, সুখোষ্ণ অর্থাৎ যেরূপ উষ্ণদ্রব্য খাইতে সুখজনক।

স্নিগ্ধ (ঘৃত তৈলাদি সংযুক্ত) দ্রব্য আহার করিতে ভাল লাগে, অগ্নিকে উদ্দীপিত করে, শীঘ্র পরিপাক পায়, বায়ুর অনুলোম করে, শরীর পুষ্ট ও দৃঢ় করে, বল বৃদ্ধি করে ও বর্ণের প্রসন্নতা সম্পাদন করে। এই জন্য স্নিগ্ধ দ্রব্য আহার করা উচিত।

মাত্রাবৎ অর্থাৎ পরিমিত মাত্রায় ভোজন করিলে তাহা বায়ু, পিত্ত ও কফকে পীড়িত না করিয়া আয়ুরই বৃদ্ধি সাধন করে, ইহা সহজে গুহ্য নাড়ীতে উপস্থিত হয়, জঠরাগ্নিকে দুর্ব্বল করে না এবং অক্লেশে পরিপাক পায়। এইজন্য পরিমিত মাত্রায় ভোজন করা উচিত। পরিমিত মাত্রা কি তাহা পরে লিখিত হইবে।

(ক্রমশঃ)

সন্ন্যাসীর হাতে সোণা প্রস্তত।

—০:০—

[রসায়ন-তত্ত্ব]

তান্ত্রিক যুগে—পিত্তল আবিষ্কার।

আমরা উপকথায় শুনিয়া আসিতেছি, সেকালে অনেক সন্ন্যাসীই স্বর্ণ প্রস্তত করিতে পারিতেন। ভক্তিভরে সাধু সেবা করিয়া দুঃস্থ—গৃহস্থ, কৃত-সুবর্ণের প্রসাদে সম্পন্ন হইয়া উঠিতেন। এখনও অনেকের বিশ্বাস, সন্ন্যাসীরা মনে করিলে স্বর্ণ প্রস্তত করিতে পারেন। তবে, তাঁহারা যাহাকে-তাহাকে স্বর্ণের প্রস্তত প্রণালী শিখাইতে চাহেন না। এই বিশ্বাসে এদেশের বহুলোকের সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে। আমরা এমনও শুনিয়াছি—জুয়াচোরেরা সন্ন্যাসীর বেশে পল্লীবধূর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া, রূপার মুদ্রাকে স্বর্ণে পরিণত করিবার প্রলোভন দেখাইয়া গৃহস্থের যথাসর্ব্বস্ব লইয়া চম্পট দিয়াছে। সংবাদপত্রেও মাঝে মাঝে এইরূপ বুজরুকির কথা শুনিতে পাওয়া যায়। সরল-প্রাণ হিন্দু—চিরদিন সাধু ভক্ত, সে ধর্ম্ম-বিশ্বাসে সাধু অসাধু চিনিতে পারে না। বাটীতে সন্ন্যাসী থাকিলে সে

কৃতার্থ হয়, অতিথিকে দেবতার মত পূজা করে, ঘরের কথা, মনের কথা অকপটে খুলিয়া বলে। শেষে প্রবঞ্চকের হাতে পড়িয়া সর্ব্বস্বান্ত হইয়া, হাহাকার করিতে থাকে।

সাধু সন্ন্যাসীরা যে স্বর্ণ প্রস্তুত করিতে পারে—হিন্দুর মনে এ বিশ্বাস কেমন করিয়া জন্মিল? এ বিশ্বাসের মূলে কি কোনও সত্য নাই? ইহা কি কেবল গল্প কথা? না, তাহা হইতেই পারে না। হয়ত কোনও ভস্ম-ধূসর সন্ন্যাসী—কোন্ সুদূর অতীতে, এই স্বর্ণ-ভূমি ভারতে একদিন সত্য সত্যই রাসায়ণিক উপায়ে স্বর্ণ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। সে ঘটনা গল্পে-গাথায় চিরজীবী হইয়া, ভারতের জন সমাজে পরিচিত হইয়া পড়িয়াছিল। হিন্দু এখনও তাহা ভুলিতে পারে নাই। এখনও সে বিশ্বাস করে,—দুর্গম-বন-কান্তারে, দুরারোহ অচল শিখরে, এখনও সেরূপ মহাপুরুষের অভাব নাই।

গল্পের কথা ছাড়িয়া দিই। "ইন্দ্রজাল" "কক্ষপুট" "উড্ডীশ" "তন্ত্র" প্রভৃতি গ্রন্থেও আমরা স্বর্ণ প্রস্তুতের প্রকরণ দেখিতে পাই। তান্ত্রিকযুগের যোগী ও সিদ্ধপুরুষগণ—নাগ খর্পর জশদ প্রভৃতি স্বল্পমূল্যের নিকৃষ্ট ধাতুকে, নানাদ্রব্যের সংমিশ্রণে—উৎকৃষ্ট ধাতুতে পরিণত করিতে পারিতেন। তাঁহাদের রাসায়নিক কৌশলে—তাম্র স্বর্ণকান্তি ধারণ করিত। জশদ-বঙ্গ—রৌপ্যে রূপান্তরিত হইত। আমরা সে সকল পুটের অর্থ বুঝিনা, উপাদান চিনিনা, যৌগিক পদার্থের অর্থও জানিনা। তন্ত্র এখন আমাদের কাছে, প্রহেলিকা, আগম্ শাস্ত্র পাগলের প্রলাপ।

হউক্ প্রলাপ, হউক মিথ্যা, আজ আমি তান্ত্রিক যুগের সেই স্বর্ণপ্রকরণ লিপিবদ্ধ করিব। ইহাতে আর কোনও উপকার না হউক, সেকালের রাসায়ণিক অনুসন্ধিৎসার যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় ত জানা যাইবে। এ আত্ম বিস্মৃত জাতির পক্ষে—তাহাই যে পরম লাভ।

অনেক তন্ত্রেই স্বর্ণ ও রৌপ্য প্রস্তুতের জন্য "রসায়ন প্রকরণ" লিপিবদ্ধ হইয়াছে। অধিকন্তু বলা হইয়াছে—সিদ্ধপুরুষ ভিন্ন রসায়ন কার্য্যে অপরের অধিকার নাই। পাঠকগণের কৌতূহল নিবারণের জন্য, আমরা তন্ত্রোক্ত "রসায়ন বিধি" নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

তাম্রং পলমিতং গ্রাহ্যং তদর্দ্ধে বঙ্গ-খর্পরৌ।
কুশারি পত্র রসেন মর্দ্দয়েৎ প্রহর দ্বয়ং॥
ঊর্দ্ধাধো লবণং দত্ত্বা স্থাল্যাগর্ভেনিধাপয়েৎ।
অজা শকৃত্তুষাগ্নিনা পচেৎ কুণ্ডে দিনত্রয়ং।
স্বাঙ্গশীতং ক্ষিপেৎ দুগ্ধে তত্তাম্রং স্বর্ণতাং ব্রজেৎ।

—সিদ্ধান্ত। ১১শ অঃ

৮ তোলা তাম্র, ৪ তোলা রাং ও দস্তার সহিত মিশ্রিত করিয়া, কুশারি-পত্র রসে দুই প্রহর মর্দ্দন করিবে। একটী হাঁড়ীর মধ্যে উক্ত মিশ্রিত দ্রব্য রাখিয়া, ঊর্দ্ধ ও অধোদিকে লবণ চাপা দিবে। পরে—ছাগ-বিষ্ঠা ও তুষাগ্নি-পূর্ণ গর্ত্তে—উক্ত ভাণ্ড তিন দিন ধরিয়া পাক করিবে। ভাণ্ড শীতল হইলে, ভাণ্ড মধ্যস্থ পদার্থ—দুগ্ধে নিক্ষেপ করিবে। ইহাতে ঐ তাম্র স্বর্ণ হইবে।

প্রক্রিয়া কঠিন নহে। কিন্তু কুশারি পত্র কি? তন্ত্রে কুশারি বৃক্ষের বর্ণনা যেটুকু পাওয়া যায়, তাহাতে বুঝা যায়—ঐ বৃক্ষ ঠিক ছোলাগাছের ন্যায়। বৃক্ষের তলদেশের মৃত্তিকা ঠিক্ ঘৃতাক্তের মত বোধ হয়। আমরা এরূপ বৃক্ষ দেখি নাই। কোথায় পাওয়া যায় তাহাও জানি না।

সূক্ষ্মাণি তাম্র পত্রাণি কৃত্বা চাগ্নৌ প্রতাপয়েৎ।
রুদন্তী-মূল রসেচ নিষিঞ্চেৎ বার পঞ্চকং।
চুল্ল্যাং দৃঢ়তরে পাত্রে স্থাপয়িত্বা চ শুল্বকং।
পাদাংশং যশদং দত্বা লোহদার্ব্ব্যা প্রচালয়েৎ।
যামৈকেন ভবেত্তাম্রং স্নিগ্ধং কাঞ্চন সন্নিভং॥

ক্রিয়োড্ডীশ। ৭ম পটল

তাম্রের সূক্ষ্ম পত্র প্রস্তুত করিয়া তাহাকে অগ্নিতে উত্তপ্ত করিবে। উত্তপ্ত হইলে, রুদন্তী মূলের রসে ফেলিবে। এইরূপে ৫ বার তাম্রকে তপ্ত করিয়া উক্ত রসে ফেলিতে হইবে। তার-পর, প্রজ্জ্বলিত অগ্নির উপর লৌহ পাত্র রাখিয়া তাহাতে ঐ তাম্রপত্র গুলি দিবে এবং তাম্রের চতুর্থাংশ দস্তা দিয়া লৌহদণ্ডের দ্বারা মর্দ্দন করিতে থাকিবে। এক প্রহরের মধ্যেই উক্ত তাম্র কাঞ্চন তুল্য হইবে।

এ প্রক্রিয়াটীও বেশ সরল। কিন্তু ইহাতেও একটু গোলোযোগ আছে—রুদন্তীর মূল দুষ্প্রাপ্য। রুদন্তী একপ্রকার ক্ষুপজাতীয় বৃক্ষ—ইহার পত্রও "চণকপত্র নিভং" অর্থাৎ ছোলাগাছের পাতার মত। অধিকন্তু এই বৃক্ষের "পত্রে পত্রেচ দৃশ্যতে তোয়বিন্দু সমন্বিতং"। পাতায় পাতায় জল বিন্দুর মত পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়। এক্ষণে আমাদের জিজ্ঞাস্য—কুশারি ও রুদন্তী কি একই বৃক্ষ? রুদন্তীর জন্ম-বৃত্তান্ত বড় অদ্ভুত। একদা কোন কারণে পার্ব্বতীর একগাছি কেশ ছিঁড়িয়া মাটিতে পড়িয়াছিল। সেই কেশ ক্রমে বৃক্ষরূপে পরিণত হয়। এই বৃক্ষ জন্ম-গ্রহণ করিয়াই দেখেন,—পৃথিবীর নরনারী রোগে ও জরায় জীর্ণ! জীবের এই কষ্ট দেখিয়া বৃক্ষ কাঁদিয়া ফেলিল—

"রোদিতীব জনান্ পূর্ব্বান্ জরয়া জর্জ্জরী-
কৃতান্।।
ময়ি ভুবি বিদ্যমানে কথং ক্লিশ্যন্তি মানবাঃ॥

আমি পৃথিবীতে বিদ্যমান থাকিতে মানুষ কেন রোগে কষ্ট পাইতেছে? এই বৃথা জীবের দুঃখ দেখিয়া, জাত মাত্রই রোদন করিয়াছিল, এই জন্যই ইহার নাম রুদন্তী। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রেও রুদন্তীর নামোল্লেখ আছে। রুদন্তী—জরা অর্থাৎ অকাল বার্দ্ধক্য নাশক, অত্যন্ত বলকারক, কান্তি-মেধা ও আয়ুর্ব্বর্দ্ধক। আমরা এ গাছ অদ্যাপি দেখি নাই। বোধ হয় সোম বৃক্ষের মত, ইহা ধরণী হইতে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

গোমূত্রং হরিতালঞ্চ গন্ধকঞ্চ মনঃশিলা।
সমং সমং গৃহীত্বা তু যাবৎ শুষ্যাতি পেষয়েৎ।
একাদশ দিনং যাবৎ যত্নেন রক্ষয়েৎ শুচি।
মন্ত্রেণ ধূপ দীপাদি নৈবেদ্যৈ দুগ্ধ মিশ্রিতৈঃ।

মন্ত্রস্ত—ওঁ নমো হরিহরায় রসায়ন, সিদ্ধিং কুরু কুরু স্বাহা। অযুত জপেন সিদ্ধিঃ।

* * * * *

তদ্বটীং গোলকং কৃত্বা বস্ত্রেণ বেষ্টয়েৎ পুনঃ।
মৃত্তিকাং লেপয়ে ত্তস্য ছায়া শুষ্কন্তু কারয়েৎ।
মহাকুণ্ডে বিনিক্ষিপ্তে পলাশ কাষ্ঠ বহ্নিণা।
জ্বালায় দগ্ধ যামস্তু —
তদ্ভস্ম জায়তে সিদ্ধি র্ব্বিদ্ধি সিদ্ধি সমাকুলং।
তাম্র পাত্রে অগ্নি মধ্যে বিন্দুমাত্রং নিযচ্ছতি।
তৎক্ষণাজ্জায়তে স্বর্ণং নান্যথা শঙ্করোদিতং।
দাতব্যং গুরু ভক্তায় ন দদ্যাৎ দুষ্ট মানসে।
গোপ্যং গোপ্যং মহাগোপ্য দেবানামপি দুর্ল্লভং।
সিদ্ধ পীঠে ভবেৎ সিদ্ধি গায়ত্রী লক্ষ র্জাপনৈঃ॥

* * *

* দত্তাত্রেয়ঃ

"মহাদেব দত্তাত্রেয়ের নিকট রসায়ন বলিতেছেন; গোমূত্র, হরিতাল, গন্ধক ও মনঃ-শিলা, এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া খলে

পেষণ করিবে। যাবৎ না শুষ্ক হয়, তাবৎকাল উত্তমরূপ পেষণ করিয়া, যত্ন পূর্ব্বক বিশুদ্ধ স্থানে রাখিয়া দিবে। পরে একাদশ দিবস গত হইলে, ধূপ দীপ ও দুগ্ধ মিশ্রিত নৈবেদ্যাদি নানাবিধ উপচারে যক্ষিণীর পূজা করিবে। অনন্তর, ওঁ নমো * * এই মন্ত্র দশ সহস্র জপ করিয়া সিদ্ধি হইলে পূর্ব্বপিষ্ট দ্রব্য গোলাকার করিয়া বস্ত্রদ্বারা বেষ্টন করিবে। পরে মৃত্তিকার দ্বারা লেপ দিয়া গর্ত্ত মধ্যে পলাশ কাষ্ঠ নিক্ষেপ করিয়া তদুপরি ঐ গোলক রাখিবে এবং উপরে পলাশ কাষ্ঠ দ্বারা অষ্ট প্রহর পর্য্যন্ত জ্বাল দিবে। তৎপরে ঐ ভস্ম সংগ্রহ করিয়া রাখিবে। অনন্তর এক খণ্ড তাম্রপাত্র অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া তাহাতে ঐ ভস্ম একবিন্দু দিলে তৎক্ষণাৎ ঐ তাম্র পাত্র স্বর্ণ হইবে। ইহা মহাদেবের উক্তি, কদাচ ইহার অন্যথা হয় না। ইহা গুরুভক্তকে দিবে, সন্দিগ্ধমনা অবিশ্বাসীকে দিবে না। এই রসায়ন-প্রক্রিয়া করিবার পূর্ব্বে কোন সিদ্ধ-ক্ষেত্রে বসিয়া লক্ষ সংখ্যক গায়ত্রী জপ করিতে হইবে।”

—রসিক মোহন চট্টোপাধ্যায়ের অনুবাদ।

আনীয় বহু যত্নেন সম্বলং তোলকদ্বয়ং।
বসুরাগ্নং শিবঞ্চাগ্নং মায়াবিন্দু সমন্বিতং॥
বীজত্রয়ঞ্চাষ্ট শতং প্রজপেৎ সম্বলোপরি।
অশীতি তোলক মানং কৃষ্ণধেনু সমুদ্ভবং।
দুগ্ধ মানীয় যত্নেন চাষ্টোত্তর শতং জপেৎ॥
বস্ত্রযুক্তেন সূত্রেন দুগ্ধ মধ্যে বিনিঃক্ষিপেৎ।
উত্তাপং জ্বালয়দ্ধীমান্ মন্দ মন্দেন বহ্নিণা।
রিপুর্ব্বেদার্দ্ধ পর্য্যন্ত মর্দ্ধ শেষং ভবেৎ যদি।
তদৈবোত্তোল্য তদ্দ্রব্যং দগ্ধং তোয়ে বিনিক্ষিপেৎ
ততঃ পরীক্ষা কর্ত্তব্যা।
নির্ধূমং পাবকে দ্রব্যং দৃষ্ট্বা উত্থাপ্য যত্নতঃ।
তত্রৈব প্রজপেন্মন্ত্রং সর্ব্বমঙ্গল-মাত্মকং॥
সার্দ্ধেন তোলকং তাম্রং বহ্নি মধ্যে বিনিক্ষিপেৎ।
যথা বহ্নিস্তথা তাম্র দৃষ্ট্বা উত্থাপ্য যত্নতঃ॥
গুঞ্জা প্রমাণং তদ্দ্রব্যং, সত্যং সত্যং হি শঙ্করি।
রৌপ্যং ভবতি তদ্দ্রব্যং, নান্যথা শঙ্করোদিতং॥

দত্তাত্রেয়। ১৩শ পটলঃ।

“দুই তোলা পরিমাণ সম্বল আনিয়া তাহার উপরে ওঁ হুং হ্রীং এই ত্র্যক্ষর মন্ত্র আটশত বার জপ করিয়া, কৃষ্ণবর্ণ গাভীর দুগ্ধ ৮০ তোলা আনিয়া তাহার উপরে উক্ত মন্ত্র আটশত বার জপ করিবে। তৎপরে ঐ সম্বল বস্ত্রখণ্ডে পুটলী করিয়া তাহাতে সূত্র বন্ধন দ্বারা উক্ত দুগ্ধ মধ্যে নিক্ষেপ করত মন্দ মন্দ অগ্নিতে জ্বাল দিবে। যৎকালে ঐ দুগ্ধের অর্দ্ধ অর্থাৎ ৪০ তোলা শেষ হইয়া ৪০ তোলা মাত্র অবশিষ্ট থাকিবে, তৎকালে ঐ সম্বলের পুটলী দুগ্ধ হইতে উঠাইয়া জল মধ্যে নিক্ষেপ করিলে, যদি তাহা হইতে ধূম নির্গত না হয় তবেই সম্বল যথার্থ কার্য্যার্হ হইয়াছে জানিবে। পরে ঐ সম্বলের উপরে পূর্ব্বলিখিত মন্ত্র অষ্ট সহস্র জপ করিবে। অনন্তর অর্দ্ধ তোলা পরিমিত তাম্র অগ্নিতে দগ্ধ করিবে, যখন ঐ তাম্র অগ্নিবৎ হইবে, তখন উহা অগ্নি হইতে উঠাইয়া তাহাতে একগুঞ্জা পরিমিত উক্ত সম্বল দিলেই তৎক্ষণাৎ রূপা হইবে।”

রসিক মোহন চট্টোপাধ্যায়ের অনুবাদ।

“কৃষ্ণসর্প মেকং গৃহীত্বা তস্য মুখে শিববীর্য্যং দূরয়িত্বা সর্পস্য মুখং শুদঞ্চ বদ্ধা নূতন মৃন্ময় স্থালী মধ্যে সংস্থাপ্য স্থালীমুখং মৃদাদিনা সংলিপ্য নির্জ্জন স্থানে প্রাতরারভ্য পুনঃ। প্রাতর্যাবৎ বহ্নিনা জ্বালং দদ্যাৎ। ততঃ শুভক্ষণে স্থালীমুখ মুদ্ঘাত্য সর্পভস্মঃ বিহায় শিববীর্য্যং গৃহ্নীয়াৎ। তত স্তোলকমিতং তাম্রং গালয়িত্বা তস্মিন্ গলিত তাম্রে রক্তিক মাত্রং তচ্ছিববীর্য্যং

দদ্যাৎ। তেন তৎক্ষণাদেব তত্তাম্রং সুবর্ণী ভূতং জাতমিতি।”

রসিক চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত তন্ত্র সংগ্রহ।

ইহার বঙ্গানুবাদ নিষ্প্রয়োজন। আমি কেবল দেখাইতে চাই—দ্রব্যগুণের প্রভাবেই হউক আর মন্ত্র তন্ত্রের মহিমাতেই হউক—মানুষের চেষ্টায় যে নিকৃষ্ট ধাতু হইতে উৎকৃষ্ট ধাতু উৎপন্ন হইতে পারে, সে কালের লোকের ইহা দৃঢ় ধারণা ছিল। সুতরাং রাতারাতি বড়লোক হইবার আশায় গৃহস্থগণ সাধু সন্ন্যাসীর শরণাগত হইতেন।

এক্ষণে কথা হইতেছে এই—বাস্তবিক কি সাধু সন্ন্যাসীরা স্বর্ণ প্রস্তুত করিতে পারিতেন? বা সরল প্রাণ গৃহস্থকে ভুলাইবার জন্য ইহা তাঁহাদের স্বানুষ্ঠিত ইন্দ্রজাল? এ প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইলে, আমাদিগকে আরও একটু অগ্রসর হইতে হইবে। তন্ত্র ছাড়িয়া বিজ্ঞানময় আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র অনুসন্ধান করিতে হইবে। আমরা মন্ত্রের অর্থ বুঝি না, তন্ত্রের মহিমা জানি না, সুতরাং তন্ত্রের প্রভাব আমাদের মত মহামূর্খের কাছে, অনেক দিন হইতেই ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু দ্রব্যের বীর্য্য-বিপাক-প্রভাব, আমরা ত অস্বীকার করিতে পারি না। আমাদের জীবন্ত বিজ্ঞান আয়ুর্ব্বেদ দ্রব্যের গুণ অনুসন্ধান করিয়া আমাদের সভ্যতার অতীত সাক্ষীরূপে, এখনও দণ্ডায়মান। এখন দেখা যাউক—আয়ুর্ব্বেদে স্বর্ণ প্রস্তুত প্রক্রিয়া সমর্থিত হইয়াছে কিনা?

আয়ুর্ব্বেদের চরক ও সুশ্রুত নামক সংহিতাদ্বয় অতি প্রাচীন গ্রন্থ। এই দুই গ্রন্থে কৃত্রিম উপায়ে স্বর্ণ প্রস্তুত—প্রক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায় না।

বৌদ্ধ নাগার্জ্জুন ৭ম শতাব্দিতে—যে রস রত্নাকর নামক চিকিৎসা গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাহাতে আমরা একটী শ্লোক দেখিতে পাই—

কি মত্র চিত্রং রসকো রসেন
* * * * * ভাবিতঃ।
ক্রমেন কৃত্বাম্বু ধরেণ রঞ্জিতঃ
করোতি শুল্বং ত্রিপুটেন কাঞ্চনং॥

ইহার অর্থ—ইহাতে আশ্চর্য্য আর কি আছে? রসক নামক রসের দ্বারা ভাবিত তাম্র রঞ্জিত হইয়া, তিন পুটে কাঞ্চনত্ব লাভ করে। ইহার দ্বারা বেশ বুঝা যায়—তাম্র যে কাঞ্চনে পরিণত হইতে পারে, রসরত্নাকর-রচয়িতার তাহা অজ্ঞাত ছিল না। আর রসক নামক পদার্থের সংযোগেই তাম্র সুবর্ণ হইয়া যায়। এক্ষণে দেখা যাউক এই রসক কোন পদার্থ?

ভিক্ষু-গোবিন্দের “রস হৃদয়” পাঠে আমরা জানিতে পারি—“রসক” অষ্টরসের মধ্যে একটী রস। “রসার্ণব” নামক গ্রন্থকার রসকের আর একটি নাম দিয়াছেন—“খর্পর”। কিন্তু খর্পর যে কোন্ পদার্থ, এ গ্রন্থে তাহা বুঝিবার উপায় নাই। “রসক” অষ্ট রসের অন্যতম। যথা—

“বৈক্রান্ত-কান্ত সস্যক-মাক্ষিক-বিমলাদ্রি দরদ রসকশ্চ।
অষ্টৌ রসাস্তথৈষাং সত্ত্বানি রসায়ানি স্যুঃ॥

হিন্দু কেমিষ্ট্রী, ২য় ভাগ, ৩৪ পৃঃ।

মতান্তরে অষ্ট মহারস, যথা—

মাক্ষিকং বিমলং শৈলং চপলো রসকস্তথা।
সস্যকো দরদশ্চৈব স্রোতোহঞ্জনমথাষ্টকম্।
—রসার্ণব।

এই অষ্ট রসের অন্যতম রস “রসক” যে তাম্রাদি ধাতুকে সুবর্ণে পরিণত করিতে পারে তাহার প্রমাণ—

"তীক্ষ্ণং নাগং তথা শুল্বং রসকেন তু রঞ্জয়েৎ।
সমস্তং জায়তে হেম কুষ্মাণ্ড কুসুম প্রভং॥

হিন্দু কেমিষ্ট্রী, ১ম ভাঃ। ৮ পৃঃ।

তীক্ষ্ণ (লৌহ) নাগ (সীসা) শুল্ব (তাম্র) রসক দ্বারা রঞ্জিত হইলে, কুষ্মাণ্ড কুসুমের বর্ণযুক্ত স্বর্ণ হইয়া পড়ে।

"রস প্রকাশ সুধাকর" একখানি রস-গ্রন্থ, ইহার রচয়িতার নাম যশোধর। এই গ্রন্থে রসক ও খর্পরের শুদ্ধি প্রণালী সরল ভাষায় লিখিত হইয়াছে। গ্রন্থকার বলিয়াছেন—

খর্পরং রেচিতং শুদ্ধং স্থাপিতং নরমূত্রকে।
রঞ্জায়েন্মাস মেকং হি তাম্রং স্বর্ণ প্রভং বরং॥

হিঃ কেঃ ২য়, ৬০ পৃঃ।

অর্থাৎ নরমূত্রে স্থাপিত হইবে, খর্পর বিশুদ্ধ হয়। সেই খর্পর একমাসে তাম্রকে স্বর্ণ বর্ণে রঞ্জিত করে।

রসক যে তাম্রকে স্বর্ণ বর্ণে রঞ্জিত করিবার শক্তি ধরে, নাগার্জ্জুন রচিত "রসরত্ন সমুচ্চয়" গ্রন্থে ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। বাহুল্য ভয়ে, তাহা আর উদ্ধৃত করিলাম না। এই সকল গ্রন্থের মতামত দেখিয়া, রসক ও খর্পরকে অভিন্ন বলিয়াই আমার মনে হইতেছে। বিশেষতঃ "রুদ্র যামন তন্ত্রে"র ধাতু মঞ্জরী পড়িয়া আমার আরও বিশ্বাস হইয়াছে—"খর্পর" ও "রসক" অভিন্ন পদার্থ। "ধাতুমঞ্জরীতে" যে পিত্তল প্রস্তুতের প্রক্রিয়া লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহাতে দেখিতে পাই—

শুদ্ধ খর্পর সংযোগে জায়তে পিত্তল শুভং।"

হিঃ কেঃ ১ম, ৫২ পৃষ্ঠা।

অর্থাৎ তাম্র ও খর্পর সংযোগে উত্তম পিত্তল প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই গ্রন্থের মতে—"খর্পর' অর্থে জশদ। জশদ দস্তা ধাতু। খর্পরের পর্য্যায়ে রসক নামও পাওয়া যায়। যথা,—

জাসত্ব চ জরাতীতংরাজতং যশদায়কং।
রূপ্য ভ্রাতা বরীয়শ্চ ত্রোটকং কোমলং লঘু॥
চর্ম্মকং খর্পরং চৈব রসকং রস বর্দ্ধকং।
সদা পথ্য বলোপেতং পীতরাগং সুভস্মকং।
এতত্ত্ব খর্পর নাম কার্য্য কর্ম্মসু সিদ্ধিদং॥

হিঃ কেঃ ২য়, পৃঃ ১০৬ ও ৭।

জাসত্ব, জরাতীত (যাহাতে জরা অর্থাৎ মরিচা ধরেনা) রাজত (রৌপ্য সদৃশ) যশদায়ক, রূপ্য ভ্রাতা, বরীয়, ত্রোট্রক, কোমল, লঘু চর্ম্মক, খর্পর রসক, রসবর্দ্ধক, সদাপথ্য, বলোপেত, পীতরাগ (পীতবর্ণে রঞ্জিত কারী) সুভস্মক (সহজে ভস্ম করা যায়)—খর্পরের এই সকল নাম।

আমার বিশ্বাস—সেকালের তান্ত্রিকগণ তাম্র ও দস্তা সংযোগে যে উত্তম পিত্তল প্রস্তুত করিতেন, সাধারণে তাহাকেই স্বর্ণ বলিয়া বিশ্বাস করিত। ১৭৮০ খৃঃ পর্য্যন্ত তাম্র রসক (Calumine) ও অঙ্গার মিশ্রিত করিয়া য়ুরোপের রাসায়নিকগণও পিত্তল প্রস্তুত করিতেন। কিন্তু ইহার বহুকাল পূর্ব্বেই ভারতে তাম্র ও জশদ সংযোগে পিতল প্রস্তুত প্রক্রিয়া প্রচলিত ছিল। পিতলের আদরও স্বর্ণের অপেক্ষা ন্যূন ছিল না।

তাঁহারা স্বর্ণের উৎপত্তি তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। অর্থাৎ স্বর্ণ তিন প্রকারে উৎপন্ন হয়, ইহাই তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল। যথা ;—

রসজং ক্ষেত্রজং চৈব লোহ সঙ্করজং তথা।
ত্রিবিধং জায়তে হেম চতুর্থং লোপলভ্য তে॥

হিঃ কেঃ (রসার্ণব) ১ম, ১৪ পৃঃ।

স্বর্ণ ত্রিবিধ উপায়ে প্রাপ্ত হওয়া যায়। (১) রস

ক্রিয়া দ্বারা (২) ভূমি হইতে, (৩) ধাতু সংমিশ্রণ হইতে। এই তিন প্রকার ছাড়া আর কোন উপায়ে স্বর্ণ প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। এই ধাতু সংমিশ্রণ জাত স্বর্ণকে আমি পিত্তল নামে অভিহিত করিতেছি। আমার বিশ্বাস—তান্ত্রিক সন্ন্যাসীরা রসক বা খর্পর সংযোগে যে ধাতু প্রস্তুত করিতেন—তাহার বর্ণ পীতবর্ণ হইত। এবং তাহাই স্বর্ণ নামে কথিত হইত। স্বর্ণের মত বর্ণ হইলেই—তাহাকে স্বর্ণ বলা চলিত। কবিরাজী মতে স্বর্ণবঙ্গ নামক একটী ঔষধ আছে, উহাতে স্বর্ণের সংস্পর্শ নাই, উহার উপাদান রাং, পারদ ও লবণ। কেবল স্বর্ণের বর্ণ বিশিষ্ট বলিয়াই উক্ত ঔষধের নাম "স্বর্ণ বঙ্গ" হইয়াছে। সেইরূপ তাম্র হইতে জাত পিত্তলকে তাহার উজ্জল বর্ণের জন্য—তান্ত্রিকগণ স্বর্ণের সম্ভ্রম প্রদান করিতেন। ইহাই আমার বক্তব্য। তবে—মন্ত্রের প্রভাবে তাম্র যে স্বর্ণে পরিণত হইতে পারে না,—এ কথা আমি বলিতেছিনা। কেননা, মন্ত্রের অসীম শক্তি—সে শক্তি আমাদের মত সীমা-বদ্ধ-জ্ঞান-মানবের সমালোচনার বহির্ভূত।

গ্রীক্ দার্শনিক অরিষ্টটনের বর্ণনায় দেখা যায়—কৃষ্ণ সাগরের তীরে একরকম মাটী পাওয়া যাইত। ঐ মৃত্তিকার সহিত তাম্রকে গালাইলে তাহার রক্তবর্ণ হরিদ্রাবর্ণে পরিণত হইত। এই মৃত্তিকার নাম—"কাদমিয়া"। এই কাদমিয়ায় রসকের অংশ বিদ্যমান ছিল। তাই পারসিক আলকেমিষ্ট উহাকে সফেদ তুতিয়া বলিয়াছেন।

বেদে পিত্তলের নাম পাওয়া যায় না। স্বর্ণের নাম পাওয়া যায়। কিন্তু অথর্ব্ব বেদে রয়ি নামক ধাতুর উল্লেখ আছে। যথা—"রয়িমুরুং পিশঙ্গ সদৃশন্"। সায়ণ রয়িকে স্বর্ণ নামে অভিহিত করিয়াছেন। আমার বিশ্বাস—এই রয়িই পিত্তল। চরকে পিত্তলের নাম হইয়াছে—"রীতি"। বেদে হরিৎ শব্দে—পীতবর্ণ বুঝায়। সুতরাং বেদের হরিতায়স্ শব্দও পিত্তলের নামান্তর হইতে পারে। "হরিতায়স্ সংক্ষিপ্ত হইয়া হয়ত হরিতী হইয়াছিল, শেষে চরকের সময়ে "হরিতীর" আদিবর্ণ লুপ্ত হইয়া তাহা "রীতি নাম পাইয়া থাকিবে। কিন্তু এ সমস্ত অনুমানের কথা, নিশ্চয় করিয়া কিছু বলা যায় না।*

তীশ চন্দ্র রায় এম, এ।

পরিবর্ত্তনের প্রতিবাদ।

-:o:-

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র রায় মহাশয়—একজন প্রবীণ সাহিত্যিক। বিবিধ মাসিক পত্রে তাঁহার বহু প্রবন্ধ পড়িয়াছি, ছাত্রের মত—তাঁহার প্রবন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য কথা শিখিয়াছি। সম্প্রতি "আয়ুর্ব্বেদ" পত্রে আয়ুর্ব্বেদ সম্বন্ধে তাঁহাকে আলোচনা করিতে দেখিয়া

---

* এই প্রবন্ধের রচনাকালে, ডাঃ পি, সি, রায়ের "হিন্দু কেমিষ্ট্রী,"কবিরাজ ব্রজবল্লভ রায়ের "আয়ুর্ব্বেদের ইতিহাস" এবং তারাপদ মুখোপাধ্যায়ের "জনপদ" নামক সন্দর্ভ হইতে যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছি।
—লেখক।

আমার অত্যন্ত আনন্দ হইয়াছে। আনন্দের একমাত্র কারণ—তিনি যোগ্য ব্যক্তি, তাঁহার কাছে আমরা এমন কিছু পাইব, যাহা অন্যত্র দুর্লভ।

"পরিবর্ত্তিত প্রণালীতে আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ প্রস্তুত করা উচিত কি না?"—সতীশ বাবুর লেখনী-প্রসূত সুচিন্তিত সন্দর্ভ। সাধারণের অনুধাবন যোগ্য, কবিরাজ মহাশয়দের পক্ষেও প্রবন্ধটী অবশ্য পাঠ্য। কিন্তু দুঃখের বিষয়—উক্ত প্রবন্ধটী মনোযোগের সহিত পড়িয়াও আমি অনেক স্থলে তাঁহার সহিত একমত হইতে পারি নাই। হইতে পারে—ইহা আমার অজ্ঞতা, আমি হয়ত তাঁহার কথা ঠিক বুঝিতে পারি নাই। তথাপি,—কর্ত্তব্যের অনুরোধে তাঁহার দুই একটী মন্তব্যের প্রতিবাদ করিব। আশা করি সে জন্য সতীশ বাবু আমাকে ক্ষমা করিবেন।

সতীশ বাবুর প্রশ্ন—কবিরাজী ঔষধ প্রস্তুতের প্রণালী—ডাক্তারী মতে পরিবর্ত্তন করা উচিত কি না? আমার উত্তর—সর্ব্বত্র নহে। কেন নহে, তাহা বলিতে গেলে, প্রথমেই আমাদের দেখা উচিত—কবিরাজী ঔষধ প্রস্তুত-প্রক্রিয়ার অনুরূপ-প্রক্রিয়া ডাক্তারী মতেও আছে কি না? অবশ্য সতীশ বাবু ইহার বিচার করিয়া দেখিয়াছেন। আমিও দেখিয়াছি—কবিরাজী মতে যাহার নাম "স্বরস",—তাহা ডাক্তারী মতের Sucous বই আর কিছুই নহে। ইহা ভিন্ন—

কবিরাজী	কাথ	ডাক্তারদের	Decoction.
„	হিম	„	Maceration.
„	ফাণ্ট	„	Infusion.
„	চূর্ণ	„	Powder.
„	বটক বটী	„	Pills.
	লেহ	„	Syrups বা Confection.
	তৈল	„	Oils, Ointments.

উভয় মতে পূর্ব্বোক্ত প্রক্রিয়াগুলির অনেকটা মিল দেখিতে পাওয়া যায়। এক্ষণে আমার বক্তব্য—যে প্রক্রিয়া উভয় মতেই অবিকল এক, যেস্থলে সতীশ বাবুর প্রস্তাব আমি সাদরে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত। যেমন, কবিরাজী মতে ফাণ্ট প্রস্তুত করিতে হইলে, উষ্ণ জলে কুট্টিত ঔষধ নিক্ষেপ করিতে হয়। ডাক্তারী মতে Infusion প্রস্তুত-প্রণালীও ঠিক তাই। এখানে ডাক্তারী মতের অনুসরণে আপত্তি হইতে পারে না। কিন্তু আয়ুর্ব্বেদ যেখানে, ঔষধ-বিশেষকে রাত্রে জলে ভিজাইয়া প্রভাতেই তাহাকে গ্রহণ করিবার উপদেশ দিতেছেন, সেই আয়ুর্ব্বেদীয় মতের "হিম" প্রক্রিয়ার সহিত ডাক্তারী মতের Maceration এর প্রক্রিয়ার অনেকটা ঐক্য থাকিলেও যৎকিঞ্চিৎ পার্থক্য বর্ত্তমান। আবার কতকগুলি প্রক্রিয়ায়—কবিরাজী মতে ও ডাক্তারী মতে বিস্তর প্রভেদ পরিলক্ষিত হয়। এরূপ স্থলে, ডাক্তারী প্রক্রিয়ার অনুসারে কবিরাজী ঔষধ প্রস্তুত করা কতদূর সঙ্গত তাহা বলিতে পারি না। ডাক্তারী Liquid Extract, Solid Extract, Tincture প্রভৃতির অনুরূপ প্রক্রিয়া আয়ুর্ব্বেদে আছে বলিয়া মনে হয় না। এরূপ স্থলে ডাক্তারী প্রণালীতে আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ প্রস্তুত করিলে, ঔষধের উপকারিতার তারতম্য হয় না কি? যেখানে প্রক্রিয়া উভয় মতেই এক, সেখানে ঔষধ প্রস্তুতের মূলসূত্র একই হউক, তাহাতে ক্ষতি নাই—বরং লাভ আছে। দৃষ্টান্ত

স্বরূপ "কূটজাবলেহ"কে আমি পাঠকগণের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি।

কুটজত্বক্ তুলাং দ্রোণে জলস্য বিপচেৎ সুধীঃ।
কষায়ং পাদশেষঞ্চ গৃহ্লীয়াদ্ বস্ত্র গালিতং।
ত্রিংশৎ পলং গুড়স্যাত্র দত্ত্বা চ বিপচেৎ পুনঃ।
সান্দ্রত্বমাগতং দৃষ্টা চূর্ণানীমানি দাপয়েৎ।
রসাঞ্জনং মোচরসং ত্রিকটুং ত্রিফলাং তথা ॥
লজ্জালু চিত্রকং, পাঠাং বিল্বমিন্দ্রযবং বচাং।
ভল্লাতকং প্রতিবিষাং বিড়ঙ্গানি চ বালকং।
প্রত্যেকং পলসম্মানং ঘৃতস্য কুড়বং তথা।
সিদ্ধ শীতে ততো দদ্যান্মধুনঃ কুড়বন্তথা ॥

ইহার অর্থ কুড়চীর ছাল ১ তুলা ১ দ্রোণ (৬৪ সের) জলে সিদ্ধ করিবে, ১৬ সের জল থাকিতে নামাইয়া বস্ত্রে ছাঁকিয়া লইবে। ঐ ক্বাথে ৩০ পল পরিমিত গুড় মিশ্রিত করিয়া আবার জ্বাল দিবে। ক্বাথ গাঢ় হইলে নামাইবে।

সতীশ বাবুর মত অনুমোদন করিতে হইলে, এই ঘনত্ব পর্য্যন্তই কূটজাবলেহের পাক শেষ হইত। এবং তাহা হইলে ডাক্তারী Syrup বা Confectionএর সহিত এই কবিরাজী লেহ প্রস্তুত-প্রক্রিয়ার সামঞ্জস্য থাকিত। কিন্তু কুটজ ক্বাথের সিরাপ হইয়া গেলেও, তাহাতে আবার রসাঞ্জনাদি চূর্ণগুলি পক্ক ক্বাথে প্রক্ষেপ দিবার ব্যবস্থা রহিয়াছে এবং তাহার সঙ্গে ঘৃত ও মধু মিশাইবারও উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। যদি ডাক্তারী মতে—কুটজ ক্বাথে গুড় বা চিনী সংযোগে সিরাপ প্রস্তুত করিতে হয়, তবে পাকশেষে চূর্ণ দ্রব্যগুলির সংমিশ্রণ কখনই যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না। এই লেহ-পাকের প্রণালী দেখিলেই বেশ বুঝা যায়—কবিরাজী লেহ এবং ডাক্তারী সিরাপ, উভয়ের পাকে অনেক পার্থক্য আছে। এই চূর্ণ পদার্থের প্রক্ষেপই উভয়কে তফাৎ করিয়া দিয়াছে। কুড়চীর ক্বাথের সিরাপ প্রয়োগ করিলে যে ফল পাওয়া যায়, চূর্ণ পদার্থ মিশ্রিত কুটজাবলেহে তাহার চেয়েও বেশী উপকারিতা দেখা যায়। এরূপ স্থলে, ডাক্তারী সিরাপের প্রক্রিয়ায় কবিরাজী লেহ পাক করা সমীচিন কিনা, সতীশবাবু তাহা ভাবিয়া দেখিবেন কি? আমার বিশ্বাস, ডাক্তারী সিরাপে আর কবিরাজী লেহে আকাশ-পাতাল তফাৎ, উভয় ঔষধ এক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত হইতে পারে না।

আবার কবিরাজী মতের বটিকা, ডাক্তারী মতের pills এর সমান নহে। কবিরাজী বটিকা দ্রব পদার্থ দিয়া মাড়িতে হয়, কতরকম রসের ভাবনা দিতে হয়, বরং ডাক্তারী পিল—কবিরাজী মতের "বটক", "মোদক" বা পিণ্ডেরই অনুরূপ। কবিরাজেরা ঘন সারকে চূর্ণ দ্বারা দৃঢ় করিয়া বটিকা প্রস্তুত করেন না। গুড় ঘন ক্বাথ ও চূর্ণ সহযোগে কবিরাজেরা লেহ প্রস্তুত করেন। এই লেহই ডাক্তারদের মতে কতকটা pills এর মত। দুঃখের বিষয়—বহুযুগ পরে, কৃতৌষধের সংজ্ঞা বদলানো—একেবারেই অসম্ভব।

তৈল পাক ও ঘৃত পাক—ডাক্তারী-বিজ্ঞানের উপদেশে হইতে পারে না। কেন না ডাক্তারদের Oils ও Ointments এর সঙ্গে কবিরাজী ঘৃত-তৈলের তুলনাই হয় না। কবিরাজেরা ঘৃত ও তৈল পাক করিবার সময়—প্রথমে মূর্চ্ছা-বিধি, তা'রপর কল্ক-বিধি, ক্বাথ বিধি, গন্ধপাক প্রভৃতি বহুবিধ প্রক্রিয়াই করিয়া থাকেন। অয়েল, অয়েণ্টমেণ্ট করিতে হইলে এ সব কোন বালাই নাই।

আসব অরিষ্ট সম্বন্ধেও সতীশবাবু যাহা বলিয়াছেন, তাহাও আমরা ভাবিয়া দেখিয়াছি।

আসব ও অরিষ্ট চিনী, মধু বা গুড়ের সহিত রুদ্ধ ভাণ্ডে একটা নির্দ্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত সন্ধিত হয়। সেই সন্ধিত প্রক্রিয়ার (fermented) সময়ই তাহা গুড়-চিনীর সহিত পচিতে থাকে। পাত্র হইতে তুলিয়া, তাহাকে ছাঁকিয়া অন্য পাত্রে রাখিলে, আর তাহা পচে না। অন্ততঃ সেরূপ আসব অরিষ্টে ছাতা ধরিতে বা গাঁজনা জমিতে আমি দেখি নাই। আসব, অরিষ্ট প্রস্তুত হইয়া গেলে তাহাতে ঠিক্ ভিনিগারের মত গন্ধ বাহির হয়। আমার বিশ্বাস—আসব বা অরিষ্টকে তজ্জাত অম্লরসই পচন হইতে রক্ষা করিয়া থাকে। কবিরাজগণ—নির্ম্মাল্য ফলাদির চূর্ণ নিক্ষেপ করিয়া, সন্ধিত দ্রবপদার্থের নির্ম্মলতা সম্পাদন করিয়া,—উপরিস্থিত দ্রবাংশ গ্রহণ করেন, অধঃপতিত ঘনকাথ পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। আমার নিজের অভিজ্ঞতায়—আমি আসব, অরিষ্টকে একবৎসর পর্য্যন্ত সমান গন্ধবর্ণ যুক্ত ভাবে থাকিতে দেখিয়াছি। সতীশ-বাবু আমার কথার সত্যতা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। আমি দুইবৎসর পূর্ব্বের প্রস্তুত "উশীরাসব" প্রয়োগ করিয়া একটী রক্তপিত্ত রোগীকে আরোগ্য করিয়াছিলাম।

সতীশবাবু সুরামিশ্রিত জলে ভিজাইয়া ঔষধ-দ্রব্যের সারগ্রহণ করিতে বলিয়াছেন। তিনি বলেন—ইহাতে আসব বা অরিষ্টের উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে। আমি বলি, পারে না। সুরামিশ্রিত জলে ঔষধ ভিজাইয়া রাখিলে, আসব বা অরিষ্ট হয় না, ইহাকে বরং "পরিবর্ত্তিত হিম" বলিতে পারি; যাহার ডাক্তারী নাম—Maceration—আয়ুর্ব্বেদ মতে "হিম" ১ রাত্রি ভিজাইতে হয়, সেইজন্যই "পরিবর্ত্তিত হিম নাম দিলাম।

সতীশবাবু "স্বরস" ও "ক্বাথ" সংরক্ষণের জন্য—সুরাসার ব্যবহারের পরামর্শ দিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে ফলপ্রাপ্তি সম্বন্ধে একটু সন্দেহ আসিয়া পড়ে। বিশেষতঃ—কবিরাজেরা ক্বাথকে বাসি করিয়া ব্যবহার করেন না। তাঁহারা সদ্য প্রস্তুত ক্বাথের আদর করিয়া থাকেন। সুরাসারের কার্য্য গ্লিসারিং দ্বারাও চলিতে পারে—সতীশবাবুর ইহাও একটী মন্তব্য। আমার বিশ্বাস—সর্ব্বত্র গ্লিসারিং প্রয়োগ চলে না। মধুর দ্বারাও সতীশবাবু ক্বাথ সংরক্ষণের পক্ষপাতী—কিন্তু ইহারও দোষ আছে—মধুসংযুক্ত ক্বাথ আসবের মত Farmented হইতে পারে। মধু পচন নিবারক বটে, কিন্তু দ্রবপদার্থের সহিত মিশিলে মধু বিকৃত হইয়া যায়। সুপক্ক ফল—খাঁটী মধুতে ভিজাইয়া রাখিলে, সে ফল অনেকদিন অবিকৃত থাকে, এইটুকুই মধুর ক্ষমতা।

সুরাসার যে পচন নিবারক—এ' জ্ঞান আর্য্য ঋষিদের ছিল। সুরাসারের সংস্কৃত নাম—"কোহল"। এই কোহল শব্দ হইতে আরবী ও ইংরাজী "আলকোহল" শব্দের উৎপত্তি। আসবে "কোহল" মিশানো হয় ত ঋষিদের উদ্দেশ্য ছিলনা। তাহাতে আসবারিষ্টের গুণান্তর হইতে পারে। আসব বা অরিষ্ট মদ্য জাতীয় হইলেও, তাহা সুরা নহে। মদ্য—সন্ধিত দ্রব মাত্র, মদ্যকে চুয়াইলে 'সুরা' হয়। সেকালে মদ্যের অনেক শ্রেণী ছিল। সুরা—অন্ন বা তণ্ডুল হইতে প্রস্তুত হইত। যথা মনুর উক্তি—"সুরা বৈ মল মন্নানাং।" অমরকোষের মতে সুরার আর একটী নাম—"পরিস্রুতা"। ইহা দ্বারা বেশ বুঝা যাইতেছে—"সন্ধিত" পদার্থকে চুয়াইয়া লইতে হয়, আর্য্য ঋষিদের সে জ্ঞান ছিল। তথাপি যে তাঁহারা আসব অরিষ্টকে চুয়াইয়া

লইবার উপদেশ দেন নাই,—ইহার কারণ—তাঁহাদের সেরূপ উদ্দেশ্য ছিল না। অথবা তাঁহারা আসব অরিষ্ট—সকল জাতিকেই ঔষধার্থে ব্যবহার করিতে দিতেন, "সুরা"-পান তাঁহাদের কাছে অত্যন্ত নিন্দনীয় ছিল। এই-জন্যই সম্ভবতঃ তাঁহারা আসব অরিষ্টকে দীর্ঘ-কাল স্থায়ী করিবার জন্য চুয়াইয়া সুরাতে পরিণত করিতে ইচ্ছা করেন নাই। চাণক্যের অর্থশাস্ত্র পাঠে আমরা বুঝিতে পারি—সেকালের নৃপতিগণ সুরার শুল্ক আদায় করিতেন। আসব ও অরিষ্টের শুল্ক ছিল না। যে কারণেই হউক—ঋষিরা যখন আসব ও অরিষ্টকে চুয়াইবার ব্যবস্থা করেন নাই, আমরাই বা তাহা করিতে যাই কেন? আধুনিক বিজ্ঞানের মাপকাঠিতে—ঋষি-প্রতিভা মাপা যায় না।

সতীশবাবুর যে সকল প্রস্তাবে আমার আপত্তি ছিল, উপরে অতিসংক্ষেপে আমি তাহা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু তাঁহার অনেকগুলি কথা আমার বেশ ভাল লাগিয়াছে। সুতরাং তাঁহার অনেকগুলি প্রস্তাবের সহিত আমি একমত। যদি পরি-বর্ত্তিত প্রণালীতে আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ প্রস্তুত করিতে হয়,—তাহা হইলে প্রক্রিয়ার পরিবর্ত্তন করিলে হইবে না। যেখানে রস বাহির করিতে হইবে, সেখানে "টিঞ্চার প্রেস" যন্ত্র ব্যবহার করা হউক,—ঔষধ বিশেষে "পারকোলেটার" ব্যবহার করা হউক. সহজে ঔষধদ্রব্যকে চূর্ণ করিবার জন্য Disintegrator, 'বলমিল' পটমিল, প্রভৃতি যন্ত্র ব্যবহার করা হউক, ছাঁকিবার জন্য সূক্ষ্ম চালুনী ও রেশমী বস্ত্র ব্যবহার করা হউক। দ্রব বিশেষকে পরিষ্কার করিবার জন্য ফিলটার পেপার ব্যবহার করা হউক, তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই। আমি ডাক্তার, কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্রে আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধও আমাকে নির্ব্বাচন করিতে হয়। তাই সতীশ-বাবুর প্রবন্ধের প্রতিবাদ করিতে বাধ্য হইলাম।

ডাক্তার শ্রীক্ষেত্রমোহন চট্টোপাধ্যায়
এল্, এম্, এস্।

মনুষ্য রক্তের লোহিত কণিকার আকার

সহস্রাধিক ছাত্রের রক্ত অনুবীক্ষণ যন্ত্র সহযোগে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আমার ধারণা হইয়াছে যে, রক্তের লোহিত কণিকার আকার সম্বন্ধে প্রচলিত শারীর-বিদ্যা-সংক্রান্ত পুস্তক সমূহে যে বর্ণনা আছে. তাহার পরিবর্ত্তন হওয়া আবশ্যক।

প্রচলিত মতানুসারে উক্ত কণিকাগুলির আকার—গোলাকৃতি, চেপ্টা এবং ধার অপেক্ষা মধ্যস্থল পাৎলা। রুটী প্রস্তুত করিবার লেচিকে দুইদিকে বুড়া আঙ্গুল দিয়া চাপ দিলে যে আকার হইবে, তাহা ঐ কণিকা-গুলির আকারের সদৃশ। ঐ মতানুসারে

কণিকাগুলির মধ্যস্থলে একটা পাৎলা ত্বক্ আছে।

আমার মতে ঐ কণিকাগুলির মধ্যস্থল একেবারে ফাঁক, উহাতে কোনও ত্বক নাই। অর্থাৎ কণিকাগুলির আকার মোটা ও গোল তারে নির্ম্মিত আংটী বা বলয়ের অনুরূপ। ষ্টীমারে যেরূপ Lif · belt দেখা যায় তদনুরূপ।

কণিকাগুলির ঐরূপ আকার পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইলে একটা কাচ স্লাইডের [Slide] উপর বড় এক ফোঁটা রক্ত লইতে হইবে। পর্য্যবেক্ষণের জন্য একটা পুরাণ অনুবীক্ষণ যন্ত্র (যাহার stage ক্ষয় হইয়া গিয়া অসমতল হইয়াছে) হইলে ভাল হয়। ঐরূপ অসমতল অনুবীক্ষণে দেখিবার সময় কণিকাগুলি ক্ষেত্রের বন্ধুরত্ব-নিবন্ধন কোনও একদিকে স্রোত-প্রবাহে চালিত হইতে দেখা যাইবে। নূতন অনুবীক্ষণ হইলে একটু আধটু কাগজের দ্বারা অসমতল ষ্টেজ করিয়া লওয়া যায়। Cover slip খানি খুব পাৎলা হওয়া আবশ্যক। বেশী ভারি হইলে উহার চাপে কণিকাগুলি নড়িতে পারিবে না। রক্তের প্রবাহ দেখিয়া তদুপরি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সংযোগ করিতে হইবে। প্রবাহে রক্ত কণা-গুলি আকৃষ্ট হইয়া চলিতেছে, দেখা যাইবে। এইরূপ অবস্থায় কয়েকটী কণা উল্টাইয়া-পাল্টাইয়া চলিতেছে দেখা যাইবে। ঐরূপ চলন-শীল দুই একটী কণার আকারের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেই স্পষ্ট বোধ হইবে যে, উক্ত লোহিত-কণাগুলির মধ্যস্থলে বাস্তবিক ত্বক্ নাই।

কোনও যন্ত্রের উপকারিতা বা অপকারিতার দিক্ দিয়া দেখিলেও বুঝা যাইবে যে, কণা-গুলির নূতন আকার ধরিয়া লইলে তাহাদের স্বকার্য্য সম্পাদনের বিশেষ সুবিধা হয়।

(১ম) কণাগুলির বহিরাবরণের আয়তন বর্দ্ধিত হয়, ইহাতে তাহাদের অক্সিজেন আদান-প্রদানের খুব বেশী সুবিধা হইবে।

(২য়) মধ্যস্থানে একটি অনাবশ্যক ত্বকের পরিবর্ত্তে ছিদ্র বা ফাঁক থাকিলে ঘন রক্ত রসের মধ্য দিয়া কণাগুলির গমনাগমনের পক্ষে বাধা কম পড়ে।

(৩য়) ঐরূপ আকারে কণাগুলি অধিক-তর নমনীয় হইবে; তাহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র Capillary-র মধ্য দিয়া যাইবার সময় ও অধিকতর সুবিধা হইবে।

মাছ, বেঙ্ প্রভৃতি যে সকল জীবের লোহিত কণিকায় Nucleus আছে,—তাহাদিগের কণা পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখা-যায় যে—Nucleus এর চারিদিকে একটা গভীর খাঁজ আছে। আমার বিবেচনায় উচ্চতর জন্তুদিগের লোহিত কণিকা সৃষ্টি হইবার কালে Nucleus এর চারিধারের খাঁজ গভীরতর হইয়া Nucleusটী কণিকা হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে, মধ্য স্থানটা এইরূপে ফাঁক হইয়া যায়। পরে Nucleusটী ভঙ্গ হইয়া Blood platelets এ পরিণত হয়।*

শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

* এই প্রবন্ধ বিজ্ঞান সভায় শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় এম্ এ, মহাশয়ের সভাপতিত্বে, ডাঃ শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ডি, এস, সি; পিএচ্ ডি, সি, আই, ই, মহোদয়ের সম্মুখে লেখক কর্ত্তৃক পঠিত।

টোট্‌কা ও মুষ্টিযোগ

বসন্তে প্রতিষেধক বিধি।—

(১) এই রোগের প্রাদুর্ভাবকালে পুরুষের দক্ষিণ হস্তে ও স্ত্রীলোকের বাম হস্তে হরিতকীর একটি বীজ ধারণ করিলে এই রোগে আক্রান্ত হইবার ভয় থাকে না। (২) তেলাকুচা, মাধবীলতা, অশোক, পাকুড় ও বেতস—ইহাদের পত্রের ক্বাথ পর্য্যষিত করিয়া পান করিলে বসন্ত হইবার আশঙ্কা থাকে না।

ব্রণে ব্যবস্থা।—

(১) ধুতুরার মূল বাটিয়া সৈন্ধব লবণ মিশাইয়া এবং ঐ দুইটি দ্রব্য অল্প গরম করিয়া ব্রণ হইবামাত্র প্রলেপ দিলে বিশেষ উপকার দর্শে। (২) টাবালেবুর মূল, গণিয়ারি, দেবদারু, শুঁঠ, কেলেকোড়া ও রাস্না—এই সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে ব্রণশোথে ফল দর্শিয়া থাকে।

যকৃৎ রোগে সুব্যবস্থা।—

কুলেখাড়া পাতার রস প্রাতে ও বৈকালে এক তোলা লইয়া অল্প মধুর সহিত সেবন করাও—সত্বঃ উপকার পাইবে। ইহাতে যকৃতের ক্রিয়া ভাল তো হইবেই, তদ্ভিন্ন ইহা সেবনের ফলে রক্তবৃদ্ধি হইয়া দেহ সবল ও সুস্থ হইবে।

দূষিত জল জনিত জ্বরে।

বাসক ছাল, মুতা, গুলঞ্চ (গাঁট বাদ), পলতা, শুঁঠ, ধনে ও চিরাতা—এই কয়টি দ্রব্যের প্রত্যেকটি ১৩।০ কুঁচ ওজনে লইয়া আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া প্রাতে ও বৈকালে এক ছটাক করিয়া অল্প মধুসহ পান করিতে দাও। এই-রূপ ব্যবস্থায় দূষিত জল সেবন জনিত জ্বর ৩।৪ দিনে আরোগ্য হইবে।

অজীর্ণে মুষ্টিযোগ।—

অজীর্ণ হইয়া ভেদ হইতে থাকিলে চারি আনা যোয়ান ও চারি আনা লবণ—একত্র মিশাইয়া না চিবাইয়া একটু জলসহ গিলিয়া ফেল, সত্বঃ সুফল পাইবে।

শ্রীঅতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
কবিভূষণ।

সমালোচনা

চিকিৎসা সার সংগ্রহ। ১ম খণ্ড।—৺ পীতাম্বর কবিরাজ সংগৃহীত ও ঢাকা—মুড়াপাড়া হইতে শ্রীমদনমোহন কবিরঞ্জন কবিরাজ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ।৵০ আনা। এখণ্ড কেবল জ্বর-চিকিৎসা লইয়া লিখিত। সকল প্রকার জ্বরে যে সকল নিয়মে চলা

উচিত,—যে সকল পাচন, মুষ্টিযোগ ও ঔষধাদি ব্যবহার করা কর্ত্তব্য—শাস্ত্রীয় শ্লোক হইতে অনুবাদ করিয়া সেই সকল কথা ইহাতে বলা হইয়াছে। বলিবার প্রণালী মন্দ হয় নাই। তবে কবিরাজী পুস্তকে কুইনাইন ঘটিত ঔষধ দিবার ব্যবস্থা করা—সঙ্গত মনে করিতে পারি না।—তাহা হইলে আর আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার বিশেষত্ব রহিল কি! এ পুস্তকের সঙ্কলনকার কম্পজ্বরে যে হরিতাল ঘটিত ঔষধ প্রয়োগের কথা বলিয়াছেন, সেই হরিতাল ঘটিত ঔষধই তো জ্বরের বিরাম অবস্থায় ব্যবহার করিলে সুফল পাওয়া যাইতে পারে। কুইনাইনের ম্যালেরিয়া ভিন্ন অন্য জ্বর বন্ধ করিবার শক্তি নাই; হরিতালের ম্যালেরিয়া ছাড়া অনেক জ্বর বন্ধেরই ক্ষমতা আছে। যাহা হউক এ সকল কথা বাদ দিলে গ্রন্থখানি মন্দ হয় নাই।

বিবিধ প্রসঙ্গ

গাভীর হিসাব।—গত আদম সুমারীতে প্রকাশ,—সমগ্র ভারতে গাভীর সংখ্যা ৩৭৪০০০০০। ইহার মধ্যে যুক্তপ্রদেশেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। বাঙ্গালা প্রদেশে গাভী, ষাঁড়, বাছুর এবং মহিষ মিশাইয়া একত্র হিসাব ২৫৩০০০০০। হিসাবে যাহা বুঝা যায়, তাহাতে বাঙ্গালা দেশ হইতে এখনো গো-কুল নির্ম্মূল হয় নাই। তবে বাঙ্গালায় দুগ্ধের দুর্দ্দশা হইল কেন?

ঘৃতে চর্ব্বি।—কলিকাতা সহরে আবার নাকি ঘৃত বলিয়া চর্ব্বি চলিতেছে, মফঃস্বলে তো কথাই নাই। তবে ঘৃত আইন পাশ হইয়া কি ফল হইল।

পূর্ব্ববঙ্গে বৈদ্য-সম্মেলন।—গত ২৪শে ও ২৫শে চৈত্র ঢাকা সহরে পূর্ব্ববঙ্গ বৈদ্য সম্মেলনের ২য় অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। চট্টগ্রামের কবিরাজ শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ সেন কবিরত্ন সভাপতি হইয়াছিলেন।

টীকায় জুলুম।—'বরিশাল হিতৈষী'-তে প্রকাশ—বরিশালের কতিপয় পল্লীতে টীকাদারেরা জ্বর এবং উদরাময় পীড়াগ্রস্থ শিশুদিগকে জোর করিয়া টীকা দিতেছে। ইহার ফলে বরিশালের ফাগুপাশা গ্রামের একটী শিশুর জীবন-সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল! পীড়িতাবস্থায় টীকা দেওয়া কোন ক্রমেই সঙ্গত নহে, ইহা আইনেরও বিরুদ্ধ। আমরা এজন্য বরিশালের ম্যাজিষ্ট্রেটের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

শিশু মৃত্যু।—কলিকাতা সহরে জন্ম হিসাবে প্রত্যেক নয় জনের মধ্যে তিন জন করিয়া শিশুর মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। অস্বাস্থ্যকর পিতামাতার শুক্র শোণিতের সংমিশ্রণের ফলেই যে এই অকাল মৃত্যু ঘটিয়া থাকে, তাহা কি আর বলিতে হইবে?

যক্ষ্মারোগীর হিসাব।—সরকারি হিসাবে প্রকাশ,—পৃথিবীতে প্রতি বৎসর যত

লোকের মৃত্যু হয়, তাহার ৭ ভাগের এক ভাগ যক্ষ্মারোগে মরিয়া থাকে। ব্রিটিশ ভারতের বার্ষিক লোক সংখ্যা ৬ লক্ষ। এই হিসাবে মাসে ৪৩ হাজার ২ শত, প্রত্যেক দিন ১৪৪০, প্রত্যেক ঘণ্টায় ৬০ জন এবং প্রত্যেক মিনিটে ১ জন করিয়া যক্ষ্মা রোগে ইহলীলা সম্বরণ করিতেছে।

চিকিৎসকের মৃত্যু।—আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম, কলিকাতার লব্ধপ্রতিষ্ঠ ডাক্তার সার্জ্জন জেনারাল কর্ণেল বার্ড সাহেব লোকান্তরিত হইয়াছেন। ইনি মেডিকেল কলেজের অন্যতম অধ্যাপক ছিলেন এবং বিশেষ একজন কৃতী চিকিৎসক বলিয়া ইঁহার প্রসিদ্ধি ছিল।

বাঙ্গালীর ব্যয়।—বাঙ্গালী স্বাস্থ্যরক্ষা কল্পে ১২ লক্ষ, শিক্ষায় ১ কোটী ৬০ লক্ষ এবং স্বাস্থ্য নষ্ট বা মদ্যপানের জন্য ৮ কোটী মুদ্রা বৎসরে ব্যয় করিয়া থাকে। বাঙ্গালীর অকাল মৃত্যু ঘটিবে না তো কাহার ঘটিবে?

স্বাস্থ্য শিক্ষা।—কিছুদিন হইল, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনে অনারেবল মিঃ এইচ্, আর, আর উইন এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব পেশ করেন যে, বঙ্গদেশের গভর্ণমেণ্ট সাহায্য কৃত বালক এবং বালিকা বিদ্যালয় সমূহে যথাপ্রয়োজন গুণসম্পন্ন শিক্ষকগণ কর্ত্তৃক স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধীয় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হউক। বিশ্ববিদ্যালয়ের মেট্রিকুলেশন পরীক্ষারও ইহা বাধ্যতামূলক পাঠ্য হউক। আগামী বৎসরের বজেটে এতদুপযোগী ব্যবস্থা করা হউক। ইহা লইয়া অন্যান্য সভ্যগণের মধ্যে নানারূপ আলোচনার পর "বাধ্যতামূলক" কথাটির স্থলে "স্বেচ্ছাধীন" কথাটি গৃহীত হইয়াছে। একজন ইয়ুরোপীয় সদস্য বাঙ্গালা দেশের মঙ্গলোদ্দেশ্যে এরূপ প্রস্তাব করিয়াছেন,—ইহা আমাদের সৌভাগ্য বলিতে হইবে।

ভারতের রসায়ন।—কিছুদিন পূর্ব্বে ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে "হিন্দু রসায়ন শাস্ত্রের প্রাচীন তত্ত্ব" সম্বন্ধে যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন.—তাহাতে প্রকাশ,—"হিন্দুগণ রসায়ন ও গণিত শাস্ত্র আরব দেশ হইতে যে গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে, তাহা সত্য নহে। আরবগণই ভারতীয়দিগের নিকট হইতে ঐ দুই শাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছেন, প্রাচীন আরব গ্রন্থকারগণ কৃতজ্ঞতা সহকারে একথা স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহাদের গ্রন্থে প্রকাশ,—খলিফ হারুণ অল্ রসিদের রাজত্বকালে চরক ও সুশ্রুতের অনুবাদের জন্য ভারতীয় পণ্ডিতগণ বোগদাদে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। চরক ও সুশ্রুত ভিন্ন চিকিৎসা সম্বন্ধীয় আরও বহুগ্রন্থ হিন্দুগণ কর্ত্তৃক আরবী ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল"। এ সব কথা আমরা বরাবরই জানি। যাঁহাদের এ বিষয়ে অন্যরূপ ধারণা আছে, তাঁহারা ডাক্তার রায়ের কথায় ইহা শিক্ষা করুন।

আমাদের "নববর্ষ"।

* * *

সেই চম্পক-মালতী-মল্লী-নাগেশ্বরের গন্ধ,
সেই চঞ্চল-মুক্ত-উদাস-পবনের গতি মন্দ,
সেই ফল দোলে শ্যাম-পল্লব-শোভন-বৃক্ষের শাখে,
সেই বিহঙ্গ, স্তবক-নম্র লতার কুঞ্জে ডাকে,
সেই সুন্দর স্বপ্ন-রচিত রক্তাশোকের বীথি,
সেই লালসায় অলস নেত্র, অলির গুঞ্জ গীতি,
সেই উজ্জ্বল চন্দ্র-তপন, সেই নিশি, সেই দিবা,
সেই সৃষ্টির জীবন-মৃত্যু, নূতন হ'য়েছে কিবা ?
সেই পুরাতন, সব "এক ঘেয়ে" গঠন-রক্ষা-নাশ,
নিখিলের "নব বর্ষ" তথাপি, শুভ বৈশাখ মাস !!

* * *

সেই দলাদলি—রুধির-লিপ্ত, অন্যের শুভ-দ্বেষ,
সেই শত্রুতা—স্বার্থপরতা—বিঘ্ন-বিপদ-ক্লেশ,
সেই দরিদ্র অর্থ যোগায় ধনীর বিলাস তরে,
সেই ক্ষুধার্ত্ত-শীর্ণ-শরীর—অন্ন অভাবে মরে,
সেই সন্তাপ-শোক-যন্ত্রণা, রোগীর আর্ত্তনাদ,
সেই সংসার চির-অপূর্ণ—আশা-আকাঙ্ক্ষা-সাধ,
সেই জলাভাব পল্লীগ্রামের—জ্বলে দাবাগ্নি শিখা,
সেই ম্যালেরিয়া-কলেরা ও প্লেগে শমনের বিভীষিকা,
কিছুরি হলোনা পরিবর্ত্তন—কিছুর নাহিক ক্ষয়,
তবে কারে বল "নূতন বর্ষ" ? গাও বল কার জয় ?

* * *

ঘুচিবে যে'দিন সারা বিশ্বের দৈন্য ও গ্লানি খেদ,
হৃত-স্বাস্থ্যের মাঝে—প্রতিষ্ঠা লভিবে "আয়ুর্বেদ,"
ঘৃণ্য-বিলাস ত্যজিয়া মানব দীক্ষিত হ'বে ধর্ম্মে,
স্বর্গ আসিবে মর্ত্ত্যে নামিয়া, কামনাশূন্য কর্ম্মে,
নদীর শীর্ণ বক্ষে—ছুটিবে বীচি-বিক্ষোভ বাণ,
স্নিগ্ধ-শ্যামল-ক্ষেত্রে শোভিবে কনক-শীর্ষ ধান,
আসিবে ফিরিয়া "আচার্য্য যুগ" ল'য়ে ঔষধ পথ্য,
সার্থক হ'বে শাস্ত্র-মহিমা—জ্ঞান-বিজ্ঞান তথ্য,
অকাল মৃত্যু দূর হবে, প্রাণে জাগিবে নূতন হর্ষ,
সৃষ্টির মাঝে আসিবে সে'দিন আমাদের "নব বর্ষ"।

শ্রীব্রজবল্লভ রায়, কাব্যতীর্থ।
[ভূতপূর্ব্ব "বহুদর্শী" সম্পাদক]

মাসিকপত্র ও সমালোচক।

২য় বর্ষ। | বঙ্গাব্দ ১৩২৫—জ্যৈষ্ঠ। | ৯ম সংখ্যা।

জাতীয় সঙ্গীত।

১

তোমরা কি সেই বৈদ্য-সন্তান আর্ত্ত-হৃদয়ে অভয়-দাতা ?
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-স্থাপনে তোমাদেরি কি সৃজিল ধাতা ?
নিখিল বেদের শ্রেষ্ঠ যেটুকু—তোমাদেরি কি সে আয়ুর্ব্বেদ ?
যাহার প্রসাদে রোগ-নাশিয়ে তোমরা জীবের ঘুচা'তে খেদ ?
শল্য-শালাক্য-কায়-চিকিৎসা—সকলি যা'দের আয়ত্ত ছিল !
জরায় যৌবন যা'দের প্রসাদে ধরণীর মাঝে আসিয়াছিল ?
তোমরা কি সেই তেজো-নৈপুণ্যে জ্ঞানের জ্বলন্ত উজ্জ্বল ছবি ;
আছে কি না লুপ্ত হ'য়েছে এখন তোমাদের আজি সে সুখ-রবি ?

২

তোমরা কি সেই জ্ঞান অর্জ্জনে আগেকার মত লুব্ধপ্রাণ ?
পীড়িতের তরে মর্ম্ম-মাঝারে তুলিয়া থাক কি করুণ-তান ?
সামর্থ্য-প্রকাশে অর্থ অপেক্ষা অধিক তৃপ্তি যা'দের ছিল,
বাসনা যা'দের গুপ্ত-সাফল্য—এ মন্ত্র যাহারা শিক্ষা নিল,
রাজন্য-সমাজে মান্য যা'দের, কীর্ত্তি যা'দের ধরণী ভরা,
ধর্ম্ম-যা'দের আর্ত্ত সেবাই,—এমন ভাবেতে হৃদয় গড়া।
সে দেশ-বরেণ্য-বংশ-মাঝারে জন্ম লভিয়া পুণ্য-ফলে
সে সব কর্ম্ম যত্নে রেখেছ ?—না ভাসা'য়ে দিয়েছ অতল জলে ?

৩

তোমাদের বিদ্যা বিশ্ব ঘোষিত—'মাধব নিদান' সাক্ষ্য তা'র,
তোমরাই ভাষা করিলে সৃষ্টি'—'মুগ্ধবোধ' খানি জাননা কা'র ?
তোমাদের বংশে জন্ম লভিলা 'চক্রপাণিদত্ত'—কোথায় সে দিন ?
তোমাদেরি বংশে 'বিজয় রক্ষিত'—সে টীকার জ্যোতিঃ হয়নি ক্ষীণ।
তোমাদেরি রত্ন মুগ্ধ হইয়া গ্রীস্-আরবেরা সাধিয়া নিল,
আরব হইতে সমগ্র বিশ্ব চিকিৎসা-বিদ্যা শিখিয়াছিল।
তোমরাই আগে সেবার ব্রত বিজ্ঞানের ওগো করিয়াছিলে,
সে সকল আজি করিছ চর্চ্চা ?—না সমাজ হইতে তুলিয়া দিলে !

৪

দাসত্ব করিয়া ক্লান্ত কখন হওনি তোমরা আছে কি মনে ?
জ্ঞানেরি চর্চ্চায় শ্রান্ত হৃদয়, আপনা ভাবিতে জগত-জনে।
তোমাদের দেখি, আর্ত্ত ভাবিত—বুঝি দেবগণ সমুখে মোর,
তোমাদেরো হৃদি সে ভাবে মুগ্ধ,—তোমাদেরো নেত্রে বহিত লোর।
তোমরা ভাবিতে অপত্য তা'রে,—শাস্ত্র-উপদেশ শিক্ষা করি,—
সে শিক্ষার স্রোতঃ রুদ্ধ এখন,—দুঃখ হয় না সে সব স্মরি'।
কোথা তোমাদের সে সব শিক্ষা ? সে দীক্ষা দিবার ক'জন আছে ?
তা'রি ফলভোগ, ভিক্ষা-করুণা, আর আঁখিজল তাহার পাছে !

শ্রীসত্যচরণ সেন গুপ্ত কবিরঞ্জন।

মকরধ্বজের প্রস্তুত-প্রণালী

——:০:——

[বৃদ্ধবৈদ্যের উপদেশ]

আমার বাটী পল্লীগ্রামে। বৈদ্যবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, তিন পুরুষ ধরিয়া বৈদ্য-বৃত্তিই আমাদের অবলম্বন। কিন্তু আমার উত্তরাধিকারিগণ কেহই জাতীয় ব্যবসায়-লিপ্ত নহে। ইহা অবশ্যই দুঃখের কথা! এ দুঃখের কথা আমি এতদিন মনেই রাখিয়াছিলাম, আজ কিন্তু সকলের কাছে প্রকাশ করিতেছি। ইহার কারণ—আমার মত বুড়ার কাছে আমার বংশধরেরা কিছুই শিখিল না। আমাদের বংশ-পরম্পরা-প্রচলিত এমন কতকগুলি ঔষধ

আছে, আমার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই সেগুলি লুপ্ত হইয়া যাইবে। আমার জীবন-নাটকে এখন পঞ্চম অঙ্ক চলিতেছে, যবনিকা-পতনের আর বিলম্ব নাই। আর ত অপেক্ষা করিতে পারি না। আজীবন চিকিৎসা-ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিয়া আমি যেটুকু অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, আমার ইচ্ছা তোমরা তাহা শিখিয়া লও। আমি জানি, তোমরা আমার চেয়ে পণ্ডিত, যশস্বী ও কীর্ত্তিমান; কিন্তু আমি যে তোমাদের চেয়ে বয়সে বুড়া—তাহা ত অস্বীকার করিতে পারিবে না। সত্য বটে, একালের শিক্ষিত কবিরাজ তোমরা;—তোমরা রোগীর বাড়ী গেলে ১৬ টাকা দর্শনী পাও, তোমরা ল্যাণ্ডো-মোটরে চড়, পেটেণ্ট ঔষধ আবিষ্কার কর। আমার চেয়ে তোমাদের কত বেশী সম্ভ্রম! আমি ফাটা পায়ে চটী পরিয়া, ধূলায় ধূসর হইয়া, পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া চিকিৎসা করি। টাকাটা-সিকেটা যে' যা' দেয়—হাসি মুখে লই। ইহাতেই আমার মরাই ভরা ধান, গোয়াল ভরা গাই, বাগান ভরা গাছ, পুকুর ভরা মাছ। আমি কি শুধু আমার দেশের কবিরাজ?-আমি দলাদলিতে মধ্যস্থ, বারয়ারীতে প্রধান পাণ্ডা, পল্লীর উন্নতি-কামনায় পরামর্শ দাতা, আমি আমার দেশের লোকের বিপদে বন্ধু, সম্পদে সহায়, সান্ত্বনায় সুহৃদ,—আমি নই কি? নাই বা হইলাম আমি—"বিদ্যারত্ন" "বৈদ্যরত্ন" "কাব্যতীর্থ" "কবিভূষণ"? আমার জন্যই ত আমার দেশবাসী—চিকিৎসকের অভাব এখনও টের পায় নাই। এই টুকুই আমার সুখ, এইটুকুই আমার গর্ব্ব।

আমি কোন্ ঔষধ কেমন করিয়া প্রস্তুত করি, কোন্ রোগে কিরূপ ব্যবস্থা দিয়া কেমন ফল পাইয়াছি, তোমাদের কাছে একে একে তাহা বলিয়া যাইব। তোমরা শুনিবে কি?

আজ প্রথমেই "মকরধ্বজের" কথাটা বলি। "মকরধ্বজ" বড় নামজাদা ঔষধ। সাহেবেরাও ইহার গুণের প্রশংসা করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়—অনেক কবিরাজ মহাশয়ই ইহা প্রস্তুত করিতে জানেন না। অথচ লেবেল আঁটিয়া "ষড়গুণ", "সিদ্ধ" নাম দিয়া—কেনা "রস সিন্দুর" বিক্রয় করেন। আমি স্বহস্তে "মকরধ্বজ" প্রস্তুত করিয়া থাকি। অনেকের বিশ্বাস—"মকরধ্বজ" প্রস্তুত করা বড়ই কঠিন ব্যাপার। আবার কেহ কেহ এমন কথাও বলিয়া থাকেন,—"মকরধ্বজ প্রস্তুত করিলে বংশ থাকে না।" একথার মূলে কোনও সত্য আছে বলিয়া মনে হয় না। আমার বয়স ৭৬ বৎসর, সংসারে আমি মহাসুখী। ঈশ্বরাশীর্ব্বাদে—আমার ৪টী পুত্র ও ৩টী কন্যা বর্ত্তমান। তাহাদের সন্তান-সন্ততি হইয়াছে, তাহারা দশের মাঝে একজন হইয়া সংসার-ধর্ম্ম করিতেছে। যাক্,—বাজে কথা ছাড়িয়া এইবার কাজের কথা বলি।

আমি যে উপায়ে ষড়গুণ বলিজারিত মকরধ্বজ প্রস্তুত করি, তোমাদিগকে তাহা বলিতেছি।

প্রথমে পারা লইতে হইবে। পারার যত ওজন—তাহার ৬ গুণ গন্ধক লইয়া বেশ করিয়া চূর্ণ করিয়া একটা পাত্রে রাখিয়া দিবে। এই পারা বা গন্ধক শোধন করিবার আবশ্যক নাই।

কবিরাজদের কাছে "বালুকা যন্ত্র" সবিশেষ পরিচিত। একটা বড় হাঁড়ীতে এক হাঁড়ি বালি [গঙ্গার বালি হইলেই ভাল হয়] পুরিলেই বালুকা যন্ত্র হইল। এইরূপ "বালুকা যন্ত্রের"

ঠিক মধ্যস্থলে একটী ছোট হাঁড়ি বসাইবে। হাঁড়ির তলদেশ যেন সমতল হয়। সেই ছোট হাঁড়িতে পারা রাখিবে, তা'র পর পারার হাঁড়ি শুদ্ধ বালুকা যন্ত্রটী উনানের উপর বসাইবে এবং উনানটী আগুন দিয়া ধরাইয়া দিবে। উনানটী কাঠের কিম্বা ঘুঁটিয়ার দ্বারা জ্বালিবে। পাথুরে কয়লা দিবে না। পূর্ব্বে যে পারার ৬ গুণ গন্ধক গুঁড়াইয়া রাখিয়াছ, সেই গন্ধকের কিয়দংশ লইয়া—যে হাঁড়িতে পারা রাখিয়াছ—তাহাতে দিবে। এমনভাবে গন্ধক দিবে, যেন পারা চাপা পড়ে। গন্ধক গলিয়া তৈলের মত হইলে, আবার তাহাতে গন্ধক দিবে। সে গন্ধক গলিয়া গেলে আবার দিবে। এইরূপে ক্রমে ক্রমে অল্পে অল্পে সেই ৬ গুণ ওজন করা গন্ধকের সমস্ত টুকু পারার হাঁড়িতে দিতে হইবে। গন্ধক দেওয়া হইয়া গেলে, গলিত গন্ধক তরল থাকিতে-থাকিতে, চিম্‌টা বা সাঁড়াশী দিয়া পারার হাঁড়ি নামাইয়া ফেলিবে। কিছুক্ষণ পরে—হাঁড়ি ঠাণ্ডা হইলে এবং গন্ধক জমিয়া কঠিন হইলে—ভাঁড়ের তলা ছিদ্র করিয়া পারা বাহির করিয়া লইবে। এই পারার নামই "ষড়গুণ বলিজারিত" পারা। গন্ধকের নাম—বলি। ৬ গুণ বলির দ্বারা জারিত, তাই ইহার নাম "ষড়গুণ বলিজারিত।" রস-গ্রন্থে ষড়্‌গুণ বলি জারণ প্রথা যাহা উক্ত হইয়াছে, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি।

"ক্ষুদ্র ভাণ্ডে রসং ক্ষিপ্ত্বা বালুকা যন্ত্র-মধ্যতঃ।
ষড়্‌গুণং গন্ধকং দত্ত্বাদগ্নাগ্নিঞ্চ শনৈঃ শনৈঃ
তৈলরূপো যদা গন্ধ স্ততোহবতারয়েৎ দ্রুতং।
স্বাঙ্গ শীতে দৃঢ়ে গন্ধে স্ফোটয়িত্বা রসং নয়েৎ॥

এইরূপ বলিজারিত পারা ৮ তোলা এবং গন্ধক ৮ তোলা লইবে। এই গন্ধক শোধন করিয়া লইতে হইবে। গন্ধক শোধন সকলেই জানেন। গন্ধকের ডেলায় একটু ঘৃত মাখাইয়া লোহার হাতায় করিয়া মৃদু আগুনে গলাইতে হয় এবং সেই গলিত গন্ধক জল মিশ্রিত দুগ্ধের পাত্রে ফেলিতে হয়। ইহাই হইতেছে—গন্ধক শোধনের সর্ব্বাপেক্ষা সহজ বিধি। দুগ্ধ নির্ব্বাপিত গন্ধককে রৌদ্রে শুকাইয়া লইয়া ব্যবহার করিবে।

প্রথমে পারা ৮ তোলা খলে ঢালিবে, তাহার সঙ্গে ২ ভরি সোণার পাত দিবে। আমি চীনে সোনার পাত ব্যবহার করিয়া থাকি। চীনা পাত—পোদ্দারের দোকানে বিক্রয় হয়। তাহা কিনিয়া আনিয়া কাঁচি দিয়া ছোট ছোট করিয়া কাটিয়া পারার সহিত মিশাইবে। পারার সহিত সোণা খুব শীঘ্র মিশিয়া যায়। পারা ও সোণা খলে ফেলিয়া নুড়ী দিয়া আধ ঘণ্টা আন্দাজ মাড়িলেই সোণা পারার সঙ্গে মিশিয়া যায়। সোণা মিশ্রিত পারা একটু ঘন হয়—মাড়িলে যেন সূতার মত হইয়া যায়। পারাও সোণা মিশিয়া গেলে—তাহাতে ৮ ভরি শোধিত গন্ধক দিবে। তা'র পর খুব ধীরে ধীরে লঘু হস্তে মাড়িতে থাকিবে। জোরে মাড়িলে পারা গন্ধক শীঘ্র মেশে না, কখনও বা সমস্ত অংশও মেশে না। যত আস্তে মাড়িবে, ততই ভাল। মাড়িতে মাড়িতে পারা ও গন্ধক মিশিয়া ঘোর কৃষ্ণবর্ণ হইবে। এই কৃষ্ণবর্ণ চূর্ণের নাম—"কজ্জলী।" সোণা না দিয়া, শুধু পারা গন্ধক একত্র মাড়িলেও কজ্জলী হয়। এই কজ্জলী—কবিরাজদের অনেক ঔষধেই ব্যবহার হইয়া থাকে।

এক্ষণে, পারা-গন্ধক ও স্বর্ণ-সংমিশ্রণে যে কজ্জলী প্রস্তুত হইল, সেই "কজ্জলী" ঘৃত কুমারীর রসে মাড়িয়া রৌদ্রে শুকাইবে।

তিনবার মাড়িবে, তিনবার শুকাইবে। এই রূপ মাড়া ও শুকানোর নাম—"ভাবনা।"

এইবার একটী মাটির থালী যোগাড় করিবে। মাটীর থালী—এখন আর বড় কুমারেরা প্রস্তুত করে না। আগে বাজারে যথেষ্ট বিক্রয় হইত। চাষা-ভূষা লোকে—থালীতে তৈল পূরিয়া লইত। ইহার আকার ছিল—ঠিক কুঁজার মত, অথচ ক্ষুদ্র। থালী না যোগাড় করিতে পারিলে—সমতল কাল পাঁইট বোতল লইবে। বোতলটীর গাত্রে—কাদা ও বস্ত্রখণ্ডের দ্বারা বেশ করিয়া লেপ দিবে। পরে রৌদ্রে শুকাইয়া লইবে। এই লেপ দেওয়া বোতলটীর ভিতর—পূর্ব্বোক্ত ভাবনা দেওয়া কজ্জলী পূরিবে। পরে—বোতলটী বালুকাযন্ত্রের মধ্যে বসাইবে। বালুকা-যন্ত্রের কথা আগেই বলিয়াছি—৬ গুণ গন্ধকের সহিত যে যন্ত্রে পারাকে জ্বাল দেওয়া হইয়াছিল—সেইরূপ "বালুকা যন্ত্র।" কিন্তু বালুকাযন্ত্রের হাঁড়িটী এমন হওয়া চাই—যেন বোতলের গলা পর্য্যন্ত—বালিতে ঢাকা পড়ে, অর্থাৎ হাঁড়িটী—যেন গভীর হয়,;ভাত-রাঁধা-তোল-হাঁড়ি হইলেই চলিবে।

বোতল বসানো বালুকা যন্ত্রটী উনানের উপর রাখিয়া—কাঠের আগুণে জ্বাল দিবে। সকালে—যদি ৮টার সময় চড়ানো হয়, তাহা হইলে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত ধীরে ধীরে জ্বাল দিতে হইবে। জ্বালের এই নিয়ম। খুব খর-জ্বাল হইলে—ভাল 'চ'টী' বাঁধেনা।

"বালুকা যন্ত্রের" বালি গরম হইবামাত্র—বোতলের মুখ হইতে গন্ধকের ধোঁয়া এবং গন্ধ বাহির হইতে থাকিবে। অনুমান ২ ঘণ্টা জ্বাল দেওয়ার পর আর ধোঁয়া দেখিতে পাওয়া যাইবে না। এই সময় হইতে পাক শেষ হওয়া পর্য্যন্ত ১ ঘণ্টা অন্তর, ১০।১৫ মিনিটের জন্য—বোতলের মুখ, এক খণ্ড প্রস্তর বা লৌহখণ্ডের দ্বারা ঢাকিয়া দিতে হইবে। অর্থাৎ মাঝে মাঝে বোতলের মুখ ঢাকিবে এবং মাঝে মাঝে খুলিয়া দিবে। এইরূপে ১২ ঘণ্টা জ্বাল দিলেই মকরধ্বজ প্রস্তুত হইল। ১২ ঘণ্টার পর জ্বাল দেওয়া বন্ধ করিবে। তা'রপর—সাঁড়াশী দিয়া বোতলের গলা ধরিয়া, বোতলটী নামাইয়া কোনও শীতল বাতাস যুক্ত স্থানে, সে দিনের মত রাখিয়া দিবে। পরদিন বোতলের নীচের দিক ভাঙ্গিয়া ফেলিবে, দেখিবে—বোতলের মধ্যস্থল হইতে গলা পর্য্যন্ত—মকরধ্বজের উজ্জ্বল দানা লাগিয়া রহিয়াছে। ছুরি দিয়া চাঁচিয়া উহা—শিশির মধ্যে পূরিয়া রাখিবে। ইহাই—মকরধ্বজ। বোতলের নীচে—ঝামার গুঁড়ার মত—এক প্রকার পদার্থ পড়িয়া থাকে। এই ভস্মাবশেষ—স্বর্ণ ভস্মের স্থানে অনায়াসেই ব্যবহার করিতে পার। কেননা, ইহাতে সোণার ভাগ থাকিয়া যায়। আবার সোণা ভস্ম করিতে হইলে তাহার সঙ্গে পারা ও গন্ধক মিশাইতে হয়। সুতরাং বোতলের নীচে যাহা পড়িয়া থাকে—তাহাতে স্বর্ণভস্মের গুণ সমস্তই থাকে। এই জিনিষ আমি "সোণা জারা" নাম দিয়া মেহ, বহুমূত্র ও ক্ষয়কাসে ব্যবহার করিয়া চমৎকার ফল পাইয়াছি। পুরাতন উদরাময়েও ইহা অত্যন্ত উপকারী।

আমি যে ষড়্গুণ বলি জারিত মকরধ্বজের প্রস্তুত-প্রণালী লিখিলাম, ইহা আমার স্ব-কপোল কল্পিত নহে। ইহা শাস্ত্রীয়-বিধি। যথা,—

পল মাত্রং রসং শুদ্ধং তাবন্মাত্রস্তু গন্ধকং।
শাণং তনূকৃতং স্বর্ণং সর্ব্বমেকত্রমর্দ্দয়েৎ॥

বিধিবৎ কজ্জলী কৃত্বা ভাবয়েৎ কন্যকা দ্রবৈঃ।
বারত্রয়ং ততঃ ঘর্ম্মে শোষয়েদতি যত্নতঃ॥
পশ্চাৎ স্থালীং গৃহীত্বাতু সবস্ত্র কুট্টিত মৃদা।
বিলিপ্য ত্রিবারং তাঞ্চ চণ্ডাতপে চ শোষয়েৎ॥
তন্মধ্যে কজ্জলীং ক্ষিপ্তা শুভেঽহ্নি পাকবিদশুচিঃ
বালুকা পূর্ণ ভাণ্ডেচ তদ্যন্ত্রং স্থাপয়েৎ ভিষক॥
ততঃ বহ্নি জ্বালাং দদ্যাৎ মন্দং মন্দং নিশাবধি।
স্বাঙ্গ শীতে সমুদ্ধৃত্য গ্রাহ্য মূর্দ্ধগতং রসং॥
যোজয়েৎ সর্ব্ব রোগেষু গুঞ্জৈকং মাক্ষিকৈঃ সহ
মৃত্যুহৃচ্চ মহাবীর্য্যো খ্যাতোঽয়ং মকরধ্বজঃ॥
রস কুলার্ণব ২য় উঃ।

যে কেহ ইচ্ছা করিলে এই মকরধ্বজ প্রস্তুত করিতে পারিবেন। পূর্ণ মাত্রায় পাক করিলে, ১০।১২ ভরি পর্য্যন্ত জিনিষ প্রস্তুত হইতে পারে। যিনি প্রস্তুত করিবেন, তিনি মনে করিলে পূর্ব্বোক্ত মাত্রার অর্দ্ধ, সিকি বা ৮ ভাগের এক ভাগ—যে কোনও মাত্রায় প্রস্তুত করিতে পারেন। কম মাত্রায় করিলে, খরচ অবশ্যই কম হইবে, তবে পরিশ্রম—সব তাতেই সমান।

আর একটী কথা, মকরধ্বজ প্রস্তুত করিবার সময়—একটু শুদ্ধাচারে থাকা ভাল। পাকের দিন হবিষ্যান্ন গ্রহণ করিলে বড়ই ভাল হয়। অগ্নি-তাপে বসিয়া পারায় জ্বাল দিতে গেলে, একটু বেশী করিয়া ঘৃত পান করা কর্ত্তব্য।

জ্বালের প্রথম মুখে—যখন বোতল হইতে পারা ও গন্ধকের ধূম বাহির হইবে, তখন যন্ত্রের নিকট হইতে একটু দূরে থাকিতে হয়। সকলেই জানেন—পারা ও গন্ধকের ধূমে হাঁপানী ও বাতরক্তের পীড়া হইতে পারে। একটু দূরে থাকিয়া জ্বাল দিলে আর সে ভয় নাই।

এখন দেখি—যে-সে যেখানে-সেখানে মকরধ্বজ বেচিতেছে। আমার বিশ্বাস—তা'দের অনেকেই নিজের হাতে মকরধ্বজ করে না। বরিশালের ব্যবসায়ীদের কাছে কেনা-"রসসিন্দূর" "সিদ্ধ", "যড়্গুণ বলি-জারিত"—ইত্যাদি বড় বড় বিশেষণ দিয়া "মকরধ্বজ" বলিয়া চালাইতেছে। আবার কেহ কেহ এমন অজবুক যে, মকরধ্বজের বিজ্ঞাপন দিবার সময়—"ইহা আসল স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজ।" বলিয়া লিখিতে লজ্জিত হয় না। ইহাদের জানা উচিত, "মকরধ্বজের "স্বর্ণঘটিত" বিশেষণ দেওয়া চলেনা, কেননা—সোণা না দিলে সে ত "মকরধ্বজই" হইবে না। শুধু পারা-গন্ধকে যাহা প্রস্তুত—তাহার নাম যে "রসসিন্দুর'। তা'রা সেই "রস সিন্দূর" ১ টাকায় ২ ভরি কিনিয়া, প্রত্যেক তোলা ৪৲ টাকায় অনায়াসে বেচিতে পারে। তাহাতে আর কৃতিত্ব কি? বরং ১ টাকার রস সিন্দুর বেচায় তা'দের ৭৲ টাকা লাভ। আসল যা "মকরধ্বজ", সে যে জরামৃত্যুনাশক অমৃত,—ধন্বন্তরির কুম্ভ না হইলে সে ত কখনই থাকিতে পারে না।

শ্রীসদানন্দ সেন গুপ্ত কবিরাজ।

অতিসার রোগ

:o:

অতিসার রোগের প্রাবল্য আমাদের দেশে অত্যধিক। অতিসার রোগ উৎপন্ন হইবার কারণ, লক্ষণ; মুষ্টিযোগ-দ্বারা চিকিৎসা প্রভৃতি জানিয়া রাখিলে অনেক সময় সাধারণে উপকৃত হইবেন। সেই জন্য এই প্রবন্ধে অতিসার রোগ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে।

অত্যন্ত সরণ অর্থাৎ মলভেদ হয় বলিয়া এই রোগের নামক অতিসার। কেহ বলিতে পারেন যে অতিশয় মলভেদ হইলেই যদি তাহাকে অতিসার বলা যায়, তবে বিসূচিকায়, ক্রিমিরোগে বা অর্শরোগ প্রভৃতিতে তরল মলভেদ হইলে তাহাকে অতিসার বলিনা কেন? কিন্তু এই সকল ক্ষেত্রে অতিসার মূল রোগ নহে, বিসূচিকা, ক্রিমি প্রভৃতি মূল রোগ এবং অতিসার উপসর্গ।

প্রবাহিকা—চলিত ভাষায় যাহাকে আমাশয় বলিয়া জানেন, তাহা অতিসার হইতে স্বতন্ত্র রোগ নহে। উহা অতিসারেরই অবস্থাভেদ মাত্র। অনেকে গ্রহণী রোগকে পুরাতন অতিসার বলিয়া থাকেন। কোন কোন মতে গ্রহণী—অতিসার হইতে স্বতন্ত্র রোগ। আমরা গ্রহণী—রোগ-প্রসঙ্গে এ বিষয়ের মীমাংসা করিতে চেষ্টা পাইব।

অতিসার রোগ সকল ঋতুতে উৎপন্ন হইলেও গ্রীষ্মকালে প্রবল হইয়া থাকে। এইজন্য পাশ্চাত্য চিকিৎসক গ্রীষ্মকালীন অতিসার (Summer diarrhoea) এই বিশেষ সংজ্ঞা দিয়া উষ্ণকালের অতিসার রোগকে পৃথক করিয়াছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এরূপ বিশেষত্ব নির্দ্দেশ করার কোন সার্থকতা নাই। গ্রীষ্মকালে অগ্নি দুর্ব্বল হয় বলিয়া সামান্য কারণেই অতিসার রোগ উৎপন্ন হয়—এবং এইজন্য গ্রীষ্মকালে অতিসার রোগের প্রাবল্য ঘটে। গ্রীষ্মকাল ব্যতীত বর্ষাকালেও অগ্নি দুর্ব্বল থাকে এবং নদী ও সরোবরের জল বর্ষার ধোয়াট জল মিশ্রিত হইয়া দূষিত হয় বলিয়া সে সময়ে অতিসার রোগের প্রাবল্য ঘটিয়া থাকে। অনেক স্থলে বর্ষার পঙ্কিল জল শোধন করিবার প্রক্রিয়ার দোষে—যেমন অতিরিক্ত ফটকিরী প্রয়োগ করিয়া জল শোধন করা প্রভৃতি কারণেও অতিসার রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

অতিসার রোগ উৎপন্ন হইবার কারণ—শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে যে, পুরাকালীন এক রাজা দীর্ঘকালব্যাপী যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া অন্যান্য পশুর অভাবে যজ্ঞে গো-সমূহের ব্যবহার প্রবর্ত্তিত করিয়া দেন। ইহা দেখিয়া সমস্ত প্রাণী গো-সমূহের উপযোগিতা স্মরণ করিয়া যারপর নাই ব্যথিত হইয়াছিল এবং যজ্ঞে হত সেই গো সমূহের মাংস ভোজন করায়, গোমাংসের গুরুতা, উষ্ণতা ও অসাত্ম্যতা (অহিতকারিতা) হেতু এবং উহা অযথারূপে ভোজন করায় তাহাদিগের মন ও অগ্নি উপহৃত হয়। এইরূপে পূর্ব্বে অতিসার রোগ উৎপন্ন হইয়াছিল।

উপরোক্ত শাস্ত্রবাক্য হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, গুরু, উষ্ণ ও অসাত্ম্য (অনভ্যস্ত ও অহিতকর) দ্রব্য ভোজন করিলে, অযথারূপে (অতিরিক্ত, পূর্ব্ব অন্ন জীর্ণ না হইতে, দুগ্ধ ও মৎস্যাদি বিরুদ্ধ দ্রব্য একত্রে—প্রভৃতি)

ভোজন করিলে এবং মন ব্যথিত হইলে অতিসার রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। উপরোক্ত কুপথ্য সেবনের সঙ্গে সঙ্গে যদি চিত্তের বৈকল্য জন্মে, তবে অতিসার রোগ সহজেই উৎপন্ন হয়। সুতরাং অতিসার রোগ হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে কুপথ্য আহার বা গুরুতর আহার করা উচিত নহে। অপিচ গুরুতর আহার করিয়া যাহাতে মনের কোন প্রকার ক্ষোভ না জন্মে, তাহা করা উচিত। কুপথ্য সেবন ব্যতীত মনের সহিত অতিসার রোগের যে সম্বন্ধ আছে —উপরোক্ত শাস্ত্রোক্তি দ্বারা তাহাও প্রমাণিত হইতেছে।

সুশ্রুত বলিয়াছেন,—গুরুপাক দ্রব্য, অত্যন্ত ঘৃতাদি স্নেহযুক্ত দ্রব্য, অতিরিক্ত রুক্ষ দ্রব্য, অত্যন্ত উষ্ণ দ্রব্য, অত্যন্ত তরল দ্রব্য, অত্যন্ত কঠিন দ্রব্য, অত্যন্ত শীতল দ্রব্য, বিরুদ্ধ দ্রব্য (মৎস্য ও দুগ্ধ একত্রে), পূর্ব্বাহার জীর্ণ না হইতে ভোজন, অজীর্ণকর দ্রব্য ভোজন, অসাত্ম্য-দ্রব্য-ভোজন, বমন-বিরেচনের অযথা প্রয়োগ বা অতিরিক্ত প্রয়োগ, বিষবিশেষ ভয়, শোক, দুষ্ট জল বা মদ্য অধিক পরিমাণে পান করা, ঋতু-বিপর্য্যয় (শীতকালে বর্ষা হওয়া বা শীত না হওয়া ইত্যাদি), অতিরিক্ত জলক্রীড়া, মল-মূত্রের বেগধারণ এবং ক্রিমিদোষ এই সকল কারণে অতিসার রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। চরক সংহিতায় অতিসার রোগ ছয় প্রকার বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যথা—বাতজ, পিত্তজ, কফজ, ত্রিদোষজ, শোকজ এবং ভয়জ। সুশ্রুতে আমজ অতিসার ধরা হইয়াছে। যাহা হউক সুশ্রুতের উপদেষ্টা ধন্বন্তরির মতে অতিসার ছয় প্রকারই বটে ; তবে অবস্থাভেদে নানাপ্রকার লক্ষণ প্রকাশ পায়।

চরকের সহিত সুশ্রুতের মতভেদ থাকিলেও চরকের মতই প্রামাণ্য। কারণ চরক কায়তন্ত্র-প্রধান এবং সুশ্রুত শল্যতন্ত্র-প্রধান গ্রন্থ। সুশ্রুতের টীকাকার আমাজীর্ণ লক্ষণের টীকায় বলিয়াছেন যে, "ভয়, অজীর্ণ বিসূচিকা, অর্শ, অজীর্ণ প্রভৃতি নিমিত্ত যে অতিসার তাহাদের পৃথক গণনা করা হয় নাই। অতিসার রোগের ছয় সংখ্যা রক্ষার জন্য ইহাদের দোষজ বলা হইয়াছে। কিন্তু ভয়জ অতিসার দোষজ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। চরকে স্পষ্টই বলা হইয়াছে। কিন্তু ভয়জ অতিসার দোষজ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। চরকে স্পষ্টই বলা হইয়াছে :—

ভয়জ ও শোকজ দুই প্রকার অতিসার আগন্তু। সুশ্রুতে ভয়জনিত জ্বরকে আগন্তু-জ্বর বলা হইয়াছে সুতরাং ভয়জনিত অতিসারকে কি প্রকারে আগন্তু না বলিয়া দোষজ বলা যাইতে পাইতে পারে ?

পাশ্চাত্য চিকিৎসা গ্রন্থেও ভয় হইতে যে অতিসার রোগ জন্মিয়া থাকে, তাহা পৃথকভাবে বলা হইয়াছে, অতএব আমরা চরক সংহিতার মতানুসারেই অতিসার রোগের গণনা করিতেছি। প্রকৃতি ভেদে কি কারণে অতিসার রোগ উৎপন্ন হয়, সে সম্বন্ধে চরক সংহিতায় নিম্নোক্ত বিবরণ আছে।

বায়ু প্রকৃতি ব্যক্তি যদি অতিরিক্ত বায়ু, রৌদ্র ও ব্যায়াম সেবা করে, রুক্ষ দ্রব্য বা অল্প ভোজন করে, অথবা নিত্য একরূপ রস (মধুর, কটু, তিক্ত প্রভৃতির একটি) ভোজন করে, নিত্য তীক্ষ্ণ মদ্যপান বা স্ত্রীসহবাস করে, অথবা মলমূত্রাদির বেগ ধারণ করে, তাহা হইলে বায়ু কুপিত হইয়া অগ্নিকে নষ্ট করে। অগ্নি নষ্ট হইলে সেই কুপিত বায়ু মূত্র ও স্বেদকে মলা-

শয়ে আনে এবং উহাদের সহযোগে পুরীষ তরল হইয়া নির্গত হইতে থাকে। এইরূপে বাতাতিসার উৎপন্ন হয়।

পিত্তপ্রকৃতি ব্যক্তি যদি অম্বল, লবণ, কটু, ক্ষার, উষ্ণ ও তীক্ষ্ণ (হিং প্রভৃতি) দ্রব্য অতিরিক্ত আহার করে, নিয়ত অগ্নি, রৌদ্র বা উষ্ণ বায়ুসেবন করে, অথবা অত্যন্ত ক্রোধ ও ঈর্ষ্যাযুক্ত হয়, তাহা হইলে পিত্ত কুপিত হয়। সেই কুপিত পিত্ত তরলতা হেতু উষ্ণ জল যেমন অগ্নিকে নির্ব্বাপিত করে, সেইরূপ জঠরাগ্নিকে নষ্ট করিয়া মলাশয়ে গমন করে এবং মলকে তরল করিয়া অতিসার রোগ উৎপন্ন করে। শ্লেষ্ম-প্রকৃতি ব্যক্তি যদি গুরু-পাক, মধুর, শীতল ও স্নিগ্ধদ্রব্য ভোজন করে বা অতিরিক্ত ভোজন করে, চিন্তাহীন হয়, দিবানিদ্রা সেবন করে, এবং আলস্য-পরবশ হয়, অর্থাৎ কোনরূপ পরিশ্রম না করে, তাহা হইলে শ্লেষ্মা কুপিত হয়। শ্লেষ্মা স্বভাবতঃ মধুর, শীতল ও স্নিগ্ধ বলিয়া অধঃপতিত হইয়া অগ্নিকে নষ্ট করে এবং আমাশয়ে আসিয়া মলকে বিপন্ন করিয়া অতিসার রোগ উৎপন্ন করে।

অত্যন্ত শীতল, অত্যন্ত রুক্ষ, অত্যন্ত উষ্ণ, অত্যন্ত কঠিন, অত্যন্ত গুরুপাক, অত্যন্ত খর (কর্কশ), অত্যন্ত কঠিন দ্রব্য সেবন, বিষম (কখন অল্প, কখন অধিক, কখন সকালে, কখন বিকালে) আহার, বিরুদ্ধ ভোজন, অসাত্ম্য-দ্রব্য ভোজন, আহারের কাল অতিক্রম করিয়া ভোজন, অল্প মাত্রায় ভোজন, দূষিত মদ্য বা জল পান, অতিরিক্ত মদ্যপান, ঋতুভেদে সঞ্চিত দোষের (যেমন বসন্তকালে কফের) প্রতিকার না করা, বমন-বিরেচনাদি পঞ্চ কর্ম্মের অযথা প্রয়োগ, অগ্নি, রৌদ্র-বায়ু ও জলের অতিসেবন, নিদ্রা না যাওয়া বা অত্যন্ত নিদ্রা যাওয়া, ঋতু-বিপর্য্যয়, অযথা-বলপ্রয়োগ, অত্যন্ত ভয়, অত্যন্ত শোক, অত্যন্ত মনের উদ্বেগ, ক্রিমি, শোষ, জ্বর ও অর্শোরোগের দ্বারা কৃশ হওয়া—এই সমস্ত কারণে অগ্নি বিপন্ন হইয়া থাকে এবং বায়ু, পিত্ত ও কফ তিনটী দোষই কুপিত হয়। কুপিত দোষত্রয় অগ্নিকে অধিকতর দুর্ব্বল করিয়া পক্কাশয়ে প্রবেশ পূর্ব্বক ত্রিদোষজ অতিসার রোগ উৎপন্ন করিয়া থাকে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ভয়জ এবং শোকজ অতিসার আগন্তু। ভয় বা শোক হেতু বায়ুকুপিত হইয়া অতিসার রোগ উৎপন্ন করে। অপিচ ত্রিদোষজ অতিসার-নিদানে কথিত হইয়াছে যে, অত্যন্ত শোক বা ভয় হেতু ত্রিদোষ কুপিত হইয়া থাকে। শোক এবং ভয়ের অতিযোগজাত যে অতিসার,—তাহা দুশ্চিকিৎস্য।

প্রকৃতিভেদে যে সকল কারণ বশতঃ অতিসার রোগ জন্মিয়া থাকে বলিয়া কথিত হইয়াছে, বিভিন্ন প্রকৃতির স্বাস্থ্যকামী ব্যক্তি-গণের পক্ষে সেইসকল কারণ পরিত্যাগ করা উচিত। আর ত্রিদোষজ অতিসারের কারণ সকলের অতিযোগ বশতঃ ঘটিয়া থাকে। সুতরাং এ সকল কারণের অতিযোগ যাহাতে না ঘটে, তাহার উপায় করিলে—ত্রিদোষজ অতিসার জন্মিতে পারে না। ভয়জ ও শোকজ অতিসার মানস অর্থাৎ মনকে আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হয় বলা হইয়াছে। সুতরাং চিত্ত-স্থৈর্য্যই উক্ত অতিসারের প্রতিষেধের উপায়। অতিসার রোগের পূর্ব্বরূপ (কোন রোগ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে যে সকল লক্ষণ প্রকাশ পায় তাহাকে পূর্ব্বরূপ বলে) হৃদয়, নাভি, মল-

দ্বার, উদর ও কুক্ষি (নাভির অধোভাগ) দেশে সূচিবেধ যাতনা, শরীরের অবসন্নতা, অধো বায়ু নির্গত না হওয়া, মলরোধ, পেটফোলা, অপরিপাক—এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।

পূর্ব্বরূপ প্রকাশ পাইলে যদ্যপি সাবধানতা অবলম্বন করা যায়, তাহা হইলে রোগ আর প্রবল হইতে পারে না। এই পূর্ব্বরূপ প্রকাশ পাওয়ার অবস্থাকে সুশ্রুত চিকিৎসার চতুর্থ-কাল এবং রোগ-লক্ষণ প্রকাশ পাইলে পঞ্চম-কাল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছন। অতিসারে পূর্ব্বরূপ প্রকাশ পাইলে--উপবাসই সর্ব্ব প্রধান চিকিৎসা।

ভিন্ন ভিন্ন অতিসার রোগের লক্ষণ ;—বাতজ অতিসারে—রুক্ষ, ঈষৎ-রক্তবর্ণ-ফেনাযুক্ত মল বায়ুর সহিত অল্প অল্প করিয়া নির্গত হইতে থাকে, কটিদেশ, উরু ও জঙ্ঘা অবসন্ন হয়, শূলুনী হয়, প্রস্রাব বন্ধ হয়, পেট ডাকে এবং মলদ্বার নির্গত হইয়া পড়ে।

পিত্তজনিত অতিসারে—পীত, নীল, বা ঈষৎ লোহিতবর্ণ মল অতিবেগে নিঃসৃত হয়, শরীরে ঘাম হয় এবং তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, দাহ, জ্বর ও মলদ্বারের পাক হইয়া থাকে।

শ্লেষ্মজ অতিসার রোগে—শ্বেতবর্ণ, ঘন, শ্লেষ্মামিশ্রিত মলনিঃসৃত হয়, মলত্যাগ কালে শরীর রোমাঞ্চিত হয়, মলত্যাগ করিবার পরেই আবার দাস্ত হইবে বলিয়া মনে হয়, মলত্যাগ কালে শব্দ হয় না, এবং আহারে অরুচি, তন্দ্রা নিদ্রাধিক্য, শরীরের গুরুতা, অগ্নির অবসন্নতা ও উকি উঠা উপসর্গ ঘটে।

ত্রিদোষজ অতিসার রোগে রক্তাদি ধাতুর দোষ অনুসারে মলের বিবিধ বর্ণ হয়। ইহাতে হরিদ্রা বর্ণ, হরিত বর্ণ, নীলবর্ণ, মঞ্জিষ্ঠার কাথের ন্যায় রক্ত বর্ণ, মাংসধোয়া জলের মত, রক্তবর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ, শ্বেতবর্ণ বা শূকরের চর্ব্বির ন্যায় বর্ণযুক্ত মলভেদ হয়, বেদনা থাকিতেও পারে,—নাও থাকিতে পারে। কোথাও ভিন্ন ভিন্ন দোষজ অতিসারের সমস্ত লক্ষণ, কোথাও কয়েকটী লক্ষণ প্রকাশ পায়। মল কখন গ্রথিত, কখন তরল হয়। বালক ও বৃদ্ধের ত্রিদোষজ অতিসার অসাধ্য। রোগীর মাংস, রক্ত ও বল অত্যন্ত ক্ষীণ না হইলে কষ্টসাধ্য হইয়া থাকে। ত্রিদোষজ অতিসারে রোগীর মল—কাথের ন্যায়, রক্তবর্ণ, যকৃৎ-পিত্তের ন্যায়, দধির ন্যায়, মাংস ধোয়া জলের ন্যায়, ঘৃতের ন্যায়, মজ্জার ন্যায়, তৈলের ন্যায়, চর্ব্বির ন্যায়, দুগ্ধের ন্যায়, ঘৃতাদি মিশ্রিত কুট্টিত অস্থিরহিত মাংসের ন্যায়, অত্যন্ত নীল, রক্ত বা কৃষ্ণবর্ণ, জলের ন্যায় স্বচ্ছ, অত্যন্ত স্নিগ্ধ, হরিত-নীল বা কষায়ের ন্যায় বর্ণ, নানাবর্ণ, ঘোলাটে, ময়ূর পুচ্ছের ন্যায় বিচিত্রবর্ণ, আঁস্‌টে গন্ধ, বা পচা শবের ন্যায় দুর্গন্ধযুক্ত, পূযের ন্যায় গন্ধযুক্ত, বহু মক্ষিকা দ্বারা আক্রান্ত অনেক পচা দ্রবধাতু (রক্তাদি) মলের সহিত বা মল রহিত হইয়া অল্প অল্প নির্গত হইতে থাকে। এরূপ হইলে রোগ অসাধ্য হইয়া থাকে। তৃষ্ণা, দাহ, জ্বর, ভ্রম, হিক্কা ও শ্বাস উপদ্রব ঘটিলে, বেদনা একেবারে না থাকিলে বা অত্যন্ত থাকিলে, মলদ্বারের অভ্যন্তরস্থ শঙ্খের গ্রীবার ন্যায় আবর্ত্তাকার, বলি পতিত হইলে, লালাস্রাব, বল, মাংস ও রক্তের ক্ষয়, পার্শ্ব ও অস্থি সমূহে শূলবৎ বেদনা হইলে, অরুচি, প্রলাপ, ও মোহ ঘটিলে—রোগ অসাধ্য হইয়া থাকে। প্রবল অতিসার রোগ সহসা নিবৃত্ত হইলে রোগীর মৃত্যু হয়।

শোকজ ও ভয়জ অতিসারে বাতজ

অতিসারের ন্যায় লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। শোক বা ভয়ের অতিযোগ ঘটিলে ত্রিদোষজ অতিসারের ন্যায় উপসর্গ ঘটে। সুশ্রুত বলিয়াছেন যে, শোকজ অতিসারে রক্ত দূষিত হয় এবং কুঁচের ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট সেই দূষিত রক্ত মলের সহিত বা মল ব্যতীত, দুর্গন্ধযুক্ত বা গন্ধহীন হইয়া নির্গত হইতে থাকে।

অতিসারের প্রথম অবস্থায় পথ্য,—অতিসারের প্রথম অবস্থায় বলবান রোগীর পক্ষে উপবাসের ন্যায় উৎকৃষ্ট চিকিৎসা আর নাই। কেননা, লঙ্ঘনে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত দোষ সকল প্রশমিত ও পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কিন্তু এখানে বলবান শব্দ প্রযুক্ত হওয়ায় বুঝিতে হইবে যে, দুর্ব্বলের পক্ষে উপবাস নিষিদ্ধ। বালক, বৃদ্ধ, গর্ভিণী প্রভৃতিকে উপবাস দেওয়া কর্ত্তব্য নহে কারণ উহারা অল্পপ্রাণ বলিয়া উপবাসের দ্বারা ক্ষীণ হইয়া সহসা মৃত্যুমুখে পতিত হইতে পারে।

বলবান রোগীকে উপযুক্ত উপবাস দিবার পর এবং দুর্ব্বল, বালক, বৃদ্ধ প্রভৃতি উপবাসের অযোগ্য ব্যক্তিদিগকে ঔষধ-সিদ্ধ-পেয়া, খৈয়ের গুঁড়া, কাপড়ে-ছাঁকা-মণ্ড এবং মসুর দালের যূষ পথ্য দিতে হয়। মণ্ড ও পেয়ার জন্য পুরাতন দাদখানি চাউলের গুঁড়া ব্যবহার্য্য। চাউলের গুঁড়ার চৌদ্দ গুণ জল সহ মণ্ড এবং চা'র গুণ জল সহ পেয়া প্রস্তুত করিতে হয়। মণ্ড পাতলা এবং পেয়া কিছু ঘন হয়। আজ কাল যে বার্লির গুঁড়া জল সহ সিদ্ধ করিয়া দিবার নিয়ম আছে, তাহাও বার্লির মণ্ড। দালের যূষ, মণ্ড বা পেয়া—যে কোন তরল পদার্থই খাইতে দেওয়া হউক—সমস্তই কাপড়ে ছাঁকিয়া দেওয়া উচিত। মণ্ডাদির সহিত পাতি বা কাগচি লেবুর রস মিশ্রিত করিয়া দেওয়া হিতকর। শৈত্য-স্তম্ভন (ধারক) গুণ বিশিষ্ট বলিয়া মণ্ডাদি শীতল অবস্থায় প্রয়োগ করাই হিতকর। কিন্তু অত্যন্ত বায়ু অথবা শ্লেষ্মার প্রকোপ থাকিলে ঈষদুষ্ণ অবস্থায় প্রয়োগ করাই হিতকর। কেননা, শৈত্যগুণ প্রযুক্ত বায়ু বা শ্লেষ্মা বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

খৈয়ের গুঁড়া পথ্য দিতে হইলে জলের সহিত চট্‌কাইয়া, মাখনের মত করিয়া, দেওয়া উচিত। খৈয়ের পিণ্ড কঠিন হইলে তাহা গুরুপাক হইয়া থাকে। এইজন্য চাটিয়া খাইবার মত কোমল করিয়া পথ্য দেওয়া উচিত।

ছানার জল (whey) অতিসার রোগে একটী উৎকৃষ্ট পথ্য। গরম দুধে লেবুর রস দিলে ছানা কাটিয়া যায়। উহা কাপড়ে ছাঁকিয়া ঈষন্নীলবর্ণ যে জলীয়াংশ পাওয়া যায়, তাহার সহিত একটু লবণ ও আবশ্যক মত লেবুর রস মিশ্রিত করিয়া পথ্য দেওয়া উচিত।

অতিসারের প্রথম অবস্থায় দাড়িমের রস, পেয়া ও ছানার জলই একমাত্র সুপথ্য। দুই তিন দিন এই পথ্য সেবন করিয়া রোগের প্রাবল্য হ্রাস হইলে; মসুর দালের যূষ, বা ঘোল, মাছের ঝোল,—পথ্য দেওয়া যাইতে পারে। মাছের ঝোলের সহিত কচি কাঁচকলা ভিন্ন অন্য তরকারী না দিয়া এবং তৈল-ঘৃতাদি না দিয়া প্রস্তুত করা উচিত। মাছ না ভাজিয়া কাঁচা মাছের ঝোল করা ভাল। মাছের ঝোল প্রস্তুত হইলে, মাছ এবং কাঁচকলা—ঝোলের সহিত চটকাইয়া, কাপড়ে ছাঁকিয়া, পথ্য দিতে হয়। ঘোলও কাপড়ে ছাঁকিয়া দিতে হয়।

অতিসার রোগে ঔষধ অপেক্ষা পথ্য সম্বন্ধে সতর্কতাই বিশেষ আবশ্যক। কারণ পথ্য

সম্বন্ধে সামান্য দোষ ঘটিলে রোগ বৃদ্ধি পায় এবং কোন ঔষধেই তাহা নিবারণ করা যায় না। এক্ষণে অতিসার রোগের প্রথম অবস্থায় চিকিৎসার বিষয় কথিত হইতেছে।

অতিসার রোগের প্রথম অবস্থায় আমের প্রাবল্য থাকে, এজন্য উহাকে আমাতিসার বলা যায়। আম-মল গুরু বলিয়া জলে ফেলিলে ডুবিয়া যায় এবং পক্ক মল জলে ভাসিয়া থাকে। কিন্তু মল অত্যন্ত তরল, কঠিন, বা শ্লেষ্ম সংস্পর্শ জনিত শৈত্য গুণ বিশিষ্ট হইলে উক্ত পরীক্ষার ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে। কারণ আম-মল অত্যন্ত তরল হইলে লঘুত্ববশতঃ জলে ভাসিতে পারে। আবার কঠিন মল-পক্ক হইলেও গুরুত্ব বশতঃ ডুবিয়া যাইতে পারে। শ্লেষ্ম-সংস্পর্শে শীতল ও গুরু হইলেও পক্ক মল ডুবিয়া যায়। এইজন্য কেবল মল পরীক্ষার উপর নির্ভর না করিয়া অন্য পরীক্ষা দ্বারাও আমাবস্থা ও পক্কাবস্থা স্থির করিতে হয়। কারণ অতিসারের আম ও পক্কাবস্থা অনুসারে চিকিৎসার পার্থক্য ঘটিয়া থাকে।

অতিসারের আমাবস্থায় মলে দুর্গন্ধ থাকে, পেট গুড়্ গুড়্ করিয়া ডাকে, ভার হইয়া থাকে, পেটে যন্ত্রণা হয় এবং অল্প অল্প করিয়া বারংবার মল নির্গত হয়। ইহার বিপরীত লক্ষণ প্রকাশ পাইলে অর্থাৎ মলে দুর্গন্ধ না থাকিলে, পেট না ডাকিলে, ভার না থাকিলে, যন্ত্রণা না হইলে এবং অল্প অল্প মল বারংবার নিঃসৃত হওয়া বন্ধ হইয়া বিলম্বে অধিক মল নির্গত হইতে থাকিলে—অতিসারের পক্কাবস্থা বুঝিতে হইবে।

আমাতিসারে সঙ্কোচক (ধারক ঔষধ) প্রয়োগ করা কদাচ উচিত নহে। মসুর দালের যূষ এবং ঘোল—ধারক বলিয়া পথ্য-প্রসঙ্গে আমাতিসারে—প্রথমে উহাদের প্রয়োগ নিষেধ করা হইয়াছে। আমাতিসারের প্রথম অবস্থায় ধারক ঔষধ প্রয়োগ করিলে দোষ সকল রুদ্ধ হইয়া শোথ, পাণ্ডু প্লীহা, কুষ্ঠ, গুল্ম, উদর, জ্বর, দণ্ডক ও অলসক (বিসূচিকা, ভেদ) পেটফোলা, গ্রহণী, অর্শ প্রভৃতি বহুরোগ উৎপন্ন করিয়া থাকে। সুতরাং অতিসারের আমাবস্থায় পাচক ঔষধ প্রয়োগ করিয়া মলভেদ বন্ধ করা অত্যন্ত অন্যায়। কিন্তু বহু দোষের অতি নিঃসরণ হেতু রোগীর ধাতু ও বল ক্ষীণ হইয়া পড়িলে, আমাবস্থাতেও ধারক ঔষধ প্রয়োগ করিয়া মলভেদ বন্ধ করা উচিত। কেন না, এরূপ ক্ষেত্রে ধারক ঔষধ প্রয়োগ না করিয়া পাচক ঔষধের দ্বারা চিকিৎসা করিলে রোগী ক্রমে ক্ষীণতর হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইতে পারে। কিন্তু এরূপ স্থলে যে মলরোধক ঔষধ প্রয়োগ করিতে হইবে, তাহা বিশেষ বিবেচনা করিয়া করা উচিত।

অজীর্ণ আহার কর্ত্তৃক দোষ সকল বর্দ্ধিত হইয়া যাহাকে অতিসার রোগ উৎপন্ন করে অথবা যাহার অল্প অল্প মল পেট-বেদনার সহিত নির্গত হয়,—তাহাকে হরীতকী এবং পিঁপুল বাটিয়া গরম জলের সহিত খাওয়াইয়া বিরেচন করাইবে। অল্প অল্প করিয়া মল বারংবার যন্ত্রণার সহিত নির্গত হইতে থাকিলে বিরেচন-প্রয়োগ যে কিরূপ সুচিকিৎসা—তাহা যে সকল চিকিৎসক এরূপ ক্ষেত্রে বিরেচন-প্রয়োগ করিয়াছেন, তাঁহারাই ইহার গুণ সম্যক অবগত আছেন। ইহাতে বারংবার অল্প অল্প করিয়া ৫।৭ দিনে দুইশত বারে যে মল ও দোষ নির্গত হইত, বিরেচনের সাহায্যে একদিনে ৫।৭।১০ বারে সেই মল নির্গত হইয়া যাইল। অতিসার রোগের অসহ্য

শূলুনি—বিরেচন-প্রয়োগের ফলে,বিরেচন আরম্ভ হইবার আধ ঘণ্টা মধ্যে অবস্থা ভেদে ষোল আনা —বার আনা—অন্ততঃ পক্ষে অর্দ্ধেক কমিয়া যায়।

আবার এরূপ ক্ষেত্রে বিরেচন-প্রয়োগ না করিলে রোগীর দীর্ঘকাল ভোগ এবং কষ্টের একশেষ তো হয়ই, তাহার উপর ধারক ঔষধ-প্রয়োগের ফলে যথেষ্ট দোষ শরীরে আবদ্ধ থাকিয়া যায় এবং তজ্জন্য রোগী সুদীর্ঘ কাল ভুগিয়া কখন বা পরিত্রাণ পায়, কখন বা পায় না,—বহু স্থলে এরূপ ব্যাপার আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। অতিসার রোগে যাহারা ভুগিতেছে—এরূপ অনেক রোগীকে বিরেচন-প্রয়োগ করিয়া আমরা বিশেষ উপকার দেখাইয়াছি। একবার আমাশয় রোগে একটী বালক দীর্ঘকাল পীড়িত থাকিয়া নিতান্ত জীর্ণ-শীর্ণ হইয়া পড়ে। কলিকাতার একজন সুপ্রসিদ্ধ এ্যালোপ্যাথিক ডাক্তার শেষ কালে তাহাকে দেখিয়া বলেন যে, ইহার অন্য কোন উপায় নাই,—ক্যাষ্টর অয়েলের জোলাপ দিতে হইবে। ইহাতে যদি রোগী সহ্য করিতে পারে, তাহা হইলে ভাল হইবে। সুবিজ্ঞ ডাক্তারের উপদেশ মত রোগীকে জোলাপ দেওয়া হইল এবং তাহাতেই সে আরোগ্য লাভ করিল।

জোলাপ নানা প্রকারে প্রয়োগ করা যাইতে পারে, কিন্তু আমরা শাস্ত্রোক্ত হরীতকী এবং পিঁপুল প্রয়োগ করিয়া উত্তম ফল পাইয়াছি বলিয়া উহারই প্রয়োগ-বিধি লিখিত হইতেছে। সাধারণতঃ হরীতকী আধ তোলা এবং পিঁপুল দুই আনা একত্রে বাটিয়া গরম জল সহ প্রাতঃকালে খাইতে হয়। বলবান্ বা বৃহৎ কায় ব্যক্তির পক্ষে বার আনা বা একতোলা হরীতকী এবং তিন আনা বা এক সিকি পিঁপুল প্রযুক্ত হইতে পারে। আবার দুর্ব্বল এবং অল্প বয়স্ক বালকের পক্ষে বয়স-ভেদে মাত্রার কম প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। ঔষধ সেবন করিয়া ঠাণ্ডা বা হাওয়া না লাগান এবং গরমে থাকা দরকার। ইহাতে দেড় বা দুই ঘণ্টার মধ্যে বিরেচন আরম্ভ হয়। বিরেচন হইতে বিলম্ব হইলে, দুই একবার গরমজল তিন ছটাক-এক পোয়া করিয়া খাওয়া উচিত। বিরেচন আরম্ভ হইলে দুই একবার গরম জল খাইলে সম্যক বিরেচন হইয়া থাকে। বিরেচনের পর ক্ষুধার উদ্রেক হইলে, বিকালে জল-বার্লি লেবুর রস মিলিত করিয়া পথ্য দেওয়া যাইতে পারে।

(আগামী বারে সমাপ্য।)

কালাজ্বর।

—০:০—

আজকাল কলিকাতা সহরে এবং মফঃস্বলের স্থানে স্থানেও কালাজ্বর নামক এক প্রকার জ্বরের বিশেষ প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছে। বহুপ্রকার ঔষধ সেবন করাইয়াও এ রোগে সুফল না পাইয়া ডাক্তারগণ এ রোগকে এক প্রকার অসাধ্য রোগ বলেন। তজ্জন্য আজকাল ডাক্তার মহলে এই জ্বর লইয়া বিশেষ আন্দোলন

চলিতেছে। সম্প্রতি ইতালির আবিষ্কৃত Intervenous injection of choridal antimony-প্রচার কল্পে যথেষ্ট চেষ্টাও চলিতেছে। কিন্তু ইহার সুফলতা আজও নিশ্চিত হয় নাই; বিশেষতঃ antimonyর cloride ঘটিত কোন প্রস্তুতি-সম্ভব কিনা, তদ্বিষয়ে বিশেষ অনুসন্ধান চলিতেছে। আশা করি অনুসন্ধানকারিগণ এ বিষয়ে সত্বর কৃতকার্য্য হইবেন।

কালাজ্বর বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা যে আমাদের দেশে একটী নূতন ব্যাপার তাহা নহে। মহর্ষি চরকের আমলেও যে এ রোগ ছিল—তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। ডাক্তারি মতে ম্যালেরিয়ার সমলক্ষণান্বিত—বিশেষতঃ প্লীহাযুক্ত এবং কুইনাইন দ্বারা অপ্রতিক্রিয় বিশিষ্ট জ্বরকে কালাজ্বর বলে। কালাজ্বরে যে যে লক্ষণ উপস্থিত হয়-আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে সেই সেই লক্ষণ দেখিলে স্পষ্টই জানা যায়, যে ইহা আয়ুর্ব্বেদের জীর্ণ জ্বরের অন্যতম। আয়ুর্ব্বেদে জীর্ণ জ্বরের লক্ষণ এইরূপ উক্ত হইয়াছে।

ত্রিসপ্তাহ ব্যতীতস্তু জ্বরো যস্তনুতাং গতঃ।
প্লীহাগ্নিসাদং কুরুতে সজীর্ণ জ্বর উচ্যতে॥

অর্থাৎ যে জ্বর তিন সপ্তাহ ভোগের পর তনুতা প্রাপ্ত হইয়া প্লীহা ও অগ্নিসাদ উৎপাদন করে, তাহাকে জীর্ণ জ্বর বলা হয়। সুতরাং জীর্ণ জ্বরে প্লীহা থাকা অবশ্যম্ভাবী। যকৃৎ আদি স্থল বিশেষে থাকে এবং স্থল বিশেষে থাকেনা। জীর্ণজ্বর সন্তত, সতত, অন্যেদ্যু, তৃতীয়ক ও চাতুর্থক ভেদে পাঁচ প্রকার। ইহার মধ্যে সন্তত জ্বর অবিচ্ছেদী অর্থাৎ ইহার বিরাম হয় না, সামান্য কমে, তাহার উপর আবার জ্বর আসে। ইহাকে ডাক্তারগণ Malarial Remittent fever কহেন। সতত জ্বর দিবসে ২বার বেগ করিয়া আসে। ইহার ডাক্তারি নাম Double quotidian fever-সাধারণে ইহাকে দ্বৈকালীন জ্বর কহে। যে জ্বর প্রত্যহ ছাড়িয়া এবং প্রত্যহই আসে, তাহার নাম অন্যেদ্যু জ্বর। ইহার ইংরেজী নাম quotidian fever। একদিন অন্তর যে জ্বর আসে, তাহার নাম তৃতীয়ক জ্বর। ইংরাজী নাম tertian fever। দুই দিন অন্তর যে জ্বর আসে—তাহার নাম চাতুর্থক জ্বর, ইংরেজীতে ইহাকে quartah fever বলে। বিপর্য্যয় ভেদে আর এক প্রকার চাতুর্থক জ্বর আছে—যাহাতে দুইদিন জ্বর থাকে এবং এক দিন জ্বর থাকে না।

আজকাল যে জ্বরকে ম্যালেরিয়া জ্বর বলা হয়, তাহা উক্ত পাচ প্রকারেরই দেখা যায়। কালা জ্বর বলিলে যে জ্বরকে বুঝায়—তাহা সততক জ্বর। ম্যালেরিয়ার অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্র কুইনাইন, কালাজ্বর কুইনাইনে আরোগ্য হয় না। ম্যালেরিয়া জ্বরের রোগ-বীজাণু এবং কালাজ্বরের রোগ-বীজাণু এক নহে, এই জন্য পাশ্চাত্য মতে উভয়ের পার্থক্য স্বীকৃত হইয়াছে। ম্যালেরিয়াই হউক আর কালাজ্বরই হউক—উভয় প্রকার জ্বরই জীর্ণ জ্বরের অন্তর্ভুক্ত।

আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র বলেন, যে কোন শারীর-রোগ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে অহিত আহার-বিহারাদি দ্বারা শরীরস্থ বায়ু-পিত্ত এবং কফ নামক দোষত্রয়ের পৃথক অথবা মিলিতভাবে প্রকোপ থাকা আবশ্যক। দোষ প্রকোপই সর্ব্বরোগ উৎপত্তির হেতু।

"সর্ব্বেষামেব রোগানাং নিদানং কুপিতামলাঃ।
তৎপ্রকোপস্যতু প্রোক্তং বিবিধাহিত সেবনম্॥"

পাশ্চাত্য বিজ্ঞান বলেন যে, শরীর অসুস্থ না হইলে, রোগ-বীজাণু শরীরের ভিতর প্রবেশ

করিয়া বংশ বিস্তার পূর্ব্বক লব্ধবল হইয়া বিশিষ্ট রোগ উৎপাদনে সমর্থ হয় না। কারণ জীবদেহে সর্ব্বদাই নানাপ্রকারে নানারূপ রোগের বীজাণু প্রবেশ করে, কিন্তু শরীর সুস্থ থাকিলে, পালনী শক্তির প্রভাবে—হয় তাহারা ধ্বংশ প্রাপ্ত হয়—না হয় কার্য্যকরণে অসমর্থ হইয়া পড়ে। ইহা দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, দোষপ্রকোপের পর শরীরের এমন একটি অবস্থা উপস্থিত হয়, যখন বিশেষ এক জাতীয় রোগ-বীজাণু শরীরের ভিতর পুষ্ট হইয়া বিশেষ এক প্রকার রোগ উৎপাদন করে। বাহ্য জগতের যে অবস্থায় যে প্রকার রোগ-বীজাণু লব্ধবল এবং বংশ বিস্তারে সমর্থ হয়, শরীরের ভিতরের অবস্থা দোষ-প্রকোপ জন্য ঠিক সেইরূপ হইলে সেই প্রকার বীজাণু শরীরের ভিতর লব্ধবল এবং বংশবিস্তারে সমর্থ হয়। আয়ুর্ব্বেদ মতে বলিতে হইলে—এই প্রকার বলা যায়, যে, প্রকুপিত দোষ যখন ব্যাপারশীল হইয়া রোগ উৎপাদনের আয়োজন করে, তখন শরীর—বাহ্য জগতের যে অবস্থায় যে বীজাণু লব্ধবল এবং বংশ বিস্তারে সমর্থ হয় তদবস্থা প্রাপ্ত হয়, ফলে তজ্জাতীয় বীজাণু শরীরে প্রবেশ করিয়া লব্ধবল এবং বংশ বিস্তারে সমর্থ হয়। বাহিরের জীব—ভিতরে থাকিয়া নানাপ্রকার উৎপাৎ আনয়ন করে। বস্তুতঃ তাহারা রোগ উৎপাদন করে না। রোগীর যন্ত্রণা বাড়াইয়া দেয় মাত্র। বীজাণুর পুষ্টিলাভ এবং বংশ বিস্তার—রোগের হেতু নহে, উহা প্রকুপিত দোষের কার্য্য।

পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানের মতে বীজাণু ধ্বংস করিতে পারিলে রোগ আরোগ্য হয়। আয়ুর্ব্বেদ বলেন, কারণ-ভূত-প্রকুপিত-দোষ প্রকৃতিস্থ না হইলে কার্য্য-ভূত-ব্যাধি নিবৃত্ত হয় না অর্থাৎ কারণভূত প্রকুপিত দোষকে প্রকৃতিস্থ করিতে পারিলে কার্য্যভূত ব্যাধি দূর হয়।

এতৎ প্রসঙ্গে একটী কথা বলা বোধ হয় অবান্তর হইবে না,—জীবদেহে এমন একটী শক্তি আছে—যাহা জীবকে সর্ব্বদা নীরোগ রাখিতে চেষ্টা করে এই শক্তির প্রাচ্যনাম বৈষ্ণবী শক্তি বা পালনী শক্তি। অহিত আহারাদি দ্বারা দোষ-প্রকোপ উপস্থিত হইলে, এই শক্তি সেই প্রকুপিত দোষকে দূর করিবার জন্য প্রবলা হইয়া উঠে। প্রকুপিত দোষ এবং পালনী-শক্তির সংঘর্ষে শরীরে যে সমস্ত পীড়া দায়ক লক্ষণ দৃষ্ট হয়, তাহাকেই রোগ বলা হয়। শক্তি—দোষাপেক্ষা প্রবলতরা থাকিলে, বিনা চিকিৎসাতেই রোগী আরোগ্যলাভ করিতে পারে, কিন্তু দোষ প্রবলতর থাকিলে দোষ-প্রত্যনীক-ঔষধ-পথ্যাদির প্রয়োগ করিলে রোগী আরোগ্য লাভ করে। দোষ যদি অধিকতর প্রবল হয় এবং শক্তি যদি ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া আসে, তবে চিকিৎসায় কোনই ফল ফলেনা।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে জ্বর দিবসে দুইবার করিয়া আসে এবং যাহার সহিত প্লীহা থাকে, তাহাকে কালাজ্বর বলে। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে যে জ্বরকে সতত জ্বর কহে, তাহাও দিবসে দুইবার করিয়া আসে। "অহোরাত্রে সততকো দ্বৌকালাবনুবর্ত্ততে।" ইহা এক প্রকার জীর্ণজ্বর, সুতরাং ইহার সহিত প্লীহাও থাকে।

রক্তধাত্বাশ্রয়ঃ প্রায়োদোষঃ সততকং জ্বরম্।
স প্রত্যনীকং কুরুতে কাল বৃদ্ধি ক্ষয়াত্মকঃ॥

চরক চিঃ স্থান, ৩য় অধ্যায়।

অর্থাৎ দোষ প্রায় রক্ত ধাতুকে আশ্রয় করিয়া

সততজ্বর উৎপাদন করে। এই জ্বর প্রতীকার্য্য। যে দোষ ইহাকে উৎপাদন করে, কালে তাহার বৃদ্ধি এবং কালে তাহার ক্ষয় হয়। এখানে বলা হইয়াছে যে, দোষ 'প্রায়' রক্তধাতুকে আশ্রয় করে; এই 'প্রায়' কথা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে—দ্বৈকালীন জ্বর বা Double Quotidion fever Remittent, Typhoid জ্বরেও দেখা যায়, কিন্তু যেখানে দোষ—রক্তধাতুকে আশ্রয় করে না, তাহাকে কালাজ্বরও বলা হয় না।

রক্তধাত্বাশ্রয়ীদোষ কর্ত্তৃক উৎপন্ন যে সতত জ্বর তাহা সাধারণতঃ দুই প্রকারের দেখা যায়। প্রথম জ্বরোৎসৃষ্ট ব্যক্তির অর্থাৎ যাহাদিগের কোন প্রকারের জ্বর কেবল মাত্র সারিয়াছে, দোষশেষ অহিত আহার-বিহারাদির দ্বারা লব্ধ বল হইয়া রক্ত ধাতুকে আশ্রয় করিয়া সতত জ্বর উৎপাদন করে। দ্বিতীয়—আরম্ভ কালেই প্রকুপিত দোষ রক্ত ধাতুকে আশ্রয় করিয়া সতত জ্বর উৎপাদন করে। এই জ্বরের বেগ যে কখন্ হইবে—তাহার নিশ্চয়তা থাকে না। দিবা-রাত্রের মধ্যে দুইবার বেগ হয়। সচরাচর দিবসে একবার এবং রাত্রিতে একবার—এই দুইবার বেগ হইতে দেখা যায়, কিন্তু তাহারও কোন স্থিরতা নাই। দিবসেই দুইবার বা রাত্রেই দুইবার জ্বর আসিতেও পারে। দিবা ভাগে যে সময়ে জ্বর আসে, রাত্রিতেও ঠিক সেই সময় জ্বর আসিতেও দেখা গিয়াছে। জ্বর আসিবার কালে হাত-পা ঠাণ্ডা হইয়া শীত করিয়া জ্বর আসে, কখনও বা শীত মোটেই অনুভূত হয় না। যেখানে শীত করিয়া জ্বর আসে, সেস্থলে শীত দূর হইলে দাহ, পিপাসা এবং সন্তাপাধিক্য পরিলক্ষিত হয়।

প্লীহা এই রোগের সহচর। প্লীহারোগেও রক্তদুষ্টি থাকে। সুতরাং সতত জ্বরগ্রস্ত রোগীর রক্তের অবস্থা বড়ই খারাপ হয়। প্লীহারোগ সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদে এই প্রকার উক্ত হইয়াছে।

বিদাহ্যভিষ্যন্দিরতস্যজন্তোঃ
প্রদুষ্টমত্যর্থমসৃক্ কফশ্চ।
প্লীহাভিবৃদ্ধিং কুরুতঃ প্রবৃদ্ধৌ-
প্লীহোত্থমেতজ্জঠরং বদন্তি॥
তদ্বামপার্শ্বেপরিবৃদ্ধিমেতি
বিশেষতঃ সীদতি চাতুরোঽত্র।
মন্দজ্বরাগ্নিঃ কফপিত্তলিঙ্গৈঃ
রুপদ্রুতঃ ক্ষীণবলোঽতি পাণ্ডুঃ॥

অর্থাৎ বিদাহী ও কফ জনক দ্রব্য ভোজনরত-ব্যক্তির রক্ত ও কফ প্রদুষ্ট হইয়া প্লীহার বৃদ্ধি সাধনকরে। ইহার নাম প্লীহোত্থজঠররোগ। প্লীহা—উদরের বাম পার্শ্বে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ইহাতে রোগী অত্যন্ত অবসন্ন, মন্দজ্বর, অগ্নি-শক্তি হীন, কফ-পিত্তজ উপদ্রবে উপদ্রুত, ক্ষীণবল ও পাণ্ডুবর্ণ হয়।

কোন কোন স্থলে যকৃতের বৃদ্ধি এবং যকৃতে বেদনা দেখা যায়। কাসিও স্থল-বিশেষে দেখা যায় এবং তাহার ফলে কখন কখন ক্ষয়রোগ আসিতে দেখা গিয়াছে। এই জ্বরে জ্বরজন্য এবং প্লীহার জন্য রক্তের বিশেষ দুষ্টি হয় বলিয়া রোগীর গায়ে চুলকনা, খোস-পাঁচড়া দেখা দেয়। দন্তবেষ্ট (মাড়ি) ফুলিয়া উঠে, বেদনা ও শূল যুক্ত হয়। মুখের মধ্যেও স্থানে স্থানে ক্ষত প্রকাশ পায় এবং নাকদিয়া ন্যূনাধিক পরিমাণে রক্ত-নির্গত হয়। ক্রমশঃ প্লীহা-যকৃতের আকার বাড়িতে থাকে, ক্রমে শক্ত হইয়া উঠে। পাদশোথ, মুখশোথ বা সর্ব্বাঙ্গীন শোথ প্রকাশ পায় এবং উদরাময় প্রভৃতি উপদ্রব সর্ব্বশেষে আসিয়া উপস্থিত হয়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, এলোপ্যাথি

চিকিৎসায় এ রোগ আরোগ্য হয় না, তাহার কারণ এই যে, এলোপ্যাথি মতে এরোগ বিশিষ্ট-বীজাণু কর্ত্তৃক উৎপন্ন। বীজাণু-ধ্বংস হইলে রোগ সারিয়া যাইবে—এই সিদ্ধান্তে তাঁহারা চিকিৎসা করেন। যে দ্রব্যে বীজাণু ধ্বংস হয়, সেই দ্রব্য শরীরের ভিতর প্রবেশ করিলে বীজাণুর কারণভূত প্রকুপিত দোষকেও কিয়ৎ পরিমাণে প্রকৃতিস্থ করিতে পারে—সেই জন্য বীজাণুপ্রত্যনীক-চিকিৎসায় অনেক রোগ সারিতে দেখা যায়। কিন্তু কালাজ্বরে রক্তের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হয় বলিয়া বীজাণু ধ্বংস করিতে পারিলেও রোগীর উপদ্রবের কিয়ৎ-পরিমাণে শান্তি ভিন্ন আর কিছুই হয় না। কারণ দোষ প্রকৃতিস্থ না হইলে বীজাণু পুনঃ পুনঃ পুষ্টিলাভ করিতে পারে।

আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা দোষ-প্রত্যনীক। এই চিকিৎসায় প্রকুপিত দোষ প্রকৃতিস্থ হয়, তাহার ফলে বীজাণু—শরীরের যে অবস্থায় পুষ্ট হয়, সেই অবস্থা দূর হয় বলিয়া তাহারা আর বাঁচিতে পারে না এবং দোষ প্রকৃতিস্থ হইলে তাহার প্রকোপ জন্য উৎপন্ন যে রোগ—"কারণ ধ্বংসে কার্য্য ধ্বংস" এই নিয়মে দূরীভূত হয়।

রোগমাত্রেই সাধ্যাসাধ্য ভেদে দুই প্রকার; সুতরাং কালাজ্বরের ভিতরও সাধ্যাসাধ্যভেদ আছে। অসাধ্য লক্ষণ প্রকাশ পাইবার পূর্ব্বে দোষ-প্রত্যনীক-চিকিৎসা করিলে রোগ নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। কিন্তু অসাধ্য লক্ষণ প্রকাশ পাইলে কোন চিকিৎসায় সুফল পাওয়া যায় না।

আমরা অবগত হইয়াছি,—অনেক কালাজ্বরাক্রান্ত রোগী,—যাঁহারা অন্যরূপ চিকিৎসায় কোন ফলই পান নাই, আয়ুর্ব্বেদ মতে চিকিৎসিত হইয়া আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। কিন্তু হইলে কি হইবে?—আজকাল দেশের লোকের রুচি ভিন্ন প্রকারের। যতক্ষণ অর্থ ও সামর্থ্যে কুলায়, ততক্ষণ কেহই আয়ুর্ব্বেদ-মতে চিকিৎসিত হইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন না। যখন রোগের প্রতীকার হইবার কোন উপায় থাকে না, তখন কবিরাজের কাছে রোগী আসে। দেশের লোকের বুঝা উচিত,—যে আয়ুর্ব্বেদ এই দেশেরই চিকিৎসা-বিজ্ঞান এবং ইহার ঔষধাদি—এদেশীয় উপাদানে প্রস্তুত। আমাদের জন্ম এই দেশে এবং রোগও এই দেশের, সুতরাং ঔষধ যে ভিন্ন দেশে প্রস্তুত হইবে, ইহা প্রাকৃতিক নিয়মের বহির্ভূত। আমাদের উষ্ণ প্রধান দেশের রোগে আমাদের ঔষধ—পথ্যই যে বেশী উপকারী, সে সম্বন্ধে সন্দিহান হইবার কোন কারণই তো নাই।

শ্রীশচীন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ।

বন্ধ্যার পুত্রলাভ।

——— :০:-

সত্যঘটনামূলক গল্প

(১)

বিয়ের ক'নে সুধাকে যখন নানারূপ বাদ্য-কোলাহলের মধ্য হইতে বরণ করিবার জন্য পাল্কী হইতে] নামান হইল, তখন তাহার শাশুড়ী আনন্দে আট খানা হইলেন। টাকার

প্রলোভনে ছেলের বিয়ে দিয়া—তাঁহার স্বামী যেএমন চাঁদপানা বউ ঘরে আনিতে পারিবেন, —ইহা তিনি আগে ভাবিতেই পারেন নাই,—তাই তাঁহার আনন্দ—হাসিতে যেন ফুটিতে লাগিল। সুধার শাশুড়ী হাসিমুখে সুধাকে বরণ করিয়া ঘরে তুলিলেন। সুধা যে একটি পরমা সুন্দরী নারী-রত্ন-বিশেষ—গ্রামের মধ্যে এরূপ একটা সাড়া পড়িয়া গেল। দিন কতক এই আনন্দ-কোলাহলের মধ্যে থাকিয়া নববধূ পিত্রালয়ে চলিয়া গেল। তাহার পর বর্ষ ঘুরিল, সুধা, স্বামী-ঘর করিতে আসিল। তখন তাহার বয়স তের বৎসর। পতি, মনোমত পত্নী পাইয়া স্বর্গ-সুখ অনুভব করিতে লাগিলেন। এমনি করিয়া সুধার প্রথম জীবন কাটিয়া গেল।

কিন্তু মানুষের সুখ বুঝি চিরদিন সমান ভাবে থাকেনা,—পরিবর্ত্তনশীল-জগতে বিধাতার ইহাই অপূর্ব্ব নিয়ম! যে সুধা—একদিন শ্বশুর-শাশুড়ীর শুভ দৃষ্টি লাভ করিয়া ধন্তমনা হইয়াছিল, সে এখন তাঁহাদের উভয়েরই বিষ-নেত্রে পড়িয়াছে। তাহার কারণ, সুধার এখন বয়স হইয়াছে—বিংশের কাছাকাছি। অথচ এপর্য্যন্ত সে পুত্রবতী হইল না। সুধার স্বামীর এজন্য দুঃখ বা ক্ষোভ ছিলনা, কিন্তু তাহার শ্বশুর-শাশুড়ী ইহার ফলে তাহার উপর বিষম চটিয়া গেলেন. তাঁহারা স্থির করিলেন,—আবার ছেলের বিবাহ দিবেন। নানা স্থানে এজন্য পাত্রী-অনুসন্ধানও চলিতে লাগিল।

সুধার স্বামীর কিন্তু এ সকল ভাল লাগিল না, কিন্তু পিতৃ-মাতৃভক্ত পুত্র প্রকাশ্য ভাবে ইহার প্রতিবাদ করিতে না পারিয়া, যাহাতে সুধা পুত্রবতী হইতে পারে—তাহার জন্য—কত সাধু-সন্ন্যাসী—কত অতিথ-ফকির,—কত লোকের শরণাপন্ন হইল,—কত লোকে কত বুজরুগী করিয়া—কত ঔষধ বলিয়া দিয়া, কত পয়সা লইল,—কিন্তু কিছুতেই কিছু হইলনা,—এমনি করিয়া কত দিন কাটিয়া গেল।

এ দিকে সুধার শ্বশুর এক পাত্রী স্থির করিয়া ফেলিলেন। এ পাত্রী—সুধার মত সুন্দরী নহে,—সুধার বর্ণ—ফুটন্ত জ্যোৎস্নার মত,—ইহার বর্ণ উজ্জ্বল শ্যাম। ছেলের পছন্দ হইবে কিনা—তাহা লইয়া প্রথমতঃ তাঁহার একটু চিন্তা হইল, কিন্তু শেষে ভাবিলেন, বয়স্থা মেয়ে—চৌদ্দবৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছে, সুতরাং ছেলে—যুবতী পত্নী পাইয়া ভুলিয়া যাইবে। ফলে সম্বন্ধটা একরূপ পাকা পাকিই হইল, তবে সংপ্রতি পাত্রীর মাতা পরলোক গমন করায় আর একবৎসর গত করিয়া—কালাশৌচ অন্তে বিবাহ হইবে স্থির হইল।

সুধার স্বামী—সুধাকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসিতেন। পিতা তাঁহার ভবিষ্যৎ সুখের জন্য এতটা চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহার কিন্তু ইহা বিষবৎ বোধ হইতে লাগিল। একদিন শারদীয়-জ্যোৎস্নায়;—চন্দ্রালোকে সুধার স্বামী ও সুধা দ্বিতলের ছাদের উপর বসিয়া এই বিষয়ে প্রসঙ্গ করিতেছিল। সুধা বলিল—, "তুমি যাহাতে সুখী হও, আমি তাহাতেই সুখী, তুমি বিবাহ কর, আমি তাহাতে সুখী হইব।"

সুধার স্বামী বলিলেন,—"আমি ইহাতে সুখী —তা' তোমাকে কে বলিল সুধা! পিতা-মাতা এরূপ চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু ইহার সহিত আমার যে জীবন-মরণ-সম্বন্ধ নিহিত রহিয়াছে, তাঁ'রা তা' বুঝিতেছেন না—ইহাই দুঃখ। আমি

বিবাহ করিয়া সুখী হইব না সুধা। পিতা-মাতা যদি আমার পুনরায় বিবাহ দেন, তাহা হইলে আমি মরিয়া যাইব।"

সুধা একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল। তাহার পর ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—"আমার একটা কথা শুনিবে?"

সুধার স্বামী বলিলেন,—বলনা!

সুধা বলিল—"দেখ আমার বাপের বাড়ীর দেশে একটি স্ত্রীলোক আছেন, তিনি অনেককে অনেক রকম ঔষধ দেন, অনেক লোক তাঁর চিকিৎসায় সারিয়াছে। বাবা আর মাকে ব'লে, আমাকে দিন কতক বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দাও,—পাঠিয়ে দেবে কেন?—তুমিও দিন কতক চল। তাঁ'র সঙ্গে দেখা ক'রে, তিনি কি বলেন—শোনা যাক্, তা'র পর ভগবানের যা' ইচ্ছা—তা' তো হ'বেই।"

এই পরামর্শই সাব্যস্থ হইল। সুধার শ্বশুর-শ্বাশুড়ী সুধাকে পিত্রালয়ে পাঠাইতে রাজি হইলেন, কিন্তু ছেলে সঙ্গে যায়—এ ইচ্ছা তাঁহাদের বড় একটা ছিল না। যাহা হউক সুধাকে রাখিয়া সে চলিয়া আসিবে, এইরূপ সাব্যস্থ করিয়া, সুধাকে পিত্রালয়ে পাঠান হইল।

সুধা চলিয়া যাইলে পর, তাহার শ্বশুর,—গৃহিনীকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন,—"মন্দ হ'ল না, ছেলেটা বউমার কাছ থেকে যত তফাৎ থাকে—ততই ভাল, ওর মনটা বদ্লানর এ একটা সুযোগ।

(২)

দু'পর বেলা রান্না ঘরে বসিয়া ডালের হাঁড়িতে আমি কাঠি দিতেছি—এমন সময় 'কেমন আছ' বলিয়া সুধা রান্নাঘরে প্রবেশ করিল। আমি অনেক কাল তাহাকে দেখি নাই—তাহার এখন বাপের বাড়ী আসারও কোন কথা শুনি নাই,—তাহাকে দেখিয়া একটু চমকিয়া উঠিলাম। তাহার পর বলিলাম,—ভাল আছি,—তুই কখন্ এলি,—বস।

রান্নাঘরের সানের উপরে শুধু আসনে সুধা বসিয়া পড়িল। বসিয়া আমার ছেলে-মেয়েদের কথা জিজ্ঞাসা করিল। আমি বলিলাম—এই তো খেলা করিতেছিল, বোধ হয় রায়েদের বাড়ী থেকে বিন্দী আর ভবি এসেছিল—তা'দের সঙ্গে খেলা ক'র্‌তে ক'র্‌তে তা'দের বাড়ী চ'লে গিয়েছে।"

সুধার হাতে এক ঠোঙ্গা খাবার ছিল। সে উঠিয়া কুলুঙ্গি হইতে একখানি থালা লইয়া, ঠোঙ্গা হইতে খাবারগুলি তাহাতে ঢালিয়া আবার কুলুঙ্গিতে তুলিয়া রাখিল। তাহার পর বলিল—"খোকা-খুকীকে এইগুলি দিও।"

আমি বলিলাম—"খোকা-খুকীর জন্য তো খাবার এনেছিস্। আর তা'দের মায়ের জন্য কি এনেছিস্!"

সুধা হাসিল। হাসিয়া বলিল—"তোমার জন্যও এনেছি দিদি! তোমার জন্য ভাল গন্ধ-ওয়ালা তেল এনেছি। আজ বিকালে এসে সেই তেল দিয়ে—তোমার চুল বেঁধে দেব এখন।"

আমি বলিলাম—"আমার যে আর গন্ধ-ওয়ালা তেল মাখবার বয়স নেই। যাক্—তা' তুই আছিস্ ভাল তো? একলা এইছিস্—না জোড়ে এইছিস্!"

সুধা বলিল—"ওঁরাও এয়েছেন, কিন্তু দু'-জনের কেহই ভাল নেই।"

আমি বলিলাম—"কেন?"

সুধা সমস্ত ঘটনা আদ্যন্ত বিবৃত করিল। পিসীমা এতক্ষণ পূজায় ব্যস্ত ছিলেন।

তিনি পূজা শেষ করিয়া এই সময় রান্নাঘরে আসিলেন। সুধা তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। আমি বলিলাম—"পিসীমা, অনেক দিন রোগী পাওনি, আজ এই রোগীটি জুটিয়াছে।"

পিসীমা কি অসুখ জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি সমস্ত বলিলাম।

পিসীমা বলিলেন,—"আহা লোকনাথ বদ্দি যে ম'রে গেল, তা'র হাতে এ রকম কত বন্ধ্যা স্ত্রীরই যে ছেলে হ'তে দেখেছি, তা' ব'লতে পারি না। 'ফলকল্যাণ' নামে একটা ঘি খাওয়াইয়া তিনি কত বন্ধ্যাকেই যে পুত্রবতী করেছেন তা'র ঠিক নাই। তোমার স্বামীকে কোন একটা ভাল ক'ব্‌রেজের কাছ থেকে সেই ফলকল্যাণ ঘিটা তৈয়ার ক'রে নিতে বল, আমার খুব মনে হয়—তাই খেলে তোমার বন্ধ্যাত্ব দোষ কেটে যা'বে।"

আমি বলিলাম—"সে তো তৈরি ক'র্‌তে দেরী হ'বে পিসীমা,—এদিকে যে সতীন ঘট্‌বার আর এক বচ্ছর মাত্র সময়।"

পিসীমা বলিলেন,—হ্যাঁ সে ঘি তৈরি ক'র্‌তে একটু সময় লাগ্‌বে। এক বর্ণা জীবিত বৎসা গরুর দুধ দিয়ে সে ওষুধ তৈরি ক'র্‌তে হয়। তা' কোন ভাল ক'বরেজের কাছে তৈরিও থাক্‌তে পারে।

আমি বলিলাম—"এর কোন মুষ্টিযোগ বা টোট্‌কা নেই?"

পিসীমা বলিলেন,—"আছে, কিন্তু বাঁজা কে —সেটা বোঝা বড় শক্ত। বাঁজা মেয়ে মানুষও হ'তে পারে—আবার অনেক পুরুষও বাঁজা থাকে। যদি পুরুষ মানুষ বাঁজা হয়,—তা' হ'লে মেয়েমানুষকে ওষুধ খাইয়ে কি হবে?"

আমি বলিলাম—"দু'জনকেই খাওয়ালে হয় না?"

পিসীমা বলিলেন—"তা' হয়। আচ্ছা আমি গোটাকতক মুষ্টিযোগ ব'লে দিই, এইটা দিন কতক সুধা ক'রে দেখুক, আর 'ফল কল্যাণ ঘি'টাও এর মধ্যে কোন ক'বরেজের দ্বারা তৈরি ক'রে নেওয়ার ব্যবস্থা করা হোক্।"

আমি বলিলাম—"সেই বেশ।"

পিসীমা জিজ্ঞাসা করিলেন—"মাসিক ঋতুটা ঠিক হয়?"

সুধা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—ঠিক হয়।

তা'রপর পিসীমা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—"আর কোন অসুখ আছে ব'লে মনে হয়?"

সুধা বলিল—"না।"

পিসীমা বলিলেন—"দেখ এক কাজ ক'র্‌তে হ'বে—অশ্বগন্ধা মূল ২ তোলা, জল এক সের এবং দুগ্ধ এক পোয়া—এক সঙ্গে সিদ্ধ ক'রে, এক পোয়া থাক্‌তে নামিয়ে, তা'র সঙ্গে আধতোলা গাওয়া ঘি মিশিয়ে ঋতু স্নানের পর পান ক'র্‌তে হবে। এটা লোকনাথ বদ্দির একটা বড় মুষ্টিযোগ ছিল—এতে অনেকেই ফল পেয়েছে। আরও একটা ব্যবস্থা ব'লে দিই—সেটাও ক'রতে হ'বে! ঋতু স্নানের পর তো যেটা ব'ললাম—সেটা খাবেই, তা'ছাড়া ঋতুর তিন দিন ওলটকম্বলের মূলের* ছাল ৩।৪ রতি, আর গোলমরিচ ৮।১০টী—বেশ ক'রে জল দিয়ে বেটে সকাল বেলা খা'বে। আমার বোধ হয় দুটো কি তিনটে ঋতুতে এই ব্যবস্থা দু'ট ক'রলে যদি সুধা বাঁজা হয়, নিশ্চয় সে দোষ কেটে যা'বে।

আমি বলিলাম—"আর যদি সুধার স্বামী বাঁজা হয়?"

পিসীমা বলিলেন—অশ্বগন্ধা দিয়ে যে দুধটা

তৈরি করার কথা ব'ললাম—তিনি সেটা দিন কতক রোজ খেতে আরম্ভ করুন। যদি তিনি বাঁজা হন, তা'হলে ওতেই তাঁর বন্ধ্যাত্ব নষ্ট হ'য়ে যা'বে।

আমি পুনরপি বলিলাম—"আর কিছু ব্যবস্থা ক'র্‌তে হ'বে না? আর গোটাকতক মুষ্টিযোগ বলনা।"

পিসীমা বলিলেন—"এক সঙ্গে তো সব খাওয়ান হয় না? নইলে এর মুষ্টিযোগ আমি অনেক রকমই জানি। সে সব কথা তোমায় আর একদিন ব'লব।"

সুধা বলিল—"পিসীমা আমি তোমাকে ধন্বন্তরি মনে ক'রে এই ব্যবস্থায় চ'লব—তা'রপর আমার অদৃষ্ট।"

(৩)

পিসীমার ব্যবস্থামত সুধা, স্বামীকে রোজ অশ্বগন্ধা সিদ্ধ দুগ্ধ সেবন করাইতে লাগিল এবং নিজে পিসীমা যেরূপ বলিয়া দিয়াছিলেন, সেই রূপ দুইটী ঋতুতে অশ্বগন্ধা ও ওলট কম্বল সেবন করিল।

সুধার স্বামী এ সকল ব্যবস্থার উপরও একজন ভাল কবিরাজের দ্বারা "ফলকল্যাণ ঘৃত" তৈয়ার করাইয়া লইলেন. কিন্তু তাহার আর প্রয়োজন হইল না, কারণ পিসীমার ব্যবস্থায় ২ মাসের পরই সুধার গর্ভ সঞ্চার হইয়াছে—প্রকাশ পাইল। ফলে যথা সময়ে সুধা একটী পুত্র সন্তান প্রসব করিল, সুধার স্বামীর এবং তাহার শ্বশুর-শাশুড়ীর আর আনন্দের সীমা রহিল না।

এইবার সুধার স্বামীর তাহার পিতার নিকট কথা ফুটিল। তিনি বলিলেন—"বাবা, যে মেয়েটির সহিত আমার সম্বন্ধ স্থির করিয়া রাখিয়াছেন, তাহাদের অবস্থা ভাল নয়—আমাদের কথার উপর তাহারা নির্ভর করিয়া আছে, অতএব তাহার জন্য একটি সুপাত্রের ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া আমাদেরই কর্ত্তব্য।"

সুধার পিতা বলিলেন—"ঠিক।—তা' চেষ্টা করা যাউক।"

সুধার স্বামী বলিলেন—"সে পাত্র আমি ঠিক করিয়া রাখিয়াছি। আমারই একটী বন্ধু—এবার বি-এস-সি পাস করিয়াছে—কিছু লইবে না, আপনার সম্মতি পাইলে আমি তাহার সহিত বিবাহের বন্দোবস্ত করিয়া দিতে পারি।"

পিতা সম্মতি দিলেন। পুত্র নিজের জন্য যে পাত্রী স্থির করা হইয়াছিল, তাহার সহিত বন্ধুর বিবাহ দিলেন। সুধা, পিসীমার কৃপায় সপত্নীর ভয় হইতে নিষ্কৃতি পাইল। এখন সংসারে সুধার সম্মান কত! সে তো এখন আর বন্ধ্যা নহে,—সে যে এখন পুত্রবতী,—জননীপদ-বাচ্যা হইয়াছে।

শ্রীমতী কমলাবালা দেবী।

দিন-চর্য্যা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিত অংশের পর)

গতবারে যে পরিমিত মাত্রায় আহার করিবার কথা আমরা বলিয়াছি,—প্রত্যেক স্বাস্থ্যকামীর পক্ষে তাহা পালন করা কর্ত্তব্য। পরিমিত আহার করিবে এবং পূর্ব্বাহার জীর্ণ

হইলে ভোজন করিবে। পূর্ব্বাহার না হইতে হইতে ভোজন করিলে পূর্ব্বাহারের অপরিণত রসের সহিত পরবর্ত্তী আহারের রস মিলিত হইয়া--সত্বর দোষ সকলকে কুপিত করে। কিন্তু পূর্ব্বাহার জীর্ণ হওয়ায় পরে যখন দোষ সকল স্বস্থানে অবস্থান করে, অগ্নি উদ্রিক্ত হয়, ক্ষুধা হয়, স্রোতঃ মুখ সকল বিবৃত হয়, বিশুদ্ধ উদ্গার হয়, বায়ুর অনুলোম হয়, বায়ু, মল ও মূত্র নির্গত হয়,—সেই সময়ে আহার করিলে ভুক্তদ্রব্য শরীরের ধাতু সমূহকে দূষিত করে না, পরন্তু আয়ুবৃদ্ধি করিয়া থাকে। এইজন্য পূর্ব্বাহার জীর্ণ হইলে ভোজন করা উচিত। অবিরুদ্ধ-বীর্য্য-খাদ্য আহার করিবে। ইহাতে বিরুদ্ধবীর্য্য খাদ্য সেবনজনিত রোগ জন্মিতে পারে না। বিরুদ্ধবীর্য্য খাদ্য কি, তাহা পরে বলা যাইবে।

পবিত্র হইয়া, পবিত্র উপকরণ সংযুক্ত আহার করিবে। পবিত্র হইয়া আহার না করিলে, অনভিলষিত স্থানে আহার করিলে, তাহাতে অপ্রিয় আহার জন্য মন উপহত হয়।

অতিদ্রুত ভোজন করিবে না। অতিদ্রুত ভোজন করিলে ভুক্ত দ্রব্যের স্বাদগ্রহণও হয় না এবং ভোজ্য পদার্থের দোষ-গুণের উপলব্ধি হয় না, এজন্য অতিদ্রুত ভোজন করা উচিত নহে।

অতি বিলম্ব করিয়া ভোজন করিবে না। অতি বিলম্ব করিয়া ভোজন করিলে তৃপ্তি হয় না, অতিরিক্ত ভোজন করা হয় (যেমন নিমন্ত্রণ খাইতে গিয়া অধিক খাওয়া হয়), খাদ্য শীতল হইয়া যায়, ভুক্ত দ্রব্যের বিষম পাক হয় অর্থাৎ কতক খাদ্য পরিপাক হয় এবং আবার কতক খাদ্য নূতন করিয়া আমাশয়ে প্রবেশ করে—এইজন্য সমস্ত খাদ্য এক সঙ্গে পরিপাক পায় না।

কথা না কহিয়া, না হাসিয়া এবং তন্মনা হইয়া ভোজন করিবে। অতিদ্রুত ভোজন করিলে যে দোষ হয়, এই সকল কারণে সেই সকল দোষ ঘটিয়া থাকে।

আপনার অবস্থা সম্যক বিবেচনা করিয়া আহার করিলে সেই আহার সাত্ম্য অর্থাৎ হিতকর হয়।

এক্ষণে পরিমিত আহার কি তাহা লিখিত হইতেছে।

শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে যে, উদরের দুই অংশ অন্নের দ্বারা এবং এক অংশ পানীয়ের দ্বারা পূর্ণ করিবে এবং পানাদির আশ্রয় জন্য চতুর্থভাগ অবশিষ্ট রাখিয়া দিবে। এতদ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, সম্পূর্ণ পেট ভরিয়া আহার করা উচিত নহে। বাল্যকালে বৃদ্ধাদিগের মুখে এ সম্বন্ধে একটা বাঙ্গালা ছড়া শুনিয়াছিলাম।

"উনভাতে দুনো বল
বিস্তর ভাতে রসাতল ?"

শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে যে, আহারের মাত্রা অগ্নি-বলের অপেক্ষা করে অর্থাৎ যাহার অগ্নিবল অধিক, তাহার খাদ্যের মাত্রা অধিক, এবং যাহার অগ্নিবল কম, তাহার খাদ্যের মাত্রা কম হওয়া উচিত। যাহার যেরূপ মাত্রায় আহার করিলে প্রকৃতির (অর্থাৎ স্বাভাবিক স্বাস্থ্য, মল মূত্রাদির প্রবৃত্তি ইত্যাদি) বাধা জন্মেনা,—অথচ ভুক্তদ্রব্য যথাকালে বিনাক্লেশে জীর্ণ হয়, তাহার পক্ষে তাহাই পরিমিত মাত্রা।

রক্ত শালি ও ষষ্টিক প্রভৃতির তণ্ডুল, মুগের দাল, তিত্তির পক্ষীর মাংস, কৃষ্ণ সার হরিণ, শশক, শরভ ও শম্বর নামক হরিণের মাংস প্রভৃতি লঘুপাক হইলেও পরিমিত মাত্রায় আহার করা উচিত। আবার পিষ্টক, ইক্ষু-বিকৃতি (গুড় চিনি), দুগ্ধ-বিকৃতি

(দধি ছানা, ক্ষীর) মাষ কলায়, আনূপ দেশজাত মাংস, কচ্ছপ প্রভৃতি জলজ মাংস স্বভাবতঃ গুরুপাক হইলেও পরিমিত মাত্রায় আহার করা উচিত। গুরু লঘু সকল দ্রব্যই মাত্রাপেক্ষী হওয়া উচিত—এইরূপ বলায় দ্রব্যের গুরুত্ব ও লঘুত্ব অকারণ মনে করিবে না।

লঘুপাক দ্রব্য সকল বায়ু ও অগ্নিগুণ বহুল এবং গুরুপাক দ্রব্য সকল ভূমি ও সোম-গুণ বহুল। এইজন্য লঘুদ্রব্য স্বয়ং অগ্নিকে বর্দ্ধিত করে বলিয়া অতিরিক্ত পরিমাণে সেবিত হইলেও অল্প দোষ জন্মায়। আবার গুরুদ্রব্য অগ্নির বিপরীত-ধর্ম্মী বলিয়া, অগ্নি বৃদ্ধি করিতে পারেনা, সুতরাং অতিরিক্ত মাত্রায় সেবিত হইলে অত্যন্ত দোষ জন্মাইয়া থাকে। এইজন্য ব্যায়াম দ্বারা অগ্নিবল প্রবল না হইলে, গুরু-দ্রব্য কখনই অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে সেবন করা উচিত নহে।

দ্রব্য-বিবেচনায় আহার করিতে হইলে, গুরুপাক দ্রব্য অর্দ্ধতৃপ্তি বা ত্রিভাগ তৃপ্তি পর্য্যন্ত সেবন করা উচিত। লঘু দ্রব্য তৃপ্তি পর্য্যন্ত ভোজন করা যাইতে পারে, কিন্তু তৃপ্তির অতিরিক্ত ভোজন করা উচিত নহে। পরি-মিত ভাবে আহার করিলে প্রকৃতি উপহত হয় না এবং তদ্দ্বারা বল, বর্ণ, সুখ, ও আয়ুবর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

পিষ্টক চিপিটক প্রভৃতি তণ্ডুলজাত পদার্থ গুরুপাক বলিয়া ভুক্ত অবস্থায় কদাচ সেবন করা উচিত নহে এবং ক্ষুধিত ব্যক্তির পরিমিত মাত্রায় আহার করা উচিত। শুষ্ক মাংস, শুষ্ক শাক, কৃশ পশুর মাংস, ক্ষীর, ছানা, মৎস্য, দধি, মাষকলায় প্রভৃতি দ্রব্য গুরুপাক বলিয়া নিত্য ভোজন উচিত নহে।

ষেটে-ধান, শালিধান, মুগের দাল, সৈন্ধব, আমলকী, যব, বৃষ্টির জল, দুগ্ধ, ঘৃত, জাঙ্গল মাংস ও মধু নিত্য—সেবন করা উচিত। যে সকল দ্রব্য সেবন করিলে স্বাস্থ্য ভাল থাকে এবং রোগের উৎপত্তি না হয় সেই সকল দ্রব্য ভোজন করিবে।

উপরে যে সকল খাদ্য নিত্য সেবন করিবার কথা বলা হইয়াছে, তাহাতে বর্ত্তমান কালের বৈজ্ঞানিকগণের মতের সহিত সম্পূর্ণ—সামঞ্জস্য আছে। পাঠকগণের অবগতির নিমিত্ত আমরা তাহা দেখাইতেছি। অবশ্য উপরোক্ত খাদ্যের তালিকা দিগদর্শন মাত্র। উহার সহিত ফল ও তরকারী ধরিয়া লইতে হইবে।

আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ বলেন যে; পাঁচ প্রকার দ্রব্য আহার করা উচিত। যথা প্রোটিড (Proteid) কার্ব্বোহাইড্রেট (carbohydrate), চর্ব্বি (fost), ধাতব লবণ (Mineral salts) এবং জল। কথিত খাদ্যে এই সমস্ত দ্রব্যই উপযুক্ত মাত্রায় বর্ত্তমান আছে। আধুনিক মতানুযায়ী খাদ্য গুলির উপাদানের তালিকা পরপৃষ্ঠায়প্রদত্ত হইল। প্রত্যেক দ্রব্যে শতকরা যে উপাদান যত থাকে, তাহা লিখিত হইল। বিজ্ঞ পাঠক বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারিবেন যে, ঐ সকল খাদ্যদ্রব্য আহার করিলে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক দিগের কথিত শরীরের প্রয়োজনীয় সমস্ত খাদ্যই আহার করা হয়। এক্ষণে বিরুদ্ধভোজন কি—তাহাই সংক্ষেপে কথিত হইতেছে।

বিরুদ্ধ-ভোজন নানা প্রকার,—যথা গুণ-বিরুদ্ধ, সংযোগ-বিরুদ্ধ, সংস্কার-বিরুদ্ধ, দেশ, কাল ও মাত্রা-বিরুদ্ধ এবং স্বভাবতঃ বিরুদ্ধ।

	প্রোটিড	কার্ব্বোহাইড্রেট	চর্ব্বি	লবণ	জল
চাউল	৬০৯	৭৯.৪	.৪	.৫	১২.৪
যব	১০.১	৭১.২	১.৯৭	১.৯	১২.৩
দাল	২৩.১	৫৩.৬	২.২	৩.৫	১৩.৬
দুগ্ধ	৩.৯৭	৪.৮	৪.২৮	.৬	৮৬.৮
ঘৃত		—	১০০	৬	—
মাংস	১৮.১১	—	৭.৭৭	—	৭৫.৯৯
লবণ		—	—	১০০	

দুগ্ধ ও মৎস্য সংযোগ বিরুদ্ধ বলিয়া একত্রে আহার করা উচিত নহে। মধু, গুড়, তিল, দুগ্ধ-মাষকলায়, মূলা, অঙ্কুরিত ধান্যের অন্ন—ইহাদের কোনটীর সহিত ছাগাদি মাংস, এবং মৎস্যাদি ভক্ষণ করা উচিত নহে। মূলা রসুন বা সজিনা শাক আহার করিয়া দুগ্ধ পান করিবে না। মধু ও দুগ্ধের সহিত অথবা মাষকলায়, গুড় ও ঘৃতের সহিত একত্র আহার করিবে না। দুগ্ধের সহিত সর্ব্বপ্রকার অম্ল দ্রব্য ভক্ষণ করিবে না।

বিরুদ্ধ দ্রব্য সেবন করিলে উৎকট রোগ—এমন কি মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে।

কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, ঈর্ষা, লজ্জা, শোক, অভিধান, উদ্বেগ ও ভয়দ্বারা মন পীড়িত হইলে, সে সময়ে আহার করিবে না, কারণ তাহাতে অন্ন জীর্ণ হয় না এবং আম দোষ জন্মে।

আচমন—আহারের পর আচমন করিবে এবং দন্ত মধ্য গত অন্ন তৃণাদি দ্বারা নির্গত করিয়া ফেলিবে। কেননা উহা বাহির করিয়া না ফেলিলে মুখে দুর্গন্ধ জন্মে এবং দন্তের অনিষ্ট হয়।

তাম্বূল সেবন—আহারের পর সুপারী, কর্পূর, লবঙ্গ, জায়ফল প্রভৃতি সংযুক্ত তাম্বুল সেবন করিবে। তাম্বূল সেবন করিলে মুখ পরিষ্কৃত ও সুগন্ধ যুক্ত হয়, দন্ত, মল, স্বর, জিহ্বা ও ইন্দ্রিয় বিশুদ্ধ হয়, কফাদির স্রাব নষ্ট হয় এবং গলরোগ নষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু রক্তপিত্ত, উরঃক্ষত, ক্ষীণ, পিপাসা ও মূর্চ্ছা রোগে এবং রুক্ষ ও দুর্ব্বল ব্যক্তির পক্ষে তাম্বূল হিতকর নহে।

আহারান্তে কর্ত্তব্য—আহারের পরে ধীরে ধীরে এক শত পদ চলিয়া বাম পার্শ্বে শয়ন করিবে এবং মনের প্রিয়রূপ রস ও গন্ধ উপভোগ করিবে। ইহাতে ভুক্ত অন্ন দূষিত হয় না।

আহারান্তে অগ্নি বা রৌদ্রের তাপ লাগান এবং অশ্বাদি যানে আরোহণ পূর্ব্বক ভ্রমণ প্রভৃতি শ্রমজনক কার্য্য অহিতকর।

জলপান,—শরীরে জলের যতটুকু আবশ্যকতা ঘটে তাহার অধিকাংশ খাদ্য ও জলীয়ের সহিত উদরস্থ হয়, তদ্ব্যতীত বিশুদ্ধ জল পান করিয়াও আমরা তাহার কিয়দংশ পূরণ করি। শাস্ত্রে শরৎ ও গ্রীষ্মকাল ভিন্ন অন্য ঋতুতে সুস্থ ব্যক্তিকেও অল্প মাত্রায় জলপান করিবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। আহারের পূর্ব্বে জল পান করিলে শরীর কৃশ এবং আহারের পরে জলপান করিলে শরীর স্থূল হইয়া থাকে।

শাস্ত্রে আন্তরীক্ষ-গাঙ্গ নামক জলকেই উৎকৃষ্ট বলা হইয়াছে। যে আন্তরীক্ষ-জল রজত পাত্রস্থিত শাল্যন্নকে ক্লিন্ন করে না, তাহাকে গাঙ্গ-জল বলে। এতদ্ভিন্ন অন্য আন্তরীক্ষ-জলকে সামুদ্র বলে। সামুদ্র এবং আন্তরীক্ষ-জল আশ্বিন মাস ব্যতীত অন্য সময়ে পান করিতে নাই।

আন্তরীক্ষ-জলের অভাবে ভৌম জল গ্রহণ করিতে হয়। মৃত্তিকা ভেদে এবং নাদেয়, কৌপ প্রভৃতি ভেদে জলের নানা প্রকার গুণ শাস্ত্রে লিখিত হইয়াছে। অনাবশ্যক বিবেচনায় সে সমস্ত লিখিত হইল না। ভৌম (ভূমি জাত) জল প্রাতঃকালে গ্রহণ করিতে হয়। যে জল আস্বাদন ও গন্ধহীন, বিবর্ণ নহে, স্বচ্ছ এবং মল রহিত—তাহাই বিশুদ্ধ। বিশুদ্ধ জলের অভাবে অবিশুদ্ধ জল অগ্নিতে সিদ্ধ করিয়া স্থূল বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া লইবে।

পিত্ত-প্রধান ব্যক্তির পক্ষে শীতল জল; বায়ু ও কফ প্রধান ব্যক্তির পক্ষে ঈষদুষ্ণ জল হিতকর। দিবসের সিদ্ধ জল—রাত্রিতে এবং রাত্রির সিদ্ধ করা জল দিবসে ব্যবহার করা উচিত নহে।

বর্ষাকালে নদীর জল কর্দ্দম এবং বিবিধ প্রাণীর লালা, মূত্র, অণ্ডাদি দ্বারা দূষিত হয় বলিয়া সে সময়ে নদীর জল ব্যবহার করা উচিত নহে। শরৎকালে সর্ব্বপ্রকার ভৌম জল হিতকর হইয়া থাকে।

তৃষিত ব্যক্তি জল না পাইলে মোহ প্রাপ্ত হয় এবং মোহ হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটে, সেইজন্য কোন অবস্থাতেই জল পান নিষেধ করা উচিত নহে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, রোগ প্রতিকার এবং দীর্ঘ জীবন লাভের উপায় স্বরূপ বহুবিধ নীতি—ধর্ম্ম শাস্ত্রের আদেশ অবশ্য পালনীয় বলিয়াই সম্ভবতঃ আয়ুর্ব্বেদে ঐ সকলের পুনরুক্তি করা হয় নাই। অথবা ধর্ম্মশাস্ত্রের বিবিধ বচন যখন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে, তখন হয়ত সে সকল বিষয়ও আয়ুর্ব্বেদের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছিল। বহুকালব্যাপী বিপ্লবের ফলে সেই সকল গ্রন্থ বা গ্রন্থাংশ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। নচেৎ এরূপ নিতান্ত প্রয়োজনীয় বিষয়ে সূক্ষ্মদর্শী আয়ুর্ব্বেদকারগণের দৃষ্টি পতিত হয় নাই,—ইহা সম্ভবপর নহে।

মনু সংহিতায় লিখিত হইয়াছে;—"জলে—মূত্র, পুরীষ, থুথু, পূয়াদি অমেধ্য বস্তু-লিপ্ত দ্রব্য, রক্ত বা বিষ নিক্ষেপ করিবে না। এই বিধি পালন করিলে—পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ কলেরা রোগের প্রতিষেধের জন্য যাহা প্রধান উপায় বলেন—তাহা অবলম্বন করা হয়। তাঁহাদিগের মতে কলেরা রোগীর মল কোনরূপে জলে মিশ্রিত হইলে রোগের সংক্রমন ঘটে। এই উপদেশ পালন করিলে ইহা ঘটিতে পারে না।"

মনু সংহিতায় আরও লিখিত আছে;—

"মূত্র, পা ধোয়া জল, উচ্ছিষ্টান্ন, শুক্র প্রভৃতি গৃহ হইতে দূরে (একটী তীর ছুড়িলে যত দূর যায়—তত দূরে) পরিত্যাগ করিবে। এই বিধি পালন করিলে গৃহাদি পবিত্র থাকে,—কোনরূপ আবর্জ্জনা গৃহের নিকটে জমিতে পায় না, কোনরূপ দুর্গন্ধ আঘ্রাণ করিতে হয় না এবং স্বাস্থ্য ভাল থাকে।" বাহুল্য ভয়ে আমরা অধিক প্রমাণ উদ্ধৃত করিলাম না। অনুসন্ধিৎসু পাঠক মনু সংহিতা পাঠ করিলে আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত বহু স্বাস্থ্য-নীতি নিহিত আছে তন্মধ্যে দেখিতে পাইবেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, গৃহাদি নির্ম্মাণ করা সম্বন্ধে পূর্ব্বে আমাদের দেশে এরূপ সুনিয়ম ছিল যে, সেই সকল নিয়মানুসারে গৃহ নির্ম্মাণ করায় গৃহমধ্যে যথেষ্ট বায়ু ও রৌদ্রের সমাবেশ ঘটিত। সেই নিয়ম অনুসারে এই কারণেই আজিও দক্ষিণদ্বারী ঘর-ঘরের রাজা এই প্রবাদ বাক্যের প্রচলন দেখা যায়।

আয়ুর্ব্বেদের সদাচার বিধি রোগ প্রতিষেধক এবং দীর্ঘজীবন লাভ সম্বন্ধীয় নীতির অন্তর্ভুক্ত। এই জন্য সদাচার বিষয়ক কয়েকটী নীতি লিখিয়া আমরা প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

নিত্য পরিষ্কার বস্ত্র পরিধান করিবে, প্রসন্নমনা ও সুগন্ধধারী হইবে। শ্রান্তি বোধ হইবার পূর্ব্বেই শ্রমজনক কার্য্য পরিত্যাগ করিবে। দুষ্ট ঘোটকাদি-যানে আরোহণ করিবেনা। উজ্জ্বল জ্যোতির্ম্ময় পদার্থের প্রতি চাহিয়া থাকিবেনা। ঊর্দ্ধ জানু হইয়া অধিকক্ষণ বসিয়া থাকিবেনা। শ্রান্তি দূর না হইলে স্নান করিবেনা। স্নান করিয়া সেই বস্ত্র পরিধান করিয়া, অধিকক্ষণ থাকিবেনা। শরীর বক্রভাবে রাখিয়া হাঁচিবেনা, আহার করিবেনা এবং শয়ন করিবেনা।

চঞ্চল মনকে অধিকতর চঞ্চল করিবে না। জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অতি চালনা করিবেনা। অতিশয় দীর্ঘসূত্রী হইবেনা। ক্রোধ ও হর্ষের অনুবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিবেনা। শোকের বশীভূত হইবে না। কার্য্য সিদ্ধিতে অত্যন্ত আনন্দিত কিংবা কার্য্যের অসিদ্ধিতে অত্যন্ত দুঃখিত হইবে না। কার্য্য-কারণ সম্বন্ধে নিশ্চিত-বুদ্ধি হইবে অর্থাৎ এইরূপ কার্য্য করিলে এইরূপ ফল হইবে ইহা নিশ্চয় বুঝিবে।

হর্ষ-পরায়ণ হইবে, অর্থাৎ সর্ব্বদা আনন্দিত চিত্তে কাল অতিবাহিত করিবে। ব্রহ্মচর্য্য-পরায়ণ হইবে। উপেক্ষা পরায়ণ হইবে অর্থাৎ মান-অপমান, জয়-পরাজয়, সুখ-দুঃখ প্রভৃতিতে উত্তেজিত বা ক্লিষ্ট না হইয়া, সমভাবাপন্ন হইবে, কিছুতেই মনের শান্তিকে নষ্ট হইতে দিবে না।

রসায়ন ও বাজীকরণ।

আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রোক্ত রসায়ন এবং বাজীকরণ—দুইটী অপূর্ব্ব পদার্থ। দুঃখের বিষয় আজকাল বাজীকরণ আদৃত হইলেও রসায়নের ব্যবহার এক প্রকার লোপ পাইয়াছে। অপিচ, বাজীকরণ-ঔষধ প্রচলিত থাকিলেও অল্পব্যয় সাধ্য এবং সহজলভ্য বাজীকরণ ঔষধের প্রচার

নিতান্ত কম। চিকিৎসকের নিকট—যে সকল বাজীকরণ ঔষধ কিনিতে পাওয়া যায়,—সেগুলি বহুমূল্য।* এই প্রবন্ধে আমরা রসায়ন ও বাজীকরণ ঔষধ সম্বন্ধে আলোচনা করিব। প্রথমে রসায়নের বিষয় কথিত হইতেছে।

রসায়ন ঔষধ দুই প্রকার, কতকগুলি সুস্থ ব্যক্তির ওজোবর্দ্ধক এবং কতকগুলি রুগ্নের রোগ নাশক। যে সমস্ত ঔষধ সুস্থ ব্যক্তির ওজোবর্দ্ধক, সেইগুলি রসায়ন ও বাজীকরণ নামে খ্যাত।

রসায়ন ও বাজীকরণ প্রধানতঃ সুস্থ ব্যক্তির জন্য কল্পিত হইলেও রোগীর রোগ প্রশমনের জন্যও উপযুক্ত ক্ষেত্রে ঐ সকল ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। যদুক্তং চরকে,—

প্রায়ঃ প্রায়েণ রোগাণাং দ্বিতীয়ং প্রশমেমতং।
প্রায়োঃ শব্দো বিশেষার্থেহ্যভ্যয়ং হ্যভয়ার্থকৃৎ॥

অর্থাৎ রসায়ন প্রায় সকল প্রকার রোগ-নাশক। কিন্তু প্রায় শব্দ এখানে বিশেষার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, কারণ দুইটীই (রসায়ন এবং বাজীকরণ) সুস্থের ওজোবর্দ্ধক এবং রুগ্নের রোগাপহরণ—এই উভয় কার্য্য সাধক।

রসায়ন ঔষধ প্রায় সর্ব্বপ্রকার রোগনাশক—এই কথায় কেহ এমন বুঝিবেন না যে, নবজ্বরে, সান্নিপাতিক জ্বরে, বা অতিসারে রসায়ন ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। পাছে কেহ এইরূপ মনে করেন—সেই জন্য শাস্ত্রকার বলিয়াছেন—"সুস্থব্যক্তির ওজস্কর ঔষধের বিষয় বলা যাইতেছে। যে সকল ব্যাধিনাশক তাহা চিকিৎসা স্থানে বলা যাইবে। রোগ সমূহের যাহা ঔষধ তদ্দ্বারাই চিকিৎসা করা যায়।"

এখন সহজেই মনে হইতে পারে, পূর্ব্বে বলা হইল যে, রসায়ন ঔষধ প্রায় সমুদায় রোগনাশক, এবং পরে বলা হইল যে, ভিন্ন ভিন্ন রোগের যে সকল ঔষধ,—তদ্দ্বারাই তাহাদের চিকিৎসা করিবে। ইহাতে বুঝিবে কি?

ইহার মীমাংসা এই ;—রোগনাশের জন্য রোগনাশক ঔষধ এবং সুস্থের ওজোবর্দ্ধন জন্য রসায়ন ও বাজীকরণ ঔষধ প্রধানতঃ প্রয়োজ্য। কিন্তু রসায়ন ও বাজীকরণ বিশেষতঃ রসায়ন ঔষধ-প্রয়োগ দ্বারা অধিকাংশ রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে। রসায়নের রোগনাশকতা সম্বন্ধে একটা উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে।

গত বর্ষের ২য় ও ৩য় সংখ্যক "আয়ুর্ব্বেদে" "হরীতকী" শীর্ষক প্রবন্ধে ঋতু হরীতকী নামক রসায়নের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। অপিচ, উক্ত প্রবন্ধে হরীতকী যে সকল রোগ-নাশে সক্ষম, তাহাও বলা হইয়াছে। এতদ্দ্বারা বুঝা যায়—হরীতকী যে সকল রোগনাশে সক্ষম, ঋতু হরীতকী সেবনে সেই সকল রোগ নিরাকৃত হয়। কিন্তু এইটুকু বুঝিলেই চলিবে না। ঔষধ প্রয়োগ সর্ব্বত্রই যুক্তির উপর নির্ভর করে। কারণ হরীতকী-গুণ প্রসঙ্গে—হরীতকী অতিসারনাশক বলিয়া কথিত হইয়াছে। কিন্তু অতিসার হইলেই তাহাকে ঋতু হরীতকী প্রয়োগ করা চলে না। বিবদ্ধতাযুক্ত পুরাতন অতিসারে ঋতু হরীতকী ফলপ্রদ। সর্ব্বত্রই এইরূপ বিচার করিয়া রসায়ন ঔষধ ব্যবহার করিতে হইবে।

"যজ্জরা ব্যাধি বিধ্বংসী ভেষজং তদ্রসায়নম্"
অর্থাৎ যে ঔষধ জরারূপ ব্যাধি বিধ্বংসী তাহাই রসায়ন।

এস্থলে জরারূপ ব্যাধি-বিধ্বংসী অর্থে জরার প্রতিষেধক,—জরা নাশক নহে। কারণ, জরা-মৃত্যুরূপ স্বাভাবিক ব্যাধির কবল হইতে কেহই রক্ষা পায় না। স্বয়ং দেবাদিদেব মহাদেব একদিন ক্ষুণ্ণমনে কার্ত্তিককে বলিয়াছিলেন ;—

"মমায়ুর্গ্রসতে কালঃ কুতো পুত্র রসায়নম্।"

অর্থাৎ,—হে পুত্র, কাল আমার আয়ুঃ গ্রাস করিতেছে, রসায়ন ঔষধে আর কি ফল হইল!

তবে রসায়ন ঔষধ একেবারে জরার আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে না পারিলেও মনুষ্যকে সুদীর্ঘকাল জরার আক্রমণ হইতে অব্যাহত রাখিতে পারে। রোগভোগ, শরীরের প্রতি অত্যাচার এবং অত্যধিক দুশ্চিন্তা প্রভৃতি কারণে মনুষ্য যেমন অকালে জরাগ্রস্ত হয়, সেইরূপ সুনিয়মে থাকিয়া রসায়ন ঔষধ সেবন করিলে মনুষ্য দীর্ঘকাল জরার আক্রমণ হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে।

চ্যবন প্রাশ নামক সুপ্রসিদ্ধ রসায়নের ফলশ্রুতিতে লিখিত হইয়াছে :—

অস্য প্রয়োগাচ্চ্যবনঃ সুবৃদ্ধোঽভূত পুনর্যুবা।

অর্থাৎ,—এই ঔষধ প্রয়োগের দ্বারা বৃদ্ধ চ্যবনঋষি পুনরায় যৌবন লাভ করিয়াছিলেন।

রসায়ন ঔষধ সেবন দ্বারা কি ফল পাওয়া যায়,—সে সম্বন্ধে শাস্ত্রকার লিখিয়াছেন,—

দীর্ঘমায়ুঃ স্মৃতিং মেধামারোগ্যং তরুণং বয়ঃ।
প্রভাবর্ণ স্বরৌদার্য্যং দেহেন্দ্রিয়বলং পরং।
বাকসিদ্ধিং প্রণতিং কান্তিং লভতে না রসায়নাৎ।
লাভোপায়ো হি শস্তানাং রসাদীনাং রসায়নং॥

অর্থাৎ—রসায়ন ঔষধ সেবন দ্বারা মনুষ্য দীর্ঘ পরমায়ু, স্মৃতি, মেধা, আরোগ্য, (অর্থাৎ রোগ না হওয়া), তরুণ বয়স (অর্থাৎ দীর্ঘ স্থায়ী যৌবন), প্রভা, বর্ণ ও স্বরের উৎকর্ষ; দেহ ও ইন্দ্রিয়ের অতিশয় বল, বাকসিদ্ধি, বিনয় এবং কান্তিলাভ করিতে পারে। উৎকৃষ্ট রসাদি ধাতু লাভের উপায় স্বরূপ বলিয়া ইহা রসায়ন নামে কথিত হইয়াছে।

কিন্তু প্রকৃত পক্ষে দীর্ঘ আয়ুঃ প্রভৃতি লাভ করা কি এতই সহজ যে, কেবল মাত্র কিছু ব্যয় করিয়াই রসায়ন সেবন করিলে, দীর্ঘ আয়ু লাভ ঘটিয়া থাকে? যদি তাহা হইত তাহা হইলে পৃথিবী স্বর্গাপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ লোক বলিয়া বিবেচিত হইত। রসায়ণ ঔষধের সম্যক ফল লাভ করিতে হইলে বিশেষ আয়াস স্বীকার আবশ্যক।

শাস্ত্রকার বলিয়া গিয়াছেন,—শারীরিক ও মানসিক দোষ রহিত না হইলে মনুষ্য কখনই রসায়ন ঔষধ সেবনের ফলপ্রাপ্তি হয় না। যাহারা শারীরিক ও মানসিক দোষ রহিত এবং সংযতাত্মা—তাহারাই পরমায়ুবর্দ্ধক এবং জরাব্যাধি প্রতিষেধক রসায়নের ফল লাভ করিয়া থাকেন।

শাস্ত্র আরও বলিয়াছেন,—"যে ব্যক্তি সত্যবাদী, অক্রোধী, মদ্য ও মৈথুন সেবায় বিরত, অহিংস্রক, অধিক পরিশ্রমী নহে, প্রশান্তচিত্ত, প্রিয়বাদী, জপ ও শৌচ পরায়ণ, ধীর, নিত্য দানশীল, তপস্যা পরায়ণ, দেব-গো-ব্রাহ্মণ-আচার্য্য-গুরু ও বৃদ্ধের অর্চ্চনায় রত, ক্রূর কার্য্যে বিরত, নিত্য করুণাশীল, সমভাবে জাগরণ ও নিদ্রাশীল, নিত্য দুগ্ধ ঘৃতসেবী, দেশ কাল প্রমাণজ্ঞ (অর্থাৎ দেশ কাল বুঝিয়া চলেন), যুক্তিজ্ঞ, নিরহঙ্কার, সদাচারী, সঙ্কীর্ণ চিত্ত নহে, এবং যে ইহকাল ব্যতীত পরকাল ভাবিয়া ইন্দ্রিয় সকলের চালনা করে) তাহারই রসায়ন সেবন উচিত।

জিতাত্ম-বৃদ্ধ আস্তিকগণের সেবক এবং ধর্ম্মশাস্ত্র পরায়ণ (অর্থাৎ ধর্ম্মশাস্ত্রের উপদেশ অনুসারে চলেন)—সে ব্যক্তি নিত্য রসায়ন সেবনের ফললাভ করিয়া থাকেন।

রসায়নের সম্যক্ ফল লাভ করিতে হইলে যে সকল গুণের প্রয়োজন, অধুনা সেই সকল

গুণের অধিকারী কেহ আছেন কি না সন্দেহ। সুতরাং রসায়ন ঔষধ সেবন অধুনা প্রচলিত হইতে পারে কি না, সে বিষয়ে বিষম সন্দেহ। তবে সেবন একেবারে নিরর্থক হইবার নহে, কাজেই যথাযথ নিয়মে থাকিয়া উহা সেবন করিতে না পারিলেও ইহা সেবনে যে কথঞ্চিৎ ফল পাওয়া যায়, তাহা নিশ্চিত।

এক্ষণে দেখা যাউক—রসায়ন ঔষধ কিরূপ বয়সে সেবন করিলে ফলপ্রদ হইয়া থাকে! শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে :—

পূর্ব্বে বয়সি মধ্যে বা—(অর্থাৎ পূর্ব্ব বয়সে যৌবন কালে) অথবা মধ্য বয়সে (প্রৌঢ়াবস্থায়, রসায়ন ঔষধ সেবন করা উচিত। এতদ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, বালক বা কৃশ—রসায়নের অধিকারী নহে।

রসায়ন ঔষধ সেবন করিতে হইলে পূর্ব্বেই শরীর শুদ্ধ করিয়া লওয়া আবশ্যক।

শাস্ত্রকার বলিয়াছেন,—শুদ্ধ দেহ হইয়া রসায়ন ঔষধ সেবন করা উচিত। কারণ মলিন বস্ত্র রং করিলে যেমন সে রং বেশ লাগেনা, সেইরূপ অবিশুদ্ধ দেহে রসায়ন সেবন করিলে সম্যক্ ফল হয় না।"

এখন কথা হইতেছে যে, শুদ্ধ দেহ কি—এবং অশুদ্ধ দেহই বা কি? সাধারণতঃ আমাদের শরীর অশুদ্ধ। কারণ আমাদের শরীর গ্রাম্য আহার বিহারাদির দ্বারা দূষিত। এই গ্রাম্য-আহার-বিহারাদি বশতঃ শরীরের যে দোষ জন্মে, বমন-বিবেচনাদি দ্বারা সেই দোষ সংশোধন করিয়া, পরে রসায়ন ঔষধ সেবন করিতে হয়।

রসায়নের প্রয়োগ দুই প্রকার। এক কুটী প্রাবেশিক, অপর বাতাতপিক। কুটী প্রাবেশিক বিধি যেরূপ কঠিন, তাহাতে অধুনা কেহ যে কুটী প্রাবেশিক বিধি অনুসারে রসায়ন সেবন করিতে পারিবেন, এরূপ মনে হয় না। শাস্ত্রে কথিত আছে, যাঁহারা সমর্থ, নীরোগ, ধীমান্, সংযতাত্মা, সহিষ্ণু এবং ধন-জনসম্পন্ন,—তাঁহাদের পক্ষে কুটী প্রাবেশিক রসায়নই প্রশস্ত। অন্যান ব্যক্তির পক্ষে সৌর্য্য মারুতিক অর্থাৎ বাতাতপিক রসায়ন সেবন করা কর্ত্তব্য। কিন্তু বাতাতপিক অপেক্ষা কুটী প্রাবেশিক রসায়ন শ্রেষ্ঠ, কিন্তু উহা দুষ্কর।

কুটী অর্থাৎ গৃহমধ্যে থাকিয়া বাতাতপ বর্জ্জন করিয়া ঔষধ সেবন করিতে হয় বলিয়া উহাকে কুটী প্রাবেশিক রসায়ন বলে। কুটী প্রাবেশিক বিধি সম্বন্ধে শাস্ত্রে নিম্নলিখিত রূপ উপদেশ আছে।

রাজা, বৈদ্য, ব্রাহ্মণ এবং পুণ্যকর্ম্মা সাধুদিগের আবাসস্থানের নিকটে, সর্পাদির ভয় রহিত, প্রশস্ত রসায়নের আবশ্যকীয় উপকরণ-যুক্ত এবং উত্তম মৃত্তিকাবিশিষ্ট স্থানে পূর্ব্ব বা উত্তর দিকে কুটী প্রস্তুত করিবে। কুটী বেশ বিস্তৃত ও উচ্চ, ত্রিগর্ভ এবং সূক্ষ্মলোচনা (যাহাতে বহু বায়ু প্রবেশ করিতে না পারে তজ্জন্য ভিত্তির উপরিভাগে বহু ক্ষুদ্র ছিদ্রযুক্ত) হইবে। কুটী ঘন ভিত্তিযুক্ত, সকল ঋতুতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং মনের প্রিয় হওয়া উচিত। কুটী যেন স্ত্রীবর্জ্জিত হয় এবং তাহার মধ্যে যেন অপ্রিয় শব্দাদি প্রবেশ করিতে না পারে। উপযুক্ত উপকরণ এবং বৈদ্য, ঔষধ ও ব্রাহ্মণ—কুটীর মধ্যে থাকা উচিত।

অনন্তর উত্তরায়ণ কালে—শুক্ল তিথিতে, শুভ নক্ষত্রে, ক্ষৌরকার্য্যাদি করিয়া, ধৃতিমান, স্মৃতিমান শ্রদ্ধাবল ও সমাহিত চিত্ত হইয়া, রাগ-দ্বেষাদি মানস দোষ পরিত্যাগ করিয়া, সর্ব্বজীবে মিত্রতা চিন্তা করিয়া, প্রথমে দেবতা ও ব্রাহ্মণ-

গণের পূজা করিবে। পরে দেবতা, ব্রাহ্মণ ও গো প্রদক্ষিণ করিয়া কুটী প্রবেশ করিবে। কুটীতে প্রবেশ করিয়া প্রথমে বমন-বিরেচনাদি দ্বারা শরীর শুদ্ধ করিয়া লইবে। অনন্তর রসায়ন ঔষধ সেবন করিবে।

ইহার পর কি প্রকারে শরীর শুদ্ধ করিতে হয়, তাহা বলিয়া পরে নানা প্রকার রসায়ন ঔষধের বিষয় লিখিত হইয়াছে। রসায়নার্থ ঔষধ সকল শৈল সত্তম হিমবান পর্ব্বত হইতে গ্রহণ করা উচিত এবং ঐ সকল ওষধি কাল জাত, পূর্ণবীর্য্য ও কোনপ্রকার দূষিত না হয়, এরূপভাবে গ্রহণ করা উচিত—এইরূপ উপদেশ আছে। আমরা অনাবশ্যক বিবেচনায় ঐ সকল বিষয় আলোচনা করিলাম না। তবে কেহ রসায়ন সেবনেচ্ছু হইয়া জানিতে ইচ্ছা করিলে আমাদের সাধ্যমত উপযুক্ত উপদেশ পাইতে বিলম্ব হইবে না।

রসায়নের জন্য আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে নানাপ্রকার দিব্য ওষধির উল্লেখ আছে। ঐ সকল ওষধি সম্বন্ধে আমাদের কোনই জ্ঞান নাই এবং উহারা সাধারণ মানবের লভ্য এবং সেব্য নহে। সুশ্রুত গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে যে, যাহারা অধার্ম্মিক, কৃতঘ্ন, ঔষধদ্বেষী ও ব্রাহ্মণ-দ্বেষী,—তাঁহারা কদাচ সোমলতা নামক দিব্যৌষধি দেখিতে পায় না। ভগবান আত্রেয় অগ্নিবেশ ঋষিকে নানাপ্রকার দিব্যৌষধি সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া পরে বলিয়াছেন,—"দিব্যৌষধির প্রভাব আপনার ন্যায় সুকৃতাত্ম ব্যক্তিই সহ্য করিতে পারে, অকৃতাত্ম ব্যক্তিগণ সহ্য করিতে পারে না।"

দিব্যৌষধি সেবনের যে নিয়ম বলা হইয়াছে, তাহা শুনিলেও ভয় হয়, নিয়ম পালন করাতো বহুদূরের কথা। পাঠকদিগের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য উক্ত বিধির বিষয় লিখিত হইতেছে।

ব্রহ্মা সুবর্চ্চলা, আদিত্যপর্ণী, বা সূর্য্যকান্তা, নাবী বা অশ্ববলা, কাষ্ঠ-গোধা, সর্প, সোমলতা, পদ্মা অজা বা অজশৃঙ্গী, এবং নীলা—এই আট প্রকার ওষধির মধ্যে যাহা পাওয়া যায়, তাহাদের রস তৃপ্তিপূর্ব্বক পান করিয়া, কাঁচা পলাশকাষ্ঠের স্নেহভাবিত সিন্ধুকের মধ্যে উলঙ্গ হইয়া শয়ন করিবে। ঐ সিন্ধুকের উপর যে আবরণ থাকিবে তাহাতে একটী গর্ত্ত করিবে এবং ঐ গর্ত্তের মধ্য দিয়া রসায়ন সেবনকারীর জীবন ধারণার্থ একটু একটু করিয়া ছাগদুগ্ধ পান করিতে দিবে। এইরূপ ভাবে ছয়মাস কাল থাকিলে দেবতার ন্যায় বয়স, বর্ণ, স্বর আকৃতি বল ও প্রভা লাভ করা যায়।

(ক্রমশঃ)

ধল্ আঁকোড়্ বা ধল্ আঁকড়া।

—:০:—

বাতে।—

ধল্আঁকড়ার পাতা বা ছাল প্রলেপ দিলে—
বাতের ফোলা-ব্যথা যায় গো চ'লে।

বিসর্পে।—

ধল আঁকড়ার পাতার রস,
ক্ষতস্থানে দিলে বিসর্প বশ।

মলবদ্ধতায়।—

(১) ধল আঁকড়ার শিকড় আধভরি সিদ্ধ
পান ক'র্‌লে যায় মল বদ্ধ।

(২) সিকি ভরি ধলআঁকড়ার গুঁড়—
গরম জলে সেবন কর।

ইঁদুর ও সর্প বিষে।—

ইঁদুর ও সর্পবিষে
ধল আঁকড়ার পাতা দাও পিষে।
ক্ষেপা কুকুরে কামড়ায় যা'রে—
তা'রও এতে সুফল ধরে।
পাচন ক'রেও ধলআঁকড়ার
খেতে দাও গে বারম্বার।

ফোড়া বসান।—

ধল আঁকড়ার ফল মরিচ সহ—
ফোড়া ব'স্‌বে দিতে কহ।

বাতরক্তে।—

ধল আঁকড়া, অনন্তমূল,
ছাতিমছাল আর গুগ্‌গুল,
এক একটি নাও—আধ্‌ আধ্‌ ভরি,
আধসের জলে সিদ্ধ করি,
একছটাক থা'ক্‌তে নামিয়ে নিয়ে,
রক্ত দোষে খাও চুমুক দিয়ে।
পারা দোষ, বাত, বাতরক্ত, শূল
কুষ্ঠ পর্য্যন্তের ঘোচে মূল।

ক্রিমিতে।—

(১) ধল আঁকড়ার পাতার রস ছটাক সিকি,
দু'রতি কর্পূরের মিশাও ফাঁকি,
ক্রিমি সারে ক'র্‌লে সেবন,
ধল্‌আঁক্‌ড়ার গুণ জেন' এমন।

(২) ধল আঁকড়া, দাড়িমছাল আধ্‌ আধ্‌ ভরি,
সোঁদাল ছাল নাও দ্বিগুণ করি,—
আধ্‌সের জলের একছটাক শেষ,
সেবনে রয়না ক্রিমির লেশ।

শ্রীসত্যচরণ সেনগুপ্ত কবিরঞ্জন।

প্রেরিত পত্র।

—:o:—

(পরীক্ষিত দুইটী ঔষধ।)

(১ম—মূর্চ্ছা বা অপস্মার রোগে।)

আমার জনৈক কবিরাজ বন্ধু একটি রোগীর মূর্চ্ছা ভঙ্গ করিতে অসমর্থ হইয়া ডাক্তারের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। ডাক্তার বাবুকে Ammon carbএর সহায়তায় মুহূর্ত্তমধ্যে রোগীর মূর্চ্ছা ভঙ্গ করিতে দেখিয়া তিনি অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইলেন এবং ডাক্তারী চিকিৎসার অশেষবিধ প্রশংসা করিলেন। তিনি আরও বলিলেন, আয়ুর্ব্বেদীয় মতে কি এরূপ একটি ঔষধ আবিষ্কৃত হইতে পারে না? সেইদিন হইতে বন্ধুবরের আগ্রহাতিশয্যে আমি

ডাক্তারী মেটিরিয়া মেডিকা অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। এবং অল্পদিনের চেষ্টাতে নিম্নলিখিত ঔষধটি আবিষ্কার করিলাম।

প্রথমতঃ Ammon carb এর প্রস্তুত-প্রণালী লইয়া অনেক চেষ্টা করিলাম, কিন্তু তাহাতে কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। একদিন হঠাৎ Liquor Ammonia Fortis এর প্রস্তুত-প্রণালীর প্রতি লক্ষ্য করি এবং নিম্ন লিখিত বিষয়টি জানিতে পারি। "Ammon chloride (নিশাদল) কে Slaked lime (আদ্র চুণ) এর সহিত উত্তপ্ত করিলে য়্যামোনিয়া গ্যাস উৎপন্ন হইবে। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া আমি নিশাদলকে আদ্র চুণের সহিত মিশ্রিত করিবামাত্র দেখিলাম যে—একটি গ্যাস উঠিতেছে এবং ঐ গ্যাস ঠিক য়্যামোনিয়ার ন্যায় তীব্র গন্ধবিশিষ্ট। অতঃপর আমি কয়েকটি মূর্চ্ছারোগীকে ইহা প্রয়োগ করিয়া আশানুরূপ সুফল পাইয়াছি। সম পরিমাণ নিশাদল ও আদ্র চুণ লইয়া যে কেহ এই ঔষধটিকে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। ইহার ঘ্রাণ লইলে মাথার বেদনারও উপকার হয়।

(২য়—প্রদর রোগে)

রোগিণীর বয়স ১৭।১৮ বৎসর। কোন সন্তানাদি হয় নাই। ৩।৪ বৎসর যাবত অনিয়-মিত ঋতু স্রাব হইতেছিল। ততদিন কোনরূপ চিকিৎসা নাই। তাহার পর একমাস যাবত অনবরত ঋতুস্রাব হইতে আরম্ভ হওয়ায় ডাক্তারী মতে, পরে আয়ুর্ব্বেদীয় মতে চিকিৎসার ব্যবস্থা করান হয়। কিন্তু কিছুতেই ফল লাভ হয় নাই। ক্রমে রোগিণী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে লাগিল, ঘন ঘন মূর্চ্ছা হইতে লাগিল। একদিন রোগিণী মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়াছে এরূপ সময়ে আমি চিকিৎসার জন্য আহুত হইলাম। আমার ব্যবস্থায় অনেক চেষ্টায় মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল বটে, কিন্তু রোগিণী বুকের বেদনায় বড়ই অস্থির হইয়া পড়িল। আমি বিশেষ কিছু ঠিক করিতে না পারিয়া একমাত্রা মকরধ্বজের ব্যবস্থা করিয়া পূর্ব্বে যে সমস্ত ঔষধ সেবন করান হইয়াছিল তাহাই পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলাম। ডাক্তারী মতে পটাশ পার ম্যাঙ্গে-নাস্ লোসন্ দ্বারা পিচকারী প্রয়োগ করা হইয়াছিল। সেবনের জন্য কি কি ঔষধ দেওয়া হইয়াছিল তাহা জানিতে পারিলাম না। পিচ্-কারী প্রয়োগে ২।৩ দিবস কিছু কম থাকিয়া পুনরায় মাংস ধোত জল সদৃশ অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত অত্যধিক পরিমাণে স্রাব আরম্ভ হইয়াছিল—জানিলাম। সেই সময় আয়ুর্ব্বেদীয় মতে চিকিৎসা করান হয়। যে কবিরাজ মহাশয়কে ডাকা হইয়াছিল, তিনি প্রদরান্তক লৌহ খণ্ডকাদ্য লৌহ, অশোকারিষ্ট, কুটজাষ্টক প্রভৃতি অনেক ঔষধ ও মুষ্টিযোগ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। আমি সেই ব্যবস্থার উপর অন্য কোন নূতন ব্যবস্থা খুঁজিয়া না পাইয়া রাত্রির জন্য আর একমাত্রা মকরধ্বজ প্রয়োগ করিয়া বাসায় ফিরিয়া আসিলাম।

রাত্রে আমার মাথায় সহসা এক খেয়াল চাপিল। পরদিবস খানিকটা জলে কিছু ফটকিরী চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া তদ্বারা দুই বেলা দুইটি বস্তি (ডাক্তারী মতে পিচ্‌কারী) প্রয়োগ ও দুই বটি প্রদরান্তক রস (অনুপান আয়াপান রস) ব্যবস্থা করিয়া চলিয়া আসিলাম। সেবনের জন্য একটি ঔষধ না দিলে নয় বলিয়াই প্রদরান্তক রস ব্যবস্থা করিয়াছিলাম।

তৃতীয় দিবস যাইয়া শুনিলাম, অতি সামান্য মাত্রায় স্রাব হইয়াছে। পূর্ব্ববৎ ঔষধ ব্যবস্থা

করিয়া চলিয়া আসিলাম। চতুর্থ দিবস স্রাব একেবারেই হয় নাই। ঔষধ পূর্ব্ববৎই রহিল; অধিকন্তু অশোকারিষ্ট ব্যবস্থা করিলাম।

সুখের বিষয় এক সপ্তাহ মধ্যেই রোগিণী অনেকটা সুস্থ হইল। একমাস পর্য্যন্ত উপরোক্ত চিকিৎসা চলিল। মাসাতিবাহিত হইলে দেখা গেল—নিয়মিত ভাবেই ঋতুস্রাব হইতেছে। তখন প্রাতে অশোক ঘৃত, বৈকালে প্রদরান্তক রস ও রাত্রে অশোকারিষ্ট ব্যবস্থা করিলাম। ছয় মাস পরে শুনিলাম রোগিণী সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছে। অদ্যাবধি তাঁহার অন্য কোন অসুখ হয় নাই।

কবিরাজ—শ্রীমৈত্র।

"চিকিৎসকের দুঃখ" প্রবন্ধের প্রতিবাদ।

—:০:—

শ্রদ্ধাস্পদ—

শ্রীযুক্ত "আয়ুর্ব্বেদ" সম্পাদক

মহাশয়গণ সমীপেষু—

মহাশয়গণ, গত বৈশাখমাসের "আয়ুর্ব্বেদে" "চিকিৎসকের দুঃখ"—শীর্ষক প্রবন্ধটি যাহা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া দুঃখিত হইয়াছি। বুঝিবার ভুলে কেহ হয়তো ঐরূপ প্রবন্ধ লিখিতে পারেন, কিন্তু কেমন করিয়া আপনারা "আয়ুর্ব্বেদে"র মত উচ্চ শ্রেণীর চিকিৎসা বিষয়ক পত্রে উহা স্থান দান করিলেন বুঝিতে পারিলাম না। আমার দুঃখের কারণ ইহাই,—নতুবা ওরূপ প্রবন্ধ কেহ পড়িয়া শুনাইলে, উহাকে প্রলাপ বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারিতাম।

লেখক বলিয়াছেন,—"চিকিৎসা অতি মহৎ ও পুণ্য কর্ম্ম,—ইহা অনেকেরই বিশ্বাস, অন্ততঃ চিকিৎসকগণকে সমাজএই চাটুবাক্যেই অভিনন্দিত করে। কিন্তু চিকিৎসা-ব্যবসা কি সত্যই মহৎ?"

লেখকের এই স্থানেই তো মহা গলদ দেখিতেছি। "চিকিৎসা যে অতি মহৎ ও পুণ্য জনক কর্ম্ম—,.—তাহা অনেকের বিশ্বাস" হইলেও লেখক তাহা বিশ্বাস করেন না। এই জন্য সমাজের ঘাড়ে দোষ চাপাইয়া সমাজকে চাটুকার বলিতে তিনি কুণ্ঠিত হন নাই। বলি, সমাজ এই চাটুবৃত্তি করিবে কিসের জন্য? লেখক তো একটু পরেই বলিয়াছেন,—"অর্থের বিনিময়ে চিকিৎসা করা হয়।" যদি অর্থ লইয়াই চিকিৎসা করা হইল, তবে সমাজ—চিকিৎসকের নিকট কোন্ বাধ্যতা গুণে তাহার চাটুবৃত্তি অবলম্বন করিবে? সমাজ চিকিৎসা কার্য্যকে মহৎ ও পুণ্যকর্ম্ম কেন বলেন, লেখক তাহা খুলিয়া বলিতে পারেন নাই, আমরা বলি শুনুন—শাস্ত্রে আছে,—

"কপিলা কোটী দানাদ্ধি যৎফলং পরিকীর্ত্তিতম্
ফলং তৎ কোটীগুণীতমেকাতুর-চিকিৎসয়া।"

অর্থাৎ কোটী কপিলা দান করিলে যে ফল লাভ হয়, একটীমাত্র রোগীকে আরোগ্য

করিলে তাহারও কোটীগুণ ফললাভ হইয়া থাকে। চিকিৎসক এবম্বিধ পুণ্যজনক কার্য্যে ব্রতী বলিয়াই তিনি সমাজের চক্ষে প্রকৃতই মহান এবং পুণ্যবান। লেখক কি এ কথা অবগত নহেন?

মহাপুরুষ চাণক্য চিকিৎসকের গুণব্যাখ্যায় বলিয়াছেন,—

"আয়ুর্ব্বেদ কৃতাভ্যাসঃ সর্ব্বেষাং প্রিয় দর্শনম্
আর্য্যশীল গুণোপেত এষ বৈদ্যো বিধীয়তে॥"

অর্থ লইয়া চিকিৎসাবৃত্তি অবলম্বন সম্বন্ধে লেখক যে উহা অপকর্ম্ম বলিয়াছেন—ইহাও অতি বিস্ময়ের কথা। তিনি তো নিজেই বলিয়াছেন,—"অর্থগ্রহণ না করিলে চিকিৎসকের জীবিকা নির্ব্বাহ হয় না।" এ স্থলে একই লেখকের উভয় কথার সামঞ্জস্য কিরূপ রহিয়াছে—তদৃষ্টে হাস্য সম্বরণ করা যায় না।

অর্থ গ্রহণ না করিয়া চিকিৎসক করিবেন কি? পেটের দায়ে তাঁহাকে অর্থ গ্রহণ করিতে হয়। শাস্ত্রও তো সকলের নিকট অর্থ লইতে নিষেধ করেন নাই। শাস্ত্রকার তো বলিয়া গিয়াছেন,—জীবিকানির্ব্বাহার্থ রাজা এবং ধনবান ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে অর্থ অবশ্য গ্রহণীয়। যথা—

"ঈশ্বরাণাং বসুমতাং লিপ্সেতার্থন্তু বৃত্তয়ে।"

লেখক এক স্থলে বলিয়াছেন,—"মানুষের প্রকৃতিই রোগ প্রতিষেধক। চিকিৎসক সেই প্রকৃতির সহায়তা করিতে পারেন মাত্র। সেই প্রকৃতির সম্পূর্ণ স্বরূপ কোন চিকিৎসক জানিতে পারিয়াছেন?"

হা অদৃষ্ট, লেখক আয়ুর্ব্বেদর শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া আয়ুর্ব্বেদের মূলমন্ত্রটুকুও যে ভুলিয়া গিয়াছেন, তাহা জানিতাম না! আয়ুর্ব্বেদের মূল মন্ত্র—

"ব্যাধেস্তত্ত্বঃ পরিজ্ঞানং বেদনায়াশ্চ নিগ্রহম্।
এতৎ বৈদস্য বৈদ্যত্বং নবৈদ্যঃ প্রভুরায়ুষঃ॥"

অর্থাৎ ব্যাধির তত্ত্ব অবগত হইয়া উপদ্রবের দূর করাই চিকিৎসকের কার্য্য; বৈদ্য কখন আয়ুর প্রভু নহেন। এই কথাতেই তো সব কথা বলা হইয়াছে। তবে লেখক মহাশয় আবল-তাবল বকিতে বসিয়াছেন কেন?

লেখক বৈদ্যের জন্ম বৃত্তান্তের সহিত তাহার যে বৃত্তির কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা একেবারেই অসঙ্গত। কোন শাস্ত্রে—কোন পুরাণে—ব্যবসায় স্থির করিবার জন্য বৈদ্যের জন্ম রহস্য লিপিবদ্ধ হয় নাই। নিজের জাতিগত ব্যবসায়ের কথা বলিতে গিয়া তাহার জন্ম-রহস্য আনিয়া—তাহাকে যে এতাদৃশ নীচতার আসনে স্থান দান করিতে কুণ্ঠিত নহে, তাহার কল্পনা,—তাহার লেখনী—তাহার প্রবন্ধ—বৈদ্য সমাজে যে ধিক্কৃত হইবার উপযুক্ত, সে বিষয়ে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই। আমাদিগকেও ধিক যে,—সে লেখার আবার আমরা প্রতিবাদ করিতেছি।

লেখক বলিয়াছেন,—"আমাদের দেশে কি পাশ্চাত্য দেশে—কোন দেশের ইতিহাসে চিকিৎসকের নাম উল্লিখিত হয় নাই।" বাহবা বুদ্ধি! এত বুদ্ধি না হইলে আর কেহ নিজের দুঃখ সমাজে প্রকাশ করিতে বসে! পাশ্চাত্য সমাজের কথায় কাজ নাই, আমাদের সমাজের কথা বলি।—চিকিৎসক-অশ্বিনী কুমারদ্বয় ছিন্নশিরঃ-ব্রহ্মার শিরোযোজনা করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহারা যজ্ঞভাগী হইয়াছিলেন। রামায়ণ জানা আছে তো? ভিন্ন জাতি হইলেও সুষেণ যে বৈদ্য বা চিকিৎসক ছিলেন তাহাতো অস্বীকার করিবার জো নাই। সে সুষেণের নাম রামায়ণে কীর্ত্তিত কেন? এই বৃত্তির জন্য।

সকল কথার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রতিবাদ করিলে প্রবন্ধ বড়িয়া যাইবে। তাই আর বেশী বলিব না। সংক্ষেপে আর দু' একটা কথা কহিয়া লই।

লেখক বলিয়াছেন,—"চিকিৎসা বৃত্তির দ্বারা সংসারে বন্ধুতা লাভ হয় না।" আত্ম-মতের সমর্থনের জন্য কেহ যে শাস্ত্রের সকল কথাও উপেক্ষা করিতে পারে, ইহা জানিতাম না। চিকিৎসা বৃত্তির ফলে—

কচিদ্বর্থঃ কচিন্মৈত্রী কচিদ্ধর্ম্মঃ কচিদযশঃ।
কর্ম্মাভ্যাসঃ কচিচ্চাপি চিকিৎসা নাস্তি নিষ্ফলা।

অর্থাৎ চিকিৎসাবৃত্তির ফলে কোন স্থানে অর্থ লাভ, কোন স্থানে মিত্রতালাভ, কোন স্থানে ধর্ম্মলাভ, কোন স্থানে যশঃলাভ এবং যেখানে কিছুই লাভ হয় না, সেখানে কর্ম্মাভ্যাস বা Practical knowledge লাভ হয়—অতএব এ বৃত্তি নিষ্ফল নহে,—এ কথা যে লেখক ভুলিয়া গেলেন—ইহা খুবই আশ্চর্য্যের বিষয়।

লেখক একস্থলে বলিয়াছেন,—"চিকিৎসক অপাংক্তেয় বলিয়া নিন্দিত, তাহার অন্ন অভক্ষ্য বলিয়া কথিত।" আমরা পরাশর সংহিতার মত উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি, চিকিৎসক অপাংক্তেয় নহেন। যথা—

বৈশ্যকন্যাসমুৎপন্নম্ ব্রাহ্মণেনতু সংস্কৃতম্
অম্বষ্ঠ জায়তে নামাঃ ব্রাহ্মণেন সহ ভোজনৈঃ॥"

এ অবস্থায় বৈদ্য বা চিকিৎসককে অপাংক্তেয় বলিব কেমন করিয়া? লেখক বলিয়াছেন—"রামকৃষ্ণ পরমহংস চিকিৎসকের অন্নগ্রহণ করিতেন না।" জানিনা রামকৃষ্ণ পরমহংস কি করিতেন, কিন্তু সাক্ষাৎ শঙ্করের অবতার শঙ্করাচার্য্য চিকিৎসককে সর্ব্বান্তঃকরণে শ্রদ্ধা করিতেন, তাহারই প্রমাণ স্বরূপ তিনি বলিয়া গিয়াছেন,—

"বৈদ্যঃ নারায়ণঃ হরিঃ।"

লেখক সর্ব্বশাস্ত্রবিদ্ কি না জানিনা, কিন্তু সকল কথা তাঁহার মনে নাই—এবং সকল কথা না জানিয়া—না বুঝিয়া এরূপ প্রবন্ধের অবতারণা যে করিতে নাই—ইহা জোর করিয়া বলা যাইতে পারে।

শ্রীবিনোদবিহারি রায় গুপ্ত ধন্বন্তরি।

ক্ষয়রোগ।

যক্ষ্মা পৃথিবী ব্যাপী এবং বহু প্রাচীন রোগ। পৌরাণিক কাহিনীতে চন্দ্রের যক্ষ্মারোগ হইয়াছিল এইরূপ কথিত হইয়াছে। তারকা-রাজ—চন্দ্রের ক্ষয়রোগ 'রাজ'-যক্ষ্মা বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছে। রসাদি ধাতুর ক্ষয় করে বলিয়া ইহার নাম ক্ষয় এবং শরীরকে শুষ্ক করে বলিয়া ইহার নাম শোষ।

ক্ষয়রোগ যে সংক্রামক—আয়ুর্ব্বেদে তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ আছে। যথা,—

প্রসাঙ্গাদ্ গাত্রসংস্পর্শাৎ নিঃশ্বাসাৎ
সহভোজনাৎ।
এক শয্যাসনাচ্চৈব বস্ত্রমাল্যানুলেপনাৎ॥
কুষ্ঠং জ্বরশ্চ শোষশ্চ নেত্রাভিষ্যন্দ এবচ।
ঔপসর্গিক রোগাশ্চ সংক্রামন্তি নরান্নরম্॥

অর্থাৎ একত্র অবস্থান, গাত্রসংস্পর্শ, নিঃশ্বাস লাগা, একত্র ভোজন, এক শয্যা বা আসনে শয়ন বা উপবেশন, এক বস্ত্র, মাল্য বা অনুলেপন, চন্দনাদি ব্যবহার প্রভৃতি কারণে কুষ্ঠ, জ্বর, শোষ, নেত্রাভিষ্যন্দ (চোখ উঠা) এবং উপসর্গিক রোগ সকল এক ব্যক্তির শরীর হইতে অন্য ব্যক্তির শরীরে প্রবেশ করিয়া থাকে।

ইহা দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, উপরি উক্ত কারণে রোগ বীজ একের শরীর হইতে অন্যের শরীরে প্রবেশ করে। পাশ্চাত্য চিকিৎসক গণের মতেও এক প্রকার জীবাণু একের শরীর হইতে অন্যের শরীরে প্রবেশ করিয়া ক্ষয় রোগ উৎপন্ন করে।

কিন্তু রোগবীজ শরীরে প্রবেশ করিলেই যদি রোগ উৎপন্ন হইত, তাহা হইলে এতদিন পৃথিবী হইতে মানব জাতির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইত।

মানব শরীরে একটী পালিনী শক্তি আছে। সেই শক্তি শরীরের অনিষ্টকারক যাবতীয় কারণের ধ্বংস সাধন করিয়া শরীরকে রক্ষা করিয়া থাকে। যতদিন সেই শক্তি প্রবল থাকে, ততদিন কোন রোগই শরীরকে আক্রমণ করিয়া ধ্বংস করিতে পারেনা। বিবিধ অত্যাচারের ফলে দেহস্থ ঐ পালিনী শক্তি যখন অত্যন্ত দুর্ব্বলা হইয়া পড়ে, তখন সেই দুর্ব্বলা শক্তির বাধা অতিক্রম করিয়া দেহ প্রবিষ্ট রোগবীজ রোগ উৎপাদন করিয়া থাকে।

শাস্ত্রে যক্ষ্মারোগের চারিটি কারণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, যথা সাহস, বেগরোধ, ক্ষয় এবং বিষমাশন। প্রত্যেকের বিষয় পৃথক ভাবে বলা যাইতেছে।

সাহস—নিজের শরীরে যেরূপ বল, তাহার অতিরিক্ত বল-প্রয়োগ-সাধ্য কোন কার্য্য করাকে সাহস বলে। গুরুভার বহন, অতিরিক্ত বলবান ব্যক্তির সহিত যুদ্ধ (কুস্তি করা), দ্রুতগামী অশ্বকে, বৃষকে বলপূর্ব্বক ধারণ করা, সন্তরণ করিয়া মহানদী পার হওয়া—প্রভৃতি সাহস পদ কার্য্য।

এইরূপ সাহসের জন্য বক্ষঃস্থলে ক্ষত হয় এবং বায়ু সেই ক্ষতকে আশ্রয় করে। অনন্তর সেই বায়ু বক্ষঃস্থ শ্লেষ্মার সহিত ঊর্দ্ধ, অধঃ ও তির্য্যক দিকে প্রসরণ করে।

দোষ সকল মস্তকে আশ্রয় করিয়া শির শূল, গলদেশ আশ্রয় করিয়া কণ্ঠোদ্ধংস (গলা খুস খুসি), কাস, স্বরভঙ্গ ও অরুচি, পার্শ্বদেশ আশ্রয় করিয়া মলভেদ, সন্ধি আশ্রয় করিয়া জৃম্ভণ (হাই-উঠা) ও জ্বর, বক্ষ আশ্রয় করিয়া বক্ষোবেদনা উৎপন্ন করে। বক্ষে ক্ষত হওয়া কাসের সহিত কফ মিশ্রিত রক্ত নির্গত হয় এবং কাসের সময় বক্ষে শূলনিঘাতবৎ বেদনা অনুভূত হয়। শাস্ত্রে সাহসজ যক্ষ্মারোগে এই একাদশ প্রকার উপদ্রবের বিষয় লিখিত হইয়াছে। কিন্তু সর্ব্বত্র সবগুলিই যে প্রকাশ পায় তাহা নহে।

বেগধারণ—লজ্জা, ঘৃণা বা ভয় বশতঃ অধোবায়ু, মূত্র ও পুরীষের উপস্থিত বেগ ধারণ করিলে বায়ু কুপিত হইয়া এবং অন্যান্য দোষের সহিত মিলিত হইয়া ঊর্দ্ধ তির্য্যক ও অধোদেশে প্রসারিত ক্ষয়রোগ উৎপন্ন করে।

প্রতিশ্যায়, কাস, স্বরভেদ, অরুচি, পার্শ্বশূল, শিরঃশূল, জ্বর, অঙ্গবেদনা, গা আড়া-মোড়া করা, বার বার বমি হওয়া এবং মলভেদ—এই সকল লক্ষণ—এইরোগে প্রকাশ পায়।

ক্ষয়-যক্ষ্মা—অতিমাত্র শোক, চিন্তা, ঈর্ষা, উৎকণ্ঠা, ভয়, ক্রোধ, প্রভৃতি কারণে, কৃশ ব্যক্তির উপবাস এবং রুক্ষ অন্ন পান-সেবন হেতু, দুর্ব্বল প্রকৃতির অনাহার বা অল্পাহার হেতু, এবং অতিরিক্ত স্ত্রী সহবাস বশতঃ শরীর ক্ষয় প্রাপ্ত হয় এবং তজ্জন্য কুপিত বায়ু অন্যান্য দোষের সহিত মিলিত হইয়া ক্ষয় রোগ উৎপন্ন করে।

ক্ষয়জ যক্ষ্মারোগে প্রতিশ্যায়, জ্বর, কাস, অঙ্গমর্দ্দ, শিরোবেদনা, শ্বাস, মলভেদ, অরুচি, পার্শ্বশূল, স্বরভঙ্গ, এবং স্কন্ধ দেশে বেদনা—এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।

বিষমাশন—কোন সময়ে অল্প, কোন সময়ে অধিক, কখন বিকালে, কখন দু'পহর, কখন সকালে আহার করাকে বিষমাশন বলে। এই বিষমাশন ক্ষয় রোগের হেতু। বাভট বলিয়াছেন "অন্ন পান বিধি ত্যাগ" অর্থাৎ আহার ও পানের নিয়ম পরিত্যাগ যক্ষ্মারোগের হেতু। সুতরাং পানাহার সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রকার অনিয়ম হইতেই যক্ষ্মারোগ উৎপন্ন হইতে পারে। চরকে কথিত হইয়াছে যে, বিষমাহার বশতঃ ত্রিদোষ প্রকুপিত হইয়া শরীরস্থ স্রোতঃ সকলের মুখ রুদ্ধ করে। স্রোতোমুখ রুদ্ধ হওয়ায় ভুক্ত দ্রব্য সম্যক রূপে শরীর পোষণ করিতে পারে না। পরন্তু অধিকাংশ মল-মূত্র রূপে পরিণত হয়। এইজন্য পোষণাভাবে দেহ ক্রমশঃ শুষ্ক হইতে থাকে।

বিষমাশন জনিত যক্ষ্মারোগে প্রতিশ্যায় মুখ দিয়া থুথু উঠা, কাস, বমি, অরুচি, জ্বর, স্কন্ধ দেশে বেদনা, রক্তবমন, পার্শ্বদেশে এবং মস্তকে শূল-নির্ঘাৎ-বৎ বেদনা এবং স্বরভঙ্গ হয়। এই চারিটী কারণ বশতঃ যক্ষ্মারোগ উৎপন্ন হয়। এতদ্ভিন্ন শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে:—

প্রতিশ্যায়াদথো কাসঃ কাসাৎ সংজায়তে ক্ষয়ঃ।

অর্থাৎ প্রতিশ্যায় (সর্দ্দি লাগা—নাক মুখ দিয়া জলপড়া) রোগ উপস্থিত হইলে কাস এবং কাসরোগ উপেক্ষিত হইলে ক্ষয়রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ইহার সার্থকতা অনেক সময় প্রত্যক্ষ করা যায়, সামান্য কারণ হইতে (যেমন এক দিন জলে ভেজা বা অন্য কারণে ঠাণ্ডা লাগা)—পরিণামে উৎকট যক্ষ্মারোগ উৎপন্ন হয়। ইহার কারণ রোগকে উপেক্ষা করা। ঠাণ্ডা লাগিয়া সর্দ্দি হইল, তাহা গ্রাহ্য না করিয়া সুস্থ ব্যক্তির ন্যায় স্নানাহার চলিতে লাগিল, হয়ত কিছু অত্যাচারও হইল, ফলে কাস রোগ জন্মিল। সেই কাস রোগও উপেক্ষিত হইল, ক্রমে ফুস্‌ফুস্ বিকৃত হইল, শরীরের রোগ প্রতিষেধক শক্তি কমিয়া গেল তখন কোনরূপে যক্ষ্মারোগের বীজ শরীরে প্রবেশ করিলে আর নিস্তার নাই। চাষ করা সার দেওয়া জমিতে উক্ত বীজ যেমন সহজে বৃক্ষরূপে বর্দ্ধিত হইয়া উঠে, সেইরূপ রুগ্ন দেহে রোগ-বীজ সহজেই যক্ষ্মা রোগ উৎপন্ন করিয়া থাকে। এই জন্য আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে:—

"রোগ জন্মিবামাত্র প্রতিকার করা উচিত সামান্য রোগকেও উপেক্ষা করিবে না। কারণ অগ্নি, শস্ত্র ও বিষের ন্যায় সামান্য রোগও মহান অনিষ্ট উৎপাদন করিতে পারে।"

সর্ব্বপ্রকার কাস রোগই উপেক্ষিত হইলে ভবিষ্যতে যক্ষ্মারোগ উৎপন্ন হইতে পারে। কাস নিদানে কথিত হইয়াছে, "সর্ব্ব-প্রকার কাস (বাতজ, পিত্তজ, শ্লেষ্মজ, ক্ষতজ এবং ক্ষয়জ পাঁচ প্রকার) উপেক্ষিত হইলে ক্ষয় রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

এতদ্ব্যতীত শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে:—
"অজীর্ণ অন্ন ঘোর বিষ। এই অজীর্ণ অন্ন

কফের সহিত মিশ্রিত হইয়া যক্ষ্মা ও পীনসাদি রোগ সকল উৎপন্ন করিয়া থাকে।”

পূর্ব্বে সাহসাদি ক্ষয়রোগের চারিপ্রকার নিদান বলিয়া কথিত হইয়াছে, এই দুইটীও তাহার অন্তর্ভুক্ত। নচেৎ পূর্ব্বোক্ত কারণ চতুষ্টয়ের অব্যাপ্তি দোষ হইয়া পড়ে। কাস রোগে শরীর ক্ষয় প্রাপ্ত হয় বলিয়া কাস হইতে ক্ষয়রোগ জন্মে, তাহাও ক্ষয় বা যক্ষ্মা রোগের অন্তর্ভুক্ত।

অজীর্ণ হইতে যে ক্ষয় রোগ জন্মে, তাহাও এইরূপ বুঝিতে হইবে। কারণ অজীর্ণ অন্ন সম্যক জীর্ণ হয় না বলিয়া ধাতু সমূহের পোষণ করিতে পারে না। পোষণাভাবে ধাতু সমূহ ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে থাকে। সুতরাং ইহাকে ক্ষয়জ যক্ষ্মা বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

ক্ষয় দুই প্রকারে হইয়া থাকে; যথা অনুলোম ক্ষয় এবং বিলোম ক্ষয়। রস ধাতুর ক্ষয় ঘটিলে পরবর্ত্তী রক্তাদি ধাতুর ক্রমশঃ ক্ষয় হয়। ইহাই অনুলোম ক্ষয়। আবার শুক্র ধাতুর ক্ষয় ঘটিলে পূর্ব্ববর্ত্তী মজ্জাদি ধাতুর ক্রমশঃ ক্ষয় হয়। ইহাকে বিলোম ক্ষয় বলে। অতিরিক্ত স্ত্রীসহবাস, শোক প্রভৃতি কারণে শরীর শুষ্ক হইতে থাকিলেই তাহাকে ক্ষয়রোগ বলা যায় না। যতক্ষণ ক্ষয়রোগের বীজ শরীরে প্রবেশ না করে, ততক্ষণ ক্ষয়রোগ উৎপন্ন হয় না। এই পার্থক্য বুঝাইবার জন্য শাস্ত্রকার পৃথক শোষ রোগের নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

“অতিরিক্ত স্ত্রীসহবাস, শোক, বার্দ্ধক্য, ব্যায়াম, পথ-পর্য্যটন, উপবাস—এই সকল কারণে এবং ব্রণ (ক্ষত) ও উরঃক্ষত (অতিরিক্ত বলপ্রয়োগ করিয়া কার্য্য করার জন্য বক্ষের অভ্যন্তর ভাগে ক্ষত হওয়া) হইতে শোষরোগ উৎপন্ন হয়” কোন কোন চিকিৎসক এইরূপ বলিয়া থাকেন।

বুদ্ধিমান পাঠক, লক্ষ্য করিয়া দেখুন যে, অতিরিক্ত স্ত্রী সহবাস, শোক, অতিরিক্ত বল প্রয়োগ পূর্ব্বক কার্য্য করার জন্য বক্ষে ক্ষত হওয়া প্রভৃতি কারণে ক্ষয়রোগ উৎপন্ন হয় তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, আবার ঐ সকল কারণে রোগ উপস্থিত হয়—নির্দ্দেশ করা হইল, এই পার্থক্যের মধ্যে কি আছে? আছে “সংক্রামন্তি নরান্নরং”—রোগবীজ সংক্রমণ হওয়া চাই। ইহাতে স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে, আধুনিক যক্ষ্মারোগের জীবাণু তত্ত্ব শাস্ত্রকার দিগের সুবিদিত ছিল।

কেহ বলিতে পারেন যে, জীবাণুতত্ত্ব যদি সুবিদিতই ছিল—তবে তাহা স্পষ্ট করিয়া বলা হয় নাই কেন? তাঁহাদিগের বুঝা উচিত যে, বর্ত্তমানে আমরা কেবল আয়ুর্ব্বেদের কঙ্কালটুকু মাত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। আয়ুর্ব্বেদের রক্ত-মাংস-মেদে কি ছিল না ছিল—তাহা কি করিয়া বলিব? জানিনা আবার কতদিনে আয়ুর্ব্বেদের কঙ্কালে রক্ত-মাংস-মেদ সংযুক্ত হইবে।

(ক্রমশঃ)

মুষ্টিযোগ ও টোট্‌কা

ক্রিমিতে ব্যবস্থা।—(১) পালিধা মাদারের পাতার রস প্রাতঃকালে পান করাও, শিশুদিগের ক্রিমি সারিয়া যাইবে। ৫ বৎসরের শিশুর পক্ষে মাত্রা সিকি ঝিনুক। উহার কম বয়স্কের এক ঝিনুকের ৮ অংশ। (২) দাড়িমের শিকড়ের কাথ পান করাইলে ক্রিমি মরিয়া যায়। উহার মাত্রাও পূর্ব্ববৎ। (৩) পলাশ-বীজ, ইন্দ্রযব, বিড়ঙ্গ, নিমছাল ও চিরাতা চুর্ণ প্রত্যেক দ্রব্য দুই রতি এবং গুড় একআনা, একত্র সেবন করিলে ক্রিমি বিনষ্ট হয়। (৪) পলাশবীজ আধআনা ও যমানী একআনা একত্র করিয়া কয়েক দিন সেবন করিলে ক্রিমি বিনষ্ট হয়। (৫) ঘেঁটুপাতার রস ও আনারসের কচি পাতার রস এক একটি সিকি ঝিনুক লইয়া কিঞ্চিৎ মধুর সহিত মিশাইয়া শিশু-দিগকে পান করাও,—ক্রিমি নষ্ট হইবে।

হৃদ্‌শূল ও হৃদ্‌রোগে।—(১) দুই-তোলা শুঁঠ, আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধ-পোয়া থাকিতে নামাইয়া পান কর—হৃদ্‌শূল ও হৃদ্‌রোগ প্রশমিত হইবে। (২) অর্জ্জুন ছালের গুঁড়া দুইআনা লইয়া একছটাক গরম দুগ্ধের সহিত পান কর—হৃদয়ের যন্ত্রণার আশু নিবৃত্তি হইবে।

মূত্রকৃচ্ছ্রে সুব্যবস্থা।—(১) কুশ মূল, কেশে মূল, শরমূল, খাগড়ামূল ও ইক্ষু মূল—প্রত্যেক দ্রব্য ।৵১০ সাড়ে ছয় আনা ওজনে লইয়া আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া পান করিলে সহজে প্রস্রাব হইয়া মূত্রকৃচ্ছ্রের যন্ত্রণা নিবৃত্তি হয়। (২) গোক্ষুর বীজ দুইতোলা, আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া তাহাতে এক আনা পরিমিত সোরা ফেলিয়া মিশাইয়া লইয়া পান কর,—মূত্রকৃচ্ছ্রের যন্ত্রণার সদ্যঃ শান্তি হইবে। (৩) শ্বেত বেড়েলা দুইতোলা, আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া লইয়া পান কর, মূত্রকৃচ্ছ্রের শান্তি হইবে।

প্রমেহ চিকিৎসা।—(১) দূর্ব্বা, কেশুর, নাটাকরঞ্জার ছাল, টোকাপানা, কৈবর্ত্ত মুতা ও শেওলা—প্রত্যেক দ্রব্য ।৵১০ সাড়ে পাঁচ আনা ওজনে লইয়া আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া পান কর, শুক্রমেহ প্রশমিত হইবে। (২) হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, (প্রত্যেক দ্রব্যের আঁটি বাদ) সোঁদাল ফলের শাঁস ও কিস্‌মিস্‌—এই পাঁচটী দ্রব্যের প্রত্যেকটি ।৵১০ সাড়ে ছয় আনা ওজনে লইয়া আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া একটু মধু মিশাইয়া পান কর—ফেনা যুক্ত মেহের সদ্যঃ শান্তি হইবে। (৩) দারুহরিদ্রা, যষ্টিমধু, হরীতকী, আমলা, বহেড়া (এই তিনটি দ্রব্যের আঁটি বাদ) ও চিতামুল প্রত্যেক দ্রব্য ।/১০ সাড়ে পাঁচ আনা ওজনে লইয়া আধ সের জলে সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া কয়েক দিন পান কর,—প্রমেহের শান্তি হইবে।

বহুমূত্রে যোগ।—(১) কলার এঁটের রস প্রাতে দুই তোলা ও বৈকালে ২ তোলা লইয়া কিঞ্চিৎ মধুর সহিত সেবন কর, উপকার হইবে। (২) পাকা কলা ২টা, আমলকীর রস ২ তোলা, মধু ।৶১০ সাড়ে ছয় আনা, চিনি ।৶১০ সাড়ে ছয় আনা ও দুগ্ধ এক পোয়া একত্র মিশাইয়া কয়েক দিন সেবন কর,—বহুমূত্রে উপকার হইবে।

শ্রীঅতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কবিভূষণ।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

দান।—মাননীয় জজ শ্রীযুক্ত এ চৌধুরী মহাশয়ের পত্নী মিসেস চৌধুরী মহোদয়া সংপ্রতি অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় পরিদর্শনে তৃপ্তি লাভ করিয়া বিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে ১০০৲ টাকা দান করিয়াছেন। এজন্য আমরা তাঁহার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ।

রোগীর হিসাব।—বাঙ্গালা দেশে প্রত্যেক ১৫ জনের মধ্যে ৩ জনের চক্ষুরোগ; প্রত্যেক ৫ জনের মধ্যে ১ জনের দন্তরোগ, প্রত্যেক ৬ জনের মধ্যে ২ জনের আল্‌জীব বৃদ্ধি বা টন্‌সিল রোগ এবং প্রত্যেক ৭ জনের মধ্যে ১ জনের করিয়া অন্ত্র ফুলা রোগ।

মাদক দ্রব্য।—সমগ্রবঙ্গে গত ১৯১৫ খৃঃ অব্দে মদ বিক্রয় হইয়াছিল—৩১৩৯৫৯০ সের, গাঁজা বিক্রয় হইয়াছিল—৯২০১৬ সের; অহিফেন বিক্রয় হইয়াছিল—৫২৮২৩ সের। ১৯১৬ খৃঃ অব্দে মদ ৩০১০০০০ সের, গাঁজা ৭৩২১৮ সের এবং অহিফেন ৪৩৪৭৯ সের। ১৯১৭ খৃঃ অব্দে মদ ৩১৮৫০০০ সের, গাঁজা ৭৫১৯৩ সের এবং অহিফেন ৩৮১১৮ সের। হিসাবে বুঝা যায়—বাঙ্গালা দেশ নেশায় মসগুল্‌ হইয়া পড়িয়াছে। গাঁজা ও আফিংখোর অপেক্ষা মাতালের সংখ্যাই হিসাবে অধিক।

মত্ততায় দণ্ড।—বাঙ্গালা দেশে মাত্‌লামির জন্য ১৯১০-১১ খৃঃ অব্দে দণ্ড পাইয়াছিল ৯২৮৭ জন। ১৯১৫-১৬ খৃঃ অব্দে ঐরূপ দণ্ড প্রাপ্ত ব্যক্তির সংখ্যা ৯৩৭৮ জন এবং ১৯১৬-১৭ খৃঃ অব্দে দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি ৯৮৬৫ জন। ইহার মধ্যে কেবল কলিকাতায় ১৯১০-১১ খৃঃ অব্দে দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি ৮২১৬ জন; ১৯১৫-১৬ খৃঃ অব্দে ৬৭৬৩ জন এবং ১৯১৬-১৭ খৃঃ অব্দে ৬৯৬৫ জন। কলিকাতা বাঙ্গালার সকল স্থানের সেরা, কাজেই কলিকাতায় সব বিষয়েরই বাড়াবাড়ি।

শোকসভা।—৺দুর্গাপ্রসাদ সেন কবিরাজ মহাশয়ের জন্য গত ৮ই বৈশাখ কলিকাতা ইন্‌ভারসিটি ইনষ্টিটিউট হলে এক বিরাট শোকসভা হইয়াছিল। অনেকেই বক্তৃতা করিয়াছিলেন। এই বৃদ্ধ বৈদ্যের সম্বর্দ্ধনার জন্য একটি স্মৃতি সংরক্ষণ করা হইবে সাব্যস্থ হইয়াছে।

করপোরেসনের সাহায্য।—অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের দাতব্য চিকিৎসালয়ের জন্য কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটি এ বৎসর আড়াই হাজার টাকা দান করিয়াছেন। আমরা এজন্য তাঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞ।

মাসিকপত্র ও সমালোচক।

২য় বর্ষ। | বঙ্গাব্দ ১৩২৫—আষাঢ়। | ১০ম সংখ্যা।

স্বাস্থ্যরক্ষায় সমুদ্রতীর।

তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলিয়া মুক্তাজাল ছড়াইতে ছড়াইতে গভীরগর্জ্জনে বেলাভূমির দিকে পুনঃ পুনঃ সমুদ্র বেগে ছুটিয়া আসিতেছে, আবার মাথা আছড়াইয়া তীরস্থ যা' কিছু লইয়া মুহূর্ত্তে সরিয়া যাইতেছে, আবার তরঙ্গ তুলিতেছে, মুক্তাবৃষ্টি করিতেছে, তীরের দিকে ছুটিতেছে, আবার সরিয়া যাইতেছে, এ আসা-যাওয়ার বিরাম নাই, এ লীলা-খেলার অন্ত নাই; অনন্ত অগাধ অকূল অসীম সমুদ্র আপনার লীলায়, আপনার খেলায় আপনিই বিহ্বল, আপনিই উন্মত্ত, আপনিই মোহিত! লহরে লহরে হীরা, চুন্নি, পান্নার গড় বাঁধিতেছে, পলকে ভাঙ্গিয়া দিতেছে. বুক ফুলাইয়া আপনার মনে আপনি হাসিতেছে, শতবজ্রধ্বনিকে ছাপাইয়া গভীর-গর্জ্জনে নিজের বল বিক্রম বিশ্ববাসীকে বুঝাইয়া দিতেছে। চক্ষুঃ পলক তুলিয়া নিয়ত এই দৃশ্য দেখিতে চায়, গড়ের মাঠে ঘোড়ার মত সমুদ্রের বুকে ছুটিয়া যায়, আকাশ নুইয়া পড়িয়া সমুদ্রের বুকে আবরণের সৃষ্টি করিয়াছে; সেইখানে বাধা পাইয়া আবার ফিরিয়া আসে। সমুদ্রের বুকে পলকে পলকে যে কত রঙের পরিবর্ত্তন, কত রঙের একত্র সমাবেশ হইতেছে, কত রঙের কতরকমের ছোট বড় কত যে উজ্জ্বল চকচকে—ঝকঝকে ফুল ফুটিতেছে, তাহা দেখিয়া চোখ ফিরিতে চায়না, দেখিতে দেখিতে পরিশ্রান্ত হয়না, অবসাদ পায়না, আনন্দে বিস্ফারিত হইয়া থাকে।

বৃদ্ধযুবকের চক্ষুও বালকের চক্ষুর মত জিজ্ঞাসু হইয়া পড়ে, বিস্ময়ে সাগরে ভাসিয়া বেড়ায়। দৃষ্টিশক্তি তাহার পুনঃ পুনঃ নূতন নূতন খাদ্য পাইয়া বাড়িয়া উঠে, সবল হয়। সমুদ্রের বক্ষঃস্থল অসীম, কেবল ধূধূ করিতেছে, বায়ু কোনস্থলেই বাধা পায় না, সমুদ্রের বুকে অসীম নির্ম্মল আকাশ পাইয়া কেবল খেলিয়া

বেড়াইতেছে, কাচস্বচ্ছ লবণাম্বুর তরঙ্গে শত শত শ্বেতপদ্ম ফুটাইতেছে, তরঙ্গে তরঙ্গে সন্তরণ করিয়া আকাশ সাগরে ভাসিয়া পুনঃপুন আসিয়া মানবমানবীর সর্ব্বাঙ্গ আঁকড়াইয়া পুনঃপুন আলিঙ্গন করিতেছে। বায়ুর সেই অনুষ্ণাশীত স্পর্শে সর্ব্বাঙ্গে এক নবভাব আসিতেছে, সন্তাপ ও জড়তা দূরে সরিয়া পড়িতেছে। বায়ু-হিল্লোলে ভাসিয়া মানবের কর্ম্মশক্তি চতুর্গুণ বাড়িয়া উঠিতেছে। হস্ত, পদ, সবল হইতেছে, মনে স্ফূর্ত্তি ও উৎসাহ জন্মিতেছে। সমুদ্র গর্জ্জনের বিরাম নাই, শতশত ঝড়, শতশত সাইক্লোন—সমুদ্রবক্ষে ঘনীভূত হইয়া অবিশ্রাম শব্দ উঠাইতেছে, তরঙ্গের উপরে সবেগে সবলে তরঙ্গ পড়িয়া শতকামানের ঘোরগর্জ্জনকে ছাপাইয়া নবীন মেঘের শতবজ্রপাতী ঘনগভীরধ্বনিকে নীচু নীচু করিয়া অনবরত গুড়ুম গুড়ুম শব্দ তুলিতেছে। এই শব্দরাশির ভিতরে পড়িয়া কর্ণের বিশ্রাম নাই, শব্দেও কঠোরতা নাই, জল ও বায়ুর মিলনে সেই গভীর ঘোরগর্জ্জনের মধ্যেও কোমলতা আসিয়াছে।

গাম্ভীর্য্য ভীষণতা ও কোমলতার একত্র মিলন ঘটিয়াছে। এই গভীর ঘোর গর্জ্জন গ্রহণে কর্ণ সমর্থ। কর্ণ প্রস্তুত হইয়া এই সব গ্রহণ করিতেছে, করিতে করিতে তাহার সামর্থ্য বাড়িতেছে, শক্তিবর্দ্ধিত হইতেছে। স্নানার্থী সমুদ্রজলে আবক্ষঃ মগ্ন করিয়া সমুদ্রের দিকে পৃষ্ঠ রাখিয়া দাঁড়াইয়াছে; সমুদ্র পর্ব্বতপ্রমাণ তরঙ্গ তুলিয়া বেগে আসিয়া তাহার গায়ে ছুটিয়া পড়িতেছে, সর্ব্বাঙ্গ আপ্লাবিত করিয়া মাথার উপর দিয়া সেই পর্ব্বতপ্রমাণ তরঙ্গ চলিয়া যাইতেছে, আবার ফিরিবার সময়েও সবলে নাকে, মুখে, লবণাম্বুর ঝটকা লাগাইয়া স্থানভ্রষ্ট করিয়া আছড়াইয়া ফেলিয়া চলিয়া যাইতেছে। এইভাবে সমুদ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া সঙ্গে সঙ্গে স্নানার্থীর ব্যায়াম হয়, সেই ব্যায়ামে সর্ব্বশরীর দৃঢ় হয়, শরীরে বলের প্রতিষ্ঠা হয়, লবণাম্বুর ঝটকায় লোমকূপগুলি পরিস্কৃত হয়, শরীরের মল অপসারিত হয়, নিয়তচঞ্চল ফেনিল লবণাম্বুর পুনঃপুন সবেগ-স্পর্শে শরীরে উত্তাপবৃদ্ধি পায়, বাতরোগ বিদূরিত হয়, আর যে সকল রোগ কীটাণু-পুঞ্জের আশ্রয়ে জন্মিয়াছে; সেই সকল রোগের কীটাণুপুঞ্জও জলৌকার ন্যায় লবণাম্বুর সংস্পর্শে একেবারে বিনষ্ট হইয়া যায়। পচা জীবদেহে, পচা উদ্ভিদে, পচা আবর্জ্জনায় দুষ্ট কীটাণুর বর্দ্ধন হয়, অগাধ অসীম আবর্ত্তময় লবণাম্বু রাশির বক্ষে কিছুই পচিতে পারে না, তাহাতে দুষ্ট কীটাণুরও অস্তিত্ব নাই।

যক্ষ্মার কীটাণু মানুষের ফুস্‌ফুসে প্রবেশ করিয়া সেইখানে ঘরবাড়ী করিয়া লয় সত্য, কিন্তু কেবল সেই কীটাণুই মানুষকে মারে না; দূষিত বায়ুর কৃপায় অন্যজাতীয় দুষ্ট কীটাণুও নাসারন্ধ্রের পথে ফুস্‌ফুসে প্রবেশ করিয়া যক্ষ্মার কীটাণুর সহায়তা করে। এই দ্বিবিধ কীটাণুর যুগপৎ আক্রমণ আর মানুষ সহ্য করিতে পারে না, অল্পদিনেই তাহার ভবলীলার শেষ হইয়া যায়। সমুদ্রবক্ষে অবাধ সঞ্চারী স্বচ্ছন্দ বিহারী বায়ুতে দুষ্ট কীটাণুর সম্পর্ক নাই; সুতরাং সেই নির্ম্মল বায়ুগ্রহণে যক্ষ্মার কীটাণু আর নিজের সহায়তাকারী অন্যকীটাণু পাইতে পারে না। তাপের বৈষম্য যক্ষ্মাক্রান্তের বিশেষ অপকারী, সমুদ্রে তাপের বৈষম্য নাই, সর্ব্বদা তাপের সাম্যই তাহাতে বিরাজ করে। এই তাপসাম্যেই সমুদ্রের বায়ু নাতিশীত, নাত্যুষ্ণ। এই বায়ু, এই তাপ

যক্ষ্মাক্রান্তের উপকারী, হৃদরোগেও উপকারী, শ্বাস রোগেও উপকারী। কেন উপকারী বলিতে গেলে অল্পকথায় হয় না, অনেক কথা বলিতে হয়।

মেঘের উপরে মেঘ পড়াতে মেঘে যেমন বিদ্যুতের সঞ্চার হয়; সেইরূপ তরঙ্গের উপরে প্রবলবেগে তরঙ্গ পড়াতে সমস্ত সমুদ্র বিদ্যুন্ময় হইয়া উঠে; সেই বিদ্যুৎ সাগরবিহারী বায়ুকে মুহূর্ত্তে অম্লজানে পরিণত করে, আবার বিদ্যুতের সংস্পর্শে সেই অম্লজান বায়ু মুহূর্ত্তে ওজনে (ভঙ্গপ্রবণ বায়ুতে) পরিণত হয়। ওজন আবার দূষিত পদার্থের সম্মুখীন হইলে মুহূর্ত্তে ভাঙ্গিয়া চূরিয়া সহস্র সহস্র ভাগে বিভক্ত হইয়া 'ও' রূপ (বায়ুবিশেষের রূপ) ধারণ করে। এই 'ও' এর এত শক্তি বাড়ে যে, সে সেই দুষ্ট কীটাণুরাশিকে ও তাহার বিষকে ধ্বংস করিতে সমর্থ হয়। সংস্কৃত ধর্ম্মশাস্ত্রে, চিকিৎসাশাস্ত্রে বা কাব্যসাহিত্যে অম্লজান, ওজন 'ও' প্রভৃতি অর্থে ব্যবহৃত কোন শব্দ এ পর্য্যন্ত স্পষ্টতঃ পাই নাই। না পাইবার অনেক কারণ আছে, জল-বায়ুদোষে অনেক পুস্তক নষ্ট হইয়াছে, অনেক পুস্তক অগ্নি ও কীটে নষ্ট করিয়াছে, রাশিরাশি পুস্তক বর্ব্বর সেনানীর হস্তে অগ্নিসাৎ হইয়াছে, অনেক পুস্তক অধ্যয়ন অধ্যাপনার অভাবে হতাদরে জীর্ণ হইতে হইতে মৃত্যুমুখে পড়িয়াছে। যাহা অবশিষ্ট আছে, তাহার অনেকগুলি দুর্লভ, সুলভ পুস্তকের মধ্যেও সকলগুলি পুস্তকে চক্ষুঃ সংযোগ হয় নাই, চক্ষুঃসংযোগ হইলেও সমস্ত অংশের অর্থাবগতি করিতে সামর্থ্য হয় নাই। নয় ত যে আর্য্য ঋষিগণ প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান এই পাঁচপ্রকারে ও নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত, ধনঞ্জয় এই পাঁচপ্রকারে, বায়ুকে বিভক্ত করিয়াও সন্তুষ্ট হয়েন নাই, আবার উনপঞ্চাশৎ প্রকারে বিভক্ত করিয়াছেন; তাঁহারা যে সামান্য অম্লজান, ওজন 'ও' জানিতেন না, একথা বলিতে পারিনা। না জানিলেই বা কেন তাঁহারা ধর্ম্ম-ব্যাজে সমুদ্র-তীরে বাসের ব্যবস্থা দিয়াছেন? যে বায়ু গ্রহণ করিয়া আমরা জীবন রক্ষা করি; তাহার নাম প্রাণবায়ু, যাহা ত্যাগ করি, তাহার নাম অপানবায়ু। এই প্রাণবায়ুকে কি অম্লজান বলা যাইতে পারে না? স্বাস্থ্যের কথা বলিলে, রোগবিনাশের কথা বলিলে, শরীর রক্ষার কথা তুলিলে, ধর্ম্মপ্রাণ ভারতের নরনারী শুনিবে না; জগতের একান্ত কল্যাণ কাম ঋষিবৃন্দ সেইজন্য সেই কথা না উঠাইয়া সমুদ্রকে তীর্থরাজ বলিয়াছেন। সমুদ্রের জলে দাঁড়াইয়া অর্ঘমর্ষণ মন্ত্রজপ ও সন্ধ্যা তর্পণ করিবার বিধিপ্রদর্শন করিয়াছেন, পুণ্যতীর্থ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন, পুণ্যতিথিতে অব-গাহন স্নানের ব্যবস্থা দিয়াছেন, সমুদ্রে স্নান, দান, তর্পণ, শ্রাদ্ধ, পূজা—যাহা করিবে, তাহাতেই অনন্ত ফল হইবে বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, দুন্দুভিনাদে এইরূপ ঘোষণা করিয়াও তাঁহারা পরিতৃপ্ত হয়েন নাই, মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নকে আদেশ করিয়া সমুদ্রতীরে দেবাদিদেব পুরুষোত্তমের ত্রিমূর্ত্তির স্থাপন করাইয়াছেন। শক্তির উপাসকদিগকে পীঠভূমি বলিয়া বিমলার অধিষ্ঠান বিমলাক্ষেত্র বলিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন, আবার শৈবদিগকে সপ্তকল্পান্তজীবী মার্কণ্ডেয় ঋষির আশ্রম দেখাইয়া মার্কণ্ডেয় পূজিত মার্কণ্ডেয়েশ্বরের পূজার উপদেশ দিয়াছেন, ও এস্থানে অবস্থিতি করিলে অল্পায়ুও দীর্ঘজীবন লাভ করে ইঙ্গিত করিয়াছেন। সমুদ্রতীরে অদূরে সৌরদিগের জন্য কোণার্কে স্বতন্ত্র

ভাস্করক্ষেত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন। গাণপত্যদিগের জন্যও গণেশের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এই সকল ব্যবস্থা দেখিয়া ও শুনিয়া কি বলিব, আর্য্য ঋষিগণ সমুদ্রতীরে বাসের উপকারিতা জানিতেন না? সমুদ্রজলে অবগাহনের রোগসংহারতা বুঝিতেন না? ধর্ম্মশাস্ত্রের অনেক উপদেশেই যে চিকিৎসা শাস্ত্রের অনেক ব্যবস্থা নিহিত আছে, যিনি মহর্ষি জৈমিনি প্রণীত পূর্ব্বমীমাংসা অধ্যয়ন করিয়াছেন; তিনি তাহা জানেন। এই পুণ্যক্ষেত্রে বাস করিবার জন্য ঋষি বলিয়াছেন, "সংবৎসর মুপোষিত্বা মাসত্রয় মথা পিবা। তেন যষ্টং হুতং তেন তেন তপ্তং তপো মহৎ। সযাতি পরমং স্থানং যত্র যোগেশ্বরো হরিঃ। যে ব্যক্তি সংবৎর কাল, অগত্যা তিন মাস কাল এই পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে বাস করিয়া (অন্যত্র না যাইয়া) অবস্থান (উহ্য) করে; তদ্দ্বারা সে মহতী দেবপূজা, মহাযজ্ঞ, মহতীতপস্যা করিয়াছে; যেস্থানে যোগেশ্বর হরি বাস করেন; দেহাবসানে (উহ্য) সেই পরমস্থানে তাহার গতি হয়।

"বার্ষিকাং চতুরোমাসান্ যাবৎ স পুরুষোত্তমে। কাশীবাস যুগান্যাষ্টৌ দিনেনৈ কেন লভ্যতে"। আটযুগ পর্য্যন্ত কাশীতে বাস করিলে যে পুণ্য হয়; বৎসরে চারিমাস পর্য্যন্ত পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে বাস করিলে তাহার একদিনে সেই পুণ্য হয়।

"বট সাগরয়োর্ম্মধ্যে যে ত্যজন্তি কলেবরং। তে দুর্লভংপরংমোক্ষমাপ্নুবন্তি ন সংশয়ঃ"। অক্ষয়বট ও সমুদ্রের মধ্যস্থলে যে সকল ব্যক্তি দেহত্যাগ করে; তাহারা পরম দুর্লভ মুক্তি লাভ করে, এ বিষয়ে সংশয় নাই। কত বচন দেখাইব? উদ্ধৃত বচন কয়েকটির ন্যায় পুরাণ শাস্ত্রে অনেক বচন আছে; অনেক আখ্যায়িকা আছে। বিমলস্বাস্থ্যে যাহার দেহপুষ্ট, মনঃ হৃষ্ট ও সবল; সে কখনও মৃত্যুর জন্য চিন্তা করে না, মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয় না, যাহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছে, উৎকটরোগের হাতে পড়িয়া চিকিৎসায় যাহার কোন ফল হইতেছে না; সেই ব্যক্তিই মৃত্যুসম্মুখীন হইতেছে মনে করে, মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়; তাহাকেই ঋষি "বটসাগরয়োর্ম্মধ্যে" ইত্যাদি বলিয়া মোক্ষের প্রলোভনে প্রলোভিত করিয়া রোগমুক্তির উদ্দেশে সমুদ্রতীরে বাসের ব্যবস্থা দিতেছেন। যিনি একবৎসরকাল—অন্ততঃ তিনমাসকাল সমুদ্রতীরে বাসের ব্যবস্থা করিয়াছেন, সকলের পক্ষে প্রতিবর্ষে চারিমাস সমুদ্রতীরে বাসকরা কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাঁহার যে স্বাস্থ্যবিজ্ঞানে কতদূর পারদর্শিতা ছিল ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়, ঋষিদিগের উপরে ভক্তিস্রোতঃ বর্দ্ধিত হইয়া পড়ে।

"প্রাণস্ত্বং সর্ব্বভূতানাং যোনিস্ত্বং সরিতাংপতিঃ।
তীর্থরাজ নমস্তভ্যং ত্রাহিমামচ্যুতপ্রিয়"।
"ত্বমগ্নি দ্বিপদাং নাথ রেতোধাঃ কাকদীপনঃ।
প্রধানঃ সর্ব্বভূতানাং জীবানাং প্রভুরব্যয়ঃ"।
"অমৃতস্যারণিস্ত্বংহি দেবযোনি রপাং পতিঃ।
বৃজিনং হরমে সর্ব্বং"—
"অগ্নিশ্চ তেজো বড়বাচ দেঁহো রেতোধাঃ"।
ইত্যাদি ইত্যাদি।

তুমি সকল প্রাণীর প্রাণ; সকল প্রাণীর উৎপাদক, অচ্যুতপ্রিয় (ভগবানের প্রিয়, বা চ্যুত হয় না প্রিয় যাহা হইতে) তোমাকে নমস্কার, তুমি আমার নিস্তার কর। হে নাথ, তুমি দ্বিপদদিগের (মনুষ্যদিগের) অগ্নি, তুমি তাহাদিগের রেতোধাঃ (বীর্য্যধারণকারী বা বীর্য্যদানকারী) তুমি তাহাদিগের কাকদীপন (কাকের জঠরাগ্নির ন্যায় জঠরা-

গ্নির—উদ্দীপক) পঞ্চভূতের মধ্যে তুমিই শ্রেষ্ঠ, তুমি সর্ব্বজীবের প্রভু (রক্ষাকর্ত্তা) তুমি সমস্ত পাপ নষ্টকর। সমুদ্রই অগ্নি, সমুদ্রই বড়বা; সমুদ্রই দেহ, সমুদ্রই রেতোধাঃ।

যখন বায়ুকে প্রথমে পাঁচভাগে বিভক্ত করিয়া তাহার একটি বায়ুর নাম প্রাণ বলা হইয়াছে; তখন বুঝিতে হইবে, সংস্কৃত সাহিত্যে যে বায়ুকে জগৎপ্রাণ বলা হইয়াছে, সে জগৎ প্রাণ অর্থে সমস্ত বায়ু নহে, বায়ু বিশেষ। এই বায়ু সমুদ্রে নিয়ত উৎপন্ন হইতেছে, এইজন্য মন্ত্রে সমুদ্রকেই প্রাণীর প্রাণ বলা হইয়াছে। "অপেয়শ্চ মহোদধিঃ" ইত্যাদি বলিয়া ঋষি সমুদ্রের জলপান অকর্ত্তব্য বলিয়া নিষেধ করিয়াছেন। লবণ স্বাদ ও তিক্তস্বাদ বলিয়াই কেবল নিষিদ্ধ নহে, অজীর্ণতার উৎপাদন করে বলিয়াও সমুদ্রজল নিষিদ্ধ, এরূপ অবস্থায় কাকের জঠরাগ্নির ন্যায় সমুদ্র জঠরাগ্নির উদ্দীপক কি করিয়া হয় চিন্তা করিবার বিষয়। সমুদ্রতীরে বাস করিলে নানাপ্রকারে স্বাস্থ্যোন্নতি হয়, শরীরের উন্নতি, শারীরিক যন্ত্রের উন্নতি হয়, শরীর সবল হয়। ঋষি স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন; "জীর্ণত্বচইরোরগঃ" সর্প যেমন পুরাতন ত্বক্ ত্যাগ করিয়া নব কলেবর লাভ করে; সমুদ্রতীরে বাস করিলে মানুষও সেইরূপ পূর্ব্ব শরীর ত্যাগ করিয়া নব কলেবর লাভ করে। শারীরিক বল লাভ করিলে তাহার জীর্ণ করিবার শক্তিও বাড়ে; এইজন্য মন্ত্রে "কাকদীপনঃ" পদ রহিয়াছে, আর যদি "কাকদীপনঃ" না হইয়া "কাম দীপনঃ" পাঠ হয়; তবে আর তাহার ব্যাখ্যা করিবার জন্য বেগ পাইতে হয় না। "অমৃতস্যারণি" অর্থ কি? ভাববাচ্যে ক্ত প্রত্যয় করিলে মৃত অর্থে মৃত্যু বুঝায়, মৃত্যুর অভাব অমৃত, অমৃত্যু অর্থ জীবন, জীবন আত্মা নয়। মোটরকার বা ট্রেনের কল বিগড়াইলে বা তাহাতে তাপ না থাকিলে কেহ তাহাতে আরোহণ করে না; সেইরূপ শরীরের যন্ত্র বিগড়াইলে বা তাপ না থাকিলে তাহাতে আর আত্মার অধিষ্ঠান থাকে না; সুতরাং শরীর যন্ত্রের পরিচালন ও শরীরস্থ তাপই জীবন। সমুদ্র—ফুস্‌ফুস্ ও হৃদয় যন্ত্রের উপকারক; এজন্য সমুদ্রকে অমৃতের অরণি বলা হইয়াছে। আর্য্য বিজ্ঞানে অগ্নি, বিদ্যুৎ, তাপ—এ সমস্তকে সামান্যতঃ অগ্নি নামে অভিহিত করা হইয়াছে। তাপ যখন অগ্নি—তাহাকে জ্বালাইবার জন্য কাষ্ঠ চাই, এই কাষ্ঠ সমুদ্র; কাষ্ঠেরই নামান্তর অরণি। সমুদ্র মন্থনের আখ্যায়িকা ভারতবাসী মাত্রেই অবগত রহিয়াছে। এই মন্থন কার্য্যের পরিসমাপ্তি আজও হয় নাই। তরঙ্গের উপরে তরঙ্গের সবেগে পতন ও সেইরূপ আলোড়নই সমুদ্র মন্থন; সেই মন্থনের ফলে বিদ্যুতের আবির্ভাব, তাহার ফলে বিশুদ্ধ অম্লজানের আবির্ভাব; সেই অম্লজানই অমৃত—সুধা। নাসারন্ধ্রে সেই সুধা পান করিয়া মানব অমরত্ব লাভ করে, এতত্ত্বও আমরা সেই মন্ত্রস্থ 'অমৃতস্যারণি" এই পদদ্বয়ের অর্থে অবগত হই। সমুদ্রস্থ বিদ্যুতের নাম বাড়বাগ্নি ও ফস্‌ফরাসের নাম ঔষধ।

বড়বা শব্দের অভিধানিক অর্থ ঘোটকী; সমুদ্রের তরঙ্গগুলি ঘোটকীর মত তীরের দিকে ছুটিয়া আসে; সেই জন্য কবির ভাষায় তাহাকে বড়বা বলা হইয়াছে। সেই বড়বা হইতেই সামুদ্রিক বিদ্যুতের উৎপত্তি; সেইজন্য তাহার নাম বাড়ব। সেইজন্য মন্ত্রে সমুদ্রের সমস্ত দেহকেই বড়বাময় বলা হইয়াছে। "রেতোধা" শব্দের অর্থ=স্পষ্ট। শাস্ত্রে স্বহস্ত পক্ব অন্ন ভোজনেরই প্রশংসা, তাপের সমতা

বিধানের উদ্দেশেও সমুদ্রতীরে রোগীর পক্ষে বাসের ব্যবস্থা; আগুন জ্বালাইয়া আগুনের কাছে বসিয়া স্বহস্তে পাক করিলে তাপের বৈষম্য হইবে; এইজন্য স্বয়ং পুরুষোত্তম প্রকাণ্ড হোটেল খুলিয়া বসিয়াছেন। শাস্ত্রকার ঋষিরাও উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, এই ক্ষেত্রে পাক করিয়া খাইবে না, খাইলে পাপ হইবে, এই হোটেলের অন্ন না খাইলেও পাপ হইবে। উড়ে ঠাকুরেরা সম্প্রতি বঙ্গ গৃহিণীদিগের শিষ্যত্বে আদ্যার সম্ভার প্রভৃতি শিখিয়াছে; পূর্ব্বে জানিত না, তাহাদিগের পূর্ব্ব পুরুষেরাও জানিত না; আদি ঠাকুর ও আদি ঠাকুরাণী আর কি করিয়া তাহা জানিবেন? তারপর তাঁহাদিগের হাতের আগাও নাই, কষ্টে স্থষ্টে না হয় একবার হাঁড়ী উঠাইতে ও নামাইতে পারেন; পুনঃ পুনঃ নামান উঠান তাঁহাদিগের সাধ্যাতীত; কাজে কাজে সম্ভার, সাতলান প্রভৃতি তাঁহাদিগের দ্বারা হওয়া একেবারেই অসম্ভব। এজন্য ইন্দুমাধব মল্লিকের অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহের জন্মিবার যুগ যুগান্তর পূর্ব্ব হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্য্যন্ত ইউপিক্‌কুকারে তাঁহারা সেই হোটেলের অন্ন ব্যঞ্জনাদি সমস্তই রাঁধিতেন। এখন ভাবিয়া দেখুন, এইরূপ প্রসাদী অন্ন ব্যঞ্জন কত সহজে হজম হইয়া যাইতে পারে; রোগীর পক্ষেও ভাল, ভোগীর পক্ষেও ভাল। এক প্রসঙ্গে অনেক বলিলাম, আর বলিব না, আধ্যাত্মিকতার কথা আর উঠাইব না।

শ্রীযাদবেশ্বর তর্করত্ন।

সার্জ্জন-সুশ্রুত।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

—:*:—

(ধাত্রী-বিদ্যা।)

ধাত্রী বিদ্যায় সুশ্রুতের কিরূপ পারদর্শিতা ছিল, নিম্নে তাহার একটু আভাষ দিতেছি।

সুশ্রুত গর্ভস্থিত মৃত সন্তান বাহির করিবার প্রক্রিয়া সম্বন্ধে শিষ্যগণকে উপদেশ দিতেছেন;—"যদি গর্ভস্থ মৃত সন্তান হাতের সাহায্যে বাহির করিতে না পার, তাহা হইলে অস্ত্র দ্বারা ভ্রূণ ছেদন করিয়া বাহির করিবে। কিন্তু সাবধান—সন্তান জীবিত থাকিলে, কখনও অস্ত্র প্রয়োগের চেষ্টা করিও না, তাহাতে গর্ভ ও গর্ভিণী উভয়েরই বিপদ ঘটিতে পারে। মৃত সন্তান প্রসব করাইবার পূর্ব্বে, গর্ভিণীকে মধুর বচনে আশ্বস্ত করিবে। তাহার পর মণ্ডলাগ্র নামক অস্ত্রের দ্বারা ভ্রূণের মস্তক বিদীর্ণ করিয়া ফেলিবে, এবং খর্পর গুলি খণ্ড খণ্ড করিয়া শঙ্কু অর্থাৎ আকর্ষণী অস্ত্রের সাহায্যে বাহির করিবে। শেষে বক্ষঃ ও কক্ষ-দেশ ধরিয়া ধীরে ধীরে মৃত সন্তানকে বাহির করিবে। যদি মস্তক বিদীর্ণ করিতে না পার,

তাহা হইলে অক্ষিপুট ও গণ্ডদেশ ধরিয়া সন্তানকে বাহিরে আনিবে। সন্তানের স্কন্ধদেশ অপত্য পথে আবদ্ধ হইলে, বাহুদ্বয় ছেদন করিবে। ভ্রূণের উদর বায়ু কর্ত্তৃক ফুলিয়া থাকিলে, তাহা চিরিয়া অন্ত্র সমূহ বাহির, করিয়া ফেলিবে। ইহাতে শিশুর দেহ শিথিল হইয়া পড়ায় তাহাকে অনায়াসে বাহিরে আনা যায়। জঘন-দেশ দ্বারা অপত্য পথ অবরুদ্ধ হইলে, জঘনাস্থি ছেদন করিবে। * * মৃতগর্ভ নিষ্কাসনের পক্ষে মণ্ডলাগ্র অস্ত্রই খুব ভাল। তীক্ষ্ণাগ্র বিশিষ্ট বৃদ্ধি পত্র অস্ত্র প্রয়োগে গর্ভিণীকে আঘাত লাগিতে পারে।”

অতি সংক্ষেপে আমি মহর্ষির উপদেশের মর্ম্মানুবাদ লিপিবদ্ধ করিলাম। বলিতে লজ্জা হয়—সেই সুশ্রুতের বংশধর আমরা—গর্ভস্থ মৃত সন্তান ছেদনের কথা শুনিলে এখন আমাদের হৃদ্‌ কম্প হইয়া থাকে। প্রসব-সাধনের প্রধান অস্ত্র মণ্ডলাগ্রের আকারও আমরা চ’ক্ষে দেখিবার সুযোগ পাইলাম না! এমনি আমাদের দুর্ভাগ্য!

বন্ধন।

পতন, আঘাত প্রভৃতি কারণে দেহের অস্থি সমূহ ভগ্ন হইলে, “বন্ধনের” প্রয়োগ করিতে হয়। বন্ধনের ইংরাজী নাম Bandage. অস্ত্র প্রয়োগের পর আহত বা ক্ষত স্থানেও অস্ত্র চিকিৎসকগণ বন্ধনের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। সুশ্রুত এই বন্ধন ব্যাপারেও বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। তাঁহার গ্রন্থে অনেকগুলি বন্ধনের নাম পাওয়া যায়। যথা;—১। কোশ বন্ধন, ২। দাম বন্ধন, ৩। স্বস্তিক বন্ধন, ৪। তনু বেল্লিত বন্ধন, ৫। ছ তোলী বন্ধন, ৬। মণ্ডল বন্ধন, ৭। সুগিকাবন্ধন, ৮। যজক বন্ধন, ৯। খট্টা বন্ধন, ১০। চীন বন্ধন, ১১। বিবন্ধ বন্ধন, ১২। বিতান বন্ধন, ১৩। গোফণা বন্ধন, ১৪। পঞ্চাঙ্গী বন্ধন। এই সকল বন্ধনের প্রণালীই য়ুরোপের ডাক্তার-গণ ভারতবাসী বৈদ্যের কাছে বহুযুগ পূর্ব্বে শিক্ষা করিয়াছিলেন।” ‘ভারতী’ পত্রে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী এম্‌ এ, মহাশয় চিত্রের সাহায্যে তাহা দেখাইয়া দিয়াছেন।

সুশ্রুত বন্ধন কার্য্যের জন্য প্রয়োজনমত—কার্পাস বস্ত্র, মেষ লোম নির্ম্মিত বস্ত্র, রেশমী-ক্ষৌম বস্ত্র, চর্ম্ম, বংশাদির চটা বা চেয়াড়ী, সূত্র, লৌহ এবং কাষ্ঠ ফলক প্রভৃতি ব্যবহার করিতেন। দেহের স্থান বিশেষে যেরূপ যেরূপ বন্ধন সু-নিবিষ্ট হইতে পারে, সুশ্রুত তাহা উত্তমরূপেই অবগত ছিলেন। এই সকল বন্ধন আবার তিন প্রকার ছিল। যে বন্ধন খুব শক্ত অথচ বেদনা প্রদ নহে, তাহার নাম ছিল—“গাঢ় বন্ধন”। যে বন্ধনের ভিতর দিক ফাঁপা থাকিত তাহার নাম “শিথিল বন্ধন”। যে বন্ধন খুব শক্তও নহে, শিথিলও নহে—তাহার নাম “সমবন্ধন”।

সুশ্রুত শুধু সার্জ্জন ছিলেন না, তিনি এক জন ফিজিসিয়ান ও ছিলেন। সুশ্রুত সংহিতায় কায় চিকিৎসার অনেক অমূল্য উপদেশ আছে। কায় চিকিৎসক-শিরোমণি চরক ৫০০ ভেষজের উল্লেখ করিয়াছেন, ৩৭টী গুণে সুশ্রুত ৭৬০ টী গুণ বর্ণনা করিয়াছেন। সুশ্রুতের গ্রন্থে আমরা বিবিধ লবণ, ধাতু দ্রব্য, এবং নানা খনিজ পদার্থের ঔষধার্থে প্রয়োগ দেখিতে পাই।

সুশ্রুতের মতের আদর।

আজ কাল যে সকল রোগে অস্ত্র প্রয়োগ অতি কঠিন বলিয়া ধীগণ স্বীকার করিয়া

থাকেন, সুশ্রুতের সময় তাহার অধিকাংশই প্রচলিত ছিল। major operation. Amputation Abdominal Section—সুশ্রুত এসব ভালরকম জানিতেন। ৯৭৭ খৃঃ পূঃ অব্দে ও—ভারতে সুশ্রুতের অস্ত্র চিকিৎসা প্রচলিত ছিল। পাঠক মহাশয় বল্লাল পণ্ডিতের "ভোজ প্রবন্ধ" পড়িলে তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাইবেন সুশ্রুত এবং তাঁহার মতাবলম্বী শল্য বৈদ্যগণ রোগীর শরীরে অস্ত্র প্রয়োগ করিবার পূর্ব্বে, "সম্মোহিনী" ঔষধ প্রয়োগ করিয়া রোগীর জ্ঞান তিরোহিত করিতেন। অস্ত্র চিকিৎসার পরে, "সঞ্জীবনী" নামক ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া তাঁহারা রোগীর চেতনা সম্পাদন করিতেন। এখন ডাক্তারদের "ক্লোরোফর্ম্ম" "সম্মোহিনীর" স্থান অধিকার করিয়াছে, কিন্তু "সঞ্জীবনীর ন্যায় কোনও ঔষধ অদ্যাবধি য়ুরোপের Pharmacopoeu তে দেখিতে পাওয়া যায় না।

খৃষ্টীয় যুগের প্রারম্ভে আরব দেশের বিখ্যাত চিকিৎসক সিরারিয়ন, স্ব প্রণীত চিকিৎসা-গ্রন্থে, সুশ্রুত ও চরকের বহু মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। আফলাটুন্ (Aflutoon) নামক মুসলমান চিকিৎসক নবম শতাব্দিতে ভারতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ইঁহার গ্রন্থে সুশ্রুত প্রভৃতির নাম স-সম্মানে উল্লিখিত হইয়াছে। ৭ম শতাব্দিতে খালিফ্ আল্ মল্ সুরের আদেশ, "সুশ্রুত সংহিতা" আরবী ভাষায় অনূদিত হয়। ঐ গ্রন্থ "খালেল সাশুর আল হিন্দি" [Khalale Shaw shooral Hindi] নামে পরিচিত। এই সময় "চরক" প্রভৃতি বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ ও আরবী ভাষায় অনুবাদিত হয়। এই সকল অনুবাদিত গ্রন্থ আবার লাটিন্ ভাষায় অনুবাদিত হয়। সেই সকল অনূদিত গ্রন্থই য়ুরোপীয় চিকিৎসা বিজ্ঞানের সুদৃঢ় ভিত্তি। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দি পর্য্যন্ত, য়ুরোপে চিকিৎসা শাস্ত্র, ভারতীয় চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রভাবে প্রভাবান্বিত ছিল। নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকগণ—মুক্তকণ্ঠে ইহা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। গোড়ার কথাটা যাঁহারা ভাবিয়া দেখিবার অবকাশ পান না, "আয়ুর্ব্বেদের" বিজ্ঞান রহস্য যাঁহাদের ভেদ করিবার শক্তি নাই, আয়ুর্ব্বেদের বিরাট বিস্তৃতি যাঁহারা কখনও চ'ক্ষেও দেখেন নাই, কেবল সেই ক্ষীণ বুদ্ধি, মোহ মুগ্ধ ব্যক্তির কাছেই আয়ুর্ব্বেদ—Quackery! প্রার্থনা করি ভগবান্ এরূপ আত্মঘাতী মানবের মনোদৈন্য নিবারণ করুণ। ইহারা আয়ুর্ব্বেদের অঙ্গে বিশ্বরূপের প্রকট মহিমা দেখিয়া জীবন সার্থক করুক।

প্রসিদ্ধ চিকিৎসক মহাত্মা নুরুদ্দীন মহম্মদ আবদুল্লা সিরাজী সাহেব, সম্রাট সাহজাহানের পারিবারিক চিকিৎসক ছিলেন। ১৬৩০ খৃষ্টাব্দে তিনি যে "আল্ ফাজেল আদ্বিচ" [Alfazl Adwich] নামক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে সুশ্রুতোক্ত অনেকগুলি ঔষধই গৃহীত হইয়াছে। সম্রাট্ ঔরংজেবের প্রিয়তম হাকিম মহম্মদ আকবর মার্জ্জানি, ১৬৫৮ খৃঃ অব্দে "কারাবাদিন্ কাদেরি" (Karabadine Kaderi) নামক গ্রন্থে সুশ্রুতের বহু ব্যবস্থা অবিকল উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহাতে বেশ বুঝা যায়—অবনতির দিনেও, মুসলমান প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে হিন্দুর আয়ুর্ব্বেদ কত আদৃত ছিল।

সুশ্রুতের প্রতিসংস্কর্ত্তা কে ?

আমরা দেখিলাম—সুশ্রুত একজন বড়-দরের বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক ছিলেন।

রসায়ন-শাস্ত্রে তাঁহার রীতিমত অধিকার ছিল। কিন্তু তাহার গ্রন্থখানি কেবল চিকিৎসা-শাস্ত্র নহে,—তাহাকে ধর্ম্মশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, ব্যবহার শাস্ত্র, এমন কি সকল শাস্ত্রের সমন্বয় বলিতে পারা যায়। বিশ্ব রহস্যের বিপুল আবর্ত্তনে—তাঁহার ঋষিত্ব গঠিত হইয়াছিল। তাঁহার সর্ব্ব ভেদিনী দূর প্রসারিণী অক্ষুণ্ণ দিব্য দৃষ্টি—মানব-মর্ম্মের মায়ালোকে প্রবেশ করিয়া, যে অপার্থিব রত্নরাজি আহরণ করিয়াছিল, তাহা তাঁহারই অমর-ঋষি-রেখাময়ী সংহিতা খানিকে জগতের চিরন্তন সম্পত্তিরূপে পরিণত করিয়াছে! যিনি সুশ্রুত পাঠ করিবেন, তিনিই বুঝিবেন—বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের পূর্ণ জ্ঞান—কেবল মানব দেহ হইতেই লাভ করা যায়। সুশ্রুতের প্রত্যেক "স্থান"—প্রতিভার জ্বালাময় ফুৎকারে উদ্দীপ্ত-চেতন, প্রত্যেক অধ্যায়—বিজ্ঞানের হিল্লোলে ও কল্লোলে স্পন্দমান, প্রত্যেক শ্লোক ওঙ্কারের মত পবিত্র! সুশ্রুতের ভাষা সুন্দর, সরল, যেন অবিরাম গতিতে অনাবিল জলস্রোতের ন্যায় কলকলে ছুটিয়া চলিয়াছে! তাহাতে আবেগ আছে, আবর্ত্ত নাই, কল্লোল আছে, কোলাহল নাই। একটী ক্ষুদ্র প্রবন্ধে—সুশ্রুতের সকল কথা আলোচনা করিতে পারি, আমার সে শক্তি নাই। সুতরাং সমালোচনা হিসাবে আজ আমার ক্ষীণ উদ্যম নিতান্তই নিস্ফল। আমার সৌভাগ্য—যৌবনোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে আমি সুশ্রুত পাঠের একটু সামান্য অধিকার লাভ করিয়াছিলাম। ভিষক কুল তিলক পাতিলপাড়া নিবাসী শ্রীমল্লোক নাথ মল্লিক মহোদয়ের চরণ তলে বসিয়া অস্ফুট অভ্যর্থনায় আমি সুশ্রুতকে বন্দনা করিবার অবকাশ পাইয়াছিলাম। সাধক যেমন একে একে পদ্মবীজ মালার এক একটী বীজ ধরিয়া মন্ত্রের আবৃত্তি করে, আমিও তেমনি এক একটী করিয়া সুশ্রুতের মহাশ্লোক মালা জীবন-মন্ত্রের মত উচ্চারণ করিয়াছিলাম। কিন্তু কৈ সিদ্ধিলাভ করিতে ত পারি নাই। এখনও ইচ্ছা হয়—যোগ্যগুরুর মুখোদগীর্ণ সুশ্রুতোক্তি কর্ণভূষণ করিয়া জন্ম ও জীবন সার্থক করি। কিন্তু হায়, সেরূপ গুরু যে আর খুঁজিয়া পাইনা। সে ঋষির আত্মা যে চিরদিনের মতই নেপথ্য-চারী হইয়া রহিয়াছে!

সুশ্রুত সম্বন্ধে আর আমার একটী কথা বলিবার আছে। বৈদ্য সমাজের বিশ্বাস—বৌদ্ধ নাগার্জ্জুন সুশ্রুত সংহিতার প্রতি সংস্কার করিয়া গিয়াছেন। আমি কিন্তু এ মত সমর্থনের কোনও প্রমাণ এ পর্য্যন্ত দেখিতে পাই নাই। আপনারা বলিবেন,—"কেন প্রমাণের অভাব কি? সুশ্রুতের টীকাকার স্বয়ং ডল্লনাচার্য্যইত এ কথা বলিয়া গিয়াছেন।" আমি কিন্তু ডল্লনাচার্য্যের কথা সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করিয়া লইতে অক্ষম। কেননা, ডল্লনাচার্য্য নাগার্জ্জুনকে যে সুশ্রুতের প্রতি সংস্কার কর্ত্তা বলিয়াছেন, তাহাতে তাঁহারই যেন সন্দেহ রহিয়া গিয়াছে। সুশ্রুতের এক স্থানে "সুভূতি গৌতম" এই নামটি দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাতেই যত গোলযোগের সৃষ্টি। মহাত্মা চক্রপাণি দত্ত—সুশ্রেুতর টীকাকার গণের অন্যতম। নাগার্জ্জুন—সুশ্রুতের প্রতি সংস্কর্ত্তা—ডল্লনের এই কথায় চক্রপাণিও একটু সন্দিগ্ধ হইয়াছেন।

সংহিতাগ্রন্থে সাধারণতঃ চারিপ্রকার সূত্র দেখিতে পাওয়া যায়। এই চারি প্রকার সূত্র মধ্যে প্রতি সংস্কর্ত্তার রচিত সূত্রও নিশ্চয় থাকিবে। কবিরাজ মহাশয়গণ অবশ্যই ইহা

জানেন। অগ্নিবেশ কৃত সংহিতার মহর্ষি চরক সংস্কার করিয়াছিলেন, আবার চরক সংহিতারও অংশ বিশেষ "দৃঢ়বল" কর্তৃক প্রতি-সংস্কৃত হইয়াছিল। চরক গ্রন্থেই তাহার স্পষ্ট প্রমাণ আছে। সুশ্রুতগ্রন্থে সেরূপ স্পষ্ট প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায় না। সুশ্রুতের প্রতি সংস্কর্ত্তা থাকিলে সুশ্রুত গ্রন্থেই তাহার উল্লেখ থাকিত। অনেকে "সুভূতি গৌতম" নামক বুদ্ধদেবের শিষ্যকে সুশ্রুতের প্রতি সংস্কারক বলেন। কিন্তু ইহাকেও প্রমাণ বলা যায় না, বরং অনুমান বলা চলে। বিশেষতঃ গৌতম নামটি বংশ পরিচায়ক, শাক্য সিংহের বহুকাল পূর্ব্বে উহা যে বর্ত্তমান ও প্রসিদ্ধ ছিল একথা অনায়াসেই বলা যাইতে পারে।

পক্ষান্তরে—সুশ্রুত সংহিতার সর্ব্বত্রই আমরা সনাতন বৈদিক ধর্ম্মের অনুশাসন দেখিতে পাই। বৌদ্ধ নাগার্জ্জুন যদি সুশ্রুতের প্রতি সংস্কার করিবেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই এরূপ থাকিত না। বেদ বিরোধী বৌদ্ধ কর্ত্তৃক বৈদিক অনুশাসন কখনই সমর্থিত হইতে পারে না। সুশ্রুতের কোন স্থানেই—বৌদ্ধ ধর্ম্মের একটু আভাষও দেখিতে পাওয়া যায় না।

আবার নাগার্জ্জুনও একজন ছিলেন না। প্রত্নতত্ত্ববিদগণ—অনেকগুলি নাগার্জ্জুন প্রতিপন্ন করিয়াছেন। এক্ষণে আমরা জিজ্ঞাসা করি, যদি নাগার্জ্জুনকে সুশ্রুতের সংস্কারকর্ত্তা বলিয়াই ধরিয়া লওয়া যায়—তবে তিনি কোন্ নাগার্জ্জুন? বৃন্দ; চক্রপাণি প্রভৃতি উত্তর কালীন তন্ত্রকারগণ এক নাগার্জ্জুনকে 'আচার্য্য' "রসায়নবেত্তা" "মুনীন্দ্র" ইত্যাদি সম্মানে সম্মানিত করিয়াছেন। নাগার্জ্জুন বহুশাস্ত্রের প্রণেতা। কিন্তু রসায়নবেত্তা নাগার্জ্জুন আর বৌদ্ধ দার্শনিক নাগার্জ্জুন কি একই ব্যক্তি? আমরা "যোগসার" নামক একখানি গ্রন্থ পড়িয়া দেখিয়াছি, উহা নাগার্জ্জুন নামধেয় জনৈক আচার্য্যের লেখনী প্রসূত। এই গ্রন্থে মাধবকর, 'চক্রপাণি' বঙ্গসেন প্রভৃতি নব্য পণ্ডিতগণের নামের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ইনি আবার কোন নাগার্জ্জুন? নাগার্জ্জুন—যিনি রসায়নবেত্তা বলিয়া বিখ্যাত —তিনি ত বাগভটের ও পূরোবর্ত্তী।

সুশ্রুতে অনেক পাঠ পরিবর্ত্তন দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং সুশ্রুতের ভিতর যুগ যুগান্তর ধরিয়া, বহু ব্যতিক্রম ঘটিয়া গিয়াছে। উহাতে অনেক অনবধান ও ভ্রম থাকিয়া গিয়াছে। সুতরাং কোনও অর্ব্বাচীন নামের উল্লেখ মাত্র দেখিয়া প্রাচীন সংহিতার বিচার করা সমীচীন নহে।

সুশ্রুতের গুরু ভগবান ধন্বন্তরি। এই জন্য —সুশ্রুত সংহিতাকে ধন্বন্তরি সম্প্রদায়ের গ্রন্থ বলিয়া অনেকেই প্রচার করিয়াছেন। ইঁহাদের মতে—"চরক সংহিতা" আত্রেয় সম্প্রদায়ের গ্রন্থ। কিন্তু পৌরাণিক প্রমাণে আমরা দেখিতে পাই—

"তস্য গেহে সমুৎপন্নো দেব ধন্বন্তরি স্তদা।
কাশীরাজো মহারাজঃ সর্ব্বরোগ প্রণাশনঃ॥
আয়ুর্ব্বেদং ভরদ্বাজাৎ প্রাপ্যেহ স ভিষগ্‌ক্রিয়াং।
তমষ্টধা পুনর্ব্বস্য শিষ্যেভ্যঃ প্রত্যপাদয়ৎ॥"

অর্থাৎ কাশীরাজ ধন্বের গৃহে ভগবান ধন্বন্তরি পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি ভরদ্বাজের নিকট আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করেন এবং সেই আয়ুর্ব্বেদকে আটভাগে বিভক্ত করিয়া শিষ্যগণকে শিক্ষা দেন।

এই পৌরাণিক কথায় বিশ্বাস করিতে হইলে,—আত্রেয় সম্প্রদায় ও ধন্বন্তরি সম্প্রদায়

এক হইয়া যায়। মৎপ্রণীত "আয়ুর্ব্বেদের ইতিহাসে" আমি এ সকল কথার বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি। এইবার সুশ্রুতের মধ্যে যে বৈদিক অনুসাসন আছে, তাহারই দিঙমাত্র নির্দ্দেশ করিব।

সুশ্রুতের প্রথমেই আয়ুর্ব্বেদের গুরু পরম্পরা ধন্বন্তরি কর্তৃক এইরূপে কথিত হইয়াছে,—"ব্রহ্মা প্রোবাচ, ততঃ প্রজাপতি রধিজগে, তস্মাদশ্বিনৌ, অশ্বিভামিন্দ্রঃ ইন্দ্রাদহং।" তাহার পর দীক্ষা-বিধির অনুষ্ঠান বৈদিক-বিধানে অনুপ্রাণিত। রোগীর রক্ষাবিধি সুশ্রুত যাহা বলিয়াছেন, তাহাতেও দৈবাচারের পরাকাষ্ঠা দেখিতে পাওয়া যায়। হোম স্বস্তিবাচন কিছুই বাদ পড়ে নাই। সুশ্রুতের আয়ুর্ব্বৈদিক সন্নীতি ব্রাহ্মণ পুজায় ও বেদান্তাদি শাস্ত্রের অনুশীলন উপদেশে পরিপূর্ণ। সুশ্রুত দৈব ব্যাপাশ্রয় চিকিৎসা বিধিকেও উপেক্ষা করেন নাই। মন্ত্র শক্তিকেও অবিশ্বাস করেন নাই। স্মৃতিশাস্ত্রের সকল বিধান সুশ্রুত অবনত শিরে গ্রহণ করিয়াছেন। কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্মফলকে প্রাধান্য দিয়াছেন। পূর্ব্ব জন্ম, পর জন্ম মানিয়া লইয়াছেন। যাগযজ্ঞের শুদ্ধসত্ব স্বীকার করিয়াছেন সর্ব্বোপরি পারমেশ্বরী ইচ্ছাকেও প্রশ্রয় দিয়াছেন। যে গ্রন্থ এত মন্ত্র বহুল, যে গ্রন্থ এত ধর্ম্মভাবে পূর্ণ, যে গ্রন্থ এত যাগ, যজ্ঞ, ব্রত, প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী, সে গ্রন্থ কি নীরীশ্বর বৌদ্ধ মতাবলম্বী নাগার্জ্জুন কর্তৃক প্রতিসংস্কৃত হইতে পারে? যদি ইহা হইত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই বৌদ্ধ নাগার্জ্জুন সুশ্রুত হইতে বৈদিক প্রভাব একেবারেই দূর করিয়া দিতেন। সুশ্রুতের কোথাও না কোথাও বৌদ্ধমত লিপিবদ্ধ করিতেন। আয়ুর্ব্বেদের অপৌরুষেয়ত্ব অস্বীকার করিতেন। আমরা জানি, বৌদ্ধযুগে আয়ুর্ব্বেদ যথেষ্ট উন্নত হইয়াছিল, বৌদ্ধ নৃপতিগণ—জীবের কল্যাণ-কামনায় আয়ুর্ব্বেদের চর্চ্চা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অসীম অনুগ্রহের ফলে এ দেশে "আয়ুর্ব্বেদ কলেজ' পশুমানবের জন্য রুগ্নাবাস বা আতুরাশ্রম (হাসপাতাল) স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু বৌদ্ধগণ যে আয়ুর্ব্বেদের বৈদিকাচার অক্ষুণ্ণ রাখিবেন, ইহা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না।

মহর্ষি সুশ্রুতকে উদ্দেশ করিয়া—একজন প্রসিদ্ধ অধ্যাপক বলিয়াছেন—"হে ঋষি! শুনিয়াছি তুমি সার্দ্ধ দ্বিসহস্র বৎসর পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলে। কিন্তু তুমি এ মর জগতে চিরকালই অমর হইয়া রহিয়াছ—তোমার রচিত সংহিতা চিরকালই তোমায় অমর করিয়া রাখিবে। তুমি যে অসামান্য অস্ত্র চিকিৎসার উপদেশ জগৎকে দিয়া গিয়াছিলে, আমরা ভারতবাসী হইয়াও তাহার সম্যক সমাদর করিতে পারি নাই, তোমার উপদিষ্ট অস্ত্র-শস্ত্র স্বচক্ষে কখন দেখিতেও পাইলাম না। আশীর্ব্বাদ কর—ভারতের অতীত গৌরবের, অতীত জ্ঞান, গরিমায়, অতীত স্বাধীন চিন্তার নিদর্শন স্বরূপ তোমার সংহিতার গৌরব করিবার অধিকার যেন আমরা কখনও বিস্মৃত না হই।"

আয়ুর্ব্বেদের সেই অস্ত্র চিকিৎসায় গৌরব রক্ষা করিবার জন্যই—অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা। সুশ্রুতের স্বর্গীয় আত্মা দেব-নির্ম্মাল্য নিক্ষেপ করিয়া—ইহার উদ্যোগকারিগণের প্রাণগত চেষ্টাকে সফলতায় মণ্ডিত করুন,—ভারতে আবার ঋষি-যুগ ফিরিয়া আসুক,—ভগবচ্চরণে ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

শ্রীব্রজবল্লভ রায় কাব্যতীর্থ।

ম্যালেরিয়ার দেশীয় মহৌষধ।

—:*:—

আমি ডাক্তার। আমার কর্ম্মক্ষেত্র—পল্লীগ্রামে। আমার বাসগ্রামের আসে পাশে অনেকগুলি গ্রাম আছে। সে সকল গ্রামেও আমাকে সর্ব্বদা যাইতে হয়। আমি যে সকল রোগীর চিকিৎসা করিয়া থাকি, তাহার পনেরো আনাই ম্যালেরিয়া। আমার কর্ম্মাভ্যাস অর্থাৎ প্রাক্‌টিস ১৬ বৎসর চলিতেছে। সুতরাং ১৬ বৎসর কাল ম্যালেরিয়ার লীলাভূমিতে বাস করিয়া, অসংখ্য ম্যালেরিয়াগ্রস্ত রোগীর চিকিৎসায় ব্যাপৃত থাকিয়া ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে আমার একটু অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে।

আমাদের বিজ্ঞান বলে—ম্যালেরিয়া দমন করিতে কুইনাইনের মত আর দ্বিতীয় ঔষধ নাই। এই বিশ্বাস আমারও বরাবর ছিল। যেখানেই দেখিয়াছি—"ম্যালেরিয়া" সেখানেই আমি রোগীকে উপদেশ দিয়াছি—"কুইনাইন মেব কেবলং।" কিন্তু এখন আমার মতের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। কেন হইয়াছে? সেই কথাটাই বলিব।

বোধ হয় ৭।৮ মাস পূর্ব্বের কথা। আমার এক আত্মীয়াকে লইয়া তাহারই চিকিৎসার জন্য এক বয়োবৃদ্ধ ডাক্তারের পরামর্শ লইতে গিয়াছিলাম। সেখানে বন্ধুবর ব্রজবল্লভ বাবু এবং বঙ্কিম যুগের লোক দীননাথ ধর বি-এ বি-এল মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে বিশ্রম্ভালাপ চলিতেছিল। সহসা এক ভদ্রলোক ডাক্তার বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ডাক্তার বাবু! আগে ত এ দেশে এত জ্বর হইত না, এখন এমন ঘন ঘন জ্বর হয় কেন?" ডাক্তার বাবু বলিলেন,—"আগে দেশের জলবায়ু ভাল ছিল, তাই জ্বর হইত না, এখন জল বায়ু খারাপ হইয়াছে, দেশে ম্যালেরিয়া প্রবেশ করিয়াছে, তাই এত জ্বর হইতেছে।" ডাক্তার বাবুর কথায় বৃদ্ধ সুরসিক দীন বাবু একটু হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন—"তা' নয় ডাক্তার, আগে জ্বরের নাম ছিল "জ্বর" এখন তোমরা জ্বরের নাম দিয়াছ "ফিবার"—কাজেই সে হয়ও ফি—বার।" দীনবাবুর কথায় সকলেই হাসিয়া উঠিলেন। ডাক্তারের পরামর্শ লইয়া আত্মীয়ার সঙ্গে আমি আমার বাস-গ্রামে ফিরিয়া আসিলাম। ডাক্তারের প্রেস্‌ক্রপসনে নূতন কিছুই ছিলনা, আমি যাহা যাহা ব্যবস্থা করিয়াছিলাম, অবিকল সে সমস্ত ঔষধ বজায় রাখিয়া তিনি কেবল কুইনাইনের মাত্রা একটু বাড়াইয়া দিয়াছিলেন।

ঔষধ সেবন চলিতে লাগিল। কিন্তু যে জন্য অপর ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণের প্রয়োজন বুঝিয়াছিলাম, তাহার কিছুই হইল না। আমার আত্মীয়ার অসুখ এমন কিছু বেশী নহে, ২।৪ দিন অন্তর কাঁপিয়া জ্বর হয়। উপবাস দেন, কুইনাইন খান, জ্বর বন্ধ হয়। কিন্তু বেশী দিন বন্ধ থাকেনা। কুইনাইনের টনিক খাইতে খাইতেই আবার জ্বর হয়। জ্বরের এই পুনরাবর্ত্তনের কোন প্রতিকারই হইতে ছিল না। বড় বড় নাম জাদা পেটেণ্ট ঔষধ ব্যবহার করিয়াও জ্বর বেশী দিন বন্ধ থাকিতনা।

ফলে রোগিণী ডাক্তারী ঔষধের উপর বীতশ্রদ্ধ হইতেছিলেন, আমি বাড়ীর ডাক্তার—তাঁহাকে কেবল বুঝাইতেছিলাম—"আপনি ভাবিবেন না, জ্বর নিশ্চয়ই বন্ধ হইবে। এ ম্যালেরিয়া—ইহার একমাত্র ঔষধ—কুইনাইনমেব কেবলং!"

এইভাবে, দুইমাস কাটিয়া গেল। আমি ত সাধ মিটাইয়া কুইনাইন চালাইতে লাগিলাম। শেষে তিনি আর কুইনাইন খাইতে চাহেননা, কি করি? কুইনাইনের ইন্‌জেক্‌সন্ দিতে লাগিলাম। তাহার পরই তিনি আমার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য—পিত্রালয়ে চলিয়া গেলেন। পিত্রালয়—আমার বাস গ্রামের এক ক্রোশ দূরে, সে গ্রাম অতি ভয়ানক গ্রাম, ম্যালেরিয়ায় পরিপূর্ণ, সেখানকার লোক মরিয়া ভূত হয়. তথাপি ম্যালেরিয়া তাহাকে ছাড়ে না! এমন স্থানে তিনি প্রায় একমাস থাকিলেন। যখন ফিরিয়া আসিলেন, আমি আশ্চর্য্য হইলাম—তাঁহার জ্বর বন্ধ হইয়া গিয়াছে। একি স্থান পরিবর্ত্তনের গুণ? অসম্ভব! ম্যালেরিয়াগ্রস্থ স্থানে বাস করিলে কি ম্যালেরিয়া ভাল হয়? তবে কি? আত্মীয়াকে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন—"বাপের বাড়ীতে গিয়া আমি আর এক দিনও কুইনাইন খাই নাই। আমার এক মাসী আছেন, তিনি আমাকে নাটার ডগা বাটিয়া খাইতে বলেন। তাহাতেই আমার জ্বর বন্ধ হইয়াছে। আমি ৫।৭টা নাটার ডগা শিলে বাটিয়া ৩টী বড়ী তৈয়ার করিয়া লই, সেই বড়ী মাঝে মাঝে একটা করিয়া জল দিয়া গিলিয়া খাই। নাটা—জ্বরে বড় উপকারী" একজন পাশ করা উপাধিধারী ডাক্তারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া একজন অশিক্ষিতা স্ত্রীলোক বলিতেছে কিনা—নাটা জ্বরে বড় উপকারী। হা—ভাগ্য! ইহাও আমাকে শুনিতে হইল? যে জ্বর কুইনাইনে বন্ধ হয় নাই—সে জ্বর নাটায় বন্ধ হইল? ইহা কি বিশ্বাসযোগ্য কথা? আমার মুখে হাসি আসিল। আমি আত্মীয়াকে বলিলাম—বোধ হয় নাটার কাঁটার ভয়ে জ্বর আপনার দেহে প্রবেশ করিতে সাহস করে নাই! আমার কথায় তিনিও একটু হাসিলেন। আমি কিন্তু নাটার কথা মনে করিয়া রাখিলাম।

এই মহাযুদ্ধে সকল দ্রব্যই মহার্ঘ হইয়াছে। ডাক্তারী ঔষধের দাম চতুর্গুণ চড়িয়াছে,অনেক ঔষধ দুষ্প্রাপ্যও হইয়াছে। আমি পাড়াগেঁয়ে ডাক্তার, বিশেষতঃ গরীব-দুঃখী ও মধ্যবিত্ত লোক লইয়াই আমার কাজকর্ম্ম, ঔষধের মূল্য-বৃদ্ধি হওয়ায় আমি বড় বিব্রত হইলাম। অসুখ হইলেও লোকে হঠাৎ দেখাইতে চাহে না, কেননা ভিজিটের টাকা যোগাইবে কেমন করিয়া? ইহার উপর ঘরে ঘরে হোমিও-প্যাথীর বার্ণিস করা বাক্স, নিতান্ত দরিদ্রগণ বিনামূল্যে হোমিওপ্যাথী ঔষধ সেবন করিতে লাগিল। বিনা চিকিৎসায় যাহাদের রোগ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, কেবল তাহারই ডাক্তার ডাকিল। কিন্তু ইহাও প্রাণের দায়ে! কেননা দুই এক শিশি ঔষধ খাওয়াইয়াই তাহারা চিকিৎসা বন্ধ করিয়া দিল। ঔষধের দাম আর যোগাইতে পারিল না। ২০ গ্রেণ কুইনাইন না খাইলে যাহার জ্বর বন্ধ হয় না, সে দশ গ্রেণ কুইনাইন খাইয়াই নিরস্ত হইল।

এইবার আমারও মতি ফিরিল। আমি ভাবিতে লাগিলাম—যখন এ দেশে কুইনাইন আবিষ্কৃত হয় নাই, তখন কি এদেশের লোকের জ্বর ভাল হইত না? কুইনাইনের মত

জ্বর বন্ধ করিতে পারে, এমন ঔষধ কি রত্নগর্ভা ষড়ৈশ্বর্য্যময়ী ভারতভূমিতে দুর্লভ? যে দেশে "চরক" "সুশ্রুত" "বাগভট" "হারীতের" গবেষণাময়ী সংহিতা এখনও অতীতের গৌরব ঘোষণা করিতেছে, যে দেশে জ্বরঘ্ন বর্গের মধ্যে—নিম, নিসিন্দা, সেফালী. গুলঞ্চ, ক্ষেৎপাপড়া, চিরাতা, ছাতিম, আতিষ, কট্‌কী, পল্‌তা প্রভৃতি—তিক্তগণ ঋষি-প্রতিভার অপূর্ব্ব বিশ্লেষণ—জগতকে এখনও দেখাইয়া দিতেছে,—সে দেশ কি চিরদিনই কুইনাইনের উপাসনা করিবে?

সহসা নাটার কথা আমার মনে পড়িয়া গেল। পল্লীগ্রামে পথে-ঘাটে-বনে-জঙ্গলে যথেষ্ট নাটার গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। আমি তাহা সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিলাম। আয়ুর্ব্বেদের কোন্ গ্রন্থে নাটার গুণ বর্ণিত হইয়াছে. কবিরাজ মহাশয়দের নিকট তাহার সন্ধান লইতে লাগিলাম। কিন্তু পরিতাপের বিষয় কোন কবিরাজই আমার আশাপূর্ণ করিতে পারিলেন না। সকলেই মুখে বলেন,——"নাটা জ্বরঘ্ন বটে।" তাহার শাস্ত্রীয় প্রমাণ কেহই দেখাইতে পারিলেন না। অনেকেই বলিলেন—"আমরা নাটার গুণ পরীক্ষা করিয়া দেখি নাই।" হতাশ হইয়া আমি ইংরাজী ভাষায় রচিত মেটিরিয়া মেডিকা অফ ইণ্ডিয়া এবং "ফার্ম্মাকোগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা" নামক গ্রন্থ দ্বয় অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। আমি বিস্মিত হইলাম—কবিরাজ মহাশয়েরা যে নাটার গুণ কেবল পুঁথিগত বিদ্যায় পর্য্যবসিত করিয়া নিশ্চিন্ত, ডিমক ও ক্ষোরি সে নাটার গুণ তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আচার্য্য অক্ষয় চন্দ্র একদিন দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন—"ভারতবাসী ভারত দেখিল না, ভারত বুঝিল না, এত বড় মহাদেশ—তাহার কোথায় কি আছে—তাহার খোঁজ লইল না" তখন আমার সেই আক্ষেপোক্তির চরম সার্থকতা মনে পড়িতে লাগিল।

দরিদ্রের দেশে, দরিদ্রের সমাজে, দরিদ্রের মাঝে বসিয়া আমি নাটার পরীক্ষা আরম্ভ করিলাম। যে রোগীকে কুইনাইন-প্রয়োগের উপযুক্ত দেখিতাম, তাহাকে নাটা খাওয়াইতে লাগিলাম। অল্পদিনের মধ্যেই আমি বুঝিতে পারিলাম—নাটার জ্বর নাশিনী শক্তি অদ্ভুত। নাটার বড়ী—২।৩টী খাইয়াই অনেক রোগীর জ্বর বন্ধ হইতে লাগিল। নাটার আর একটি মহৎ গুণ দেখিলাম—নাটা জ্বরের রিল্যাপ্স বা পুনরাক্রমণ বন্ধ করে। ইহাতে রোগিগণ—অপব্যয়ের হাত এড়াইল, আমার ঔষধের তারিফ করিতে লাগিল। আমারও উপকার হইল—এই মহার্ঘের দুর্দ্দিনে, চড়ার বাজারে, আমি একটী মহৌষধ বিনামূল্যে লাভ করিলাম। নাটা বিনা যত্নে বনে জন্মায়, পয়সা দিয়া কিনিতে হয় না, কেবল একটু পরিশ্রম করিয়া লইয়া আসা এবং তাহা চূর্ণ করিয়া শিশিতে পুরিয়া রাখা। নাটার প্রসাদে আমিও খরচার দায় হইতে মুক্তি পাইলাম।

প্রথমে আমি নাটার ডগা বাটীয়া বটী প্রস্তুত করিতাম, তাহার পর—মূলের ছাল চূর্ণ করিয়া ব্যবহার করিতাম। কিন্তু ইহা বড় অধিক মাত্রায় দিতে হইত, নইলে জ্বর আটকাইত না। রোগীকে অনেকবারও খাইতে হইত। শেষে বীজের চূর্ণ ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিলাম। দেখিলাম নাটার গুণ ও বীর্য্য তাহার বীজেই অধিক পরিমাণে নিহিত আছে। নাটা বীজের চূর্ণ ১০ গ্রেণ ওজনে একবার মাত্র সেবন করিলে,—সে দিন

জ্বরের বেগ অতি মন্দ হইয়া যায়, পরদিন আর একবার খাইলে জ্বর আর আসে না। তৃতীয় দিন আর নাটা সেবনের আবশ্যকতা নাই।

আমি যে প্রণালীতে নাটা ব্যবহার করিতেছি, পাঠকগণের অবগতির জন্য নিম্নে তাহা লিখিতেছি।

নাটার ফল ঠিক কণ্টকময় বস্ত্ররঞ্জক লটকান ফলের মত। এই ফলের মধ্যে ১টী বা ২টী কথন বা ৩টী পর্য্যন্ত বীজ থাকে। বীজের উপরের আবরণ বড় কঠিন। বীজ গুলি দেখিতে ঠিক কড়ীর মত। উপরের আবরণ মোচন করিলে—ভিতরে শ্বেতবর্ণের শস্য বা শাঁস দেখিতে পাওয়া যায়। এই শাঁস কিঞ্চিৎ তৈলাক্ত। শাঁসগুলি রৌদ্রে দিলে বেশ খটখটে হইয়া যায়, তখন তাহাকে হামান দিস্তায় গুঁড়া করিয়া সূক্ষ্ম বস্ত্রে ছাকিয়া লইতে হয়। এই চূর্ণ ৩ ভাগ, পিঁপুল চূর্ণ ১ ভাগ, একত্র মিশাইয়া জল দিয়া মাড়িয়া বড়ী করিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া রাখিলে অনেক দিন পর্য্যন্ত অবিকৃত থাকে। কিন্তু সেরূপ কঠিন বটীকা সেবনকালীন আবার জল দিয়া মাড়িতে হয়। সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধা মধু দিয়া মাড়িয়া বড়ী পাকানো। এই বড়ী জল দিয়া গিলিয়া খাইলেই নাটার উপকারিতা দেখিতে পাওয়া যায়।

যে জ্বর কম্প দিয়া আসে, মাথার যন্ত্রণা, পিপাসা, হাত-পা কামড়ানি প্রভৃতি উপসর্গ যে জ্বরে থাকে, অথচ জ্বরের উত্তাপ খুব বেশী হয়, —এইরূপ জ্বরে—বিরাম কালে অথবা জ্বর কমিবার মুখে নাটা ব্যবহার করিতে হইবে। নাটা সেবনের পূর্ব্বে—রোগীকে একটু গরম দুগ্ধ পান করান উচিত, খালি পেটে নাটা সেবনে গা বমি বমি করে। নাটা শিশু-বৃদ্ধ—সকলকেই খাওয়ান চলে। এমন কি উদরাময়, মূর্চ্ছা, গর্ভাবস্থা—সকল অবস্থাতেই নাটা ব্যবহার করা যায়। ইহাতে কোনও বিপদের ভয় নাই। ঘুষঘুষে পিত্ত প্রধান পুরাতন জ্বরেও নাটা অত্যন্ত উপকারী। আমি প্রায় ৪ মাস কাল অনেক রোগীর দেহে নাটা প্রয়োগ করিতেছি, সর্ব্বত্রই নাটা ব্যবহারে উপকার পাইয়াছি। আমি নাটার নিম্নলিখিত গুণাবলীর পরিচয় পাইয়াছি।

১। নাটা—অত্যন্ত জ্বরঘ্ন। একমাত্রা সেবনেই উপকার জানিতে পারা যায়। সদ্যঃই জ্বর বন্ধ করে।

২। নাটা সকলকেই খাওয়ান চলে। উদরাময়, গর্ভাবস্থাতে, নিষিদ্ধ নহে।

৩। নাটা সেবনে জ্বর বন্ধ হইলে প্রায়ই রিলাপ্স হয় না।

৪। নাটা সেবন করিলে মাথা ঘোরা, কান ভোঁ ভোঁ করা - কোন উপসর্গই হয় না।

৫। নাটা ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে—রোগীকে একবার জোলাপ দিতে পারিলে ভাল হয়।

৬। নাটা—নূতন—পুরাতন উভয়বিধ জ্বরেই ব্যবহার্য্য!

৭। নাটার বীজে একটা বুনো গন্ধ আছে, এই গন্ধ নিবারণের জন্য আমি ২।১ ফোঁটা মৌরী বা দারুচিনির তৈল নাটার সহিত ব্যবহার করি।

৮। নাটার আস্বাদ তিক্ত—কিন্তু কুইনাইনের মত বিকট নহে।

৯। নাটা—প্লীহা ও যকৃতের বিকৃতি দূর করে, বিবৃদ্ধির হ্রাস করে। শরীরে নূতন রক্ত কণিকায় উদ্ভব করিয়া থাকে।

১০। নাটা—ঘর্ম্ম ও মূত্রের প্রবর্ত্তক। কোষ্ঠগত বায়ু নাশক।

কুইনাইন ভিন্ন ম্যালেরিয়ার ঔষধ নাই—এ ভ্রান্ত ধারণা অনেকেরই আছে। আমার বিশ্বাস—সে শক্তি নাটারই আছে। যাঁহারা ম্যালেরিয়ার হস্ত হইতে পরিত্রাণের জন্য রোগীকে ক্রমাগত কুইনাইন খাওয়ান, তাঁহাদিগকে আমি ডাক্তার রসের উক্তি পাঠ করিতে বলি।

ইণ্ডিয়ান মেডিকেল সার্বিসের খাস গোরা ডাক্তার মেজর রস্ বলিয়াছেন,—"ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধক বলিয়া অনেকে কুইনাইন ব্যবহার করে; কিন্তু তাহাতে উল্টা ফল হয়। কুইনাইন খাইলে ম্যালেরিয়া দিন কতক দমনে থাকে বটে, কিন্তু একেবারে যায় না। ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির মত উহা মানুষের শরীর-যন্ত্রে অবস্থান করিতে থাকে।"

ইহার পরও কি আপনারা বলিতে চাহেন—কুইনাইনে ম্যালেরিয়া নষ্ট হয়? আমি স্বয়ং একজন কুইনাইনের গোঁড়া ভক্ত ছিলাম। অনেক রোগীর দেহেই আমি কুইনাইনের ক্রিয়া প্রত্যক্ষ করিয়াছি! পরে আমার মত্ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। নাটার জ্বরনাশিনী শক্তি দেখিয়া আমি বিস্ময়ে মুগ্ধ হইয়াছি। সেকালের বৃদ্ধদের মুখে শুনিয়াছি—পূর্ব্বে কবিরাজী ঔষধ খাইয়া যাহাদের জ্বর ভাল হইত, ১০।১৫ বৎসরের মধ্যে আর তাহাদের জ্বর হইতে দেখা যাইত না। এখনকার কবিরাজেরা সেরূপ ঔষধ প্রয়োগ করেননা কেন? আগেকার কবিরাজেরা যে নাটার যথেষ্ট ব্যবহার করিতেন, নিম্নলিখিত ছড়াটিতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। "সংবাদ প্রভাকরের" পুরাতন ফাইলে আমি এই পদ্যটী দেখিতে পাইয়াছি। যথা,—

"চিরাতা, নাটার ডগা, পল্‌তা, ধনিয়া।
ক্ষেৎপাঁপড়া, নিমছাল, গুলঞ্চ আনিয়া।
প্রত্যেক জিনিষ ল'বে ভরি পরিমাণে।
তিন সের জলে সিদ্ধ—বিহিত বিধানে।
ছটাকার্দ্ধ মাত্রা—দিনে দুইবার খা'বে।
যেরূপ হউক জ্বর অবশ্যই যাবে॥"

এমন সহজ লভ্য ঔষধটীও লোকে পরীক্ষা করিয়া দেখেন না, ইহাই গভীর পরিতাপের বিষয়।

নাটা সম্বন্ধে আমি আমার পরীক্ষালব্ধ ফলই প্রকাশ করিলাম। আশা করি এ দেশের চিকিৎসকগণ—কুইনাইনের পরিবর্ত্তে এই বিনামূল্যে প্রাপ্ত সামান্য উদ্ভিদের একটু আদর করিবেন। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে নাটার কিরূপ গুণ লিখিত হইয়াছে, আমি তাহা অবগত নহি। আমার অনুরোধ—কোনও কবিরাজ মহাশয় নাটার গুণ সাধারণের গোচরীভূত করুন। ইহাতে দেশের অনেক উপকার হইবে, দরিদ্র রোগিগণও বাঁচিয়া যাইবে। এই দুঃসময়ে আমাদের দেশীয় ঔষধ গুলির গুণাগুণ পরীক্ষিত হওয়া উচিত। কত বিদেশী আসিয়া আমাদের দেশের উদ্ভিদের গুণ পরীক্ষা করিয়া তাঁহাদের মতামত সাধারণের উপকারার্থে প্রচার করিয়া গিয়াছেন, আর আমরা এমনি অলস ও কর্ত্তব্য বিমুখ যে, নিজের হাতের নিধি হেলায় হারাইতে বসিয়াছি! এজন্য আমাদের লজ্জা কি অনুতাপও হয় না। আমাদের শিক্ষা-দীক্ষা কি চিরদিনই এইরূপে জগতের মাঝে ধিক্কৃত হইবে? আমরা কি আপনার জিনিষ কখনও চিনিবার চেষ্টা করিব না!

আমি অনেকগুলি দেশীয় উদ্ভিদের ক্রিয়া-শক্তি পরীক্ষা করিয়াছি। সুযোগ ও সুবিধা পাইলে একে একে তাহা প্রকাশ করিব।*

ডাক্তার শ্রীক্ষেত্রমোহন চট্টোপাধ্যায়
L. M. S.

অতিসার রোগ।

(২)

অতিসারে প্রচুর পরিমাণে মলস্রাব হইতে থাকিলে প্রথমে পাচক ঔষধ প্রয়োগ করিয়া চিকিৎসা করিতে হয়। শূল ও আধ্মান থাকিলে বিশেষতঃ আমাশয়ে দোষ সঞ্চার অনুভূত হইলে পিঁপুল চূর্ণ ও সৈন্ধব লবণ মিশ্রিত জল প্রয়োগ করিয়া বমন করান উচিত। বমনের পর লঙ্ঘন এবং লঙ্ঘনের পর পেয়া পথ্য দেওয়া কর্ত্তব্য।

উদরে যন্ত্রণা থাকিলে স্বেদ দেওয়া কর্ত্তব্য। গরম জল পূর্ণ বোতল, বস্ত্রখণ্ড বা হস্ত উত্তপ্ত করিয়া স্বেদ দেওয়া যাইতে পারে।

অতিসারে জল প্রয়োগ;—অতিসার রোগে পিপাসা থাকিলে কলা ও শুঁঠের সহিত অথবা মুতা ও ক্ষেৎ পাঁপড়ার সহিত কিম্বা মুতা ও কলার সহিত জল সিদ্ধ করিয়া প্রয়োগ করিবে। সমভাগে মোট দুই তোলা দ্রব্য লইয়া থেঁতো করিয়া চারি সের জলের সহিত সিদ্ধ করিবে। দুই তোলা অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইয়া সেই জল পানার্থ প্রয়োগ করিবে। ধনে এবং কলার সহিতও এইরূপ নিয়মে জল সিদ্ধ করিয়া প্রয়োগ করা যাইতে পারে। এইরূপে সিদ্ধ জল প্রয়োগ করিলে তৃষ্ণা ও অতিসার প্রশমিত হইয়া থাকে।

অতিসারে ঔষধ সিদ্ধ পেয়া;—আয়ুর্ব্বেদে ভিন্ন ভিন্ন রোগে ঔষধ সহ পেয়াদি সিদ্ধ করিয়া প্রয়োগ করিবার বিধি আছে। ঐ সকল ঔষধ সিদ্ধ পেয়া পরম হিতকর এবং একমাত্র আর্য্য চিকিৎসাশাস্ত্রেই উহাদিগের প্রয়োগ দেখা যায়। নিতান্ত দুঃখের বিষয় যে, এক্ষণে এইরূপ পথ্য-প্রয়োগ একরূপ লোপ পাইয়াছে। আধুনিক বিলাসিতার যুগে ঐ সকল পরম হিতকর পথ্যের পুনঃ প্রচলন হওয়া সম্ভব পর বলিয়া মনে হয় না। তথাপি পাঠকগণের অবগতির জন্য এবং যদি কেহ এইরূপ পথ্য সেবন করিতে ইচ্ছা করেন বলিয়া ঐরূপ কতকগুলি পথ্যের বিষয় লিখিত হইতেছে।

এইরূপ পথ্য প্রস্তুত করিতে হইলে প্রথমে ক্বাথ করিয়া লইতে হয়। বীর্য্যভেদে ঔষধ দ্রব্য তিন প্রকার। তীক্ষ্ণবীর্য্য—যেমন পিঁপুল,

* অমাবস্যা পূর্ণিমা বা একাদশীর সময় যাঁহাদের জ্বর হয়, তাঁহারা ঐ সময়ের ২।১ দিন পূর্ব্ব হইতে নাটা ব্যবহার করিলে তাঁহাদের আর জ্বর হইবে না। ইহাও আমি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি।—লেখক।

মরিচ প্রভৃতি। মধ্যবীর্য্য যেমন বেলছাল, গনিয়ারী ছাল, শোণা ছাল প্রভৃতি। মৃদুবীর্য্য—যেমন আমলকী, কিসমিস প্রভৃতি। পূর্ব্বে তীক্ষ্ণবীর্য্য দ্রব্য দুইতোলা, মধ্যবীর্য্য দ্রব্য চারি তোলা এবং মৃদুবীর্য্য দ্রব্য আটতোলা লইবার বিধি ছিল। কিন্তু এক্ষণে অল্পপ্রাণ মানব গণের এরূপ মাত্রা সহ্য হয় না। পূর্ব্বে এইরূপ মাত্রাও আবার কল্কসাধ্য যবাগূ সম্বন্ধে অর্থাৎ ঔষধ বাটার সহিত পাক করিয়া পেয়াদি প্রস্তুত করার রীতি ছিল। ক্কাথ সাধ্য যবাগূর অর্থাৎ ঔষধের ক্কাথ করিয়া সেই ক্কাথের সহিত যে পেয়াদি পাক করা হয়, তাহার মাত্রা আরও অধিক। কিন্তু এক্ষণে পূর্ব্বে যে কল্ক সাধ্য যবাগূর ঔষধের মাত্রা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাই বা তদপেক্ষা কম মাত্রায় ক্কাথ সাধ্য যবাগূ প্রস্তুতের জন্য ব্যবহার করা উচিত। কল্ক সাধ্য যবাগূর জন্য উহার সিকি মাত্রায় দ্রব্য লওয়া সঙ্গত।

পূর্ব্বোক্ত নিয়মে ঔষধ দ্রব্য দুইতোলা, চারি তোলা বা আট তোলা লইয়া চারি সের জলে সিদ্ধ করিয়া দুই সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া লইবে। পরে যে দ্রব্যের যবাগূ প্রস্তুত করিতে হইবে, মণ্ড করিতে হইলে তাহার চতুর্দ্দশ গুণ; পেয়া করিতে হইলে ছয় গুণ এবং বিলেপন করিতে হইলে চার গুণ উক্ত ক্কাথ জলের সহিত পাক করিয়া লইতে হয়। মণ্ড খুব তরল (যেমন জল বার্লি) হয়, পেয়া কিঞ্চিৎ সিটাযুক্ত হয় এবং বিলেপী বহু সিটাযুক্ত এবং যৎসামান্য তরল দ্রব্য সমন্বিত হয়।

শালপানি, বেড়েলা, বেলশুঁঠ ও চাকুলের সহিত পেয়া পাক করিয়া দাড়িমের রসের সহিত মিশ্রিত করিয়া পিত্তশ্লেষ্ম জনিত অতিসার রোগে পথ্য দিবে। ধনে ও শুঁঠের সহিত পেয়া পাক করিয়া বাতশ্লেষ্ম বা অতিসার রোগে প্রয়োগ করিবে। বাতপিত্তজ অতিসারে শালপানি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুরের ক্কাথে পেয়া প্রস্তুত করিয়া প্রয়োগ করিবে। কফজনিত অতিসারে পিঁপুল, পিঁপুলমুল, চৈ, চিতামুল ও শুঁঠের ক্কাথ সহ পেয়া প্রস্তুত করিয়া প্রয়োগ করিবে।

এক্ষণে আমাতিসারের কয়েকটি ফলপ্রদ ঔষধের বিষয় কথিত হইতেছে।

ধান্যপঞ্চক—ধনে, শুঁঠ, বালা, মুতা ও বেলশুঁঠ—প্রত্যেক দ্রব্য সম পরিমাণে—মোট দুইতোলা লইয়া আধ সের জলে সিদ্ধ করিয়া, আধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে, এই ক্কাথ পান করিলে আমদোষ, শূলুনি ও মলের বিবদ্ধতা নষ্ট হয় এবং অগ্নিদীপ্তি হয়।

সমস্ত ক্কাথই এইরূপ নিয়মে প্রস্তুত করিতে হয়, অর্থাৎ দ্রব্য যতই হউক সমভাবে মোট দুইতোলা লইতে হইবে।

একটী দ্রব্য হইলে তাহাই দুইতোলা, দুইটী হইলে একতোলা করিয়া দুইতোলা, চারটী হইলে আধতোলা করিয়া দুইতোলা, আটটী হইলে এক সিকি করিয়া মোট দুই তোলা, এইরূপ নিয়মে দ্রব্য লইতে হয়। পরে উক্ত দ্রব্য উত্তমরূপে ধৌত ও কুট্টিত করিয়া আধসের জল সহ মৃদু জ্বালে সিদ্ধ করিতে হয়। আধ পোয়া শেষ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া তাহা গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

ধান্যচতুষ্ক—ধনে, মুতা, বালা ও বেল শুঁঠের ক্কাথ পিত্ত প্রধান অতিসারে হিতকর।

পিপুল, শুঁঠ, ধনে, যমানী ও হরীতকীর ক্কাথ কফজ অতিসারে, বালা, মুতা, বেলশুঁঠ, শুঁঠ ও ধনের ক্কাথ পিত্তজ অতিসারে এবং

চাকুলে, গোক্ষুর, বরাহক্রান্তা ও কণ্টকারী বাতজ অতিসারে হিতকর। এই সকল যোগ অগ্নিদীপক ও আম পাচক।

শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ, আতইচ, হিং,বেড়েলা সচল লবণ ও হরীতকী ইহাদের চূর্ণ উপযুক্ত মাত্রায় উষ্ণ জল সহ সেবন করিলে প্রবল আমাতিসার প্রশমিত হয়। পিঁপুলমূল, পিঁপুল, গজপিঁপুল ও চিতামূল চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া কিম্বা সচল লবণ, বচ, মরিচ, পিঁপুল, শুঁঠ, হিং আতইচ ও হরীতকী চূর্ণ উষ্ণজলের সহিত সেবন করিলে শ্লেষ্মজনিত অতিসারের শান্তি হয়। এই সকল চূর্ণ দুই আনা হইতে এক সিকি মাত্রায় প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

লঙ্ঘন এবং উপরোক্ত ঔষধাদি প্রয়োগ করার পর রোগীকে পূর্ব্ব কথিত ঔষধ সিদ্ধ যবাগূ, বিলেপী, এবং মাংসরস পথ্য দিবে। অতিসারে রোগী ক্ষুধার্ত্ত হইলে লঘু পাক দ্রব্য পথ্য দেওয়া উচিত। কেননা লঘু পথ্য ভোজন দ্বারা অতিসার রোগী শীঘ্রই রুচি, অগ্নি ও বল লাভ করিয়া থাকে।

তক্র চার সের, মরিচ, জীরা ও চিতামূল প্রত্যেকে সমভাগে মোট দুই তোলা কদবেল ও আমরুল শাক প্রত্যেকে চারি তোলা ও কাঁচা মুগের দাল এক ছটাক একত্র পাক করিয়া দুই সের থাকিতে ছাঁকিয়া লইবে। ইহা আহার এবং ঔষধ—উভয়ের কার্য্যই করিয়া থাকে।

শশক, হরিণ, কুক্কুট বটের ও তিতিরের মাংসরস অতিসার রোগীর পক্ষে হিতকর। শিঙ্গি, ছোট মাগুর সর্ব্বপ্রকার ক্ষুদ্র মৎস্য এবং মৌরলা মৎস্য অতিসার রোগে পথ্য দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু প্রথম অবস্থায় পূর্ব্ব কথিতরূপে যূষ মাত্র দেওয়া উচিত।

এইরূপ পথ্য ও ঔষধ প্রয়োগের পর অতিসারের পক্ক অবস্থা ঘটিলে স্তম্ভন অর্থাৎ ধারক ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত।

এক সিকি হইতে অর্দ্ধ তোলা ধলআঁকড়ার মূলের ছাল বাটিয়া ঘোলের সহিত সেবন করিলে অতিসার প্রশমিত হয়। কচিবাবলা পাতা এক সিকি হইতে আধতোলা মাত্রায় চালুনী জলের সহিত বাটিয়া সেবন করিলে অতিসার ভাল হয়। বটের ঝুরি এক সিকি বা আধ তোলা চেলুনী জলের সহিত বাটিয়া কিঞ্চিৎ ঘোলের সহিত সেবন করিলে অতিসার প্রশমিত হয়।

কাঁচড়া দাম, জামপাতা, দাড়িমপাতা, পানিফলের পাতা, বেলশুঁঠ, বালা, পাথরকুচি, মুতা ও শুঁঠ সমভাগে দুই তোলা লইয়া ক্বাথ করিয়া সেবন করিলে প্রবল অতিসারের বেগও রুদ্ধ হয়। কুড়চিছাল, ইন্দ্রযব ও মুতার ক্বাথে চিনি ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে অতিসার ভাল হয়। বেলশুঁঠ ও আমের আটির শাঁসের ক্বাথে চিনি ও মধু মিশাইয়া সেবন করিলে বমি ও অতিসার নষ্ট হয়।

অতিসারে দুগ্ধ প্রয়োগ—অতিসারের প্রথম অবস্থায় দুগ্ধ হিতকর নহে। কিন্তু পক্কাতিসারে এবং পুরাতন অতিসারে দুগ্ধ, অমৃতের ন্যায় হিতকারী। অতিসার রোগে বায়ু ও মল বিবদ্ধতার সহিত অল্পে অল্পে নির্গত হইতে থাকিলে, তৃষ্ণা থাকিলে অথবা রক্ত কি পিত্তের দোষ থাকিলে—দুগ্ধ প্রয়োগ বিশেষ হিতকর। অধিক দিনের অতিসারে যে দোষের শেষ থাকে, তাহা দুগ্ধ পান দ্বারা প্রশমিত হয়। তিন ভাগ জল এবং এক ভাগ দুগ্ধ একত্র

পাক করিয়া দুগ্ধ শেষ থাকিতে নামাইয়া প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

গো দুগ্ধ অপেক্ষা ছাগল দুগ্ধ লঘুপাক এবং ধারক বলিয়া অতিসার রোগে ছাগ দুগ্ধ প্রশস্ত। কিন্তু ছাগদুগ্ধের অভাব ঘটিলে গো দুগ্ধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। কুড়িটী মুতা, ছাগ দুগ্ধ এক পোয়া এবং জল তিন পোয়া একত্র পাক করিয়া দুগ্ধ শেষ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সেবন করিলে অতিসার রোগ প্রশমিত হয়। এইরূপ নিয়মে বেল শুঁঠের সহিত সিদ্ধ করা দুগ্ধও প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অতিসারে ঔষধ ও জল সহ সিদ্ধ দুগ্ধই হিতকর।

অতিসার রোগের অবস্থা ভেদে চিকিৎসা— অতিসার রোগে আমদোষ পরিপাক পাইলেও যে রোগীর মলের বিবদ্ধতা অর্থাৎ আটকে আটকে দাস্ত হওয়া ও পিচ্ছিলতা এবং শূলুনি থাকে, তাহাকে মূলা কি কুলের যূষের সহিত পুঁইশাক, বেতোশাক, ব্রাহ্মীশাক, আমরুল শাক, দধি ও দাড়িম ছাল সিদ্ধ ও স্নেহ সংযুক্ত করিয়া পথ্য দিবে।

অতিসার রোগে মলক্ষয় বশতঃ অত্যন্ত মুখ শোষ হইলে যব, মুগ, মাষকলাই, শালি তণ্ডুল, তিল, কুল, কচি বেল—এই সকল দ্রব্য ধনে, দধি ও দাড়িমের সহিত পাক করিয়া যূষ প্রস্তুত করিবে এবং সেই যূষ, ঘৃত ও তৈলে সাঁতলাইয়া পথ্য দিবে। কিম্বা কচ্ছপের মাংস রস—ঘৃত ও দধি সংযুক্ত করিয়া প্রয়োগ করিবে।

গুদভ্রংশ (হারিশ মলদ্বার বাহির হওয়া)— অত্যন্ত বেগ দিয়া মল ত্যাগ করিবার কালে অনেক সময় মলদ্বার নির্গত হইয়া পড়ে। সাধারণ গুদভ্রংশ রোগে মলদ্বারে শূকরের চর্ব্বি মাখাইয়া ভিতরে প্রবেশ করাইয়া দিতে হয় এবং গো ফণা নামক বন্ধন দ্বারা মলদ্বারের বহির্নির্গমন পথ রুদ্ধ করিয়া মূষিক মাংসের সেক দিতে হয়। কিন্তু অতিসার প্রশমিত হইবার পর উপরোক্ত চিকিৎসা অবলম্বন করা উচিত।

এইরূপ ক্ষেত্রে শাস্ত্রে অম্ল দ্রব্য সহ সিদ্ধ ঘৃত পান এবং অনুবাসন (স্নেহ বস্তি Enema) প্রয়োগের ব্যবস্থা আছে। আমরুল শাক, কুল, দধি, কাঁজি, শুঁঠ ও যবক্ষার সহ সিদ্ধ ঘৃত পান করিতে হয়। মলদ্বারে স্নেহ প্রয়োগ (চর্ব্বি মালিষ) ও স্বেদ দিয়া মল দ্বার স্নিগ্ধ ও মৃদু হইলে তুলা দ্বারা ধরিয়া ভিতরে প্রবেশ করাইয়া দিবে।

মল দ্বারের পাক—মলদ্বার পাকিয়া উঠিলে পটোলপত্র ও যষ্টিমধুর কাথ, অথবা বট, অশ্বত্থ, যজ্ঞডুমুর, পাকুড়, বেতস ইহাদের কাথে শর্করা ও মধুমিশ্রিত করিয়া অথবা ইক্ষুরস, ঘৃত, ছাগ দুগ্ধ বা গো দুগ্ধ মধু ও চিনি মিশ্রিত করিয়া সেবন করিবে। কিম্বা পূর্ব্বোক্ত বটাদির ছাল বাটিয়া ঘৃত সহ মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিবে বা উহাদের চূর্ণ মলদ্বারে সংলগ্ন করিবে। ইহাতে ধাইফুল ও লোধ চূর্ণও যোগ করা যাইতে পারে। ইহাতে রক্ত নির্গত হইলে ঘৃত বা শত ধৌত ঘৃত মালিষ করিয়া মলদ্বার ও কুঁচকিতে পূর্ব্বোক্ত শীতল কাথ সেচন করিবে।

রক্তাতিসার—পিত্তজঅতিসারে—পিত্ত বর্দ্ধক অনুপান সেবন করিলে পিত্ত অত্যন্ত প্রবল হইয়া রক্তকে দূষিত করে এবং দারুণ রক্তাতিসার তৃষ্ণা, শূল, দাহ ও মলদ্বারের পাক হয়। রক্তাতিসার হইলে—পায়রার মাংসের যূষ ঘৃতে সাঁতলাইয়া এবং চিনি মিশ্রিত করিয়া

পথ্য দিবে। কিম্বা হরিণ বা ছাগের রক্ত ঘৃতে সাঁতলাইয়া আহার করিতে দিবে। শশক প্রভৃতি শীতবীর্য্য বনচর পশু-পক্ষীর মাংস-রসও প্রয়োগ করা যাইতে পারে। ইন্দ্রযবের সহিত সিদ্ধ পেয়া এই রোগে বিশেষ হিতকর।

রক্তাতিসারে অন্ত্র মধ্যে ক্ষত হইয়া থাকে। সুতরাং এই অবস্থায় কঠিন খাদ্য না দিয়া তরল খাদ্য (পেয়াদি) প্রয়োগ করা উচিত। এই অবস্থায় পেয়া, মাংসরস, ছাগ দুগ্ধ, ছানার জল প্রভৃতি সুপথ্য।

আম, জাম ও আমলকী পাতার রস ছাগ দুগ্ধ ও মধু সহ সেবন করিলে রক্তরোধ হয়, বাবলা, কুল, জাম, আম ও অর্জ্জুন—ইহাদের কোন একটি গাছের ছাল—আধ তোলা বা এক তোলা বাটিয়া ছাগদুগ্ধ ও মধুসহ সেবন করিলে রক্তাতিসার ভাল হয়। কাঁটানটের মূল এক সিকি হইতে অর্দ্ধ তোলা মাত্রায় কিঞ্চিত চেলুনী জলের সহিত বাটিয়া এবং মধু ও চিনি মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে রক্তাতিসার প্রশমিত হয়। কৃষ্ণ তিল এক তোলা এবং চিনি এক তোলা বাটিয়া ছাগ দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে সত্বর রক্তস্রাব বন্ধ হয়।

কুড়চি ছাল, আতইচ বেলশুঁঠ, বালা ও মূতার কাথ—আম ও বেদনা যুক্ত রক্তাতিসার প্রশমিত করে। কুড়চি ছাল এবং দাড়িম বৃক্ষের ছালের কাথ—মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে প্রবল রক্তাতিসার প্রশমিত হয়। কুড়চি ছাল আট তোলা, একসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে এবং দাড়িমের কচি ফল আট তোলা বাটিয়া ঐরূপ নিয়মে কাথ করিয়া লইবে। অনন্তর এই দুই প্রকারে কাথ একত্র করিয়া পাক করিবে এবং একটু ঘন হইলে নামাইয়া লইবে। এই ঔষধ একসিকি হইতে আধ তোলা মাত্রায় তক্রের সহিত সেবন করিলে মৃতপ্রায় রক্তাতিসার রোগীও আরোগ্য লাভ করে।

পুট পাক প্রয়োগ—অধিকদিনের অতিসার রোগে মলের আমাবস্থা দূর হইয়া যদি অগ্নির দীপ্তি হয় এবং বেদনা না থাকে, অথচ নানা বর্ণে মল নিঃসৃত হয়—তাহা হইলে পুট পাক প্রয়োগ করিয়া চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য।

স্নিগ্ধ, ঘন, অথচ কীটাদি কর্ত্তৃক ভক্ষিত নহে—এরূপ কুড়চিছাল লইয়া থেঁতো করিয়া জাম পাতার ঠোঙ্গায় স্থাপিত করিয়া তাহাতে চেলুনীর জল সিঞ্চন করিবে। পরে উক্ত ঠোঙ্গা কুশের দ্বারা জড়াইয়া বহির্ভাগ দুই অঙ্গুলি পুরু করিয়া কর্দ্দম দ্বারা লেপ দিবে। অনন্তর ঘুঁটের আগুনের রাখিয়া পোড়াইবে। পরে মৃত্তিকা রক্তবর্ণ হইলে উহা বাহির করিয়া অভ্যন্তরস্থ কুড়চিছালের রস এক তোলা হইতে দুইতোলা মাত্রায় মধুসহ সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার অতিসার—বিশেষতঃ রক্তা-তিসার প্রশমিত হইয়া থাকে। ইহাকে কুটজ পুটপাক বলে।

কুটজ পুটপাকের ন্যায় শোণা ছালের পুট পাক প্রস্তত করিলে তাহাকে শোণাক পুটপাক বলা যায়। প্রভেদ এই যে, শোণা ছাল কুটিয়া গাম্ভীর পাতার ঠোঙ্গায় রাখিয়া কুশ দ্বারা জড়াইয়া লেপ দিয়া পোড়াইতে হয়। ইহাও অতিসারের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

অতিসারে যে সকল যোগ-সুলভ এবং সহজ প্রাপ্য—সেই সকলের বিষয় কথিত হইল। এতদ্ব্যতীত শাস্ত্রে বহুবিধ যোগের বিষয় লিখিত আছে। অতিসারের অবস্থাভেদে নানা প্রকার বস্তি-প্রয়োগের ব্যবস্থা আছে। ঔষধ সহ সিদ্ধ

নানাপ্রকার ঘৃতও অতিসারের অবস্থাভেদে প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

পুরাতন অতিসারে পথ্য—অতিসার রোগ পুরাতন হইলে এবং অগ্নির দীপ্তি হইলে অন্ন পথ্য দেওয়া যাইতে পারে। পুরাতন দাদখানি চাউলের সুসিদ্ধ অন্ন এবং কচি কাঁচ কলা ও পূর্ব্ব কথিত মৎস্যের ঝোল সুপথ্য। মাংস-সাত্ম্য রোগীকে পূর্ব্বোক্ত মাংসের যূষ পথ্য দেওয়া পারে। তদ্ব্যতীত ছাগদুগ্ধ ও গোদুগ্ধ কথিত নিয়মে সিদ্ধ করিয়া এবং অবস্থাভেদে দধি, তক্র ও সদ্যোজাত মাখন দেওয়া যায়। কচি বেলপোড়া, দাড়িম, পাকা গাব জল খাবার দেওয়া যাইতে পারে। ক্ষুধা বুঝিয়া এক বেলা অন্ন ও একবেলা পেয়াদি পথ্য দেওয়া উচিত। রোগ সম্পূর্ণ প্রশমিত না হওয়া পর্য্যন্ত এইরূপ নিয়মে পথ্য দিতে হয়। রোগ প্রশমিত হইলেও অতি সাবধানে পথ্যের মাত্রা বাড়ান উচিত। কেননা সহসা অধিক মাত্রায় আহার করিলে অথবা কুপথ্য আহার করিলে, রোগ পুনরাক্রমণ করিতে পারে। অতিসারে অপথ্য—গোধূম, মাষ কলায় যব, শিম, ওল, সজিনার ফুল বা ডাঁটা, কাঁটাল, কুমড়া, লাউ, কুল, গুরুদ্রব্য, পান, ইক্ষু গুড়, মদ্য, কিসমিস, রশুন, দূষিত জল, নারিকেল, সর্ব্বপ্রকার পত্র শাক, ক্ষার দ্রব্য, লবণ মসলা-যুক্ত ব্যঞ্জন, অম্ল রসযুক্ত দ্রব্য, স্নান, তৈলাদি মর্দ্দন স্নিগ্ধ দ্রব্য, ব্যায়াম ও অগ্নি সন্তাপ অতিসার রোগীর পক্ষে অহিতকর।

প্রবাহিকা—পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, প্রবাহিকা অতিসার রোগের প্রকার ভেদ মাত্র। অহিতকর আহার হেতু বায়ু কুপিত হইয়া সঞ্চিত মল সহ মুহুর্মুহু অধঃপ্রেরণ করিতে থাকে। এই রোগে মল ত্যাগ কালে অতিরিক্ত প্রবাহন (কোঁতান) করিতে হয় বলিয়া ইহাকে প্রবাহিকা বলে।

প্রবাহিকা রোগে বায়ুর প্রকোপ থাকিলে অত্যন্ত শূলুনি, পিত্ত প্রকোপ থাকিলে দাহ এবং কফ প্রকোপ থাকিলে অত্যন্ত কফ নির্গম হয়। আর রক্তের প্রকোপ থাকিলে মলের সহিত কখন বা মল ব্যতীত রক্ত নির্গত হয়। ইহাই সাধারণতঃ রক্তামাশয় নামে খ্যাত। প্রবাহিকা রোগের অন্যান্য লক্ষণ অতিসারের ন্যায় এবং অতিসারের ন্যায় ইহার আম ও পক্ক অবস্থা নির্ণয় করিতে হয়।

অতিসার রোগের প্রথমাবস্থায় যেরূপ হরীতকী ও পিঁপুল বাটিয়া জোলাপ লইবার কথা বলা হইয়াছে, প্রবাহিকা রোগে রক্তভেদ থাকুক আর নাই থাকুক, সেইরূপ নিয়মে জোলাপ লইতে হয়। ইহাতে রোগী কষ্ট পায় না এবং রোগও সত্বর প্রশমিত হইয়া থাকে।

বিরেচনের পর অতিসার রোগের প্রথমে যে সকল তরল পদার্থ পথ্য দিবার কথা বলা হইয়াছে, প্রবাহিকা রোগেও সেই সকল পথ্য প্রয়োগ করিতে হয়।

প্রবাহিকার ঔষধ—কচি বেলপোড়ার শাঁস দুইতোলা, ইক্ষু গুড় এক তোলা, পিঁপুল চূর্ণ এক আনা, শুঁঠ চূর্ণ এক আনা ও কিঞ্চিৎ তিল তৈল একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে প্রবাহিকা রোগ প্রশমিত হয়। ছাগদুগ্ধ আট তোলা এবং মরিচ চূর্ণ দুই আনা বা পিঁপুল চূর্ণ এক সিকি একত্র করিয়া সেবন করিলে মল-বিবদ্ধতা যুক্ত প্রবাহিকা রোগ প্রশমিত হয়। কচি বেলপোড়ার শাঁস এক তোলা, তিলবাটা একতোলা ও দধির সর একতোলা একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে প্রবাহিকা রোগের শান্তি হয়। বেল-

শুঁঠ, মরিচ ও লোধ কাষ্ঠ সমভাগে চূর্ণ করিয়া এক সিকি মাত্রায় তিল তৈলের সহিত লেহন করিলে প্রবাহিকা রোগ প্রশমিত হয়।

ছাগ দুগ্ধ বা গো দুগ্ধের মধ্যে রক্তবর্ণ উত্তপ্ত লৌহ নিক্ষেপ করিয়া সেই দুগ্ধ শীতল হইলে মধু মিশ্রিত করিয়া পান করিলে প্রবাহিকা রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে। স-সার দধি, মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে প্রবাহিকা রোগ নষ্ট হইয়া থাকে। প্রবাহিকা রোগীর অগ্নি প্রদীপ্ত হইলে অথচ ভালরূপ মল নির্গত না হইয়া ফেণা ফেণা মল নির্গত হইলে মাত গুড়, ১ তোলা, শুঁঠ চূর্ণ দুই আনা, সারযুক্ত দধি দুইতোলা, তিল তৈল আধ তোলা, দুগ্ধ আট তোলা ও ঘৃত আধ তোলা একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে এই রোগ প্রশমিত হয়।

প্রবাহিকা রোগে যে সকল বস্তি প্রয়োগের উপদেশ আছে, সেগুলি বিশেষ হিতকর। কিন্তু ঐ সকল বস্তি আর এক্ষণে প্রযুক্ত হয় না বলিয়া সে সকলের বিষয় উল্লিখিত হইল না।

প্রবাহিকায় রক্তস্রাব হইতে থাকিলে রক্তাতিসারের কথিত যোগ সকল প্রয়োগ করিয়া চিকিৎসা করিবে।

রুক্ষতা বশতঃ অতিসার জন্মিলে স্নিগ্ধ ক্রিয়া এবং স্নিগ্ধতাবশতঃ জন্মিলে রুক্ষ ক্রিয়া করিবে। ভয় ও শোক জন্য অতিসারের প্রথমে সান্ত্বনা বাক্য দ্বারা ভয় ও শোক নাশক বাক্যাদি দ্বারা শোক নাশ করিবে। বিষ, অর্শঃ ও ক্রিমি জনিত অতিসারে ঐ সকল রোগ এবং অতিসার উভয়ের প্রতিকারক চিকিৎসা করিবে। বমন, মূর্চ্ছা, তৃষ্ণা প্রভৃতি উপদ্রব থাকিলে অতিসারের অবিরোধীভাবে তাহাদের চিকিৎসা করিবে।

জ্বরাতিসার—জ্বরাতিসার একটী পৃথক্ রোগ নহে। জ্বর ও অতিসার একই সময়ে এক ব্যক্তির শরীরে উৎপন্ন হইলে তাহাকে জ্বরাতিসার বলা যায়। যদি পিত্তজ্বরে পিত্ত জন্য অতিসার হয় অথবা অতিসার রোগে জ্বর হয়, তবে ঐ মিলিত রোগকে জ্বরাতিসার বলা যায়।

জ্বরাতিসারে বিরুদ্ধ চিকিৎসা আবশ্যক। বৈদ্যগণ জ্বরাতিসারকে কষ্টসাধ্য বলিয়া থাকেন। অর্থাৎ জ্বরে বিরেচন হিতকর, অথচ বিরেচন অতিসার রোগ বর্দ্ধক। আবার অতিসার রোগে ধারক ঔষধ প্রয়োগ হিতকর, অথচ ধারক ঔষধ জ্বর বর্দ্ধক।

অতিসারের ন্যায় জ্বরাতিসারেও আম ও পক্ব অবস্থা বিবেচনা করিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয়। পথ্য প্রয়োগও অতিসারের ন্যায়, তবে যাহাতে পথ্য জ্বরের বিরুদ্ধ না হয়, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

জ্বরাতিসারের নিম্নলিখিত যোগ সকল অবস্থা বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ করিতে হয়। (১) আকনাদি, ইন্দ্রযব, চিরাতা, মুতা, ক্ষেৎ পাঁপড়া, গুলঞ্চ ও শুঁঠ ইহাদের ক্বাথ জ্বরযুক্ত আমাতিসার নাশক। (২) বেণার মূল, বালা, মুতা, ধনে, বরাহক্রান্তা, ধাইফুল লোধ ও বেলশুঁঠ ইহাদের ক্বাথ জ্বরাতিসার, অরুচি, ও আম দোষ নাশক।

(৩, ৪) ইন্দ্রযব, আতইচ, শুঁঠ, চিতামূল, বালা ও দুরালভার ক্বাথ অথবা ইন্দ্রযব, দেবদারু, কটকী ও গজপিপ্পলীর ক্বাথ সেবন করিলে জ্বরাতিসার ও দাহ প্রশমিত হয়।

(৫) বেণারমূল, বালা, ধনে, মুতা, বেলশুঁঠ, বেড়েলা ও ধাইফুল ইহাদের ক্বাথ রক্ত স্রাব যুক্ত জ্বরাতিসার নাশক। (৬) বালা,

আতইচ, মুতা, বেলশুঁঠ, শুঁঠ, ও ধনের ক্বাথ পান করিলে রক্তস্রাবযুক্ত জ্বরাতিসার প্রশমিত হয়। (৭) গুলঞ্চ, আতইচ, ধনে, শুঁঠ, বেল-শুঁঠ, মুতা, বালা, আকনাদি, চিরাতা, কুড়চি ছাল, রক্তচন্দন, বেণার মূল ও পদ্ম কাষ্ঠ ইহাদের ক্বাথ শীতল অবস্থায় পান করিলে জ্বরাতিসার, বমন বেগ, অরুচি, বমি, পিপাসা ও দাহ নষ্ট হয়। অতিসারের ঔষধ সকল বিবেচনা পূর্ব্বক জ্বরাতিসারে প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

আরোগ্য লক্ষণ—যাহার অধোবায়ু সম্যক-রূপে নির্গত হয়, দাস্ত ব্যতীত প্রস্রাব হয়, অগ্নির দীপ্তি ও কোষ্ঠ লঘু হয়, তাহার রোগ ভাল হইয়াছে জানিবে।

শ্রী—

চক্রপাণির জাতি নাশ।

চক্রপাণি দত্ত—একজন প্রসিদ্ধ বৈদ্যক গ্রন্থ প্রণেতা। তাঁহার সর্ব্বপ্রধান চিকিৎসা গ্রন্থখানি "চক্রদত্ত" নামে বিখ্যাত। বঙ্গের বৈদ্য সমাজে "চক্রদত্তের" অসাধারণ সমাদর দেখিতে পাওয়া যায়। বাস্তবিক "চক্রদত্তের" মত সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ—এ দেশে আর দ্বিতীয় আছে বলিয়া মনে হয়না। চক্রপাণি একজন স্বাধীন-চিন্তাশীল চিকিৎসক ছিলেন। বৌদ্ধ যুগের শেষাবস্থায় যখন আয়ুর্ব্বেদের সর্ব্বনাশ হইয়াছিল,—আয়ুর্ব্বেদের প্রধান অঙ্গ—শল্য-তন্ত্র একরকম উঠিয়া গিয়াছিল, সেই সময় চক্রপাণি—লতাগুল্মের অদ্ভুত বীর্য্য সংযোগে শল্য-তন্ত্রের সকল প্রয়োজন সাধন করিয়াছিলেন; চক্রপাণির এ ঋণ বৈদ্য সমাজ কখনও পরিশোধ করিতে পারিবেনা।

আমি চক্রপাণির জীবনী লিখিতে বসি নাই, তাঁহার চিকিৎসা-গ্রন্থের সমালোচনা করাও আমার উদ্দেশ্য নহে। আমরা চিরদিনই চক্রপাণিকে বৈদ্য বলিয়া জানিতাম, সম্প্রতি একজন কায়স্থ, সেই চির বৈদ্য—চক্রপাণিকে নিজের দলে টানিবার চেষ্টা করিতেছেন। চক্রপাণির জাতি মারা যাইতেছে,—"ভেড়ার শৃঙ্গে" পড়িয়া হীরার ধার ভাঙ্গিতে বসিয়াছে, সেই টুকু জানাইবার জন্যই বর্ত্তমান প্রবন্ধের অবতারণা।

সকলেই জানেন—আমাদের দেশে এখন জাতীয়তার একটা সাড়া পড়িয়াছে। সকলেই আপনার জাতিকে বড় করিবার চেষ্টা করি-তেছে। এক সময় সাম্যের অভিনয় দেখাইবার জন্য অনেক ব্রাহ্মণও "পৈতা" ফেলিয়া ভগবান হইয়া ছিলেন, এখন আবার উপনয়নে অনধি-কারী দল, সেই কুড়ানো পৈতা গলায় পরিতে চাহিতেছেন! এ রহস্য মন্দ নহে। আমি এ উন্নয়ন চেষ্টারও নিন্দা করিতেছি না। আমি বলিতে চাই—নিজে উন্নত হইতে চাও, হও, কিন্তু সে জন্য পরের জাতি মারিতে চাও কেন?

বড়কে ছোট কর কেন? কথাটা একটু বিস্তৃত করিয়াই বলি।

"কায়স্থ পত্রিকা" কায়স্থ সমাজের এক খানি মুখপত্র। উহার এখন "নব পর্য্যায়।" ঐ পত্রিকায়—"মহামহোপাধ্যায় চক্রপাণি দত্তে"র বর্ণ নির্ণয় শীর্ষক একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রবন্ধটী নিতান্তই অসার, একজন বৈদ্যকে নিজের স্বজাতি শ্রেণীভুক্ত করা হইতেছে—বোধ হয় এইজন্যই সম্পাদক এই অকিঞ্চিৎকর প্রবন্ধ পত্রস্থ করিয়াছেন! চক্রপাণি দত্ত—বৈদ্যই ছিলেন, কিন্তু হইলে কি হয়—তাঁহার উপাধি যে "দত্ত", আর রক্ষা আছে? নিশ্চয়ই চক্রপাণি কায়স্থ ছিলেন! এরূপ যুক্তির বালাই লইয়া মরিতে ইচ্ছা হয়। এইরূপ যুক্তির বলে, সুবর্ণ বণিক, তন্তুবায় প্রভৃতি যে সকল জাতির দত্ত উপাধি আছে—তাহারা সকলেই মহাত্মা চক্রপাণিকে স্বজাতি বলিয়া গর্ব্ব প্রকাশ করিতে পারে! যুক্তিটী পাঠক লেখকের কথাতেই শুনুন—

"চক্রদত্ত মধ্যে তিনি যে আত্ম-পরিচয় মূলক শ্লোকটী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাও এত সংক্ষিপ্ত যে, তাহা হইতে প্রকৃত রহস্য উদ্ঘাটন করা দুঃসাধ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। শ্লোকটী এই—

গৌড়াধি নাথ রসবত্যধিকারি পাত্র—
নারায়ণস্য তনয়ঃ সুনয়োঽন্তরঙ্গাৎ।
ভানোরণু প্রথিত লোধ্রবলী কুলীনঃ
শ্রীচক্রপাণিরিহ কর্ত্তৃ পদাধিকারী।

উক্ত শ্লোকের টীকায় প্রসিদ্ধ টীকাকার শিবদাস সেন লিখিয়াছেন—গৌড়াধিনাথো নর পাল দেবঃ, তস্য রসবতী মহানসং তস্যাধিকারী, তথা পাত্র মিতি মন্ত্রী; ঈদৃশো যো নারায়ণস্তস্য তনয়ঃ সুনঃ ইতি নীতিমান্, অন্তরঙ্গাদিতি অন্তরঙ্গ পদবিকাং ভানোরনু নারায়ণস্য তনয় ইতি যোজ্যং, তেন ভানোরনুজ ইত্যর্থঃ। বিদ্যাকুল সম্পন্নো হি ভিষগন্তরঙ্গ ইত্যুচ্যতে। লোধ্রবলী কুলীন ইতি লোধ্রবলী সংজ্ঞকঃ দত্ত কুলোৎপন্নঃ।

"উদ্ধৃত শ্লোক ও টীকাই আমাদের প্রধান অবলম্বন। উহা হইতে জানা যাইতেছে যে, গৌরাধিপতির [নর পাল দেব] নারায়ণ দত্ত নামক মন্ত্রী ছিলেন। তিনি রাজার রন্ধন শালার তত্ত্বাবধান করিতেন। নীতিমান্, লোধ্রবলী ও কুলীন (লোধ্রবলী সংজ্ঞক দত্ত কুলোৎপন্ন) চক্রপাণি দত্ত উক্ত নারায়ণ দত্তের পুত্র ছিলেন। চক্রপাণির জ্যেষ্ঠ সহোদরের নাম ভানু দত্ত—তিনি রাজার অন্তরঙ্গ (অর্থাৎ বিদ্যা কুল সম্পন্ন ভিষক্) ছিলেন। বলা বাহুল্য বন্ধনীর মধ্যবর্ত্তী বাক্যগুলি টীকাকারের। তাহা মূলে নাই।

"পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোকে (এমন কি টীকায়) যদিও চক্রপাণি দত্ত মহাশয় (কিম্বা তাঁহার টীকাকার শিবদাস সেন) তাঁহার জাতি সম্বন্ধে স্পষ্টতঃ কোনই পরিচয় প্রদান করেন নাই, তথাপি নিজেকে 'লোধ্রবলী কুলীন' সংজ্ঞায় পরিচিত করায় তাহা হইতেই তাঁহার জাতিতত্ত্ব প্রকাশিত হইয়া পড়িতেছে। টীকাকার শিবদাস সেন তাহা শত চেষ্টাতেও লোপ করিতে পারেন নাই। আজীবন মিথ্যাকে সত্যরূপে প্রচার করিবার অনর্থক চেষ্টায় ব্যাপৃত থাকা প্রযুক্ত কায়স্থদ্বেষী শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দাস গুপ্ত মহাশয়ও গ্রন্থকারের ইঙ্গিত সম্যক প্রণিধান করিতে পারেন নাই। কেবলমাত্র 'দত্ত' উপাধি দেখিয়াই নির্ব্বিচারে তাঁহাকে 'বৈদ্য' সাব্যস্ত করিয়া ফেলিয়াছেন।

"চক্রপাণি নিজেকে 'লোধ্রবলী কুলীন' বলিয়া পরিচয় প্রদান করায় ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভানু দত্ত (শিব দাস সেনের মতে) "বিদ্যাকুল সম্পন্ন" হওয়ায় চক্রপাণির বংশ যে মহা কুলীন ছিলেন তাহাই প্রকাশিত হইয়াছে। বাস্তবিক পক্ষে একমাত্র কায়স্থজাতি ব্যতীত অন্য কোন জাতি মধ্যেই দত্ত উপাধিধারী ব্যক্তি (শ্রেষ্ঠ) কুলীন বলিয়া স্বীকৃত হ'ন নাই। বৈদ্য জাতি মধ্যে 'দত্ত' উপাধিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ নিকৃষ্ট বলিয়াই পরিগণিত।

* * * *

"অন্য কোন জাতিতে বিশেষতঃ বৈদ্যজাতির মধ্যে 'দত্ত বংশ' কুলীন বলিয়া কখনই গণ্য ছিল না। এরূপ স্থলে চক্রপাণি দত্ত শ্রেষ্ঠ কুলীন বলিয়া আত্ম পরিচয় প্রদান করায় তিনি কায়স্থই হইতেছেন। * * শুধু 'কুলীন' শব্দের প্রয়োগ দ্বারাই মহামহোপাধ্যায় চক্রপাণি দত্তের কায়স্থ জাতির পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে, এবং তিনি যে কুলীন শ্রেষ্ঠ কায়স্থ পুরুষোত্তম দত্তের বংশ সম্ভূত ছিলেন তাহাই সূচিত করিয়া দিতেছে। সম্ভবতঃ আধুনিক কালের গঙ্গা স্রোতঃ" প্রভৃতি কুলসংজ্ঞার ন্যায় 'লোধ্রবল' শব্দ তাৎকালিক (পুরুষোত্তম দত্তের) দত্ত কুলের কুলীনত্ব প্রকাশক বিশেষ সংজ্ঞা ছিল। দত্ত কুলের কৌলিন্য লোপের সহিত উক্ত "লোধ্রবলী সংজ্ঞাটিও কুলশাস্ত্র হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সেন বর্ম্মা।"

এক্ষণে পাঠক মহাশয়! বোধ হয় বুঝিতে পারিতেছেন—এই সেনবর্ম্মা স্বাক্ষরকারী প্রভাস চন্দ্র—একজন বৈদ্য দ্বেষী বটেন। তাই প্রাচীন পণ্ডিত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্নের মত এক-জন শাস্ত্র-বিশারদকে আক্রমণ করিতে ইনি একটুও সঙ্কুচিত হন নাই। ইহা অবশ্যই নূতন ক্ষাত্র ধর্ম্মের একটা বিশিষ্ট লক্ষণ। এ সম্বন্ধে আমি একটী কথাও কহিতে চাহিনা।

লেখক প্রকাশ করিয়াছেন—"টীকাকার শিবদাস সেন তাহা শত চেষ্টাতেও লোপ করিতে পারেন নাই।" ইহা দ্বারা বুঝা যাইতেছে, চক্রপাণি যে কায়স্থ ছিলেন, শিব-দাস সেন কৌশলে তাহা গোপন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। আমি বিস্মিত হইতেছি,—লেখকের এ ধারণা কেমন করিয়া হইল? শিবদাস সেনের সময়ে ত "বৈদ্য বড় কি কায়স্থ বড়?"—এরূপ আন্দোলনের সূত্রপাতও ছিল না। উমেশচন্দ্র কায়স্থ দ্বেষী হইতে পারেন, কিন্তু তাহা নগেন্দ্র নাথ বসুর বৈদ্য বিদ্বেষের পুরোবর্ত্তী নহে। নগেন্দ্র বাবু নিজের স্বজাতিকে বৈদ্যের চেয়ে বড় বলিয়া প্রকাশ করিবার পর, বাধ্য হইয়াই শাস্ত্রজ্ঞানী উমেশচন্দ্র, বৈদ্যের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের জন্য চেষ্টা করিয়াছেন। উমেশ বাবুর উপর এই-রূপ মন্তব্য প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে—লেখক যদি নগেন্দ্র বাবুর বৈদ্য বিদ্বেষের কথাটা একটু ভাবিয়া দেখিতেন, আমরা তাঁহার বুদ্ধির প্রশংসা করিতে পারিতাম। তিনি (অর্থাৎ লেখক) সংস্কৃত ভাষা জানেন না, ইতিহাসের ধার ধারেন না, বৈদ্যের কুলকারিকা বুঝেন না, অথচ সাদা কাগজে কালির অক্ষরে চক্রপাণিকে কায়স্থ লিখিয়া নিজের অজ্ঞতারই পরিচয় দিয়াছেন।

লেখক প্রভাস চন্দ্র সম্ভবত: শুনিয়া থাকিবেন—এক সময় এই বঙ্গদেশে বৌদ্ধ-প্রভাব বড় প্রবল হইয়াছিল। দেশের রাজা প্রজা সকলেই বৌদ্ধ হইয়াছিলেন। অনেক ব্রাহ্মণ বৈদ্য, রাজানুজ্ঞায়—সাম্য তন্ত্রের মতে

আভিজাত্যের গর্ব্ব—উপবীত পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ইহার পরই নবীন হিন্দুত্বের অভ্যুত্থান। দেশে তখন বেদবিদ্ ব্রাহ্মণ পাওয়া যায় নাই। মহারাজ আদিশূরকে যজ্ঞ অনুষ্ঠানের জন্য বঙ্গের বাহির হইতে ব্রাহ্মণ আনাইতে হইয়াছিল। পাল রাজগণ যে বৌদ্ধমতাবলম্বী রাজা ছিলেন, এ কথাও শ্রীমান্ প্রভাসচন্দ্র শুনিয়া থাকিবেন। এই বৌদ্ধ প্রভাব—পূর্ব্ববঙ্গের বহু বৈদ্য-সন্তানকে উপবীত ত্যাগ করাইয়াছিল। বৌদ্ধ-শাসনে যাঁহারা উপবীত ত্যাগ করেন নাই, নিজের জাতির গৌরব বজায় রাখিয়াছিলেন,—তাঁহাদের নাম হইয়াছিল "লোধ্রবলী"। এরূপ ব্যক্তির সমাজ-সম্ভ্রম যথেষ্ট ছিল। এরূপ ব্যক্তিরা যেস্থানে বাস করিতেন, সেই স্থানকে "লোধ্রবল" বলিত। বৈদ্যদের কুলপুস্তকেও ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়;—যথা,—

মালঞ্চঃ সেন কুলস্য গুপ্তানাং খণ্ডমেবচ।
লোধ্রবলশ্চ দত্তানাং কুলস্থানং প্রকীর্ত্তিতং॥

বৈদ্য পঞ্জী। ২য় অঃ।

চক্রপাণি, পিতা নারায়ণের নামেরই উল্লেখ করিয়াছেন, পিতামহের নাম লিপিবদ্ধ করেন নাই। 'সেনবর্ম্মা' (?) জোর করিয়া সেই নারায়ণকে পুরুষোত্তমের পুত্র বলেন কোন্ সাহসে?

সেন বর্ম্মা বোধ হয় এতক্ষণে বুঝিয়াছেন,—"লোধ্রবল" দত্ত উপাধিধারী বৈদ্যদের একটি কুল স্থানের নাম। দত্তোপাধিক যে সকল বৈদ্য উপবীত পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তাঁহাদের সামাজিক সম্মান ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। চক্রপাণি এ শ্রেণীর বৈদ্য ছিলেন না, পাছে তাঁহার দত্তান্ত নাম দেখিয়া কাহারও মনে সে সন্দেহ হয়, সেই আশঙ্কা দূর করিবার জন্যই, তিনি যে লোধ্রবলী কুলীন—এরূপ কথায় "চক্রদত্তের" উপসংহারে—যৎকিঞ্চিৎ আত্ম পরিচয় দিয়াছিলেন। শিবদাস সেন সে পরিচয় ঢাকিবার চেষ্টা করেন নাই। চক্রপাণি যে বৈদ্য ছিলেন—চক্রপাণিশিষ্য হরিশ্চন্দ্র 'ক্রিয়া কৌমুদী' গ্রন্থে তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। হরিশ্চন্দ্র তাঁহার গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ শ্লোকে শিবকে প্রণাম করিয়া তাহার পরেই চক্রপাণিকে নমস্কার করিয়াছেন—

"অম্বষ্ঠ বংশোদ্ভব চক্রপাণি রাজন্ম পুণ্য
প্রথিতঃ স্বনামা।"

অতএব চক্রপাণি দত্তের জাতি মারিবার চেষ্টা করিয়া "সেন বর্ম্মা" কেবল উপহাসাস্পদই হইয়াছেন। সেনবর্ম্মা নিজেই ভাবিয়া দেখুন—চক্রপাণির "দত্ত উপাধি দেখিয়াই নির্ব্বিচারে তাঁহাকে" তিনি কায়স্থ সাব্যস্ত করিয়াছেন কি না? গ্রন্থ শেষে চক্রপাণি লিখিয়াছেন—

যঃ সিদ্ধযোগ লিখিতাধিক সিদ্ধ যোগা
নত্রৈব নিক্ষিপতি কেবল মুদ্ধরেদ্বা।
ভট্টত্রয়-ত্রিপথ-বেদ-বিদা জনেন
দত্তঃ পতেৎ সপদি মূর্দ্ধনি তস্য শাপঃ।

ব্রাহ্মণ এবং বৈদ্য ভিন্ন এরূপ শপথ কি কায়স্থ কখনও উচ্চারণ করিতে সাহস করে?

চক্রপাণির বংশ এখনও চৌপীড়া গ্রামে—বর্ত্তমান রহিয়াছে, "সেন বর্ম্মা" সে সন্ধান লইয়াছেন কি?*

শ্রীরাম সহায় কাব্যতীর্থ বেদান্ত শাস্ত্রী, ভট্টাচার্য্য।

*এরূপ জাতি মারিবার চেষ্টা, ইহাই নূতন নহে। "নব্য ভারত" নামক প্রসিদ্ধ সাময়িক পত্রে কৈলাস চন্দ্র সিংহ, বৈদ্য রাম প্রসাদ সেনকে কায়স্থ বলিয়া প্রচার করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। রাম প্রসাদের

'বকে'র গুণ।

—:*:—

সর্দ্দিতে।

বকের ফুল সর্ষের তেলে
সর্দ্দি ভাল হয় ভেজে খেলে।

সর্দ্দি-কাশিতে।

বক মূলের ছাল আধ ভরি,
বচ নাও সমান করি—
এক পোয়া জলের এক ছটাক শেষ,
মধু দিয়ে লাগ্‌বে বেশ।
ছ' তিন বারে সেবন কর,
সর্দ্দি-কাসিতে উপকার বড়।

জ্বরে।

বকছাল, অনন্তমূল, আধ আধ ভরি,
গোক্ষুর বীজ, হরীতকী সমান করি,
আধসের জলের এক ছটাক শেষ,
বাত-জ্বর এতে হয় বিশেষ।
ওষুধ এটি চাতুর্থক জ্বরেও,
প্রয়োগ কর আর ত্র্যাহিকেও।

চাতুর্থক জ্বরের পরিচয়।

এক দিন হ'য়ে ছ' দিন পর
আবার দেখা দেয় জ্বর,
চাতুর্থক জ্বর নাম তাহার,
বকফুল ভাজা খেলে হয় উপকার।

কফ-পিত্তরোগে।

কফ-পিত্ত রোগ যাহার
বক ফুলের মধু উপকার তা'র।

রাতকাণা রোগে।

এক সের গাওয়া ঘৃত নিয়ে
বকের পাতা এক পোয়া-মিশিয়ে দিয়ে,
মৃদু আগুনে পাক কর,
রাতকাণায় খেলে উপকার বড়।

অপস্মারে।

বকের পাতা দুই ভরি,
গোল মরিচ তার সিকি করি,
চোণা দিয়ে বেটে নিয়ে
অপস্মারে দাও নস্য দিয়ে।

বাতরক্তে।

ম'ষের দুধে বকফুলের গুঁড়
ভাল ক'রে মিশাল কর,
তা'র পর তাহার দধি থেকে—
ননিটা দাওগে গলায় মেখে।

দৌহিত্র বংশের বংশধর একজন উকীলের এবং শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয়ের কশাঘাতে কৈলাস চন্দ্রের চৈতন্য হইয়াছিল। আমরা চক্রপাণির পরিচয় জানি, পৃথক প্রবন্ধে তাহা প্রকটিত হইবে। "পুরুষোত্তম দত্ত" কায়স্থ কুলে একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। চক্রপাণি যদি তাঁহার পৌত্র হইতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই অমন বিশ্ব বিখ্যাত পিতামাতার নামোল্লেখ করিতে বিরত হইতেন না।—আঃ সং।

বাতে।

বক গাছের মূল আর ধুতুরা মূল
সমান ভাগে কর তুল্,
ব্যথা—ফোলায় প্রলেপ দাও
হাতে হাতে যদি সুফল চাও।

শ্রীসত্যচরণ সেন গুপ্ত কবিরঞ্জন।

রসায়ন ও বাজীকরণ।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত অংশের পর।)

—:o:—

শাস্ত্রে নানা প্রকার রসায়নের উল্লেখ আছে। তন্মধ্যে কতকগুলি বহুব্যয়-সাধ্য এবং বহু উপকরণ সাপেক্ষ। এই-প্রবন্ধে আমরা সেই-সকলের উল্লেখ না করিয়া অনায়াস-লভ্য কতকগুলি ঔষধের উল্লেখ করিতেছি। "হরীতকী" শীর্ষক প্রবন্ধে ঋতু হরীতকী নামক রসায়নের বিষয় লিখিত হইয়াছে বলিয়া এস্থলে তাহার উল্লেখ করা হইল না। সর্ব্বজন পরিচিত চ্যবনপ্রাশও একটী উৎকৃষ্ট রসায়ন।

(১) মণ্ডুকপর্ণীর (থুলকুড়ির রস, (২) দুগ্ধের সহিত যষ্টিমধু চূর্ণ, (৩) মূল ও পুষ্প সহ গুলঞ্চের রস সেবন করিলে আয়ু, বর্ণ, বল, স্বর ও স্মরণ শক্তি বর্দ্ধিত হয়।

অশ্বগন্ধা চূর্ণ পিত্ত প্রধান ধাতুতে দুগ্ধ সহ, বাত-পিত্ত প্রধান ধাতুতে তিল তৈল সহ এবং বায়ু ও কফ প্রধান ধাতুতে উষ্ণ জল সহ সেবন করিলে শরীর পুষ্ট হয়। সহ্যমত একটী হইতে ৪।৫ টী পিঁপুল, ঘৃত ও মধু সহ এক বৎসর কাল সেবন করিলে রসায়ন হয় এবং কাস, শ্বাস গলরোগ, পাণ্ডু, বিষম জ্বর, স্বরভঙ্গ, পীনস, শোথ প্রভৃতি বিবিধ রোগ নষ্ট হয়।

পিপ্পলী বর্দ্ধমান যোগ,—প্রথম দিন তিনটী পিপ্পলী সেবন করিয়া, প্রত্যহ তিনটী করিয়া বৃদ্ধি করিবে, অর্থাৎ প্রথম দিন তিনটী, দ্বিতীয় দিন ছয়টী, তৃতীয় দিন নয়টী, এইরূপ দশ দিন করিতে হইবে। দশ দিনের পর আবার তিনটী করিয়া প্রত্যহ কমাইতে থাকিবে। আবার দশ দিন পরে তিনটী করিয়া বর্দ্ধিত করিয়া, আবার দশ দিন পরে তিনটী করিয়া কমাইবে। এইরূপ নিয়মে এক সহস্র পিঁপুল সেবন করিতে হয়। এই পিপ্পলী-রসায়ন পুষ্টিকর, সুস্বর জনক, আয়ুবর্দ্ধক, প্লীহানাশক, বয়োস্থাপক এবং মেধাজনক। শাস্ত্রে যাহা অধম মাত্রা—তাহাই লিখিত হইল। এই মাত্রায় সহ্য না হইলে, আরও কম মাত্রায় সেবন করা উচিত। বলবান ব্যক্তির পক্ষে পিঁপুল পেষণ করিয়া দুগ্ধের সহিত সেবন করা উচিত, মধ্য-বল ব্যক্তিগণের পক্ষে ক্বাথ-প্রশস্ত এবং হীন বল ব্যক্তিগণের শীত-কষায় করিয়া সেবন করা কর্ত্তব্য। ঔষধ জীর্ণ হইলে ঘৃত ও দুগ্ধ সহ ষষ্টিক তণ্ডুলের অন্ন পথ্য করিবে।

(১) লৌহভস্মের সহিত, (২) স্বর্ণভস্মের সহিত, (৩) ব'চের সহিত, (৪) ঘৃত ও মধুর

সহিত, (৫) বিড়ঙ্গ ও পিঁপুল চুর্ণের সহিত, (৬) অথবা সৈন্ধব লবণের সহিত একবৎসর কাল ত্রিফলা সেবন করিলে মেধা, স্মৃতি, বল ও পরমায়ু বৃদ্ধি হয় এবং জরা নষ্ট হয়।

পূর্ব্বদিনের আহার জীর্ণ হইলে প্রাতে একটী হরীতকী, মধ্যাহ্ন আহারের পূর্ব্বে দুইটী বহেড়া এবং আহারের পরে চারিটী আমলকী (প্রত্যেকটী) ঘৃত ও মধুর সহিত সেবন করিলে সুস্থ শরীরে একশত বৎসর জীবিত থাকা যায় এবং সহজে জরা আক্রমণ করিতে পারে না। আমলকী ও কৃষ্ণ তিল ভৃঙ্গরাজের (ভীমরাজ) রসে পেষণ করিয়া প্রত্যহ সেবন করিলে কেশ কৃষ্ণবর্ণ, ইন্দ্রিয় নির্ম্মল, শরীর ব্যাধিহীন এবং দীর্ঘ পরমায়ু লাভ হয়।

বৃদ্ধদারকের (বীজতারক) মূল চূর্ণ করিয়া, শতমূলীর রসে আর্দ্র করিয়া, রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। শুষ্ক হইলে পরদিন পুনরায় শতমূলীর রসে মাখিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। ইহাকে ভাবনা দেওয়া বলে। এইরূপ সাত দিন করিয়া সেই ঔষধ সহ্যমত মাত্রায় (দুই আনা হইতে আধতোলা) কিঞ্চিৎ ঘৃত সহ সেবন করিলে বলিপলিত নষ্ট হয় এবং মেধা ও স্মৃতি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

হস্তিকর্ণ পলাশের মূল চূর্ণ, ঘৃত কিংবা মধুর সহিত সেবন করিলে দীর্ঘ আয়ু এবং মেধা লাভ করা যায়। ইহা একটী উৎকৃষ্ট বাজীকরণও বটে।

আমলকী চূর্ণ আট সের—এক সহস্র আমলকীর রসে একুশ বার ভাবনা দিবে। পরে উহার সহিত ঘৃত ৮ আটসের, মধু আটসের, পিঁপুল চূর্ণ একসের ও চিনি দুই সের মিশ্রিত করিয়া একটী পাত্রে রাখিয়া পাত্রের মুখ রুদ্ধ করিবে। বর্ষারম্ভে উক্ত পাত্র ভস্মরাশির মধ্যে রাখিয়া, শরৎ কালে উদ্ধৃত করিয়া লইবে। এই ঔষধ উপযুক্ত মাত্রায় (আধ তোলা হইতে দুই তোলা) সেবন করিলে বল, বর্ণ, মেধা, স্মৃতি, জীবনীশক্তি ও আয়ু বর্দ্ধিত হয়।

বিড়ঙ্গ রসায়ন—বিড়ঙ্গ চূর্ণ, যষ্টিমধু ও শীতল জল কিম্বা মধু ও কিসমিসের ক্বাথ, অথবা মধু ও আমলকীর ক্বাথ কিম্বা গুলঞ্চের ক্বাথের সহিত সেবন করিবে। ঔষধ জীর্ণ হইলে ঘৃত সংযুক্ত লবণ-বিহীন মুগের যূষ প্রস্তুত করিয়া তৎসহ যথেষ্ট ঘৃতযুক্ত অন্ন আহার করিবে। ইহাতে অর্শরোগ ও ক্রিমি নষ্ট হয় এবং মেধা ও আয়ু বর্দ্ধিত হয়।

শ্বেত বেড়েলা, পীত বেড়েলা, গোরক্ষ চাকুলে, ভুঁইকুমড়া ও শতমূলী—ইহাদের যে কোন একটীর মূল চূর্ণ, দুগ্ধের সহিত পান করিবে। ঔষধ জীর্ণ হইলে ঘৃত-দুগ্ধ-প্রধান খাদ্য আহার করিবে। এই ঔষধ পরমায়ু বর্দ্ধক, বলকারক এবং রক্তপিত্ত রোগনাশক। পীত বেড়েলা ও গোরক্ষ চাকুলে জলের সহিত সেবন করা প্রশস্ত। গৃহমধ্যে থাকিয়া এই ঔষধ সেবন করিলে সমধিক ফল লাভ হয়।

শ্বেত সোমরাজী, রৌদ্রে শুষ্ক ও চূর্ণ করিয়া ইক্ষু গুড় মাখিয়া ঘৃতাক্ত কলসের মধ্যে রাখিবে এবং কলসের মুখ রুদ্ধ করিয়া তাহা ধান্য রাশির মধ্যে স্থাপিত করিবে। সাত দিন পরে ঔষধ উদ্ধৃত করিয়া প্রতিদিন সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে সহ্য মত মাত্রায় সেবন করিয়া উষ্ণ জল পান করিবে। ঔষধ জীর্ণ হইলে শরীর শীতল জলে ধুইয়া ফেলিবে এবং শালিধান্যের অন্ন দুগ্ধ ও চিনি সংযোগে আহার করিবে। ইহা বল, বর্ণ, স্মৃতি ও পরমায়ু বর্দ্ধক।

কৃষ্ণবর্ণ সোমরাজী চূর্ণ, গোমূত্রের সহিত সেবন করিলে কুষ্ঠ, পাণ্ডু, ও উদর রোগ নষ্ট হয় এবং বল, স্মৃতি ও পরমায়ু বৰ্দ্ধিত হয়। এই ঔষধ প্রাতে সূর্য্যের রক্তিমবর্ণ দূর হইলে সেবন করিতে হয় এবং লবণবিহীন আমলকীর যূষের সহিত সংযুক্ত অন্ন পথ্য করিতে হয়।

মণ্ডূক পর্ণী রসায়ন—মণ্ডূক পর্ণীর (থুলকুড়ির) রস দুগ্ধসহ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিবে অথবা রস সেবন করিয়া দুগ্ধ পান করিবে। ঔষধ জীর্ণ হইলে দুগ্ধ, ঘৃত, তিল এবং যব দ্বারা প্রস্তুত খাদ্য আহার করিবে। অন্ন (ভাত) পরিত্যাগ করা উচিত। এই ঔষধ সেবন করিলে মেধা ও আয়ু বৰ্দ্ধিত হয়। কুটী প্রাবেশিক নিয়মে ঔষধ সেবন করিলে অধিক ফল হয়। প্রথমে ২।১ দিন উপবাস করিয়া ঔষধ সেবন করা কৰ্ত্তব্য।

ব্রাহ্মী রসায়ন · অন্নাহার পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মী শাকের রস সহ্য মত মাত্রায় পান করিবে। ঔষধ জীর্ণ হইলে লবণ বিহীন মণ্ড, পেয়াদি দুগ্ধ সহ সেবন করিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে অত্যন্ত মেধা বৃদ্ধি হয় এবং দীর্ঘ পরমায়ু লাভ করা যায়।

প্রাতঃকালে ধারোষ্ণ দুগ্ধ বা শীতল জল পান করিলে কাস, শ্বাস, অতিসার, জ্বর, পীড়কা, কুষ্ঠ, কোঠ, মূত্রাঘাত, অর্শঃ, শোথ, গলরোগ, শিরোরোগ, কর্ণরোগ, চক্ষুরোগ, বাত, পিত্ত, কফ ও ক্ষত জনিত রোগ সকল নষ্ট হয় এবং দীর্ঘ পরমায়ু লাভ করা যায়।

প্রাতঃকালে শীতল জলের নস্য গ্রহণ করিলে ব্যঙ্গ, বলি, পলিত, পীনস, স্বরভঙ্গ ও কাস ভাল হয় এবং শরীর পুষ্ট ও দৃষ্টি শক্তি বৰ্দ্ধিত হয়।

নিগুণ্ডী কল্প—নিসিন্দা মূলের ছাল চূর্ণ এক সের ও মধু দুই সের একত্র মিশ্রিত করিয়া একটী ঘৃতভাণ্ডে রাখিবে। পরে উক্ত ভাণ্ডের মুখ রুদ্ধ করিয়া একমাস ধান্য রাশির মধ্যে স্থাপিত করিবে। অনন্তর উদ্ধৃত করিয়া তক্র বা গোমূত্রের সহিত সেবন করিলে বলি-পলিত নষ্ট হয়, বল, বীর্য্য, আয়ু, মেধা ও দৃষ্টিশক্তি বৰ্দ্ধিত হয় এবং বিবিধ রোগ নষ্ট হইয়া থাকে।

ভৃঙ্গরাজ চূর্ণ এক ভাগ, তিল অৰ্দ্ধভাগ এবং আমলকী চূর্ণ অৰ্দ্ধভাগ—একত্র করিয়া চিনি বা গুড়ের সহিত সেবন করিলে অকাল জরা ও বিবিধ রোগ নষ্ট হয়।

খণ্ডাম্রক—সুপক্ক মিষ্ট আম্রের রস ৬৪ সের, চিনি ৮ সের, গব্য ঘৃত ৪ সের, শুঁঠ চূর্ণ ৩২ তোলা, মরিচ চূর্ণ ৩২ তোলা, পিঁপুল চূর্ণ ১৬ তোলা এবং জল ৮ সের একত্র করিয়া মৃৎ পাত্রে পাক করিবে। যখন হাতায় লাগিবে, এরূপ ঘনীভূত হইলে তখন নামাইয়া তেজপাতা চূর্ণ ৩২ তোলা এবং গেঁটেলা, চিতামূল, ধনে, মুতা, জীরা, কৃষ্ণজীরা, শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ, জায়ফল, তালীশপত্র, দারুচিনি, ছোট এলাচ ও নাগকেশর প্রত্যেকের চূর্ণ আট তোলা প্রক্ষেপ দিয়া উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া লইবে। অনন্তর শীতল হইলে ৪ সের মধু মিশ্রিত করিবে। এই ঔষধ একতোলা হইতে দুই তোলা মাত্রায় আহারের পূর্ব্বে সেবন করিলে অর্শঃ, অম্লপিত্ত কাস, শ্বাস, ক্ষয়, মূর্চ্ছা, শূল, বমি, মূত্রকৃচ্ছ্র প্রভৃতি বিবিধ রোগ নষ্ট হয় এবং মেধা ও পরমায়ু বৰ্দ্ধিত হইয়া থাকে। ইহা উৎকৃষ্ট বাজীকরণ।

যষ্টিমধু চূর্ণ, বংশলোচন চূর্ণ, পিঁপুল চূর্ণ, চিনি অথবা মধু ও ঘৃত—ইহার যে কোন

একটীর সহিত ত্রিফলা চূর্ণ সেবন করিলে উৎকৃষ্ট রসায়ন হয়।

লৌহ ভস্ম বা স্বর্ণ ভস্ম,বচের চূর্ণ সহ অথবা ঘৃত ও মধুসহ. কিম্বা বিড়ঙ্গ ও পিপুল চূর্ণের সহিত এক বৎসর সেবন করিলে জরা নষ্ট হয় এবং মেধা, স্মৃতি, বল ও পরমায়ু বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

রসায়নের পুষ্টিজনক অনেক ঔষধ প্রয়োগে বাজীকরণ এবং বাজীকরণের অনেক ঔষধ প্রয়োগে রসায়ন হইয়া থাকে। বুদ্ধিমান ব্যক্তি বিবেচনা পূর্ব্বক এক অধিকারের ঔষধ অন্য অধিকারে প্রয়োগ করিতে পারেন।

ক্ষয়রোগ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর)

যক্ষ্মারোগের সাধারণ লক্ষণ—স্কন্ধ ও পার্শ্ব দেশে বেদনা, গাত্র গরম হওয়া ও জ্বালা করা এবং সর্ব্বদা জ্বর থাকা - ক্ষয়রোগের সাধারণ লক্ষণ। এই কয়টি উপসর্গ যুগপৎ ঘটিলে ক্ষয় রোগ বলিয়া আশঙ্কা করিবে।

যক্ষ্মার একটি প্রধান উপসর্গ অতিরিক্ত ঘাম হওয়া। অনেকে যক্ষ্মা রোগের নিদানে ইহার উল্লেখ না দেখিয়া ক্ষুণ্ণ হইয়া থাকেন। কিন্তু ক্ষুণ্ণ হইবার কোন কারণ নাই। জ্বর-নিদান অনুসন্ধান করিলেই ইহার মীমাংসা হয়। ক্ষয়রোগে জ্বর হইলে ঘর্ম্ম হইয়া থাকে। ক্ষয় রোগে প্রলেপক নামক জ্বর হয়। প্রলেপক জ্বরের লক্ষণ যথা :—

প্রলিম্পন্নিব গাত্রাণি ঘর্ম্মেণ গৌরবে ন চ।
মন্দ জ্বর বিলেপী চ সশীতঃ স্যাৎ প্রলেপকঃ॥

অর্থাৎ যে জ্বরে শরীর ঘর্ম্ম দ্বারা লিপ্ত ও গুরু হয় এবং শীত লক্ষণ বিশিষ্ট মন্দ মন্দ জ্বর হয় তাহাকে প্রলেপক জ্বর বলে। ক্ষয়রোগে প্রচুর ঘর্ম্ম হয়, ইহা তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

ক্ষয়রোগের পূর্ব্বরূপ—ক্ষয়রোগ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে নিম্নলিখিত লক্ষণ প্রকাশ পায়। কাস, অঙ্গ মর্দ্দ (গাত্র বেদনা), কফ নির্গম, তালুশোষ, বমি. অগ্নিমান্দ্য, মত্ততা, নাসিকা দিয়া জল ও কফস্রাব, শ্বাস, পীনস ও নিদ্রাধিক্য উপসর্গ ঘটে। রোগীর চক্ষু শ্বেত বর্ণ হয় এবং মাংস ভক্ষণ ও স্ত্রী সহবাসে ইচ্ছা হয়। রোগী স্বপ্ন দেখে—কাক, শুক, নীলকণ্ঠ, শকুন—এই সকল পক্ষী এবং বানর ও কাঁক-লাস যেন তাহাকে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে, নদী জলশূন্য হইয়াছে, শুষ্ক বৃক্ষ সকল যেন বায়ু ও ধূমে আচ্ছন্ন রহিয়াছে।

রোগ মাত্রেই প্রবল বা মৃদুভাবে প্রকাশ পাইতে পারে। জ্বর বলিতে দুই এক দিনে মারাত্মক জ্বরও বুঝায়. আবার সামান্য-সাধ্য জ্বরও বুঝায়। যক্ষ্মা রোগও সেইরূপ প্রবল বা অপ্রবল ভাবে প্রকাশ পাইতে পারে। রোগের প্রাবল্য বা অল্পতা রোগীর শরীরের অবস্থা ও রোগবীজের উপর নির্ভর করে। প্রবল রোগে হঠাৎ শীত করিয়া জ্বর হয়, কাস,

শ্বাসরুদ্ধ ও পাঁজরার বেদনা উপসর্গ ঘটে এবং উপসর্গ সকল ক্রমে বাড়িতে থাকে। নীলবর্ণ পুযের ন্যায় কফ নির্গত হয়, কখন কখন মুখ দিয়া রক্ত উঠে! ক্রমে পূর্ব্ব কথিত উপসর্গ আসিয়া জোটে।

অপ্রকাশ যক্ষ্মা নানা আকারে প্রকাশ পায়। অনেক স্থলে রোগ এরূপ ভাবে প্রকাশ পায় যে, সহজে ক্ষয়রোগ বলিয়া ধরা পড়ে না। কার্য্যক্ষেত্রে আমরা যত প্রকার দেখিয়াছি, নিম্নে লিখিত হইতেছে।

ঘুষ ঘুষে জ্বর, ঘুষ ঘুষে কাস—এইরূপ আকারে অনেক স্থলে প্রকাশ পায়। রোগী প্রথমে গ্রাহ্যই করে না, বিশেষ বিজ্ঞ চিকিৎসক ব্যতীত সহজে রোগ ধরিতে পারে না। জ্বর ও কাসের চিকিৎসা চলিতে থাকে। কখন কখন হঠাৎ রোগ প্রবল আকারে প্রকাশ পায়, কখন বা ধীরে ধীরে রোগীর দেহ ও প্রাণ ক্ষয় করিতে থাকে। যখন ধরা পড়ে, তখন রক্ষার আর উপায় থাকে না। মুখ দিয়া রক্ত উঠা—কখন কখন হঠাৎ মুখ দিয়া রক্ত উঠে, সঙ্গে সঙ্গে জ্বর বুকে বেদনা প্রভৃতি উপসর্গ ঘটে। কখন বা একদিন মুখ দিয়া রক্ত উঠে, দীর্ঘকাল পরে আবার একদিন উঠে, কিছুদিন পরে আবার উঠে, শেষে রোগ প্রবল ভাবে প্রকাশ পায়। একবার রক্ত উঠার পর দুই বৎসর রক্ত উঠে নাই, দুই বৎসর পরে রক্ত উঠার পর আবার এক বৎসর উঠে নাই, কিন্তু ছয় মাস পরে রোগ প্রবলভাবে প্রকাশ পাইল এবং রোগী সত্বর মৃত্যুমুখে পতিত হইল—ইহাও প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

স্বপ্নদোষ ও রক্তহীনতা—রোগীর বয়স ১৯।২০ বৎসর, নিত্য স্বপ্নদোষ হয়, শরীর অত্যন্ত রক্তহীন হইয়া পড়িতেছে, ক্ষুধা ও কোষ্টশুদ্ধি ভাল হয় না, বিকালে একটু জ্বর ভাব হয়।—কবিরাজ জ্বরের চিকিৎসা করেন, কোন ফল হয় না। ২।৩ মাস পরে অন্য একজন বিজ্ঞ কবিরাজের চিকিৎসায় কিন্তু আরোগ্য লাভ করিল—এমনও দেখা গিয়াছে।

অজীর্ণ ও রক্তহীনতা—রোগীর বয়স ২৭।২৮ বৎসর, আসিয়া বলিল—অজীর্ণ রোগে কষ্ট পাইতেছি, অম্ল ঢেকুর উঠে, বমি হয়। অমুক অমুক দেখিয়াছেন কিছু হয় নাই। অজীর্ণ রোগের যেরূপ অবস্থা এবং যে ঔষধ দেওয়া হইয়াছিল—তাহাতে উপকার হইবার কথা—তবে হইল না কেন? জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনার শরীর কি এইরূপ কৃশ? রোগী বলিল, না মহাশয়, আমি এর ডবল ছিলাম, দেড়মাসে এইরূপ হইয়া গিয়াছি। ক্ষয় রোগ স্থির করিলাম, রোগীর বোধ হয় বিশ্বাস হয় নাই। অন্য চিকিৎসকের চিকিৎসাধীনে ক্ষয়রোগে মৃত্যু হইল—এরূপ কথাও শুনিয়াছি।

স্বরভঙ্গ, গলা বেদনা—রোগী আসিয়া বলিল, কবিরাজ মহাশয়, স্বরভঙ্গ হ'য়েছে, গলায় বড় বেদনা আর সর্ব্বদা সর্দ্দি জ'মে আছে। অমুক অমুক দেখিয়াছে, কোন ফল হয় নাই। দুই সপ্তাহ চিকিৎসা করা হইল, কোন ফল হইল না। তৃতীয় সপ্তাহে রোগী আসিলে জিজ্ঞাসা করিলাম, কখন গরমীর ব্যারাম হ'য়েছিল কি? উত্তর "না।" রোগীর শরীর ক্রমশঃ ক্ষয় পাইতেছে দেখিয়া ক্ষয়রোগ স্থির করিয়া চিকিৎসা করা হইল, রোগী আরোগ্য লাভ করিল। এরূপ অবস্থাও দেখা গিয়াছে।

পাণ্ডু রোগ, উদরী।—রোগী পরিচিত, নিবাস ইটালিতে ছিল। পাণ্ডুরোগের মত লক্ষণ প্রকাশ পায়। কলিকাতার কয়েকজন সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ, এলোপ্যাথ ও হোমিওপ্যাথ চিকিৎসা করেন। তাঁহারা রোগীর পেটে জল হইবে বা হইয়াছে সন্দেহ করেন। ইঁহাকে কিন্তু গুপ্ত যক্ষ্মা মৃত্যুর পূর্ব্বে স্বীয় মূর্ত্তি দেখাইয়াছিল

আশ্চর্য্য রোগী।—রোগীর বয়স প্রায় চল্লিশ। মুদিখানার দোকান আছে, বাগানে তরকারী করিয়া বিক্রয় করে। আসিয়া অবস্থা জানাইল,—জ্বর, কাস, মুখ দিয়া রক্ত উঠে, অন্যান্য উপসর্গ আরও ছিল, স্মরণ নাই। ক্ষয়রোগ স্থির করিলাম। রোগী—ম'শায় দু বৎসর হ'ল বিয়ে করেছি বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল। দুই সপ্তাহ চিকিৎসার পরে রোগী কোথায় গেল জানিনা। এক বৎসর পরে দেখি, রোগী এক প্রকাণ্ড বজরা মাথায় করিয়া বাজারে চলিয়াছে। কি ব্যাপার, অপ্রবল ক্ষয়রোগ,—না ক্ষয় রোগ নয়, না তাহার নব বিবাহিতা পত্নীর এয়োতের জোর,—এ সমস্যার মীমাংসা হয় নাই।

ম্যালেরিয়ার বেশে যক্ষ্মা।—কখন কখন যক্ষ্মারোগ ম্যালেরিয়ার আকারে প্রকাশ পায়। কিন্তু ইহা প্রায়ই ম্যালেরিয়া-প্রধান-স্থানে হইয়া থাকে, প্রথমে ধরা পড়ে না। ম্যালেরিয়া অপেক্ষা শরীরের অধিকতর ক্ষয় হয় বলিয়া বিজ্ঞ চিকিৎসক কিছুদিন পরে ধরিতে পারেন।

(ক্রমশঃ)

মকরধ্বজের প্রস্তুত প্রণালী।

(২)

আমি যে নিয়মে "মকরধ্বজ" প্রস্তুত করিয়া থাকি, পূর্ব্বেই তাহার উল্লেখ করিয়াছি। এক্ষণে "মকরধ্বজ" সম্বন্ধে আরও দুই একটী কথা বলিব।

অল্প কয়েকদিন পূর্ব্বে আমার এক পৌত্র একখানা ঔষধের তালিকা পুস্তক আনিয়া আমায় দেখায় এবং রহস্য করিয়া আমাকে বলে—"দাদামশায়! তোমাদের মকরধ্বজ প্রস্তুতের সমস্ত বুজরুকী এইবার ধরা পড়িয়া গিয়াছে। এই দেখ—এই পুস্তকে লেখা রহিয়াছে—মকরধ্বজ খুব কম খরচে তৈয়ার হয়। কবিরাজেরা অনর্থক বহুমূল্য লইয়া মকরধ্বজ বিক্রয় করে। মকরধ্বজের ভরি ৪৲ টাকার বেশী হইতে পারে না।"

নাতী আমাকে বইখানা পড়িতে দিয়া চলিয়া গেল। মাধ্যাহ্নিক আহারের পর আমি বেশ অভিনিবিষ্ট হইয়াই বইখানা পড়িয়া ফেলিলাম, পড়িয়া বুঝিলাম—এক ব্যক্তি ব্রাহ্মণ হইয়াও ঔষধের ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছে, তাহার অপূর্ব্ব মূল্য-নিরূপন পুস্তিকায় সমস্ত কবিরাজের বিরুদ্ধেই এক চাতুরীময় মন্তব্য লিপিবদ্ধ হইয়াছে! বইখানা পড়িয়া আমার হাসি আসিল। কেননা ঐ ব্যক্তি লিখিয়াছে —"আমি যে গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপণ

করিলাম, তাহাতে অনেক কবিরাজই আমাদের ঘোরতর বিরোধী ও শত্রু হইয়া দাঁড়াইবে, এ বিষয় সুনিশ্চিত।" অর্থাৎ এই লোকটীর বিশ্বাস—এ যে তিন টাকায় এক সের চ্যবনপ্রাশ এবং চারি টাকায় একভরি "স্বর্ণঘটিত বিশুদ্ধ আসল মকরধ্বজ" দিতেছে—ইহাতে স্বার্থে আঘাত লাগিবে বলিয়া বঙ্গদেশের সমস্ত কবিরাজ অসন্তুষ্ট হইবেন! কিন্তু সুখের কথা—কোন শিক্ষিত কবিরাজ—এই ঢক্কানিনাদী-বিজ্ঞাপন পড়িয়া,—লোকটীর একটী কথাও প্রতিবাদ যোগ্য মনে করেন নাই। তাঁহারা জানেন—কালই আসল নকলের বিচার করিয়া দিবে। অনাদিকাল হইতে কবিরাজ মহাশয়গণ যে সম্মান উপভোগ করিয়া আসিতেছেন, একজন অজ্ঞাতকুলশীলের ব্যবসাদারী কথায় সে সম্মানের অণুমাত্রও নষ্ট হইবে না।

এই ব্যক্তি কেমন করিয়া "আসল মকরধ্বজ" সস্তায় দিতেছে, তাহার কৈফিয়ৎ দিতে ছাড়ে নাই। পাঠকগণ অগ্রে তাহার কথা গুলা পড়ুন, তাহার পর আমার বক্তব্য আমি বলিব।

"অতি পাতলা স্বর্ণপত্র ১ পল (৮ তোলা) পারদ ৮ পল (৬৪ তোলা) এবং পারদের দ্বিগুণ গন্ধক অর্থাৎ ১৬ পল (১২৮ তোলা) লইয়া একত্র কজ্জলী করিয়া ঘৃত কুমারীর রসে ভাবনা দিয়া সমতল বোতলে পূরিয়া বালুকা যন্ত্রে ৩ দিন পাক করিবে। এবং শীতল হইলে পুষ্পরেণুর ন্যায় লালবর্ণ ঔষধ উঠাইয়া লইবে।"

"পূর্ণমাত্রায় হিসাব দেখাইতে একটু অসুবিধা বলিয়া ৮ ভাগের একভাগের হিসাব দেওয়া গেল।"

"শোধিত স্বর্ণ ১ তোলা ২৫৲ টাকা + হিঙ্গুলোত্থ পারদ ৮ তোলা ৪৲ টাকা + শোধিত আমলাসা গন্ধক ১৬ তোলা ২৲ টাকা + কাষ্ঠ ১৲ টাকা + বোতল বালি, হাড়ী ইত্যাদি ১৲ টাকা + একটী দক্ষ লোকের পারিশ্রমিক ২৲ টাকা মোট ৩৫৲ টাকা। খরচ একটু বেশী করিয়াই ধরা গেল।"

*　*　*　*　*　*

"স্বর্ণ যদিও মকরধ্বজের গুণ জন্মায় কিন্তু তাহা কথনও মকরধ্বজের সহিত মিশ্রিত হয় না। বোতলের নীচে যে স্বর্ণভস্ম পড়িয়া থাকে, তাহা আয়ুর্ব্বেদোক্ত কোন ঔষধে ব্যবহৃত হইতে পারেনা বটে, কিন্তু সোহাগা দিয়া গালাইয়া পোদ্দার দোকানে বিক্রী করা যায় অথবা তাহা দ্বারা অলঙ্কারাদিও প্রস্তুত হয়। অতএব পূর্ব্ব প্রদর্শিত মোট খরচ ৩৫৲ টাকা হইতে ২৩৲ টাকা বাদ দেওয়া যাইতে পারে। ৩৫৲—২৩ = ১২৲ টাকায় অন্ততঃ ৭ তোলা মকরধ্বজ প্রস্তুত হয় অর্থাৎ প্রত্যেক তোলা মকরধ্বজে কোন ক্রমেই ২৲ টাকার অধিক খরচ পড়িতে পারেনা।"

সুতরাং এই ব্যক্তির মতে কবিরাজগণ যে ৩২৲।২৪৲।১৬৲।৮৲ টাকা দরে মকরধ্বজ বিক্রয় করেন, ইহা অতিবড় অমানুষিক নৃশংস ব্যাপার !!

আমি স্বয়ং স্বহস্তে মকরধ্বজ প্রস্তুত করিয়া থাকি। মকরধ্বজ পাক সম্বন্ধে আমার যৎকিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা আছে। সেই অভিজ্ঞতার বলে আমি বড় গলা করিয়া বলিতে পারি—বাপু হে! বৈদ্যের ব্যবসায় ধরিয়া পরিবার পালন করিতেছ, কর, তাহাতে কেহ বাধা দিবেনা, কিন্তু বি এ পাশ করিয়া বিজ্ঞান বিরুদ্ধ কথা বলিতে যাও কেন? নিজের কথাতেই

তুমি যে ধরা পড়িয়াছ। তিন দিন মকরধ্বজে জ্বাল দিতে পারে—এমন "দক্ষ লোকের" পারিশ্রমিক কি ২৲ টাকায় হয়? তুমি কি সত্যযুগের লোক? আমরা ২৫৲ টাকার কম পারিশ্রমিকে ত দক্ষ লোক পাইতেই পারিনা। ৮ ভরি হিঙ্গুলে এক ভরি পারা বাহির হয়—এটা বোধ হয় তোমার জানা আছে। এখন হিঙ্গুলের ভরি ৵০ আনা, এই হিসাবে এক পারার দামই যে ৮৲ টাকা হয়। হিঙ্গুলের দাম বাড়িয়াছে, তোমার মকরধ্বজের দাম তো বাড়ে নাই।

তোমার নিজের কি হিঙ্গুলের খনি আছে? না, "কাশীমপুরের ও ভাওয়ালের গড় এবং টেঙ্গর (পার্ব্বত্য ভূমি) নিকটে থাকাতে"—তোমাকে হিঙ্গুল কিনিতে হয় না? তুমি বোধ হয় হিঙ্গুল "সজীব অবস্থায়" "সকল সময়" "অতি সহজে" ও "সুলভে" মিলাও!

তোমার কামদুঘা দেশে—জ্বালানী কাষ্ঠ একটাকায় ৪ মণ পাওয়া যায়, কিন্তু ৩ দিন মকরধ্বজে জ্বাল দিতে যে ১২ মণেরও বেশী কাঠ লাগে! তোমার দেশের কাঠ কি বৈদিক যুগের অগ্নিমন্থ—অরণি? সে কাঠ কি অতি ধীরে ধীরে পোড়ে?

আমরা মকরধ্বজে যে স্বর্ণ দিয়া থাকি, তাহার ভস্মাবশেষ—ঔষধে প্রয়োগ করিয়া থাকি। তুমি তাহা "সোহাগা দিয়া গালাইয়া" "পোদ্দার দোকানে" বিক্রী কর, অথবা পরিবারের গহনা গড়াও! তোমার হাতের বাহাদুরী আছে। কিন্তু তুমি রসায়ন শাস্ত্রে এমনই অজ্ঞ যে—পারদ ও গন্ধক সংযোগে তিন দিন জ্বাল প্রাপ্ত হইলে স্বর্ণ যে "নিরুত্থ" ভাবে ভস্ম হইয়া যায়, সে জারিত স্বর্ণ যে আর পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারে না—এ সহজ বুদ্ধিটুকুও তোমার 'ঘটে' নাই। মকরধ্বজের বোতলের নিম্নদেশে পতিত স্বর্ণ—ঠিক ঝামার মত হইয়া যায়, তাহা আঙুল দিয়া চাপিলে ছাইএর মত চূর্ণ হইয়া যায়। তুমি তো তুমি, স্বয়ং ভরদ্বাজ, অগ্নিবেশ, অত্রি মুনিও সে স্বর্ণ "সোহাগা সংযোগে গালাইয়া"—পূর্ব্বাবস্থায় পরিণত করিতে পারেন না। ধন্য তুমি—সমস্ত বাঙ্গালা দেশটাকে ন্যাকা বুঝাইয়া দিতে চাও! তুমি যখন এত বড় রাসায়নিক—ভস্ম সোণাকেও আসল সোণা করিতে পার—তখন নিশ্চয়ই মুকুন্দ সূরি রচিত "রস-হৃদয়" গ্রন্থখানা পড়িয়াছ। তিনি কি বলিয়াছেন, একবার পড়িয়া দেখ;—

"রসস্যৈকং দ্বিধা গন্ধং সদ্ধেম রসপাদিকং
মৃণ্মূষাভ্যন্তরে ক্ষিপ্ত্বা পুটেৎত্রিংশদ্বনোপলৈঃ
এবং পুটদ্বয়াৎ স্বর্ণং নিরুত্থং ভস্মজায়তে।

রস-হৃদয়।

অর্থাৎ একভাগ পারদ, দুইভাগ গন্ধকের সহিত, পারদের সিকিভাগ স্বর্ণকে মূষার মধ্যে রাখিয়া ত্রিশখানি বিল ঘুঁটিয়ার দ্বারা পুট দিবে। এইরূপ দুইটী পুটে স্বর্ণ নিরুত্থ ভস্ম হইয়া থাকে। "নিরুত্থং যৎ পুনর্নজীবতি"—ইতি ভাব মিশ্র। ধাতু যেরূপ ভাবে ভস্ম হইলে, আর পুনর্জীবিত অর্থাৎ পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয় না,—তাহার নামই নিরুত্থ। ৬০ খানি ঘুঁটিয়ার জ্বালেই যখন স্বর্ণ নিরুত্থ ভস্ম হয়, তখন ৩ দিনের ক্রমাগত জ্বালে কি হয় ভাব দেখি।

রসজ্ঞ পাঠক! বোধ হয় এইবার বুঝিয়াছেন—পারা ও গন্ধক সংযোগে পাচিত স্বর্ণ আর পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয় না। এরূপ অসম্ভবকে সম্ভব করিতে যিনি সক্ষম, তিনি মানুষ নহেন, তিনি সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর!

এক্ষণে পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন—"তবে ৪৲ টাকায় এক ভরি মকরধ্বজ অন্যে বিক্রয় করে কেমন করিয়া ?"
আমিই উত্তর দিতেছি।

অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন—বরিশাল জেলার কাউগাছী গ্রাম, যশোহর জেলার সিন্ধানী গ্রাম এবং পূর্ব্ববঙ্গের অন্য কতকগুলি গ্রাম হইতে—কায়স্থ এবং জুগী জাতীয় ঔষধ বিক্রেতারা মধ্যে মধ্যে ঔষধ বিক্রয় করিবার জন্য দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া থাকে। ইহাদের প্রত্যেকের সঙ্গে এক একটী টিনের বাক্স—বাক্সটী লালবর্ণের "খেরো" বস্ত্রে মণ্ডিত। এই বাক্সে বিক্রেতাগণ "লৌহ" "তাম্র" "বঙ্গ" "খর্পর" "স্বর্ণবঙ্গ" "রসসিন্দুর" প্রভৃতি ধাত্বৌষধ লইয়া—বৈদ্য-ব্যবসায়ীগণের দ্বারে উপস্থিত হয়। ক্রেতাকে ইহারা ১৲ টাকায় ৮ ভরি "সহস্র পুটিত লৌহ" ১০ ভরি "সহস্র পুটিত অভ্র", ৪ ভরি "বঙ্গ" ও "স্বর্ণবঙ্গ", ১৬ ভরি 'খর্পর' এবং ৪ ভরি "রস সিন্দুর" বিক্রয় করিয়া থাকে। অনেকেই না জানিয়া ইহাদের নিকটে—ধাতুদ্রব্য কিনিয়া থাকেন। কিন্তু ইহারা যে লৌহের পরিবর্ত্তে গেরিমাটী, অভ্রের পরিবর্ত্তে অভ্রচূর্ণ মিশ্রিত-উনানের দগ্ধ মৃত্তিকা, (পাছে কেহ অভ্র বলিয়া বিশ্বাস না করে, সেইজন্য ইহারা কাঁচা অভ্রের বস্ত্র গালিত সূক্ষ্মচূর্ণ—পোড়ামাটীর সহিত মিশায়) বঙ্গের পরিবর্ত্তে হোয়াইট লেড বা রং সফেদা, খর্পরের পরিবর্ত্তে বিলাতীমাটী দিয়া খরিদ্দারগণকে প্রবঞ্চিত করে,—এখন অনেকেই তাহা জানিতে পারিয়াছেন। ইহাদের প্রস্তুত "রস সিন্দুর" অতি উজ্জ্বলবর্ণ, তাহার চটি—দিব্য পরিপাটী, মূল্যও কত সুলভ—একটাকায় ৪ ভরি! এই "রস সিন্দুরই"—শিব কণ্ঠস্থিত সর্পের মত কখনও "আসল স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজ, কখনও "ষড়্গুণ বলিজারিত সিদ্ধ মকরধ্বজ", কখনও বা "স্বর্ণসিন্দুর" নামে—আলমারীর শিশিতে স-গৌরবে শোভা পাইয়া থাকে। এখন পাঠক মহাশয় বিবেচনা করিয়া দেখুন—এক টাকায় ৪ ভরি "মকরধ্বজ" কিনিয়া, তাহার প্রত্যেক তোলা আমি যদি প্রলোভন পূর্ণ বিজ্ঞাপনের সাহায্যে ৪৲ টাকা দরে বিক্রয় করি, তাহা হইলে ১৲ টাকায় আমার ১৫৲ টাকা লাভ হয় কিনা ?

এই সকল "লৌহ-অভ্র-মকরধ্বজ" বিক্রয় কারিগণ—ইহাদের কুলক্রমাগত শিক্ষার ফলে ৩ ঘণ্টায় এক পাক "মকরধ্বজ" প্রস্তুত করিতে পারে। এই "মকরধ্বজ" হিঙ্গুলেরই রূপান্তর মাত্র। সামান্য পারিশ্রমিক পাইলে এবং এক বেলা পেট ভরিয়া খাইতে দিলে—ইহারাই কবিরাজের বাটীতে বসিয়া তথা-কথিত "মকর ধ্বজ' পাক করিয়া দেয়। পারায় জ্বাল দিলে বংশ থাকেনা—যাহাদের মনে এইরূপ ভয় আছে, তাঁহারা ইহাদের দ্বারাই "রস সিন্দুর' ওরফে "মকরধ্বজ" প্রস্তুত করাইয়া লন। রসসিন্দুরকে সুদৃশ্য চাকচিক্যশালী করিবার জন্য ইহারা কজ্জলীর সঙ্গে মনছাল এবং তাম্র চূর্ণ মিশ্রিত করে। ইহাতে চটি বেশ ঝকঝকে এবং পাতলা হয়, কখনও বা ময়ুরপুচ্ছের চন্দ্রিকার মত বিচিত্র বর্ণের আভাও ধারণ করে।

কিন্তু, যাহা প্রকৃত 'মকরধ্বজ', তাহা কখনই অল্প মূল্যে বিক্রীত হইতে পারে না। আমি ইহার উদাহরণ দিতেছি। ভারতের অদ্বিতীয় বৈজ্ঞানিক ডাঃ পি,সি রায়, যাহার প্রতিষ্ঠাতা, সেই জগদ্বিখ্যাত বেঙ্গলকেমিকেল ও ফার্ম্মাসিটিকেল ওয়ার্কসে—আজ কাল মকর

ধ্বজ প্রস্তুত হইতেছে, এ মকরধ্বজের কাটতিও খুব, কিন্তু এই ঔষধালয়ের সুবিজ্ঞ কার্য্যাধক্ষ —৪৲ চারি টাকায় ১ ভরি মকরধ্বজ বিক্রয় করেন না। ডাক্তার কার্ত্তিক চন্দ্র বসু এম বি —তাঁহার প্রসিদ্ধ ল্যাবরেটরীতে বিশুদ্ধ "মকর-ধ্বজ" প্রস্তুত করিতেছেন, তিনিও ১৬৲ টাকা ও ২৪৲ টাকার কমে "মকরধ্বজ" বিক্রয় করেন না। বসুর ল্যাবরেটরীর "মকরধ্বজ"ও লোকে আদর করিয়া কিনিয়া থাকে। বেঙ্গল কেমিকেল এবং বসুর ল্যাবরেটরীতে—এক সপ্তাহ মকরধ্বজের মুল্য ৸৵০ চৌদ্দ আনা। মকরধ্বজ যদি সস্তা দামে বিক্রয় করা সম্ভব হইত, তবে সর্ব্বাগ্রে এই উভয় কারখানার সত্বাধিকারিগণ সস্তায় দিতে পারিতেন।

এইবার "মকরধ্বজের" অনুপানের একটু আলোচনা করা যাউক। পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণ—যিনি বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়া "চূড়ান্ত সস্তায় ঔষধ বিক্রয় করিয়া থাকেন," তিনি মকরধ্বজ সেবনের এক অনুপানের তালিকাও ছাপিয়া-ছেন। নহিলে অনুষ্ঠানের ক্রটি হইবে যে! পাঠক মহাশয়! একটু নমুনা দেখিবেন কি? যথা ;—

"স্নায়বিক দুর্ব্বলতা ও বায়ুর জন্য—চাউল ধোয়া জল ও মিশ্রী অথবা মাখন বা দুধের সর এবং মিশ্রী, ত্রিফলা (হরিতকী বহেড়া আমলকী) ভিজানো জল, মিশ্রি অথবা বাদাম কিম্বা বড় এলাচি বাটা মিশ্রী * * বৈকালে উপযুক্ত মাত্রায় মকরধ্বজ সেবনীয়।"

"পিত্ত রোগে—ধনে মৌরী ভিজান জল মিশ্রী সহ অথবা গুলঞ্চ বা পটোল পাতার রস মধু সহ প্রাতে উপযুক্ত মাত্রায় মকরধ্বজ সেব্য।"

"কফরোগে—আদার রস মধু অথবা আদার রস মিশ্রী সহ কিম্বা তুলসী পাতার রস আদা ও মধুসহ, পানের রস মিশ্রী কিম্বা পিঁপুল চূর্ণ ও মধু সহ মকরধ্বজ সেব্য।"

"নব জ্বরে—তুলসী পাতার রস, পানের রস আদার রস মধু অথবা পানের রস, সৈন্ধব লবণ (শরীরে বেদনা থাকিলে) বেল পাতার রস ও মধু সহ মকরধ্বজ সেব্য।"

"পুরাতন জ্বরে—সেফালিকা পাতার রস মধু বা গুলঞ্চের রস মধু অথবা চিরতা ভিজান জল মধু সহ সেব্য।"

"প্রমেহ রোগে—কাঁচা হরিদ্রা রস মধু বা কেশুর্ত্তার রস মধু অথবা কাবাব চিনী চূর্ণ মধু কিম্বা গঁদ বা ঈসবগুল ভিজান জল মিশ্রী সহ * * সেব্য।"

"অর্শোরোগে—নাগেশ্বর ফুলের রেণু চূর্ণ এবং মাখন মিশ্রী অথবা গাঁদা ফুলের পাতার রস ও সাফ চিনী সহ কিম্বা যমানী চূর্ণ বিট লবণ ও ঘোল সহ * * সেব্য।"

মকরধ্বজের এইরূপ অনুপানের সুদীর্ঘ তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে। অধিক উদ্ধৃত করিব না। এক কথায় ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে,—যে যে মুষ্টিযোগে যে যে রোগ ভাল হয়—ব্যবসায়ী বাবুটীর পুস্তকে তাহা অবিকল উদ্ধৃত হইয়াছে। রসুন বাটা, এরণ্ডমুল, কিছুই বাদ যায় নাই। দুঃখের বিষয়—শাস্ত্রে এরূপ অনুপানে মকরধ্বজ সেবনের ব্যবস্থা আদৌ লিখিত হয় নাই। বাবু যে রোগে যে টোটকার ব্যবহার দেখিয়াছেন তাহাই মকর ধ্বজের অনুপান করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আমার বক্তব্য—ঐ সকল অনুপান শুধু সেবন করিলেই ত ফল পাওয়া যায়। উহার সঙ্গে "মকরধ্বজ" মিশাইবার প্রয়োজন কি? কাঁচা হলুদের রস মধুসহ সেবনে প্রমেহ রোগ আরোগ্য হয়,—তবে ইহার সঙ্গে মকরধ্বজ প্রয়োগের

সার্থকতা কোথায়? ঘুঁটেরছাই, সিউলী পাতার রসের সহিত সেবন করিলে পুরাতন জ্বর ভাল হইতে পারে। এ আরোগ্য ফল—সিউলী পাতারই প্রাপ্য, ঘুঁটের ছাইয়ের নহে। ইহার দ্বারা ঘুঁটের ছাইএর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করা যায় না। অনুপানের অর্থ—ঔষধের সহিত কোনও বিকট বিস্বাদ পদার্থের মিশ্রণ নহে। অনুপান অর্থে পশ্চাৎ পান বুঝায়। ঔষধ সেবন করিয়া মুখ বিকৃত হইলে, সেই বিকৃতি সংশোধনের জন্য যাহা সেবন বা চর্ব্বণ করা যায়—তাহারই নাম "অনুপান"। এই সাদা কথাটা যে বুঝেনা, সে যদি আপনাকে আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ বলিয়া জাহির করিতে চায়, হাসি পায় না কি?

পরিভাষায় বৈদ্যরাজ শ্রীকণ্ঠ বলিয়াছেন—

ভক্ষয়েৎ ভেষজং মুখ্যং জলৈর্ব্বা মধুনা সহ।
ক্ষীরমিক্ষুরসং যূষমনুপানং প্রশস্যতে॥

ধাতুঘটিত মুখ্য ঔষধ জল অথবা মধুর সহিত মাড়িয়া খাইবে। অনন্তর দুগ্ধ, ইক্ষুরস, মুদ্গ বা মসূরাদির যূষ অনুপান করিবে। বলা বাহুল্য মকরধ্বজ একটী মুখ্য ভেষজ - ইহা অকৃত্রিম হইলে কেবল মধু দিয়া মাড়িয়া খাইলেই যথেষ্ট। সেবনান্তে ইচ্ছামত দুগ্ধাদি পান করিতে পার। ইহাই হইতেছে অনুপান। রসুনবাটা, পলতা ছেঁচা, এরণ্ড মূলের রস, প্রভৃতির দ্বারা মকরধ্বজ মাড়িয়া খাওয়া—আয়ুর্ব্বেদ সম্মত নিয়ম নহে। উহার নাম অনুপান নহে, উহা সহপান। তোমরা এইরূপ উৎকট উদ্ভট বিকট স্বরস কল্ক চূর্ণাদি—ঔষধের সহিত মিশাইবার ব্যবস্থা দিয়া,লোকের পক্ষে কবিরাজী ঔষধ সেবন—বিভীষিকাময় করিয়া তুলিয়াছ। তোমাদের মত শাস্ত্রে অনধিকারী অথচ অহঙ্কারে স্ফীত ব্যক্তির সহিত তর্ক করিতেও আমাদের প্রবৃত্তি হয় না।

কত ওজনের মসলা আগুণে চড়াইলে, কতটা মাল উৎপন্ন হইতে পারে, এ জ্ঞানও তোমার নাই। কেননা তুমি যে ৮ ভাগের এক ভাগের হিসাব দিয়াছ, তাহাতে ৭ ভরি মকরধ্বজ উৎপন্ন হইতে পারে না। বিশেষতঃ ৩ দিন পাক করিলে পারা অনেকটা উড়িয়া যায়। এমন কি, সাড়ে তিন ভরি কিম্বা পৌনে চার ভরির বেশী মাল জন্মে না। তুমি নিজে "কাজের কাজী" নহ, কেবল পরের কথায় বিশ্বাস করিয়া হিসাব দিয়াছ! আগে নিজে মানুষ হও, পরে—অপরের কার্য্যের সমালোচনা করিও। নহিলে তোমাকে দেখিয়া বৈদ্য সমাজ "ভূতাপ সরণ" মন্ত্রই পাঠ করিবে।

শ্রীসদানন্দ সেন গুপ্ত।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

-:*:-

বিদ্যালয়ের তৃতীয় বর্ষ।—করুণাময় জগদীশ্বরের অপার করুণাবলে অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় বর্ষ পূর্ণ হইয়া আসিল। এইবার এই বিদ্যালয় তৃতীয় বর্ষে পদার্পণ করিবে। লুপ্তপ্রায় আয়ুর্ব্বেদের পুনরুদ্ধারের জন্যই এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা। বর্ত্তমান সময়ের আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণ অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদের চিকিৎসা যে ভুলিয়া গিয়াছেন, এ কথা

অস্বীকার করিবার যো নাই। যতগুলি কারণে আয়ুর্ব্বে[illegible]য় চিকিৎসার অবনতি ঘটিয়াছে,—[illegible] মণ্ডলী অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদে [illegible] তাহার সর্ব্বপ্রধান কারণ। এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠায় ছাত্রগণকে সেই লুপ্তপ্রায় আয়ুর্ব্বেদের শিক্ষাই যত্নপূর্ব্বক দেওয়া হইতেছে। সুতরাং এই বিদ্যালয় হইতে উত্তীর্ণ ছাত্রগণ কায়-চিকিৎসার মত কাটাকাড়া, পোয়াতিখালাস প্রভৃতি সকল প্রকার চিকিৎসাতেই কৃতিত্ব লাভ করিয়া আয়ুর্ব্বেদের গৌরব বর্দ্ধনে যে সক্ষম হইবে, সে পক্ষে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

বৈদ্যের কর্ত্তব্য।—চিকিৎসা বৃত্তিতে বৈদ্যজাতির যেরূপ গৌরব, এমন আর কিছুতে নাই। রাজা—মহারাজা হইতে আরম্ভ করিয়া সামান্য গৃহস্থ পর্য্যন্ত—সকলকেই চিকিৎসকের বশ্যতা স্বীকার করিতে হয়। পক্ষান্তরে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি লাভে বঞ্চিত হইয়া যাঁহারা জীবিকা নির্ব্বাহের কোন পন্থাই স্থির করিতে পারিতেছেন না, তাঁহাদিগের পক্ষে পাঁচ বৎসর কাল অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদের শিক্ষা সমাপ্তি পূর্ব্বক স্বাধীন বৃত্তি অবলম্বনের,ইহা যে মাহেন্দ্র সুযোগ, সে কথা স্বীকার করিতেই হইবে। চিকিৎসায় সিদ্ধিলাভ করিলে অর্থপ্রাপ্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহের চিন্তা তো থাকেই না, তদ্ভিন্ন মিত্রতা, ধর্ম্মসঞ্চয় এবং যশঃ লাভও যে ইহা দ্বারা ঘটিয়া থাকে ইহা সুনিশ্চয়। সেইজন্য আমরা অণ্ডার গ্রাজুয়েট ছাত্রবৃন্দকে—পরামর্শ প্রদান করিতেছি, তাঁহারা সামান্য চাকরির চেষ্টায় সময় নষ্ট না করিয়া এই নূতন সেসন্সের আরব্ধ কালেই অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইয়া আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষায় মনোভিনিবেশপূর্ব্বক নিজের জীবিকা নির্ব্বাহের সংস্থান এবং সেই সঙ্গে দেশের-দশের-সমাজের মঙ্গল সাধনে যত্নবান হউন। পরোপকার করিবার এরূপ বৃত্তি জগতে যে আর একটিও নাই।

আয়ুর্ব্বেদের উপর আবগারি।—গত ১৭ই জ্যৈষ্ঠের "হিতবাদী"তে ঢাকা হইতে শ্রীযুক্ত রাখাল চন্দ্র দত্ত কবিরাজ একখানি পত্র প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে প্রকাশ,—

"প্রায় দুইমাস হইল একটি সাহেব Excise Inspector ঢাকা বাবু বাজারস্থিত কবিরাজ শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র কবিরঞ্জন মহাশয়ের একটি রোহিত কারিষ্টের বোতল খরিদ করিয়া কবিরাজ মহাশয়ের সম্মুখেই খুলিয়া লইয়া যান। ইহাতে নাকি Chemical Examinationএ শত করা ৫৭ এলকোহল পাওয়া গিয়াছে। সেই উপলক্ষে গত কল্য সন্ধ্যাকালে কবিরাজ মহাশয়কে গ্রেপ্তার করিয়া অদ্য ম্যাজিষ্ট্রেট সমক্ষে উপস্থিত হইবার জন্য জামিন লওয়া হইয়াছে। গতকল্য কবিরাজ মহাশয়ের দোকানের অমৃতারিষ্ট প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার অরিষ্টই পুলিশ লইয়া গিয়াছে।"

বিচারে ইহার কি হইল, তাহা এখনও প্রকাশ হয় নাই, সুতরাং সে সম্বন্ধে আমরা কিছু বলিবনা, তবে কবিরাজী আসব এবং অরিষ্টে যে অ্যালকোহলের বিন্দুমাত্রও পাওয়া যায় না—ইহাতো নিশ্চয় কথা, সেই জন্য ধৃত কবিরাজ মহাশয়ের আসবাদিতে কি করিয়া অ্যালকোহল পাওয়া গেল, তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছিনা। মৃত সঞ্জীবনীর মত যে ঔষধ চুঁয়াইয়া প্রস্তুত করা হয়, তাহাতে অ্যালকোহল আছে এবং সেইজন্য সে ঔষধের প্রচলন দেশ হইতে একরূপ লোপই পাইয়াছে। আসব এবং অরিষ্টকেও যদি সেই শ্রেণীতে ফেলা হয়, তাহা হইলে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা করা যে দায় হইয়া উঠিবে। যাহা হউক আমরা এই মকদ্দমার বিচার ফল জানিবার জন্য উৎসুক রহিলাম।

মাসিকপত্র ও সমালোচক।

২য় বর্ষ। } বঙ্গাব্দ ১৩২৫—শ্রাবণ। { ১১শ সংখ্যা।

কাজের কথা।

বালক-রক্ষা।—বাঙ্গালীর অকালমৃত্যুর পরিমাণ যত অধিক, পৃথিবীর কোনো দেশে আর এমনটা নাই। ইহার প্রধান কারণ বাঙ্গালীর ব্রহ্মচর্য্যের অভাব। একদিন অবশ্য এমনটা ছিল না, একদিন বাঙ্গালী ব্রহ্মচর্য্য-পালনই ধর্ম্মরক্ষার মূলগ্রন্থি বলিয়া মনে করিত। তাহার ফলে বাঙ্গালী-বালকের গুরুগৃহে অধ্যয়নের সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষার ব্যবস্থা হইত। এখন সে পদ্ধতি দেশ হইতে লোপ পাইয়াছে, ফলে চিররুগ্ন-বাঙ্গালীজাতি পরমায়ু থাকিতেও মৃত্যুকে প্রিয় সুহৃদ জ্ঞানে অকালে আলিঙ্গন করিতেছে।

* * * *

ব্যাধির কারণ।—ব্যাধির কারণ যে পাপ-প্রবণতা, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। আজি বাঙ্গালীর শতকরা নিরানব্বই জন ডিস্‌পেপসিয়া বা অজীর্ণ রোগগ্রস্থ কেন?—ব্রহ্মচর্য্যের অভাবে পাপের প্রসার বৃদ্ধিই তাহার কারণ। অজীর্ণরোগে ভুক্ত অন্ন সম্যকরূপে পরিপাক প্রাপ্ত হয় না কেন?—অগ্নির অভাবে। পরিপাক ক্রিয়ার সম্পাদন করাই তো অগ্নির কার্য্য, তবে তাহার ব্যতিক্রমের কারণ কি?—পাপ সঞ্চয়। শুক্ররক্ষা জঠরাগ্নির ক্রিয়া সম্পাদনের মূল। বাঙ্গালী সেই শুক্র রক্ষার অভাবে যে পাপ সঞ্চয় করিতেছে, বাঙ্গালীর অজীর্ণ তাহারই মুখ্যতম কারণ। আজি অজীর্ণ সারাইবার জন্য বাঙ্গালী ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু সে অজীর্ণ সারিবে কেমন করিয়া! আগে শুক্ররক্ষার চেষ্টা কর, তাহার পর রোগ আরোগ্যের চেষ্টা করিও।

* * * *

অকাল মৃত্যু।—শুক্রক্ষয়ই অকাল মৃত্যুর সর্ব্বপ্রধান কারণ। শুক্ররক্ষা করিতে পারিলে, যে সকল সন্তান-সন্ততি জন্মগ্রহণ করে, তাহারা সবল, সুস্থ ও দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া থাকে। বাঙ্গালী অপেক্ষা অন্যান্য জাতি

এই জন্যই সবল, সুস্থ ও দীর্ঘায়ু। তাহার পর পিতামাতার মনোপ্রবৃত্তির সহিত অপত্য কুলের মনো প্রবৃত্তি স্বভাবতঃই সুসম্বদ্ধ। কাজেই ব্রহ্মচর্য্য বিহীন পিতামাতার বংশধরগণ যে শুক্ররক্ষায় একান্ত উদাসীন হইবে, তাহা তো নিশ্চয় কথা। বালক রক্ষা করিতে হইলে,—সমাজ রক্ষা করিতে হইলে—দেশ রক্ষা করিতে হইলে—আমাদিগকে এ সকল বিষয় বিশেষরূপে চিন্তা করিতে হইবে। প্রত্যেক জনক-জননীকে অপত্যগণের দীর্ঘ জীবন-কামনায় নিষ্কলঙ্ক চরিত্র—আদর্শ পুরুষ-প্রকৃতি হইতে হইবে,—শুধু বচনে চলিবেনা —কার্য্যতঃ ব্রহ্মচর্য্যরক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। বালক-রক্ষার—বাঙ্গালী-রক্ষার ইহা ভিন্ন আর অন্য উপায় নাই।

* * * *

ছাত্রজীবনে ব্রহ্মচর্য্য।—ছাত্র জীবনে ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা দিবার জন্য শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণ একটু চিন্তাশীল হইয়াছেন জানিয়া আমরা সুখী হইয়াছি, কিন্তু এ শিক্ষাটা অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়ের মত একান্ত প্রয়োজনীয় হইবে না। আমাদের মনে হয় এ শিক্ষাটাও অন্যান্য শিক্ষার মত একান্ত প্রয়োজনীয় হইলে মন্দ হইত না। আমাদের দেশের বালকগণ অধঃপতনের পথ কিরূপ পরিষ্কার করিতেছে, রেলে-ষ্টীমারে এবং কলিকাতার সৌধগুলির দেওয়ালগুলি লক্ষ্য করিলেই তাহার যাথার্থ্য নির্ণীত হইতে পারে। বালকগণের পাপাশক্তির আবেশ উচ্ছ্বাস যখন প্রবল হইয়া পড়ে, তখনই এই সকল স্থলে কুৎসিত কথা লিখিয়া তাহাদিগের শিরিষ-কুসুম-সুকোমল-হস্ত কলুষিত করিতে তাহারা কুণ্ঠিত হয় না। দেশের চিন্তাশীলগণ এ সকল বিষয় পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন কি? এই সকল বিভৎস ব্যাপার যখনই আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইয়া থাকে, তখনই আমরা দেশের অধঃপতন কতটা গড়াইয়াছে, বুঝিতে পারি,—বুঝিয়া মর্ম্মাহত হই; কিন্তু প্রতীকার করিবার উপায় আমাদের ক্ষমতা-বহির্ভূত।

* * * *

প্রতীকারের উপায়।—প্রতীকারের উপায় কিন্তু আছে, তবে সে উপায়টার জন্য আমাদিগকে রাজকীয় শাসনের শরণ গ্রহণ করিতে হইবে। প্রাসাদের দেওয়ালে হউক, রেল গাড়ীতে বা ষ্টীমারে হউক—কেহ ঐরূপ লিখিতেছে দেখিলেই, আগে আইনের বন্ধন আঁটিবার ব্যবস্থা করিয়া, পুলিশ কর্ম্মচারীর হস্তে তাহাদিগকে অর্পণ করিতে হইবে। যদি এইরূপ ব্যবস্থা করা হয়, তাহা হইলে এরূপ কুৎসিত লেখার চলনটা হাটে-ঘাটে আর দেখিতে পাওয়া যাইবে না। এরূপ লেখার ফলে—যাহারা ঐরূপ লিখিয়া থাকে —শুধু তাহাদেরই যে অবনতি ঘটিতেছে তাহা নহে, এরূপ লেখা পাঠ করিয়া অনেক চরিত্রবান-বালকও চরিত্রহীনতার পথে উপস্থিত হইবার সুযোগ পাইতেছে। বাস্তবিকই আমরা যখন রেল বা ষ্টীমার যোগে গমন করি, তখন আমাদের সহিত আমাদের সন্তান-সন্ততি বা ঐ শ্রেণীর কেহ থাকিলে, লজ্জায়—ঘৃণায় অধোবদন হইয়া থাকি। ইহার প্রতীকারের জন্য কর্ত্তৃপক্ষগণের যে হস্তক্ষেপ করা অত্যন্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

শ্রীসত্যচরণ সেন গুপ্ত কবিরঞ্জন।

হোমিওপ্যাথি—আয়ুর্ব্বেদ সমুদ্রের একটী তরঙ্গ।

বর্ষকাল পূর্ব্বে, এই "আয়ুর্ব্বেদেরই" অবতরণিকায় আমরা লিখিয়াছিলাম—"আয়ুর্ব্বেদ একটী মহা সমুদ্র, অ্যালোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি, হাইড্রোপ্যাথি, টিস্যুরেমিডি, হাকিমী—সেই মহা সমুদ্রের এক একটী তরঙ্গ।" আজ আবার সেই কথার পুনরুক্তি করিতেছি।

আমেরিকার অদ্বিতীয় হোমিওপ্যাথ, ডাক্তার ন্যাশ্—তাঁহার অসাধারণ অভিজ্ঞতা ও কর্ম্মক্ষেত্রের যুক্তিময়ী গবেষণা—একখানি ক্ষুদ্র পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। ঐ পুস্তক খানির নাম—How to take the case. সম্প্রতি ঐ পুস্তকের এক সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। বন্ধুবর ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এল্ এম্ এস্—এই পুস্তকখানি আমাদিগকে পড়িতে দিয়াছেন। গ্রন্থের বিশেষত্ব—গ্রন্থকার প্রকৃত সাধকের ন্যায় হোমিওপ্যাথির বিজ্ঞান-বৈচিত্র্যকে মহত্তর করিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার অপূর্ব্ব লিপি-কৌশলে, মহা প্রলয়ের নিরালোক শূন্যতা—অভয়হস্তের সেবা-সান্ত্বনায় ভরিয়া উঠিয়াছে। গ্রন্থের প্রত্যেক অধ্যায়ে আমরা এক ত্যাগশীল তপস্বীর উদার হৃদয়ের পূর্ণ পরিচয় পাইয়াছি।

এখন বাঙ্গালার ঘরে ঘরে—"পল্‌সেটিলা-নক্স-সম্বলিত বক্স!" অনেকের ধারণা—হোমিওপ্যাথি ঔষধে উপকার না হইলেও অপকার হয় না। এইরূপ হোমিওপ্যাথকে সম্বোধন করিয়া ডাক্তার বলিতেছেন—"উপযুক্ত ঔষধ প্রয়োগে শরীর হইতে যেমন উৎকট ব্যাধি দূরীভূত হয়, তেমনি অনুপযুক্ত ঔষধ প্রয়োগে নূতন ব্যাধির সৃষ্টি হয়। সুস্থের প্রাণ বিনাশ করিবার ক্ষমতা যদি আমাদের ঔষধের না থাকে, তবে অসুস্থকে আরোগ্য করিবার ক্ষমতাও তাহার নাই।" কেমন সরল সুন্দর সত্য কথা! গ্রন্থকার আরও বলিয়াছেন—"একখানা তীক্ষ্ণ ধার ক্ষুর ব্যবহারে যেরূপ বিপদের সম্ভাবনা, ঔষধের অনুপযুক্ত ব্যবহারেও তদ্রূপ বিপদের সম্ভাবনা। * * এই সকল ঔষধ দ্বারা যেরূপ মহা উপকার সাধন করা যাইতে পারে, তদ্রূপ মহা অনিষ্টও করা যাইতে পারে।"

যাঁহারা বলেন হোমিওপ্যাথি ঔষধে উপকার না হইলেও কোন অপকার হয় না;—আশা করি আস্ফালন করিবার পূর্ব্বে, তাঁহারা ডাক্তার ন্যাশের কথাটা একবার ভাবিয়া দেখিবেন। যাঁহারা হোমিওপ্যাথি-বিজ্ঞানের রহস্য বুঝেন না, তাঁহারা হোমিওপ্যাথি ঔষধের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের জন্য যে সকল কৌশল অবলম্বন করেন, পূর্ব্বোক্ত মন্তব্যটী (অর্থাৎ হোমিও ঔষধের দ্বারা অপকার হয় না) তাহার অন্যতম। এইরূপ যুক্তিহীন মতবাদীগণকে আমরা মহাত্মা কেণ্ট ও ডাক্তার ন্যাশের উপদেশ অনুধাবন করিতে পরামর্শ দিতেছি।

ডাক্তার ন্যাশ হোমিওপ্যাথিকে বড় করিবার জন্য আর একটী কথা বলিয়াছেন। নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল।

"হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে কোনও রোগী নীরোগ হয়ও নাই,

হইবেও না। কারণ এই চিকিৎসা ভিন্ন রোগের সমূল উৎপাটন করিবার আর অন্য পন্থা নাই।" একথাটা অবশ্যই ন্যাশ সাহেব অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসাকে লক্ষ্য করিয়াই বলিয়াছেন; আমরা কিন্তু হোমিপপ্যাথির এই দাবীটুকু সমূলক বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিতেছি না। ডাক্তার ন্যাশ যদি মনোযোগ দিয়া ভারতের আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র পাঠ করিতেন, আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি—নিশ্চয়ই তাঁহার মতের পরিবর্ত্তন ঘটিত। কেননা আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধগুলি রোগীর নির্গদ-রূপে ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণ কর্ত্তৃক পরিকল্পিত হইয়াছিল। তাহা শিশ্নোদর-পরায়ণ-মানব মস্তিষ্কের বৈজ্ঞানিক বুদ্বুদ নহে। আয়ুর্ব্বেদের যুক্তি ব্যাপাশ্রয় চিকিৎসা, আজ যাহাকে "হয়" বলিয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, কাল তাহাকে "নয়" বলিয়া বিসর্জ্জন দিতে পারে নাই। বিশেষতঃ আয়ুর্ব্বেদ বেত্তাগণ—যেরূপ অমানুষিক প্রতিভাবলে ব্যাধির স্বরূপ নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন,—সেরূপ প্রতিভা স্বল্পজীবী কলির মানবে বিকশিত হইতে পারে না। তবে ইহাও নিশ্চয়—আমরা সে লোকাতীত জ্ঞানের যথার্থ উত্তরাধিকারী নহি।

ডাক্তার ন্যাশ যে হোমিওপ্যাথির একনিষ্ঠ সাধক, সেই হোমিওপ্যাথিও—ভারতের আয়ুর্ব্বেদের অঙ্গীভূত। আয়ুর্ব্বেদ সমুদ্র, হোমিওপ্যাথি তাহার একটী তরঙ্গ মাত্র। এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে অতি সংক্ষেপে আমরা তাহা দেখাইয়া দিব।

জগতে সকল শক্তির ন্যায় জীবনী শক্তিরও বিকাশের পথ ব্যোমিক বিস্ফুরণের ভিতর দিয়া। প্রণব—এই বিস্ফুরণের সঙ্কেত। তুমি, আমি, বৃক্ষ, লতা, বিশ্বের যাহা কিছু সর্ব্বস্ব—সমস্তই ওঁকার বা আদিম বিস্ফুরণের প্রসব। তোমার আমার দৈহিক পরমাণুপুঞ্জ নিয়তই বিস্ফুরণশীল। য়ুরোপের বিজ্ঞানে ইহারই নাম "অ্যাটমিক মুভমেণ্ট।" যে কোন কারণেই হউক—এই আনবিক স্ফুরণের সাম্যাবস্থা নষ্ট হইলে তাহাকে বিকার বা রোগ বলে। আত্মজ্ঞ জীবনী শক্তি—পুরুষ-শরীরের সর্ব্বত্র ব্যাপী, শরীরের সূক্ষ্ম (অনু ধাতু) উপাদানের উপর আদেশ চালাইয়া—এই পুরুষই আপনার ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা অভিব্যক্ত করেন। ঋষিকল্প বৈজ্ঞানিক হানিমান বলিয়াছেন—

When a person falls ill, it is only this spiritual self acting vital force, every where Present in the organism, that is Primurily deranged by the dynamic influence of a morbific agent inmical to life or genon. বিজ্ঞান যেখানে সত্য প্রচার করিতেছে সেখানে হারীত ও হ্যানিমানে প্রভেদ কোথায়?

ধন্বন্তরি কল্প বাগভট একজন পাকা বৈজ্ঞানিক ছিলেন। বাগ্‌ভট বলিয়াছেন—"লক্ষণ ভিন্ন ব্যাধির স্বরূপ মানুষে জানিতে পারে না।" পঞ্চ-তন্মাত্র স্পৃষ্টা প্রকৃতি দ্রৌপদীকে বিবসনা করিয়া, তাহার স্বরূপ দেখিবার শক্তি কাহার আছে? বিপর্য্যস্ত প্রকৃতির আর্ত্তস্বরের নামই ব্যাধি; প্রকৃতি যখন প্রকৃতস্থা হইবার জন্য মানবের সাহায্য প্রার্থনা করেন, তখন তিনি নিজের অভাব অভ্রান্ত রূপেই ব্যক্ত করিয়া থাকেন। শবচ্ছেদের প্রয়োজন নাই, শারীর তত্ত্ব নিরূপণের জন্য নর-বলি অনাবশ্যক; লক্ষণই সব। সম্পূর্ণ লক্ষণে সম্পূর্ণ রোগ ধরা পড়ে।

কার্য্যও কারণ একই পদার্থ।" এই বাগ্‌ভটের যুগেই পৃথিবীতে প্রথম লাক্ষণিক চিকিৎসার আবির্ভাব হইয়াছিল। এই মহাকথাই, বহু শতাব্দি পরে, মহাত্মা হ্যানিমানের কর্ণে প্রতিধ্বনি তুলিয়াছিল।

আয়ুর্ব্বেদের "সদৃশ সূত্র" যাহা, য়ুরোপের হোমিওপ্যাথিও তাহা। এই সদৃশ-সূত্রের ভিত্তির উপর—হ্যানিমান যে মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন, একথা অস্বীকার করা চলে না। "সমঃ সমং শময়তি" এই সদৃশ সূত্রের ইংরাজী অনুবাদ—Similia Similibus carantur. সদৃশ চিকিৎসার মুখ্য উপদেশ—"রোগের সমস্ত লক্ষণগুলি সম্পুর্ণরূপে না জানিলে চিকিৎসক তাহার প্রতিকার করিতে পারেন না। অতএব রোগমাদৌ পরীক্ষেতঃ ততোঽনন্তর মৌষধং। ততঃ কর্ম্ম ভিষক্ পশ্চাৎ জ্ঞান পুর্ব্বং সমাচয়েৎ।"

আয়ুর্ব্বেদের সদৃশ-সূত্র যে কি গবেষণা-ময় —এক কথায় তাহা বুঝান যায় না। এই মতে চিকিৎসা করিতে গেলে চিকিৎসককে রোগের অবস্থান স্থান," অনুভূতি "উপচয়" "অপচয়" "কারণ [বিপ্রকৃষ্ট, সন্নিকৃষ্ট] ধাতু" "প্রকৃতি" 'পূর্ব্বরূপ" „লক্ষণ" বিশেষ লক্ষণ সাত্ম প্রভৃতি সকল তত্ত্বের অনুসন্ধান করিতে হইবে। উপাদানের বিশ্লেষণ করিয়া নিপুণ হস্তে ঔষধ প্রয়োগ করিতে হইবে। হোমিওপ্যাথির Location, sensasion, modaiity, causes, constitution and temperement প্রভৃতির সহিত আয়ুর্ব্বেদের সদৃশ সূত্রের রীতি-মত ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাতঃকালে শিশির পড়ে, মধ্যাহ্নে তাপ বৃদ্ধি হয়, সন্ধ্যায় বায়ু বলবান হইয়া উঠে। বাল্যে শ্লেষ্মা বৃদ্ধি হয়, যৌবনে পিত্ত, বার্দ্ধক্যে বায়ু—কালের ধর্ম্ম শারীর মানস ও জড় ভেদে ত্রিজগতেই এক, এই ত্রিতত্ত্বের একীকরণ—আয়ুর্ব্বেদের বিশেষত্ব। ইহা হইতেই রোগের উপচয় উপশমের কারণ বুঝিতে পারা যায়। বহু যুগ পূর্ব্বে ভারতের ঋষি এ তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন। হিন্দু সন্তান এ সকল তত্ত্ব ভুলিয়া গিয়াছে, তাই সে অন্যের মুখের একটা কথা শুনিলে বিস্ময়-মুগ্ধ হইয়া পড়ে। অতীতের প্রতি অশ্রদ্ধা—তাহাকে আত্মহারা করিয়াছে। বিপুলায়তন ভারতে যে জিনিষ অতি পুরাতন, তাহাকেই সে অপরের আবিষ্কার মনে করে।

আমরা বরাবর বলিয়া আসিতেছি—আয়ুর্ব্বেদই জগতের একমাত্র আয়ুর্ব্বেদ ছিল। বেদ—অনন্তকাল ব্যাপী, "আয়ুর্ব্বেদও সেই বেদ,—সকল রূপ চিকিৎসা তত্ত্বই আয়ুর্ব্বেদের ভিতর নিহিত রহিয়াছে। এখন আয়ুর্ব্বেদের অবনতির যুগ, তথাপি সমগ্র চিকিৎসার মৌলিক তত্ত্বগুলি আজিও আয়ুর্ব্বেদ-সূত্রের উপর স্থাপিত। খৃষ্ট-ধর্ম্ম—যেমন বৌদ্ধ ধর্ম্মের অনুবাদ, জগতের চিকিৎসা গ্রন্থ তেমনি আয়ুর্ব্বেদের প্রভা-পুষ্ট। জীবের দেহ ধাতু সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তন-শীল—স্বতঃই ক্ষয়-প্রবণ, "তোমরা ধাতুর সেই সাত্ম দিয়া ক্ষয় পূরণ কর —তোমাদের দেশ হইতে অকাল মৃত্যু অকাল বার্দ্ধক্য, অস্বাভাবিক রোগ শোক, বিলুপ্ত হইয়া যাইবে।"—ভারতের উদার-বিজ্ঞানের ইহাই একমাত্র উপদেশ। আয়ুর্ব্বেদে যে তত্ত্ব নাই, সে তত্ত্ব জগতের কোথাও নাই। চরকের উক্তির চরম সার্থকতা—

"যন্নেহাস্তি নতৎ কচিৎ!"

তাই বলিতেছিলাম—আয়ুর্ব্বেদে যাহা নাই, —হোমিওপ্যাথি তাহা কোথায় পাইবে? হোমিওপাথির ঔষধ-নির্ব্বাচনে আয়ুর্ব্বেদের

সেই দ্রব্যের বীর্য্য ও শক্তি-রহস্যই পরিস্ফুট, হোমিওপ্যাথেরা অল্প মাত্রায় ঔষধ ব্যবহার করেন। আয়ুর্ব্বেদও তীক্ষ্ণ ঔষধের সূক্ষ্ম মাত্রার নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। আপনারা মান পরিভাষার উপক্রমণিকা পড়িলেই তাহা বুঝিতে পারিবেন। যথা ;—

জালান্তর গতৈঃ সূর্য্য করৈ ধ্বংসী বিলোক্যতে।
ষড়্ধ্বংসীভির্ম্মরীচিঃ স্যাৎ তাভিঃ ষড়্ভিশ্চ রাজিকা॥"

কালিঙ্গ মানং।

[পরিভাষা প্রদীপ]

ত্রাস রেণুস্ত বিজ্ঞেয় স্ত্রিংশতা পরমাণুভিঃ।
ত্রাস রেণুস্ত পর্য্যায় নাম্না ধ্বংসী নিগদ্যতে॥

মাগধ পরিমাণং।

[পরিভাষা প্রদীপ]

আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধ প্রস্তুত প্রণালী আলোচনা করিলেও আমরা জানিতে পারি—ভেষজ দ্রব্যের জারণ-মারণ-মর্দ্দন-সন্তাপন সমস্তই তাহার জড় ধর্ম্ম নষ্ট করিবার জন্য। কেননা শক্তি না হইলে শক্তিকে আঘাত করিতে পারেনা।

হোমিওপ্যাথির যাহা মূলসূত্র—তাহাও অনন্ত আয়ুর্ব্বেদের এক ভগ্নাংশ। আমরা তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিয়া এই স্থানেই এ প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি।

যদ্বিষং ভক্ষণাদ্দেহে যদ্রূপ মুপলক্ষ্যতে।
তস্য তদগদং জ্ঞেয় মিত্যুচে হারীতঃ স্বয়ং॥

অর্থাৎ যে বিষ ভক্ষণ করিলে শরীরে যে যে লক্ষণ উপস্থিত হয়, সেই বিষই সেই লক্ষণ নিবারক অগদ (ঔষধ)—স্বয়ং হারীতঋষি একথা বলিয়াছেন। "বিষস্য বিষ মৌষধং"—ভারতের পুরাতন সিদ্ধান্ত। এখন পাঠক মহাশয় ভাবিয়া দেখুন—হোমিওপ্যাথি—আয়ুর্ব্বেদ মহা সাগরেরই একটী তরঙ্গ কি না?

শ্রীব্রজবল্লভ রায় কাব্যতীর্থ।

রসায়ন ও বাজীকরণ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিত অংশের পর)

—:*:—

এইবার বাজীকরণের কথা বলা যাউক। বাজীকরণ সম্বন্ধে শাস্ত্রে লিখিত হইয়াছে ;—"যাহা বহু পুত্রজনক, সদ্যঃই স্ত্রীতে হর্ষজনক, যাহাতে অপ্রতিহত বলের সহিত স্ত্রীগমনে সামর্থ্য জন্মে, যাহাতে স্ত্রীলোকের অত্যন্ত প্রিয় হওয়া যায়, যদ্বারা জরাগ্রস্ত পুরুষেরও শুক্রবৃদ্ধি প্রাপ্ত ও পুত্রোৎপাদন ক্ষমতা জন্মে, যাহাতে বহুশাখা বিশিষ্ট মহান চেত্য বৃক্ষের ন্যায় মনুষ্য বহু অপত্য বিশিষ্ট হইয়া লোকের সম্মানভাজন হয়েন, যাহা দ্বারা ইহ ও পরলোকে সন্তান মূলক যশঃ, শ্রী, বল ও পুষ্টিলাভ করা যায়, তাহাকে বাজীকরণ বলে।"

বাজীকরণ ঔষধ সেবন সম্বন্ধে শাস্ত্রকার বলিয়াছেন ;—"আত্মবান পুরুষ নিত্যই

বাজীকরণ ইচ্ছা করিবেন। কারণ বাজী করণ দ্বারা পুত্র হয় এবং পুত্র হইতে ধর্ম্ম, অর্থ, প্রীতি ও যশোলাভ হয়। সুতরাং বাজীকরণ ঐ সকল লাভের হেতু স্বরূপ" শাস্ত্রে অপুত্রক পুরুষকে ছায়াহীন, বলহীন, একশাখাবিশিষ্ট এবং পূতিগন্ধযুক্ত বৃক্ষের সহিত তুলনা করা হইয়াছে, অপিচ শাস্ত্র বলিয়াছেন,—"অপুত্রক পুরুষ চিত্রিত দীপের ন্যায়, জলশূন্য পদার্থের ন্যায়, আকৃতি বিশিষ্ট কিন্তু অধাতব পদার্থের ন্যায় এবং তৃণ নির্ম্মিত প্রতিকৃতির ন্যায়। অপুত্রক পুরুষ প্রতিষ্ঠা রহিত, নগ্ন, একচক্ষুঃ এবং নিষ্ক্রিয়।"

বহু সন্তান বিশিষ্ট পুরুষ বহুমূর্ত্তি, বহুমুখ, বহুব্যূহ, বহুক্রিয়, বহুচক্ষুঃ, বহুজ্ঞান ও বহু আত্মাযুক্ত। বহুপুত্রক ব্যক্তি মঙ্গলময়, প্রশস্ত ধন্য, বীর্য্যশাখ এবং বহুশাখ বলিয়া প্রশংসিত হয়েন। প্রীতি, বল, বিস্তার. বিভব, কুল, যশ, প্রভৃতি অপত্য সংশ্রিত। সুতরাং যিনি ঐ সকল গুণ লাভে ইচ্ছা করেন, তিনি যেন নিত্য ভোগ সুককর বীর্য্য বর্দ্ধন এবং অপত্য বর্দ্ধন বাজীকরণ পরায়ন হয়েন।

মনের হর্ষোৎপাদনকারিণী স্ত্রীই বাজীকরণের প্রধান ক্ষেত্র। কারণ অভিলষিত রূপ রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দের এক একটীর দ্বারাই মনের প্রীতি সম্পাদিত হইয়া থাকে। স্ত্রী শরীরে ঐ পাঁচটীই যখন একত্র অবস্থিত, তখন স্ত্রীই যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হর্ষোৎপাদনকারিণী তাহাতে আর সন্দেহ কি। স্ত্রী ব্যতীত অন্য কোথাও রূপ-রসাদি পাঁচটীর একত্র সমাবেশ দেখা যায়না। স্ত্রীতেই বিশেষরূপে প্রীতি, অপত্য, ধর্ম্ম, অর্থ, লক্ষ্মী ও লোক সকল প্রতিষ্ঠিত। তবে শাস্ত্রকার ইহাও বলিয়াছেন, যেস্ত্রী সুরূপা, যৌবন সম্পন্না, সুলক্ষণা, বশীভূতা এবং সুশিক্ষিতা সেই স্ত্রীই শ্রেষ্ঠ বাজীকরণ।

শাস্ত্রকার বাজীকরণ সম্বন্ধে আরও বলিয়াছেন,—"বিবিধ মনোজ্ঞ ভোজ্যদ্রব্য আহার, নানাবিধ পানীয় দ্রব্য, পান, শ্রুতি মধুর বাক্য শ্রবণ. সুখকর স্পর্শ, জ্যোৎস্নারাত্রি, নবযৌবন সম্পন্না কামিনী, শ্রুতি মধুর সঙ্গীত শ্রবণ, তাম্বুল ভক্ষণ. মদ্যপান. পুষ্পমাল্য ধারণ. ও মনের প্রফুল্লতা, প্রভৃতি দ্বারা বাজীকরণ হইয়া থাকে।"

বাজীকরণ ত্রিবিধ, যথা. শুক্রজনক. শুক্র প্রবর্ত্তক এবং শুক্রের জনক ও প্রবর্ত্তক। ঘৃতাদি শুক্রজনক, কুঁচের মূল চূর্ণ প্রভৃতি শুক্র প্রবর্ত্তক এবং গোধূম, মাষ কলায় ডিম্ব প্রভৃতি শুক্রজনক ও প্রবর্ত্তক।

এক্ষণে বাজীকরণ যোগ সকল লিখিত হইতেছে। এই সকল যোগ সুস্থ ব্যক্তির শুক্রবর্দ্ধক এবং ক্ষীণ শুক্র ও শুক্র দৌর্ব্বল্য বিশিষ্ট পুরুষের পক্ষে পরম হিতকর। সুস্থ ব্যক্তি এই সকল যোগ সেবন করিলে শুক্র ক্ষয় জনিত কোন প্রকার রোগ জন্মিতে পারে না।

পাঁঠার কোষ জলে সিদ্ধ করিয়া লইবে। পরে একটী পাত্রে দুগ্ধজাত গব্য ঘৃত চড়াইয়া তাহাতে সেই জল সহ কোষ, সৈন্ধব লবণ, এবং পিঁপুল চূর্ণ নিক্ষেপ করিয়া পাক করিয়া লইবে। ইহা অত্যন্ত রতি শক্তিবর্দ্ধক।

পাঁঠার কোষ এক ছটাক. দুগ্ধ আধ সের. এবং জল দুই সের একত্র সিদ্ধ করিয়া. দুগ্ধাবশেষ থাকিতে অর্থাৎ আধ সের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া দুগ্ধ গ্রহণ করিবে। এই দুগ্ধ দ্বারা খোসা রহিত তিল সাতবার ভাবনা দিয়া সেই তিল সেবন করিলে রতিশক্তি বর্দ্ধিত হয়। ইহা অপেক্ষা অল্প মাত্রায় ভাবনার জন্য দুগ্ধ প্রস্তুত করিতে হইলে, পাঁঠার কোষের

আটগুণ পরিমাণ দুগ্ধ এবং দুগ্ধের চারিগুণ জল একত্র সিদ্ধ করিয়া দুগ্ধাবশেষ থাকিতে নামাইয়া লইবে।

ভূমিকুষ্মাণ্ড চূর্ণ, ভূমিকুষ্মাণ্ডের রসে সাত দিন ভাবনা দিবে। এই চূর্ণ ঘৃত ও মধু সহ সেবন করিলে বাজীকরণ হয়। এইরূপে আমলকীর চূর্ণ আমলকীর রসে সাতদিন ভাবনা দিয়া ঘৃত, চিনি ও মধুসহ সেবন করিলেও ফল হয়। এই ঔষধ সেবন করিয়া দুগ্ধ পান করা কর্ত্তব্য।

ভূমি কুষ্মাণ্ড বাটিয়া দুগ্ধ ও ঘৃতসহ সেবন করিলে যৌবন দীর্ঘস্থায়ী হইয়া থাকে।

আলকুশী বীজের শস্য এবং কুলেখাড়ার বীজ চূর্ণ করিয়া বা বাটিয়া চিনি ও ধারোষ্ণ দুগ্ধ সহ পান করিলে রতিশক্তি বর্দ্ধিত হয়। দুগ্ধ দোহন কালে যতক্ষণ উষ্ণ থাকে, ততক্ষণ তাহাকে ধারোষ্ণ দুগ্ধ বলে।

কুলেখাড়ার বীজ চূর্ণ বা কুঁচের মূল চূর্ণ, চিনি ও ধারোষ্ণ দুগ্ধ সহ সেবন করিলে বাজী-করণ হয়।

শতমূলী ও কুঁচের মূল চূর্ণ করিয়া চিনি ও ধারোষ্ণ দুগ্ধসহ পান করিলে অথবা যষ্টিমধু চূর্ণ ঘৃত ও মধু সহ সেবন করিলে রতিশক্তি বর্দ্ধিত হয়।

গোক্ষুর বীজ, কুলে খাড়ার বীজ, শতমূলী, আলকুশী বীজ, গোরক্ষ চাকুলের মূল ও বেড়েলার মূল ইহাদের চূর্ণ সমভাগে একত্র করিয়া সহ্যমত মাত্রায় দুগ্ধ সহ রাত্রে সেবন করিলে বাজীকরণ হয়।

মাষকলায় ঘৃতে ভাজিয়া দুগ্ধ ও চিনি সহ পাক করিয়া পায়স প্রস্তুত করিবে। ইহা উত্তম বাজীকরণ। দধির সর, চিনি, মধু, মরিচ চূর্ণ, ছোট এলাচ চূর্ণ ও বংশলোচন চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া সুগন্ধযুক্ত ভাণ্ডে রাখিবে। ঘৃত বহুল ষষ্টিক তণ্ডুলের অন্ন সেবন করিয়া এই ঔষধ উপযুক্ত মাত্রায় পান করিলে বর্ণ, স্বর, বল ও রতিশক্তি বর্দ্ধিত হয়।

এই স্থলে দধির সর এক পোয়া, চিনি এক ছটাক, ঘৃত ১ তোলা; মধু ১ তোলা এবং অন্যান্য দ্রব্য উপযুক্ত মাত্রায় (এক সিকি বা তদ্রূপ) গ্রহণ করিতে হইবে।

টাটকা মাংস ও রোহিত মৎস্য আহার করিলে বাজীকরণ হয়। বিশেষতঃ বড় পুঁটি (সরল পুঁটী) ঘৃতে ভাজিয়া সেবন করিলে রতিশক্তি বর্দ্ধিত হয়।

পিঁপুল, মাষকলায়, শালিধান্যের তণ্ডুল, যব ও গোধুম একত্র মিশ্রিত করিয়া ঘৃত সহ পিষ্টক প্রস্তুত করিবে। এই পিষ্টক ভক্ষণ করিয়া চিনি মিশ্রিত দুগ্ধ পান করিলে রতিশক্তি বর্দ্ধিত হয়। এই স্থলে পিঁপুল চূর্ণ এক সিকি এবং অন্যান্য দ্রব্য উপযুক্ত মাত্রায় লইতে হইবে।

কাঁকড়া, কচ্ছপ ও কুম্ভীরের ডিম্ব ভক্ষণ করিলে অত্যন্ত শুক্রবৃদ্ধি হয়।

অশ্বত্থের ফল, মূল, ছাল ও কুঁড়ির সম ভাগে দুই তোলা, দুগ্ধ ১৬ তোলা এবং জল ৬৪ তোলা একত্র পাক করিয়া ১৬ তোলা থাকিতে নামাইয়া লইবে। এই দুগ্ধ ছাঁকিয়া চিনি ও মধুসহ পান করিলে রতিশক্তি বর্দ্ধিত হয়।

মাষকলায় চূর্ণ, ঘৃত ও মধু সহ সেবন করিয়া দুগ্ধ পান করিলে রতি শক্তি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

প্রথম প্রসূতা গাভীর বৎস বড় হইলে তাহার দুগ্ধ পান করিলে অথবা যে গাভী মাষ কলায়ের পত্র ভক্ষণ করে, তাহার দুগ্ধ পান করিলে বাজীকরণ হয়।

আলকুশী বীজ চূর্ণ ও গোধূম চূর্ণ দুগ্ধ সহ পাক করিয়া ঘৃত মিশ্রিত করিয়া শীতল হইলে ভোজন করিবে এবং পরে দুগ্ধ পান করিবে। ইহা উত্তম বাজীকরণ।

চড়াই পাখীর মাংস তৃপ্তিপূর্ব্বক আহার করিয়া দুগ্ধ পান করিলে রতিশক্তি বর্দ্ধিত হয়। কলায়ের যূষের সহিত ষষ্টিক তণ্ডুলের অন্ন ভোজন করিয়া দুগ্ধ পান করিলে বাজীকরণ হয়। মৎস্য ও হংস, ডিম্ব—ঘৃতে ভাজিয়া খাইলে বাজীকরণ হয়।

আলকুশী বীজ, মাষকলায়, পিণ্ডখর্জ্জুর, শতমূলী, পানিফল ও কিসমিস সমানভাগে মোট দুই সের, দুগ্ধ চারি সের এবং জল চারি সের একত্র সিদ্ধ করিয়া চারি সের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে, পরে তাহার সহিত চিনি তিন পোয়া, বংশলোচন তিন পোয়া এবং নূতন ঘৃত দেড় সের মিশ্রিত করিবে। এই ঔষধ সহ্যমত মাত্রায় সেবন করিয়া ষষ্টিক তণ্ডুলের অন্ন ভোজন করিলে বহু পুত্র লাভ করা যায়।

টাট্‌কা রোহিত মৎস্য ঘৃতে ভাজিয়া দধি, দাড়িমের রসের সহিত প্রস্তুত ছাগমাংসের যূষের সহিত পাক করিয়া অগ্রে মৎস্য, পরে যূষ ইহা সেবন করিবে, বৃষ্য ও পুত্রজনক।

মৎস্য বা মাংস কুট্টিত করিয়া তাহার সহিত হিং, সৈন্ধব, ধনে ও গোধূম চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া ঘৃতে পাক করিয়া পিষ্টক প্রস্তুত করিবে। ইহা উত্তম বাজীকরণ।

ছাগাদির মাংস রসে দধি ঘৃত, লবণ এবং দাড়িমের রস সংযোগে মৎস্য পাক করিবে। মাংস রস মৎস্যের মধ্যে প্রবেশ করিলে উহা পেষিত ও কণ্টক শূন্য করিয়া মরিচ, জীরা, ধনে, অল্প হিং এবং নূতন ঘৃত মিশ্রিত করিবে। অনন্তর মাষকলায়ের ধুলি প্রস্তুত করিয়া উক্ত মৎস্য তন্মধ্যে পূর দিয়া ঘৃতে ভাজিয়া লইবে। ইহা পুষ্টিকর, বলকর, পুত্রোৎপাদক, শুক্রবর্দ্ধক এবং হর্ষজনক।

বৃষ্যলম্পিকা—চিনি দশসের, নূতন ঘৃত পাঁচ সের মধু আড়াই সের, এবং জল আড়াই সের একত্র পাক করিবে। অনন্তর ঘন হইয়া আসিলে উহাতে গোধূম চূর্ণ আড়াইসের নিক্ষেপ করিবে। অল্প পাকের পরে নামাইয়া শিলায় উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া লইবে। এই ঔষধ সেবনে রতিশক্তি বর্দ্ধিত হয়।

যে সকল দ্রব্য মধুর, স্নিগ্ধ, জীবনীশক্তি বর্দ্ধক, পুষ্টিকর, গুরু ও মনের হর্ষজনক তৎসমস্তই বৃষ্য, সুতরাং বাজীকরণের জন্য এবম্বিধ দ্রব্য প্রয়োগ করিবে।

শ্রী—

ছাত্র জীবনে—স্বাস্থ্যরক্ষা।

—:*:—

আয়ুর্ব্বেদের সহযোগী সম্পাদক কবিরঞ্জন মহাশয় এবার কুম্ভকারকে দিয়া কর্ম্মকারের কাজ করাইবেন। আমায় নাকি 'আয়ুর্ব্বেদ' পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিতেই হইবে! অথচ আয়ুর্ব্বেদ শব্দের যোগরূঢ় অর্থটাই আমার জানা নাই। সেক্সপিয়র-মিণ্টন্ ও চরক-সুশ্রুত যে

সম্পূর্ণ বিভিন্ন জগতে বাস করেন, ইহা মহামান্য কবিরঞ্জন মহাশয় কিছুতেই শুনিবেননা। তিনি বলিলেন, "কিছু না কিছু আয়ুর্ব্বেদ নিশ্চয়ই আপনার জানা আছে। এক কথায় যাহা আয়ুর্বৃদ্ধির নিদান, তাহাই আয়ুর্ব্বেদ। এত শত বহি পড়িলেন, কোন গ্রন্থেই কি আয়ুর্বৃদ্ধির কথা নাই? এ হইতেই পারেনা।" সত্য বলিতে কি, বুদ্ধিমান ও বিজ্ঞের সঙ্গে তর্কে আমি অজ্ঞ—হারিয়া গিয়াছি। তিনিই আমাকে লিখিতব্য প্রবন্ধের শিরোনামা ধার্য্য করিয়া দিয়াছেন। আপনারা জানেন, চোখে ঠুলি দেওয়া-জন্তু-বিশেষ বাধ্য হইয়া কিরূপ ঘুরিয়া ঘুরিয়া তৈল বাহির করে। আমারও চোখে ঠুলি দেওয়া,—এ শাস্ত্র আমার নিকট অন্ধকার ময়। তা'র পরে বাধ্যবাধকতাও যথেষ্ট। প্রথমতঃ অজানা বিষয়েও আমাকে লিখিতে হইবে, অধিকন্তু আবার নির্দ্ধারিত বিষয়ে! যখন ছিঁড়িয়া পলাইবার সাধ্য নাই, তখন আমাকে ঘুরিতেই হইবে। আমি বেশ বুঝিতেছি, আপনারা হাসিতেছেন, কিন্তু কি করিব—কপালের লেখা—উপায় নাই। অতএব আপনারা হাসুন, আমি ঘুরিতে থাকি।

প্রথমেই বলিয়া রাখি আমি ভাণধরিব না, যাহা জানি না—সে বিষয়ে পাণ্ডিত্য দেখাইতে গেলে ঘোরাই সার হইবে—তৈল বিন্দুও বাহির হইবে না। আমার প্রবন্ধ দয়াবান্ সম্পাদক মহাশয়ের প্রশস্ত হৃদয়ের প্রশস্ত অর্থ অনুসারে কতকটা আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রসম্মত হইতে পারে, কিন্তু নিশ্চয়ই আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্র-সংগৃহীত নহে। আমি যাহা লিখিতেছি, তাহা কতকটা নিজের অভিজ্ঞতা প্রসূত, কতকটা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য—অবশ্য পঠিতব্য পুস্তক পাঠের ফল। তবে আমার বিশ্বাস, আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে এরূপ প্রবন্ধেরও কথঞ্চিৎ সার্থকতা থাকিতে পারে—কারণ যাহা সহজ, যাহা সবাই জানে বা বুঝিতে পারে—অথচ আকীর্ণ হইয়া রহিয়াছে, তাহা সংগ্রহ করিলেও তাহার ভ্রমপ্রমাদের মধ্যে হয়ত কিঞ্চিৎ এমন সত্য নিহিত থাকিতে পারে, যাহা বিশেষজ্ঞেরা নিতান্ত ঘৃণার চক্ষে না দেখিবার সম্ভাবনা। আরও এক কথা,—সহজ কথা—প্রাণের কথা প্রায়শঃই সত্য হয়,—কেন না তাহা অনেক সময়েই ঈশ্বরানুপ্রেরিত। এই জন্যই বোধ হয় রবীন্দ্রনাথের যুগেও গ্রাম্য নিরক্ষর কবির সহজ সরল কবিতা প্রবাসী-ভারতবর্ষের পৃষ্ঠায় স্থান লাভ করিতেছে এবং এই জন্যই হয়ত গুণগ্রাহী আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র নিজ সুবিশাল ঔষধাগারে সামান্য মুষ্টিযোগের জন্যও স্থান নির্দ্দেশ করিতে ভুলিয়া যায় নাই।

ছাত্র জীবন, শিক্ষার জীবন—সর্ব্ব বিষয়ে। এ শিক্ষা আবার লাভ করিতে হইবে সামঞ্জস্যের ভিতর দিয়া,—শারীরিক ও মানসিক যাহা কিছু ধর্ম্ম, আছে তাহাদের সামঞ্জস্য বিধান করিয়া ক্রমোন্নতি করিতে হইবে—সামঞ্জস্য ভিন্ন ক্রমোন্নতি সম্ভব হইবে না। কথাটা স্পষ্ট করিয়া বলি। ছাত্রদের অবশ্য মানসিক উন্নতি—মুখ্য উদ্দেশ্য, তাই বলিয়া শরীরের স্বাস্থ্যে অবহেলা করিলে চলিবে না, কেন না শরীরে-মনে বড় নিকট সম্বন্ধ, একের ভাল-মন্দ অন্যের ভাল-মন্দের সঙ্গে একই সূত্রে গ্রথিত। শরীর ও মন যেন একই জিনিসের দুইটা দিক—এই দুই দিক লইয়াই জিনিষটার সম্পূর্ণতা, এক-দিকের অভাবে আসল জিনিসটার হ্রাস হইয়া পড়ে। অতএব গৌণ হইলেও শরীররক্ষা ছাত্র-জীবনের একটী উদ্দেশ্য। প্রদীপ জ্বালান মুখ্য উদ্দেশ্য হইতে পারে, কিন্তু তৈল না হইলে প্রদীপ জ্বালিবে কেমন করিয়া? তাই

দীপে তৈল প্রদান গৌণ হইলেও একটী উদ্দেশ্য। মনের কাজ করিতে হইবে, শরীরের সাহায্যে—তাই স্বাস্থ্যরক্ষায় মনোযোগী না হইলে উপায় নাই। এই কারণেই ছাত্র-জীবনেও দুইটী ঋষিবাক্যের সামঞ্জস্য বিধান করিয়া চলিতে হইবে—একটী "ছাত্রাণাং অধ্যয়নং তপঃ," অপরটী "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনং।" তপশ্চর্য্যাই প্রধান উদ্দেশ্য কিন্তু তপোবিঘ্ন নিরাকরণের জন্য সুগঠিত, সুবেষ্টিত, সুসজ্জিত-শরীর-মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে তপস্বী মনকে স্থাপন করিতে হইবে। 'ব্যাধি মন্দির'—তপস্যার পক্ষে কখনই সুকর নহে।

আগে শরীর মন্দির নির্ম্মাণের কথাই বলি। মন্দির নির্ম্মাণের কথাতেই তপস্যার কথাটাও আপনা আপনি যেন আসিয়া পড়ে; কেননা নির্ম্মাণ করিবার সময়ে সর্ব্বদাই দৃষ্টি রাখিতে হইবে যে, মন্দির সম্পূর্ণরূপে তপশ্চর্য্যার উপযোগী হইতেছে কি না।

মন্দিরের সঙ্গে শরীরের সনাতন প্রথানুসারে উপমা স্থাপন করিয়াছি বটে, কিন্তু মনে রাখিতে হইবে—দুইয়ের মধ্যে বিশেষ একটু প্রভেদ আছে। মন্দিরের সম্বন্ধে ভিত্তি স্থাপন হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ চূণকাম পর্য্যন্ত সমস্তই মানুষকে নিজে করিতে হয়, মন্দির নিজে অচল জড়; কিন্তু শরীরের উপযুক্ত আহারীয় সংগ্রহ করিয়া দিয়া, একটু যত্ন করিতে থাকিলে, শরীর নিজেকে নিজে গড়িয়া তোলে। দুইটী ইংরাজী শব্দে এ পার্থক্য বেশ হৃদয়ঙ্গম হয়। মন্দির mechanical জিনিস, শরীর organic সৃষ্টি। আর একটু কথা এই;—তপস্যার উপযোগী করিয়া মন্দির নির্ম্মিত হইবে, কিন্তু তপস্যা—মন্দিরকে গড়িতে পারে না, কিম্বা মন্দির তপস্যাকে উন্নত করিতে পারে না, কিন্তু শারীরিক অবস্থা অনেক সময়েই মনের অবস্থার সৃষ্টি করে এবং মানসিক অবস্থা প্রায়শঃই শরীরকে গড়িয়া লয়। অর্থাৎ তপস্যা ও মন্দিরের মধ্যে co-existence সম্বন্ধ থাকিলেও শারীর ও মানসিক অবস্থার মধ্যস্থিত interaction সম্পর্ক নাই। এই interaction সম্পর্ক আছে বলিয়াই সর্ব্ব চিকিৎসা শাস্ত্রেই অনেক সময় শরীরের চিকিৎসা করিতে যাইয়া বিশেষজ্ঞেরা অগ্রে মনের চিকিৎসা করিয়া থাকেন এবং মনের চিকিৎসা প্রধানতঃ শারীর-চিকিৎসা দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে।

শরীর তিনটী প্রক্রিয়া দ্বারা নিজেকে গঠন, পরিপোষণ ও রক্ষণ করে, যথা আহার্য্য গ্রহণ, গৃহীত আহার্য্যের পরিপাক, পরিপাক প্রাপ্ত সারাংশের দেহ মধ্যে স্থিতি।

আহার্য্য গ্রহণ—সরল চিত্তে নিয়মিত সময়ে পরিমিতরূপে পুষ্টিকর ও সহজপাচ্য লঘু আহার্য্য গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। ছাত্রের সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে যে, তিনি মানসিক উন্নতি বিধানের জন্য শরীরের পুষ্টি করিবেন। অতএব মন উত্তেজিত হয়—ধারণা শক্তির হ্রাস হয় বা কুপ্রবৃত্তির উদ্রেক হইতে পারে এমন আপাততঃ রসনাতৃপ্তিকর আহার্য্য তিনি কদাপি গ্রহণ না করেন। মাদক দ্রব্য বা কোনোরূপ stimulant দ্রব্যমাত্রই বর্জ্জন করা কর্ত্তব্য; কেননা ইহা মানুষকে একটা সাময়িক অনুপ্রেরণা প্রদান করে বটে, কিন্তু পুনঃ পুনঃ অস্বাভাবিকরূপে উত্তেজিত হইয়া স্নায়ুমণ্ডলী যখন নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, তখন শরীর নানা রোগ কবলিত হইয়া পড়ে। মাছ-মাংস অপেক্ষা দুধ-ঘিয়ের ব্যবহার বেশী হওয়া আবশ্যক। আমিষ ও নিরামিষ—উভয়বিধ খাদ্যই বলকারক স্বীকার করি, কিন্তু আমিষ-ভোজীর বল যেন কতকটা

ব্যাঘ্রাদির মত হিংসার পক্ষে উপযোগী ও নিরামিষ ভোজীর বল যেন হাতীর মত সৌশীল্য ও বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনের পক্ষে হিতকর। কেহ কেহ স্থির করিয়াছেন—মানুষের মাংস হজম করিবার উপযোগী পাকস্থলী ও মাংস ছিঁড়িয়া খাইবার উপযোগী মাংসাশী জন্তুর মত চারটী সূক্ষাদন্ত আছে এবং বঙ্গদেশে মাংস না হউক, মৎস্য গ্রহণ না করিলে নাকি শরীরের বিশেষ কিছু প্রত্যবায় হইয়া থাকে। তা' যাই-হউক এগুলি যখন রজোগুণের বর্দ্ধক, তখন খুব বিবেচনার সহিত নিতান্ত কম মাত্রায় ছাত্রগণের এগুলি গ্রহণ করা বিধেয়।

আহার্য্য পরিপাক।—আহার্য্য গ্রহণ করিলেই হইল না। শরীর রক্ষা পরিপাক ক্রিয়ার উপরে সর্ব্বতোভাবে নির্ভর করে। খাদ্যের সারাংশ হইতেই রস উৎপন্ন হয় এবং রসই ক্রমান্বয়ে রক্তাদিতে পরিণত হইয়া শরীর পোষণের কারণ হয়। আয়ুর্ব্বেদে উক্ত হইয়াছে :—

রসাদ্রক্তং ততো মাংসং মাংসান্মেদঃ প্রজায়তে।
মেদসোঽস্থি ততো মজ্জা ততঃ শুক্রস্য সম্ভবঃ॥

কিন্তু খাদ্য পরিপাক না হইলে শরীর খাদ্যের এই সারাংশ গ্রহণ করিতে পারে না, কাজেই শরীরের পক্ষে অত্যাবশ্যক উপাদানগুলির স্বল্পতা বশতঃ শরীর ক্রমেই নিস্তেজ ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে।

এই অজীর্ণ রোগ নানাকারণে ঘটিয়া থাকে। ছাত্রদের পক্ষে সাধারণতঃ অনিয়মিতাহার অপরিমিতাহার, আবদ্ধ বায়ুতে অধিকক্ষণ যাপন করিয়া অধ্যয়নাদি, মানসিক পরিশ্রমজনক কর্ম্মকরণ, অধিক রাত্রিজাগরণ, দুশ্চিন্তা বা অতিচিন্তা ইত্যাদিতে অজীর্ণরোগ উদ্ভব হইয়া থাকে। রাত্রিজাগরণের মত দুষ্কর্ম্ম অতি কমই আছে। ইহাতে শরীর নিতান্ত নিস্তেজ হইয়া পড়ে। আহার যেমন প্রয়োজনীয়, আরাম দায়িনী নিদ্রা ততোধিক আবশ্যক। পরিপাকক্রিয়ায় নিদ্রা অত্যন্ত সাহায্য করে। বিজ্ঞ চিকিৎসকেরা বলেন,—রজনীর শেষার্দ্ধে একঘণ্টা জাগিলে যে ক্ষতি হয়, পূর্ব্বার্দ্ধে দুই ঘণ্টা নিদ্রা যাইলেও তাহার পূরণ হয় না। তৎপরে দুশ্চিন্তায়ও শরীরের কম ক্ষতি হয় না। দুশ্চিন্তা যে একরূপ মর্ম্মান্তিক জ্বর—সে বিষয়ে সন্দেহ কি?

ভারতবাসী ছাত্রদের সম্বন্ধে কম পড়া অপেক্ষা বেশী পড়ার অভিযোগই অধিকতর শ্রুত হওয়া যায়। প্রাণের দায়ে উদরান্নের সংস্থানের জন্য তাহাদের পড়া, তাহাদের পক্ষে অধ্যয়নের জন্য অতিশ্রমকরা খুব সম্ভবপর। কিন্তু প্রকৃতি তা' বুঝিবে কেন? এই অতিরিক্ত মানসিক শ্রমের শাস্তি তাহাদিগকে ভোগ করিতে হয়। অনেক ছাত্র মানসিক শ্রমানুযায়ী আহারীয় পান না বলিয়া তাঁহার পিত্তাধিক্য জন্মে তাহাতে শরীর গরম হয়, হাত-পা-চক্ষু জ্বালা করে। অধিকন্তু ভারতবাসী অনেক সময় বিনা কাজে এত ব্যস্ত যে, শারীরিক ব্যায়াম করিবার জন্য দশ মিনিট সময় তাহার দিবারাত্র মধ্যে হইয়া উঠে না। অনেক ব্রাহ্মণ ছাত্রের কথা শুনিয়াছি, তাঁহারা পড়াশুনা নষ্ট হইবার ভয়ে সন্ধ্যাবন্দনাদি করেন না, তাঁহারা অবশ্য ব্যায়াম করার কথা ভ্রমেও মনে আনিতে পারেন না। ফলে এই হয়—উষ্ণ পাকস্থলীতে যে খাদ্য পড়ে, তাহা হজম হয় না। কাজেই উদর কুপিত বায়ু এবং অম্ল ক্লেদের আশ্রয় স্থল হইয়া পড়ে। অনেক সময় নির্ম্মল বায়ু সেবনের অভাবে সর্ব্ব

শরীরে উপযুক্ত পরিমাণে রক্ত সঞ্চারিত হয় না। কাজেই পাকস্থলী দুর্ব্বল বা অসাড় হইয়া পড়ে। সুতরাং খাদ্য-পরিপাকের জন্য পাকস্থলীর নিয়মিত সঞ্চালন হয়না বলিয়া খাদ্যের পরিপাক হয় না কিম্বা আংশিক পরিপাক হয়। কাজেই হয় উদরাময়, না হয় কোষ্ঠবদ্ধ রোগের সৃষ্টি হয়।

অজীর্ণ রোগে প্রথমতঃ সেই সনাতন উপদেশ—যে সকালে-সন্ধ্যায় পর্য্যাপ্ত নির্ম্মল বায়ু সেবন করিতে হইবে,—সমুদ্র বা নদী তীরস্থ বায়ুই হউক বা বিস্তীর্ণ প্রান্তরের বায়ুই হউক, অগত্যা পার্ক প্রভৃতির বায়ুতেও চলিতে পারে। সম্ভব হইলে প্রতিদিনই কয়েক মিনিট ধরিয়া শারীরিক ব্যায়াম করিয়া বায়ু সেবনে বহির্গত হওয়া উচিত। কোষ্ঠ যাহাতে পরিষ্কার হইয়া যায়—কয়েকদিন অন্তর বিবেচনা করিয়া এইরূপ মৃদু বিরেচক ঔষধ বা জোলাপ লওয়া যাইতে পারে, কিন্তু মনে রাখা কর্ত্তব্য - ঔষধ সেবন যতটা পারা যায়, না করাই ভাল, কারণ পুনঃ পুনঃ ঔষধ সেবনে ঔষধ নিত্য খাদ্যের মধ্যে পরিণত হইয়া যায় এবং শেষে ঔষধে আর ফললাভ হয় না। অধিকন্তু প্রকৃতির যে স্বাভাবিক রোগ-নিবারিণী শক্তি আছে, সেটা লোপ পাইয়া যায়।

অজীর্ণরোগীর খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান হইতে হইবে। আহার করা সম্বন্ধে সর্ব্ব সময়েই সেই সনাতন প্রথাই সমীচীন বলিয়া মনে হয়—"বরং কম খাইয়া পস্তাইও, তবু বেশী খাইয়া ভুগিও না।" এ বিষয়ে পাশ্চাত্য ডাক্তার Andrew Wilson এবং Robert Bell বলিতেছেন,—"muscular exercise is essential to the proper performance of the intestinal functions. Therefore, those who must sit for hours at a desk for a livelihood should make it a rule to have their morning and evening walks regularly, when constipation would trouble them but little. * * *

If individuals would systematically conform to a well-considered dietic regimen, and would, moreover, give full attention to a daily and complete clearance from their bodies of the waste products of food, indigestion would cease to trouble and dyspepsia would vanish."

এইরূপ ভাবে যিনি জীবন যাপন করেন, তাঁহার সহজে কোন রোগের করালগ্রাসে পতিত হইবার আশঙ্কা করিতে হয় না। যিনি যাহা আহার করেন, তাহাই হজম করিয়া ফেলেন—তিনি বাস্তবিকই সুখী। কারণ তিনি সুনিশ্চিত শারীরিক স্বাস্থ্যলাভ করেন এবং শারীরিক স্বাস্থ্যবিধান হইলে মনের স্বাস্থ্য আপনিই ফুটিয়া উঠে।

তার'পর অতিরিক্ত পাঠের জন্য যে রোগ উপস্থিত হয় তাহা প্রত্যেক ছাত্রই অনায়াসে এড়াইয়া চলিতে পারেন। পড়া-শুনায় work while you work, play while you play এ বড় সুন্দর রীতি। কিন্তু দুঃখের বিষয়—আমরা স্বতঃই

পড়ার সময় খেলি, খেলার সময় পড়ি
আর পরীক্ষার আগে রাত জেগে জেগে মরি।

পরিপাক প্রাপ্ত সারাংশের দেহ মধ্যে স্থিতি।—এখন হইতেছে ধারণার কথা। খাদ্যগ্রহণ করিয়া পরিপাক করিয়া রক্তমাংসে পরিণত করিলেই হইল না।

এরূপ যত্নবান হইতে হইবে—যাহাতে ঐ সারাংশ শরীরের মধ্যেই অবস্থিতি করিয়া ক্রমান্বয়ে শরীরের ও তৎসঙ্গে মনের শক্তি-বর্দ্ধন করিতে পারে। ওজো ধাতুর বর্দ্ধন করাই শারীরিক স্বাস্থ্যলাভের উদ্দেশ্য, কেননা এই ওজঃই মানসিক উৎসাহ-প্রতিভাদি বর্দ্ধনের কারণ। বাগভট এই ওজো ধাতুর গুণ নিম্ন লিখিতরূপে বর্ণনা করিয়াছেন,

"নিষ্পাস্ততে যতো ভাবা বিবিধা দেহ সংশ্রয়াঃ
উৎসাহ-প্রতিভা-ধৈর্য্য-লাবণ্য সুকুমারতাঃ ॥"

সুশ্রুত বলেন,

রসাদীনাং শুক্রান্তানাং ধাতুনাং
যৎপরং তেজস্তৎ খল্বোজ স্তদেবলমিতি।"

অর্থাৎ রস হইতে শুক্র পর্য্যন্ত সপ্তধাতুর যে পরম তেজোভাগ তাহাই ওজঃ। ওজঃই বলের কারণ।

তাহা হইলে ওজঃ বৃদ্ধি করিতে হইলে শরীর মধ্যে ওজো ধাতুর কারণ ভুত এই সপ্ত ধাতুর সংরক্ষণ করা একান্ত কর্ত্তব্য। সুতরাং বীর্য্যধারণ বা বিন্দু ধারণ করিতে হইবে। "মা রেতঃ স্কন্দয়েৎ কচিৎ" এ ঋষিবাক্য ছাত্রগণের পক্ষে সর্ব্বথা পালনীয়। বাস্তবিকই "মরণং বিন্দু পাতেন জীবনং বিন্দুধারণাৎ।" বীর্য্যের ক্ষয় প্রায় অধিকাংশ রোগেরই মূলীভুত কারণ বলিয়া আয়ুর্ব্বেদ ও পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্র একবাক্যে ঘোষণা করিতেছে।

আমার মনে হয়, এই বীর্য্যধারণই শরীর রক্ষার পক্ষে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য। শরীর মধ্যে বীর্য্যের স্তম্ভন করিতে পারিলে আহার-বিহারের সামান্ত নিয়ম ভঙ্গ শরীরের বেশী কিছু ক্ষতি করিতে পারে না। কিন্তু বীর্য্যধারণের ক্ষমতা না থাকিলে অন্ত দুইটী নিয়ম খুব যত্ন সহকারে পালন করিলেও ফল সর্ব্বস্তদই হইয়া থাকে। কিন্তু বীর্য্যধারণ কিরূপে সম্ভবে?

মনের চিকিৎসা।—বীর্য্যরক্ষার কথায় মনের চিকিৎসায় আসিয়া পড়িলাম। কাম বাসনা মনের বিকার হইতে উৎপন্ন। বাস্তবিক পক্ষে পরিশুদ্ধ মন না হইলে মানবের পদে পদে বিপদ। শত চেষ্টার ফলে শরীর মধ্যে যে শুক্রধাতু উপার্জ্জিত হয়, মানসিক ক্ষণিক চাঞ্চল্যে তাহার স্কন্দন করিয়া, মানব নিজ শরীরকে "ব্যাধি-মন্দির" করিয়া তুলে। অনেক সময় শরীরের চিকিৎসায় যে রোগের বিন্দু মাত্রও আরোগ্য লাভ হয় না, তাহার কারণ যে পাপমন পাপের স্রষ্টা, তাহার ত কোন চিকিৎসা হয় না। তাই ম্যাকবেথ শারীরিক চিকিৎসায় লেডি ম্যাক্‌বেথের কোন ফল হইতেছে না দেখিয়া ডাক্তারকে বলিয়াছিলেন,—

"Canst thou not minister to a mind diseased etc.?" কিন্তু মনের চিকিৎসা অনেক সময়েইত শারীরিক চিকিৎসা দ্বারা সম্ভবে না। কেননা মানসিক যে রোগ শারীরিক রোগের ফল মাত্র, শারীরিক ঔষধ প্রয়োগে সেই মানসিক রোগের কথঞ্চিৎ উপশম সম্ভবপর, কিন্তু মানসিক রোগই যেখানে শারীরিক রোগের কারণ, সেখানে ঔষধ সেবন নিস্ফল। সেখানে প্রক্রিয়া দ্বারা চিকিৎসা করিতে হইবে। রোগীকেই চিকিৎসকের আসন গ্রহণ হইবে। তাই ডাক্তার, ম্যাক্‌বেথকে বলিলেন—"Therein the patient must minister to him self."

মনের চিকিৎসা, মনের উন্নতি বিধান—তাহাকে কলুষের অন্ধকূপ হইতে পবিত্রতার বিমল আলোকে আনয়ন করা। সাধুসঙ্গ, সর্ব্বদা সদ্ বিষয়ে চিন্তা ও আলাপন, কামের পরিবর্ত্তে স্নেহের ও ভগবদ্ভক্তির সাধনা, দুশ্চিন্তার উপস্থিতি মাত্রে মাতৃনাম স্মরণ,

সর্ব্বদা প্রফুল্ল চিত্তে অবস্থান, প্রভৃতি মনকে উন্নত করিবার প্রধান উপায়।

একদিনে মন বশ না হইতে পারে পুনঃ পুনঃ চেষ্টার ফলে হইবেই হইবে। তৎপরে শরীরের স্বাস্থ্য ও বলবৃদ্ধি করিতে পারিলে মনের অনেকটা স্বাস্থ্য বিহিত হওয়া খুবই সম্ভব। "sound mind in a sound body" —এ আজগুবি কথা নয়। দেবমন্দিরে পিশাচের বাস ক্বচিৎ সম্ভবপর। পরিশুদ্ধ শরীরে কলুষিত মন থাকিতে লজ্জা বোধ করে, পারিপার্শ্বিক অবস্থা তাই মনকে অনেকটা পরিশুদ্ধ হইতে বাধ্য করে।

বাস্তবিকই সেদিন ভারতের কি আনন্দের দিন—যে দিন ভারতে এমন ছাত্রবৃন্দ দেখা দিবেন—যাঁহাদের বীর্য্যবান্ দেহ ওজো লাবণ্যে দেদীপ্যমান্, এবং সেই দেহে যাঁহাদের বিমল মন সুশিক্ষার আলোকে ভাস্বর। এমন দিন ভারতবর্ষেই একদিন ছিল—যেদিন ছাত্রজীবন ব্রহ্মচর্য্যের সঙ্গে একসূত্রে গ্রথিত ছিল। এ যুগে যদি পুনরায় ভারতের শুভার্থিগণ শরীর মনের সামঞ্জস্যকে ভিত্তি করিয়া ছাত্র-শিক্ষার প্রবর্ত্তন করিতে পারেন, তবে আবার আমরা উপলব্ধি করিতে পারি, ছাত্র জীবনে শীর্ণ দেহ, নিরুৎসাহ মন, স্মৃতিশক্তিহীনতা, অকালবার্দ্ধক্য অবশ্যম্ভাবী নহে বরং ছাত্র জীবনেই শারীরিক ও মানসিক সর্ব্ববিধ গুণের পূর্ণ সুষমা বিকাশ হইয়া থাকে এবং ইহা ও উপলব্ধি করিতে পারি—কেমন করিয়া গৃহে গৃহে ছাত্রের মুখে প্রফুল্লতার সঙ্গে গাম্ভীর্য্যের সংযোগ হয়,—প্রতিজ্ঞার সঙ্গে সুশিক্ষাজনিত বিনয়ের একত্র সমাবেশ হইতে পারে এবং বীর্য্যের সঙ্গে প্রতিভার শুভ পরিণয় সম্ভবে। ভারতের জীবন তখন পরিপূর্ণতার, সফলতার আনন্দে শিহরিত হইবে। ভারতের মনস্বী চিন্তাপ্রসূত-আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসা সার্থক হইবে, আয়ুর্বৃদ্ধি তখন নিরর্থক হইবে না, বাঁচিয়া থাকা তখন লাঞ্ছনার হইবে না। তখন বাঁচিবার জন্য লোক পাগল হইবে। কারণ, তখন দীর্ঘজীবন, সুস্থ শরীর, জ্ঞানময় মন—একই স্থানে বাস করিবে, কারণ তখন বাঁচিবার আশা ও জ্ঞানলাভের তৃষা করবদ্ধ হইয়া ভবিষ্যের আলোকময়-লোকের পথে যাত্রা করিবে।

আয়ুর্ব্বেদ আমাদের অতীত গৌরবের চিহ্ন। এ অতীত মহিমার গৌরব যখন আমরা বুঝিয়াছি, যখন এই পাশ্চাত্যশিক্ষা-প্লাবনের যুগেও আবার "আয়ুর্ব্বেদ কলেজ" স্থাপিত হইয়াছে, খুব আশা হয়—এই আয়ুর্ব্বেদ কলেজই আমাদিগকে সেই অতীত সামঞ্জস্য-শিক্ষার পুনরুদ্যাপনের গৌরবে গৌরবান্বিত করিবে।

শ্রীসতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ,

বর্ষা-বন্দন।

এস, স্নিগ্ধ শ্যাম শান্ত প্রকৃতি মোহন!
ধারি বরিষণ! এস, সন্তাপ হরণ!
নিদাঘে দারুণ রবি
শীর্ণ করি দেহ-ছবি—
প্রখর কিরণে বল করেছে হরণ,
তপ্ত শুষ্ক দেহে তাই করি আবাহন।

কদম্ব পরাগ-বাহী সুরভি সমীর
মথি সারা কায়ে এস শীতল-শরীর!
জলদের নীলাম্বর
পরি অঙ্গে ঋতুবর!
এস সাজি বিদ্যুতের কণক-মালায়,
তাপিত ধরণী আছে তব প্রতীক্ষায়।

যাবে এবে দিনকর দক্ষিণ অয়ন
শুনিয়ে তোমার সনে অবনী মিলন,
বলীয়ান সোম-সখা
আসিয়া করিবে দেখা,
বাড়াইবে মানবের ক্ষীণ দেহে বল,
নব পল্লবিত হবে ওষধি সকল।

তাই বলি এস ত্বরা তাপিত জীবন!
আদেশ জানাও নরে করি গরজন,
তোমার পরশ লাভে
ভূবায়ু শীতল হ'বে
মন্দ হবে মানবের জঠর অনল,
লঘুভোজী নর নারী পাবে নব বল।

ধৌত শুভ্র বাস যার সুগন্ধ বিলাসী
শীতল-শীকর-বায়ু-হীন-হর্ম্ম্যবাসী
দিবানিদ্রা পরিহরি
ব্যায়াম বর্জ্জনকারী
রবির কিরণ ত্যাগী রবে নিরাময়
এসে এই বলে দাও জীবে দয়াময়।

শ্রীসুরেন্দ্রকুমার দাশ গুপ্ত কাব্যতীর্থ

আয়ুর্ব্বেদে ক্ষার-কল্পনা।

[রসায়ন তত্ত্ব]

—— :*: ——

এ দেশে এখনও এমন অনেকে আছেন, যাঁহাদের চক্ষে বৈদিক ঋষি বর্ত্তমান হটেনটট্‌ বা সাওতালেরই একটু মার্জ্জিত সংস্করণ মাত্র। য়ুরোপ সভ্য হইবার পূর্ব্বে—আর্য্য ঋষি যে পার্থিব বিজ্ঞানেও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন, একথা হয়ত তাঁহাদের কাছে আরব্য উপন্যাসের আখ্যায়িকার মতই অসম্ভব শুনাইবে। তথাপি আজ আমরা আয়ুর্ব্বেদের "ক্ষার কল্পনাকে" উপলক্ষ করিয়া ঋষি প্রতিভার যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিব।

অনেকের ধারণা—আর্য্য ঋষিগণ মনস্তত্ত্বের যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু ভৌতিক বিজ্ঞানে তাঁহাদের আদৌ কোন অধিকার ছিল না। আমরা তাঁহাদিগকে ভারতের জীবন্ত বিজ্ঞান আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

য়ুরোপের "রসায়নী বিদ্যা"—এখন সভ্য সমাজে যথেষ্ট সমাদর লাভ করিয়াছে, কিন্তু বলিতে লজ্জা নাই—এই রসায়নী বিদ্যাও সর্ব্ব প্রথম ভারতবর্ষেই আবিষ্কৃত হইয়াছিল।

* আয়ুর্ব্বেদীয় ঋতুচর্য্যা অবলম্বনে লিখিত।

বৈদিক যুগের সোম-সন্ধান যিনি মন দিয়া পড়িয়াছেন, তাঁহাকে আর নূতন করিয়া বুঝাইতে হইবে না—হিমালয়ের সানুপর্ণকুটিরে যেদিন হৈম পাত্রে সোম বিন্দুর উচ্ছ্বাস উঠিয়াছিল, সেই দিন ভারতেই জগতে রসায়নশাস্ত্রের জাতোৎসব সম্পন্ন করিয়াছিল।

সুশ্রুতের ত্রিবিধ ক্ষার কল্পনা পাঠ করিলে প্রাচীন হিন্দুর রসায়নের ইতিহাস বেশ বুঝিতে পারা যায়। সে ক্ষার প্রস্তুত প্রণালী আধুনিক উন্নত বিজ্ঞান সম্মত। শাস্ত্রকারের উপদেশ —যে সকল পদার্থের ক্ষার প্রস্তুত করিতে হইবে, প্রথমেই তাহা অগ্নিতে দগ্ধ করিবে। পরে সেই ভস্মাবশেষ জলে গুলিয়া অগ্নির তীব্র তাপে জ্বাল দিলে যে চূর্ণবৎ পদার্থ পাক পাত্রে অবশিষ্ট থাকিবে, উহারই নাম ক্ষার। আয়ুর্ব্বেদে অনেক প্রকার ক্ষার ও তাহাদের বিভিন্ন কার্য্য প্রণালীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সকলগুলির পরিচয় দেওয়া চলে না। আমি কেবল প্রধান ক্ষার গুলির উল্লেখ করিব।

যবক্ষার।—বহু শতাব্দি অতীত হইল—ভারতের প্রাচীন বিজ্ঞান চরক ও সুশ্রুতে, এই যবক্ষারের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং অতি প্রাচীন কাল হইতেই ভারতে এই যবক্ষারের ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে। ইহার অনেকগুলি পর্য্যায় আছে, যথা—"যবাগ্রজ" "যবলাস" "যবশূক" "যবনালজ" "যবজ" ও "যবাপত্য"। এই প্রতিশব্দগুলি বিশেষভাবে পর্য্যালোচনা করিলে জানা যায়—যব ভস্ম করিয়া যে ক্ষার পদার্থ পাওয়া যায়—তাহার নামই যবক্ষার। ইহার প্রস্তুত প্রণালী এইরূপ ;—

প্রথমে যবের শূক (শিষ বা শুঁয়া) অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া, সেই ভস্ম একসের পরিমাণে লইবে, এবং তাহা ৬৪ সের জলে গুলিবে। পরে সেই ক্ষার মিশ্রিত জলকে উপর্য্যুপরি একবিংশতি বার বস্ত্র খণ্ডে ছাঁকিয়া লইবে। শেষে সেই জল কোনও পাত্রে রাখিয়া তীব্র অগ্নিতাপে জ্বাল দিবে। জলীয়াংশ মরিয়া গিয়া যখন দেখিবে পাত্রে একরকম চূর্ণ পদার্থ অবশিষ্ট রহিয়াছে—তাহা গ্রহণ করিবে। ইহাই হইল যবক্ষার। এই প্রণালীতে যে ক্ষার প্রস্তুত হইয়া থাকে, ডাক্তারেরা তাহাকে Corbonate of Potash বলেন। কিন্তু অনেকস্থলেই আমরা দেখিতে পাই—আধুনিক বিজ্ঞানে যবক্ষারকে 'সোরা' বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এই জন্য—নাইট্রোজেন গ্যাসের বাঙ্গালা নাম "যবক্ষার জান"।

সোরার ইংরাজী নাম—"নাইট্রেট অফ্ পটাস্"। যব হইতে জাত যবক্ষারের সঙ্গত অভিধান—"কার্ব্বনেট অফ্ পটাস্"। এই দ্রব্য সম্পূর্ণ পৃথক্।

ক্ষারতত্ত্বের সম্যক্ আলোচনা করিলে আমরা বুঝিতে পারি,—প্রাচীন কালে স্থলজ বৃক্ষ পোড়াইয়া ঋষিরা তাহার ক্ষার ব্যবহার করিতেন। ডাক্তারী বিজ্ঞানেও দেখা যায়—অধিকাংশ স্থলজ বৃক্ষ আছে, যাহা পোড়াইলে অবিশুদ্ধ পোটাসিয়ম কার্ব্বনেট পাওয়া যায়। পল্লীর অশিক্ষিত সমাজেও আমরা দেখিয়াছি—কদলী বৃক্ষের ভস্ম দ্বারা লোকে বস্ত্রাদি ধৌত করিয়া থাকে। যুগ যুগান্তর পূর্ব্বে যুগাবতার সুশ্রুত নিম্নলিখিত বৃক্ষগুলি পোড়াইয়া ক্ষার প্রস্তুত করিবার উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। যথা ;—

ঘণ্টাপারুল, কুড়চী, অশ্বকর্ণ, পারিভদ্রক, বহেড়া, সোঁদাল, তিল্বক (লোধবৃক্ষ) আকন্দ, মনসাসিজ্, আপাং, পারুল, ডহরকরঞ্জ,

বাসক, কদলী, রক্তচিত্রক, নাটাকরঞ্জ, ইন্দ্রবৃক্ষ (কুটজ ভেদ) আস্ফোতা, অশ্বমারক (করবীর), ছাতিম, গণিয়ারী, কুঁচ এবং ঘোষাবৃক্ষ।

কেনেডা, উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ রুষিয়া প্রভৃতি স্থানে প্রচুর পরিমাণে স্থলজ বৃক্ষ জন্মিয়া থাকে।—ঐ সকল দেশবাসীরা এখনও পর্য্যন্ত বৃক্ষাদি দগ্ধ করিয়া কার্ব্বনেট অফ্ পটাস প্রস্তুত করিয়া থাকে।

সর্জ্জিক্ষার—আয়ুর্ব্বেদে আর একটী ক্ষারের নাম—সর্জ্জিক্ষার। ইহার অপভ্রংশে—সাচিক্ষারের নামের সৃষ্টি। স্থলজ বৃক্ষ-লতাদি দগ্ধ করিয়া যেমন কার্ব্বনেট অফ পটাশ পাওয়া যায়, সেই রূপ জলজ ও সমুদ্রতীর জাত বৃক্ষ-লতাদি দগ্ধ করিয়া সেই ভস্ম হইতে কার্ব্বনেট অব সোডা পাওয়া যায়। অতি প্রাচীনকালে মিশ্র (মিশর) দেশে এই সোডা—সাবান ও কাচ-নির্ম্মাণ কার্য্যে ব্যবহৃত হইত। চরক ও সুশ্রুত পাঠেও আমরা জানিতে পারি—স্মরণাতীত কাল হইতেই এই জ্ঞান-পুণ্য-বহুলা ভারত ভূমিতেও ইহার ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে।

বাজারে সচরাচর সাজিমাটী নামে যাহা বিক্রয় হইয়া থাকে, তাহা আর কিছুই নহে—মৃত্তিকা মিশ্রিত কার্ব্বনেট অফ সোডা। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে কোন কোন দেশের লবণাক্ত ভূমিতে একপ্রকার সামুদ্রিক লতা জন্মিয়া থাকে, তাহা দগ্ধ করিলে যথেষ্ট পরিমাণে সর্জ্জিক্ষার সংগৃহীত হইয়া থাকে।

বহুকাল পূর্ব্বে—চরক ও সুশ্রুত প্রভৃতি বৈদ্যকাচার্য্যগণ, যবক্ষার (Carbonate of Potash) এবং সর্জ্জিকা ক্ষার (Carbonate of Soda)—এই দুইটী যে পৃথক পদার্থ তাহা জানিতেন। কিন্তু য়ুরোপে বহুদিন পর্য্যন্ত এই দুইটী ক্ষার একই পদার্থ বলিয়া স্বীকৃত হইয়া আসিতেছিল ;এখন সে সন্দেহের নিরসন হইয়া গিয়াছে।

সুশ্রুত একজন অদ্বিতীয় অস্ত্র চিকিৎসক ছিলেন। তদীয় শল্য-তন্ত্রের প্রভাব—য়ুরোপ সভ্য হইবার পূর্ব্বে—নিখিল বিশ্বকে একদা বিস্ময়-বিমুগ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল। দুঃখের বিষয়—সেই সুশ্রুতের বংশধরগণ, আজ সুশ্রুতোক্ত যন্ত্রশস্ত্রের আকৃতি চিনিতে পারিল না! সুশ্রুত অস্ত্র চিকিৎসার অঙ্গ স্বরূপ—ক্ষার প্রস্তুত প্রণালীর আবিষ্কার করিয়াছিলেন। সে ক্ষার ত্রিবিধ। ১। মৃদু। ২। মধ্যম। ৩। তীক্ষ্ণ। মৃদুক্ষার (mild) মধ্যম ক্ষার (caustic) সুশ্রুতের তীক্ষ্ণক্ষার ভিন্নপ্রকারের ক্ষার পদার্থ নহে। মৃদুক্ষারে দন্তী দ্রবন্তী প্রভৃতির সংমিশ্রণ ঘটাইয়া তীক্ষ্ণক্ষার প্রস্তুত হইয়া থাকে। সুশ্রুতের মধ্যম ক্ষারকে caustic Alkall বলা যায়। মহাত্মা সুশ্রুত তীক্ষ্ণক্ষার প্রস্তুতের যে প্রণালী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, বিলাতী বৈজ্ঞানিকগণও তাহার অনুসরণ করিয়াছেন। ঘণ্টাপারুল, কুটজ প্রভৃতি বৃক্ষের ক্ষারাত্মক ভস্মাবশেষ জলে গুলিয়া ছাঁকিয়া লইয়া, তাহাতে ভস্ম শর্করা, ঝিনুক, শঙ্খনাভি—অগ্নিদগ্ধ করিয়া যে চূর্ণ (caustic lime) পাওয়া যায়—সেই চূর্ণ মিশাইয়া অগ্নিতে পাক করিলেই তীক্ষ্ণক্ষার প্রস্তুত হইয়া থাকে। সুশ্রুতের আবির্ভাব কাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত—বহুযুগের ব্যবধান, কিন্তু এখনও য়ুরোপের রাসায়নিকগণ সুশ্রুতের মতেরই অনুসরণ করিয়া আসিতেছেন। তাঁহারা এখনও মৃদুক্ষারের সহিত চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া জ্বাল দিয়া তীক্ষ্ণক্ষার প্রস্তুত করিয়া

থাকেন। সুশ্রুত লৌহ-কলসীর মধ্যে মুখবন্ধ করিয়া তীক্ষ্ণক্ষার সংরক্ষণের উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণও এই ব্যবস্থামত ক্ষার রক্ষা করিয়া থাকেন।

তীক্ষ্ণক্ষার হীনবীর্য্য হইলে, অর্থাৎ Carbonated হইয়া গেলে, পুনরায় চূণের সহিত তাহাকে জ্বাল দিয়া লইতে হয়। এই আধুনিক বিজ্ঞানের মতটীও সুশ্রুতের মতের প্রতিধ্বনি মাত্র।

সুশ্রুতের মতে—ক্ষার ঈষৎ শ্বেতবর্ণ ও পিচ্ছিল। নব্য রাসায়নিকগণও এই কথা স্বীকার করিয়া থাকেন। অম্লরসের (Acids) দ্বারা যে তীক্ষ্ণক্ষারের তেজ নষ্ট (Neutralisation) হয়,—ভারতের অদ্বিতীয় বৈজ্ঞানিক সুশ্রুতই ইহা আবিষ্কার করিয়াছিলেন। সুশ্রুত বলেন—ক্ষার পদার্থে লবণ রস আছে, সেইজন্য অম্লরসের সহিত লবণ রস মিশ্রিত হইলে, ক্ষারের তীক্ষ্ণতা দূর হয়—ক্ষার মাধুর্য্য গুণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। নব্য রসায়ন শাস্ত্রেও প্রকারান্তরে—এই মত সমর্থিত হইয়াছে। অম্ল ও ক্ষার সংযুক্ত হইয়া যে একরকম নূতন পদার্থ উৎপাদিত হয়, তাহার নাম লবণ (Salt); এই লবণ-জাতীয় পদার্থে অম্ল বা ক্ষারের গুণ না থাকায়, অম্ল ও ক্ষারের সংযোগে—ক্ষারের তেজ প্রশমিত হয়। ইহাই নব্য রসায়নের সিদ্ধান্ত।

মৃদুক্ষার।—যব ভিন্ন বহু স্থলজ বৃক্ষের ভস্ম হইতে যে ক্ষার পদার্থ পাওয়া যায়, আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ তাহা জানিতেন। ঘণ্টাপারুল, কুড়চী, পারিভদ্র প্রভৃতি বৃক্ষ দগ্ধ করিয়া মৃদুক্ষার প্রস্তুত-প্রণালী অনুধাবন করিলেই আমরা তাহা বুঝিতে পারি। বাহুল্য ভয়ে সে সকল বিধি আমরা উদ্ধৃত করিলাম না। অনুসন্ধিৎসু পাঠক সুশ্রুতোক্ত "ক্ষার পাক বিধি" পড়িয়া দেখিবেন। ঘণ্টাপারুল, কুড়চী প্রভৃতির ভস্ম এক এক ভাগ লইয়া (মোট ৩২ সের) ১৯২ সের জলে (অথবা গোমূত্রে) গুলিয়া, তাহা উপর্য্যুপরি ২১ বার বস্ত্র পরিশ্রুত করিয়া সেই ক্ষারজল গ্রহণ করিবে। পরে ঐ জল কটাহে চড়াইয়া অগ্নির জ্বালে পাক করিতে হইবে। মধ্যে মধ্যে হাতা দিয়া উহা নাড়িয়া দিবে। যখন দেখিবে উহা স্বচ্ছ রক্তবর্ণ ও পিচ্ছিল হইয়াছে, তখন নামাইয়া ছাঁকিয়া সিঠা বাদ দিবে। ইহারই নাম মৃদুক্ষার।

মধ্যম ক্ষার।—মৃদুক্ষার অর্থাৎ কার্ব্বনেট হইতেই মধ্যম ক্ষার প্রস্তুত হইয়া থাকে। নব্য রাসায়নিকগণ—চূণের সহিত কার্ব্বনেটকে উত্তপ্ত করেন। সুশ্রুতেরও ইহাই অভিমত।

পূর্ব্বোক্ত নিয়মে প্রস্তুত ক্ষারজল হইতে ৴১॥০ জল পৃথক করিয়া রাখিয়া বাঁকি জল কড়ায় করিয়া জ্বাল দিবে। পরে নাটা, ভস্ম শর্করা, ঝিনুক ও শঙ্খ নাভি এই ৪ দ্রব্য অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া যে চূর্ণ প্রস্তুত হইবে—সেই চূর্ণ ৴৪ সের লইয়া—পৃথক রক্ষিত দেড় সের ক্ষার জল সহ পেষণ করিয়া চুল্লীস্থ ক্ষার মধ্যে উহা নিক্ষেপ করিবে। হাতা দিয়া ঘন ঘন নাড়িতে থাকিবে—যেন উহা তরল হইয়া না যায়। পাকশেষে নামাইয়া, লৌহ কলসে পুরিয়া মুখ বন্ধ করিয়া রাখিয়া দিবে। ইহারই নাম মধ্যম ক্ষার।

তীক্ষ্ণ ক্ষার।—তীক্ষ্ণক্ষার—একটী স্বতন্ত্র ক্ষার নহে। মৃদুক্ষারে, দন্তী, দ্রবন্তী, রক্ত চিত্রক, গণিয়ারী, নাটাকরঞ্জ, তালমূলী, বিটলবণ, সুবর্চ্চিকা, কনকক্ষীরী, হিং, বক, এবং কাষ্ঠ বিষ—ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৪

তোলা মাত্রায় নিক্ষেপ করিয়া পাক করিলে তীক্ষ্ণক্ষার প্রস্তুত হয়।

ক্ষার-কল্পনায়—সুশ্রুতোক্ত প্রণালীই যে আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ গ্রহণ করিয়াছেন, সংক্ষেপে আমরা তাহা দেখাইলাম। সুশ্রুত অস্ত্র চিকিৎসার সময় প্রয়োজনীয় স্থলে এই সকল ক্ষারের প্রয়োগ করিতেন। সুশ্রুত বলিয়াছেন, পীড়িত স্থান ক্ষার দ্বারা দগ্ধ করিলে জ্বালা করিতে থাকে। সেই জ্বালা নিবারণের জন্য, সুশ্রুত দগ্ধ স্থানে ঘৃত ও মধুসহ অম্ল বর্গের প্রলেপ দিবার উপদেশ দিয়াছেন। ক্ষার দ্রব্যে অম্লরস ব্যতীত সকল প্রকার রসেরই অস্তিত্ব আছে। তবে ইহাতে কটুরস ও লবণ রসের আধিক্য দেখিতে পাওয়া যায়।

হায়! সুশ্রুতের যুগ ত অনেক দিন চলিয়া গিয়াছে, তাঁহার শল্যতন্ত্রও নামশেষ হইয়াছে, কিন্তু তিনি যে জগতের প্রথম বৈজ্ঞানিক—কেবল এই কথা বলিয়াই আমরা সভ্যজগতে এখনও গর্ব্ব প্রকাশ করিতে পারি।

শ্রীসুধাংশুভূষণ সেন গুপ্ত।

ক্ষয়রোগ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর।)

স্ত্রীলোকের ঋতু বন্ধ।—ক্ষয়রোগ জন্মিলে স্ত্রীলোকের ঋতু বন্ধ হইয়া যায়। ধাতু সকলের ক্ষয় এবং শরীর রক্তহীন হয় বলিয়া এইরূপ ঘটে। যেমন প্রসবের সময় অতিরিক্ত রক্ত স্রাব হয় বলিয়া শরীরে পুনরায় যথেষ্ট রক্ত সঞ্চয় না হওয়া পর্য্যন্ত ঋতুস্রাব হয় না, ইহাও সেইরূপ রক্তের অভাবে ঘটিয়া থাকে।

জ্বর, অরুচি ভয়ানক উৎকাসি।—রোগিনী মুসলমান জাতীয়। কথিত উপসর্গ ব্যতীত আর কোন উপসর্গ ছিলনা। প্রথমে কাস সংযুক্ত জ্বর মনে করিয়া চিকিৎসা করি। কিন্তু কাস, কিছুতেই কমে না। দিবারাত্রি রোগী কাসে, বিরাম নাই, বলিলেই চলে। কাস যখন কিছুতেই কমিল না, জ্বর সর্ব্বদাই থাকে এবং শরীরে অত্যন্ত ক্ষয় হইতেছে দেখিলাম, তখন ক্ষয়রোগ বলিয়াই স্থির করি। অল্পদিন পরেই রোগী মারা যায়।

যত প্রকার ছদ্মবেশে যক্ষ্মারোগ উৎপন্ন হয়, তন্মধ্যে যাহা দেখিয়াছি তাহাই লিখিলাম। বোধ হয় ইহার আরও প্রকারভেদ থাকিতে পারে। ফলকথা যক্ষ্মা রোগ এইরূপভাবে চোরের মত লুকাইয়া আক্রমণ করে বলিয়া অনেক সময় প্রথমে রোগ ধরা পড়ে না, সেইজন্য প্রায়ই মারাত্মক হয়। সুতরাং এ সম্বন্ধে সাধারণের ও চিকিৎসকগণের যথেষ্ট সতর্ক হওয়া উচিত।

ক্ষয়রোগের অসাধ্য লক্ষণ সম্বন্ধে শাস্ত্রে লিখিত হইয়াছে,—"পূর্ব্ব কথিত একাদশ প্রকার উপসর্গ, অথবা কাস, অতিসার, পার্শ্ব বেদনা, স্বরভঙ্গ, অরুচি ও জ্বর এই ছয়টী উপসর্গ, অথবা জ্বর, কাস ও রক্ত নির্গমন এই তিনটী উপসর্গ ঘটিলে রোগী বাঁচে না।" গ্রন্থান্তরে কথিত হইয়াছে—"কাস ও মাংসের ক্ষয় ঘটিলে কিম্বা সমস্ত

লক্ষণ, অর্দ্ধেক লক্ষণ বা তিনটী (পূর্ব্ব কথিত) লক্ষণ প্রকাশ পাইলে রোগী রক্ষা পায় না।”

অপর অসাধ্য লক্ষণ যথা—“যে ক্ষয়রোগী প্রচুর আহার করা সত্বেও ক্ষীণ হইতে থাকে, যাহার অতিসার হয় এবং মুষ্ক ও উদর ফুলিয়া উঠে সে রোগী বাঁচে না। যে রোগীর চক্ষু শুক্লবর্ণ, অন্নে দ্বেষ হইয়াছে, কষ্টে প্রস্রাব করে এবং উর্দ্ধশ্বাস হয়, সে রোগীর শীঘ্র মৃত্যু হয়।

চিকিৎসাযোগ্য ক্ষয় রোগীর সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে,—

“যে রোগীর জ্বরানুবন্ধ নাই ; যে রোগী বলবান, যে রোগী চিকিৎসা ক্রিয়া (বমন, বিরেচন, ঔষধ) সহ্য করিতে সক্ষম, যে রোগী অত্যাচারী নহে), দীপ্তাগ্নি সম্পন্ন এবং অকৃশ —এইরূপ রোগীর চিকিৎসা করিবে

ফলতঃ ক্ষয় রোগীর আরোগ্য লাভের পক্ষে দুইটী বিষয় প্রধান, বল, মাংস প্রথমতঃ ক্ষয় না হওয়া এবং দ্বিতীয়তঃ অগ্নি প্রবল থাকা। অবশ্য ক্ষয়রোগ জন্মিলে বল, মাংসের কিছু ক্ষয় হইবেই, কিন্তু অতিরিক্ত ক্ষয় হইলে আর আরোগ্য লাভের আশা থাকে না। তারপর অগ্নিবল। শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

“পুরুষের জীবনের মূল বল এবং বলের মূল অগ্নি। সুস্থ ব্যক্তির পক্ষেই এই,—ক্ষয় রোগীরত কথাই নাই। ক্ষয়রোগীর অগ্নি যদি যথেষ্ট পুষ্টিকর খাদ্য পরিপাক করিয়া ক্ষয়ের পূরণ করিতে না পারে, তবে সে রোগীর জীবনের আশা কম।

ক্ষয়রোগ ভাল হয় কি না ?—এ সম্বন্ধে আমাদের ভাবিবার কিছু নাই। পৌরাণিক কাহিনীতে বহু প্রাচীন কালে চন্দ্রদেবের যক্ষ্মা রোগ হইতে মুক্ত হইবার পরিচয় পাওয়া যায়। চিকিৎসা শাস্ত্রেও ক্ষয়রোগের সাধ্যাসাধ্য অবস্থা লিখিত হইয়াছে। কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা এই বিষয় লইয়া বহুকাল হইতে মাথা ঘামাইয়া আসিতেছেন। এতদিন যক্ষ্মারোগ ভাল হয় না বলিয়া তাঁহাদের ধারণা ছিল। সুখের বিষয় এক্ষণে তাঁহারা ইহা সুখসাধ্য বলিয়া স্থির করিয়াছেন। অবশ্য প্রথম হইতে চিকিৎসা করা আবশ্যক এ কথাও তাঁহারা বলেন।

পাশ্চাত্য পণ্ডিত সকল, মুক্তবায়ু —সেবনই ক্ষয়রোগের প্রধান চিকিৎসা বলিয়া স্থির করিয়াছেন। কিন্তু আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র—সারবান পদার্থ—যথা দুগ্ধ, মাংস, স্বর্ণভস্ম, মুক্তাভস্ম প্রভৃতির পক্ষপাতী। একথায় কেহ যেন মনে না করেন যে আয়ুর্ব্বেদ ক্ষয়রোগে মুক্তবায়ু-সেবনের উপকারিতা বুঝেন না ; আয়ুর্ব্বেদ মুক্তবায়ু সেবনের উপকারিতা বিলক্ষণই বুঝিতেন। তাই শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে যে, “বায়ুই আয়ু।” তদ্ব্যতীত শাস্ত্রে আরও কথিত হইয়াছে যে, ঋতুবিষম অর্থাৎ যে ঋতুতে যেরূপ হওয়া উচিত তাহার বিপরীত—যেমন বসন্তকালে উত্তরবায়ু, অতি স্তিমিত (স্তব্ধ), অতি চল (দ্রুতগামী), অতি পরুষ (খরখরে), অতি শীতল, অত্যন্ত উষ্ণ, অত্যন্ত রুক্ষ, অত্যন্ত অভিষ্যন্দী (জল সংযুক্ত) অতি ভয়ঙ্কর শব্দযুক্ত, ও পরস্পর অতি প্রতিহত, অতি (ঘূর্ণমান) এবং অহিতকর গন্ধ, বাষ্প (গ্যাস), সিকতা, ধূলি ও ধূম সংযুক্ত বায়ু দূষিত। আবার ধূমও শোথ ও কাস রোগের কারণ স্বরূপ। সুতরাং ক্ষয়রোগীর পক্ষে যে দূষিত বায়ু সেবন পরিত্যাগ করা উচিত—সে বিষয়ে সন্দেহ কি ? আবার সহরের ধূলিধূমসংযুক্ত বায়ু অপেক্ষা পল্লীর নির্ম্মল বায়ু যে হিতকর তাহা নিশ্চয়।

প্রকৃত কথা, বিশুদ্ধ বায়ু যে ক্ষয়রোগীর পক্ষে হিতকর এবং ধূমধূলি সংযুক্ত বায়ু যে অনিষ্টকর ইহা অবিসংবাদিত। কিন্তু তদ্ব্যতীত ক্ষীণমান যক্ষ্মারোগীর দেহের ক্ষয় নিবারণ জন্য পুষ্টি-জনক ঔষধও নিতান্ত আবশ্যক। ফলতঃ ক্ষয়রোগীর শরীরের পুষ্টি সাধনই শ্রেষ্ঠ চিকিৎসা। সেইজন্যই আয়ুর্ব্বেদে ক্ষয়রোগীকে ক্ষয়নিবারক এবং ধাতুপোষক ঔষধ দিবার ব্যবস্থা আছে।

স্বর্ণভস্ম, রৌপ্য, তাম্র, হীরকভস্ম, মুক্তাভস্ম লৌহভস্ম প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার পুষ্টিকর ধাতু, উপধাতু যক্ষ্মারোগে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যক্ষ্মা রোগীর যে ক্ষয়কর ঘর্ম্ম হয়, তাহা নিবারণের জন্য ক্ষয়নিবারক অনেক ঔষধের সহিত প্রবাল ভস্ম সংযুক্ত করা হইয়াছে। প্রবালের ন্যায় উৎকৃষ্ট ঘর্ম্ম-রোধক ঔষধ আর নাই। যাহাদের স্বভাবতঃ অত্যন্ত ঘর্ম্ম হয়, তাহাদিগের পক্ষে প্রবালের মালা ধারণ করিলে ঘর্ম্মাধিক্য নিবারিত হইয়া থাকে।

কস্তূরী বা মৃগনাভিও ক্ষয়রোগের একটী শ্রেষ্ঠ ঔষধ। ইহা যে কেবল পুষ্টিকর এবং ক্ষয়নাশক তাহা নহে। ইহা শারীরিক ক্রিয়ার উত্তেজক বলিয়া যক্ষ্মারোগে মহোপকার সাধন করিয়া থাকে। অপিচ কস্তূরী কফ, বায়ু, শীত এবং বিষনাশক।

ক্ষয়নিবারণের জন্য শাস্ত্রকারগণ চ্যবনপ্রাশ, ছাগলাদ্য ঘৃত প্রভৃতি বিশিষ্ট পুষ্টিকর ঔষধ প্রয়োগের বিধি দিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ঘৃতাদি ক্ষয়রোগীর সকল অবস্থায় প্রযুজ্য নহে। জ্বর, অজীর্ণ, উদরাময় প্রভৃতি থাকিলে ঘৃত সহ্য হয় না। তবে অজীর্ণ সত্ত্বেও ভোজনের প্রথম গ্রাসের সহিত অল্প মাত্রায় ছাগলাদ্য ঘৃত প্রয়োগ করিয়া সহ্য হইতে দেখিয়াছি। যাহা হউক জ্বর প্রভৃতি উপসর্গ না থাকিলে ঘৃত প্রয়োগে বিশেষ ফল হইয়া থাকে।

পথ্য সম্বন্ধে কবিরাজদিগের একটু দুর্নাম আছে। জ্বর, অতিসার প্রভৃতি রোগের প্রথমাবস্থায় তাঁহারা রোগীকে লঙ্ঘন দিয়া থাকেন। কিন্তু ক্ষয়রোগের পথ্য সম্বন্ধে ঠিক তাহার বিপরীত। ক্ষয়রোগে সর্ব্বপ্রকার পুষ্টিকর পথ্য দিবার বিধি আছে। যব, গম, মুগ, ছোলা, উত্তম চাউল, মাখন, ঘৃত প্রভৃতি হইতে প্রস্তুত নানাপ্রকার খাদ্য এই রোগে সুপথ্য। মাংসেরত কথাই নাই, মাংসের যূষ, মাংসের বড়া, মাংস রৌদ্রে শুষ্ক ও চূর্ণ করিয়া তাহা হালুয়ার ন্যায় করিয়া, মাংসের লাড়ু—এইরূপ বিবিধ উপায়ে ক্ষয়রোগীকে মাংস দিবার ব্যবস্থা আছে। জাঙ্গল দেশজ মৃগ, পক্ষীর মাংস, যক্ষ্মারোগে হিতকর। যক্ষ্মা রোগের চিকিৎসায় সর্ব্বাপেক্ষা ছাগের বড়ই আদর। শাস্ত্র বলিয়াছেন,—"ছাগমাংস, ভক্ষণ, ছাগদুগ্ধ চিনি সংযুক্ত পান, ছাগী ঘৃত, ছাগসেবা এবং ছাগমধ্যে শয়ন—ক্ষয়রোগ নাশক।

সুশ্রুতে—লিখিত আছে যে, ছাগবিষ্ঠা, ছাগমূত্র, ছাগদুগ্ধ, ছাগঘৃত, ছাগরক্ত ও ছাগ-মাংস সেবন যক্ষ্মারোগ নাশক।

ছাগের যে যক্ষ্মারোগ প্রতিষেধক শক্তি আছে, তাহা আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরাও প্রমাণ করিয়াছেন। ছাগের শরীরে যক্ষ্মা-রোগের বীজ প্রবিষ্ট করাইয়া দিলেও উহাদের যক্ষ্মারোগ হয় না।

যক্ষ্মারোগের পথ্যাপথ্য শাস্ত্রে যাহা লিখিত হইয়াছে,—আমরা নিম্নে তাহা লিপিবদ্ধ করিতেছি।

মোচা, পাঁকা কাঁটাল, পাকা আম,

খেজুর, ফলসা ফল, আমলকী, কিসমিস, সজিনার ফুল ও ডাঁটা, পলতা, কচি তালশাঁস, কর্পূর, মিছরী প্রভৃতি ক্ষয়রোগে হিতকর।

মলমূত্রাদির বেগধারণ, পরিশ্রম, স্ত্রীসহবাস, স্বেদ, রাত্রিজাগরণ, বলপ্রয়োগসাধ্য কার্য্য করা রুক্ষ অন্নপান, তাম্বূল, তরমুজ, কুলথ কলায়, মাষকলায়, রশুন, বাঁশের কোঁড়, হিং, অম্লদ্রব্য, তিক্ত দ্রব্য, কষায় দ্রব্য, কটু দ্রব্য, সর্ব্বপ্রকার পত্র-শাক, ক্ষারদ্রব্য, শিম, প্রভৃতি ক্ষয়রোগে অপথ্য।

ক্ষয় রোগীর মন যাহাতে প্রফুল্ল থাকে, তাহার ব্যবস্থা করিবার উপদেশ শাস্ত্রে বিশেষভাবে দেওয়া হইয়াছে। সুবেশবিন্যাস, মাল্যধারণ, হর্ষজনক বাক্যশ্রবণ, সঙ্গীতশ্রবণ, নৃত্যদর্শন, চন্দ্রকিরণ দর্শন, মুক্তামণি নির্ম্মিত প্রচুর ভূষণধারণ, যজ্ঞ, দান, দেবতা ও ব্রাহ্মণের পূজা—ক্ষয়রোগীর পক্ষে হিতকর। এই সমস্ত কার্য্যদ্বারা রোগীর মন বেশ প্রফুল্ল ও সন্তুষ্ট থাকে। অপিচ, সর্ব্বদা রোগের বিষয় ভাবিয়া রোগী রোগকে বর্দ্ধিত করিয়া তুলিতে পারে না। মনের সুখ আরোগ্যের সর্ব্বপ্রধান সহায়।

ক্ষয়রোগীর মল ও শুক্র যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করা উচিত, কারণ ক্ষীণমান যক্ষ্মারোগীর সর্ব্বধাতুসার শুক্র—ক্ষয় হইলে তাহাকে আর কতদিন বাঁচাইয়া রাখা যাইতে পারে! সেইজন্য যক্ষ্মারোগীর শুক্র-ক্ষয় যাহাতে না হয়, তাহার জন্য সর্ব্বতোভাবে যত্ন করা কর্ত্তব্য।

ক্ষয় রোগীর মল রক্ষা সম্বন্ধে শাস্ত্র বলিয়াছেন,—রাজযক্ষ্মারোগীর মল বিশেষভাবে রক্ষা করা উচিত। কারণ সর্ব্বধাতুক্ষয় পীড়িত রোগীর মলই বলস্বরূপ হইয়া থাকে।

এক্ষণে আমরা বঙ্গদেশে ক্ষয়রোগের প্রাবল্যের কারণ আলোচনা করিব। পূর্ব্বে যক্ষ্মারোগের সাহসাদি যে কয়টী কারণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, প্রত্যেকটী অবলম্বন করিয়া বলা যাইতেছে।

সাহস।—সাহস বল প্রয়োগসাধ্য। বাঙ্গালীর বলই নাই, সুতরাং বল প্রয়োগ করিবে কিরূপে? যদিও এইজন্য দুই চারি জনের ক্ষয়রোগ হয়, কিন্তু তাহা রোগের প্রাবল্যের কারণ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না।

বিষমাশন—কোন দিন অল্প, কোন দিন অধিক কোন দিন সকালে, কোন দিন বিকালে, এইরূপ অনিয়মে আহার করাকে বিষমাশন বলে। আমাদের দেশে ইহার অভাব নাই সেইজন্যই ইহাকে ক্ষয় রোগের প্রাবল্যের কারণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে।

সুশ্রুতে কথিত হইয়াছে, রন্ধনশালা বিশ্বস্তজন পরিবেষ্টিত, প্রশস্ত এবং পবিত্র স্থানে হওয়া উচিত। কিন্তু বর্ত্তমানে আমাদের রন্ধনশালার "বামুন ঠাকুর" বা রসুয়ে বামুন বা চপ-কাটলেট প্রস্তুতকারী ইতর জাতীয় লোক, ময়রার দোকানের ময়রা বা অন্যজাতি একেবারেই বিশ্বস্ত নহে। ইহারা অর্থোপার্জ্জনের দিকে লক্ষ্য রাখে, ভোক্তার মঙ্গলামঙ্গলের দিকে একেবারেই লক্ষ্য রাখে না। ধর্ম্মশাস্ত্রে কথিত হইয়াছে যে, মাতাকে বা মাতৃতুল্য ব্যক্তিকে আহারীয় প্রস্তুতের ভার প্রদান করিবে। হায় বঙ্গজননীগণ; তোমরা আজ ইহার ব্যতিক্রম করিতেছ বলিয়াই বঙ্গের আজ এই দুর্দ্দশা।

খাদ্য রক্ষা সম্বন্ধে সুশ্রুত বলেন যে, বিবিধ গুণযুক্ত সুসংস্কৃত অন্ন গোপনভাবে পবিত্রস্থানে রাখিয়া দিবে। কিন্তু আমাদের ময়রার

দোকানের খাবার, হোটেলের চপ-কাটলেট পথের ধূলি রঞ্জিত হইয়া প্রকাশ্য এবং অপবিত্র স্থানে আনন্দে বিরাজ করে। রসুয়ে বামুনের রন্ধন করা অন্ন আহার করা যাঁহাদিগের ভাগ্যে ঘটে, তাঁহাদের অবস্থাও এইরূপ।

তারপর, শাস্ত্রে ঘৃত, দুগ্ধ, জাঙ্গলমাংস, প্রভৃতি পুষ্টিকর খাদ্য নিত্য আহার করিবার উপদেশ আছে। আমাদের অনেকেরই ভাগ্যে ঐ সকল জোটে না। বাঙ্গালীর ঘরে শাক আর ভাত! তাহাও আবার অনেকের ভাগ্যে টাটকা মেলে না, অনেককে বাসী ও শুষ্ক তরকারীই প্রায় আহার করিতে হয়। বাঙ্গালী ক্ষয়রোগগ্রস্ত না হইবে না তো হইবে কাহারা?

আহারের সময় সম্বন্ধে শাস্ত্রোপদেশের অনুসরণ আমরা করিতে পারিনা। ইহার প্রধান কারণ—চাকরী বা অন্য কাজ কর্ম্মের অনুরোধে অনেককেই ৮।৯।১০ টার মধ্যে খাইতে হয়। আর খাইয়াই কর্ম্মস্থলের উদ্দেশে বেগে ধাবিত হইতে হয়। কিন্তু স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য আহারের পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম করার বিধি শাস্ত্র যে মাথার দিব্য দিয়া বলিয়া গিয়াছেন! আমরা সে সকল কথা মানিনা বলিয়াই তো আমাদের এই দুঃখ! আমরা নিজের দোষে রোগ ভোগ করিতেছি—আমাদের ব্যাধি আমাদেরই অনিয়মের ফল সম্ভূত। কবি এইজন্যই না বলিয়া গিয়াছেন,—

"কারো দোষ নয় গো মা!
আমি স্বখাদ-সলিলে ডুবে মরি শ্যামা!"

(আগামী বারে সমাপ্য)

শ্রী—

সূচিকাভরণ ও INJECTION

—:*:—

আয়ুর্ব্বেদ অনন্ত ঔষধের ভাণ্ডার—এ কথা সত্য। কিন্তু তথাপি অনেক স্থলেই আধুনিক আয়ুর্ব্বেদজ্ঞকে অপদস্থ হইতে হয়। নিম্নে এরূপ একটি উদাহরণ দেওয়া গেল।

আমি এক বৎসর হইল কার্য্যোপলক্ষে মুক্তাগাছার নিকটবর্ত্তী এক পল্লীতে গিয়াছিলাম। সেখানে একটি জ্বর রোগীর আয়ুর্ব্বেদীয় মতে চিকিৎসা হইতেছিল। সন্ধ্যার সময় রোগীর নাড়ীর গতি বিশৃঙ্খলা, বাক্‌রোধ ও হিমাঙ্গ উপস্থিত হইল। কবিরাজ মহাশয় ঔষধ দিলেন, কিন্তু রোগীর গলাধঃকরণের শক্তি নাই। বেগতিক বুঝিয়া তিনি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিলেন।

তৎক্ষণাৎ একজন sub assistant surgeonকে ডাকা হইল। সেই সময় আমিও সেখানে উপস্থিত হইলাম। ডাক্তার বাবু রোগী পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "অবস্থা খারাপ, আরও পূর্ব্বে যেমন তেমন একজন এলোপ্যাথিক ডাক্তার আনাইলে ভাল হইত। এরূপ অবস্থায় কবিরাজের উপর নির্ভর করিয়া থাকা সঙ্গত হয় নাই।" কথা শুনিয়া আমি লজ্জায় ম্রিয়মান হইয়া পড়িলাম। ডাক্তারবাবু রোগীকে Injection করিলেন। রাত্রি ১২ টার সময় রোগী কথা কহিল। তখন তিনি 'মকরধ্বজের' ব্যবস্থা করিলেন। উহা আমার সঙ্গেই ছিল। এক মাত্রা প্রয়োগ করিয়াই বেশ ফল পাওয়া গেল। দুই ঘণ্টা পরে আর এক মাত্রা দিতে বলিলেন। আমি বলিলাম,

"কি ডাক্তার বাবু। ডাক্তারীতে বুঝি কুলাইতেছে না—রীতিমত যে কবিরাজী আরম্ভ করিয়া দিলেন? এখন দেখছি ডাক্তারের উপর নির্ভর করিয়া থাকাই অসঙ্গত হইয়া দাঁড়াইল! ডাক্তার বাবু হাসিয়া বলিলেন, "আমি মকরধ্বজের খুব পক্ষপাতী এবং চিরদিন ইহা ব্যবহার করিয়া আসিতেছি।" এই সূত্রে তাঁহার সহিত আমার বেশ আলাপ-পরিচয় হইল। তিনি কথায় কথায় বলিলেন, "আয়ুর্ব্বেদে কি Injection নাই?" আমি বলিলাম, "ডাক্তারী মতে Injection করিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয়, কিন্তু আমাদের মতে ওরূপ ভাবে ঔষধ প্রয়োগের কোন প্রয়োজনীয়তা নাই। এরূপ অবস্থায় সূচিকাভরণ শ্রেষ্ঠ ঔষধ। ইহা সেবন করাইতে না পারিলে রোগীর মস্তকে কিঞ্চিৎ স্থান ক্ষত করিয়া লাগাইয়া দিলে বিদ্যুদ্বেগে সমস্ত শরীরে উহার ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে। ইহাতে আপনাদের মত Spirit Lamp, Syringe প্রভৃতি কোন আপদ বালাইয়ের দরকার হয় না।" ডাক্তার বাবু বলিলেন, "উনি সূচিকাভরণ প্রয়োগ করিলেন না কেন?" আমি বলিলাম, "উহাতে সর্পবিষ আছে, কাজেই উহা সকলে প্রয়োগ করিতে পারেন না।" তিনি সর্প বিষের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া দুঃখের সহিত বলিলেন, "আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধের শ্রেষ্ঠ উপাদানগুলির ব্যবহার সম্বন্ধে যদি এখন এইরূপই হইয়া থাকে, তবে আয়ুর্ব্বেদের উন্নতি কিরূপে সম্ভবে? কবিরাজ মণ্ডলী যদি এখনও এবিষয়ে ঔদাসীন্য প্রকাশ করেন, তবে নানাস্থানে সভাসমিতি করিয়াই বা লাভ কি?" বলাবাহুল্য যে, আমি ডাক্তার বাবুর এ কথার কোন প্রত্যুত্তর দিতে সক্ষম হই নাই। কিন্তু ডাক্তার মহাশয়ের কথা অনুসারে আমি বলিতে বাধ্য যে, ইহা কবিরাজ মহাশয়দের পক্ষে বিশেষ লজ্জার কথা।

আয়ুর্ব্বেদোক্ত বিষ-চিকিৎসাগুলি ক্রমেই কালের করালগর্ভে বিলীন হইয়া যাইতেছে। প্রত্যক্ষ ঔষধগুলি লুপ্ত হওয়ার দুইটী কারণই প্রধান। (ক) উপকরণের অভাব, (খ) প্রাচীন চিকিৎসকের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই ঔষধের লোপ। এক সময়ে এতদঞ্চলে কয়েকজন প্রাচীন কবিরাজ বিষ-চিকিৎসায় বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ঔষধগুলি প্রায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ডাক্তারী Injectionএর সঙ্গে ঐ সকল ঔষধের বেশ তুলনা হইতে পারে। রোগীর যখন জীবনের আশা থাকিত না, তখন শরীরের কোন স্থানে ক্ষত করিয়া তাঁহারা ঐ সকল ঔষধ প্রয়োগ করিতেন। প্রাচীন লোকমুখে শুনা যায়, এই উপায়ে অনেক মুমূর্ষু রোগী বাঁচিয়া গিয়াছে। আমরা বহু অনুসন্ধানে এইরূপ একটি চিকিৎসকের আত্মীয়ের নিকট হইতে ৪০ বৎসরের পূর্ব্বেকার তৈয়ারী তিনটি বটি প্রাপ্ত হইয়াছি। দুঃখের বিষয় কিন্তু উহার প্রস্তুত প্রণালীর লিখিত কোন ফর্দ্দ পাই নাই। অন্য এক স্থান হইতে সংগৃহীত একখানি হস্তলিখিত ছিন্ন পুস্তকে মাত্র কয়েকটি ঔষধের ফর্দ্দ পাইয়াছি, তাহার একটি নিম্নে প্রকাশ করিলাম। * কোন অভিজ্ঞ চিকিৎসক মহোদয় ইহা প্রয়োগ করিয়া ফলাফল 'আয়ুর্ব্বেদে' প্রকাশ

* সোদর প্রতিম কবিরাজ শ্রীমান্ যোগেন্দ্রকিশোর লোহ এই পুস্তকখানি সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন।

করিলে বাধিত হইব। আমরা উহা কাহাকেও প্রয়োগ করিতে সাহসী হই নাই। কেননা অজ্ঞাত ঔষধে রোগমুক্তি অপেক্ষা জীবন মুক্তির আশঙ্কাই বেশী বলিয়া বোধ হয়।

বিশ্বনাথ রস।

বংশপত্র হরিতাল	১
মনঃশিলা	১
শিমুলক্ষার	১
অমৃত	১
তুঁতে ভস্ম	১
শ্বেত করবীর মূলেরছাল	১
কজ্জলী	।০

চিতামূলের রসে ৭ ভাবনা ও নিসিন্দা পত্র রসে একদিন মর্দ্দন করিয়া ১ রতি বটী করিতে হইবে। হরিতালকে কুষ্মাণ্ডরস, তিল তৈল ও ত্রিফলার কাথে পৃথক পৃথক দোলাযন্ত্রে শোধন। তুঁতে পায়রার বিষ্ঠাসহ একটি মুছিতে ভরিয়া গজপুট। অনুপান দুগ্ধ। পথ্য দুগ্ধ, ঘৃত, মিঠাই, অন্ন, অবস্থাদৃষ্টে দেয়। লবণ জল বর্জ্জিত। সন্নিপাতে, বাক্‌রোধে নাড়ী ডুবিলে।

বারান্তরে অন্যান্য ঔষধ গুলিও প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীশ্যামাচরণ মৈত্র কবিরত্ন।

উচ্ছে।

("পল্লীবার্ত্তা" হইতে উদ্ধৃত)।

—— :*: ——

উচ্ছে দুই প্রকার। ১। বড় উচ্ছে ও ২। ছোট উচ্ছে। বাজারে বড় উচ্ছেকে করেলা এবং ছোট উচ্ছেকে শুধু উচ্ছে বলে।

কারবেল্ল বড় উচ্ছের সংস্কৃত নাম। ইহার অপভ্রংশ করেলা। কারবেল্লী ছোট উচ্ছের সংস্কৃত নাম। বড় উচ্ছের ইংরাজী নাম Momordica Charantia; হিন্দি নাম করেলা; এবং ছোট উচ্ছেকে ইংরেজীতে M. Muricata এবং হিন্দিতে করেলী বলে।

সুশ্রুত মতে উচ্ছেলতার কাথ দ্বারা পক্ক ঘৃত বাতরক্তে বিশেষ হিতকর ঔষধরূপে গণ্য। (চিঃ—৫ অঃ।) ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে—উচ্ছে রক্ত শোধক; ডাক্তারেরা বলেন, "ব্যাসিলাস্ লেপ্রি" বলিয়া এক প্রকার কীটাণু বাতরক্ত জন্মাইয়া থাকে, তবে উচ্ছে এই কীটাণু ধ্বংস করিতে পারে বলিয়াই উচ্ছেকে বাতরক্ত রোগের ঔষধ একথা বলা যাইতে পারে। কীটাণু শরীরে থাকিলে রোগের উপশম হয় না, বাতরক্ত রোগ হইতে মুক্তি পাইলেই যে শরীরের ঐ কীটাণু নষ্ট হইয়াছে এরূপ মনে করা অযৌক্তিক হইতে পারে না। মসূরিকা রোগের চিকিৎসা-ব্যবস্থায় ভাব প্রকাশে কুষ্ঠ রোগে যে সকল লেপনাদ ক্রিয়া উক্ত হইয়াছে এবং পিত্তশ্লেষ্ম বিসর্পে যে সকল ক্রিয়া কথিত হইয়াছে, তৎসমুদয়ই ঐ রোগ হিতকর ও প্রশস্ত বলা হইয়াছে।

ভাব প্রকাশ বলেন, করেলা পত্রের রসে হরিদ্রাচূর্ণ সংযুক্ত করিয়া পান করিলে রোমান্তী

জ্বর, বিসর্প ও ব্রণের প্রশমন হয় (মঃ খঃ ২য় ভাঃ)।

চক্রদত্ত বলেন,—জ্বর রোগীর সেবনার্থ উচ্ছে শাক ব্যবস্থা করিবে (জ্বর - চিঃ)।

Its action & uses—

Stimulent and alternative; the fruit pulp & juice of the leaves & also seeds are anthelmintic & given in lumbrici. The fruit is also tonic and alternative & given in rheumatism, gout and deseases of the liver & spleen. The whole plant powdered is used for dusting over leprous & other intvactable ulcers. (Materia Madica of India—R. N. Khory, part II, p, 314)

উচ্ছে শীতবীর্য্য, ভেদক, লঘু ও তিক্ত রস। ইহা জ্বর, পিত্ত, কফ, কণ্ডু ও কৃমিনাশক এবং রক্তশোধক। ফল, বীজ এবং পত্ররস কৃমিঘ্ন, রসায়ন, বিবিধ বাত ও প্লীহা যকৃৎ পীড়ার উত্তম পথ্য। দুই প্রকার উচ্ছের একই গুণ। ছোট উচ্ছে লঘু ও অগ্নি দীপক। মাত্রা ১ তোলা হইতে ২ তোলা, নিত্য ব্যবহারে মাত্রা দুই একটু কম বেশী হইলে কোনও অপকার হয় না।

উচ্ছে সর্ব্বপ্রকার বসন্ত রোগের উত্তম প্রতিষেধক; ইহা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কোন বহুদর্শী ব্যক্তির নিকট হইতে অবগত হইয়াছিলাম। এ কথা প্রমাণার্থ আমি নিজে ক্রমান্বয়ে সাত দিবস কাল উচ্ছে খাইলাম,—তাহার পর বসন্তের টিকা লইলাম। বসন্তের টিকা লইবার পরও উচ্ছে খাইতে লাগিলাম; তিন বারই তুল্য ফল ফলিয়াছিল। ১৩২০ সনে অন্য সাত ব্যক্তিকে দিয়া আমি এই পরীক্ষা করিয়াছিলাম, ১৩২১ সনে ৫১ জনকে দিয়া এই পরীক্ষা করিয়াছি,—ইহাদের কোনও ব্যক্তির টিকা উঠে নাই। ইহাতেই প্রমাণিত হইতেছে উচ্ছে বসন্ত ব্যাধির প্রতিষেধক। একই 'লিম্প' হইতে দুই জনকে টিকা দিয়া দেখা হইয়াছে,—যে উচ্ছে খাইয়াছে তাহার টিকা উঠে নাই, আবার যে উচ্ছে খায় নাই—তাহার টিকা হইয়াছে; ইহাতে "লিম্প্" যে কার্য্যক্ষম ইহা প্রমাণিত হয়। এ বৎসরও বহু প্রকার পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, সমফল।

যাঁহারা প্রবল বসন্ত রোগীর চিকিৎসা বা শুশ্রূষা করেন, তাঁহাদের প্রত্যহ এই উচ্ছে আহারীয়ের সঙ্গে ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। প্রবল বসন্ত ও হাম রোগীকেও উচ্ছে ভাতে সিদ্ধ করিয়া পথ্য স্বরূপে প্রত্যহ খাওয়ান একান্ত প্রয়োজন; ইহাতে এ পর্য্যন্ত কোন রোগীর মৃত্যুসংবাদ আমরা পাই নাই; রোগও ধীরে ধীরে বেশ সারিয়া যায়। কোনও দুষ্ট উপসর্গ দেখা দেয় না। যাঁহারা বসন্ত রোগীর শুশ্রূষা করেন, তাঁহারা প্রত্যহ উচ্ছে ব্যবহার করিলেও প্রবল বসন্ত-বিষের একান্ত সংশ্রব থাকা হেতু কোন কোন সময়ে ২।৪টি বসন্ত গাত্রে উঠিতে পারে, কিন্তু ইহাতে প্রবল জ্বর হয় না। শরীরে সামান্য বেদনা মাত্র হয়, মারাত্মক হইতে দেখি নাই।　　*　　*　　*

উচ্ছে ভাত ও ডালের সহিত সিদ্ধ করিয়া, তরকারীরূপে অথবা তৈল বা ঘৃতে ভাজিয়া আহারের প্রথমেই অন্নের সহিত খাইবার ব্যবস্থা বহু প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। সেইরূপই ব্যবহার করিতে হয়। শুধু খাইলেও হয়—অন্য কোন নূতন প্রণালীতে খাইবার নিয়ম নাই। উচ্ছে সপ্তাহে ২।১ দিন না খাইয়া বসন্ত রোগের সময় প্রত্যহ ব্যবহার করা প্রয়োজন; নতুবা উপরোক্ত

ফল নাও ফলিতে পারে—একথা স্মরণ থাকা প্রয়োজন। উচ্ছে খাদ্য ও ঔষধ উভয়ই; ইহা ব্যবহারে কাহারও কোনও ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই। * * *

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ রায়, কবিভূষণ।

শিশুর ক্রিমি-চিকিৎসা।

(মহিলাদিগের জন্য ছড়ায় লিখিত)

ক্রিমি শিশুদের শত্রুবড়,
উপেক্ষা কভু নাহি ক'র।
রস্‌তড়্‌কা যা' শিশুর হয়,
ক্রিমি প্রায়ই তা'র মূলে রয়।
ক্রিমি নাশক ঔষধ দিলে,
রস্‌তড়্‌কায় সুফল মিলে।
ক্রিমি নাশক ঔষধ সহ,
বিরেচন তড়কার ব্যবস্থা দেহ।
ক্রিমি থেকে হয় ওলাউঠা,
জ্বর, অতিসার—এটা—ওটা।

বিছানা আঁচড়ায় মাথা টানে,
নাক চুলকায় দেখ্‌বে যেখানে,
সেখানে ক্রিমি বুঝে নিও,
বিবেচনা ক'রে ঔষধ দিও।

দাঁত কিড়্‌মিড়্‌ চিহ্ন ক্রিমির,
পেটের ব্যথায় করায় অস্থির।
মুখে জল উঠে—থুতু ফেলে,
ক্রিমিতে জোর দাও সে স্থলে।
শয্যামূত্রও এই কারণে,
প্রায়ই হয়—ক'ন্ বিজ্ঞগণে।

বিড়ঙ্গের অল্প গুঁড় নিয়ে,
ক্রিমি হ'লে দাও খাওয়াইয়ে।
বিড়ঙ্গ বড় উপকারী,
ব্যবস্থা ক'র সদা এরি।

চূণের উপরকার থিতান জল,
দ্বিগুণ জল নাও—শীতল,
আর একটু সৈন্ধব নিয়া,
ক্রিমি হ'লে দাও খাওয়াইয়া।

কচি পাতা আনারসের,
মধুসহ খাওয়ালে উপকার ঢের।

কালমেঘের পাতা বড় উপকারী,
ক্রিমিতে ব্যবস্থা দিও এরি।
মাঝে মাঝে কালমেঘ দিলে,
শিশুর স্বাস্থ্যের উন্নতি মিলে।

পাল্‌তে মাদার বা চাঁপা ফুলের
পাতার রসে উপকার ঢের।
ক্রিমি রোগে মধুর সহ
যে কোনটি দিতে কহ।

ভাট বা কদম পাতার রস
মধু সহ খেলে ক্রিমি বশ।

চাঁপাফুল, শুঁঠ এক এক আনি,
দাড়িম শিকড়, বিড়ঙ্গ তিনগুণ জানি,

—

আধ্ আধ্ আনা সোমরাজ, সোনামুখী,
এক পোয়া জলের এক ঝিনুক রাখি,
অল্প গরম—চারি বারে,
খাইয়ে দিলে ক্রিমি সারে।

—

ছাতিম শিকড়, বিড়ঙ্গ এক এক আনি,
চাঁপাফুল, শুঁঠ অর্দ্ধেক জানি,
নিম শিকড়ের ছাল রতি দুই,
সোমরাজীরও মাপ নাওগে ওই।
পাল্‌তেমাদার আর সোনামুখী,
ওজন কর তিনটি কুঁচ রাখি।
আধ আনা নাও বীজ পলাশের,
দু' আনা কিস্‌মিস্ নাওগে ফের।
সিদ্ধ কর এক পোয়া জলে
নামিয়ে নাও এক কাচ্চা র'লে।
দু'রতি বিট নুন প্রক্ষেপ দিয়ে,
দু' তিন বারে দাও খাওয়াইয়ে।

শ্রীসত্যচরণ সেন গুপ্ত, কবিরঞ্জন।

গর্ভিণীর সাধভক্ষণ।

—:*:—

এতদ্দেশে "গর্ভিণীর সাধভক্ষণ" প্রথাটি যে কতকাল হইতে প্রচলিত হইয়াছে, তাহার সংখ্যা জ্ঞাত না থাকিলেও প্রথাটি যে বহুকালের এবং আর্য্যঋষিগণ কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত ও উন্নত বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপরে সংস্থাপিত তাহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। কেন না, চরক, সুশ্রুত এবং ভাবপ্রকাশ, প্রভৃতি প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থাদিতে এতদ্বিষয়ক বহু গবেষণা পূর্ণ যুক্তি এবং ব্যবস্থাদির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। অপিচ জ্যোতিষাদি দর্শনশাস্ত্রেও সাধভক্ষণ ব্যাপারের জন্য শুভদিন ও শুভক্ষণের ব্যবস্থা প্রত্যক্ষ করা গিয়া থাকে। এই সাধভক্ষণ ব্যাপারটি গর্ভিণীর স্বাস্থ্য এবং ভ্রূণের ভাবি জীবনের উন্নতির দিকে বৈজ্ঞানিক লক্ষ্য রাখিয়া প্রবর্ত্তিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, অধুনা সে পরিণাম হিতকর উচ্চ বৈজ্ঞানিক-লক্ষ্য-যুক্তির দিকে আদৌ দৃষ্টি না করিয়া একটা যথেচ্ছভাবের প্রথা গঠন করিয়া লওয়ায় মহর্ষিদের বাক্যটির অস্তিত্বমাত্র রক্ষিত হইতেছে। কারণ এক্ষণে আয়ুর্ব্বেদীয় ভিষক্ বা জ্যোতিষ্ক পণ্ডিত গ্রহাচার্য্য প্রভৃতি অভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের সমাদর আর পূর্ব্বের ন্যায় গৃহস্থগণের গৃহে নাই। সুতরাং গৃহে সমাদরের ত্রুটি প্রযুক্ত তাদৃশভাবে কবিরাজ এবং গ্রহাচার্য্যগণ আর শিক্ষিত হইতেছেন না। ফলতঃ সাধভক্ষণের উদ্দেশ্য কি? উহাতে প্রসূতি এবং গর্ভস্থ ভ্রূণের কি কি উপকার হয়, সাধভক্ষণ না করিলেই বা প্রসূতির ও ভ্রূণের কি কি অপকার হয়, এসকল প্রয়োজনীয় বিষয়ের সমালোচনা দেশমধ্যে আদৌ অনুশীলন না থাকায় ইহা একটা কথার কথামধ্যে পরিগণিত হইয়া পড়িয়াছে।

আজকাল সাধভক্ষণে ভাল কাপড়, উত্তম অলঙ্কার আর পরমান্ন ও মিষ্টদ্রব্য অথবা মৎস্যাদির অনুষ্ঠান করিয়া প্রতিবেশীবর্গকে নিমন্ত্রণ এবং বাদ্যভাণ্ড প্রভৃতি ধুমধাম করিলেই যথেষ্ট হইয়া গেল মনে করা হয়।

কিন্তু সাধভক্ষণ ব্যাপার যে শুভক্ষণেই শেষ নহে, উহা আরম্ভমাত্র এবং উহা এক-দিনের ব্যাপার নহে, উহার সহিত ভাবি সন্তানের সুখ দুঃখ বিজড়িত আছে, তাহা যদি বুঝাইয়া দিবার লোক এখনকার দিনে বর্ত্তমান থাকিতেন, তাহা হইলে শতকরা হয়ত দুইচারজনও উহার উপকারিতা উপলব্ধি করিয়া তদনুসারে কার্য্য করতঃ দেশমধ্যে আদর্শ সাজিতে পারিতেন।

অদ্য আমরা প্রাচীন শাস্ত্রাদি হইতে এত-দ্বিষয়ক বৈজ্ঞানিক হেতুবাদ সকল উদ্ধৃত করিয়া পাঠকগণকে উপহার দিতে ইচ্ছা করিয়াছি। ভরসা করি ইহা দ্বারা পাঠকগণ নিশ্চয়ই উপকৃত হইবেন।

সাধভক্ষণের প্রয়োজনীয়তা।—শাস্ত্র বলেন—চতুর্থমাস গর্ভের বয়স হইলে তখন ভ্রূণের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ স্পষ্টরূপে প্রকাশ পায়, হৃদয় জন্মে ও চৈতন্য প্রকাশ হয়; এ নিমিত্ত চতুর্থমাসে গর্ভস্থ সন্তান নানাবিধ ভোগ করিতে অভিলাষ করে। আমাদের হোমিও-প্যাথিক শাস্ত্রের বৈজ্ঞানিক যুক্তি অনুসারে এরূপ ভোগবিলাসও শিশু এবং জননীর ভাবি-মঙ্গলজনক। অর্থাৎ যাহার ভাবি মঙ্গল জননে যেরূপ বস্তুর প্রয়োজন, সে তাহাই আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে, তৎকালে প্রসূতির দেহ দুইটি হৃদয়বিশিষ্ট (নিজের ও গর্ভস্থ সন্তানের) হয় বলিয়া তাৎকালিক আকাঙ্ক্ষাকে দৌহৃদ বলা যায়। সেই আকাঙ্ক্ষা যথোচিত ভাবে পূর্ণ না হইলে গর্ভস্থ সন্তান কুব্জ, কুনি, খঞ্জ, বামন, বিকৃতাক্ষ অথবা অন্ধ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে।

তাহা হইলে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, একদিন একবার মাত্র কতকগুলি মিষ্টান্ন ভক্ষণেই গর্ভিণীর সাধ পূর্ণ হইতে পারে না। বিশেষতঃ সাধ যে শুধু মিষ্টান্নেই পূর্ণ হইতে পারে, এরূপ বলা যাইতে পারে না। ইহাতে অনেকপ্রকার দ্রব্যের জন্যই আকাঙ্ক্ষা হইতে পারে। নিম্নে সে সকল বিষয়ের বিস্তৃত ব্যাখ্যা প্রদর্শিত হইতেছে।

যতঃ স্ত্রী দৌহৃদং প্রাপ্যবীর্য্যবন্তং চিরায়ুষম।
পুত্রং প্রসূয়তে তস্যাভস্মৈ বাঞ্ছিতমর্পয়েৎ।

(ভাবপ্রকাশ)

অর্থাৎ গর্ভিণী দৌহৃদ প্রাপ্ত হইলে সন্তান বলবান ও আয়ুষ্মান্ হয়। অতএব গর্ভাবস্থায় স্ত্রীলোকদিগের অভিলষিত সামগ্রী দেওয়া নিতান্ত কর্ত্তব্য।

উক্তবচনেও একদিন মাত্র শুভক্ষণ দেখিয়া একবার যে কোন মিষ্টদ্রব্য বা বস্ত্রালঙ্কার দিবার ব্যবস্থা নাই। আবার—

ইন্দ্রিয়ার্থানসৌ যান্ যান্ ভোক্তুমিচ্ছতিগর্ভিণী।
গর্ভবাধাভয়ত্তাসাং ভিষগাহৃত্যদাপয়েৎ॥

ভাবপ্রকাশ।

গর্ভাবস্থায় গর্ভিণীর ইন্দ্রিয়দিগের যাহা যাহা ভোগ করিবার অভিলাষ জন্মে গর্ভপীড়া বা গর্ভবাধা জন্মিবার আশঙ্কায় সেই সকল অভিলাষ পূর্ণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

ভাবপ্রকাশ আরও বলিয়াছেন,—

"গর্ভিণীর যে যে ইন্দ্রিয়ের অভিলাষ পূর্ণ না হয়;—সন্তানের সেই সেই ইন্দ্রিয়ের পীড়া জন্মে।"

এ সম্বন্ধে শাস্ত্র আরও বলিয়াছেন,—গর্ভিণীর রাজদর্শনে ইচ্ছা হইলে, সন্তান মহাভাগ্যবান ও ধনবান হয়। পট্টবস্ত্র বা রেশমী-বস্ত্র কিম্বা অলঙ্কারের জন্য গর্ভিণীর আকাঙ্ক্ষা হইলে, সন্তান অলঙ্কার-প্রিয় হয়।

উক্ত কথায় ইহাও প্রতীয়মান হইতেছে, যে, আকাঙ্ক্ষিত বিষয়গুলির উপভোগ করাইলে তবে ঐ সকল সুফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, নতুবা গর্ভপীড়া হইবার সম্ভাবনা।

"গর্ভিণীর তপস্বীদিগের আশ্রমদর্শনে অভিলাষ হইলে পুত্র ধর্ম্মশীল ও সংযতাত্মা হয়। দেবপ্রতিমা দর্শনাভিলাষী গর্ভিণীর গর্ভস্থ সন্তান সভাসদ্ ও প্রমথোপম হয়। গর্ভিণীর সর্পাদি-ব্যাল জাতি দর্শনে আকাঙ্ক্ষা হইলে সন্তান হিংসাশীল হয়।"

"গর্ভধারিণীর মহিষমাংস ভক্ষণে অভিলাষ জন্মিলে সন্তান পরাক্রমশীল, রক্তাক্ষ ও লোম-যুক্ত হয়। বরাহমাংসে লোভ হইলে সন্তান নিদ্রাশীল ও পরাক্রমশালী হয়। মৃগমাংসের অভিলাষে সন্তান দ্রুতগমনশীল ও বিক্রমশালী এবং বনচর হইয়া থাকে।"

উক্ত সকল জন্তু ব্যতীত অন্য কোন জন্তুর মাংসভক্ষণে গর্ভবতীর অভিলাষ জন্মিলে সেই সেই জন্তুর স্বভাবানুসারে সন্তানের স্বভাব ও আচরণ হওয়া স্বাভাবিক বুঝিতে হইবে।

হিন্দুশাস্ত্রকর্ত্তা মহর্ষিগণ হিন্দু সন্তানকে জগতে অজেয় এবং দীর্ঘায়ু, স্বাস্থ্যবান, বলবীর্য্য এবং সৌন্দর্য্য ও অসীম মেধাবী হইবার উপযুক্ত উপায়ের যে সকল সুপথ আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন, আমরা তাহার কিছুরই সম্মান করিতে শিক্ষা করি নাই বলিয়াই আজি চিররুগ্নতা লাভ করিতেছি।

আর্য্যঋষিগণ আমাদিগের জন্মের পূর্ব্ব হইতেই যেরূপে বিবাহ, রজঃসলা—গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন এবং সাধ ভক্ষণাদির সুব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহার সকল গুলিই আমাদের দীর্ঘজীবন ও উন্নত স্বাস্থ্য লাভের বিবিধ উপায় স্বরূপ। ব্রহ্মচর্য্যাদির ব্যবস্থা ও এই জন্য। আর্য্য মহর্ষিগণ আমাদের মঙ্গলার্থে যে সকল ব্যবস্থা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, সেই ব্যবস্থাগুলিকে সমাদরপূর্ব্বক তাহাদিগের অনুষ্ঠানে বদ্ধপরিকর থাকিতে পারিলে আর আমাদের চিন্তা কি?

বর্ত্তমানকালে এ সকল আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে নিতান্ত উপহাসাস্পদ হইতে হয়। কারণ অনেকেই উক্ত সংস্কারগুলিকে বড়ই বাড়াবাড়িযুক্ত কুসংস্কার বলিতে ত্রুটি করেন না। যাহা হউক আমাদের অধঃপতন যখন অনেকদূরে আসিয়া পড়িয়াছে, তখন ইহা হইতে পুনরুত্থান আমাদের পক্ষে বড়ই শক্ত কথা। জানিনা, এ স্রোত আর কতকাল চলিবে??

শ্রীনলিনীনাথ মজুমদার।

সে কালের চিকিৎসা।

—:*:—

প্রথমে একটা গল্প বলি।—জনৈক ব্রাহ্মণ স্ত্রীপুত্রাদি লইয়া দরিদ্র ক্লিষ্ট হইয়া অতি কষ্টে কালাতিপাত করিতেন। এমন কি মধ্যে মধ্যে অনাহারেও তাঁহাকে দিনাতিপাত করিতে হইত, তথাপি অপমানিত হইবার ভয়ে তিনি ধনী লোকের দ্বারস্থ হইতে পারিতেননা। একদিন বিপ্র পত্নী শুনিলেন যে, এক রাজা দানছত্র খুলিয়া আগন্তুক বিপ্রবর্গকে বহুল অর্থদানে সন্তুষ্ট করিতেছেন। তিনি স্বীয় স্বামীকে উক্ত রাজ সভায় উপস্থিত হইবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ কিন্তু প্রথমে অপমানিত হইবার ভয়ে কিছুতেই যাইতে সম্মত হইলেন না। পরে স্ত্রীর বারম্বার অনুরোধে এবং পরিবারবর্গের অন্নকষ্টে ব্যথিত হইয়া রাজ সভায় যাইবার জন্য কৃতসংকল্প হইলেন। রাজভবনে যাইবার পথে একটী ক্ষুদ্র সরিৎ পার হইতে হয়। সেই সরিৎ পার হইবার সময় ব্রাহ্মণের পরিধেয় বস্ত্র জলসিক্ত হইয়া গেল। দ্বিতীয় পরিধেয় না থাকায় তিনি আর্দ্র বস্ত্রেই রাজসভায় উপনীত হইলেন। ব্রাহ্মণ স্বস্তিবাদনপূর্ব্বক রাজ সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলে, রাজা আর্দ্রবস্ত্রের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। নদীপার হইবার সময় যেরূপে পরিধেয় জলসিক্ত হইয়াছিল, ব্রাহ্মণ তাহার আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিলেন। রাজা সবিশেষ শ্রবণ করিয়া সহাস্যবদনে ব্রাহ্মণের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক—"সেই আর এই" এই কথা বলিয়া সভাত্যাগ করিয়া অন্তঃপুরে প্রস্থান করিলেন। ব্রাহ্মণ ভগ্নহৃদয়ে রিক্ত হস্তে নিজ কুটীরে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক পত্নীকে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত করতঃ দুঃখপ্রকাশ ও নিজ ভাগ্যে দোষারোপ করিতে লাগিলেন। বিপ্রপত্নী বড়ই চতুরা ও বুদ্ধিমতী ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণকে সান্ত্বনাপূর্ব্বক গৃহে যে যৎকিঞ্চিৎ আহার্য্য ছিল—তাহাই স্বামী ও পুত্র সন্তানগণকে আহার করাইলেন। পরে ব্রাহ্মণকে পুনরায় পরদিবস রাজসভায় যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। ব্রাহ্মণ একবার অপমানিত হইয়া আর কিছুতেই রাজসভায় যাইতে সম্মত হইলেন না। ব্রাহ্মণী কহিলেন, "আপনাকে ভিক্ষার জন্য আর রাজসভায় যাইতে বলিতেছিনা। রাজা যে কথা বলিয়াছেন, তাহার উত্তর দিয়া চলিয়া আসিবেন।" ব্রাহ্মণ বলিলেন,—"রাজাকে কি উত্তর দিব?" ব্রাহ্মণী বলিলেন, "কল্য প্রাতে যাইবার সময় শিখাইয়া দিব।" পরদিন প্রাতে বিপ্রপত্নী একটী জলপূর্ণ পাত্র ও একটী ক্ষুদ্র লোষ্ট্র স্বামীর হস্তে দিয়া তাঁহাকে রাজসভায় পাঠাইলেন এবং বলিয়া দিলেন যে, এই জলপাত্রটী রাজহস্তে দিয়া তন্মধ্যস্থ জলে লোষ্ট্রটী নিক্ষেপ করিতে বলিবেন। লোষ্ট্রটী জলমগ্ন হইলে বলিবেন যে, "এই আর সেই"। বিপ্রবর জলপাত্র ও লোষ্ট্র লইয়া রাজভবনাভিমুখে গমন করিলেন। রাজসমীপে উপস্থিত হইয়া জল পাত্রটী নৃপকরে সমর্পণ পূর্ব্বক লোষ্ট্রটী পাত্রস্থ জলে নিক্ষেপ করিতে বলিলেন। রাজা জলে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিবামাত্র উহা জলমগ্ন হইলে

ব্রাহ্মণ বলিলেন 'এই আর সেই'। রাজা অপ্রভিত হইয়া ব্রাহ্মণকে প্রচুর অর্থদান করিলেন। ব্রাহ্মণ অর্থরাশি সমভিব্যাহারে হর্ষোৎফুল্ল চিত্তে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। ভিক্ষালব্ধ ধনরত্নাদি স্বীয় পত্নীকে দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রিয়ে। গত কল্যই বা নরপতি আমাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন কেন, আর অদ্যই বা তোমার শিক্ষামত কথাটী বলায় লজ্জিত হইয়া ধনরাশি দান করিলেন কেন? আমি ইহার কারণ বুঝিতে পারিতেছি না।" বিপ্রপত্নী বলিলেন "পুরাকালে অগস্ত্য মুনি গণ্ডূষপূর্ব্বক সমুদ্র শোষণ করিয়াছিলেন, আর আপনি সেই বিপ্র বংশোদ্ভব হইয়া একটী ক্ষুদ্র সরিৎ পার হইতে গিয়া জলসিক্ত হইয়াছিলেন। ইহা ব্রাহ্মণদিগের অবনতির পরিচায়ক। সেই জন্য রাজা বিদ্রূপ করিয়া "সেই আর এই" বলিয়াছিলেন। অদ্য আপনার নিকট ইহার উত্তর পাইলেন যে, যখন রামচন্দ্র রাজা ছিলেন, তখন সাগর জলে প্রস্তর ভাসাইয়া সেতু নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, আর এখনকার নরপতিদের লোষ্ট্র মাত্রও ভাসাইবার সামর্থ্য নাই। আপনার এই উত্তরে লজ্জিত হইয়া রাজা পুরস্কার স্বরূপ অর্থদান করিয়াছেন।" ব্রাহ্মণ এই কথা শুনিয়া স্বীয় পত্নীর বুদ্ধিমত্তার বহুল প্রশংসা করিতে লাগিবেন।

ইহা ত গেল যুগ যুগান্তরের কথা। আমরা যাহা শুনিয়াছি ও দেখিয়াছি এক্ষণে আর তাহা দেখিতে পাই না। আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা সম্বন্ধে যাহা দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি এক্ষণে তাহা দেখিতে পাই না,—এক্ষণে তাহা অলৌকিক বলিয়া বোধ হয়।

শৈশবাস্থায় আমার স্বাস্থ্য এরূপ খারাপ ছিল যে, স্নান করিলেই জ্বর হইত। ডাক্তারি (এলোপ্যাথিক) চিকিৎসায় জ্বর আরোগ্য হইত, কিন্তু কিছুদিন ভাল থাকিয়া যে দিন স্নান করিতাম, সেই দিন হইতে আবার জ্বর হইত। আমাদের জনৈক কর্ম্মচারী (সরকার) আমাকে স্নান করাইবার জন্য একেবারেই নিষেধ করিতেন। আমার ভাগ্যে স্নান প্রায় ঘটিত না, মাসান্তে হয়ত একদিন স্নান করিতাম ও সেই দিন হইতেই আবার জ্বরভোগ করিতাম। স্বর্গীয় কবিরাজ ৺নবীন চন্দ্র সেন গুপ্ত মহাশয় মদীয় পিতৃদেবের বন্ধু ছিলেন। তিনি প্রায়ই আমাদের বাটীতে আসিতেন। একবার গল্পচ্ছলে আমার কথা উঠিল। তিনি বলিলেন,—এবার জ্বর হইলে যেন তাঁহাকে সংবাদ দেওয়া হয়। পর বার জ্বর হওয়ায় ডাক্তারি চিকিৎসা না করিয়া উক্ত কবিরাজ মহাশয়কে সংবাদ দেওয়া হইল ও তিনিই চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সেবার জ্বর আর কিছুতেই ছাড়ে না। অনেক দিন ভোগ হইয়া একটু কমিল। একদিন কবিরাজ মহাশয় আসিলে আমি সাগু বা খই আর খাইব না বলিয়া কান্নাকাটি করিতে লাগিলাম। সে দিন তিনি অর্দ্ধখানি বড়ী দিলেন এবং তাহার অর্দ্ধখানি অর্থাৎ সিকিখানি খাওয়াইতে বলিলেন। আর অন্ন পথ্যের ব্যবস্থা করিলেন ও ২।১টা জামরুল খাইতে বলিলেন। অনেক দিন পীড়ার পর একেবারে অন্নপথ্য না দিয়া মাতৃঠাকুরাণী আমাকে সে দিন রুটি খাইতে দিলেন। বহু দিনের পর পথ্য পাইব, অনেক রুটি খাইব আশা করিয়া আছি। কিন্তু একগ্রাস মাত্র মুখে তুলিয়া বমি করিতে লাগিলাম। পরদিন মাতৃঠাকুরাণী অন্ন পথ্য দিলেন। তাহাও সামান্য মাত্র খাইয়া আর খাইতে পারিলাম না। প্রত্যহ পেট ফাঁপিতে লাগিল। কবিরাজ

মহাশয়কে পুনরায় সংবাদ দেওয়া হইল। তিনি আসিয়া প্রত্যহ স্নানের ব্যবস্থা করিলেন, স্নানের পর ভিজা ভাত ও মাগুর মাছের ঝোল, আহারের পর পানার্থ ডাবের জল। সেই হইতে আমার প্রত্যহ স্নান সহ্য হইতে লাগিল। এমন কি, এখন গ্রীষ্মকালে ২।৩ বারও স্নান করিয়া থাকি। আমার সম্বন্ধে যে কথা বলিলাম, ইহা চল্লিশ বৎসরের পূর্ব্বেকার কথা।

আবার মদীয় পিতৃদেবের নিকট গল্প শুনিয়াছি যে, বাল্যাবস্থায় তাঁহার বাতশ্লেষ্মা জ্বর হয়। স্বর্গীয় ৺রামেশ্বর কবিরাজ মহাশয় তাঁহার চিকিৎসা করেন। একদিন তিনি জ্বরত্যাগের জন্য ঔষধ দিয়া গেলেন। সেই ওষধ সেবনে একেবারে বিজ্বর হইয়া হিমাঙ্গ (collapse) হইয়া যাইলেন, সেই রাত্রে সকলেই ভীত হইয়া পড়িলেন। প্রতিবাসী সকলে মিলিয়া কবিরাজ মহাশয়ের নিকট ছুটিলেন। তাঁহাকে পাওয়া গেল না। তিনি স্থানান্তরে গিয়াছিলেন। পরদিন প্রাতে তিনি স্বয়ং আসিলেন। রোগীকে স্নান করিতে বলিলেন এবং সদ্যঃ দধি ও পান্তভাত পথ্যের ব্যবস্থা করিলেন। আরও বলিলেন যে, জীবনে কখনও জ্বর হইবে না। যদি কখনও জ্বর হয়, স্নান করিয়া সদ্যঃ দধি ও পান্ত ভাত খাইলেই জ্বর ত্যাগ হইবে। এই ঘটনার পর হইতে আমরাও তাঁহাকে জ্বর হইলে স্নান করিয়া সদ্যঃ দধি ও পান্ত ভাত খাইতে দেখিয়াছি। কিন্তু আজীবন মাষকলাই খাইতে নিষেধ

এরূপ চিকিৎসা আর এখন দেখিতে পাওয়া যায় না।

ইহা যে কেবল চিকিৎসকের অভাবে হইয়াছে—তাহা নহে। চিকিৎসক, চিকিৎসার্থী—উভয়েরই অভাব। চিকিৎসার্থীর অভাবে চিকিৎসকেরা নিজেদের বিদ্যোন্নতি ও মূল্যবান ঔষধাদি প্রস্তুত করিবার সুযোগ পান না। আবার আজকাল চিকিৎসকেরা অধিকাংশই পরস্পরের ছিদ্রান্বেষী। চিকিৎসার্থিরাও অধিক দিনের জন্য একজনের চিকিৎসাধীনে থাকিতে ভালবাসেননা। তাহাতেও সুচিকিৎসার আশা করা যায় না। কারণ রোগের লক্ষণাবলী ক্রমশঃ প্রকাশিত হয় এবং এই লক্ষণ সমষ্টির উপর রোগ-নির্ণয় নির্ভর করে। সুতরাং চিকিৎসা বিভ্রাট হইয়া পড়ে। কেহই রোগ-নির্ণয়ের উপযুক্ত সুযোগ পান না। আবার ডাক্তারি চিকিৎসার উপর লোক দীর্ঘকাল নির্ভর করিয়া থাকে, কিন্তু কবিরাজী চিকিৎসার উপর সেরূপভাবে নির্ভর করিয়া থাকিতে পারে না, যদি থাকে তাহা একেবারে শেষ অবস্থার উপর, যখন ডাক্তারীতে আরোগ্যের আশা একেবারে থাকে না। এই সব নানা কারণে বোধ হয় কবিরাজ মহাশয়েরা উপযুক্ত ফলপ্রদ ওষধ প্রস্তুত রাখিতে সক্ষম হন না।

ফলে দেশের লোকের রুচি বিপর্য্যয়ে অধুনা আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার অবনতি তো ঘটিয়াছেই, আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক মণ্ডলী ও যে ইহার জন্য দোষী নহেন, তাহা নহে, সে কালের মত আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র মন্থনপূর্ব্বক প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ ঔষধ সকলের প্রস্তুত কার্য্যেও তাঁহারা বুঝি আর মনোযোগী নহেন।

ডাক্তার শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাস।

স্বর্ণ সিন্দুর বা মকরধ্বজ।

—:*:—

স্বর্ণ সিন্দুর বা মকরধ্বজের ন্যায় ঔষধ পৃথিবীতে আবিষ্কৃত হয় নাই বা অন্য কোন দেশের চিকিৎসা শাস্ত্রে নাই। ইহার প্রস্তুত প্রণালী কেবল আমাদের প্রাচীন পণ্ডিতগণ জানিতেন। এই ঔষধ প্রত্যেক আর্য্য সন্তানের পক্ষে গৌরবের বিষয়। মকরধ্বজের উপাদান পারদ, গন্ধক ও সোনা। পারদ ও সোনা একত্র মর্দ্দন করিয়া মিশ্রিত হইলে তাহার সহিত গন্ধক মিশাইয়া কজ্জলী প্রস্তুত করিতে হয়। পরে উক্ত কজ্জলী মৃত্তিকালিপ্ত বোতলে পূর্ণ করিয়া বালুকা যন্ত্রে পাক করিলে গন্ধক পুড়িয়া যায়, সোনা বোতলের নিম্নে পতিত হয়, মকরধ্বজ বোতলের গলদেশে সংলগ্ন হইয়া থাকে।

রসায়ন-বিজ্ঞানে সুপণ্ডিত এ দেশের কেহ কেহ বলেন, মকরধ্বজ প্রস্তুত করিতে স্বর্ণের ব্যবহারের কোন তাৎপর্য্য নাই। যদিও তাহাতে স্বর্ণ সংযুক্ত করা হয়, কিন্তু তাহাতে ও বিনা-স্বর্ণে প্রস্তুত রসসিন্দুর নামক পদার্থে কোন পার্থক্য থাকে না। যেহেতু উভয়ের রাসায়নিক পরীক্ষায় কোন পার্থক্য দৃষ্ট হয় নাই। এ সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলিবার জন্যই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

মকরধ্বজে সোণাও থাকে না, গন্ধকও থাকে না। কিন্তু সোণা বা গন্ধকের স্থূলাংশ মকরধ্বজে না থাকিলে ও তাহাদের গুণ, বীর্য্য ও প্রভাব বিদ্যমান থাকে এবং তদ্দ্বারা অনন্ত-কাল যাবৎ মহোপকার সাধিত হইতেছে। কিন্তু আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ এভাবে ইহা বুঝিতে রাজী হইবেন না। আজকালকার দিনে অনেকেরই ঋষি বাক্য গুলির প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মিয়াছে। তাই তাঁহারা অবলীলাক্রমে প্রাচীন ঋষি বাক্যগুলি পদদলিত করিতে পরাঙ্মুখ নহেন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী এম এ, এফ, সি, এস্ মহাশয় তাঁহার "আয়ুর্ব্বেদ ও নব্য রসায়ন গ্রন্থে স্বর্ণসিন্দূর ও রসসিন্দূরের রাসায়নিক পরীক্ষায় কোন পার্থক্য নাই বলিয়া স্বর্ণ সিন্দূরের প্রস্তুত প্রক্রিয়ায় "স্বর্ণ নিরর্থক ব্যবহৃত হয়। স্বর্ণ সিন্দূর প্রস্তুত কালে স্বর্ণ একেবারে বাদ দেওয়া উচিত"—ইত্যাদি অনেক কথাই বলিয়াছেন। এমন কি ডাক্তারজী শ্রী-প্রফুল্ল চন্দ্র রায় প্রমুখ বিশিষ্ট রাসায়নিক দ্বারা পরিচালিত "বেঙ্গল কেমিকেল ও ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস" নামক রাসায়নিক কারখানায় এখন পর্য্যন্তও এই "স্বর্ণ ঘটিত" স্বর্ণ সিন্দূর ২৪৲ টাকা ভরি বিক্রয় হইতেছে বলিয়া বড়ই দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। পঞ্চানন বাবু এক-জন এম-এ ও রাসায়নিক পণ্ডিত। কাজেই তাঁহার মত বিজ্ঞানাচার্য্য ব্যক্তির কথার প্রতি-বাদ করিবার ক্ষমতা আমাদের আদৌ নাই। কোট পেণ্টুলন-বুট বিহীন-নিরামিষভোজী জীর্ণ শীর্ণ কলেবর ঋষিদিগের বাক্যগুলি তিনি যে শ্রদ্ধার সহিত মানিয়া লইবেন, সে আশা সুদূর পরাহত। কাজেই বাধ্য হইয়া আমাকে প্রত্যক্ষ প্রমাণের আশ্রয় লইতে হইবে।

দ্রব্য মাত্রেরই রাসায়নিক (Chemical action] ও শারীরিক কার্য্যকারিতাশক্তি (Physislogical action) এক প্রকার নহে। রসায়নবিদ্ দ্রব্য পরীক্ষা করিয়া তাহার সাধারণ গুণ প্রকাশ করিলে ভিষক মানব শরীরে প্রয়োগ পূর্ব্বক তাহার শারীরিক কার্য্য কারিতা শক্তি নির্ণয় করেন। তৎপর তাহা ঔষধরূপ পরিগৃহীত হয়। কেবল রসায়ন বিদের পরামর্শানুসারে প্রাচীন ঋষিগণ ঔষধ নির্ণয় করেন নাই এবং বর্ত্তমানেও বোধ হয় পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিজ্ঞান কেবল রসায়ন শাস্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। তাহা হইলে [illegible] সাপের বিষও মানব শরীরের বিশেষ উপকারী হইয়া পড়িত। * সর্প বিষের মধ্যে রাসায়নিক পরীক্ষায় যে পদার্থ পাওয়া যায়, তাহা [illegible] শরীরের বিশেষ পুষ্টি সাধনেই সক্ষম [illegible] দ্রব্যের বিশ্লেষণ-বিচার করিলেও বর্ত্তমান রসায়নবেত্তাগণ এখনও বহু পদার্থের গুণ [illegible] অক্ষম। সুতরাং এস্থলে ভিষক্-দিগের [illegible] বচনই প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিতে [illegible] যে স্থলে রসসিন্দূর "অনুপান বিশেষণ [illegible]তি বিবিধান গুণান্" সে স্থলে স্বর্ণ সিন্দূর। [illegible] রসায়নং বৃষ্যতরঞ্চ বলং মেধাগ্নি কান্তিস্মবর্দ্ধনঞ্চ।" সুতরাং 'বল ও বৃষ্যতরঞ্চ' ইহার বিশেষ গুণ বলিতে হইবে। রোগীর অবসন্নতায় একমাত্রা স্বর্ণ সিন্দূরে যে কাজ হয়, তাহা রস সিন্দূরে হইবার সম্ভাবনা নাই। ইহাতে বুঝা যায়—রাসায়নিক পরীক্ষায় স্বর্ণ সিন্দূর এবং রসসিন্দূর একই পদার্থ হইলে ও তাহাদের গুণগত পার্থক্য অবশ্যই আছে। দ্রব্যগত উপাদান এক হইলেই যদি তাহার গুণগত কোন পার্থক্য না থাকে, তবে আজ চিনীর জন্য এত ভাবনা ভাবিতে হইত না। আধুনিক রাসায়নিক পণ্ডিতগণ সর্ব্বত্র অযত্ন সুলভ কয়লা ১২ ভাগ ও জল ১১ ভাগ মিশ্রিত করিয়া চিনীর পরিবর্ত্তে ব্যবহার করিতেন। (came & sugar = C 12 H 22011.)

স্বর্ণ সিন্দূরের ন্যায় স্বর্ণবঙ্গও রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য এই যে, স্বর্ণ সিন্দূর স্বর্ণের সহিত এবং স্বর্ণ বঙ্গ বঙ্গের সহিত রাসায়নিক ক্রিয়ায় সাধিত হইয়া থাকে। বঙ্গ মেহ নাশক। স্বর্ণবঙ্গ বঙ্গের সহিত রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত হয় বলিয়া স্বর্ণ বঙ্গ প্রমেহ রোগের একটি শ্রেষ্ঠ ঔষধ। এ স্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে, যদি পারদের আকর্ষণী শক্তিতে স্বর্ণ সিন্দূরে স্বর্ণের গুণ, বীর্য্য ও প্রভাব না থাকে তবে ঐ প্রক্রিয়াতেই প্রস্তুত স্বর্ণবঙ্গে বঙ্গের গুণ, বীর্য্য, প্রভাব কেমন করিয়া আসিল? এবং স্বর্ণ বঙ্গ ও স্বর্ণ সিন্দূর দেখিতে একই রকম পদার্থ না হইয়া ভিন্নাকৃতি ও ভিন্ন গুণ বিশিষ্ট হইল কেন? পঞ্চানন বাবু ইহা ভাবিয়া দেখিয়াছিলেন কি? তিনি যেন একথা স্মরণ রাখেন, আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ মাত্রেরই ভিত্তি বর্ত্তমান রসায়নী বিদ্যা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর বিদ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত।

আয়ুর্ব্বেদীয় যে সমস্ত ভেষজপক্ক-তৈল-—ঘৃত আছে, উপাদান জানা না থাকিলে কোন্ কোন্ দ্রব্যে উহা প্রস্তুত রাসায়নিক পরীক্ষায় তাহা জানা যায় না। কেননা বহুগুণ বিশিষ্ট বহু ভেষজের গুণে উহা প্রস্তুত হয় এবং স্বর্ণ

* Chemistry has not yet succeeded in separating the active principles of snake-poison. Ency, 9th Edition, 22 vol 191 p. p.

সিন্দুরে যেমন সোনার স্থূলাংশ থাকে না, তদ্রূপ ভেষজপক্ক-তৈল-ঘৃতেও ভেষজের স্থূলাংশ থাকে না, কেবল মাত্র গুণ, বীর্য্য ও প্রভাব উহাতে আকৃষ্ট হইয়া থাকে। কাজেই আমরা ঔষধের ফল প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। সামান্য একটু তৈলের নস্য গ্রহণ করিলেই মাথার বেদনা ছাড়িয়া যায়, শূলরোগে তৈল মর্দ্দনে তৎক্ষণাৎ বেদনার লাঘব হয়, এইরূপ প্রত্যক্ষ ফল দর্শন করিয়াও কেহ কি বলিতে সাহস করেন—উহা কিছুই নহে?

অপামার্গের শিকড় হস্তে ধারণ করিলে ঐকাহিক জ্বর আরোগ্য হয়, কার্পাস মূল পদ-দ্বয়ে বন্ধন করিলে শোথ প্রশমিত হয়, পশুর ক্ষতে পোকা হইলে অগ্নেশ্বর লতার অগ্রভাগ ছিঁড়িয়া ফেলিবামাত্র সমস্ত পোকা পড়িয়া যায়। পঞ্চানন বাবু রাসায়নিক পরীক্ষা করিয়া ইহার কি কোন মীমাংসা করিতে পারিবেন? অথবা কোন রসায়নবিদ্ বলিতে পারিবেন যে, অপামার্গ, কার্পাস মূল ও অগ্নেশ্বর লতার মধ্যে এমন কি শক্তি বিদ্যমান আছে—যদ্দারা জ্বরাদি রোগের উপশম হইতে পারে? এই শক্তিকে আর্য্য ঋষিগণ "প্রভাব" বলিয়াছেন। এখানেই বৈজ্ঞানিকের পরাজয়। এই শক্তি জড়তত্ত্ববাদীগণের জ্ঞানের অতীত। ইহা মনোবিজ্ঞানের বিষয়ীভূত। বস্তুতঃ মনোবিজ্ঞানের সীমায় না পৌঁছিতে পারিলে জ্ঞানের সম্পূর্ণতা সম্ভাবনা নাই। পৃথিবীতে কেবলমাত্র আর্য্যেরাই ইহা অবগত ছিলেন।

আমাদের শেষ বক্তব্য এই যে, নব্য রসায়নের দ্রব্য-বিশ্লেষণী-শক্তি থাকিলেও গুণ ও প্রভাব নির্ণয়ে সর্ব্বথা প্রভুত্ব নাই। সুতরাং পঞ্চানন বাবুর মত যাঁহারা কেবলমাত্র রসায়নী বিদ্যার সাহায্যে প্রাচীন চিকিৎসা সম্মত ভেষজ সমূহ পরিবর্ত্তন করিতে বাসনা করেন, তাঁহাদের যে বিশেষ ভ্রম হইয়াছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

কবিরাজ শ্রী—মৈত্র।

সমালোচনা।

সুবর্ণ বণিক সমাচার।—আষাঢ়। সম্পাদক শ্রীযুক্ত নৃসিংহ প্রসাদ দত্ত বি এল। কার্য্যালয় ২৭ নং মদন বড়াল লেন, বহুবাজার, কলিকাতা। বার্ষিক মূল্য ২৷৹ টাকা। ইহা নামে "সুবর্ণ বণিক সমাচার" হইলেও এখানি প্রকাশ করিয়া ইহার কর্ত্তৃপক্ষগণ মাসিক সাহিত্য-বিপণির সম্পদ-বৃদ্ধিই করিয়াছেন। সাহিত্য বিষয়ক অনেকগুলি সারগর্ভ প্রবন্ধ এ সংখ্যায় স্থান পাইয়াছে। "শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য ঠাকুরের জীবনী"তে বৈষ্ণব সাহিত্যের অনেক কথা অবগত হওয়া যায়। "যোগিনী" একটি ক্রমশঃ প্রকাশ্য উৎকৃষ্ট গল্প। "কর্ম্মনীতি"—মানুষকে কর্ম্মী করিবার গবেষণা মূলক প্রবন্ধ। "দেবতা আমার" শ্রীমতী ক্ষণ-প্রভা দেবীর মত অপরিচিতা লেখিকার লেখা হইলেও ইহার অস্তিত্ব কিন্তু ক্ষণমুহূর্ত্তে লয় পাইবে না।

"ঠাকুর উদ্ধারণ দত্ত" পাকা হাতের লেখা। "সংবাদ পূর্ণ চন্দ্রোদয়ে" অনেক কথা শিখিবার আছে। "হরিশ-ভাণ্ডারী" গল্পে মুন্সীয়ানা যথেষ্ট। "মহাযুদ্ধে" সাময়িক কবিতা। "জাতি-ভেদ" অনেক যুক্তি অবলম্বনে লিখিত। "শ্রীপাট পানিহাটী" প্রাচীন কীর্ত্তি কথায় পূর্ণ। "মধুমক্ষিকার চাষ" পাঠে অনেকের উপকার হইবে। মোটের উপর এ সংখ্যার সকল প্রবন্ধই বিশেষ মনোমদ হইয়াছে। প্রবন্ধ নির্ব্বাচনে সম্পাদক মহাশয় সুখ্যাতি পাইবারই উপযুক্ত। কাগজ ও ছাপা অতি উৎকৃষ্ট। বর্ত্তমান এই দুর্দ্দিনে এরূপ উৎকৃষ্ট কাগজে এখনও ইঁহারা এ পত্র বাহির করিতে পারিতেছেন দেখিয়া, আমরা আরও সুখী হইয়াছি।

নূতন জ্বর

—:*:—

কলিকাতার অবস্থা।—কলিকাতায় যে নূতন সংক্রামক জ্বরের আবির্ভাব হইয়াছে, তাহাতে কলিকাতার প্রায় তৃতীয়াংশ অধিবাসী পীড়িত। এ জ্বর বেশী দিন স্থায়ী নহে, সাধারণতঃ ৩ দিন বা ৫ দিন ভোগের পর এই জ্বর ছাড়িয়া থাকে। কিন্তু ইহার ফলে সর্ব্বাঙ্গে বেদনা, অরুচি এবং দৌর্ব্বল্য দীর্ঘকাল ভোগ করিতে হয়। এই জ্বরাসুরের আক্রমণে কলিকাতার স্কুল-কলেজ-অফিসাদির কার্য্য-পরিচালন বিষয়েও বহু বিঘ্ন ঘটিয়াছে। আমাদের সহযোগী সম্পাদক এই জ্বরে বিশেষ পীড়িত হইয়াছিলেন। প্রেসের অধিকাংশ কর্ম্মচারীও এই জ্বরে আক্রান্ত হন। "আয়ুর্ব্বেদ কলেজে"র অনেক ছাত্রও এই জ্বরে পীড়িত। এবারের "আয়ুর্ব্বেদ" বাহির করিতে সেই জন্য আমাদিগকে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইয়াছে।

এই নূতন জ্বরটি কি?—এই নূতন জ্বরটি যে কি,—তাহা লইয়া অনেকে অনেক কথা কহিতেছেন। কেহ বলিতেছেন,—ইহা ডেঙ্গো জ্বর, কেহ বলিতেছেন, ইহা ইনফ্লুয়েঞ্জা, কেহ বলিতেছেন, ইহা যুদ্ধ জ্বর। প্রথমে এ জ্বর বোম্বাইয়ে আসিয়াছিল। বোম্বাইয়ের প্রায় সমগ্র অধিবাসীকে বিপর্য্যস্ত করিয়া ইহা কলিকাতায় আগমন করে। কলিকাতা হইতে কলিকাতার নিকটবর্ত্তী মফঃস্বলের অনেক স্থানেও ইহা সংক্রামিত হইয়া দেশে একটা বিষম বিভীষিকার সঞ্চার করিয়া তুলিয়াছে।

এই জ্বরের পরিণাম।—এই জ্বরের পরিণামে ভয়ানক গাত্র দাহ, সর্ব্বাঙ্গে বেদনা, অরুচি এবং দৌর্ব্বল্য উপস্থিত হয়। জ্বর বন্ধ হইলেও শ্লেষ্মা দূর হয় না, তাহার ফলে কাসিটা অনেক দিন পর্য্যন্ত থাকে। দাহ হওয়ার ফলে শৈত্য ক্রিয়ায় স্বভাবতঃই আসক্তি জন্মে। সে আসক্তি সম্বরণ করিতে না পারিলে পুনরাক্রমণ ঘটিয়া নিউমোনিয়া উপস্থিত হয়। এই অবস্থা উপস্থিত হইলে জীবন রক্ষার আর আশা থাকে না। সংপ্রতি কলিকাতায় এই ভাবের মৃত্যু সংখ্যা অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। একবার জ্বর ভোগের পর আবার যাহারা

পাল্টাইয়া পড়িতেছে, নিউমোনিয়া হইয়া তাহারা প্রায়ই মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। সেই জন্য এই জ্বর হইতে মুক্ত হওয়ার পর শৈত্য ক্রিয়া একেবারেই বর্জ্জন করা কর্ত্তব্য।

এই জ্বরে সংক্রমণের কারণ।—এই জ্বরে আক্রান্ত ব্যক্তির নিঃশ্বাসে অন্যের শরীরে এই বিষ প্রবেশ করে, সেই জন্য এই জ্বরে আক্রান্ত রোগীর অঙ্গস্পর্শ যতটা না করিতে পারা যায় ততই ভাল। এই সকল রোগী হাঁচিবার, কাসিবার এবং কথা কহিবার সময় অপরকে আক্রান্ত করিতে পারে। এই জ্বরে আক্রান্ত রোগীর গামছা ও গ্লাস ব্যবহার করিলে, এক শয্যায় শয়ন করিলে, থুঁতু এবং সিক্‌নি স্পর্শ করিলে—এই জ্বরের বিষ অন্যের শরীরে প্রবেশ করিতে পারে। যে বাড়ীতে এই জ্বরে একজন আক্রান্ত হইতেছে, সে বাড়ীর সকল লোকের জ্বর হইবার ইহাই কারণ। এই জন্যই এ জ্বর এত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে।

প্রতিষেধক বিধি।—(১) বিশেষ ক্লান্তিজনক কার্য্য এ সময় করা উচিত নহে। (২) মুক্ত বাতাসে অবস্থিতি—বিশেষতঃ রাত্রি কালে গ্রীষ্মাতিশয্যে খোলা যায়গায় শয়ন করা একেবারে পরিহার করা উচিত। (৩) অত্যধিক জনতার সমাগমে গমন অবিধেয় (৪) শরীর সামান্য মাত্র অসুস্থ বোধ করিলেই সতর্কতা অবলম্বন করিবে। (৫) এ জ্বরে আক্রান্ত হইবামাত্র শয্যা গ্রহণ করিবে এবং সম্পূর্ণ সুস্থ না হওয়া পর্য্যন্ত শয্যাত্যাগ করিবে না। (৬) বাটীতে কেহ এই জ্বরে আক্রান্ত হইলে তাহাকে পৃথক রাখিবে। (৭) এই জ্বরে আক্রান্ত রোগীর থুঁতু এবং কাস ফেলিবার স্থান স্বতন্ত্র করিয়া দিবে। (৮) থিয়েটার ও বায়স্কোপ দেখিবার স্পৃহা এ সময় একেবারেই পরিত্যাগ করিবে।

মৃত্যুর কথা।—এই জ্বর প্রথমে একবার হইয়া ৩ দিন বা ৫ দিনের মধ্যে ছাড়িয়া যায় বটে, কিন্তু ইহাতে পুনরাক্রমণের সম্ভাবনা ঘন ঘন। দুর্ব্বল শরীরে এই ঘন ঘন আক্রমণের ফলে জীবনী শক্তি কতক্ষণ স্থির থাকিতে পারে? তাহার উপর শৈত্য ক্রিয়ায় যে বিষময় ফল উৎপন্ন হয়, তাহার কথা তো পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সেই জন্য দেশবাসীর সকলেই এ সময় বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করুন—ইহাই আমাদিগের পরামর্শ। স্মরণ রাখিবেন, কলেরা এবং প্লেগের বিভীষিকাময়ী মূর্ত্তি অপেক্ষা এ জ্বরের মূর্ত্তি কোন অংশে কম নহে। বায়ু এবং শ্লেষ্মার আধিক্য লইয়াই এ জ্বরের উৎপত্তি হইয়া থাকে—সেইজন্যই ইহার পরিণাম ভয়ঙ্কর ভাব ধারণ করিতেছে। আমরা এইজন্য পরামর্শ দিতেছি, দেশবাসিগণ এ সময় বিশেষ সতর্ক হউন, একবার যাঁহারা এই জ্বরে আক্রান্ত হইয়া মুক্তি লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা আর যাহাতে পাল্টাইয়া না পড়েন, তাহার জন্য যতটা নিয়মে থাকিতে পারেন—তাহার চেষ্টা করুন। পানীয় জল গরম করিয়া প্রতিগৃহে পান করিবার ব্যবস্থা করুন। কদাচ ঠাণ্ডা ক্রিয়া করিবেন না। এই রূপ করিলেই এ জ্বর দেশ হইতে পলায়ন করিবে।

ঔষধের কথা।—দুই বেলা এক রতি করিয়া "মকরধ্বজ" সেবন এ সময় বিশেষ হিতকর। আমরা চা পানের পক্ষপাতী না হইলেও এ সময় চা পানের পরামর্শ দিতে পারি। 'চা'য়ের সহিত একটু আদার রস মিশাইয়া পান করিলে আরও সুফল লাভের সম্ভাবনা। আমরা এই জ্বর সম্বন্ধে পরবর্ত্তী প্রবন্ধে সবিস্তার আলোচনা করিব।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

ঢাকার মামলা।—ঢাকার কবিরাজ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সরকার "রোহিতকারিষ্টের" জন্য যে বিপন্ন হইয়াছেন, তাহার প্রতীকার কল্পে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক সম্প্রদায় হইতে আবগারি কর্ম্মপক্ষদিগকে উহার প্রত্যাহার করাইবার চেষ্টা চলিতেছে। গত ৫ই জুলাই এই মামলার প্রতিবাদ করিবার জন্য কলুটোলায় সেন মহাশয়দিগের বাটীতে কলিকাতার সমস্ত কবিরাজদিগকে লইয়া এক বিরাট সভার অধিবেশন হইয়াছিল। কলিকাতার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র নাথ সেনের মামলা যে নজীরে তুলিয়া লওয়া হইল, ঢাকার মামলাও সেই নজীরে তুলিয়া লওয়া হউক এবং ভবিষ্যতে আবগারি বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণ কোন স্থানেই যাহাতে এরূপ মামলা দায়ের করিতে না পারেন, ভারতগবর্ণমেণ্টের তরফ হইতে তাহার জন্য সার্কুলার জারি করা হউক—এই সকল প্রসঙ্গ ঐ সভায় বিশেষ ভাবে আলোচনা করা হইয়াছিল। ঐ সভার অধিবেশনের ফলে অনারেবল শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী মহাশয় বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় বলিয়াছিলেন, এই অভিযোগ সম্বন্ধে যাবতীয় কাগজ পত্র ব্যবস্থাপক সভায় দাখিল করা হউক। গবর্ণমেণ্ট কিন্তু ইহাতে সম্মত হন নাই। এই মামলা রুজু করিবার পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট হইতে উকীলের পরামর্শ গ্রহণ করা হইয়াছিল কিনা—ব্রজেন্দ্রবাবু সে সম্বন্ধেও প্রশ্ন করিয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্ট উত্তর দিয়াছিলেন,—"করা হয় নাই।" পুনরায় ব্রজেন্দ্র বাবু প্রশ্ন করেন,—"ইহা কি একটা পরীক্ষা স্বরূপ মামলা?" গবর্ণমেণ্ট উত্তর দিলেন,—"না।" গবর্ণমেণ্টের এইরূপ উত্তরে আমরা আরও শঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছি। বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট এরূপ মামলা চালানয় কবিরাজী চিকিৎসার মূলে কুঠারাঘাত করা হইবে বলিয়া ইহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছিলেন। সেই দৃষ্টান্ত অনুসারে এই মামলাও উঠাইয়া লইয়া বাঙ্গালাদেশে কবিরাজী চিকিৎসার বাধা বিঘ্ন দূর করা কি কর্ত্তৃপক্ষের 'কর্ত্তব্য' নহে। একদা সার পারডি লিউকিসের মত একজন বিশেষ অভিজ্ঞ চিকিৎসক বলিয়াছিলেন যে, "অ্যালোপাথির মত আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার সমর্থনও গবর্ণমেণ্টের করা একান্ত কর্ত্তব্য। "দেশে এরূপ মামলা চলিলে আয়ুর্ব্বেদের প্রসার বৃদ্ধি আর কেমন করিয়া হইবে?

সংক্রামক জ্বরে 'নায়ক'।—সহযোগী 'নায়ক' সংক্রামক জ্বরের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য বলিয়াছেন,—"পূর্ব্বে সকালে সন্ধ্যায় প্রতিঘরেই ধূপ ধূনা জ্বলিত। ইহা নিত্য নৈমিত্তিক কর্ত্তব্য কার্য্য ছিল। পিতৃ পিতামহাদির আচরিত নিয়মাদি পরিহার করিয়া আমরা পদে পদে ভুগিতেছি। প্রাণ রক্ষার জন্য আমাদের কথামত সকলে চলিয়া দেখুন। ধূপ ধূনা গঙ্গাজল ব্যবহার করুন। শরীর ও মন পরিষ্কার ও পবিত্র রাখুন। আচার মত অন্ততঃ কয়েক দিন চলুন। দেখিবেন, ধীরে ধীরে রোগ পলায়ণ করিবে।" সহযোগীর পরামর্শ যে খুবই সঙ্গত সে বিষয়ে আর সন্দেহ মাত্র নাই।

মাসিকপত্র ও সমালোচক।

২য় বর্ষ। | বঙ্গাব্দ ১৩২৫—ভাদ্র। | ১২শ সংখ্যা।

কাজের কথা।

—:*:—

অতীত ও বর্ত্তমান।—অতীত ও বর্ত্তমানের কথা চিন্তা করিলে আমাদের অনেক কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে,—যখন আমরা সভ্য হই নাই,—ইংরাজী শিক্ষা পাই নাই, উদরান্নের সংস্থানের জন্ত যখন আমাদিগকে পল্লী-মায়া বিসর্জ্জন দিয়া বিদেশবাসী হইতে হয় নাই, তখন—সেই অতীত কালে শান্তি বলিয়া আমাদের মধ্যে যে একটা জিনিস ছিল, এখন আর তাহা নাই। সুজলা-সুফলা-মলয়জ শীতলা-শস্যশ্যামলা-পল্লী-প্রান্তরে মার্ত্তণ্ড-ময়ুখ-পীড়িত-কৃষকের গানে আমাদের প্রাণের মধ্যে যে একটা স্ফূর্ত্তি আনিয়া দিত, সহরের জন কোলাহলের মধ্যে সে স্ফূর্ত্তি আমরা যেন আদৌ উপলব্ধি করিতে পারিনা। পল্লীবাসী অবস্থায় পোলাও-কালিয়া-লুচি-কচুরির আস্বাদনে রসনা তৃপ্ত করিবার ক্ষমতা তখন কার দিনে আমাদের ভাগ্যে অল্প ঘটিলেও—ক্ষেতের ধান, বাগানের তরকারী এবং পুকুরের মাছে আমরা যে তৃপ্তিলাভ করিতাম, সে তৃপ্তি—সে আনন্দ—সে সুখভোজন এখন যেন আর আমাদের ভাগ্যে জোটেনা। বাঙ্গালী যে আজি এত রোগক্লিষ্ট, তাহার অনেকটা কারণও ইহাই।

* * * *

খাদ্যাভাব।—সহরে অবশ্য খাদ্য সম্ভারের অভাব নাই। অর্থও এখনকার দিনে যথেষ্ট সুলভ। কিন্তু হইলে কি হয়? আমরা এখন যে পরিমাণ অর্থ উপার্জ্জন করি, সে অর্থে শুধু উদরান্নের ব্যবস্থা করিলেই তো হইবেনা—এখন সে অর্থে আমাদের অবস্থোচিত তাবৎ বিষয়ই রক্ষা করিতে হয়। যিনি যেরূপ চাকরি করেন, তাঁহাকে সেইরূপ styleএ থাকিতে হয়। ভিতরের অবস্থা যাহাই হউক, বাহ্য সম্পদটা সকলকেই ঠিক রাখিতে হয়। সেই সকল ঠিক রাখিয়া তাহার পর আমাদের জীবন ধারণের ব্যবস্থা। কাজেই

এই অবস্থায় অনেকস্থলে ব্যবস্থার বিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে। তাহারই ফলে দেশে এখন এত রোগের সৃষ্টি। অকাল মৃত্যু—শিশু মৃত্যু—আজীবন মৃতকল্প অবস্থা—সকলই এই ব্যবস্থা-বিপর্য্যয়ে ঘটিতেছে।

* * * *

শাস্ত্র-বিধি।—শাস্ত্রকার বলিয়া গিয়াছেন,—"শরীরমাদ্যং।" সে কথাটা এখন কার দিনে দেশের লোক বাস্তবিকই বোঝে না। শাস্ত্রের তাবৎ বিধিই তো এখন আমরা উল্লঙ্ঘন করিতে বসিয়াছি। সদাচার-পালনে শুধু যে ধর্ম্মরক্ষা হয়,—তাহা নহে, সদাচার-পালন স্বাস্থ্যোন্নতিরও মূল ; কিন্তু সে সদাচার-পালনের বিধিটা এখন দেশ হইতে একরূপ লোপ পাইতেই বসিয়াছে। সহরে আসিয়া এখন আমরা যথেষ্ট মাংসাশী হইয়াছি, দোকানের জবাই করা মাংস কিনিয়া লইয়া গিয়া আমরা খাইতে শিখিয়াছি। কিন্তু এইরূপ আহারে আমরা যে সদাচার-বিধি উল্লঙ্ঘন করিতেছি—আমাদের অজীর্ণ—আমাদের যক্ষ্মা—আমাদের ক্ষয়রোগ তাহারই ফল সম্ভূত।

* * * *

'খনার' বচন।—মাংস শরীর ধারণের সহায়তা করে সত্য, কিন্তু সে মাংস উপযুক্ত হওয়া চাই। ছাগ মাংস ভক্ষণে—কচি ছাগই ব্যবহার করা উচিত। দোকানের মাংস যে কি—তাহা কিন্তু কাহারও দেখিবার প্রয়োজন হয় না। শাস্ত্রবিধি অবলম্বনে 'খনা' আমাদের আহারীয়ের ব্যবস্থার বলিয়া গিয়াছেন—

"শাকের ছাঁ, মাছের মা'—
কচি পাঠা, বৃদ্ধ মেষ,
দধির অগ্র, ঘোলের শেষ।"

অর্থাৎ শাক কচি অবস্থায়, মাছের মাথা, কচি পাঠা, বৃদ্ধ মেষ, দধির অগ্রভাগ—এবং ঘোলের শেষ—শরীর পুষ্টির সহায়তা করে। কিন্তু এখন এ সকল কথা, শোনেই বা কে?—আর মানেই বা কে?

* * * *

দুগ্ধ ও ঘৃত।—দুগ্ধ ও ঘৃত শরীর রক্ষার যে দুইটি দ্রব্য সর্ব্বাপেক্ষা উপকারী, সে দুইটির আস্বাদন সহরের বাঙ্গালী তো এখন একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছে। শাস্ত্র বলিয়াছেন,—"ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ!" কিন্তু খাঁটি ঘৃত পাইবার উপায় নাই, ঘৃত সেবনে সহরবাসীর প্রবৃত্তিও নাই।—তাহার পর পল্লী-মায়া ত্যাগ করিয়া সহরে আসিয়া, বাঙ্গালী সন্তান অর্থের মুখ অধিক করিয়া দেখিতে পাইতেছে সত্য, কিন্তু যে কোন কারণেই হউক, পুষ্টিকর আহারীয় গ্রহণ অনেকের ভাগ্যেই যে ঘটিতেছেনা—ইহা অবিসংবাদিত। সহর প্রবাসী-বাঙ্গালীর রোগ-প্রবণতার প্রসার-বৃদ্ধির ইহাই কারণ। কিন্তু ইহার আর প্রতীকার নাই।

* * * *

পল্লীগ্রামে ম্যালেরিয়া।—আমাদের পল্লী-জননী আজি কানন-বহুলা হইয়া—ম্যালেরিয়া প্রপীড়িতা সত্য, দারুণ গ্রীষ্মাতিশয্যে পল্লীমাতার পুষ্করিণীগুলি দাম-শৈবালে সমাচ্ছন্ন হইয়া নষ্ট হইতে বসিয়াছে সত্য, নৈশ অন্ধকারে পল্লী-ভিটায় ব্যাঘ্রের হুঙ্কারে ভীতির সঞ্চার হইয়া থাকে সত্য, কিন্তু যদি আমরা—কায়মনোপ্রাণে সহর বাসের স্পৃহা ছাড়িয়া দিই,—আমাদের পরিত্যক্তা পল্লী-জননীর শান্তিময় ক্রোড়ে আবার যদি আমরা স্থান লইতে পারি, ক্ষেতের ধান, বাগানের তরকারি, পুকুরের মাছের ব্যবস্থা করিয়া আবার যদি আমরা অল্পে সন্তুষ্ট থাকিতে পারি, তাহা

হইলে আবার আমাদের শরীর রক্ষার উপযোগী পুষ্টিকর আহারীয়ের ব্যবস্থা হইতে পারে। বনজঙ্গলগুলি কাটাইয়া, সুপেয় জল সংস্থানের ব্যবস্থা করিয়া, পল্লীভূমির ম্যালেরিয়া দূর করা যাইতে পারে। কিন্তু সহর প্রবাসী বাঙ্গালী বাবুর সে প্রবৃত্তি কি আর হইবে ?

শ্রীসত্যচরণ সেন গুপ্ত কবিরঞ্জন।

শিক্ষায় স্বাস্থ্য হানি।

—:*:—

আবার ফরমাস্,—'আয়ুর্ব্বেদ' পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিতে হইবে—তাহা শুদ্ধ একটী নহে, মাসে মাসে—ধারাবাহিক রূপে। অধিকন্তু ফরমাস এবার একজনের নহে ;—শুদ্ধ সহৃদয় সহযোগী সম্পাদক কবিরঞ্জন মহাশয়ের নহে। কবিরাজ-শিরোভূষণ মাননীয় সম্পাদক শ্রীযুক্ত যামিনী ভূষণ রায় এম, এ, এম্, বি মহাশয়ের ও সুলেখক-সুসাহিত্যিক-বিদ্বান শ্রীযুক্ত ব্রজ-বল্লভ রায় কাব্যতীর্থ কাব্যকণ্ঠ বিশারদ মহাশয়েরও এ ফরমাসে যোগাযোগ আছে। আমা হেন অকিঞ্চনের পক্ষে এপরম সৌভাগ্য-সঞ্চার—সন্দেহ নাই।

কিন্তু মানি—এ সৌভাগ্য তাঁহাদের সহৃদয়তা ও স্নেহ প্রসূত, মানি তাঁহাদের উদ্দেশ্য কথনই এ দীনকে অপদস্থ করা নহে, কিন্তু তথাপি প্রাণ যে অত্যন্ত ব্যস্ত না হইয়া পারিতেছে না। মুচিরাম গুড় recommendation বলে ডেপুটী হইতে পারিলেন বটে, কিন্তু জন-সাধারণের পক্ষ হইতে গ্রন্থকার তাহাতে 'হরি-বোল' দিতে বিরত হইলেন কই ? আমি মহা-জনের অনুগ্রহে লেখক মহলেই যেন চলিয়া যাইলাম, কিন্তু এ পদোন্নতিতে পাঠকের কণ্ঠে অব্যক্ত 'হরিবোল' ফুটিতে চাহিবে না কি ? কুসুমের প্রসাদে কীট যেন সুর-শিরই প্রাপ্ত হইল, কিন্তু কীটের তাহাতে গৌরব বাড়িল কই ?

এবারের প্রবন্ধটীও সহযোগী সম্পাদক মহাশয় কর্ত্তৃক অবধারিত। ও বারের প্রবন্ধটী যে মোটেই ভাল হইয়াছিল—সে বিষয়ে বিন্দু মাত্রও প্রতীতি আমার নাই। আমার মনে হয়, ও বারে সহৃদয় হইলেও কবিরঞ্জন মহাশয় আমাকে একটা কড়া প্রশ্নের সমাধান করিতে দিয়াছিলেন,—কারণ সে প্রবন্ধে আমার গণ্ডীর বাহিরে আমার ভ্রমণ পথ নির্দ্ধারিত হইয়াছিল,—রোগীকে চিকিৎসকের কাজ করিতে বলা হইয়াছিল,—ভগ্নস্বাস্থ্য—ছাত্রকে স্বাস্থ্যরক্ষা-বিধান করিবার ভার দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু এবারের প্রশ্ন পত্র অনেক সহজ—রোগীকে তাহার রোগের ইতিহাস বলিতে হইবে,—সে যে বিষয়ে ভুক্তভোগী, তাহাই তাহাকে বর্ণন করিতে হইবে.—ছাত্রকেই জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে—"আধুনিক শিক্ষায় তোমার স্বাস্থ্য কেন ভগ্ন হইতেছে লিখ।" ছাত্রের কার্য্য যখন উত্তর-প্রদান, তখন আমি অবশ্য এ প্রশ্নের উত্তর দিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। কিন্তু প্রশ্ন সহজ বলিয়া যে উত্তর

সুন্দর দিতে পারিব—তেমন গর্ব্ব করিতে পারি না। হয়ত কঠিন প্রশ্নের ছাত্র যাহা উত্তর দেয়, সহজ প্রশ্নের উত্তর তাহা হইতেও খারাপ দিয়া ফেলে,—উত্তরের এই অনিশ্চয়তা আছে বলিয়াই ছাত্র—ছাত্র, এবং অজ্ঞতার এই অনিশ্চয়তাকে নিরাকরণ করিবার জন্যই শিক্ষকের আবশ্যকতা। তবে ভরসা মাত্র এই যে, দয়া ও স্নেহের চক্ষে সর্ব্বদোষের ক্ষমা মিলে। তাই কবির বাণী সার্থক—"How sweet is mercy" এবং "mercy is twice blessed."

পূর্ব্ব প্রবন্ধে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছিলাম—উপযুক্ত শিক্ষা দেহ ও মনের সামঞ্জস্যের মধ্য দিয়া লাভ করিতে হইবে। এখন শিক্ষায় কতটা স্বাস্থ্য হানি হইতেছে বুঝিতে হইলে, প্রথমেই দেখিতে হইবে—বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালীতে এই সামঞ্জস্য বিধানের কতটা ত্রুটি পরিলক্ষিত হইতেছে। বলা বাহুল্য, আমি এই পন্থা অবলম্বন করিয়াই আমার বক্তব্যের অবতারণা করিব।

আর একটি কথা এখানে বলিয়া রাখা ভাল মনে করি,—পূর্ব্ব প্রবন্ধের মত এ প্রবন্ধেও আমি 'স্বাস্থ্য' শব্দটির অর্থ একটু বিশদ করিয়া ধরিয়াছি। এই শব্দটীতে আমি শরীর ও মন--উভয়ের স্বাস্থ্যের কথাই বুঝিয়া লইয়াছি। তবে বর্ত্তমান প্রবন্ধে মনের স্বাস্থ্য হানি সম্বন্ধে পৃথক করিয়া বলিব না; কারণ পূর্ব্ব প্রবন্ধে এ বিষয়ে যাহা বলিয়াছি—তাহাই যথেষ্ট।

আর একটা কথা এই যে, রোগের চিকিৎসার কথা বলিতে গেলেই রোগের কথা পূর্ব্বেই বলিতে হয়। সুতরাং পূর্ব্ব প্রবন্ধেও যে স্বাস্থ্যহানির কথা মোটেই বলি নাই. তাহা নহে। এ প্রবন্ধে,—পূর্ব্ব প্রবন্ধে স্বাস্থ্যহানি সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, তাহার পুনরুক্তি যতটা পারি—না করিতে চেষ্টা করিব। পুনরুক্তির জন্যই যে এ বিষয় ত্যাগ করিতেছি তাহা নহে, স্থানাভাবের কথাও ভাবিতে হইতেছে। বলা বাহুল্য পুনরুক্তির ভয় করিলে বিষয় অনেক সময়ই বিশদ করিয়া বলা যায় না, তাই বিশেষ আবশ্যক মনে হইলে পূর্ব্ব প্রবন্ধের কথাও পুনরুক্ত হইবে। পুনরুক্তি বা অন্ততঃ পুনর্ধারণা ভিন্ন মানুষ এ জগতে কি বলিতে পারে? মানুষের মৌলিকতা যে অনুচিন্তনকে আশ্রয় করিয়াই জন্মগ্রহণ করে। এমন কথা কি কেহ কখন ভাবিতে বা বলিতে পারিয়াছে—যাহা অন্য কেহ না হউক—অন্ততঃ ঈশ্বরও কখনও ভাবিয়া দেখেন নাই?

আশা করি যাহা বলিয়াছি তাহাতে আমার প্রবন্ধ কোন্ ধারা বাহিয়া চলিবে—তাহা বুঝিতে আর বিশেষ কষ্ট পাইতে হইবে না। আমার এই দুইটী প্রবন্ধ একই সময়ে "companion pieces" ভাবে পড়িলে আমার বক্তব্য আরও সহজ বোধ্য হইবে।

যতদূর দেখা যাইতেছে, বিদেশীয় ও বিজাতীয় শিক্ষার সংঘর্ষে আমাদের শিক্ষার যতটা অবনতি হইয়াছে ও তজ্জন্য আমাদের স্বাস্থ্যের যতটা হানি হইতেছে. ততটা আর কিছুতেই হইতেছে না। স্বীকার করি, মানুষকে চরম শিক্ষা পাইতে হইলে, মাত্র নিজের শিক্ষায় শিক্ষিত হইলে তাহার চলিবে না,—তাহাকে বিদেশীয়ের নিকট হইতেও সংগ্রহ করিতে হইবে। এইরূপ সব জাতিই করিয়াছে। স্বয়ং ইংরাজ জাতি—যাহাদের শিক্ষা আজ আমরা চরম আদর্শ বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছি ও একান্ত ভক্তিভরে পূজা

করিতেছি—তাহারাও বিভিন্ন সময়ে ফরাসীয়, জার্ম্মান, ইতালীয় প্রভৃতি জাতির শিক্ষা হইতে অনুকরণ করিয়াছে; ফ্রান্স-ইংরাজী রোমান্সের আব্‌হাওয়া না পাইলে, ক্রুভেয়ার (Trouvere) ও ক্রবেডুর (Troubadour) কবিগণ তাহার যে শিশুশিক্ষা যুগের প্রবর্ত্তন করিয়াছিল, তাহার শেষ হইত না। আবার ইউরোপীয় সর্ব্বসাহিত্যই গ্রীক্ ও রোমান্ সাহিত্যের নিকট চিরঋণী। কিন্তু তাই বলিয়া এত অনুকরণের মধ্যেও ঐ ঐ জাতি তাহাদের নিজ জাতীয় শিক্ষার প্রাণটাকে হারাইয়া ফেলে নাই,—এই প্রাণটা অটুট ছিল বলিয়াই উহারা আজ নিজ নিজ সাহিত্যের গর্ব্ব করিতে পারিতেছে।

নর্ম্মানাধিকারে ঘোর ভাগ্য-বিপর্য্যয়ে ইংরাজী ভাষা ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া যাইতেছিল। কিন্তু সেই চূর্ণ—পুনরায় যে মহা সৌধ হইয়া গড়িয়া উঠিল—তাহার কারণ, সে ভাষা, সে সাহিত্য—এই অবসানের মহাঝড়ের মধ্যেও তাহার জাতীয় প্রাণটাকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিয়াছিল, কিন্তু ভারতীয় শিক্ষার অদৃষ্ট অন্য রূপ, -এ অনুকরণশীল, কিন্তু রক্ষণশীল নহে, এ হুজুগে মাতিয়া চলিয়াছে, নিজের দিকে ইহার লক্ষ্য নাই, এ কেবল গ্রহণ করিতেছে, কিন্তু হজম করিতেছে না। অধিকন্তু ইহার আহরণ-স্পৃহা এতদূর বলবতী হইয়া উঠিয়াছে যে, নিজস্ব ত্যাগ করিয়াও পরস্ব সমাদরে বক্ষে তুলিয়া লইতে ইহার লজ্জা বোধ হয় না। এই জন্যই ত ইহার নিজস্ব প্রায় বিলুপ্ত, জীবনী শক্তি ক্ষীণা। এই লুপ্তপ্রায় প্রাণকে সজীব করিতে পারিলে তবে ইহার বাড়িবার আশা। নতুবা ভগ্নস্বাস্থ্য ইহাকে মৃত্যুর দ্বারে উপস্থিত করিবে। সময়ানুযায়ী অনুকরণ করা ভাল, অন্যের নিকট হইতে গ্রহণ করা ভাল, কিন্তু গ্রহণ করিবার সময় বিশেষ বিবেচনা করিতে হইবে—সমীকরণ করিতে পারিব কিনা। বিদেশীয় শিক্ষা যতটা আমার শিক্ষার সহিত সামঞ্জস্য লাভ করিতে পারে, ততটাই গ্রহণ করা উচিত,—তদতিরিক্ত গ্রহণ করিলে, সে শিক্ষাকে আমি 'আমার ঘরে' রাখিতে পারিব না, সে শিক্ষা আমাকে 'তাহার ঘরে' লইয়া যাইবে। পর-শিক্ষা—পর-ধর্ম্মেরই মত অনেক সময় ভয়াবহ হইয়া উঠে। আমরা কিন্তু এ সব বুঝি না—আমাদের শিক্ষক ছিলেন—গুরু, পিতা; এখনকার শিক্ষক হইয়াছেন—বন্ধু, সখা! আগের শিক্ষক—ছাত্রকে সম্বোধন করিতেন—'বৎস', এখন স্কুলের শিক্ষক ডাকিবেন,—'my dear boy'—কলেজের শিক্ষক ডাকিবেন 'gentleman'। এসম্বন্ধে কি আমাদের চলে? ফল তাই বিষময় দাঁড়াইতেছে। etiquette রূপ বিদেশীয় মদিরা প্রথম হইতেই আমাদের ছাত্রের মাথা নষ্ট করিয়া দেয়। তাই বালক এই ভ্রাতৃভাবের শিক্ষায় প্রথম হইতেই একটু স্বেচ্ছাচারী হইয়া গড়িয়া উঠে,—এই স্বেচ্ছাচারীতাই পরে তাহার মনের ও শরীরের স্বাস্থ্য-হানির কারণ হয়,—যথেচ্ছাহার, যথেচ্ছ পরিচ্ছদ ধারণ, উচ্ছৃঙ্খল চিন্তাকরণ, ছাত্রদের কি ক্ষতি করিতেছে,—তাই বলিবার জন্যই ত আজ উপস্থিত হইয়াছি।

ছাত্র-শিক্ষকে এই সখ্যভাব—ছাত্রকে নিজেকে শিক্ষকের সহিত সমান গণ্য করিতে শিক্ষা দিয়াছে,—তাই ছাত্র আজ আর বড় একটা শিক্ষককে মানিয়া চলিতে চাহেনা,—তাই ভারতীয় শিক্ষার একটা কেন্দ্রস্থলে,—এই কলিকাতা সহরেও শিক্ষকের সহিত ছাত্রের

Strike রূপ অভাবনীয় ব্যাপারের আবির্ভাব সম্ভব হইয়া থাকে। এইরূপ ব্যাপার কি ছাত্রের ঘোর মানসিক স্বাস্থ্যহানির পরিচায়ক নহে? আজকালকার ছাত্র-সমাজ শিক্ষককে ধরিয়া লইয়াছে—শুদ্ধ বাহিক শৃঙ্খলা সাধনের একটা যন্ত্র স্বরূপ। তিনি দেখিবেন—শুদ্ধ তাঁহার ক্লাসে ছেলেরা অসদ্ব্যবহার—পাশ্চাত্য ধরণের অসদ্ব্যবহার - না করে। ছাত্রের মন—তাহার চরিত্র—শিক্ষকের শিক্ষক তার বাহিরে। তিনি শুধু বলিবেন পুস্তকের উপদেশ; কিন্তু কোন কিছু সৎশিক্ষা মনে প্রবেশ করাইয়া দিবার ইচ্ছা ও অনেক সময় ক্ষমতা তাঁহার নাই। ব্যবসায়ী জাতির নিকট হইতে আমরা শিখিয়াছি, শিক্ষাও ব্যবসাগত। টাকা দাও, পড়। শিক্ষক বলিবেন,—তুমি শুনিবে। তিনি তোমার নিকট পুস্তকের বুলি আওড়াইবেন, তুমি ঘরে গিয়া তোতা পাখীর মত তাহা মুখস্থ করিয়া ফেলিতে চেষ্টা কবিবে।—সে উপদেশ তোমার মস্তিকে প্রবেশ করিয়া, তোমার জীবনের প্রতি কার্য্য কলাপের সহিত যাহাতে সংমিশ্রিত হইয়া যায় তাহা দেখা শিক্ষকের গণ্ডীর বাহিরে। শিক্ষক তাহা দেখিবেন না—তিনি দেখিবেন—তাঁহার ক্লাসে 'ডিসিপ্লিন্' নামক পাশ্চাত্য etiquette রক্ষিত হইতেছে কিনা। ঘরে তুমি যদিচ্ছা ব্যবহার করিতে পার, শিক্ষকের তাহাতে কি আসিয়া গেল? আজকাল আইন-কানুনের শিক্ষা,—আইন মানিয়া চলিলেই হইল—আইনের একচুল ব্যবধান করিলেই শিক্ষক ও ছাত্র উভয়েই দণ্ডনীয়। Law must be observed to the letter. আইন Shylock এক পাউণ্ড মাংস দোষ পাইলেই বুক হইতে ছুরি দিয়া কাটিয়া লইবে। Mecry এখানে নাই—দয়া ও স্নেহের শিক্ষা ভারতের নিজস্ব ছিল, সে শিক্ষার নির্ব্বাসনের ষড়যন্ত্র চলিতেছে। শিক্ষক আইনের সদা ভীতি লইয়া নিজে দেখিবেন? না ছাত্রের শিক্ষায় মনোযোগী হইবেন? পূর্ব্বে এটা ছিল না। পড়ার বয়স হইবামাত্র শিক্ষক ছাত্রকে নিজ গৃহে লইয়া যাইতেন। সেখানে পুস্তকের শিক্ষা ত হইতই, অধিকন্তু ছাত্রের জীবন সুখে অতি-বাহিত হইতে পারে—এমন যাবতীয় শিক্ষায় তাহাকে শিক্ষিত করা হইত। তাহার চরিত্র, তাহার শরীরপোষণ, তাহার খাদ্যাখাদ্যের ব্যবস্থা, তাহার ধর্ম্ম প্রবৃত্তির উন্মেষ সাধন—এইরূপ সর্ব্ব বিষয়ে শিক্ষা দিয়া,তাহাকে একটী 'কাজের লোক' করিয়া পুনরায় পিতৃ ভবনে হাজির করিয়া দেওয়া হইত। এখনকার মত শিক্ষাকে 'পুস্তক গত শিক্ষা' এইরূপ সঙ্কীর্ণ অর্থে তখন ধরা হইত না। সুখের বিষয় এ আদর্শে এ যুগেও অন্ততঃ একটী বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে—বোলপুরে—কবীন্দ্র রবীন্দ্র নাথের প্রসাদে। সেখানে ছাত্রগণ কিরূপে যুগপৎ শরীর ও মনের স্বাস্থ্যলাভ করিয়া শিক্ষিত হইতেছে তাহা প্রণিধান যোগ্য। কিন্তু কে প্রণিধান করে! ভারতের সে জাতীয় প্রাণ যে মৃত্যুশয্যায় অচেতন? তাই কবির যে কবিত্ব—কল্পনার আতিশয্যে মূর্ত্ত হইয়া ফুটিয়াছে এ ভারতে তাহা হয়ত আর তা'র অনুরূপ সৌন্দর্য্যকে খুঁজিয়া পাইবে না, হয়ত তাই আপনাকেই বরণ করিয়া ক্ষোভে Narcissus এর মত যৌবনেই আত্মহত্যা করিয়া বসিবে।

আমি পাশ্চাত্য শিক্ষার নিন্দা করি না,—বরং কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করি, পাশ্চাত্য শিক্ষাই আমাদের চক্ষু ফুটাইয়াছে—আমাদের অতীত গৌরবকে সম্মান করিতে শিখাইয়াছে,

—আমাদের চতুর্দ্দিকে যে জাতীয়তার অভাবের সাড়া পড়িয়াছে, তাহাও ভাবিয়া দেখিলে পাশ্চাত্য শিক্ষাই জাগাইয়া দিয়াছে। আমার উদ্দেশ্য—পাশ্চাত্য শিক্ষার নিরাকরণ নহে, আমার উদ্দেশ্য—পাশ্চাত্য শিক্ষাকে আমাদের অতীত শিক্ষার সহিত একীকরণ, আমার উদ্দেশ্য এই দেখান যে, পাশ্চাত্য শিক্ষা অন্যায়-ভাবে গ্রহণ করিয়া আমরা জাতীয় শিক্ষাকে হারাইয়া ফেলিতেছি ও সঙ্গে সঙ্গে আত্মরক্ষার শক্তির অভাবে স্বাস্থ্যহীন হইতেছি।

দেশ-কাল পাত্র ভেদে সবটারই পরিবর্ত্তন আবশ্যক—এটা আমাদের বুঝিতে হইবে। না বুঝিয়া স্বাস্থ্যের কি অবনতি সাধিত হইতেছে শুনুন।

শীত প্রধান দেশে প্রভাতে বরফের গুতায় বাহির হওয়া যায় না, গায়ের রক্ত জমাট বাঁধে, তাই বিলাতে বেলা ১০টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত স্কুলে, কলেজে, পড়ার সময়। বিলাতে এটা সুনিয়ম সন্দেহ নাই। তাই বলিয়া যে দেশে দ্বিপ্রহর রৌদ্রে কাঠ ফাটে, সে দেশে ১০টার সময় জামাজুতা আঁটিয়া, ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে, রাস্তার ধূলা খাইয়া, জনাকীর্ণ ক্লাসে ৪।৫ ঘণ্টা গিয়া একই ভাবে বসিয়া থাকিলে ছাত্রের রক্ত যে দিন দিন শোষিত হইতে থাকিবে, সে বিষয়ে সন্দেহ কি? এইরূপ ভাবে গিয়া বসিয়া থাকিলেই মাথা ঘুরিতে থাকে, তদুপরি সেখানে লিখিতে-পড়িতে হইলে, শিক্ষক মহাশয় কি বলিতেছেন—তাহাতে মনোযোগী হইতে হইলে, মস্তিষ্কটী যে অল্পেই নষ্ট হইবে সেটা কি বড়ই অস্বাভাবিক? -কাজেই ১৬ বৎসর না হইতেই ছাত্র যে চস্‌মা লইবেন, নানারূপ আধিব্যাধি যে তাঁহার জীবনের সাথী হইবে তিনি যে ক্রমে 'তালপাতার সিপাই' হইয়া গড়িয়া উঠিবেন, তিন হাতের বেশী বাড়িবেন না, না হাসিলেও যে তাঁহার দশন পংক্তি বিকশিত হইয়াই থাকিবে, ২০ বর্ষেই তাঁহার চুল পাকিবে, ৩০ বর্ষে তিনি উন্মাদ হইবেন বা ৪০ বর্ষের মধ্যেই 'থাইসিসে' মারা যাইবেন—এ কি বড়ই আশ্চর্য্য কথা?

এত গেল মুখবন্ধের কথা। কোন কোন ছাত্রের অভিভাবক শিক্ষা বিষয়ে এতদূর অনু-রাগ-পরায়ণ যে, হয়ত ৪৷৷০ টার সময় স্কুল হইতে আসিয়াই ছাত্র দেখিলেন, গৃহ-শিক্ষক মহাশয় অবতীর্ণ হইয়াছেন। মনোযোগে বা অমনো-যোগে তাঁহাকে অন্ততঃ দুই ঘণ্টা কাল পড়ি-তেই হইবে—তা'হয়ত বা চারিটী মুড়ি খাইয়া বা ২টী সন্দেশ জলযোগ করিয়া। মাষ্টারমহাশয় ত চলিয়া গেলেন, তবু কি ছাত্রের নিস্তার আছে? সান্ধ্যভোজন—বোর্ডিং বা মেসের অপক্ক অন্ন ব্যঞ্জন বা গৃহের প্রায়শঃ অসার খাদ্যে যেমনই হউক—তাঁহার ঘুমাইবার জো' টী নাই। পরদিনকার স্কুল বা কলেজের পড়া তাঁহাকে শিক্ষা করিতে হইবে। এ পর্য্যন্ত ত পড়া কেবল বুঝিলেনই, এবার তাঁহার মুখস্থের পালা। নিদ্রাভরে চক্ষু ঢুলু ঢুলু—তথাপি ছাত্র পড়িতেছেন—তা "A point has position but no magnitude" ই হউক বা "The total quantity of energy is conserved"ই হউক—তাহার পাঠে কতকটা আত্মকাহিনীই তাহার বিবৃত করিতেছে। তাহার নিজেরও স্থিতি আছে, কিন্তু বিস্তৃতি ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে, শরীর মনের energy ত ক্ষয় হইতেছে, কোন্ জগতে যাইয়া যে তাহার ক্ষতি পূরণ হইবে তাহা বিধাতাই জানেন। রাত্রি ১২টার সময় ত ছাত্র শয়ন করিলেন,—বাতিক চড়িয়া যাওয়ায় সমস্ত রাত্রি হয় দেখিলেন, আধ-নিদ্রা ঘোরে অনন্ত স্বপ্ন, নয় ভুগিলেন insom-

nia য়। ক্রমে দেখা যাইতে লাগিল—ছাত্রের চক্ষু কোটর-গত, গণ্ডস্থল শুকাইয়া যাইতেছে, কিছুই হজম হয় না—কখনও উদরাময়,কখনও কোষ্ঠবদ্ধতা রোগ লাগিয়াই আছে। প্রাত-র্ভ্রমণ ও ব্যায়াম সম্বন্ধে অভিভাবক ও অভি-ভাবকের প্ররোচনায় ছাত্র ক্রমে নিতান্ত অমনোযোগী—কেন না সেটা বাজে কাজে সময় ক্ষেপ মাত্র। *

যে জাতির শিক্ষাকে আদর্শ করিয়া মানুষ চলে, ক্রমে সেই জাতির আচার নীতিও তাহার মজ্জাগত হইতে থাকে। ছাত্রও বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিখিতে লাগিলেন—এই দুনিয়ার সব খাওয়া যায়,—জাতিভেদ বর্ব্বর জাতি সুলভ কুসংস্কার,—সাহেবের আদর্শানুকরণ শততীর্থ দর্শনফলের সমান,—কেন না তাঁহাদের আদর্শই সভ্যতার চরম,—কেন না তাঁহারা সভ্য ধরণে পরিচ্ছদ ব্যবহার করেন, সভ্যধরণে বসেন, পা ফাঁক করিয়া দাঁড়াইয়া সিগারেট খান, অভিনব ধরণে হাসেন, কাসেন, আহার করেন। ফলে ছাত্র খাইতে লাগিলেন—যাবতীয় রেষ্টরেণ্টে উচ্ছিষ্ট পাত্রে—যেমন তেমন রকমের মাংসাদি—যাহার তাহার হাতে। গ্রীষ্ম প্রধান দেশে অত হংসডিম্ব, গরম মাংস, পেঁয়াজ-রসুন, হজম হইবে কেন? অম্লরোগ, দদ্রু হইতে আরম্ভ করিয়া কুষ্ঠ পর্য্যন্ত যাবতীয় চর্ম্মরোগ, ওলাউঠা প্রভৃতি নিত্য নূতন রোগ দল বাঁধিয়া ভারত ভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া ছাত্রের জীবন শেষ করিতেছে। আঁটা পোষাকে ছাত্রের রক্ত সঞ্চারণ বন্ধ, শরীরটী ঠেঙ্গার মত টিকটিকে, রক্তহীনতায় সেঁতসেতে। যথেচ্ছাহারে মন উত্তেজিত হইতে লাগিল, নৈতিক জীবনের অধঃপতন জন্য ব্রহ্মচর্য্যের অভাব ঘটিতে লাগিল—ছাত্র শীর্ণ দেহে মরণের পথের যাত্রী হইলেন। ছাত্রদের আদর্শ সাহেব,—কাজেই যে যত বেশী সিগারেট বিষপান করিবে, ভেস্লিন্ মাথায় মাখিবে, সোপ্ গায়ে ব্যবহার করিবে,সে তত বেশী সভ্য ও শিক্ষিত। সরবতের পরিবর্ত্তে চা, তৈলের পরিবর্ত্তে লোশন্, কাপড়ের পরিবর্ত্তে হ্যাট্‌কোট্ চলিতেছে। চা—ডিস্পেপ্সিয়া, লোসন—চর্ম্ম ফাটা বা চর্ম্মরুক্ষতা, কোট পেণ্টালুন—বৃদ্ধিহীন শীর্ণদেহ, হ্যাট্—অকালে পক্বকেশ বা মস্তকদেশে টাকরূপ মরুস্থলের সৃষ্টি করিতেছে—মাঝে মাঝে দুই একটী oasis পরিদৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু কতটা প্রাণারাম তাহা ছাত্রগণই মাত্র উপলব্ধি করিতে পারেন।

শীতপ্রধান দেশে গ্রীষ্মকালে অপরাহ্ণ চারিটা পাঁচটার সময় ধরণী শীতল হইতে থাকে, তখন একপেট মাংস বিস্কুট টিফিন্ খাইয়া পাশ্চাত্যেরা যে খেলা খেলেন, এতদ্দেশে সেই প্রাণহরণকারী foot-ball খেলা ঐ চারিটা পাঁচটার সময়ই যখন রৌদ্রে ছাতি ফাটে, তখন সুবিস্তীর্ণ ময়দানে যৎকিঞ্চিৎ কচুরি-সন্দেশ জলযোগ করিয়া, খেলিয়া, ছাত্রেরা কি সুন্দর স্বাস্থ্যই লাভ করেন, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। শীতকালের cricket খেলাটাই কি কম? এটী শীতকালের খেলা। বিলাতে ১১টায় আরম্ভ—এখানেও তাই—দর্শকেরা

* প্রবন্ধ লেখক সতীশবাবু B. A. পাস করিলেও এখনও ছাত্র, M A এবং আইন শিক্ষা করিতেছেন। উচ্চশিক্ষার উচ্চ আকাঙ্ক্ষায় তাঁহার নিজের স্বাস্থ্য প্রায়শঃই ভাল নয়, সেইজন্য তিনি বর্ত্তমান শিক্ষার স্বাস্থ্য-হানি কিরূপ ঘটিয়া থাকে, সে সম্বন্ধে বিলক্ষণ ভুক্তভোগী। এইজন্যই তাঁহার কথাগুলি বড় হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে।—আঃ সং।

রৌদ্রে ছত্র মাথায় দিয়া বা ছায়ায় দাঁড়াইয়া দেখেন,—আর যুবক-ছাত্রেরা বিলাতের অনুকরণে একরাশ কোট পেন্টালুন আঁটিয়া হ্যাট মাথায় খেলেন—মুখটী কাল, চক্ষু দুইটী কোটর গত, গণ্ডস্থল শুষ্ক। ইংলণ্ডে এ খেলা স্বাস্থ্যকর,এখানে ইহা প্রাণান্তকর।—ভারতের মাঠ শীতকালের মধ্যাহ্ন রৌদ্রে যেরূপ উত্তপ্ত থাকে, তাহা মানুষের রক্ত শোষণ করিবার পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী।

এতটা গেল মোটা মোটা অনুকরণে কথা। একটু তলাইয়া দেখিলে আমরা বুঝিতে পারি——বিলাতের সংঘর্ষে আমাদের শিক্ষার আদি হইতে বড় একটা ভুল চলিয়া আসিয়াছে। যে জাতির যেটা মাতৃভাষা, সেই ভাষার ভাব সে জাতি খুব সহজে হৃদয়ঙ্গম করে এবং সেই ভাষায় ব্যুৎপন্ন হইলে অন্যভাষা শিক্ষা সে জাতির পক্ষে আর ততটা কষ্টকর হয় না। স্বীকার করি ভারতের আধুনিক চলিত ভাষাগুলি এখনও দরিদ্র এবং বিভিন্ন ভাষার ভাব প্রবাহ দ্বারা ইহাদের ক্ষীণ কলেবরের পুষ্টি সাধন করিতে হইবে। কিন্তু আগে আমার কি আছে—সেটা বুঝিয়াই কি অন্যের গৃহে ধার করিতে যাওয়া উচিত নহে?

বিশেষতঃ মানুষের ভাব প্রবাহ ও সাহিত্য অনেকটা একই নিয়মপথে অগ্রসর হয়—যেমন সর্ব্বদেশের ভাষাতেই পদ্যের জন্ম গদ্যের পূর্ব্বে হইয়াছিল। মানুষমাত্রেই যখনএকজাতি—অবশ্য বিস্তৃতঅর্থে—তখনমানুষের চিন্তাপ্রণালীপ্রকৃতির নিয়মানুযায়ী অনেকটা এক পথই বাহিয়া চলে। "Greatmen think alike" না বলিয়া "Men as men think alike" বলিলেও একেবারে অসত্য বলা হয় না। ভাষাপেক্ষা ভাবের বড়ত্ব চিরকালই জগতে স্বীকৃত হইয়া আসিয়াছে। এই ভাব গ্রহণের জন্যই এক ভাষা অন্যভাষার নিকট প্রধানতঃ ঋণী। ভাব আসল জিনিস, ভাষা তাহার পরিচ্ছদ—যদিও ভাষারও ভাবকে সুস্পষ্ট, সুন্দর ও সুসজ্জিত করিবার জন্য সময় সময় বিশেষ আবশ্যকতা থাকুক এবং এই আবশ্যকতার জন্যই সময়ে সময়ে এই ভাষারও অনুকরণ হইয়া থাকুক। ভাবকে চিনিতে পারাই তাই বেশী কষ্ট,ভাষাকে আয়ত্ত করা ততটা নহে। এই ভাব সব জাতির মধ্যেই যখন একই পন্থাবলম্বন করিয়া বৰ্দ্ধিত হয়, তখন আমরা নিজের ভাষার পরিচ্ছদে ভূষিত করিয়া যদি ইহাকে আগে ভাল করিয়া চিনিয়া লই তবে যতটা হৃদয়ঙ্গম হয়, পরের ভাষার পরিচ্ছদে ততটা হয় কি? পরের ভাষা দিয়া আরম্ভ করিলে ভাষা ও ভাব দুইটাই নূতন ঠেকে—শিশুর কোমল মস্তিষ্কে এতটা নূতনত্ব অসহ হইয়া পড়ে।—প্রথম হইতেই তাহার মাথা ঘুলাইয়া দিলে সে শিখিবে কি? জাতীয় ভাষায় প্রথম শিক্ষার প্রবর্ত্তন হইলে চিরপরিচিত মাতৃভাষার পরিচ্ছদে জাগতিক ভাবের প্রাণটাকে যদি একেবার বুঝিয়া ধরিয়া লইতে পারি, ভাব কি প্রণালীতে জগতে প্রসারিত হইয়া গিয়াছে—যদি এই মূল সত্যের বোধটা আমার কোনক্রমে জন্মিয়া যায়,—তবে তারপরে-যে কোন দেশের সাহিত্যে প্রবেশ লাভ আর কি কঠিন বোধ হইবার সাধ্য আছে?—তখন ভাষা শিক্ষাটাই যা কষ্ট। একবার ভাষাটা শিক্ষা হইলে পূর্ব্বপরিচিত ভাবকে ধারণা করা আর তখন কঠিন হয় না। বরং নূতন পোষাকে তাহাকে আরও বেশী করিয়া সুন্দর দেখি বলিয়া আরও বেশী করিয়া বুঝিতে পারি। তখন সেই বিদেশীয় সাহিত্যচর্চ্চাকালে যত নূতন ভাবই আমার সম্মুখে

আসিয়া উপস্থিত হউক না কেন, স্বদেশভাষার ভাবের সঙ্গে তাহাকে একীভূত করিয়া লইতে পারি। তখনই শিক্ষার সার্থকতা। নূতন ভাষার নূতন ভাবে নিজভাষার ক্ষীণতা পরিপুষ্টি লাভ করিতে থাকে।

কিন্তু আমরা ত তাহা করি না! ইংরাজী আমাদের ধ্যানজ্ঞান হইয়াছে—কারণ ইংরাজী না শিখিলে মোটা চাকরি মেলে না। 'ক, খ', এর সঙ্গে 'A, B, Cর পাঠ আরম্ভ করি। কিছুদিনের মধ্যেই ক-খ'য়ের পাঠ বন্ধ হইয়া A, B, C'র ধারা ক্রমেই বাড়িয়া চলে।

বর্ত্তমান কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাতৃভাষার স্থান প্রসারিত করা হইয়াছে বটে কিন্তু মান বাড়ে নাই। বাঙ্গালা পড়িয়া এখনও ত বড় চাকরি জুটে না! অধিকন্তু যেরূপ প্রশ্ন পত্র হয় তাহাতে বাঙ্গালার জ্ঞানোন্নতির উপর বিশেষ দাবী করা হয় না—বাঙ্গালীর ছেলে যা বাঙ্গালা স্বভাবতঃ জানে ও বোঝে তাহা লিখিয়াই অনায়াসে পরীক্ষা বৈতরণী পার হইয়া যায়। ইংরাজীর আসন এতটা উচ্চ হওয়ায় ছাত্রগণের এইরূপ একটা কঠিনভাষাকে ইহার অভিনব ভাবসহ আয়ত্ত করিতে কঠোর প্রয়াস পাইতে হয়—যাবতীয় শিরোরোগ, চক্ষুরোগ, অকালবার্দ্ধক্য ও অকালমৃত্যু যে এই চেষ্টার, এই অন্যায় শক্তিপ্রয়োগের, অন্ততঃ কতকটাও পরিণাম নহে—এ কথা কি কেহ সাহস করিয়া বলিতে পারেন?

এ পর্য্যন্ত যা দেখিলাম—অনুকরণের,—Servile imitation এর শিক্ষা আমাদের কাল হইয়া উঠিয়াছে। আমরা শুধু জানি আহরণ করিতে, কিন্তু সমীকরণ করিতে পারি না—কারণ দিন দিন আমাদের জাতীয় জীবনীশক্তি হ্রাস হইয়া যাইতেছে—তাই এত স্বাস্থ্যহানি,—দৈহিক, নৈতিক ও ধর্ম্মজীবনের ধ্বংস লক্ষণ যুগপদ্ ফুটিয়া উঠিয়াছে।

এই স্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধার সাধন করিতে হইলে আমাদের জাতীয় জীবনীশক্তির সজীবতা আনয়ন করিতে হইবে, এবং তাহা করিতে হইলে প্রথমতঃই স্বীয় স্বীয় ভাষার উন্নতির জন্য আমাদের নিতান্ত মনোযোগী হইতে হইবে। আমাদের মনে রাখিতে হইবে আমরা শিখিব সবই, কিন্তু শিখিব নিজের ভাবে, এবং নিজের ভাষার উন্নতিই তাহার চরম উদ্দেশ্য থাকিবে। আমাদের দেশকাল পাত্রের অনুসারে অস্মদ্দেশীয় শিক্ষার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। পরের শিক্ষায় যেটুকু ভাল সেটুকুই আমরা গ্রহণ করিব; কিন্তু পরের শিক্ষার যাহা আমাদের অহিতকর তাহা গ্রহণ করিয়া আমরা মরিব না। আমাদের দেশে যখন প্রাতঃকালেই শিক্ষাদানের উপযুক্ত সময়, তখন সেই সময়েই যাহাতে শিক্ষাদান করা হয়, তাহার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। আমাদের দেশ—মুনিঋষির দেশ—এখানে গুরু—জনক,—'ইয়ার' নহে; কারণ তাঁহার নিকট হইতে ছাত্রের ইহকাল ও পরকালের শিক্ষা হইয়া থাকে। গুরু বাস্তবিকই ছাত্রের জ্ঞানজীবনের জন্মদাতা।

এ আমাদের দেশ চিরকাল ধর্ম্মকে কর্ম্মের অগ্রে রাখিয়া চলিয়াছে—সেই ধর্ম্মের ভাবের অভাবে এ দেশ যে কর্ম্ম জীবনে ও নৈতিক শিক্ষায় অধঃপতিত হইতে থাকিবে সে বিষয়ে সন্দেহ কি? অতএব এ ভারতভূমিতে শিক্ষাকে সংকীর্ণ অর্থে বুঝিয়া—ছাত্রকে পুস্তকের বুলি মুখস্থ করাইয়া ছাড়িয়া দিলেই চলিবে না। তাহার চরিত্র গঠিত হইতেছে কিনা—তাহার ব্রহ্মচর্য্য ব্রত রক্ষিত হইতেছে কিনা, শিক্ষার

তাহার শরীর ও মনের পূর্ণ সামঞ্জস্য সাধিত হইতেছে কিনা—এ সব বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে,—তবে ছাত্রের দেহ-মন স্বাস্থ্য-সৌরভে চতুর্দ্দিক মুখরিত করিবে। আমাদের বুঝিতে হইবে—কেবল কতকগুলা পুঁথি মুখস্থ করাইয়া বেদম লেখাইয়া এক একটী উচ্ছৃঙ্খল ভগ্নস্বাস্থ্য—গোলামপ্রস্তুত করিবার জন্য শিক্ষা মোটেই নহে—পুস্তক পাঠ শিক্ষার Medium মাত্র। পুস্তকের শিক্ষা শারীরিক-মানসিক ও আধ্যাত্মিক—এই তিন উন্নতিকে বক্ষে ধারণ করিয়া পরিপূর্ণত্ব লাভ করে। তাই মানসিক বৃত্তির পরিচালনের ক্ষতিপূরণের নিমিত্ত আমাদের দেশের উপযোগী শারীরিক ব্যায়াম শিক্ষা দিবার সুবন্দোবস্ত করিতে হইবে। শিক্ষার উদ্দেশ্য—আপনার,—স্বদেশের ও জগতের উন্নতি সাধন। কিন্তু সুস্থ দেহ জ্ঞানময় মন ও ধর্ম্মেচ্ছা ব্যতিরেকে এ উদ্দেশ্য সফল হইতে পারে না। তাই সর্ব্বপ্রথমে ছাত্রগণ যাহাতে নীরোগ হইয়া সুস্থ দেহের অধিকারী হইতে পারে ও তাহাদের পরস্পরের সংঘর্ষে বা অন্য কোনও উপায়ে যাহাতে তাহাদের মধ্যে আধি ব্যাধির প্রসার বৃদ্ধি না হয়—এইরূপ ভাবে শিক্ষাদানের চেষ্টা করিতে হইবে। নির্ম্মল বায়ুর উপভোগ সম্ভব হয়—এমন স্থানে বিদ্যালয় স্থাপিত হওয়া উচিত। Cleanliness যে godliness—ইহা ছাত্রের মনে প্রবেশ করাইয়া দিতে হইবে। কেননা অপরিচ্ছন্নতা অনেক সময়েই ব্যাধির মূলীভূত কারণ। ছাত্রের খাদ্যাখাদ্য বিষয়েও বিশেষ মনোযোগী হইতে হইবে—খাদ্যের অনুরূপ যে মনোবৃত্তির স্ফুরণ হয় খুব সত্য কথা।

এইরূপ শিক্ষার বন্দোবস্ত হইলে ছাত্র সুস্থ শরীরে নিয়মিত সময়ের অল্পপরিশ্রমে এখনকার প্রাণহানিকর শিক্ষার ব্যবস্থায় যতটা সময়ে যতটা শিক্ষা করে, তাহা হইতে অনেক কম সময়ের মধ্যে অনেকটা বেশী শিক্ষা করিতে পারিবে। তদুপরি যদি ছাত্রের মনে ধর্ম্মভাবের পূর্ণ বিকাশ করিয়া দিতে পারা যায়, তাহা হইলে ছাত্রের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবন উত্তরোত্তর সজীবতার আনন্দে হাসিয়া উঠিবে—সে স্বেচ্ছায় জগতের মঙ্গল বিধান—আপনার মঙ্গল সাধন বলিয়া ধরিয়া লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইবে।

মনে রাখিতে হইবে—ধর্ম্মশিক্ষা যে জাতির নাই, সে জাতি কখন আদর্শ শিক্ষা প্রাপ্ত হইতে পারে না। নৈতিক অধঃপতন তাহার শিক্ষা-গর্ব্বের মূলচ্ছেদন করিয়া দেয়। বাস্তবিকই যে জাতির নৈতিক মেরুদণ্ড নাই, সে জাতি কখন জীবন-সংগ্রামে জয়ী হইতে পারে না। তাই বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে ধর্ম্মশিক্ষা দিতে হইবে। কিন্তু সে ধর্ম্মশিক্ষা যেন আজকাল কার বিদ্যালয়-বিশেষের মত সাম্প্রদায়িক-ধর্ম্ম শিক্ষা না হয়। যেখানে বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী ছাত্রগণের সম্মিলন হইয়া থাকে, সেখানে সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মে চলিবে কেন? সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম সেখানে গোঁড়ামি করিয়া ছাত্রের প্রাণে শুদ্ধ বিদ্রোহের সৃষ্টি করে। সে নিজ ধর্ম্মমতের সঙ্গে এ ধর্ম্মের সমতা করিতে না পারিয়া অবিশ্বাসী হইয়া পড়ে। বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য থাকিবে—ছাত্রের নিজ ধর্ম্ম মতের পরিবর্ত্তন নহে। যা'র যা'র ধর্ম্ম, তা'র তা'র থাকিবে, কারণ কোনও ধর্ম্মই মানিয়া চলিলে মানুষের পক্ষে অহিতকর নহে। কিন্তু বিদ্যালয় শিক্ষা দিবে—সার্ব্বজনীন—ধর্ম্ম—মানুষের আদি ধর্ম্ম, যে ধর্ম্ম না হইলে কোন মানুষেরই চলে না, ধর্ম্মের সেই মূল সত্যগুলি।—যেমন

ঈশ্বর আছেন, তিনি অধর্ম্মের শত্রু, কারণ তিনি ধর্ম্মময়, যাহা সত্য তাহার উৎসাহ দানই ধর্ম্ম ইত্যাদি। ছাত্রের মনে এই সনাতন ধর্ম্মের সৃষ্টি করিতে পারিলে, সে একটা প্রকৃত মানুষ হইয়া উঠিবে,—কাজেই মানুষ মাত্রকে সে তাহার নিজ জাতিভুক্ত করিয়া লইতে পারিবে, মানুষমাত্রের মঙ্গলই তাহার মঙ্গল বলিয়া তাহার পূর্ণ প্রতীতি জন্মিবে, তাহার মনের সর্ব্ব কুসংস্কারের নিরাকরণ হইয়া যাওয়ায় তাহার মনের পূর্ণ স্বাস্থ্য ফুটিয়া উঠিবে।

ভারত তপস্বীর দেশ। এ তপোবনে ধর্ম্ম সহযোগে শিক্ষার যে বিমল জ্যোতিঃ-প্রকাশ হইয়াছিল, তাহার প্রভাবে এ জাতির মহিমোজ্জ্বল হইয়াছিল ও সে জ্যোতিঃর মহা-প্লাবন উছলিয়া পড়িয়া সুদূর পাশ্চাত্য শিক্ষাকেও ভাস্বর করিয়া দিয়াছিল। যে জাতি শরীরকে আগে রাখিয়া শিক্ষা ও সাধনা করিয়াছিল, যে জাতিই প্রচার করিয়াছিল—"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্ম সাধনং"—সে জাতির বংশধর আজ শরীরকে অবমাননা করিয়া যদি কেবলই শিক্ষায় দীক্ষিত হইতে চাহে, তবে কি বুঝিতে হইবে না যে,এ জাতি তাহার অতীত মহিমাকে অবজ্ঞা করিতেছে, তাহার জাতীয়তাকে ভুলিয়াছে, তাহার নিজস্ব সম্পত্তিকে তুচ্ছ করিয়া পরের অজানিত অনিশ্চিত 'অস্বর্গ্য' ধনের লোভে দিগন্তের পানে ভাসিয়া চলিয়াছে! এটা কি বোঝা বড় শক্ত কথা যে, যে দেশে যে প্রণালীতে ব্যাস-বাল্মিকী, কালিদাস-ভবভূতি, কপিল-পাতঞ্জল, চরক-সুশ্রুত শিক্ষিত হইয়া-ছিলেন, সেই দেশের পক্ষে সেই শিক্ষা-প্রণালীই সর্ব্বাপেক্ষা যুক্তিযুক্ত, ফলপ্রদ ও মহিমময়? সে দেশের কি অনুকরণের শিক্ষায় স্বাস্থ্যহানি অশেষ লজ্জাকর নহে? হইতে পারে—সে সময় আজ নাই, সে পাত্র নাই, বিভিন্ন জাতির সংস্পর্শে অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গিয়াছে। কিন্তু সে দেশত তেমনি আছে, সে দেশের অতীত মহিমার জাজ্জ্বল্যপ্রমাণ অতুলনীয় গ্রন্থ-রাজি ত এখনও বর্ত্তমান! তবে কেন সে জাতি নিজস্বকে ভুলিয়া গেল? নর্ম্মান সভ্যতা-লালিত ইংরাজের মত পরস্বকে সমীকৃত করিয়া আপন গৌরবে আপন আদর্শে দেহ-মনের সামঞ্জস্যে সে কেন আপন শিক্ষা-সৌধ গড়িয়া তুলিল না? কবি বুঝি তাই কাঁদিয়াছিলেন—

"হে বঙ্গ! ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন,
তা' সবে অবোধ আমি অবহেলা করি,
পরধন লোভে মত্ত।"

শ্রীসতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ।

চিকিৎসকের কর্ত্তব্য।

-০*০-

[ময়মনসিংহ বৈদ্যসম্মেলনীর দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনে কবিরাজ শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ মৈত্র কর্ত্তৃক পঠিত প্রবন্ধের সারাংশ।]

ভারতবর্ষে হিন্দুরাজগণের অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে সঙ্গে রাজানুগ্রহের অভাব এবং বৈদেশিক চিকিৎসার অভ্যুদয় বশতঃ আয়ুর্ব্বেদের বিশেষ অবনতি ঘটিয়াছিল। মুসলমানদিগের রাজত্ব-কালে ভারতব্যাপী যে বিপ্লববহ্নি প্রজ্জলিত হইয়াছিল, তাহাতে অনেক গ্রন্থ ভস্মীভূত হইয়া

গিয়াছে। বিশেষতঃ মুসলমান রাজগণ হেকিমি চিকিৎসারই প্রাধান্য স্থাপনের প্রয়াসী ছিলেন। তৎপরে ইংরেজ রাজত্বের সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য চিকিৎসা প্রসার লাভ করিয়া জগদ্ব্যাপী হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু হেকিমি চিকিৎসা ও বর্ত্তমান উন্নতশীল পাশ্চাত্য চিকিৎসাও যে আয়ুর্ব্বেদ সমুদ্র মথিত—তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে চরক এবং সুশ্রুত সংহিতা প্রথমতঃ আরব্য ভাষায় ও পরে তাহা হইতে ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হইয়াছে—ইহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। উক্ত ল্যাটিন ভাষার অনুবাদই চিকিৎসা শাস্ত্রের মূলভিত্তি। ইউরোপীয় ভৈষজ্যশাস্ত্র সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত প্রাচ্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানের নিকট ঋণী। আজিও ইউরোপের চিকিৎসা-বিজ্ঞানবিদ্‌গণ ভারতীয় প্রাচীন গ্রন্থগুলি আবিষ্কারের জন্য সমুৎসুক। সুখের বিষয় ভারতবাসীও এজন্য উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছেন।

কিন্তু কেবল গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইলেই আয়ুর্ব্বেদের উন্নতি হইবে না। আধুনিক অনেকেই নিদান মুখস্থ করিয়াই আয়ুর্ব্বেদের পাঠ সমাপন করেন ও ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন। কাজেই প্রত্যক্ষভাবে রোগ-পরিচয় না হওয়ার ব্যবস্থার ব্যতিক্রমে অনেক স্থলে ফল বিপরীত হইয়া দাড়ায়, চরক সংহিতায় লিখিত আছে;—

শ্রুতেপর্য্যবদাতৃত্বং বহুশো দৃষ্ট কর্ম্মতা।
দাক্ষং শৌচমিতিজ্ঞেয়ং বৈদ্যেগুণ চতুষ্টয়ম্॥
সূত্র স্থান, নবম অধ্যায়।

শুধু পড়িয়া বিদ্বান হইলে চলিবেনা, হাসপাতাল স্থাপন করিয়া আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার্থিদিগকে প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে—এজন্য শরীর তত্ত্ববিৎ উপযুক্ত কৃতবিদ্য অধ্যাপকের প্রয়োজন। কাজেই প্রথমতঃ উপযুক্ত আয়ুর্ব্বেদজ্ঞকেই পাশ্চাত্যমতে অস্ত্রচিকিৎসাদি শিক্ষা করিয়া অধ্যাপনায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে। এই মহদুদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্তই কলিকাতা মহানগরীতে "অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়" নামে একটি কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপিত হইয়াছে। শুনেতেছি টাঙ্গাইল অঞ্চলেও এইরূপ একটী কলেজ স্থাপনের প্রস্তাব চলিতেছে।† দেশে আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসকের যেরূপ অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে, তাহাতে দুই একটি কলেজে অভাব পূর্ণ হওয়া অসম্ভব। কাজেই যাহাতে প্রত্যেক জেলায় অন্ততঃ পক্ষে একটি করিয়া কলেজ ও হাসপাতাল প্রতিষ্টিত হইতে পারে, তজ্জন্য সকলেরই যথাসাধ্য চেষ্টা ও যত্ন করা কর্ত্তব্য।

ঔষধ প্রস্তুত বিষয়েও আমরা সম্পূর্ণ উদাসীন। অনেক সময় ছাত্র ও ভৃত্যের উপর ভার দিয়াই নিশ্চিন্ত থাকি। ঔষধ প্রস্তুত করিতে যে শুদ্ধাচার সম্পন্ন হওয়া প্রয়োজন, পাশ্চাত্য সংসর্গে পড়িয়া আমরা এ কথা এক রূপ ভুলিয়া গিয়াছি। অশুচি শরীরে ঔষধ প্রস্তুত করিলে ঔষধের গুণেরও তারতম্য হইয়া থাকে। প্রমাণ স্বরূপ আমি এ স্থলে 'কাসন্দের' কথা উল্লেখ করিতে পারি। 'কাসন্দ'—সরিষা বাটা ও কতিপয় মসলার একটি সংমিশ্রণ। আমাদের ময়মনসিংহ অঞ্চলে ইহা যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়। ইহা প্রস্তুতকালে শরীর কোন রূপ অশুচি থাকিলে,—এমনকি অশুচি ব্যক্তির ছায়া পর্য্যন্ত লাগিলেও নষ্ট হইয়া যায় এবং স্বাদ

† প্রস্তাব চলিতেছে,—না আমরা শুনিয়াছি, টাঙ্গাইলেও অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে।
—আঃসং

গন্ধ সমস্তই বিকৃত হইয়া পড়ে। তখন ইহা পচিতে আরম্ভ হয়। কিন্তু শুদ্ধাচারে প্রস্তুত 'কাসন্দ' দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত অবিকৃত অবস্থায় থাকে। আমাদের আয়ুর্ব্বেদোক্ত আসব-অরিষ্ট সমূহও কাসন্দের মত শুদ্ধাচারের সামান্য ব্যতিক্রমেই নষ্ট হইয়া যায়—তাহা আমি অনেকস্থলে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। কাজেই প্রত্যেক চিকিৎসকের শুদ্ধাচার পরায়ণ হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

ঔষধের উপাদান সমূহ যাহাতে পচা ও কীটদংষ্ট না হয় সে বিষয়ে তীব্রদৃষ্টি রাখিতে হইবে। কেবল ব্যবসায়ী বেণে ও বেদে' জাতির উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে চলিবেনা।

দেবতালয়-বল্মীক-কূপ-রথ্যা-শ্মশানজাঃ।
অকাল তরুমূলোত্থ্যা ন্যূনাধিক চিরন্তনাঃ।
জলাগ্নি ক্রিমি সংকুন্না ওষধ্যস্ত ন সিদ্ধিদাঃ॥

এই বাক্য প্রতিপালন করিতে হইলে চিকিৎসককে স্বহস্তে দেখিয়া-শুনিয়া বনজ ওষধি সমূহ সংগ্রহ করিতে হয়। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত ও আমরা ইহাতে সম্পূর্ণ উদাসীন। এরূপ অবস্থায় আয়ুর্ব্বেদের উন্নতি কিরূপে সম্ভবে? ওষধি উদ্ধৃত করিবার কালাকালও আমরা বিচার করিনা।

মূলানি শিশিরে গ্রীষ্মে পত্রং বর্ষা বসন্তয়োঃ।
ত্বক্কন্দো শরদি ক্ষীরং যথর্ত্তুং কুসুমং ফলম্।
হেমন্তে সারমোষধ্যা গৃহ্নীয়াৎ কুশলো ভিষক্॥

আমরা এই বাক্যের কি সার্থকতা রক্ষা করি? পূর্ব্বকালে চিকিৎসকগণ মন্ত্রপূতঃ করিয়া শ্রদ্ধার সহিত ওষধি উত্তোলন করিতেন। আর বর্ত্তমানে আমরা পায়খানা হইতে ফিরিবার সময়ও ওষধি উদ্ধৃত করি। আয়ুর্ব্বেদের কি শোচনীয় অধঃপতন এরূপ অনাচার সত্ত্বেও যে ঔষধের ক্রিয়া হয়, ইহাই ত আশ্চর্য্যের বিষয়!

কতকগুলি বনৌষধির অপ্রাপ্তি এবং অপরিচয়ও আয়ুর্ব্বেদের অবনতির অন্যতম কারণ। মেদ, মহামেদ, জীবক, ঋষভক প্রভৃতির অভাব সত্ত্বেও চ্যবনপ্রাশ প্রভৃতি ঔষধের আশ্চর্য্য ফল পরিলক্ষিত হইতেছে। মেদ, মহামেদ প্রভৃতি আবিষ্কৃত হইয়া ঔষধগুলি যথাযথভাবে প্রস্তুত হইলে বৃদ্ধব্যক্তিও যে চ্যবন মুনির ন্যায় পুনর্যৌবনত্ব প্রাপ্ত হইবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি? বন জঙ্গলে যে সমস্ত অপরিচিত গাছগাছড়া দেখা যায়, অনুসন্ধান করিয়া ঐ সমস্ত অপরিচিত গাছগাছড়ার আকৃতি, গুণ ক্রিয়া, স্বাদাদি পর্য্যালোচনা করিয়া চিনিয়া লইতে পারিলে আয়ুর্ব্বেদের মহোপকার সাধিত হয়। আবার কতকগুলি বনৌষধি আছে—তাহা এক নামে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন রূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন কোকিলাক্ষ, বৃহতী, বিদ্ধড়ক ইত্যাদি। কোকিলাক্ষের সন্দেহ মীমাংসার জন্য কলিকাতার জনৈক বিখ্যাত কবিরাজ মহাশয়ের নিকট হইতে কিছু কোকিলাক্ষ-বীজ আনাইয়াছিলাম। তিনি কোকিলাক্ষ নাম দিয়া এলবালুকা * পাঠাইয়া ছিলেন। কোকিলাক্ষ কখন ও এলবালুকা হইতে পারে না। ইহাকে হিন্দুস্থানে তালমখনা, উৎকলে 'মাখুরেণ' নামে অভিহিত করা হয়। তবে কি কোকিলাক্ষ আমাদের দেশে তালমাখনারই নামান্তর নহে? পদ্মকাষ্ঠস্থলে কেহ

* এ কবিরাজ মহাশয়টি কে—তাহা প্রবন্ধ লেখকের বলা। যে কবিরাজ 'কোকিলাক্ষ' চাহিলে 'এলবালুকা' দিয়া থাকেন, তিনি কবিরাজ নামেরই অনুপযুক্ত আমরা জানিতে চাহি—তিনি কি জাতিতে বৈদ্য? না বৈদ্যের ব্যবসায়ী? আঃ সং।

স্থলপদ্ম কেহ বা বেনে দোকানের একপ্রকার কাষ্ঠ (যে কাষ্ঠ দ্বারা কেরোসিনের বাকস প্রস্তুত হয় দেখিতে অনেকটা সেইরূপ) ব্যবহার করেন। আমি অনেক প্রাচীন কবিরাজকে আমাদের দেশীয় পাউড়া কাঠ (রঙ্গি কাঠ) ব্যবহার করিতে দেখিয়াছি। পাউয়া—বকম ও নিম জাতীয় বৃক্ষ বিশেষ। ইহার সার পদ্ম গন্ধ বিশিষ্ট ও দেখিতে ঠিক পদ্মবর্ণ। কাজেই আমারও ইহাই পদ্মকাষ্ঠ বলিয়া বিশ্বাস। তবে পার্ব্বত্য প্রদেশজাত রঙ্গিকাঠ ব্যবহার করা উচিত। বিড়ঙ্গ আমাদের দেশে-ঘিন্নি গোটা নামক একপ্রকার লতার বীজ ব্যবহৃত হয়। ইহার পাতা গুলঞ্চ পাতা সদৃশ, তলদেশ মসৃন ও শ্বেতবর্ণ। ফুলগুলি ঠিক কলমী লতার ফুলের ন্যায়। গাছ পান,—সাঁচি, কাল, সাদা ভেদে পান যদিও চারিপ্রকার, কিন্তু সাঁচি পান ব্যবহারই অমি যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে করি। হবুষের পরিবর্ত্তে ধনের ব্যবহার দৃষ্ট হয় এবং উহা পাওয়া যায় না বলিয়া অনেকে ধারণা। আমি আইশ্রে নামক একপ্রকার লতাপ্রাপ্ত হইয়াছি। উহার ডাঁটা, পাতা পিঁপুল গাছের মত। ফল অশ্বত্থ ফল সদৃশ। পাতা ও ফলে মৎস্যের ন্যায় গন্ধ পাওয়া যায়। মাছের আঁইশের ন্যায় গন্ধ বলিয়াই বোধ হয় ইহার নাম আইশ্রে হইয়াছে। হবুষের আকৃতির সহিত সৌসাদৃশ্য বর্ত্তমান বলিয়া আইশ্রেকেই হবুষ বলিয়া ধারণা হয়। বৃহতীদ্বয়ের স্থলে কোথাও ছোট ব্যাকুড় ও বড় ব্যাকুড়, কোথাও বা ছোট ব্যাকুড় ও কণ্টকারী ব্যবহৃত হয়। আয়ুর্ব্বেদের উন্নতি করিতে হইলে ইহার মীমাংসা এবং অপ্রাপ্য ও দুষ্প্রাপ্য বনৌষধি গুলি আবিষ্কারের জন্য একটি অনুসন্ধান সমিতি গঠিত হওয়া বিশেষ প্রয়োজন।

প্রতিবৎসর আয়ুর্ব্বেদ সভার সঙ্গে প্রদর্শনী খুলিলে অনেক উপকার হয়। অনুসন্ধান সমিতিতে যে সমস্ত বনৌষধির আবিষ্কার হইবে, তাহা প্রতিবৎসর উক্ত প্রদর্শনীতে প্রদত্ত হইলে অপরিচিত বনৌষধির পরিচয় ও অকৃত্রিম ঔষধ প্রস্তুত—যুগপৎ সম্পাদিত হইবে।

লৌহ, অভ্র প্রভৃতি ধাতুসমূহের যত অধিক পুট দেওয়া হয়, ততই তাহার কার্য্যকারিতাশক্তির বৃদ্ধি হইতে থাকে। ধাতু সমূহ অত্যধিক জারিত হইয়া সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতম অণুপরমাণুতে বিভক্ত হইয়া অসংখ্য পরমাণুর সমষ্টি মানব দেহে ক্রিয়া প্রকাশ করে। শরীরাবয়ব অসংখ্য পরমাণুর সমষ্টি মাত্র।

শারীরাবয়বাস্তু পরমাণু ভেদেনাপরিসংখ্যেয়া ভবন্তি,
অতি বহুত্বাদতি সৌক্ষ্ম্যাদতীন্দ্রিয়ত্বাচ্চ।

চরকসংহিতা, শারীর স্থান, সপ্তম অধ্যায়।

এই যে পরমাণু—এই পরমাণুর সহিতই বর্ত্তমান হোমিপপ্যাথিক তত্ত্ব নিহিত আছে। শরীরস্থ এই সূক্ষ্মতত্ত্ব অবগত হওয়াতেই হোমিওপ্যাথিক ঔষধগুলি ডাইলিউসন্ দ্বারা ক্রমে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতম পরমাণুতে বিভক্ত হইয়াছে। অণুর সহিত অণু পরমাণুর সহিত পরমাণু মিশ্রিত হয়। পরমাণুর সহিত অণু মিশ্রিত হইতে পারে না। সমধর্ম্মীর সহিত সমধর্ম্মীর মিলন স্বাভাবিক। এই জন্যই জলের সহিত জল, তৈলের সহিত তৈল মিশ্রিত হয়। তৈলের সহিত জল মিশ্রিত হইতে পারে না। মানবদেহের সমধর্ম্মী করণার্থই মহর্ষিগণ লৌহ অভ্র প্রভৃতি ধাতু সমূহ সহস্রাধিকবার জারণ-মারণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। কাজেই জারণ-মারণে বিশেষ সূক্ষ্মদৃষ্টি রাখিতে হইবে। এরূপ অনেক কবিরাজ আছেন—যাঁহারা বরিশালের জারিত

দ্রব্য বিক্রেতাদের নিকট হইতে টাকায় ১৫।১৬ তোলা লৌহ, অভ্র, বঙ্গ প্রভৃতি ধাতু সমূহ খরিদ করিয়া ব্যবসায় করিতেছেন। আবার অনেক নব্য কবিরাজ গেরিমাটি ও হীরাকস ভস্ম হইতে কৃত্রিম উপায়ে লৌহ ভস্ম প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিতেছেন। কিন্তু একথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে—চিকিৎসা বিষয়টা অর্থকরী বিদ্যা বা সাধারণ ব্যবসায়ের জিনিষ নহে।

চর্চ্চা না থাকায় আয়ুর্ব্বেদের সুন্দর সুন্দর বিষয়গুলি আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। কাহারও স্বাস্থ্য পরিবর্ত্তনের আবশ্যক হইলে ডাক্তারের সাহায্যে স্থান নির্ব্বাচন করিয়া লইতে হয়। অথচ চরকের সূত্রস্থানে স্থান-নির্ব্বাচনের অতি সুন্দর পন্থা প্রদর্শিত হইয়াছে। বস্তিকর্ম্মও চর্চ্চাভাবে আজ লুপ্ত প্রায়। ইহাতে বুঝা যায়, আমাদের যাহা আছে, তাহার চর্চ্চাই রীতিমত হইতেছে না। অথচ বর্ত্তমানে আমাদের কিছু নাই বলিয়াই চীৎকার করিতেছি।

উপসংহারে আমার শেষ বক্তব্য এই যে, আয়ুর্ব্বেদের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি করিতে হইলে, হিংসা, দ্বেষ পরিত্যাগ করিয়া নিঃস্বার্থ ভাবে এক মহামন্ত্রে অনুপ্রাণিত হইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে। আমাদের সব ছিল বা আছে—একথা বলিলে কেহ শুনিবে না। যতদিন আমরা কার্য্যক্ষম না হইব বা কার্য্যের দ্বারা জনসাধারণকে মুগ্ধ করিতে না পারিব—ততদিন আয়ুর্ব্বেদ যে তিমিরে সে তিমিরে'ই থাকিবে—ইহা সুনিশ্চিত। নিঃস্বার্থভাবে ও সমবেত চেষ্টায় আয়ুর্ব্বেদের উন্নতিকল্পে আত্ম-নিয়োগ করিলে আবার ইহার পুনরুত্থানের আশা করা যায়।

শ্রীযোগেন্দ্র কিশোর লোহ।

মানব-জন্ম-রহস্য।

—:*:—

পূর্ব্ব প্রকাশিত—"গর্ভিণীর সাধ ভক্ষণ" প্রবন্ধে বলিয়াছি,—চতুর্থ মাস গর্ভকালেই দৌহৃদ প্রাপ্তিবশতঃ গর্ভিণীর সাধ ভক্ষণ কাল আরম্ভ হয়, এবং তৎকাল হইতেই নিম্নলিখিত রূপে ভ্রূণ বর্দ্ধনের সঙ্গে সঙ্গে নানাপ্রকার অভিলাষ জন্মিতে আরম্ভ হয়, সে জন্য সন্তান ভূমিষ্ট না হওয়া পর্য্যন্ত গর্ভিণীর অভিলাষ পূর্ণ করা গৃহস্থ মাত্রেরই একান্ত কর্ত্তব্য, নতুবা ভাবী অনিষ্ট হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। আমাদের এতদ্দেশে এতদ্বিষয়ক সমালোচনা মোটেই না থাকায় চতুর্থ মাসের স্থলে অধিকাংশই সপ্তম মাসে মাত্র একটি দিন শুভক্ষণ দেখিয়া নির্ব্বাচন পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন বা পরমান্ন গর্ভিণীকে ভক্ষণ করিতে দিয়াই সাধ ভক্ষণ কার্য্য শেষ হয়। এক্ষণে পঞ্চম মাস গর্ভ কাল হইতে সন্তানের জন্মকাল পর্য্যন্ত রহস্য বিষয়ক আর্য্য শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তগুলি বিবৃত করিতে চেষ্টা করিব। আয়ুর্ব্বেদ বলেন,—

"পঞ্চম মাসে গর্ভস্থ ভ্রূণের মন জন্মে। ষষ্ঠ মাসে বুদ্ধি জন্মে। অষ্টম মাসে গর্ভস্থ

সন্তানের দেহে ওজঃ ধাতু জন্মে, এবং গর্ভিণী ও গর্ভস্থ সন্তান মুহুর্মুহু পরস্পর পরস্পরের ওজঃ গ্রহণ করে—অর্থাৎ কখন বা গর্ভিণীর ওজঃ ধাতু সন্তান গ্রহণ করে, আবার কখন বা সন্তানের ওজঃ গর্ভিণীর দেহে সঞ্চরণ করে, এ নিমিত্ত গর্ভিণী ও সন্তান ওজের অভাব ও পূরণ হেতু যথাক্রমে ম্লান ও প্রফুল্ল হয়; অর্থাৎ যখন গর্ভিণীর ওজধাতু গর্ভস্থ শিশু গ্রহণ করে, তৎকালে গর্ভিণী ম্লান ও শিশু প্রফুল্ল হয় আবার যে সময় শিশুর ওজঃধাতু গর্ভিণীর দেহে সঞ্চরণ করে, তখন গর্ভস্থ শিশু ম্লান এবং গর্ভিণী প্রফুল্ল হইয়া থাকে। সুতরাং অষ্টম মাসে ওজের স্থিরতা না থাকা জন্য তৎকালে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে প্রায়ই জীবিত থাকে না।*

অষ্টম মাসে নৈঋত কোণের অধিষ্ঠাতার উদ্দেশ্যে বলি (মাংস অন্ন) প্রদান করা কর্ত্তব্য।† যেহেতু উক্ত নৈঋত কোণের অধিষ্ঠাতাও গর্ভস্থ শিশুর অংশভাগী। এমন কি স্বয়ং মহাদেবও উক্ত রাক্ষসকে সন্তান রক্ষার নিমিত্ত বলি প্রদান করিয়াছেন।

কুমার তন্ত্রে উক্ত আছে যে, গর্ভিণীর অষ্টম মাসে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের অধিপতিকে মাংস ও অন্ন দ্বারা বলি প্রদান করিবে।

যথা—"নবম, দশম একাদশ অথবা দ্বাদশ মাসে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়া থাকে। ইহার অতিরিক্ত বিলম্ব হইলে বিকার প্রাপ্ত বলিয়া বুঝিতে হইবে।" (যদিও এদেশে দশ মাস ও দশ দিনের প্রসবকেই স্বাভাবিক প্রসব বলা হইয়া থাকে, তথাপি উহার ব্যতিক্রমে যথা নবম বা একাদশ ও দ্বাদশ মাসে প্রসবকেও যে অস্বাভাবিক বলা যায় না এতদ্বারা সেই জ্ঞান লাভ করিবার সুযোগ হইতেছে।)

এক্ষণে গর্ভের মধ্যে ভ্রূণের কোন্ অঙ্গ সর্ব্বাগ্রে জন্মে, তাহাই কথিত হইতেছে।

শৌনক বলেন যে, গর্ভের অগ্রে শিরোদেশই জন্মে। কারণ মস্তকই দেহ ও ইন্দ্রিয়ের মূল। কৃতবীর্য্য মুনি কহেন যে, অগ্রে হৃদয় জন্মে, কারণ হৃদয়ই বুদ্ধি ও মনের স্থান। ব্যাসদেব কহেন যে, নাভি অগ্রে জন্মে, কারণ প্রাণ তৎস্থানে অবস্থান পূর্ব্বক তেজঃ সহকারে দেহীর সমস্ত দেহ বর্দ্ধন করে। মার্কণ্ডেয়ের মতে অগ্রে হস্তপদ উৎপন্ন হয় বলিয়া কথিত আছে, কারণ হস্ত পদই দেহীর সকল ক্রিয়ার মূল। মুনি শ্রেষ্ঠ গৌতম বলেন যে, কোষ্ঠ অর্থাৎ দেহের মধ্যভাগ অগ্রে জন্মে, কারণ তাহাতেই সমস্ত অবয়ব উৎপন্ন হয়, কিন্তু উক্ত মত সকল সঙ্গত নহে। কেননা ধন্বন্তরি বলেন যে,—সমগ্র অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এককালেই জন্মে, চ্যুত ফলের ন্যায় অতি সূক্ষ্মতা প্রযুক্ত তাহার উপলব্ধি হয় না। যেমন আম্র ফল পাকিয়া উঠিলে তাহার কেশর, মাংস, অস্থি ও মজ্জা প্রভৃতি পৃথক রূপে দৃষ্ট হয়। সেই ফলের

* কারণ ওজঃ ধাতুই মানবের জীবন স্বরূপ। যেহেতু দোহস্থ বস্তুর রস লইতে শুক্র পর্যন্ত সপ্ত ধাতুর মধ্যে শুক্রের পূর্ব্ববর্ত্তী ছয়টী ধাতুতেই মল থাকে, কিন্তু শুক্রে মল থাকে না, সেই শুক্র আবার পরিপাক হইয়া দুইভাগে বিভক্ত হয়। উহার স্থূলভাগ শুক্র এবং স্নেহময় সূক্ষ্ম ভাগ, ওজঃরূপে পরিণত হয়। এস্থলে অষ্টম মাসের সন্তান যাহারা মাতৃ ওজঃ গ্রহণ কালে অত্যন্ত প্রফুল্লাবস্থায় জন্মে, সেই সকল আটাশে ছেলেকে জীবিত থাকিতে দেখা যায়। আর যাহারা মাতাকে ওজঃ অর্পণ কালে ভূমিষ্ঠ হয় তাহারাই অত্যল্প কালে মরিয়া যায়। এরূপ অনুমান বোধ হয় ভ্রমাত্মক বলিয়া সিদ্ধান্ত না হইতেও পারে।
—লেখক।

† এরূপ প্রথা আদৌ প্রচলিত দেখা যায় না।

তরুণাবস্থায় ঐ সকল কেশর প্রভৃতি অতি সূক্ষ্মভাবে থাকে বলিয়া দেখা যায় না, ক্রমশঃ কাল সহকারে তাহারা প্রকাশ পায়; সেইরূপ গর্ভেরও তরুণ অবস্থায় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল থাকা সত্বেও অতীব সূক্ষ্মত্ব প্রযুক্ত তাহার উপলব্ধি হয় না। ক্রমশঃ কাল সহকারে সেই সকল প্রকাশিত হয়।

উক্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকলের মধ্যে পিতৃজ, মাতৃজ, রসজ, আত্মজ, সত্বজ ও সাত্মজ এই সকল ভাগের বিবরণ—ক্রমান্বয়ে বিবৃত করা যাইতেছে। যথা,—

পিতৃজাঙ্গ,—কেশ, শ্মশ্রু, লোম, অস্থি, নখ, দন্ত, শিরা, স্নায়ু, ধমনী ও রেতঃ এই গুলি পিতা হইতে জন্মে।

মাতৃজাঙ্গ,—মাংস, শোণিত, মেদ, মজ্জা, হৃদয়, নাভি, যকৃৎ, প্লীহা, অন্ত্র ও গুহ্য এই গুলি নিতান্ত কোমল পদার্থ এবং ইহারা মাতা হইতে জাত।

রসজাঙ্গ। শারীরিক বৃদ্ধি, বল, বর্ণ ও স্থিতি এ সমুদয়ই রস হইতে উৎপন্ন।

আত্মজাঙ্গ।—ইন্দ্রিয় সমূহ, জ্ঞান বিজ্ঞান, পরমায়ু, সুখ ও দুঃখ প্রভৃক্তি আত্মজাত বিষয়। আত্মজ অর্থাৎ আত্মজাত বিষয় মধ্যেই সত্বজ ও সাত্মজ বিষয় সকল অন্তর্ভূত থাকে। কারণ দেহীর আত্ম ইচ্ছানুরূপেই আহার-বিহার ও ব্যবহারাদি সংঘটিত হওয়াতে ইন্দ্রিয় সমূহ পরিচালিত হইয়া স্বীয় কর্ম্মানুসারে—জ্ঞান, বিজ্ঞান, পরমায়ু এবং সুখ ও দুঃখাদি পরিণাম উপস্থিত হইয়া লইয়া থাকে। যদিও উক্ত বিষয় সকল পূর্ব্ব জন্মের অদৃষ্ট ফলের উপর অনেক পরিমাণে নির্ভর করে বটে, কিন্তু সংসর্গ ও আচার ব্যবহার প্রভৃতি আত্মজ কর্ম্ম দ্বারা সে অদৃষ্টকে বহু পরিমাণে আয়ত্ত করা যাইতে পারে। ফল যে কর্ম্মের আয়ত্ত এবং কর্ম্ম যে আত্মজ ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত।

গর্ভের বিশিষ্ট উপকারী পদার্থ বর্ণিত হইতেছে। অগ্নি, সোম, পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, সত্ব, রজঃ, তম, পঞ্চেন্দ্রিয় এবং কর্ম্ম পুরুষ—ইহারা গর্ভকে জীবিত রাখে।

অগ্নি শব্দে এখানে পাচক, আলোচক, রঞ্জক, ভ্রাজক ও সাধক এই পাঁচ প্রকার, আর পঞ্চভূতগত পঞ্চ প্রকার এবং ধাতু গত উষ্মাকে বুঝিতে হইবে। উক্ত অগ্নি শক্তিরূপ বান বলিয়া বাক্যের অধিদেবত্ব প্রাপ্ত হয় ও পরিপাকাদি ক্রিয়া দ্বারা গর্ভস্থ শিশুকে জীবিত রাখে। তারপর সোম (জল) পঞ্চাত্মক—শ্লেষ্মা, রস ও শুক্র প্রভৃতি সোমাত্মক যে সকল পদার্থ—শরীরে নিহিত আছে, তাহাদিগের এবং রসনেন্দ্রিয়ের শক্তি স্বরূপ হইয়া দেহে অবস্থিতি করতঃ মনের অধিদেবতা স্বরূপ হইয়া সেই সোমাত্মক পদার্থ শুক্রঃ প্রভৃতি সম্পূরণ এবং পঞ্চ প্রকার আগ্নেয় পদার্থ ও বায়ু দ্বারা শোধিতাংশকে আর্দ্রতা বিধান করতঃ জীবনের অনুকূলতা সম্পাদন করিয়া থাকে। পৃথিবী, জলদ্বারা ক্লিন্নাবস্থা প্রাপ্ত গর্ভের কাঠিন্য বিধানে শরীরস্থ দোষ, ধাতু, মল এবং তদবয়ব অঙ্গ, উপাঙ্গ প্রভৃতির সঞ্চারণ ও উচ্ছ্বাস, নিঃশ্বাস দ্বারা আকাশ, বায়ু ও অগ্নি কর্ত্তৃক বিদারিত স্রোতঃ সকলকে উর্দ্ধ, অধঃ ও তির্য্যগ গমনে অবকাশ প্রদান পূর্ব্বক শিশুর জীবন রক্ষা করে। সত্ব, রজঃ ও তম এই তিনটি গুণ মনের স্বরূপতায় পরিণত হইয়া—জীবাত্মার শরীরান্তর গ্রহণ ও মোক্ষের কারণ বলিয়া গর্ভস্থ শিশুকে জীবিত রাখে।

পঞ্চেন্দ্রিয় অর্থাৎ—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা জিহ্বা, ত্বক—ইহারা স্ব স্ব কার্য্য অর্থাৎ শব্দ,

স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ গ্রহণ রূপ ক্রিয়া দ্বারা গর্ভের আনুকূল্য করিয়া থাকে।

ভূতাত্মা অর্থাৎ কর্ম্ম-পুরুষ। এই কর্ম্ম-পুরুষ জাগরিক অনন্ত জন্তু সমূহের চৈতন্য স্বরূপ হইয়া প্রাণ ধারণ করিতেছে।

ডাঃ শ্রীনলিনী নাথ মজুমদার।

ক্ষয়রোগ।

ক্ষয়—ক্ষয় বশতঃই ক্ষয় রোগ বঙ্গদেশে এত প্রাবল্য লাভ করিয়াছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে (১) শোক, চিন্তা, ঈর্ষ্যা, উৎকণ্ঠা, ভয়, ক্রোধ প্রভৃতি কারণে (২) কৃশ ব্যক্তি রুক্ষ অন্ন পান সেবন করিলে, (৩) অল্পাহার করিলে হৃদয়স্থ রস ক্ষয় প্রাপ্ত হয় এবং রক্তাদি পরবর্ত্তী ধাতু সকলেরও ক্রমশঃ ক্ষয় হইয়া থাকে। (৪) অতিরিক্ত স্ত্রী সহবাস বশতঃ শুক্রক্ষয় প্রাপ্ত হয় এবং মজ্জাদি পূর্ব্ববর্ত্তী ধাতু সমূহ ক্রমশঃ ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

(১) শোক, চিন্তা, ঈর্ষ্যা, উৎকণ্ঠা, ভয় ও ক্রোধ প্রভৃতি উপসর্গগুলি আজকাল বাঙ্গালার ঘরে ঘরে সম্যকরূপে বিদ্যমান। বর্ত্তমান অকাল মৃত্যুর যুগে পুত্রকন্যার শোক পাইতে হয় নাই—এমন গৃহস্থ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। চিন্তার ত অবধি নাই। অন্ন চিন্তায় সমস্ত বাঙ্গালা জর্জ্জরিত। তাহার উপর মাতৃদায়, পিতৃদায়, কন্যাদায়, সামাজিক দায় প্রভৃতি আছে। শাস্ত্রে চিন্তাদি কারণে হৃদয়স্থ রস শুষ্ক হয় লিখিত হইয়াছে। চলিত কথায় বলে—"ভাবনায় বুকের রক্ত শুকিয়ে যা'চ্ছে।" বাস্তবিকই এখন সমগ্র বাঙ্গালী জাতির এইরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে।

ঈর্ষ্যাও বাঙ্গালায় বেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। প্রতিবাসী দুই বেলা পেট ভরিয়া খাইতে পাইলে অনেকে ঈর্ষ্যা পরতন্ত্র হন। আত্মীয় স্বজনের উন্নতি দেখিলে হিংসায় জ্বলিয়া উঠেন।

উৎকণ্ঠারও অবধি নাই। আজ ছেলে—কাল মেয়ের রোগ, কখন কি হয়। কাল সাহেব চটিয়াছে, বুঝি চাকরী যায়। তার উপর ঋণ আছে, মহাজন আছে, কুটুম্ব-কুটুম্বিতা আছে। ভয় আমাদের সর্ব্বদাই। পথে গাড়ী-ঘোড়া চাপা পড়িবার বা বলবান ব্যক্তির অঙ্গ সংঘর্ষণ ভয়, আপিষে সাহেবের ভয়, গৃহে গৃহিণীর অলঙ্কারের ও মুদির-ধোপার তাগাদার ভয়! আমরা এখন ভয়ে ভয়ে যাই—ভয়ে ভয়ে চাই!

শরীর দুর্ব্বল এবং মন নানা কারণে বিরক্ত, কাজেই অল্পেই বাঙ্গালীর ক্রোধের উদ্রেক হয়। সে ক্রোধ—ভৃত্য-গৃহিণী ও পুত্র কন্যার উপরে বা অনুপস্থিত প্রতিবাসী প্রভৃতির উদ্দেশে প্রকাশিত হয়।

২। শাস্ত্রে কৃশ ব্যক্তির রুক্ষান্ন সেবন ক্ষয় রোগের কারণ বলিয়া কথিত হইয়াছে। বাঙ্গালী মাত্রেই এক্ষণে কৃশ। দুই একজন স্থূল বা অতিস্থূল থাকিতে পারেন, কিন্তু মাষরাশির

ন্যায় (অর্থাৎ এক রাশি মাষ কলায়ের মধ্যে দুই একটী ছোলা থাকার মত) তাহা নগণ্য। এই কৃশ বাঙ্গালী জাতি এক্ষণে রুক্ষান্নই সেবন করিতেছে। স্নেহ প্রধান বিশুদ্ধ ঘৃত এক্ষণে অবিশুদ্ধ। যাহা পাওয়া যায় তাহাও অতীব দুর্ম্মূল্য। গড়ে একজন বাঙ্গালীর প্রত্যহ দুই বেলা দুই ফোঁটা ঘৃত উদরস্থ হয় কিনা সন্দেহ। তৈল সম্বন্ধেও প্রায় তদ্রূপ। যাহাদের শাকান্ন জুটে না, তাহারা ঘৃত-তৈলাদি পাইবে কোথায়? এই স্নেহের অভাবে ক্ষয় রোগ আমাদের প্রতি এত নিঃস্নেহ হইয়া পড়িয়াছে।

৩। দুর্ব্বল ব্যক্তির অনশন বা অল্পাশন ক্ষয় রোগের অন্যতম কারণ। দুর্ব্বল বাঙ্গালী জাতির এক্ষণে অনশন করিতে না হইলেও অল্পাশন প্রায় পনর আনা বাঙ্গালীকে করিতে হয়। যে সকল বস্তু মানবের উপযুক্ত এবং হিতকর খাদ্য, সে সকল বস্তু এক্ষণে দুর্ল্লভ। ঘৃতাদি যে সকল বস্তু আহার করিলে অগ্নি প্রদীপ্ত হয়—সে সকল বস্তু এক্ষণে অপ্রাপ্য বা দুষ্প্রাপ্য। উহাদের অভাবে বাঙ্গালীর অগ্নি-বল এক্ষণে ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে। ক্ষীণাগ্নি বাঙ্গালী এখন আর অধিক আহার করিতে পারে না, যাহা আহার করে তাহাও কুখাদ্য। কাজেই দুর্ব্বল ব্যক্তির অনশন এক্ষণে বঙ্গদেশে বিশেষরূপে ঘটিতেছে। সুতরাং বঙ্গদেশে ক্ষয় রোগের যে প্রাবল্য ঘটিবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি!

৪। দুর্ব্বল শরীরে কাম রিপুর উত্তেজনা অধিক হয়। অপিচ, এখন আর পূর্ব্বের ন্যায় ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে থাকিয়া সংযম শিক্ষা করার নিয়ম নাই। শুধু তাহাই নহে, এখন আর বাঙ্গালী স্ত্রী সহবাস সম্বন্ধে তিথি-নক্ষত্র-পর্ব্বদিন বিচার করে না। সুতরাং দুর্ব্বল, অল্পাহারী, রুক্ষাহারী, অপুষ্টিকরদ্রব্যাহারী বাঙ্গালীর স্ত্রী-প্রিয়তা যে বঙ্গদেশে যক্ষ্মা রোগের কারণ, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

(ক) শুক্রক্ষয় দিগদর্শন মাত্র হইলেও সমস্ত ধাতুক্ষয়ই-ক্ষয় রোগের কারণ এবং এই কারণে অনেক প্রসূতি ক্ষয়রোগগ্রস্তা হইয়া থাকে। আজকাল ১২।১৩।১৪ বৎসর বয়সে স্ত্রীলোকের সন্তান হয়। প্রথম সন্তান হইবার পরে আবার বৎসরে বৎসরে সন্তান হইতে থাকে। ইহার ফলে প্রসূতির শরীর নিতান্ত রক্তশূন্য এবং ক্ষীণ হইয়া পড়ে। এইরূপ রক্ত- এবং ক্ষীণ দেহে ক্ষয় রোগ সহজেই স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিতে পারে।

এতদ্ব্যতীত অজীর্ণ রোগও যে ক্ষয় রোগের প্রাবল্যের অন্যতম কারণ, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। অজীর্ণ এক্ষণে বঙ্গদেশব্যাপী। বঙ্গে অজীর্ণ রোগের প্রাবল্য নামক প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

বঙ্গদেশে ক্ষয় রোগের এইরূপ প্রাবল্য নিবারণের উপায় কি? উত্তরে বলিতে হয় যে, যে সমস্ত কারণে বঙ্গে ক্ষয় রোগের প্রাবল্য ঘটিতেছে—সেই সকল দূর করা। কিন্তু তাহা দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় সম্ভব-পর নয়। সম্ভবপর নয় বলিলেও ঠিক বলা হইল না, সম্ভবপর হইলেও বর্ত্তমানে আমরা যেরূপ স্রোতে গা ঢালিয়া চলিয়াছি, তাহাতে আমরা পারি বলিয়া বোধ হয় না। কিসের স্রোতে আমরা গা ঢালিয়া চলিয়াছি?—বিলাসিতার। কিসের জন্য আমাদের এত অভাব অনটন?—বিলাসিতার। কিসের জন্য আমাদের এত চিন্তা-ভয়-উৎকণ্ঠা?—বিলাসিতার। কিসের জন্য আমরা দুই বেলা পেট

ভুরিয়া খাইতে পাই না?—বিলাসিতার। বিলাসিতা ব্যতীত আমাদের এই দুর্দ্দশার যে অন্য কোন কারণ নাই, আমরা এমন কথা বলিতেছি না, কিন্তু বিলাসিতাই এজন্য অধিক পরিমাণে দায়ী। ব্যক্তিগত ভাবে,—সমাজগত ভাবে—দেশগত ভাবে এই বিলাসিতা বঙ্গে ওতঃপ্রোতঃ ভাবে বিদ্যমান। দুই একটা উদাহরণ দেওয়া বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। ব্যক্তিগত ভাবে বলিতেছি এইজন্য যে, যাহার উদরে দিবারাত্রিতে দুই পয়সার ঘৃত,এক পোয়া দুগ্ধ বা এক ছটাক মাংস পড়ে না, চা, চুরুট, সোডা, সার্ট, কোট, ষ্টকীনে তাহার যথেষ্ট ব্যয় হয়। সমাজগত ভাবে বলিতেছি এইজন্য যে, যে সমাজের লোক দুই বেলা পেট ভরিয়া খাইতে পায় না—সেই সমাজে কন্যার বিবাহ দিতে হইলে কন্যার পিতাকে মূল্যবান বস্ত্র, বডি-জ্যাকেট, বহুমুল্য স্বর্ণালঙ্কার, অসংখ্য কন্যাযাত্রী ও বরযাত্রীর ষোড়শোপচারে আহার্য্য প্রভৃতির ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে হয়। দেশগত হিসাবে বলিতেছি এইজন্য যে, এই দরিদ্র দেশ হইতে কৃত্রিম মণিকার—কাঁচের চুড়ি-পুতুল-বাঁশি প্রভৃতি প্রস্তুত কারক বিদেশী বণিক লক্ষ লক্ষ টাকা লুটিয়া লইয়া যায়। এই বিলাসিতা যদি আমরা পরিত্যাগ করিতে পারি, তাহা হইলে আমাদের অভাব-অনটন, আমাদের চিন্তা-উৎকণ্ঠা—একদিনও স্থায়ী হইতে পারে না। কিন্তু বিলাসিতা-স্রোতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত দুর্ব্বলচিত্ত-বাঙ্গালী তোমরা—তাহা পারিবে কি?

পারিবে না। আর পারিবে না বলিয়াই বলিতেছিলাম যে, সম্ভবপর হইলেও আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় আমরা তাহা করিতে অক্ষম। সেই জন্য অভাব, অনটন, চিন্তা, উৎকণ্ঠা, ভয়-ভীতি হইতে অব্যাহতি পাইবার উপায় এক্ষণে আর নাই। তথাপি যে কারণগুলি পরিত্যাগ করা আমাদের সাধ্যায়ত্ত—অন্ততঃ সেইগুলি পরিত্যাগ করা উচিত। ইহাতেও দেশের অনেক কল্যাণ সাধিত হইবে এবং রোগ-শোক-জর্জ্জরিত-বঙ্গদেশে ক্ষয় প্রভৃতির প্রাবল্য অনেক কম হইবে।

সংযম শিক্ষা—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, অতিরিক্ত শুক্রক্ষয় বশতঃ ক্ষয় রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহা কেবল শাস্ত্রে পাঠ করি নাই, অনেক স্থলে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। এইজন্য বাল্যকাল হইতে দেশের বালকগণকে সংযম শিক্ষা দেওয়া অত্যন্ত আবশ্যক—একথাও আমরা অনেক সময় বলিয়া থাকি। প্রকৃত কথা,—কুসংসর্গে পড়িয়া অপরিণত বয়সে অবৈধ উপায়ে শুক্রক্ষয় করা দেশে একটী বিষম কুপ্রথা হইয়া পড়িয়াছে। ইহার ফলে ভবিষ্যতে অনেক বালক—যৌবনের প্রারম্ভে ক্ষয় রোগগ্রস্ত হইতেছে। এই জঘন্য রীতি বঙ্গদেশের যে কি অনিষ্ট করিতেছে, তাহা অনেকেই অবগত নহেন। যাহাতে এই সর্ব্বনাশী প্রথার একেবারে মূলোচ্ছেদ হয়—যেমন করিয়া হউক, তাহার চেষ্টা করা প্রত্যেক স্বদেশহিতৈষী ব্যক্তির নিতান্ত কর্ত্তব্য।

একেত বাল্যকালে এইরূপ ক্ষয় ঘটে, তাহার পর বাল্যাবস্থার শেষে, যৌবনের প্রারম্ভে বা যৌবনে বিবাহ করিয়া অনেকে রিপুর দাস হইয়া পড়ে। শরীরের প্রতি লক্ষ্য নাই ভবিষ্যৎ অনিষ্টের ভয় নাই,—অপকৃষ্ট পুত্র কন্যা জন্মিবার আশঙ্কা নাই, বিধি নিষেধ না মানিয়া যথেচ্ছভাবে রিপু চরিতার্থ করাই তাঁহারা জীবনের কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন। তখন একবার বুঝিয়াও দেখেন না যে,

ভোগে রোগের ভয় আছে। ফলে সেই ক্ষয়িত দেহে যখন যক্ষ্মারোগ আশ্রয় করে, তখন দারুণ অনুতাপ উপস্থিত হয়। কিন্তু হায়, তখন আর নিষ্কৃতির উপায় থাকে না। যে ব্যক্তি রোগ-মুক্ত হইয়া দীর্ঘকাল বাঁচিতে ইচ্ছুক, তাহার পক্ষে সংযম শিক্ষা করা নিতান্ত আবশ্যক। শুক্রই জীবন—ইহা সর্ব্বদা মনে রাখিবেন—, শুক্রক্ষয় অর্থে জীবন ক্ষয় করা। দেশের লোকে এই বিষয় সম্যক বিবেচনা করিয়া সংযম শিক্ষা করিলে বঙ্গদেশে ক্ষয় রোগের প্রাদুর্ভাব অনেক কম হইবে।

রক্তক্ষয়—স্ত্রীলোকগণ অল্প বয়সে অনেক-গুলি সন্তান প্রসব করার ফলে প্রচুর রক্ত ক্ষয় বশতঃ ক্ষয়রোগ গ্রস্থ হইয়া থাকে—এ কথা বলিয়াছি। এ বিষয়ের প্রতিকার করিতে হইলেও স্ত্রীপুরুষের সংযত হওয়া আবশ্যক। সহধর্ম্মিণীর স্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবন কে না কামনা করে? কিন্তু আমরা জানিয়া শুনিয়া আপনার পায়ে আপনি কুড়ুল মারি, প্রসবের পর প্রসূতির শরীর যতদিন না পূর্ব্ববৎ সুস্থ ও সবল হয়—ততদিন সংযত হওয়া উচিত একথা মনে করি না। অল্প বয়সে অধিক সন্তান হওয়ার বিষময় ফল সম্বন্ধে আমরা অন্যত্র বিশেষ আলোচনা করিয়াছি। যাহা হউক দেশের লোকে এ বিষয়ে মনোযোগী হইলে বঙ্গে ক্ষয়রোগের প্রাদুর্ভাব অনেক কম হইবে এবং যেখানে এখন রোগ-পীড়িতা শীর্ণ-দেহা বিষন্নবদনা গৃহ কার্য্যে অসমর্থা জননী জীর্ণ-শীর্ণ-বালকবালিকা-বেষ্টিতা হইয়া অকাল মৃত্যুর অপেক্ষা করিতেছে দেখিতেছি, সেইস্থান সুস্থদেহা, রোগহীনা, গৃহকার্য্য-নিপুণা-প্রফুল্লবদনা জননী সুস্থ সকল বালকবালিকা বেষ্টিত হইয়া মাতৃত্বের মহিমায় গৃহস্থলী মণ্ডিত করিতেছে দেখিতে পাইব।

কাস রোগ হইতে ক্ষয়রোগ উৎপন্ন হইতে পারে, সুতরাং কাসরোগকে কদাচ উপেক্ষা করা উচিত নহে,। অজীর্ণ রোগ হইতেও কালে ক্ষয়রোগ উৎপন্ন হইতে পারে। সুতরাং অজীর্ণরোগ-গ্রস্ত ব্যক্তির সুনিয়মে এবং সাবধানে থাকা কর্ত্তব্য। অপিচ সুপথ্য ও সুচিকিৎসা দ্বারা রোগ নিরাকরণ করা উচিত। পূর্ব্বে অজীর্ণ-রোগ সম্বন্ধীয় প্রসঙ্গে এ বিষয়ের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক। এক্ষণে ক্ষয় রোগের বীজ যাহাতে এক ব্যক্তির শরীর হইতে সংক্রমিত না হইতে পারে, তজ্জন্য কি উপায় অবলম্বন করা উচিত, সে সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে।

ক্ষয়রোগ সংক্রামক। এই রোগীর সহিত একত্র অবস্থান, রোগীর ব্যবহৃত দ্রব্যাদি ব্যবহার প্রভৃতি কারণে রোগ অন্যের শরীরে সংক্রমিত হয়। এইজন্য ক্ষয়রোগীকে স্বতন্ত্র রাখা কর্ত্তব্য। রোগীকে স্বতন্ত্র রাখিলে অন্যের সহিত তাহার সংস্পর্শ ঘটে না, সুতরাং রোগও সংক্রমিত হইতে পারে না।

কিন্তু রোগীকে স্বতন্ত্র রাখিলেও তাহার সুশ্রূষার জন্য লোকের আবশ্যক। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, সুস্থ ও সবল ব্যক্তির দেহে রোগবীজ প্রবেশ করিলেও রোগ উৎপন্ন করিতে না। সুতরাং সুস্থ ও সবল ব্যক্তির দ্বারাই ক্ষয়রোগীর সুশ্রূষা করা উচিত। শীর্ণ-দুর্ব্বল-দেহ এরূপ ব্যক্তির যক্ষ্মারোগীর নিকটে যাওয়া কদাচ উচিত নহে। এই নিয়মটি পালন করিলে যক্ষ্মারোগের সংক্রমণ ঘটে না। কিন্তু আমাদের দেশে কাহারও ক্ষয়রোগ হইলে তাহাকে পরিবারস্থ সমস্ত ব্যক্তি—এমন কি বালকবালিকাগণের সহিও একত্র থাকিতে

দেখা যায়। ইহা অত্যন্ত অন্যায় প্রথা এবং ইহার ফলে ক্ষয়রোগ বিস্তৃতি লাভ করিয়া সমাজের মহান্ অনিষ্ট সাধন করিতেছে। পিতা, মাতা, পুত্র, কন্যা, পুত্রবধূ—যাহারই কেন ক্ষয়রোগ হউক না, তাহাকে এইরূপ স্বতন্ত্র রাখিতে হইবে। পরিবারস্থ অন্যান্য ব্যক্তিগণের হিত কামনায় ক্ষয়রোগগ্রস্তেরও স্বতন্ত্র থাকা বিশেষ কর্ত্তব্য।

ক্ষয়রোগের বীজ বিষরূপে অন্যের শরীরে সংক্রমিত হয়। এই রোগে দোষ সকল কফ, থুথু এবং রক্তের সহিত নির্গত হয়, সুতরাং ঐ সকল পদার্থে রোগবীজ থাকে। এই জন্য ক্ষয় রোগীর কফ, থুথু, রক্ত প্রভৃতি যেখানে সেখানে ফেলা উচিত নহে। ঐ সমস্ত একটী পাত্রে সংগ্রহ করিয়া নির্জ্জন স্থানে পুঁতিয়া ফেলা বা ফেলিয়া চূর্ণ ঢাকা দেওয়া উচিত। রোগীর কফ থুথু বস্ত্রাদিতে লাগিলে, সেই বস্ত্রাদি ফেলিয়া দেওয়া বা গরম জলে সিদ্ধ করিয়া লওয়া উচিত। ফলতঃ কফ ও থুথুর সহিত যখন রোগ-বিষ থাকে, তখন সেই কফ ও থুথুকে বিষবৎ বিবেচনা করিয়া যাহাতে কোন উপায়ে অপরের দেহে প্রবেশ করিতে না পারে, সেইরূপ উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। এমন হইতে পারে যে, কোন ব্যক্তির ক্ষয়রোগ হইয়াছে অথচ ধরা পড়ে নাই, সে লোকের সঙ্গে মিলিতে হয়। অথবা রোগ হইয়াছে জানিয়াও সে স্বতন্ত্র না থাকিয়া লোকালয়ে যাইতেছে। ইহার প্রতিকারের জন্য কাহারও উচ্ছিষ্ট দ্রব্য খাওয়া, কাহারও সহিত একত্র খাওয়া, অন্যে যে দ্রব্যে মুখ দিয়াছে, তাহাতে মুখে দেওয়া বা অন্যের ব্যবহৃত বস্ত্র মাল্যাদি ব্যবহার পরিত্যাগ করাই উচিত।

যক্ষ্মারোগের কীট পিপীলিকা দ্বারা সংক্রমিত হইতে পারে। ইহার প্রতিষেধের জন্য যক্ষ্মারোগীর কফ ও থুথুতে যাহাতে পিপীলিকা বসিতে না পারে—তাহা করা উচিত এবং খাদ্য ও পানীয়ে যাহাতে কীট-পিপীলিকা বসিতে না পারে এরূপ সাবধানে রাখা কর্ত্তব্য।

ক্ষয়রোগীর হাচিবার বা কাশিবার সময় সূক্ষ্ম থুথু কফের ফেণার সহিত রোগবীজ নির্গত করিয়া শরীরে প্রবিষ্ট হইতে পারে। এইজন্য শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে।

"মুখ আবৃত না করিয়া হাচিবে না এবং হাই তুলিবে না।" এই নিয়মটী সকলে পালন করিলে কথিত সংক্রমণ ঘটিতে পারে না।

পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকদিগের মতে গৃহ মধ্যে নির্ম্মল বায়ু এবং রৌদ্র প্রবেশ করিলে ক্ষয় রোগের জীবাণু মরিয়া যায়। আমাদের দেশে বাস্তু গৃহ নির্ম্মাণ করিবার যে সকল নিয়ম আছে, সেই সকল নিয়ম অনুযায়ী গৃহ প্রস্তুত করিলে গৃহে যথেষ্ট বায়ু ও রৌদ্র প্রবেশ করে। সেই জন্যই বোধ হয় আয়ুর্ব্বেদে এ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলা হয় নাই। আমাদের স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধীয় অনেক নীতি ধর্ম্মশাস্ত্রের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট আছে দেখা যায়। ধর্ম্মশাস্ত্রের উপদেশ পালন করিলেই সেই সকল নীতির অনুসরণ করা হয়। ধর্ম্মের সঙ্গে আমরা যে কত অমূল্য জিনিষ হারাইয়াছি, তাহার ইয়ত্তা নাই এবং তাহারই ফলে আমরা আজি এত ব্যাধি সঙ্কুল। যদি আবার আমরা সে কালের মত শাস্ত্রবিধি মানিয়া চলি—সে কালের রীতি-নীতি—সে কালের শিক্ষা-দীক্ষার অনুকরণ করিয়া আবার যদি আমরা অতীত গৌরবকে সমাদর করিতে শিক্ষা করিতে পারি,—সকল বিষয়ে সংযমী হইবার জন্য আবার যদি আমরা কায়মনো-

বাক্যে বদ্ধ পরিকর হই—তাহা হইলে নষ্ট প্রায় সোনার বাংলা আবার পূর্ব্ব মূর্ত্তি ধারণ করিতে পারে। কিন্তু দেশের লোকে এ সকল কথা বুঝিবেন কি ?

শ্রী—

ম্যালেরিয়া তত্ত্ব।

ইহা আনন্দের বিষয় যে, বাঙ্গালী জাতির কিসে উন্নতি হয় এ বিষয়ে বাঙ্গালী মাত্রেই অনুসন্ধিৎসু হইয়াছেন এবং বাঙ্গালী জাতির বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তি অনেক পর্য্যালোচনা করিতেছেন। লেফটেনাণ্ট কর্ণেল শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বঙ্গবাসী হিন্দুগণকে "ধ্বংসোন্মুখ জাতি" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি কয়েক বৎসরের সেন্সস-বিবরণী হইতে দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, বাঙ্গালী হিন্দুর সংখ্যা ক্রমশঃই হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে। তিনি মুসলমান জাতির সংখ্যা-বৃদ্ধি ও হিন্দু জাতির সংখ্যা-হ্রাস দেখাইয়া হিন্দুর সামাজিক রীতি-নীতির মধ্যে তাহার ধ্বংসের কারণ নিহিত আছে ইহা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত কিশোরীলাল সরকার মহাশয় ঐ প্রবন্ধের উত্তরে ঐ সকল সেন্সস বিবরণী হইতেই দেখাইয়াছেন যে, বাঙ্গালী-হিন্দু ক্ষয় হইতেছে ইহা সত্য, কিন্তু তাহার কারণ হিন্দুর আচার-ব্যবহারে নহে, তাহার কারণ অন্যত্র। তাহার প্রধান কারণ বাঙ্গালার ম্যালেরিয়া।

শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রবন্ধে আর কিছু উপকার হউক বা না হউক—বাঙ্গালী প্রকৃতই ধ্বংসোন্মুখ কিনা সে বিষয়ে অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তির দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে ও তাঁহারা সকলেই সেন্সস বিবরণী যথেষ্ট যত্ন সহকারে পর্য্যালোচনা করিয়াছেন এবং তাঁহাদের মধ্যে অনেক বিষয়ে অনেক মতভেদ থাকিলেও ইহা সর্ব্বসম্মতিমতে স্বীকৃত হইয়াছে যে, বাঙ্গালী হিন্দু জাতির সংখ্যাবৃদ্ধি কমিয়া আসিতেছে এবং শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয় ব্যতীত অপর সকলেই স্বীকার করেন যে, বাঙ্গালী জাতির কি হিন্দু, কি মুসলমান সকলেরই সংখ্যাবৃদ্ধি কমিয়া আসিতেছে। এই সংখ্যাহ্রাসের কারণ এবং তাহার প্রতিকার সম্বন্ধে বহু মতভেদ দৃষ্ট হয় কিন্তু এ কথা অবিসম্বাদিত সত্য যে, বঙ্গদেশে জন্মের হার অপেক্ষা মৃত্যুর হার অধিক এবং এদেশে মৃত্যুর হার যেরূপ ভীষণ, পৃথিবীর অন্য কোনও দেশে সেরূপ আছে কিনা সন্দেহ। জন্মের হার এবং মৃত্যুর হার হাজার-করা হিসাবে ধরা হইয়া থাকে এবং সে সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলা আবশ্যক মনে করিতেছি। বাঙ্গালা দেশে জন্মহার খুব অধিক, কিন্তু মৃত্যুহার দেখিলে মনে হয়—এ কেবল মরিবার জন্যই জন্ম।

জন্মহার

দেশ	১৮৮১	১৮৯০	১৯০১	১৯০৪	১৯০৫
বঙ্গদেশ	৪৭·৯	৫১·৮	৪৩·৯	৪২·৩৯	৩৯·৫
ইংলণ্ড	৩৪·৭	৩০·২			২৭·২

মৃত্যুহার—

দেশ	১৮৮৫	১৮৯১	১৮৯৩	১৯০৩	১৯০৪	১৯০৫
ইংলণ্ড		১৯৮	১৭	১৫·৪	১৫·৩	১৫·২
বঙ্গদেশ	২২৭৮	২৬·৯৪	৩১·৩২	৩৩·৩৩	৩২·৪৫	৩৮·৩
বম্বে	২৭·২৬	৩২·৩০	৪১·৩৯	৩১·৮৪		
মাদ্রাজ	২৬·২	২২·৩	২২০৫	২১০৪		

বাঙ্গালা দেশে মৃত্যুর বন্যা যে রূপ প্রবল-ভাবে বহিয়া চলিয়াছে, এমন আর কোথায় ? মৃত্যু সকল দেশেই আছে, সকল মানবেরই আছে, জন্মিলে মরিতে হইবে, কিন্তু আমাদের একি মরণ ? স্বাভাবিক বার্দ্ধক্য অনেক সময় মৃত্যুর কারণ ; আকস্মিক আধিদৈবিক ঘটনা বহুশঃ মৃত্যুর কারণ, অনেক ব্যাধি—যাহার হস্ত হইতে মানুষ আপনাকে রক্ষা করিতে সক্ষম—সেই সকল নিবার্য্য-ব্যাধিতেও অনেকে মৃত্যু মুখে পতিত হয়।

এই সকল নিবার্য্য-ব্যাধির প্রতিপত্তি ইংলণ্ডে কিরূপ শুনিবেন !—তাহা দ্বারা হাজার করা ৭ জনের অধিক মৃত্যুমুখে পতিত হয় না। বঙ্গদেশে হাজার করা প্রায় ৩০ জন ঐরূপ ব্যাধিতে জীবন ত্যাগ করে। আর ঐ ৩০ জনের মধ্যে ২০।২১ জনের একমাত্র জ্বর রোগেই জীবনের অবসান হয়। এ কি মরণ ! মৃত্যু চাহি না—একথা আমি একবারও বলিবনা, মৃত্যু ত চাহি, কিন্তু পৃথিবীর লোক যেমন করিয়া মরে—তেমনি করিয়া মরিতে চাহি—এ সৃষ্টিছাড়া মরণ চাহি না। এ পৃথিবীর আঁস্তাকুড়ে পচিয়া পচিয়া মরিতে চাহি না। বাঙ্গালা দেশে এখন কিরূপ মৃত্যু বিচরণ করিতেছে, তাহার প্রকৃষ্ট জ্ঞানের জন্য জন্ম-মৃত্যুর তালিকা পরীক্ষা করা আবশ্যক হইতে পারে, কিন্তু পরিপূর্ণ পূর্ণিমার সৌন্দর্য্য বুঝিবার জন্য যেমন রুদ্ধ গৃহে বসিয়া চাঁদের ছবি না দেখিয়া মুক্ত আকাশতলে দাড়াইয়া জ্যোৎস্না-সাগরে ডুবিয়া যাইতে হয়, তেমনি বঙ্গদেশের এখন কি অবস্থা, তাহা হৃদয়ে অনুভব করিতে হইলে, সেন্সস-বিবরণী ফেলিয়া রাখিয়া বাঙ্গালার পল্লীগ্রামে যাইতে হয়। সেখানে গেলে আর বিচার-বিতর্ক মনে আসিবে না,—বাঙ্গালার যে কি অবস্থা হইয়াছে—তাহা আর বুঝিতে বিলম্ব হইবে না। কোথায় গেল পল্লীবাসীর সে সৌন্দর্য্য, সে উচ্চহাস্য, সে ক্রীড়া-কলরোল, সে আত্মীয়-স্বজন-ভরা-প্রফুল্ল সংসার ! কোথায় গেল সে সম্মুখ সংগ্রাম—সে জীবন্ত জীবন !—কোথায় গেল সে আনন্দ উৎসব,—কোথায় গেল সে পূজা-পার্ব্বণ? বাঙ্গালার পল্লীগ্রাম—যাহা একদিন উৎসবের আনন্দ ভবন ছিল, যেখানে একদিন বালকের কলরোলে, যুবকের সঙ্গীতে, বৃদ্ধের ক্রীড়ায় আনন্দের অসীম প্রস্রবন উন্মুক্ত ছিল,—যেখানে একদিন কুলবধূগণ সুস্থ-সুন্দর দেহে সবল শিশু ক্রোড়ে লইয়া "আয় চাঁদ আয়" বলিয়া মধুর কণ্ঠে আকাশের দেবতাকে মুগ্ধ করিত—নারীগণের ব্রতে—দেবার্চ্চনায়, গুরুসেবায় দেব ভাব জাগরিত হইত—যুবক ও প্রৌঢ়জনের কীর্ত্তনে, তর্জ্জায়, যাত্রায়, পাঁচালীতে অনন্ত স্ফূর্ত্তি মুখরিত হইয়া উঠিত—সেই পল্লী-গ্রাম আজ নিরানন্দের ছায়ায় অন্ধকার,—সেখানে আজ লোকসংখ্যা বিরল,—যাহারা বাঁচিয়া আছে তাহারা কঙ্কালসার, ম্রিয়মান, আনন্দের,—স্ফূর্ত্তির চিহ্ন মাত্র নাই—সে স্থান শ্মশানের পূর্ব্বাভাষ মাত্র।

কোনও কোনও গ্রামে প্রবেশ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, অনেক গৃহ জনশূন্য; কোথাও বা একটি বৃহৎ অট্টালিকা, একদিন সে বাটীতে দোল, দুর্গোৎসব প্রভৃতি বারমাসে

তের পার্ব্বণ হইত – এখন সে অট্টালিকা ভগ্নপ্রায়,—তাহারাই একটী ঘরে দুইটী বিধবা,—কেবল বিধবা বলিয়াই প্রাণে বাঁচিয়া আছেন।

অনেক বাটীতে ঘরে ঘরেই জ্বর, শুশ্রূষা করিবার লোক পাওয়া যায় না। কাহারও জ্বর আসিয়াছে—কাহারও আসিতেছে—কাহারও বা কিছুক্ষণ পরে আসিবে। কেহ মুমূর্ষু, কেহ বা উত্থানশক্তি রহিত। পাঁচজনে দেখা হইলে রোগের কথা, শোকের কথা, দুঃখের কথা। এই ত এখন বাঙ্গালার প্রাণের কথা,—আমি একথা চাহি না। একদিন জন্ম—একদিন মৃত্যু ; মাঝের দিন কয়টা প্লীহা-যকৃতের বেদনা—জ্বর। এই ত এখন বাঙ্গালার জীবন! এ জীবন-কি জীবন—না একটা দুর্ব্বহ ভার! এ জীবনে কি আনন্দ আছে, উৎসাহ আছে, না আশার আলো আছে? আমি এ জীবন চাহি না। ১৯১৬ সালের যে সরকারী স্বাস্থ্য বিবরণ (Report on sanitation in Bengal for the year 1916) প্রকাশিত হইয়াছে, তদবলম্বনে "ভারতবর্ষ" পত্রিকার গত মাঘ মাসের সংখ্যায় বঙ্গদেশে ১৯১৬ সালের একটী মৃত্যু সংখ্যার তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে। তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায়, ১৯১৬ সালে সারা বঙ্গদেশ হইতে সর্ব্বশুদ্ধ ১২,৪১,০ ২১ জন যমপুরে প্রেরিত হইয়াছে। তন্মধ্যে একমাত্র জ্বর রোগেই ৯,০৯৮৮০ জনের মৃত্যু হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে বর্দ্ধমান বিভাগ হইতে ১৭৪৬৮০, প্রেসিডেন্সি বিভাগ হইতে ১,৮১,৫৮৩ ; রাজসাহী বিভাগ হইতে ২,৮২১৮৭ ; ঢাকা বিভাগ হইতে ১৮৫৩৭৬ এবং চট্টগ্রাম বিভাগ হইতে ৮৬০৫৪ একুনে ৯০৯৮৮০ জন একমাত্র জ্বর রোগেই যমালয়ে গমন করিয়াছে। কি ভীষণ অবস্থা!

ম্যালেরিয়া যে বাঙ্গালা দেশের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে এবং এই ম্যালেরিয়াকে বঙ্গদেশ হইতে বিদূরিত করিতে না পারিলে যে দেশের মঙ্গল নাই—সে বিষয়ে দুইমত হইবার কারণ দেখা যায় না।

এই "আয়ুর্ব্বেদের" এক সংখ্যায় পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে—"কি কুক্ষণে জানিনা ম্যালেরিয়া-বিষ বাঙ্গলার পল্লীগুলিতে প্রবেশ করিয়াছিল। এই বিষের জ্বালায় বাঙ্গালার কত পল্লীরই যে সর্ব্বনাশ সাধিত হইয়াছে, তাহা ভাবিলেও বুক ফাটিয়া যায়। সর্ব্বাগ্রে আমাদের চিরত্যক্ত পল্লীগুলিকে ম্যালেরিয়ার হস্ত হইতে রক্ষা করিতে হইবে। পল্লীমাতাকে রক্ষা করিতে পারিলে তবে আমরা নিজেরা রক্ষা পাইব।" কিন্তু ম্যালেরিয়া বিদূরিত করিবার কথা চিন্তা করিতে গেলে প্রথমেই একটা আতঙ্ক উপস্থিত হয়,—"একি সম্ভব? এত বড় ভীষণ রাক্ষস—যে সমস্ত দেশকে গ্রাস করিয়া বসিয়াছে—তাহাকে বিতাড়িত করিবার শক্তি-সামর্থ্য কোথায়? আমরা অর্থহীন—শক্তিহীন—আমরা দেশ হইতে ম্যালেরিয়া তাড়াইয়া দিব—ইহা অসম্ভব।" কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে শ্রীভগবানের রাজ্যে কিছুই অসম্ভব নহে। তাঁহার নাম স্মরণ করিয়া দেশবাসীগণ ম্যালেরিয়াকে দেশ হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলে তাঁহারা যে কৃতকার্য্য হইবেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বসু-বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠার দিবসে প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত সার জগদীশ চন্দ্র বসু মহাশয় এই কথাই দেশ জননীকে নিবেদন করিয়াছেন—"কি সেই মহাসত্য—যাহার জন্য এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইল? তাহা এই যে, মানুষ যখন তাহার জীবন ও সমস্ত আরাধনা কোন

উদ্দেশ্যে নিবেদন করে, সেই উদ্দেশ্য কখনও বিফল হয় না, যাহা অসম্ভব ছিল, তাহা সম্ভব হইয়া থাকে।" আমাদের দেশে সকলের মনে এই ভাবটী জাগরিত করিতে হইবে, তাহা হইলে সূর্য্যোদয়ে যেমন অন্ধকার বিদূরিত হয়, তেমনই এদেশ হইতে ম্যালেরিয়া দূরীভূত হইবে।

ম্যালেরিয়াকে তাড়িত করিতে হইলে আমাদের কয়েকটী বিষয় বিশেষভাবে আলোচনা করা আবশ্যক :—

১ম—ম্যালেরিয়া উৎপত্তির কারণ কি?

২য়—ম্যালেরিয়া নিবার্য্য ও প্রতিকার যোগ্য কি না এবং কোনও দেশ হইতে দূরীভূত করা গিয়াছে কি না?

৩য়—ম্যালেরিয়া নিবারণের কি সহজ উপায় আমাদের দেশে অবলম্বিত হইতে পারে?

এই সকল বিষয়ের আলোচনা বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির দ্বারাই হওয়া সম্ভব ও বাঞ্ছনীয়। তবে এবিষয়ে সাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিবার জন্য আমি কিঞ্চিৎ আভাস দিবার চেষ্টা করিব।

প্রথম কথা ম্যালেরিয়া উৎপত্তির কারণ সম্বন্ধে। যে দেশ নিম্ন, জলাময়—যেখানে পয়ঃ প্রণালীর সুব্যবস্থা নাই, যেখানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয়ের আধিক্য—যেস্থান জঙ্গলাকীর্ণ—সেই সকল স্থলেই ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব দৃষ্ট হয়।

আমাদের দেশে পূর্ব্বে ম্যালেরিয়া ছিল না, এখন সমস্ত দেশ ম্যালেরিয়ায় আচ্ছন্ন হইয়াছে ইহার কারণ কি?

এত আমাদের সেই পুরাতন দেশ? কোথা হইতে ম্যালেরিয়া আসিল?

(১) অনেক মনীষী এইরূপ সিদ্ধান্ত করেন—"পীড়া যত কারণেই হউক, তাহার মধ্যে নবাগত মানব সংসর্গ একটী প্রধান কারণ। যখন কোন দেশে অন্যত্র হইতে নূতন মানবের সমাগম হয় তখন কি এক অদ্ভুত কারণে নূতন নূতন পীড়াও আসিয়া উপস্থিত হয়। নূতন জাতির সংস্পর্শে পুরাতন জাতির জাতীয় আচার-ব্যবহার-রীতি-নীতির যে পরিবর্ত্তন হয়, তাহা আপাত দৃষ্টিতে কুফল প্রসূ বলিয়া অনুমিত না হইতে পারে, কিন্তু তাহার ফলও যে মারাত্মক তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। আহার-পরিচ্ছদ, উৎ-উৎসব, আনন্দ, ক্রীড়া—সকল বিষয়েই জাতীয়তা বিসর্জ্জন করিয়া নূতন পন্থা অবলম্বনে সেই জাতি যে ধ্বংসোন্মুখ হয়, তাহার নিদর্শন পৃথিবীর অন্যান্য জাতির সঙ্গে আমরাও হইয়াছি।

(২) এদেশে রেলওয়ে-বিস্তারের সহিত ম্যালেরিয়ার আবির্ভাব বিশেষ সংশ্লিষ্ট আছে। রেলপথের দুইধারে যে নালা থাকে, তাহাতে জল জমিয়া থাকে এবং রেলপথের দ্বারা গ্রামের জল নিঃসরণের পথ অনেক স্থলে বন্ধ হইয়া যায়। রাজা দিগম্বর মিত্র এইমত সর্ব্বপ্রথমে সাধারণের গোচরে আনয়ন করেন।

দেশের উত্তরোত্তর বর্দ্ধমান দারিদ্র্য যে দেশবাসীকে দুর্ব্বল করিয়া আনে, তাহার ফলে নূতন রোগের আবির্ভাব সুগম হয়।

আমাদের বিলাস-বাসনা প্রবল, অথচ আমাদের ক্ষেত্রে ধান্য জন্মেনা, যে উপায় অবলম্বনে ধান্য জন্মিতে পারে, তাহা আমাদের সাধ্যাতীত, আমাদের শিল্প নাই, বাণিজ্য নাই। আমাদের খাইবার সংস্থান নাই পরিবার সঙ্গতি নাই এরূপ ক্ষেত্রে রোগের বীজ যেমন ফলে এমন আর কিছুই নহে।

উপরে যে তিনটী কারণের কথা উল্লেখ করিলাম, উহারা সম্পূর্ণ পৃথক নহে, পরস্পর

সংশ্লিষ্ট। ঐ সকল কারণ এবং আরও কতকগুলি কারণ পরোক্ষভাবে ম্যালেরিয়া উৎপাদনের সহায়তা করে। ম্যালেরিয়ার প্রত্যক্ষ কারণ সম্বন্ধে এক্ষণে বিজ্ঞান স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। ম্যালেরিয়া শব্দটী ইটালীয়, উহার ধাতুগত অর্থ মন্দ বাতাস (mala—মন্দ aria—বাতাস) ইংরাজী বৈদ্যক সাহিত্যে ১৮২৭ সালে এই কথাটী প্রবেশ লাভ করে। ম্যালেরিয়া জ্বরের লক্ষণাবলী এত সুস্পষ্ট যে, ম্যালেরিয়া-নির্ণয় আদৌ দুঃসাধ্য নহে এবং যে দেশে এই ম্যালেরিয়া রোগ প্রবেশ লাভ করিয়াছে, সেই দেশবাসীর দেহের ও মনের যে ইহা সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছে তাহাও সর্ব্ববাদী সম্মত। কিন্তু ইহার নিদান সম্বন্ধে পূর্ব্বে কেহই কোনও সিদ্ধান্ত স্থির করিতে পারেন নাই। সাধারণতঃ ইহা একপ্রকারের বিষ বলিয়া অনুমিত হইত, কোনও প্রকারে উক্ত বিষ শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া জ্বর আনয়ন করিত। বৈজ্ঞানিকেরা উক্ত বিষের অনুসন্ধান অনেকস্থলে করিয়াছেন, আর্দ্রভূমিতে, জলায় উদ্ভিদরাজ্যে,—কিন্তু তাহাতে সফলতা লাভ করেন নাই।

অনেকে অনুমান করিতেন যে, দিবসের অতিরিক্ত উত্তাপের পর সহসা নৈশ আর্দ্র শীতবায়ু দেহে সংলগ্ন হইয়া ম্যালেরিয়া উৎপাদন করিত। ম্যালেরিয়ার-কারণ অনুসন্ধিৎসুগণ অবশেষে দেখিতে পাইলেন, যে ম্যালেরিয়াগ্রস্ত রোগীর রক্তমধ্যে একপ্রকার জীবাণু পরিলক্ষিত হয়—অপর কোন রোগীর রক্তে উক্ত জীবাণুর অস্তিত্ব নাই এবং যাহারই রক্তমধ্যে উক্ত জীবাণু পুষ্ট হইতেছে দেখিতে পওয়া গিয়াছে, তাহারই ম্যালেরিয়া জ্বর হইয়াছে। উক্ত জীবাণু যে ম্যালেরিয়ার নিদান তাহা বুঝিতে বাকী থাকিল না, কিন্তু কোথা হইতে ঐ জীবাণু আইসে, উহা কি জাতীয় এবং কিরূপে উহা দেহ হইতে দেহান্তরে পরিচালিত হয়, তাহার অনুসন্ধান চলিতে লাগিল।

অনুসন্ধানে যিনি সফলকাম হইলেন. তিনি নিজের আত্ম প্রসাদের সহিত পৃথিবীর ধন্যবাদ ও তৎসহ নোবেল পারিতোষিক প্রাপ্ত হইলেন। সে অধিক দিনের কথা নহে, ১৮৯৯ সালে মাদ্রাজের জনৈক I, M, S, কাপ্তেন Ranold Ross তাঁহার আবিষ্কার সভ্যজগতের সমক্ষে উপস্থিত করেন। তখন হইতে ম্যালেরিয়ার নিদান সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে আর মতদ্বৈধ বা সন্দেহ নাই। এক্ষণে ইহা অবিসম্বাদিত রূপে স্থির হইয়াছে যে, ম্যালেরিয়াগ্রস্ত রোগীর রক্তে যে বিশেষ জীবাণু দেখিতে পাওয়া যায়, উক্ত জীবাণুর দেহের মধ্যে প্রবেশই ম্যালেরিয়ার একমাত্র কারণ—কোনও রূপে কোনও দেহে উক্ত জীবাণু-প্রবেশ নিবারণ করিতে পারিলে সেই দেহে ম্যালেরিয়া জ্বর কিছুতেই আসিবে না। সুতরাং উক্ত জীবাণু দেহের মধ্যে কি প্রকারে সংক্রামিত হয়, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা জ্ঞাতব্য বিষয়। নিঃশ্বাসে বায়ুর সহিত, পানে জলের সহিত খাদ্যের সহিত বা অপর কোন প্রকারে উহা সংক্রামিত হইতে পারে কিনা—তাহা পরীক্ষা করা হইয়াছে। পরীক্ষার চরম সিদ্ধান্ত Ranold Ross.এর কীর্ত্তি এই যে, এক জাতীয় মশক আছে—কেবল তাহারাই উক্ত জীবাণু একদেহ হইতে দেহান্তরে লইয়া যাইতে পারে এবং লইয়া গিয়া থাকে। ঐ মশকের নাম anopheles উক্ত মশক রক্ত শোষণ কালে ম্যালেরিয়াগ্রস্ত রোগীর রক্তসহ উক্ত জীবাণু

শোষণ করিয়া লয়—উক্ত জীবাণু উক্ত মশক দেহে বিনষ্ট না হইয়া পুষ্টি ও বল লাভ করে। পরে জীবাণুবাহী এনোফিলিস মশক নীরোগ ব্যক্তির গাত্রে দংশন কালে উক্ত জীবাণু তাহার দেহে প্রবিষ্ট করাইয়া দেয়। উক্ত জীবাণু মনুষ্য রক্ত মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়া শীঘ্র শীঘ্র বংশ বৃদ্ধি করিতে থাকে এবং তাহার ফলে সাধারণতঃ ১০।১১ দিবস পরে উক্ত ব্যক্তির শীত, কম্প পিপাসা হইয়া জ্বর আইসে। ইহা হইতে পরিলক্ষিত হইবে যে, এনোফিলিস মশক ম্যালেরিয়াগ্রস্ত লোকের রক্ত হইতে ম্যালেরিয়া বীজাণু গ্রহণ পূর্ব্বক নীরোগদেহে দংশন কালে উক্ত জীবাণু প্রবিষ্ট করাইয়া ম্যালেরিয়া রোগের প্রসার করিয়া থাকে—ইহাই ম্যালেরিয়ার প্রত্যক্ষ কারণ। দ্বিতীয় কথা—ম্যালেরিয়া নিবার্য্য ও প্রতিকার যোগ্য কিনা? মানব শরীরের গঠন প্রণালীর মধ্যে এমন কিছুই নাই যে, তাহার ম্যালেরিয়া হইবেই হইবে। পৃথিবীর অনেক স্থানেই ম্যালেরিয়া আদৌ নাই, সুতরাং ম্যালেরিয়া নিবার্য্য ও প্রতিকার যোগ্য—তদ্বিষয়ে দ্বিধা করিবার কোনও কারণ নাই। পৃথিবীর যে সকল স্থানে ম্যালেরিয়া সংক্রামক রূপে লোকক্ষয় করিয়া থাকে, তাহার মধ্যে যে যে স্থানে তাহা নিবারণ করিবার উপায় বিধিমত অবলম্বিত হইয়াছে সেই সেই স্থানে ম্যালেরিয়া প্রশমিত হইয়াছে।

ম্যালেরিয়া যে নরশক্তির নিকট পরাজয় স্বীকার করে, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে—তাহার কয়েকটী এখানে উদ্ধৃত করিতেছি।

(১) হাভানায় ম্যালেরিয়া জ্বরে মৃত্যু সংখ্যা-

বৎসর	সংখ্যা
১৮৮০	৩২৫
১৮৮৮	১০১
১৮৯০	১৭০
১৮৯৫	২০৬
১৯০০	৩৪৪

তৎপরে ১৯০১ সাল হইতে ম্যালেরিয়া বিদূরিত করিবার ব্যবস্থা হইয়া থাকে—

সাল	১৯০১	১৯০২	১৯০৩	১৯০৪	১৯০৫	১৯০৬
সংখ্যা	১৫১	১৭৭	৫১	৪৪	৩২	২৬

(২) সুইডেনহ্যাম বন্দরে

১৯০১ সালে জ্বর বিদূরিত করিবার চেষ্টার সূত্রপাত হয়।

বৎসর	১৯০১	১৯০২	১৯০৩	১৯০৪	১৯০৫
মৃত্যু সংখ্যা	৬১০	১৯৯	৬৯	৩২	২৩

(৩) হং কং

বৎসর	১৮৯৭	১৮৯৮	১৮৯৯	১৯০০
মৃত্যু সংখ্যা	১৯৭	১২৬	৬৩	১৬৩

তৎপরে ১৯০১ সালে ম্যালেরিয়া দমনের চেষ্টার ফলে—

বৎসর	১৯০১	১৯০২	১৯০৩	১৯০৪	১৯০৫
মৃত্যু সংখ্যা	১৩২	১২৮	৬৩	৫৮	৫৪

(৪) ইসম্যালিয়াতে ১৯০২ সালে ম্যালেরিয়া দমনের চেষ্টা হয়। ১৯০২ সালের পূর্ব্বের ও পরের মৃত্যুসংখ্যা বিশেষ বিবেচনার বিষয়—

বৎসর	মৃত্যুসংখ্যা
১৮৭৭	৩০০
১৮৮২	৪৮০
১৮৮৭	১৮০০
১৮৯২	২০৫০
১৮৯৭	২০৮৯
১৮৯৯	১৭৮৪
১৯০০	২২৮৪

১৯০১	১৯৯০
১৯০২	১৫৫১
১৯০৩	২১৪
১৯০৪	৯০
১৯০৫	৩৭

ইহা দেখিলে কে না বলিবে যে, ম্যালেরিয়াকে দূর করা মানবের শক্তির অধীন। ইহা দেখিলে নিজের দেশে ম্যালেরিয়ার এরূপ অক্ষুণ্ণ ও অপ্রতিহত প্রভাব দেখিয়া কে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে? পানামা খাল খনন কালে সহস্র সহস্র কুলিরা কার্য্য করিয়াছিল। প্রথম-বার পীত জ্বরে ও ম্যালেরিয়ায় বহু সহস্র কুলি প্রাণত্যাগ করে কিন্তু দ্বিতীয় বারে বিশেষ সতর্কতার সহিত কার্য্য করায় ঐ দুইটী রোগের প্রভাব লক্ষিত হয় নাই। সেই জন্য দ্বিতীয় বারে যাঁহার চেষ্টায় সুফল ফলিয়াছিল—তিনি বলিয়াছিলেন "আমি বিবেচনা করি যে, স্বাস্থ্য-রক্ষা সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞগণ এক্ষণে সহজেই দেখাইতে পারেন যে, গ্রীষ্মপ্রধান দেশে যে কোনও স্থানের অধিবাসীগণকে পীতজ্বর ও ম্যালেরিয়া হইতে রক্ষা করা মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত এবং তাহার জন্য যে সকল ব্যবস্থার প্রয়োজন তাহাও সহজ এবং অল্পব্যয়সাধ্য।" তিনি আরও বলিয়াছিলেন—"গ্রীষ্ম প্রধান দেশের যে সকল স্থান এক্ষণে ম্যালেরিয়ার কবলগ্রস্ত, সেই সকল স্থান মানব ইতিহাসের প্রভাত কালে ধনে-জনে-জ্ঞানে যেমন পরিপূর্ণ ছিল, আবার তেমনি হইবে।" এই আশার বানী এদেশে কি পরিপূর্ণ হইবে না?

তৃতীয় কথা ম্যালেরিয়া নিবারণ সম্বন্ধে।—ম্যালেরিয়ার যে সকল পরোক্ষ কারণের কথা উল্লিখিত হইয়াছে বা অন্য যে সকল পরোক্ষ কারণ আছে, তৎ সম্বন্ধে কোন আলোচনা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। ম্যালেরিয়ার যাহা প্রত্যক্ষ কারণ তাহা কিরূপে দূর করা যায়—তাহাই আমাদের এক্ষণে প্রধান ও প্রথম আলোচ্য বিষয় হইতেছে। এনো-ফিলিস বা ম্যালেরিয়া মশক ম্যালেরিয়ার প্রত্যক্ষ কারণ বলিয়া উক্ত মশকের নির্ব্বাচন ও উহার আকৃতি-প্রকৃতি, উদ্ভব-স্থিতি-লয় ইত্যাদি সম্বন্ধে জ্ঞান আমাদের অত্যাবশ্যকীয়। তৎপরে উক্ত মশক যাহাতে আমাদিগকে দংশন করিতে না পারে—তাহার উপায় স্থির করা এবং অবলম্বন করা প্রয়োজন।

এনোফিলিস বা ম্যালেরিয়া মশকের আকৃতি—সাধারণ মশকের আকৃতি হইতে কিছু ভিন্ন আছে।

উক্ত মশক সাধারণতঃ দূষিত জলে ডিম্ব ত্যাগ করে—যেখানে ডোবার চতুষ্পার্শ্বে নল-খাগড়া বা অন্য উদ্ভিজ্জের বাহুল্য আছে—সেই স্থানই ডিম্ব ত্যাগের প্রকৃষ্ট স্থান। ডিম্ব হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট উৎপন্ন হয়, উক্ত কীট কিছুদিন পরে রূপান্তরিত হইয়া গুটী হয় ও পরে গুটী হইতে মশক দেহ ধারণ করিয়া জল পরিত্যাগ করিয়া বায়ুতে বিচরণ করিতে আরম্ভ করে। জলে অবস্থান কালে ইঁহারা মৎস্যের খাদ্য।

ম্যালেরিয়া-মশকের জন্ম ও পুষ্টি—দূষিত জলাশয়ে, সেইজন্য সকল দেশেই দূষিত জলা-শয়ের সংস্কার ও পয়ঃপ্রণালীর সুব্যবস্থাই ম্যালেরিয়া-নিবারণের প্রথম উপায় বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। এক্ষণে আমাদের দেশে কি প্রকারে দূষিত জলাশয়ের সংস্কার ও পয়ঃ-প্রণালীর সুব্যবস্থা হইতে পারে, তাহাই প্রধান বিবেচনার বিষয়।

বাঙ্গালা দেশে অনেক নদী পুরাতন প্রবাহ পরিত্যাগ করিয়া নূতন পথে চলিতেছে, অনেক

নদী শুকাইয়া গিয়াছে—এই সকল নদীর সংস্কার করিয়া গ্রাম সমূহের জলপ্রণালী উক্ত নদীর সহিত সংযোগ করিয়া দিবার কল্পনা অনেকের মনে আসিয়া থাকে। কিন্তু একেবারে সমগ্র বঙ্গদেশের উন্নতিসাধন করিবার চেষ্টা যে কিরূপ ব্যয় ও শক্তি-সামর্থ্য সাপেক্ষ ও যেরূপ বিপদ সঙ্কুল, তাহাতে সে কল্পনা করিতে সাহস হয় না। আমি এমন উপায় চিন্তা করিতে বলি—যাহা আমাদের সাধারণের সাধ্যায়ত্ত অথচ যাহার ফলও সুনিশ্চিত।

আমি একএকটী বিশেষ গ্রাম অথবা পরস্পর সংলগ্ন দুই তিনটী গ্রামের এক একটী গ্রাম মণ্ডলী সম্বন্ধে পৃথক ভাবে ম্যালেরিয়া দমনের চেষ্টা করিবার কথা বলি। এইরূপ পৃথক চেষ্টায় প্রথম ও প্রধান ফল এই যে, যে গ্রামের উন্নতির চেষ্টা হইবে—সেই গ্রামের আপামর সাধারণ সকল ব্যক্তির উৎসাহ, উদ্যম ও চেষ্টার অবধি থাকিবে না। নিজের সংসার রক্ষা, বংশ রক্ষা, প্রাণরক্ষায় কে উদাসীন থাকিতে পারে? গ্রামের মধ্যে এই উন্নতির আবশ্যকীয়তা পরিস্ফুট হইয়া উঠিলে উক্ত উন্নতির জন্য কার্য্য করা সহজ হইবে।

কোনও একটী গ্রামের অধিবাসীগণ তাঁহাদের গ্রামে ম্যালেরিয়া দমনে অভিলাষী হইলে কি প্রণালী অবলম্বন করিবেন? সর্ব্বপ্রথমে তাঁহাদের মনের একাগ্রতা আবশ্যক এবং তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে দলাদলি, বিরোধ, স্বার্থপরতা—এ সকল ভুলিয়া যাইতে হইবে। গ্রামের মধ্যে বুদ্ধিমান, বলিষ্ঠ ও ক্লেশসহিষ্ণু অল্পসংখ্যক কয়েক জন ব্যক্তির উপর সাধারণতঃ সকল বিষয়ের ভার অর্পণ করিতে হইবে। তাহারা গ্রামে যে সকল পুষ্করিণী ডোবা, জলপ্রণালী আছে, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন। যে সকল পুষ্করিণী বৃহৎ—যাহাতে মৎস্য আছে—সেই সকল পুষ্করিণীতে ম্যালেরিয়া মশকের ডিম্ব মৎস্যের কলেবর বৃদ্ধি করে মাত্র, সুতরাং সেই সকল পুষ্করিণী দ্বারা বিশেষ ক্ষতি হয় না। কিন্তু যে সকল জলাশয় ক্ষুদ্র, জঙ্গলাকীর্ণ, সেই সকল পুষ্করিণীর সংস্কার করা আবশ্যক, কিন্তু পল্লীগ্রামে পুষ্করিণী-সংস্কার এক দুঃসাধ্য বিষয় হইতেছে। অনেক পুষ্করিণীর অধিকারী এক্ষণে নিঃস্ব হইয়াছেন—তাঁহাদের সংস্কার করিবার সামর্থ্য নাই। এরূপ স্থলে গ্রামের অন্য অধিবাসীগণ অপরের পুষ্করিণী সংস্কারে অর্থব্যয় করিতে কখনই স্বীকার করেন না এবং এমন কি—পুষ্করিণীর মালিকও অপরের সাহায্য লইতে প্রস্তুত হয়েন না। অনেকস্থলে একটী পুষ্করিণীর অনেকগুলি 'সরিক' থাকায় কেহই তাহার উন্নতি করে কোনও চেষ্টা করেন না। কিন্তু এখন আর সে গোলযোগ করিবার দিন নাই—যে পুষ্করিণীর সংস্কার গ্রামের স্বাস্থ্যের জন্য আবশ্যক, তাহা সকলে মিলিয়া করিতে হইবে—তাহাতে সরিকের তর্ক, স্বত্বের তর্ক, হিন্দু মুসলমানদের তর্ক করিবার আর অবসর নাই। পুষ্করিণী অসংস্কৃত থাকিলে তাহার বিষময় ফল গ্রামের সকলকেই সমানভাবে ভোগ করিতেই হইবে—সুতরাং পুষ্করিণী-সংস্কারের ভারও সকলকেই লইতে হইবে। বৃহৎ পুষ্করিণী ব্যতীত গ্রামে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয় আছে, তন্মধ্যে কতকগুলির সহিত গ্রামের পয়ঃপ্রণালীর কোনও সংযোগ নাই, তাহারা বদ্ধ জল মাত্র,—তাহাদিগকে বুজাইয়া ফেলিতে হইবে। আবার কতকগুলি জলাশয়—যাহা আপাততঃ দৃষ্টিতে বদ্ধজল বলিয়া প্রতীয়মান

হয়—প্রকৃতপক্ষে পয়ঃনালীর অংশমাত্র পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া রহিয়াছে, সেইগুলি পরস্পর সংলগ্ন করিয়া সমতলে এক বা বহু পয়ঃপ্রণালী গঠিত করিতে হইবে—যাহা দ্বারা গ্রামের কলুষ জলরাশি কোন স্থানে আবদ্ধ না থাকিয়া দূরে নদীগর্ভে বা অন্যত্র নিঃসারিত হইতে পারে।

এই প্রকারে কোন গ্রামের উন্নতি করিতে গেলে গ্রামবাসীগণকে প্রথমেই একটী অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে,—কোন্ পুষ্করিণীর সংস্কার আবশ্যক, কোন্ জলাশয় পূর্ণ করা প্রয়োজন, কোন্ স্থান দিয়া কি ভাবে পয়ঃপ্রণালী গঠন করিতে হইবে, কোথায় ম্যালেরিয়া-মশকের নিবাস—এই সকল বিষয়ে সাধারণ জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া গ্রামবাসীগণের কোনও কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার সাহস না হওয়া সঙ্গত ও স্বাভাবিক। গ্রামবাসীগণের দ্বিতীয় অসুবিধা—যাহা না হইলে কোন কাজই হয় না সেই অর্থের জন্য। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আমরা যদি একবার বদ্ধপরিকর হইয়া উঠিয়া দাঁড়াই, তবে ঐ দুইটি অসুবিধার কোনটাই আমাদের পথে অন্তরায় হইবে না।

যেমন পল্লীসংস্কারের ভার একদিকে পল্লীবাসীর উপর ন্যস্ত থাকিবে, তেমনি অপরদিকে যাঁহারা কৃতবিদ্য, জ্ঞানবৃদ্ধ বিশেষজ্ঞ, তাঁহারা পল্লী হইতে হইতে পলাইয়া সহরে আসিয়া অর্থ সঞ্চয় করিলেই তাঁহাদের সকল কর্ত্তব্য সম্পাদিত হইবে না। সহর হইতে তাঁহাদের পল্লীর দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। পল্লীবাসীর উদ্যম ও চেষ্টার সহিত তাঁহাদের সহানুভূতি ও জ্ঞানের সম্মিলন করিতে হইবে। এই সম্মিলনেই আমাদের সকল আশা ও ভরসা নিহিত আছে।

সহরের মধ্যে কলিকাতা প্রধান—জ্ঞানে ও অর্থে কলিকাতা দেশের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। এই কলিকাতা হইতে বঙ্গদেশের অর্দ্ধেক বিচ্ছিন্ন হইতেছিল বলিয়া সমস্ত বঙ্গদেশ আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিয়াছিল—, সমগ্র বঙ্গদেশের প্রতিও কলিকাতার অনেক কর্ত্তব্য আছে। সৌভাগ্যক্রমে এই কলিকাতা সহরে কয়েকটী দেশবৎসল-কৃতবিদ্য চিকিৎসক Anti Malarial League (ম্যালেরিয়া দমন সমিতি) নামে একটী সমিতি গঠিত করিয়াছেন এবং তাঁহারা দেশ মধ্যে যে কোনস্থানে গিয়া পল্লীবাসীদিগকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছেন। এই সমিতিকে লোকবল, অর্থবল দিয়া স্থায়ী করিতে হইবে,—জেলায় জেলায়—এমন কি প্রতি মহকুমায় যাহাতে উহার শাখা-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয় তাহা করিতে হইবে।

কলিকাতায় উক্ত 'ম্যালেরিয়া দমন সমিতির' নির্দ্দিষ্ট পন্থা আশ্রয় করিয়া কলিকাতার অদূরবর্ত্তী পানিহাটী মিউনিসিপ্যালিটিতে ম্যালেরিয়া নিবারণ সম্বন্ধে যে সকল কার্য্য হইয়াছে ও তাহা যেরূপ ফলদায়ক হইয়াছে তাহা নিতান্তই আশাপ্রদ। সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রায় বাহাদুরের নিকট আমি এই প্রবন্ধের প্রত্যেক তথ্যের জন্য ঋণী। তিনিই দশবর্ষাধিক কাল উক্ত পানিহাটী মিউনিসিপ্যালিটীতে ধীরে ধীরে কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। প্রথম প্রথম তাঁহার অভিজ্ঞতা, লোকবল বা অর্থবলের কিছুই ছিল না, তজ্জন্য কোনও কার্য্য করাও অত্যন্ত কঠিন হইয়াছিল, কিন্তু তিনি তাহাতে পশ্চাৎপদ হয়েন নাই। গ্রামের মধ্যে ম্যালেরিয়া-মশকের আবাসভূমি খুঁজিতে লাগিলেন,—দেখিলেন যে, বৃহৎ জলাশয়গুলিতে ম্যালেরিয়া-মশকের ডিম্ব নাই।

ক্ষুদ্র জলস্থলীগুলি প্রতি বৎসর মিউনিসি- প্যালিটী হইতে কয়েকজন কুলি পরিষ্কার করিবার চেষ্টা করিত—কিন্তু তাহাদের মধ্যে কোন্‌গুলি পূর্ণ করা প্রয়োজন, কোন্ গুলি পরিষ্কার করা প্রয়োজন—তাহার প্রভেদ বিচার না করায় তাহাদের দ্বারা ক্ষতিই হইত। সেই মহানুভব ব্যক্তি গ্রামের সর্ব্বস্থান দর্শন করিয়া গ্রামের একটী প্ল্যান প্রস্তুত করিয়া কোন্ জলাশয়গুলির কোনও সংস্কারের আবশ্যক নাই এবং কোন্ গুলির কিরূপ সংস্কার প্রয়োজন—তাহা স্থির করিলেন। গ্রামের পয়ঃ প্রণালী গুলি দ্বারা জল নিঃসরণের পথ স্থির করিলেন এবং সেই পথগুলি যাহাতে ভবিষ্যতে বিলুপ্ত না হইয়া যায় এবং তাহার কোথায় কিরূপ সমতল রাখা আবশ্যক—তাহা স্থায়ী করিবার জন্য সেই পথ গুলিতে প্রায়শঃ ৫০ ফিট অন্তরে একটী করিয়া পাকা গাথনী ইটের চিহ্ন রাখিলেন। পানিহাটী-মিউনিসি- প্যালিটীতে ম্যালেরিয়া দমন সংক্রান্ত এই কার্য্য ধীরে ধীরে বৎসরে বৎসরে অল্প অল্প করিয়া হইয়া আসিতেছে। ইহার ফল কি শুনিবেন? কার্য্য আরম্ভ হইবার ৮ বৎসর পরে যখন ম্যালেরিয়ায় উক্ত গ্রামের সংলগ্ন দুইটী গ্রামে মৃত্যুসংখ্যা ১৫৯ হইয়াছিল, তখন উক্ত গ্রামে ম্যালেরিয়ায় একটী লোকও মৃত্যুমুখে পতিত হয় নাই! উক্ত গ্রামের কার্য্য এখনও সুসম্পন্ন হয় নাই, এখনও কার্য্য চলিতেছে। কার্য্যে কত ব্যয় হইয়াছে জানেন? বৎসর বৎসর মাত্র ৬০।৭০ টাকা করিয়া ব্যয় হইয়া আসিতেছে। এ কথা শুনিলে কাহার না আশা হয়?

বিদেশে যাইবার আবশ্যক নাই—নিজের দেশে—নিজের চক্ষে যখন দেখিতে পাইতেছি যে, সামান্য ব্যয় করিয়া ম্যালেরিয়া-রাক্ষসীকে দমন করা যায়, তখন কি আমাদের নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকা উচিত? পানিহাটীতে যাহা হইয়াছে, তাহা বাঙ্গালা দেশের সকল মিউনিসিপ্যালিটীতে ও সকল গ্রামেই হইতে পারে। ম্যালেরিয়া দমন করিতে হইলে একটা রাজশক্তির প্রয়োগ এবং ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে হইবে—এ ধারণা পরিত্যাগ করিতে হইবে। বৎসর বৎসর ৫০।৬০ টাকা খরচ করিলে এবং ধীরভাবে অগ্রসর হইলে যদি ম্যালেরিয়া দমন করা যায়, তবে আমাদের নিরাশ হইবার কারণ কি? প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা দেখিতে পাইতেছি যে, গ্রামের মধ্যে সামান্য ব্যয়ে—অবশ্য এক বৎসরে নহে—কয়েক বৎসর ধরিয়া কার্য্য করিয়া একটি গ্রামের ও প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছে। যে উপায়ে এই গ্রামের উন্নতিলাভ হইয়াছে, তাহা বহুকষ্ট- সাধ্য অথবা বহু ব্যয়সাধ্য নহে,—ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত সমস্ত গ্রামের অধিবাসীদিগেরই ইহা হৃদয়ঙ্গম হওয়া আবশ্যক যে প্রকৃত প্রস্তাবে ম্যালেরিয়া দমন করা সহজসাধ্য ও অল্পব্যয় সাধ্য। কিন্তু গ্রামের মধ্যে পরস্পরের মধ্যে প্রীতি ও একমত তত সুলভ নহে। কিন্তু ইহা কি চিরকালই দুর্লভ থাকিবে?—কেবল এক প্রাণ হইলে, কেবল চেষ্টা, যত্ন, উদ্যম করিলে দেশের সর্ব্বাপেক্ষা যাহা অমঙ্গল, আমরা তাহাকে দূর করিতে পারি। এ অবস্থায়ও কি আমরা পরস্পরের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিরোধ সৃষ্টি করিয়া, আমাদের যাহা কিছু শক্তি ও যাহা কিছু বুদ্ধি আছে, তাহা ঐ বিরোধ-বহ্নিতে আহুতি অর্পণ করিয়া দেশের কল্যাণকে ভস্মীভূত করিব? না—দেশের কল্যাণের কথা স্মরণ করিয়া—নিজেদের অতি তুচ্ছ, অতি

সামান্য বিরোধের কথা বিস্মৃত হইব? এক্ষণে গ্রামে গ্রামে গ্রামবাসীগণ নিজের চেষ্টায় যাহাতে গ্রাম হইতে ম্যালেরিয়া বিদূরিত করিতে পারেন, তাহার জন্য কৃতসঙ্কল্প হউন, এবং সহজে ও অল্পব্যয়ে সঙ্কল্প সিদ্ধি করিবার জন্য উপায় নির্দ্ধারিত করিয়া লইয়া সেই পথে অগ্রসর হউন।

যাহাতে অল্পব্যয়ে, সহজে, নিজের চেষ্টায় নিজের কল্যাণ হইতে পারে, আমি সেই কথাই বলিতেছি। আমি অপর কাহারও উপর নির্ভর করার কথা বলি নাই। যাঁহারা নিজের সাহায্য করেন—ভগবান, এমন কি গবর্ণমেণ্ট পর্য্যন্ত তাঁহাদের সাহায্য করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ আমাদের বর্ত্তমান গভর্ণর বাহাদুর বঙ্গদেশে ম্যালেরিয়া দমনের জন্য বিধিমত চেষ্টা করিবেন তাহাতে আমাদের অণুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট ম্যালেরিয়া দমনের চেষ্টা করিতেছেন বলিয়া আমরা যদি নিশ্চিন্ত হই, তাহা হইলে আমাদিগকে আত্ম প্রতারিত হইতে হইবে। গবর্ণমেণ্ট যে সকল কার্য্য করিবেন বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছেন, তাহা কবে আরম্ভ হইবে, বা কবে শেষ হইবে—তাহার কিছুই স্থিরতা নাই। বিশেষতঃ গবর্ণমেণ্ট বঙ্গদেশের অনেক বৃহৎ ও প্রধান নদীর সংস্কার করিতে পারেন। তাহা সর্ব্বাংশে সুসম্পন্ন হইলেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লীর পয়ঃপ্রণালী সম্বন্ধে আমি যে ব্যবস্থার উল্লেখ করিয়াছি, তাহার প্রয়োজনীয়তা কিছুতেই ক্ষুণ্ণ হইবে না। বৃহৎ নদীর সংস্কার এবং ক্ষুদ্র পল্লীর পয়ঃ-প্রণালীর সুব্যবস্থা পরস্পর পরস্পরের সাহায্য করে। বরঞ্চ পল্লীর পয়োনালীর ব্যবস্থা অধিকতর প্রয়োজনীয় এবং তাহা পল্লীবাসীকেই করিতে হইবে। নিজের কর্ত্তব্যভার নিজের মাথার উপর বহন করিতে হইবে, পরের মুখের দিকে তাকাইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না।

বর্ত্তমান যুগধর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য করিলে—চারিদিকে ঘূর্ণমান কালচক্রের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে, আশায় প্রাণ পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। মনে হয়—সে দিন বহুদূরে নাই—যেদিন বঙ্গবাসী বিলাস-ব্যসনের কুহক বিস্মৃত হইবে, যেদিন সেই পুরাতন পরিত্যক্ত পল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে,—যেদিন বাঙ্গলার পল্লী-লক্ষ্মী পরিপূর্ণ পূর্ণিমায় অগাধ অনন্ত জ্যোৎস্না সমুদ্রের মধ্যে বসিয়া পল্লীবাসীর পূজা গ্রহণ করিবেন। সে দিন দূরবর্ত্তী নহে—যে দিন এই অসংখ্য স্রোতস্বতী বিভূষিত, দিগন্ত প্রসারী-হরিত-ক্ষেত্র-বিমণ্ডিত, শ্যামা-দোয়েল-পিকবর মুখরিত, বিবিধ ফুলফল ভরা তরুরাজি সমলঙ্কৃত সোণার বাঙ্গালা সুস্থ-সবল-সন্তান ক্রোড়ে ধরিয়া গৌরব অনুভব করিবে। সে দিন কল্পনার কুআশায় আচ্ছন্ন নহে-যেদিন বাঙ্গালী বিদ্যায়—জ্ঞানে—স্বাস্থ্যে—বলে—নিজের শির উন্নত করিয়া রাখিতে পারিবে। সেদিন আসিবেই আসিবে—যে দিন বাঙ্গালী হৃদয়ের অন্তস্তলে অনুভব করিবে, যে, বাঙ্গলার জলে—বাঙ্গালার মাটীতে বিধাতার করুণ আশীর্ব্বাদ নিহিত আছে। শুধু আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে—একথা ভুলিলে চলিবে না যে, আমরা মানুষ,—আমাদের মানুষের মত বাঁচিতে হইবে, আর আমাদের মানুষের মতই মরিতে হইবে আমরা সমস্ত জীবন ধরিয়া প্রতিদিন মরিতে মরিতে বাঁচিয়া থাকিতে চাহিনা।*

শ্রীরামরতন চট্টোপাধ্যায়।

* "ভারতবর্ষ' পত্রিকার জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত "কি চাহিনা" শীর্ষক প্রবন্ধ লেখক কর্ত্তৃক পরিবর্ত্তিত হইয়া প্রকাশিত হইল।

"আয়ুর্ব্বেদের" নিয়মাবলী।

১। আয়ুর্ব্বেদের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা, ডাক মাশুল ।৵০ আনা; আশ্বিন হইতে বর্ষারম্ভ। যিনি যে কোন সময়েই গ্রাহক হউন, সকলকেই আশ্বিন হইতে কাগজ লইতে হইবে। টাকাকড়ি কবিরাজ শ্রীযামিনীভূষণ রায় কবিরত্ন এম-এ, এম-বি, ৪৬নং বিডন্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

২। মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে "আয়ুর্ব্বেদ" প্রকাশিত হয়। যে মাসের কাগজ সেই মাসেরমধ্যে না পাইলে সংবাদ দিতে হয়। অন্যথা ঐ সংখ্যা পৃথক্ মূল্য দিয়া লইতে হইবে।

৩। প্রবন্ধ লেখকগণ কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিবেন। যে সকল প্রবন্ধ মুদ্রণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত না হয়, সাধারণতঃ সেগুলি নষ্ট করা হইয়া থাকে, তবে লেখক যদি প্রত্যর্পণ করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন এবং পুনঃ প্রেরণের টিকিট পাঠান, তাহা হইলে অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ পাঠান হইয়া থাকে।

৪। গ্রাহকগণ ঠিকানা পরিবর্ত্তনের সংবাদ যথাসময়ে জানাইবেন, নতুবা অপ্রাপ্ত সংখ্যার জন্য আমরা দায়ী হইব না। "আয়ুর্ব্বেদ" সম্বন্ধে কোন বিষয় জানাইতে হইলে অনুগ্রহপূর্ব্বক গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিবেন নচেৎ কাজের বড়ই অসুবিধা হয়।

৫। রীপ্লাই কার্ড কিম্বা টিকিট না দিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না।

৬। বিজ্ঞাপনের হার—

মাসিক	এক	পৃষ্ঠা	বা	দুই	কলম	৮৲
"	আধ	"	"	এক	"	৪॥০
"	সিকি	"	"	আধ	"	২৷৶০
"	অষ্টাংশ	"	"	সিকি	"	১॥০

বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দিতে হয়, এক বৎসরের মূল্য অগ্রিম দিলে টাকায় এক আনা কম লওয়া হয়। পত্র ও প্রবন্ধাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কবিরাজ শ্রীহরিপ্রসন্ন রায় কবিরত্ন
"আয়ুর্ব্বেদ" কার্য্যাধ্যক্ষ
২৯নং ফড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

২৯, ফড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট, অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় হইতে শ্রীহরিপ্রসন্ন রায় কবিরত্ন দ্বারা প্রকাশিত ও ১৬১ নং মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট, গোবর্দ্ধন মেসিন প্রেস হইতে শ্রীহরিপ্রসন্ন রায় কবিরত্ন দ্বারা মুদ্রিত।

গ্রন্থাদি প্রাপ্তি স্বীকার।

পরম বিদ্যোৎসাহী ডাঃ শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র রায় এল্, এম্, এস্, মহাশয় অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে নিম্নলিখিত চিত্র ও পুস্তকগুলি দান করিয়াছেন :—

(১) অস্থিভঙ্গ ও সন্ধিবিশ্লেষের ২৪ খানি চিত্র (২) স্বপ্রণীত বৈদ্যকব্যবহার বিদ্যা (Medical Jurisprudence) ১ খানি (৩) সৌদামিনীর প্রসূতি ও ধাত্রীশিক্ষা (৪) মহেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রণীত "বাঙ্গালা ফিজিওলজি" ১ খানা (৫) জীবাণু ও রক্ত সম্বন্ধীয় সুরঞ্জিত চিত্র ১ খানি।

মাঘের সূচী।